বঙ্গদর্শন

(নবপর্য্যায়)

মাসিক পত্র।

দশম বর্ষ।

১৩১৭

লেখকগণের নাম।

শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার, শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযাদবেশ্বর তর্করত্ন, মহামহোপাধ্যায় শ্রীগুরুচরণ তর্কদর্শনতীর্থ, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল রায়, শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল, শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল, শ্রীলোকনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীশশধর রায়, শ্রীশরচ্চন্দ্র চৌধুরী, শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী, শ্রীসখারাম গনেশ দেউস্কর, শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য, শ্রীকালিনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযতীন্দ্রমোহন গুপ্ত, শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়, শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়, শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, ৺রজনীকান্ত সেন, শ্রীমোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ, শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার, শ্রীজগদানন্দ রায়, শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার, শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ, শ্রীব্যোমকেশ মুস্তাফি, শ্রীজিতেন্দ্রলাল বসু, শ্রীরাধারমণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন বাগচি, শ্রীমতী হেমলতা দেবী, শ্রীমতী অনুরূপা দেবী, শ্রীসরসীলাল সরকার, শ্রীআনন্দগোপাল ঘোষ, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়, শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার, শ্রীসীতারাম বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসুধীরচন্দ্র মজুমদার, শ্রীপ্রফুল্লনারায়ণ রায়, শ্রীপ্রাণনাথ সরকার।

শ্রীশৈলেশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত।

এস, সি, মজুমদার কর্ত্তৃক
২০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, মজুমদার লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত।

বার্ষিক মূল্য ৩৷৵৹।

দশম বর্ষের সূচী।

বিষয় — পৃষ্ঠা।

বঙ্গদর্শন।

জাতিতত্ত্ব-আলোচনা।*

১। জাতিতত্ত্ব-আলোচনার প্রয়োজনীয়তা।

বিভিন্ন জাতির মনুষ্যের উৎপত্তি ও পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ নির্ণয় জাতিতত্ত্বের উদ্দেশ্য। জাতিভেদ নানা প্রকার; যথা, আকৃতিগত জাতিভেদ, দেশগত জাতিভেদ, ভাষাগত জাতিভেদ, ধর্ম্মগত জাতিভেদ, এবং বৃত্তিগত জাতিভেদ। হিন্দুসমাজে যেরূপ বর্ণভেদ বা জাতিভেদ বিদ্যমান আছে, তাহার প্রধান ঐহিক উপকারিতা—প্রধান গৌরব—এই যে ইহার কল্যাণে সমাজ বহুকাল আভ্যন্তরীণ অশান্তি ও অরাজকতার, এবং জীবন-সংগ্রামে প্রতিযোগিতার, হস্ত হইতে মুক্ত ছিল; কারণ বর্ণ ধর্ম্মে বিশ্বাসবশতঃ সকলেই পৈত্রিক পদ-মর্য্যাদা এবং বৃত্তি লইয়া সন্তুষ্ট ছিলেন, এবং এক জাতির লোক অপর জাতির লোকের সম্পদ, সম্ভ্রম ঈর্ষার চক্ষে দেখিতেন না। কিন্তু সে দিন আর আছে কি? যদি সে দিন না থাকে, তবে সামাজিক বিশৃঙ্খলার এবং অন্তর্দ্রোহের প্রতীকারের উপায় কি?

অনেক সরলহৃদয় ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু মনে করেন, শাস্ত্রের বিধি মানিয়া চলিলেই এখনও সমাজে শান্তি স্থাপিত হইতে পারে। কিন্তু সমাজ এখন শাস্ত্র হইতে এতদূরে আসিয়া পড়িয়াছে যে, উভয়ের সমন্বয় একরূপ অসম্ভব মনে হয়। প্রায় সাড়ে পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে বিজয়নগরের সম্রাট্ বুক্ক রায়ের কুলগুরু ও মন্ত্রী সুপ্রসিদ্ধ মাধবাচার্য্য লিখিয়া গিয়াছেন—†

---

* ভাগলপুরের গত সাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত।

এখন জাতিতত্ত্বের আলোচনায় আমাদের যথেষ্ট লাভ আছে সেজন্য এ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতেছে, প্রবন্ধ শেষ হইলে ইহার বিরুদ্ধে সুলিখিত রচনা প্রকাশেও আমাদের আপত্তি নাই। তবে মনে রাখিতে হইবে সত্যনিরূপণই আমাদের উদ্দেশ্য—বঃ সঃ।

† "অধ্যয়নবিধিস্তাবদর্থজ্ঞানপর্য্যন্তং সাঙ্গবেদপাঠমাচষ্টে। ন চ কলৌ যুগে তাদৃশং বিপ্রং কঞ্চিদপ্যুপলভামহে। তথা ব্রহ্মচারিপ্রকরণে বেদাশ্রমধর্ম্মা অধ্যয়নধর্ম্মাশ্চ সহস্রশঃ স্মর্য্যন্তে। ন চ তান্ সর্ব্বান্ যথাবদনুতিষ্ঠন মাণবকঃ কোঽপ্যুপলভ্যতে। যদা অধ্যয়নস্যৈব ঈদৃশী গতিঃ তদা কৈব কথা সাঙ্গ কৃৎস্ন বেদার্থানুষ্ঠানস্য। তথা সতি শাস্ত্রীয় মুখ্য ব্রাহ্মণ্যোপেতস্য কস্যাপ্যভাবাৎ ক্ষত্রিয়বৈশ্যজাত্যোশ্চ স্বরূপেণৈবোচ্ছিন্নত্বাৎ শুশ্রূষয়িতব্যানাং দ্বিজানামসম্ভবে তচ্ছুশ্রূষকস্য মুখ্যস্য শূদ্রস্যাত্মলাভানাশঙ্কনীয়ত্বাৎ কিং চাতুর্ব্বর্ণমুদ্দিশ্য প্রবৃত্তং ধর্ম্মশাস্ত্রং স্বরূপেণৈব লুপ্যতাম্? কিং বা মুখ্যাসম্ভবেঽপি যথাসম্ভবং চাতুর্বর্ণ্যমাশ্রিত্য ধর্ম্মশাস্ত্রং প্রবর্ত্ততাম্? ইতি মীমাংসায়াং স্বরূপলোপাৎ বরং যথাসম্ভবানুষ্ঠানমিত্যভিপ্রেত্য যুগপ্রবৃত্তাং সর্ব্বৈরপ্যবর্জনীয়ামধর্ম্মপ্রবৃত্তিমদোষত্বেনাভ্যুপগম্য 'তেষাং নিন্দা ন কর্ত্তব্যা" ইত্যুক্তম্।" পরাশরমাধব (Bombay Sanskrit Series, No. LIX), Vol. II., Part I. pp. 451—452.

"অর্থ বুঝিয়া ছয়টি অঙ্গের সহিত বেদ-পাঠকে অধ্যয়ন বলে। কিন্তু কলিযুগে সেইরূপ (অধীতবেদ) ব্রাহ্মণ আমরা মোটেই দেখিতে পাই না। স্মৃতিশাস্ত্রের ব্রহ্মচারি-প্রকরণে ব্রহ্মচর্য্য ও বেদাধ্যয়ন সম্বন্ধে বহুতর নিয়ম বিহিত হইয়াছে। সেই সকল নিয়ম প্রতিপালন করিতেছে এরূপ একটিও বিদ্যার্থী পাওয়া যায় না। যখন অধ্যয়নের এই দশা তখন শ্রুতি-স্মৃতি-বিহিত ক্রিয়া-কলাপের আর কথা কি? এ অবস্থায় যখন শাস্ত্রোক্ত মুখ্য ব্রাহ্মণের গুণবিশিষ্ট ব্রাহ্মণ আর পাওয়া যায় না, যখন ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য একেবারে বিলুপ্ত এবং সেবাযোগ্য দ্বিজের অভাববশতঃ সেবাধর্ম্মী মুখ্য শূদ্রের নিঃসন্দেহ অভাব উপস্থিত, তখন প্রশ্ন উঠিতে পারে,—চতুর্ব্বর্ণের নিমিত্ত প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মশাস্ত্র কি একেবারে লোপ করা হইবে, না মুখ্য বর্ণচতুষ্টয় প্রাপ্ত হওয়া অসম্ভব হইলেও যথাসম্ভব চতুর্ব্বর্ণ আশ্রয় করিয়া ধর্ম্মশাস্ত্র প্রচলিত রাখিতে হইবে? ধর্ম্মশাস্ত্র একেবারে লোপ করা অপেক্ষা বরং যথাসাধ্য শাস্ত্রবিধিপ্রতিপালনের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য এবং কালের গতি অনু-সারে সাধারণের অপরিহার্য্য শাস্ত্রবিরুদ্ধ কার্য্যকেও দোষহীন মনে করা উচিত। এইজন্যই পরাশর বলিয়াছেন 'ঐ সকল কার্য্যের নিন্দা করা উচিত নহে'।"

মাধবের প্রায় সাড়ে ছয় শত বৎসর পূর্ব্বেই যে বর্ণধর্ম্মবিধায়ক শাস্ত্র এবং সমাজের পরস্পর সম্বন্ধ বিচ্ছিন্নপ্রায় হইয়া-ছিল, শঙ্করাচার্য্য শারীরক ভাষ্যে (১।৩।৩৩) প্রকারান্তরে তাহার আভাষ দিয়া গিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন, "যিনি বলেন এখনকার লোকের মত আগেকার লোকেরও দেবতাদিগের সহিত আলাপ ব্যবহার করিবার সামর্থ্য ছিল না, তিনি জগতের বৈচিত্র্য অস্বীকার করিয়া ফেলেন।.... ... (তিনি হয় ত বলিতে পারেন) এখনকার মত কালান্তরেও বর্ণাশ্রমসম্বন্ধীয় নিয়মগুলি অব্যবস্থিতপ্রায় বা শাস্ত্রসম্মত ছিল; সুতরাং ব্যবস্থাবিধায়ক শাস্ত্র নিরর্থক।"*

পরিব্রাজকশ্রেষ্ঠ শঙ্কর সমগ্র ভারতের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়াই এই দুই পংক্তি লিখিয়া গিয়াছেন। ব্যবস্থাবিধায়ী শাস্ত্র নিরর্থক বা লোপ করিতে শঙ্কর বা মাধব ইঁহারা কেহই রাজি ছিলেন না। এই শ্রেণীর সমাজনেতাগণের অবস্থা মাধবের ব্যবস্থার অনুরূপ না হইয়া পারে না। কিন্তু মুখ্যবর্ণ প্রাপ্ত হওয়া অসম্ভব হইলেও যথাসম্ভব চতুর্ব্বর্ণ আশ্রয় করিয়াই ধর্ম্মশাস্ত্র প্রচলিত রাখিতে হইবে।" এই ব্যবস্থা আমাদের কাণে "হুকুমের নৌকা শুক্না দিয়ে চালাবার" ব্যবস্থার মত লাগে। বিজয়নগর-সম্রাটের কুলগুরু এবং মন্ত্রীর মত বড় লোকের পক্ষে এরূপ ব্যবস্থা সমাজে চালান সম্ভব ছিল। কিন্তু বিংশ শতাব্দিতে ব্রিটিশসাম্রাজ্যে তাহা করে কে? শক্তিমান্

* যস্তু ক্রিয়াদিদানীন্তনানামিব পূর্ব্বেষামপি নাস্তি দেবাদিভির্ব্যবহর্তুং সামর্থ্যমিতি স জগদ্বৈচিত্র্যং প্রতি-ষেধেৎ।......ইদানীমিব চ কালান্তরেঽপ্যব্যবস্থিতপ্রায়ান্ বর্ণাশ্রমধর্ম্মান্ প্রতিজানীত। ততশ্চ ব্যবস্থাবিধায়ি-শাস্ত্রমনর্থকং স্যাৎ।"

আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত যামিনীকান্ত তর্কতীর্থ ভাষ্যের এই অংশ আমায় দেখাইয়া দিয়াছেন।

সমাজনেতার অভাবে বর্ত্তমান সমাজকে ঠেলিয়া লইবার একমাত্র শক্তি ব্যক্তিগত অভিরুচি। কিন্তু ব্যক্তিভেদে রুচিভেদ। বিভিন্ন ব্যক্তির রুচির উপর নির্ভর করিয়া চলিতে হইলে সমাজের পক্ষে কোন দিকেই অগ্রসর হওয়া অসম্ভব; তাহাতে কেবল গোলমালের বৃদ্ধির সম্ভাবনা এবং হইয়াছেও তাহাই। সমাজকে এই গোলমালের হাত হইতে মুক্ত করিয়া উন্নতির দিকে চালাইতে হইলে একজন যোগ্য পথপ্রদর্শকের আবশ্যক। বর্ত্তমান সময়ে হিন্দুসমাজে কাহাকে এই পথপ্রর্দশকের স্থানে অভিষিক্ত করিতে পারেন? এই প্রশ্নের একমাত্র উত্তর জ্ঞানকে,—জাতিতত্ত্বের, সমাজতত্ত্বের জ্ঞানকে। জড়-বিজ্ঞানের আলোচনা করিয়া মানুষ যেমন জড়শক্তিকে আয়ত্ত করিতে, মানুষের কল্যাণসাধনে নিয়োগ করিতে, শিক্ষা করিয়াছেন, নর-বিজ্ঞানের—জাতিতত্ত্বের, সমাজতত্ত্বের আলোচনা করিয়াও তেমনি মানুষ যে, সমাজের শক্তিকে কতক পরিমাণে আয়ত্ত এবং কল্যাণকর অনুষ্ঠানে নিয়োজিত করিতে পারিবেন এ বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

২। জাতিতত্ত্ব-আলোচনার বৈজ্ঞানিক প্রণালী।

এদেশে এখন জাতিতত্ত্বের আলোচনা যে হইতেছে না এমন নহে। প্রতিবৎসর বিভিন্ন জাতির দ্বিজত্ব প্রতিপাদন বা প্রতিবাদার্থ অনেক পুস্তক প্রকাশিত হইতেছে। কিন্তু এত জাতিতত্ত্ব-বিষয়ক পুস্তক প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও জাতিতত্ত্বের প্রকৃত বৈজ্ঞানিক আলোচনা হইতেছে এমন কথা বলিতে সাহস হয় না। বরং এই সকল পুস্তকের দ্বারা বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে জাতিতত্ত্ব-আলোচনার পথ রুদ্ধ হইয়া আসিতেছে বলিয়া মনে হয়। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, বৈজ্ঞানিক প্রণালী কি? যুক্তি দ্বারা প্রমাণনিচয়ের প্রামাণিকতা বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া লইয়া তদুপরি সিদ্ধান্ত স্থাপনের নাম বৈজ্ঞানিক প্রণালী। এই প্রণালীর প্রথম সূত্র,—শ্রুতিই হউক আর স্মৃতিই হউক কোন প্রমাণই অভ্রান্ত সত্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না, যুক্তিবিরুদ্ধ হইলে শ্রুতিও অগ্রাহ্য। হিন্দু-দার্শনিক প্রণালীর সহিত বৈজ্ঞানিক প্রণালীর প্রভেদ এইটুকু—দার্শনিকেরা শব্দ, আপ্তবাক্য বা শ্রুতিকে বিনা বিচারে প্রমাণরূপে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত, কিন্তু বিজ্ঞানপন্থী সেরূপ করিতে প্রস্তুত নহেন। বৃহস্পতির ভাষায় বলিতে গেলে বৈজ্ঞানিক প্রণালীর সংজ্ঞা এইরূপ হয়।

“কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যং বিচারণা।
যুক্তিহীনে বিচারে তু ধর্ম্মহানি প্রজায়তে॥”

দার্শনিকেরা মুখে শ্রুতির চূড়ান্ত প্রামাণিকতা স্বীকার করিলেও কাযের বেলা ব্যাখ্যার ছলে শ্রুতিবাক্যকে যুক্তির উপর দাড় করাইয়াছেন। বৈদান্তিক, সাংখ্য, অদ্বৈতবাদী, দ্বৈতবাদী প্রভৃতির প্রদত্ত উপনিষদের বাক্যের বিবিধ ব্যাখ্যায় তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। দার্শনিকেরা শ্রুতিকে ঢাকের বাঁওয়ার মত ব্যবহার করিয়া মনের মত আওয়াজ বাহির করিয়া লইয়াছেন। দর্শনে প্রকৃতপক্ষে যুক্তিরই প্রাধান্য।

কিন্তু দার্শনিকের যুক্তি এবং বৈজ্ঞানিকের যুক্তির বিস্তর প্রভেদ আছে। যুক্তি দুই প্রকার; স্বভাবজ এবং পর্য্যবেক্ষণমূলক। মনের মধ্যে আপনা আপনি যে যুক্তি উদিত হয় তাহার নাম স্বভাবজ যুক্তি। দর্শনে এই যুক্তিরই প্রাধান্য। স্বভাবজ যুক্তির দোষ এই,—বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন রুচি, বিভিন্ন প্রকার শিক্ষা এবং বিভিন্ন প্রকারের সংসর্গে বাস নিবন্ধন ইহা বিভিন্ন আকার ধারণ করে এবং শুধু এইরূপ যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া চলিতে গেলে কোনও বিষয়ে একমত হওয়া অসম্ভব। কিন্তু পর্য্যবেক্ষণের দ্বারা বা দশটা দৃষ্টান্ত দেখিয়া যে যুক্তি গঠন করা যায়—সেই যুক্তি অবলম্বনে বিচারে প্রবৃত্ত হইলে সর্ব্ববাদি-সম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভবপর। বর্ত্তমান প্রস্তাবে পর্য্যবেক্ষণমূলক যুক্তির দ্বারা প্রমাণাদি পরীক্ষা করিয়া লইয়া কিরূপে জাতিতত্ত্ব আলোচনা করিতে হইবে তাহারই কিঞ্চিৎ আভাষ প্রদত্ত হইবে।

৩। শ্রুতি—চতুর্ব্বর্ণের উৎপত্তি।

চতুর্ব্বর্ণের উৎপত্তি সম্বন্ধে শ্রুতির সাক্ষ্য,—পুরুষসূক্ত (ঋগ্বেদ ১০।৯০।১১-১২):—

"যখন তাঁহারা পুরুষকে বিভাগ করিয়াছিলেন, তখন কয় খণ্ডে বিভাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার মুখ কি ছিল, বাহু কি ছিল, উরু কি ছিল, এবং পদ কি ছিল ?

"ব্রাহ্মণ ছিল পুরুষের মুখ, বাহু হইতে রাজন্য সৃষ্ট হইয়াছিল, উরুদ্বয় ছিল বৈশ্য, এবং পদ হইতে শূদ্র উৎপন্ন হইয়াছিল।"

যজুর্ব্বেদে (তৈত্তিরীয় সংহিতা ৭।১।১।৪—৬) বিষয়টি আরও পরিস্ফুট করা হইয়াছে। যজুর্মন্ত্র হইতে জানিতে পারি,—প্রজাপতি সন্তানকামনায় অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ করিয়াছিলেন; এবং মুখ হইতে মনুষ্যের মধ্যে ব্রাহ্মণ এবং পশুর মধ্যে ছাগল, বক্ষস্থল ও বাহু হইতে মনুষ্যের মধ্যে রাজন্য বা ক্ষত্রিয় এবং পশুর মধ্যে ভেড়া; উদর হইতে মানুষের মধ্যে বৈশ্য এবং পশুর মধ্যে গরু এবং পদদ্বয় হইতে মানুষের মধ্যে শূদ্র এবং পশুর মধ্যে ঘোড়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এই সকল বেদমন্ত্রে প্রাণীতত্ত্বের যে আভাষ পাওয়া যায় তদনুসারে এই মত দাঁড়ায়,—চারি বর্ণ একই প্রকার জীব, মনুষ্যের চারিটি বিভাগ নহে, স্বতন্ত্র চারি প্রকারের জীব, সৃষ্টির আদি হইতে স্বতন্ত্রভাবে বিদ্যমান।

বিজ্ঞানপন্থিগণ শ্রুতির এই প্রমাণও বিনা বিচারে অভ্রান্ত সত্যরূপে গ্রহণ করিতে পারেন না। চারিবর্ণ যে শুধু ভারতবর্ষেই দেখা যায় এমন নহে। পৃথিবীর সকল সভ্য-সমাজেই কোন এক সময়ে ব্রাহ্মণ বা পুরোহিত, রাজন্য বা শাসনকারী অভিজাত, বৈশ্য বা স্বাধীন কৃষক, বণিক ও পশুপালক, এবং শূদ্র বা ক্রীতদাস ও পরাধীন শ্রমজীবী, এই চারি শ্রেণী বা বর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। ইংলণ্ড, জর্ম্মাণি প্রভৃতি ইউরোপের যে যে দেশে রাজতন্ত্রশাসন বিদ্যমান আছে, সেই সেই দেশে চারিবর্ণের চিহ্ন এখনও লুপ্ত হয় নাই। তবে খৃষ্টানসমাজের বর্ণভেদের এবং হিন্দুসমাজের বর্ণভেদের মধ্যে প্রধান প্রভেদ এই যে, হিন্দুসমাজে ধর্ম্ম-যাজনবৃত্তি যেমন বংশানুগত, খৃষ্টানসমাজে সেরূপ নহে। কিন্তু প্রভেদ যাই হোক, পৃথিবীর সকল সভ্য-সমাজেই যখন চারিবর্ণ-ভেদ দেখা গিয়াছে,

তখন মানিয়া লইতে হইবে সকল স্থলেই একই রূপ কারণ একই রূপ ফল উৎপাদন করিয়াছে। পৃথিবীর অন্যান্য সমাজে যে যে কারণে চতুর্ব্বর্ণের উৎপত্তি হইয়াছে,ভারতবর্ষেও অবশ্য সেই সেই কারণের ক্রিয়াফলেই চতুর্ব্বর্ণের অভ্যুদয়। সুতরাং চতুর্ব্বর্ণের উৎপত্তি নিরূপণ করিতে হইলে প্রথমত বিভিন্ন সভ্যসমাজের পুরাবৃত্ত আলোচনা করিয়া বর্ণভেদের উৎপত্তি ও পরিণতি-নিয়ামক সাধারণ নীতি বাহির করিয়া লইতে হইবে এবং সেই হিসাবে শ্রুতির প্রমাণের বিচার করিয়া তবে সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতে হইবে।

৪। স্মৃতি—অতিরিক্ত বর্ণের উৎপত্তি।

যজুর্বেদের "রুদ্রাধ্যায়ে" (তৈত্তিরীয় সংহিতা ৪।৫।৪; বাজসনেয় সংহিতা ১৬) এবং "পুরুষমেধ প্রকরণে" (বাজসনেয় সংহিতা ৩৫; তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ৩।৪) নিষাদ, রথকার প্রভৃতি চতুর্ব্বর্ণের অতিরিক্ত অনেকগুলি বর্ণের নাম আছে। গৌতম, মনু, বৌধায়ন, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতির ধর্ম্মশাস্ত্রে এই সকল অতিরিক্ত বর্ণকে সঙ্কীর্ণ বা মিশ্র বর্ণ বলা হইয়াছে। বৌধায়নের মতে (১।৯।১৭।৯) বৈশ্যের ঔরষে এবং শূদ্রার গর্ভে জাত সন্তান 'রথকার'। রথকারের উৎপত্তি সম্বন্ধে যাজ্ঞবল্ক্যের মত অন্যরূপ। তিনি বলেন ক্ষত্রিয়ের ঔরষে এবং বৈশ্যার গর্ভে মাহিষ্যের উৎপত্তি; বৈশ্যের ঔরষে ও শূদ্রার গর্ভে করণের উৎপত্তি; এবং মাহিষ্যের ঔরষে ও করণজাতীয়া স্ত্রীর গর্ভে রথকারের উৎপত্তি (১।৯১—৯৫)। রথকারাদি অতিরিক্ত বর্ণসমূহের উৎপত্তির এই রূপ বিবরণ যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান বা বিশ্বাসযোগ্য কিম্বদন্তীমূলক নহে, পরবর্ত্তী কালের কল্পনাপ্রসূত, ইহা প্রমাণ করা কঠিন নহে।

'বর্ষাসু রথকার আদধীত', 'বর্ষাকালে রথকার যজ্ঞাগ্নি আধান করিবেন,' ভাষ্যকারগণের ধৃত এই শ্রুতিবচনে রথকারকে যজ্ঞ করিবার অধিকার প্রদান করা হইয়াছে। জৈমিনির পূর্ব্বমীমাংসা-সূত্রে (৬।১।৪৪-৫০) রথকারের সম্বন্ধে এক সুদীর্ঘ অধিকরণ আছে। রথকার 'ত্রৈবর্ণিক' অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, এবং বৈশ্য এই তিনের অন্যতম, অথবা শূদ্র, অথবা চাতুর্ব্বর্ণ্যাতিরিক্ত স্বতন্ত্র বর্ণ, এই অধিকরণে এই সকল প্রশ্ন সবিস্তর আলোচিত হইয়াছে। এই আলোচনার মধ্যে জাতিতত্ত্ব বিষয়ে শিখিবার এত কথা আছে যে মূল সূত্রগুলি শবর স্বামীর ভাষ্যের মর্ম্মানুবাদ সহ না উদ্ধৃত করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারা যায় না। জৈমিনির প্রথম সিদ্ধান্ত—

"বচনাদ্রথকারস্যাধানেঽস্য সর্ব্বশেষত্বাৎ॥"

শ্রুতির বিধি 'বর্ষাকালে রথকার অগ্নি আধান করিবে'। এখন জিজ্ঞাস্য, রথকার কি ত্রৈবর্ণিকের অন্যতম, অথবা অ-ত্রৈবর্ণিক? শ্রুতি বচনে ব্রাহ্মণ, রাজন্য, এবং বৈশ্যের অগ্নিস্থাপনের কথা বলিয়া সর্ব্বশেষে রথকারের অগ্নিস্থাপন বিহিত হইয়াছে। সর্ব্ব শেষে উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া রথকার অ-ত্রৈবর্ণিক।

তারপর পূর্ব্বপক্ষের মত উল্লিখিত হইয়াছে—

"ন্যায্যো বা কর্ম্মসংযোগাৎ
শূদ্রস্য প্রতিষিদ্ধত্বাৎ॥"

রথকার ত্রৈবর্ণিক বা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের অন্যতম এই কথাই ন্যায্য। শূদ্র অগ্নিস্থাপনে অসমর্থ সুতরাং রথকার শূদ্র নহে, ত্রৈবর্ণিকেরই অন্যতম, রথনির্ম্মাণবৃত্তি অবলম্বন করার নিমিত্ত 'রথকার' নামে অভিহিত।

জৈমিনির উত্তর—

"অকর্ম্মত্বাৎ নৈবং স্যাৎ॥"

ত্রৈবর্ণিকের মধ্যে রথনির্ম্মাণকারী থাকিতে পারে না, কারণ শিল্পকর্ম্ম দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের পক্ষে নিষিদ্ধ। সুতরাং রথকার ত্রিবর্ণের বহির্ভূত এবং বেদবাক্য অনুসারে অগ্নিস্থাপনের অধিকারী।

এইরূপ উত্তরের যুক্তি—

"আনর্থক্যং চ সংযোগাৎ॥"

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের অগ্নিস্থাপনের জন্য যথাক্রমে বসন্ত, গ্রীষ্ম ও শরৎ ঋতু বাঁধা আছে। এই তিন বর্ণের জন্য পুনরায় বর্ষাকাল বিহিত হইলে সেই বাক্য নিরর্থক হয়। সুতরাং মনে করিতে হইবে রথকার এই তিন বর্ণের বহির্ভূত।

পুনরায় পূর্ব্বপক্ষের আপত্তি উল্লিখিত হইয়াছে—

"গুণার্থেনেতি চেৎ॥"

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের মধ্যে এমন কেহ থাকিতে পারে যে মুখ্য অর্থে, অর্থাৎ রথ নির্ম্মাণ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে বলিয়া, রথকার নহে, কিন্তু গৌণ অর্থে অর্থাৎ রথ নির্ম্মাণ করিতে পারে বলিয়া রথকার বলিয়া অভিহিত হয়। বর্ষাকালে আধানের ব্যবস্থা তাহার নিমিত্ত।

জৈমিনির উত্তর—

"উক্তমনিমিত্তত্বম্॥"

আমরা বলিয়াছি এই সকল অগ্ন্যাধান সম্পর্কীয় শ্রুতি কালাদি কর্ম্মের অঙ্গবিধায়ক নহে, মূল-কর্ম্মবিধায়ক। পূর্ব্বেই যখন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, এবং বৈশ্যের অগ্ন্যাধান বিহিত হইয়াছে তখন রথকার ত্রৈবর্ণিকের অন্তর্ভূত হইলে, তৎসম্বন্ধে স্বতন্ত্র বিধি নিরর্থক হইয়া পড়ে। যাহার সম্বন্ধে আদৌ অগ্ন্যাধান বিহিত হয় নাই 'বর্ষাসু রথকার আদধীত' এই বিধি তাহার সম্বন্ধেই প্রযুজ্য। অতএব রথকার ত্রিবর্ণের বহির্ভূত।

জৈমিনির চরম সিদ্ধান্ত—

"সৌধন্বনাস্তু হীনত্বাৎ
মন্ত্রবর্ণাৎ প্রতীয়েরন্॥"

"যে সকল অত্রৈবর্ণিক ব্যক্তি রথ নির্ম্মাণ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে তাহারা সকলে অগ্ন্যাধানে অধিকারী রথকার নহে। সৌধন্বন জাতিবাচক শব্দ। সৌধন্বন নামক জাতি ত্রৈবর্ণিক হইতে কিঞ্চিৎ হীন, স্বতন্ত্র জাতি; শূদ্র, বৈশ্য, বা ক্ষত্রিয় নহে। "বর্ষাসু রথকার আদধীত" এই বচনে সৌধন্বনগণের অগ্ন্যাধানের বিধান করা হইয়াছে। এখন প্রশ্ন হইতে পারে সৌধন্বনগণ যে ত্রিবর্ণের কিঞ্চিৎ হীন এবং তাহারাই যে অগ্ন্যাধানের অধিকারী রথকার তাহা কি করিয়া জানা যায়? সৌধন্বনগণ যে ত্রিবর্ণের অপেক্ষা হীন তাহার প্রমাণ "প্রসিদ্ধি" অর্থাৎ উহা সকলেরই বিদিত। এবং বেদমন্ত্র হইতেও জানা যায় সৌধন্বন জাতিই অগ্ন্যাধানের অধিকারী রথকার। "সৌধন্বনা ঋভব শূরচক্ষসঃ" এবং "ঋভূণাস্ত" ইত্যাদি এই দুইটি রথকারের অগ্নি-আধানের

মন্ত্র। অতএব সৌধন্বনগণই ঋভু, এবং ঋভুগণই রথকার। কারণ বেদে আছে "নেমিং নময়ন্তি ঋভবো যথা" ঋভুগণ যেমন রথের নেমি যোগ করেন, যাঁহারা রথে নেমি যোগ করেন তাঁহারা ঋভু বলিয়া কথিত হন। রথকারেরা রথে নেমি যোগ করেন (সুতরাং ঋভু অর্থ রথকার)। অতএব (প্রমাণিত হইল) ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও নয় এবং শূদ্রও নয় এরূপ সৌধন্বন জাতিরই অগ্নি-আধানের অধিকার 'বর্ষাসু রথকার আদধীত, এই শ্রুতিতে বিহিত হইয়াছে।" *

শেষোক্ত সিদ্ধান্ত-সূত্র এবং তাহার ভাষ্য রথকার জাতির এবং অপরাপর অতিরিক্ত বর্ণের ইতিহাস-সম্পর্কীয় এত তথ্যপূর্ণ যে এই ক্ষুদ্র প্রস্তাবেও উহার সবিস্তর অনুবাদ এবং টীকার মূল না দিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। সূত্রের অক্ষরার্থ এই—"সৌধন্বনগণ (ত্রৈবর্ণিক অপেক্ষা) হীন এবং বেদমন্ত্রে (রথকাররূপে) বর্ণিত; সুতরাং (আধানমন্ত্রের রথকার শব্দে) সৌধন্বনগণকে বুঝিতে হইবে।" শবর স্বামীর ভাষ্য ঠিক সূত্রের অনুযায়ী। সূত্র ও ভাষ্য একত্র গ্রহণ করিলে আমরা সূত্রকারের সময়ের সমাজের একখানি সুন্দর চিত্র প্রাপ্ত হই। তখন রথ নির্ম্মাণ করিয়া ত্রিবর্ণের ইতর অনেক জাতিই জীবিকা নির্ব্বাহ করিত, তন্মধ্যে 'সৌধন্বন' নামক রথনির্ম্মাণেরও জাতিই বেদোক্ত রথকার স্থানীয় বলিয়া পরিগণিত হইত। সৌধন্বনগণের সামাজিক পদ সম্বন্ধে জৈমিনি বলিয়াছেন "হীনত্বাৎ", অর্থাৎ তিনি নিজে দেখিয়া বলিয়াছেন (ত্রিবর্ণের অপেক্ষা) হীন এই নিমিত্ত; এবং শবরও তদনুসারে লিখিয়াছেন "সৌধন্বনেরা যে দ্বিজাতি অপেক্ষা কিঞ্চিৎ হীন তাহা 'প্রসিদ্ধেঃ' অর্থাৎ প্রসিদ্ধ বা সকলের জানা। সৌধন্বন-রথকারেরা ত্রৈবর্ণিক অপেক্ষা হীন তাহার প্রমাণ স্বরূপ যে 'প্রসিদ্ধি' উল্লিখিত হইয়াছে ইহার ভিতরে একটি নিগূঢ় তথ্য লুক্কায়িত রহিয়াছে। সে তথ্যটি এই, রথকারেরা যে সঙ্কর বা মিশ্রবর্ণ একথা শবর স্বামীর সময় কল্পিত হয় নাই। জৈমিনি বা শবর যদি রথকার বা অপর কোন অতিরিক্ত বর্ণ সঙ্কীর্ণ হইতে পারে এই কথা জানিতেন তবে রথকার ত্রৈবর্ণিকও নয় শূদ্রও নয় এই কথা বুঝাইবার জন্য এত ক্লেশ স্বীকার করিতেন না, 'রথকার সঙ্কর' এই এক কথা বলিয়াই সকল গোল মিটাইয়া দিতেন। "জৈমিনীয় ন্যায়মালা-বিস্তারে" * মাধবাচার্য্য তাহাই

৪। ন তু সর্ব্ব এব অত্রৈবর্ণিকো রথকারঃ, 'সৌধন্বনাঃ—ইত্যেষ জাতিবচনঃ শব্দঃ, সৌধন্বনা নাম জাতিঃ অভিধীয়তে, হীনাস্তু কিঞ্চিৎ ত্রৈবর্ণিকেভ্যঃ জাত্যন্তরং ন তু শূদ্রাঃ ন বৈশ্যাঃ, ন ক্ষত্রিয়াঃ তেষাম্ ইদমাধানম্। 'কথম্ অবগম্যতে? প্রসিদ্ধের্মন্ত্রবর্ণাচ্চ, মন্ত্রবর্ণোহি ভবতি, সৌধন্বনা ঋভব শূরচক্ষসঃ—ইতি 'ঋভূণাস্ত'—ইতি রথকারস্য আধানমন্ত্রঃ। তস্মাৎ সৌধন্বনা ঋভবঃ—ইতি, ঋভবশ্চ রথকারাঃ। অপিচ 'নেমিং নময়ন্তি ঋভবো যথা'—ইতি যে নেমিং নময়ন্তি তে ঋভবঃ—ইত্যুচ্যন্তে—রথকারাশ্চ নেমিং নময়ন্তি। তস্মাৎ অত্রৈবর্ণিকানাম্ অশূদ্রাণাম্ এতৎ আধানম্—ইতি॥" "মীমাংসা-দর্শনম্." এসিয়াটিক সোসাইটি প্রকাশিত, পূর্ব্বঃ ষট্কঃ ৬৩২—৬৩৩ পৃঃ।

৫। জৈমিনীয় ন্যায়মালা-বিস্তরঃ" (পুনা, ১৮৯২) ৩১০ পৃঃ।

করিয়াছেন। মাধব যাজ্ঞবল্ক্যের দোহাই দিয়া রথকার 'সঙ্কীর্ণ জাতিবিশেষ' এই এক কথা বলিয়া পূর্ব্বপক্ষের মত খণ্ডন করিয়া দিয়াছেন। আপস্তম্বের ধর্ম্মসূত্র প্রাচীন অপাণিনীয় সংস্কৃতে লিখিত এই গ্রন্থে সঙ্কর বর্ণের কোন কথা নাই।

মীমাংসকগণের অনুগ্রহে রথকার জাতির ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে যেরূপ প্রচুর উপকরণ পাওয়া যায় অপরাপর অতিরিক্ত বর্ণের সম্বন্ধে সেরূপ উপকরণ দুর্লভ। কিন্তু ইহাদের উৎপত্তির যে বিবরণ স্মৃতিশাস্ত্রে পাওয়া যায় তাহাও যে পরবর্ত্তীকালের কল্পনামাত্র এরূপ অনুমান করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি অধিকাংশ অতিরিক্ত বর্ণেরই প্রথম উল্লেখ যজুর্ব্বেদের রুদ্রাধ্যায়েও পুরুষমেধ প্রকরণে। সুতরাং বৈদিক যুগের প্রায় প্রথমাবধিই যে অতিরিক্ত বর্ণের উৎপত্তি আরম্ভ হইয়াছিল সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। এখন জিজ্ঞাস্য, সেই সুদূর অতীতে, যখন বর্ণভেদের বন্ধন অত্যন্ত শিথিল ছিল, তখন কি বিভিন্ন বর্ণের স্ত্রীপুরুষের মিলন হইতে সুসংবদ্ধ বর্ণ বা জাতির উৎপত্তি সম্ভবে?

৫। নিবন্ধধৃত প্রমাণ—কায়স্থাদি আধুনিক জাতির উৎপত্তি।

আমরা এতক্ষণ যে যে শাস্ত্র হইতে জাতিতত্ত্বের উপকরণ সঙ্কলন করিয়াছি সেই সকল শাস্ত্র সম্বন্ধে একটি বিষয়ে নিঃসংশয় হওয়া যায়; এই সকল শাস্ত্রের পাঠাদি অপেক্ষাকৃত অবিকৃত অবস্থায় আমাদের হস্তগত হইয়াছে। ব্রাহ্মণেরা বহু যত্নে শ্রুতির পাঠের মৌলিকতা রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি কয়েক খানি প্রধান স্মৃতি গ্রন্থ সম্বন্ধেও কতক পরিমাণে সেকথা বলা যাইতে পারে। অন্যূন সহস্র বৎসর যাবৎ যে এই সকল ধর্ম্মশাস্ত্রের পাঠ একরূপ আকারে চলিয়া আসিতেছে প্রচলিত ভাষ্য, টীকা, প্রতীকাই তাহার প্রমাণ দিতেছে। কিন্তু ভাষ্য ও টীকা দ্বারা অবিকৃত অবস্থায় পরিরক্ষিত শাস্ত্রগ্রন্থ ছাড়াও অনেক ধর্ম্মশাস্ত্র এবং পুরাণ আছে যে সকল গ্রন্থ হইতে জাতিতত্ত্ব-বিষয়ক প্রমাণ সংগ্রহ করা যাইতে পারে। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, প্রাচীন ভাষ্য বা টীকা-হীন গ্রন্থ হইতে প্রাচীন প্রামাণ্য বচন বাছিয়া লইতে হইলে কি প্রণালী অবলম্বন করা উচিত? এ ক্ষেত্রে রঘুনন্দনাদি স্মৃতিনিবন্ধকারগণের পন্থানুসরণ ভিন্ন আর উপায় নাই। বৌদ্ধবিপ্লবের অবসান অবধি হিন্দুসমাজ আর মূলশাস্ত্র-গ্রন্থের দ্বারা শাসিত হয় নাই, নিবন্ধ বা সংগ্রহগ্রন্থে ধৃত বচন-প্রমাণানুসারে সমাজ নিয়মিত হইয়া আসিতেছে। প্রত্যেক হিন্দুরাজার সভায় এক এক জন করিয়া নিবন্ধকার থাকিতেন। আমাদের এই দেশের রাজাদের মধ্যে হরিবর্ম্মার সভার নিবন্ধকার ছিলেন তদীয় মন্ত্রী ভবদেব ভট্ট, বল্লালসেনের সভায় ছিলেন অনিরুদ্ধ ভট্ট এবং লক্ষ্মণ সেনের সভায় ছিলেন হলায়ুধ। মুসলমানী আমলের নিবন্ধকারেরা এই সকল প্রাচীন নিবন্ধকারগণের ধৃত বচনকে প্রমাণ রূপে গ্রহণ করিয়া ব্যবস্থা দিয়া গিয়াছেন; পারত পক্ষে স্বাধীনভাবে মূলশাস্ত্র হইতে বচন প্রমাণ গ্রহণ করেন নাই। রঘুনন্দন মলমাসতত্ত্বের সূচনায় লিখিয়াছেন—

"নিবন্ধান্ বহুধালোক্য নিবধ্যন্তে সতাং মুদে।"

তিনিই একাদশী তত্ত্বে লিখিয়াছেন—

"তস্মান্নানাদেশীয় সংগ্রহকারলিখিত-বচনসম্বাদাদেব প্রামাণ্যপরিগ্রহঃ।"

রঘুনন্দনেরও পূর্ব্ববর্ত্তী নিবন্ধকার মদনপাল "মদন-পারিজাতের" সূচনায় লিখিয়াছেন—

"হেমাদ্রিকল্পদ্রুমসাপরার্ক
স্মৃতার্থ সারান্ স্মৃতিচন্দ্রিকাঞ্চ।
মিতাক্ষরাদীনবলোক্য যত্না-
ন্নিবধ্যতে সংগ্রহতো নিবন্ধঃ॥"

দেবগিরির যাদবরাজ মহাদেবের সময়ে (১২৬০—১২৭১ খৃঃ অঃ) হেমাদ্রি সুপ্রসিদ্ধ "চতুর্ব্বর্গ-চিন্তামণি" সঙ্কলন করিয়াছিলেন। অপরার্ক আর একজন নিবন্ধকার, এবং "কল্পদ্রুমাদি" প্রসিদ্ধ নিবন্ধ।

প্রাচীন ভাষ্যকার বা টীকাকারগণ ব্যাখ্যা করেন নাই এবং নিবন্ধকারগণ ধরেন নাই এরূপ প্রাচীন শাস্ত্রবচন যে এখনও প্রাপ্ত হওয়া না যায় এমন নহে। কিন্তু যে সকল শাস্ত্রবাক্য ভাষ্যে বা নিবন্ধে স্থান পায় নাই তাহা শত প্রাচীন হইলেও সমাজশাসনে নিয়োজিত প্রকৃত শাস্ত্র বলিয়া অভিহিত হইতে পারে না। যে সকল শাস্ত্রবচন ভাষ্যাদিতে স্থান পাইয়াছে সে সকল বচনে অতীত ইতিহাসের অবিকৃত চিত্র থাকুক আর না থাকুক উহাদের ঐতিহাসিক মূল্য আছে; কেননা ঐ সকল বচন সমাজ-শাসনে নিয়োজিত হওয়ায় সমাজের জীবন-ইতিহাস নির্ম্মাণ করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু তদতিরিক্ত বচনে রচনাকারের স্বমত ভিন্ন জনসাধারণের মতের প্রতিধ্বনি বা সমাজের আকাঙ্ক্ষা বা আদর্শের আলেখ্য পাইতে আশা করিতে পারি না। সমাজতত্ত্ব বা পুরাবৃত্ত অনু-সন্ধানকারীর কাছে রচনাকারের মতেরও যে মূল্য না আছে এমন নহে। কিন্তু রচনাকার কে এবং কোন্ সময় কি অবস্থার ভিতর থাকিয়া গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন ইত্যাদি বিষয় না জানিতে পারিলে তাঁহার বাক্যের প্রামাণিকতা নিরূপণ করা কঠিন। সুতরাং সমাজতত্ত্ব-আলোচনাকারী যদি প্রামাণ্য এবং সমাজে আদৃত ভাষ্য, টীকা এবং নিবন্ধবহির্ভূত স্মৃতির বা পুরাণের বচন প্রমাণরূপে গ্রহণ করিতে চাহেন, তবে অতিমাত্রায় সাবধান হইয়া লইবেন।

ভাষ্য-নিবন্ধাদিতে প্রাচীনকালে রচিত শাস্ত্রবচনই ধৃত হইয়াছে, এবং মূল বচন রচনকালে আধুনিক অনেক জাতিই গঠিত হয় নাই; সুতরাং নিবন্ধাদিধৃত বচনে আধুনিক-জাতিনিচয়ের অধি-কাংশেরই নাম পাওয়া যায় না। আধুনিক-জাতিনিচয়ের উৎপত্তি সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় বিবরণ না থাকায় যে বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে এরূপ মনে হয় না। আমরা শ্রুতিনিবদ্ধ চতুর্ব্বর্ণের উৎপত্তিবিবরণ এবং মনু-যাজ্ঞ-বল্ক্যাদির অতিরিক্ত বর্ণের উৎপত্তি-বিবরণ হইতেই দেখিয়াছি কিরূপ ভিত্তির উপর ঐ সকল বিবরণ প্রতিষ্ঠিত। কমলাকর ভট্টের "শূদ্রধর্ম্মতত্ত্ব" * নামক নিবন্ধে

* "শূদ্র কমলাকর" বা শূদ্রধর্ম্মতত্ত্ব", ১৭৮৪ শকে শিলা ছাপাখানায় মুদ্রিত (লিথোগ্রাফ)। এসিয়াটিক সোসাইটীর লাইব্রেরীর পুস্তক।

আধুনিক বণিক্-মালাকারাদির যে বিবরণ পাওয়া যায় তাহাও ঐ একই ছাঁচে ঢালা। কমলাকর এই সকল বিবরণ প্রধানতঃ 'জাতিবিবেক' নামক গ্রন্থ হইতে সঙ্কলন করিয়াছেন। নিম্নে কয়েকটি প্রসিদ্ধ জাতির উৎপত্তি-বিবরণ প্রদত্ত হইল।

বণিক্—মালাকার।

"শূদ্রাদ্‌বৈশ্যায়াং যো জাতো বণিগ্‌জন
ইতি স্মৃতঃ।
পারসব্যাং চ মাহিষ্যান্মালাকারঃ স উচ্যতে॥'
(৮১ ক পৃঃ)

কায়স্থ।

"অথ কায়স্থোৎপত্তিঃ। পাদ্মে সৃষ্টিখণ্ডে—
সৃষ্ট্যাদৌ সদসৎ কর্ম্মজ্ঞপ্তয়ে প্রাণিনাং বিধিঃ।
ক্ষণং ধ্যানে স্থিতস্তস্য সর্ব্বকায়াদ্বিনির্গতঃ॥
দিব্যরূপঃ পুমান্ হস্তে মসীপাত্রং চ লেখনীম্
চিত্রগুপ্ত ইতিখ্যাতো ধর্ম্মরাজ সমীপতঃ॥
প্রাণিনাং সদসৎকর্ম্মলেখ্যায় স নিয়োজিতঃ।
ব্রহ্মণাতীন্দ্রিয়জ্ঞানী দেবাগ্ন্যো যজ্ঞভুক্ সদা॥
ভোজনাচ্চ সদাতস্মাদাহুতির্দীয়তে দ্বিজৈঃ।
ব্রহ্মকায়োদ্ভবোযস্মাৎকায়স্থোজাতিরুচ্যতে॥
নানাগোত্রাশ্চ তদ্বংশ্যাঃ কায়স্থাভুবি সন্তি বৈ।
স্কান্দেরেণুকামাহাত্ম্যে"—ইত্যাদি। রেণুকামাহাত্ম্য হইতে কমলাকার চন্দ্রসেন নামক ক্ষত্রিয় রাজর্ষির গর্ভবতী পত্নীর আখ্যান উদ্ধৃত করিয়াছেন। ক্ষত্রিয়কুলনাশক জামদগ্নি রামের ভয়ে চন্দ্রসেনপত্নী দাল্‌ভ্য ঋষির আশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। জামদগ্নি যাইয়া দাল্‌ভ্যকে অনুরোধ করিলেন, "গর্ভবতী চন্দ্রসেনপত্নীকে বাহির করিয়া দিন, আমি বধ করিব।" দাল্‌ভ্য চন্দ্রসেনপত্নীকে আনিয়া হাজির করিয়া বর চাহিলেন, "আমার গর্ভস্থ শিশুর জীবন ভিক্ষা দিন।" রাম উত্তর করিলেন—

"ক্ষত্রিয়ান্তকরশ্চায়ং তৎ ত্বং যাচিতবানসি।
প্রার্থিতশ্চ ত্বয়া বিপ্র কায়স্থো গর্ভ উত্তমঃ॥
তস্মাৎ কায়স্থ ইত্যাখ্যা ভবিষ্যতি শিশোঃ
শুভা।"

এই বলিয়া রাম চলিয়া গেলেন। তার পর
"কায়স্থ এষ উৎপন্নঃ ক্ষত্রিণ্যাং ক্ষত্রিয়াত্ততঃ।
রামাজ্ঞয়া স দাল্‌ভ্যেন ক্ষাত্রধর্ম্মাৎ বহিঃ
কৃতঃ॥
দত্তঃ কায়স্থ ধর্ম্মোঽস্মৈ চিত্রগুপ্তস্য যঃ স্মৃতঃ।
তদ্গোত্রজাশ্চ কায়স্থা দাল্‌ভ্যগোত্রাস্ততোভবন্॥
দাল্‌ভ্যোপদেশতস্তে বৈ ধর্ম্মিষ্ঠাঃ সত্যবাদিনঃ।
সদাচারপরা নিত্যং রতা হরিহরার্চ্চনে।
দেববিপ্রপিতৃণাং বৈ অতিথীনাং চ পূজকাঃ॥
মাহিষ্যবনিতাসূনুং বৈদেহাদ্যং প্রসূয়তে।
স কায়স্থ ইতি প্রোক্তস্তস্য কর্ম্ম বিধীয়তে॥
ক্ষত্রাদ্বৈশ্যায়াং মাহিষ্যো বিপ্রায়াং বৈশ্যজো
বৈদেহঃ।" (৮১ খ—৮২ খ পৃঃ)

কমলাকর-উদ্ধৃত কায়স্থের উৎপত্তিবিবরণে 'রকমারি' আছে। কিন্তু বণিক্, মালাকারের ন্যায় লোহকার, নাপিত, তৈলিক, শৌণ্ডিক, প্রভৃতির উৎপত্তি-বিবরণে এরূপ 'রকমারি' নাই। প্রাচীন তথাকথিত সঙ্কীর্ণ বর্ণনিচয়ের স্থলাভিষিক্ত এই সকল জাতিকে সটান ঐ সকল বর্ণের অবৈধ মিলনজাত অতি সঙ্করররূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। এই সকল বিবরণের ভিত্তি কি তাহা কমলাকরধৃত জাতিবিবেকের এই

তুরুস্ক উৎপত্তিবিবরণ দৃষ্টেই বুঝা যাইবে—
"মেদস্থ বনিতাকার্য্যাৎ সঙ্গতান্ধে নচেদ্রহঃ।
সা সূতে যবনং পুত্রং তুরুস্কঃ স প্রকীর্ত্তিতঃ।
প্রসিদ্ধো ম্লেচ্ছদেশে যো গোবধেনাস্থবর্ত্তনং॥"
(৮৩ থ পৃঃ)

এই প্রকার বিবরণ যে কষ্টকল্পনাপ্রসূত একথা বলাই বাহুল্য; এবং এ সকল বিবরণকে প্রত্যক্ষদৃষ্ট ঘটনা বিবৃতির ন্যায় খাঁটি ঐতিহাসিক প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়া জাতিতত্ত্ব আলোচনা করিবার চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র। তাই বলিয়া কি শাস্ত্রবচন একেবারে ছাড়িয়া দিয়া জাতিতত্ত্ব—জাতি বা বর্ণভেদের ইতিহাস আলোচনা করিতে হইবে? তা নয়। এ সকল বচনের সাক্ষাৎ ঐতিহাসিকতা না থাকিলেও পরোক্ষ ঐতিহাসিকতা আছে। কল্পনার আচরণের ভিতরে, যে যুগের যে জাতির কল্পনা, সেই যুগের সেই জাতির চিত্তবিলাসের একটি চিত্র লুক্কায়িত আছে। এ চিত্র চিনিয়া লইতে হইলে অন্যান্যপথে অনুসন্ধান করিয়া চিনিবার উপায় শিখিয়া লইতে হইবে। প্রত্নতত্ত্ব, লোকাচারতত্ত্ব, আকৃতিতত্ত্ব আলোচনা করিয়া সমাজের ইতিহাসের যে সূত্র পাওয়া যায় সেই সূত্র অনুসারে শাস্ত্রীয় প্রমাণের সারোদ্ধার করিয়া জাতিবিজ্ঞান সংকলিত করিতে হইবে। অন্যান্য প্রসঙ্গ বারান্তরে।

শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ।

সূর্য্যপূজা।*

বঙ্গভাষার অন্যতম সম্রাট স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় তাঁহার ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায় নামক অত্যুৎকৃষ্ট-গ্রন্থের উপক্রমণিকায় লিখিয়াছেন:—

"মনুষ্যগণ যেরূপ জল, বায়ু, মৃত্তিকাদি নৈসর্গিক বস্তুতে পরিবেষ্টিত থাকেন, তাঁহাদের আচার ব্যবহার ধর্ম্মাদি বিষয়ে তাহার সম্পূর্ণ কার্য্যকারিত্ব অবলোকিত হয়। তুষার-মণ্ডিত হিমালয়, গিরি-নিঃসৃত নির্ঝর, আবর্ত্তময়ী বেগবতী নদী, চিত্ত-চমৎকারক ভয়ানক জল-প্রপাত, অযত্ন-সম্ভূত উষ্ণপ্রস্রবণ, দিগ্দাহকারী দাব-দাহ, বসুমতীর তেজঃপ্রকাশিনী সুচঞ্চল-শিখা-নিঃসারিণী লেহায়মানা জ্বালামুখী, বিংশতি সহস্র জনের সন্তাপ-নাশক বিস্তৃত-শাখা-প্রসারক বিশাল বটবৃক্ষ, শ্বাপদ-নাদে নিনাদিত বিবিধ-বিভীষিকা-সংযুক্ত জন-শূন্য মহারণ্য, পর্ব্বতাকার-তরঙ্গ-বিশিষ্ট প্রসারিত সমুদ্র, প্রবল ঝঞ্ঝাবাত, ঘোরতর শিলাবৃষ্টি, জীবিতাশা-সংহারক হৃৎকম্প-কারক বজ্রধ্বনি প্রলয়-শঙ্কা-সমুদ্ভাবক ভীতিজনক ভূমিকম্প, প্রখর-রশ্মি-প্রদীপ্ত নিদাঘ-মধ্যাহ্ন, মনঃ-প্রফুল্লকারী সুধাময়ী শারদীয় পূর্ণিমা, অসংখ্য-তারকা-মণ্ডিত তিমিরাবৃত বিশুদ্ধ গগন-মণ্ডল ইত্যাদি ভারতভূমি-সম্বন্ধীয় নৈসর্গিক বস্তু ও নৈসর্গিক ব্যাপার অচিরাগত কৌতু-

* আসাম গৌরীপুরে উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত।

হলাক্রান্ত হিন্দু-জাতীয়দিগের অন্তঃকরণ এরূপ ভীত, চমৎকৃত ও অভিভূত করিয়া ফেলিল যে, তাঁহারা প্রভাবশালী প্রাকৃত পদার্থ সমুদয়কে সচেতন দেবতা জ্ঞান করিয়া সর্ব্বাপেক্ষায় তদীয় উপাসনাতেই প্রবৃত্ত থাকিলেন।"………তাঁহারা "সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কেবল আপনাদের অর্থাৎ মানব-জাতির প্রকৃতিই বুঝিতেন এবং তদ্দৃষ্টে ঐ সমস্ত জড়ময় বস্তুরও মনুষ্যাদির ন্যায় হস্ত-পদাদি অবয়ব এবং ক্ষুৎপিপাসা ও কাম-ক্রোধাদি মনোবৃত্তি বিদ্যমান আছে বলিয়া বিশ্বাস করিতেন।*

ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ের প্রথম ভাগ দ্বিতীয় বার মুদ্রিত হইবার চতুর্দ্দশ বর্ষ পরে "বৌদ্ধ ভারতবর্ষ" নামক গ্রন্থ-প্রণেতা † রিজ ডেভিড্‌স্ সাহেবও লিখিয়াছিলেন :—

The hypothesis of a soul—a material, but very subtle sort of homunculus within the body—had been started to explain the life and motion, sleep and death, of human beings. By analogy, logically enough, it had been extended ever more and more widely, to explain similar phenomena in the outside world. There must be a soul in the sun. How else could, one explain its majestic march across the heavens, evidently purposeful, its rising and its setting, its beauty and light and glow? If its action was somewhat mysterious, who was to limit or define the motives of the soul of so glorious a creature? There was no argument about it. It was taken for granted, and any one who doubted was simply impious. These souls in nature gods they called them had, of course, no existence outside the brains of the men who made them. And the external souls, the gods, were therefore identical in origin and nature with the souls supposed to live inside human bodies.

পৃথিবীর ধর্ম্মমতের প্রথম যুগের ইতিহাস আলোচনা করিলে ইহাই দেখা যাইবে যে সে সময়ে উহা অনেকাংশে একরূপই ছিল; মনুষ্যের আরাধ্য বস্তুও অনেক স্থানে একই ছিল। ধ্যান ও ধারণা, জ্ঞান ও বিশ্বাস, ভক্তি ও প্রীতি, সুখ ও সুবিধা এ সকলের তারতম্যানুসারে আরাধনার বা মূর্ত্তির বা পূজাসংশ্লিষ্ট কর্ম্ম-কাণ্ডের তারতম্য এখনও যেমন ঘটিয়া থাকে, তখনও তেমনি ঘটিত। তাঁহারা যে সমস্ত বস্তুর উপকারিতা অনুভব করিতেন, তাহাতেই প্রাণ ও দেবত্ব আরোপ

* ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়, প্রথমভাগ উপক্রমণিকা, ৭৫ পৃষ্ঠা।

† Buddhist India—T. W. Rhys Davids, pp. 255-56

করিয়া পূজা করিতেন। তাই আমরা দেখিতে পাই, এককালে সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, অসি, অশ্ব, বৃক্ষ, সরীসৃপ প্রভৃতি পৃথিবীর সকল জাতিরই পূজা পাইত। * তাতারের প্রান্তরে, লিবিয়ার মরুভূমে, পারস্যের শৈলশিখরে, ভাগীরথীর তীরে, অরিনোকোর কান্তারে তাই এককালে শত সহস্র তপনভক্তের স্তবধ্বনিত হইয়া আকাশ বিকম্পিত করিত। †

আজিও ভারতবর্ষ সে পূজা বিস্মৃত হয় নাই, আজিও তাহার লতা-গুল্ম-সমাচ্ছন্ন শ্বাপদসঙ্কুল বনমধ্যে, নাগকুলাশ্রয় ভগ্ন জীর্ণ ভূপতিত ইষ্টকস্তূপ মধ্যে এবং কচিৎ সুদৃশ্য বহুপ্রাচীন মন্দিরাভ্যন্তরে নানাবিধ সূর্য্যমূর্ত্তি নয়নগোচর হয়। বুদ্ধ-গয়ার মোহন্তের গৃহে এইরূপ একটি সূর্য্যমূর্ত্তি দেখিয়া প্রত্নতত্ত্ববিৎ কানিংহাম সাহেব লিখিয়াছেন—'ভারতবাসীরা গ্রীকদিগের নিকট হইতে মূর্ত্তি-শিল্প শিক্ষা করিয়াছে, ফার্গুসন সাহেবের এই মত আমিও সমর্থন করি।' ‡

শুধু ফার্গুসন বা কানিংহাম নহেন, অধিকাংশ পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণই বলিয়া আসিতেছেন, গ্রীস এবং রোম হইতেই ভারতবর্ষ চিত্রবিদ্যা ও মূর্ত্তিগঠন-কৌশল শিক্ষা করিয়াছে, এ বিষয়ে রোমই নাকি আমাদের শিক্ষাগুরু? ইহা একটি গুরুতর কথা, ভারতবর্ষের শিক্ষা, কল্পনা, জ্ঞান, সভ্যতা ও বিকাশের প্রাচীনত্বের এবং মৌলিকত্বের উপর আঘাত! দেশের শিক্ষিত সমাজের অধুনা এদিকে দৃষ্টি পতিত হইয়াছে বলিয়া ভরসা হয়, সে দিন অধিক দূর নহে, যে দিন আমরা সত্যের পথ দিয়া প্রকৃত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিব। তবে আমি এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, যে বহু উচ্চ আদর্শে গঠিত সভ্যতা শত সহস্র বর্ষ ধরিয়া ভারতের ন্যায় একটি সুবিস্তৃত অতি বৃহৎ জনপদে রাজ্ঞীর ন্যায় বিরাজমানা, যাহার ইঙ্গিতে জগতের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য, পৃথ্বিপূজিত নাটক * সমুজ্জ্বল হর্ম্ম্যচয়, সুগঠিত মন্দির ও মস্‌জেদ জন্ম লাভ করিয়া আজিও সমুন্নত রচনা-কৌশলের অভ্রান্ত প্রমাণরূপে সর্ব্বজনের নিকট স্তুয়মান, সেই ভারতবর্ষ যে চিত্রবিদ্যা ও ভাস্কর্য্য শিক্ষা করিবার নিমিত্ত ভিখারীর ন্যায়

---

* There are somethings, animate and inanimate, which have been common objects of adoration amongst the nations of the earth; the sun, the moon and all the hosts of heaven; the sword; reptiles as the serpent; animals, as the noblest, the horse.—Tod's Rajsthan, vol. I.

† The plains of Tatary, the sands of Libya, the rocks of Persia, the valley of the Ganges and the wilds of Orinoko, have each yielded votaries alike evident in devotion to his effulgence, of this great world both eye and soul.—Tod's Rajsthan, vol. I.

‡ I agree with Mr. Furguson in thinking that the Indians in all probability derived the art of sculpture from the Greeks. Cunningham's Archeological Reports, vol. IIII, p. 97.

* শকুন্তলা। আমাদের নাটক সম্বন্ধে উইলসন সাহেব বলিয়াছেন—The nations of Europe possessed no dramatic literature before the fourteenth or fifteenth century, at which period the Hindu drama had passed into its decline.—Hindu Theatre—vol. I, preface.

অন্যের দ্বারস্থ হইয়াছিল, ইহা বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না। কলিকাতার চিত্রবিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব প্রধান অধ্যক্ষ তাই সে দিন তাঁহার গ্রন্থে লিখিয়াছেন—গ্রীকগণ যেমন ভারতবর্ষকে দর্শন বা ধর্ম্মমত শিক্ষা দেয় নাই, তেমনি চিত্রবিদ্যা এবং খোদিতশিল্প শিক্ষাও দেয় নাই। ভারতের কলাবিদ্যা ভারতের নিজস্ব, উহা ভারতের চিন্তা ও নৈপুণ্যপ্রসূত। *

সে আজ কত যুগের কথা, এক দিন প্রভাতে পূর্ব্ব গগন অরুণরাগে রঞ্জিত হইয়া উঠিল। প্রতিদিন তেমনি উঠিত। কলকণ্ঠ বিহগের গীতিমুখরিত শান্ত-কুঞ্জভবনের বৃক্ষে পত্রে, লতায় পুষ্পে সে বালারুণ-কিরণ প্রতিফলিত হইল—সুদূর শৈলমালার ধবল শিখরাবলী—কাঞ্চনবর্ণ ধারণ করিল। বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে আর্য্য ঋষি দেখিলেন, আদিত্য উদিত হইয়া জগতের অন্ধকার বিনাশ করিতেছেন। কি মহান, কি পবিত্র, কি সুন্দর দৃশ্য! তিনি যুক্তকরে আদিত্যের জয় গান করিয়া উঠিলেন। সেই গীতিধ্বনি আজিও ভারতাকাশে শ্রুত হইতেছে, সেই গীত ঋগ্বেদের মণ্ডলে ও সুক্তে আত্মপ্রকাশ করিয়া আজিও ভারতবর্ষীয় কল্পনার প্রাচীনত্বের প্রমাণ করিতেছে। গ্রীসের য়্যাপেলো কি তখন জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন? ফিবাস্ বা টির্, সল বা থর তখন কোথায় ছিলেন?

মহাগ্রন্থ ঋগ্বেদের ১।১৪, ২।২৭, ৯।১১৪, এবং ১০।৭ সুক্তে মিত্র ও আদিত্যের বহুল উল্লেখ আছে। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে অষ্টজন আদিত্যের কথা লিখিত আছে, শতপথ ব্রাহ্মণ এবং বিষ্ণু পুরাণেও আদিত্যের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। শাস্ত্রোক্ত এই আদিত্য তবে কে? ইনিই কি বিশ্ব-চক্ষু কর্ম্ম ও ধর্ম্মসাক্ষী সূর্য্য? পণ্ডিতবর সত্যব্রত সামশ্রমী কহিতেছেন—

উষোদয়ের পরেই প্রাতঃকাল, ইহাকেই অরুণোদয় কাল কহে। প্রাতঃকালের পরই ভগোদয় কাল, অর্থাৎ অরুণোদয়ের পরই যখন সূর্য্যের প্রকাশ অপেক্ষাকৃত তীব্র হইয়া উঠে, ভগ সেই কালের সূর্য্য। যে পর্য্যন্ত সূর্য্যের তেজ অত্যুগ্র না হয় তাবৎ তাদৃশ স্বল্পতেজা সূর্য্যকে পূষা কহে, অর্থাৎ পূষা ভগোদয়ের পরকালবর্ত্তী সূর্য্য। পূষোদয়ের পরই অর্কোদয় কাল, ইহার পরই মধ্যাহ্ন। এই কালের সূর্য্যকে অর্ক বা অর্য্যমা কহে। এই অর্য্যমার অন্তেই পূর্ব্বাহ্ন শেষ হয়। *

* But the Greeks no more created Indian sculpture and painting than they created Indian philosophy and religion.............. Indian art..............in its distinctive and essential character, is entirely the product of Indian thought and Indian artistic genius.—Indian sculpture and Painting, E. B. Havell., p. 5.

* Aditi, eternity or the eternal, is the element which sustains, and is sustained by the Adityas.................This eternal and inviolable principle.............is the celestial light.—Rath translated by Muir, Sanskrit Texts, vol. V.p. 37.

অপূর্ব্ব শোভা সন্দর্শনে পুলকিত ভক্তি-বিগলিত ঋষি কল্পনার চক্ষে দেখিলেন যে মার্ত্তণ্ডদেব সপ্তাশ্বপরিচালিত রথে আকাশ-মার্গে বিচরণ করিতেছেন। তিনি কহিলেন—

সূর্য্য দীপ্তিমান ও সকল প্রাণীদিগকে জানেন। তাঁহার অশ্বগণ তাহাকে সমস্ত জগতের দর্শনের জন্য ঊর্দ্ধে বহন করিতেছে।" *

"হে দীপ্তিমান্ সর্ব্বপ্রকাশক সূর্য্য! হরিৎনামক সপ্ত অশ্ব রথে তোমাকে বহন করে, জ্যোতিই তোমার কেশ।" †

"সূর্য্য রথবাহক সাতটি অশ্বীকে যোজিত করিলেন, সেই স্বয়ংযুক্ত অশ্বী-দিগের দ্বারা তিনি গমন করিতেছেন।' ‡

এখন একটি প্রশ্ন হইতে পারে, আর্য্য ঋষিগণ সত্য সত্যই কি বিশ্বাস করিতেন যে সূর্য্যদেব সপ্তাশ্ব কর্ত্তৃক বাহিত রথে আকাশ পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন। উত্তরে সায়ণ কহিতেছেন—"হরিতঃ অশ্বয়ঃ রশ্ময়ো বা।" আবার সেই রশ্মিকে সূর্য্যের কেশ বলিয়াও কল্পনা করা হইয়াছে। বোধ হয় ইহা হইতেই সূর্য্যের বৃত্তাকার মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে দিগন্তবিস্তারি রশ্মি বা "halo" দিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকিবে। সে যাহা হউক, সূর্য্যের রথে ঠিক সপ্তসংখ্যক অশ্বের কল্পনা কেন? তবে কি আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে আবিষ্কৃত ইন্দ্রধনুর সপ্তবর্ণ (অথবা সূর্য্যের রশ্মি বিশ্লেষণে আবিষ্কৃত সপ্তবর্ণ) সেই সে কালের আর্য্য ঋষিগণ জ্ঞাত ছিলেন? যদি না থাকিতেন তবে রশ্মি অর্থে অশ্ব শব্দ ব্যবহার করিবেন কেন?

ঋগ্বেদ যদিও অতি প্রাচীন, কিন্তু প্রাচীন হইলেও "বৈদিক সংহিতায় হিন্দুজাতির মনোবৃত্তি যতদূর বিকশিত ও বহু বিষয়-ব্যাপৃত দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা নিতান্ত প্রথমাবস্থার লক্ষণ নয়। ঐ সংহিতায় তাঁহাদের যাদৃশ অবস্থা লক্ষিত হয়, তাহা নিতান্ত বর্ব্বর লোকের অবস্থা বলিয়া কদাচ পরিগণিত হইতে পারে না। তাঁহারা গ্রাম ও নগর নির্ম্মাণ করিয়া অধিবাস করিতেন, ভূমি কর্ষণ করিয়া যবাদি শস্যসমূহ উৎপাদন করিতেন, রাজত্বপদ ও রাজকীয় ব্যবস্থা সংস্থাপন করিয়া রাজ্য শাসন করিতেন, অস্ত্র, বর্ম্ম ও স্বর্ণালঙ্কার নির্ম্মাণ করিয়া ব্যবহার করিতেন এবং রথারোহণ, বস্ত্রবয়ন ও সূচীকর্ম্ম সম্পাদন করিয়া আপনাদের অবস্থোন্নতির প্রত্যক্ষ পরিচয় প্রদান করি-তেন। ধন ও ধনাঢ্য, সুবর্ণ ও সুবর্ণকোশ ঋণ ও অধমর্ণ, বৃদ্ধি ও বার্দ্ধুষিক, সমুদ্রযান ও সামুদ্রিক বণিক, পান্থ ও পান্থনিবাস, ঔষধ ও চিকিৎসাবৃত্তি, গগন-পর্য্যবেক্ষণ ও মাস মলমাসাদি কালাংশ নির্দ্ধারণ এই সমস্ত মহত্তর বিষয়ের পৌনঃপুন উল্লেখ, সংহিতা-কালীন হিন্দুসমাজের সমধিক উৎকর্ষ সাধন পক্ষে সাক্ষ্য দান করিতেছে। চোর ও চৌর্য্য, ব্যভিচার ও ব্যভিচারিণী, রহস্য-প্রসব ও ভ্রূণহত্যা, দ্যূত ও দ্যূতকারক এই সমস্ত জনসমাজের আদিম অবস্থায় তাদৃশ সম্ভাবিত নহে, প্রত্যুত সভ্যতা-সত্তারই বিষ-ময় লক্ষণ বলিয়া লক্ষিত হইতে পারে।"*

* ঋগ্বেদ, ৺রমেশচন্দ্র দত্ত। ১।৫০।১

† ঋগ্বেদ ৺ রমেশচন্দ্র দত্ত

‡ ঐ

* ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়, প্রথমভাগ, উপক্রমণিকা,—৮১।৮২ পৃঃ

এ সকল জানিয়াও যদি কেহ বলিতে চাহেন যে প্রাচীন ঋগ্বেদ কেবল বল্কলপরিহিত অসভ্য বা অল্পাধিক সভ্য আর্য্যদিগের ইতিহাস, সুতরাং আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ বহু আয়াসে বহু কৌশলপূর্ণ যন্ত্র সাহায্যে যে তথ্য আবিষ্কার করিয়া যশস্বী হইয়াছেন তাহা তাঁহারা কিছুতেই জানিতেন না, তাঁহাদিগের জন্য সুসভ্য ঐতিহাসিক থরন্‌টনের একটি উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি— Ere yet the pyramids looked down upon the valley of the Nile, when Greece and Italy, these cradles of European civilisation, nursed only the tenants of the wilderness, India was the seat of the wealth and grandeur. † অর্থাৎ যখন ইজিপ্তের পিরামিড কেবল নাইল নদীর তীরে নির্ম্মিত হয়, যখন য়ুরোপীয় সভ্যতার লীলা-নিকেতন গ্রীস এবং ইটালী বন্য মানবের আবাসস্থল ছিল, ভারতবর্ষ তখন সম্পদে ও সমৃদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিচিত ছিল।

পূর্ব্বোল্লিখিত রিজ ডেভিড্‌স্ সাহেবও প্রসঙ্গান্তরে বলিয়াছেন—But a comparison with the general course of the evolution of religious beliefs elsewhere shows that the beliefs reached in the Rig veda are not primitive. A consideration of the nature of those beliefs, so far as they are not found elsewhere shows that they must have been, in the view of the men who formulated them, a kind of advance on, or *reform of the previous ideas.* *

ইহা নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে বাবোলিয়ান † এবং আসিরিয়ান সাম্রাজ্যে ভারতবর্ষের হিন্দুধর্ম্মের ন্যায় এক প্রকার হিন্দুধর্ম্ম প্রচলিত ছিল। নানাবিধ সূর্য্য-প্রতিমা ও সূর্য্যপূজার প্রাধান্যই ইহা প্রমাণ করিয়া দিতেছে। হেরডোট্‌স্ বলিয়াছেন যে পারসিকগণ সূর্য্যের পূজা করিত। প্রাচীন ইন্দো-সিথিক মুদ্রাতেও মিথ্‌দেবের মূর্ত্তি দেখা গিয়াছে। "বেদে মিত্র ও বরুণ নামে দুইটি দেবতার বিষয় লিখিত আছে। ঐ দুই দেবতার নাম মিত্রাবরুণ বলিয়া একত্র সমাহৃত হইয়াছে এবং ঐ উভয় দেবতার উদ্দেশে যুগপৎ বহুতর সূক্ত সন্নিবেশিত রহিয়াছে। অবেস্তা শাস্ত্রেও অর্তখত্র নামক পারসীক নরপতির কীলরূপা শিল্পলিপিতে এবং হিরোডোট্‌স্ ও প্লুটার্ক প্রভৃতি গ্রীক গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থে পূর্ব্বতন পারসিকেরা মিথ্‌নামক দেব-বিশেষের উপাসক বলিয়া

† History of the British Empire in India.—E, Thornton, vol. I, p. 3.

* Buddhist India.—Rhys Davids.

† The Jews hankered after the hosts of Heaven, and called their God the God of Sabaoth; the Birs Nirmud of Babylon was a temple of planatary worship.

—The early Aryans and their invasion of India by H. G. Keer in the Calcutta Review.

বর্ণিত হইয়াছে। মিথ্ শব্দের অর্থ সূর্য্য ও বন্ধু। সংস্কৃত মিত্র শব্দেরও ঐ উভয় অর্থই প্রসিদ্ধ আছে। মিথ্ দেবতা অবনীমণ্ডলের সমুদয় অংশেই আলোক আনয়ন করেন। অতএব তিনিও সূর্য্যদেব বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছেন।*

একদিন আরল তীর হইতে বাল্‌টিক হ্রদ এবং পরে তথা হইতে কালিডোনিয়া এমন কি সুদূরবর্ত্তী জর্ম্মাণসাগর মধ্যস্থিত দ্বীপাবলীতে পর্য্যন্ত সূর্য্যপূজা প্রচলিত ছিল। আইওলিয়ান্, আসিরিয়ান্ এবং সিভিস্‌গণ, বোল্ট এবং গথগণ সকলেই তপনভক্ত হইয়াছিল। † সিন্ধুনদের তীরভূমিকে কেন্দ্র করিয়া কিরূপে এই তপনপূজা পৃথিবী মধ্যে বিস্তার লাভ করিয়াছিল, দক্ষ ঐতিহাসিক গ্রন্থ লিখিয়া সে আলোচনা করিবেন, ক্ষুদ্র প্রবন্ধ তাহার স্থান নহে। আমাদের গরুড়পুত্র সম্পাতির পক্ষদগ্ধের কাহিনী কিরূপে গ্রীকদিগের Icarusএর কাহিনীতে রূপান্তরিত হইয়াছে, ‡ সূর্য্যদেবের গতিনিরূপক একটি রূপক যাহাতে নাইল-তীরের সূর্য্যদেব এবং সিন্ধুতীরের সূর্য্যদেব একইভাবে কল্পিত হইয়াছেন, কিরূপে বৈদেশিক সাহিত্যবিশ্রুত আর্গোনটাসের সমুদ্রযাত্রার উপাখ্যানে পর্য্যবসিত হইয়াছে ইহারও অনুসন্ধান ঐতিহাসিক করিবেন।

সূর্য্যদেব যে সর্ব্ব দেশেই অশ্বপরিচালিত রথে ভ্রম্যমান তাহা নহেন। যখন সিথিয়ার প্রান্তর হইতে এক দল ঔপনিবেশিক আসিয়া জাট্‌ল্যাণ্ডে উপনিবেশ সংস্থাপন পূর্ব্বক বাস করিতে লাগিলেন তখন তাঁহাদের সূর্য্যদেবের রথে সপ্তাশ্বের পরিবর্ত্তে ধীরে ধীরে সপ্তমেষ সংযুক্ত হইল। স্থান এবং অবস্থাভেদে যেমন ধর্ম্মমতের পরিবর্ত্তন ঘটে, তেমনি দেবমূর্ত্তির কল্পনা বা গঠনেরও পরিবর্ত্তন ঘটে। সিথিয়া সুদৃশ্য অশ্বের আবাসভূমি ছিল। সুতরাং তদ্দেশবাসিগণ তথায় থাকা কালে সূর্য্যরথ বহন করিবার জন্য অশ্বই কল্পনা করিতে পারিত। কিন্তু জাট্‌ল্যাণ্ডের ঔপনিবেশিকগণ যখন দেখিল তথায় অশ্ব নাই, তখন ক্রমে ক্রমে অশ্বের কথা বিস্মৃত হইতে লাগিল; শেষে তাহাদের বংশধরগণ তদ্দেশের প্রধান প্রাণী মেষকেই অশ্বের স্থানে স্থাপন করিল। এইরূপ পরিবর্ত্তনের কাহিনী পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল নহে। কিন্তু ভারতবর্ষেই শুধু কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। এখানে তপনদেব সেই ঋগ্বেদের কাল হইতেই সপ্তাশ্ববাহিত রথারূঢ় বলিয়া কল্পিত হইয়া আসিতেছেন। সেই বার্দ্ধক্যজীর্ণ অতি প্রাচীন যুগের কুহেলি-সমাচ্ছন্ন

* ভারতবর্ষীয় উপাসকসম্প্রদায়, প্রথম ভাগ, উপক্রমণিকা।

† That a system of Hinduism pervaded the whole Babylonian and Assyrian empires, scripture furnishes abundant proofs, in the mention of the various types of Sun-God *Balnath*, whose pillar adorned *"every mount"* and *"every grove"*...It was not confined to these celebrated regions of the east, but was disseminated throughout the earth; because from the Aral to the Baltic, colonies were planted from that central region.

‡ Tod's Rajsthan, vol. I, pp. 634-635.

স্মৃতিটি বহন করিয়া বৃদ্ধ পুরাণাদি আজিও কহিতেছে—

দ্বাদশাত্মা সপ্তহয়ো ভাস্করোঽহস্করঃ খগঃ।
সূরঃ প্রভাকরঃ শ্রীমান্ লোকচক্ষুর্গ্রহেশ্বরঃ॥*
স সপ্তাশ্বে সৈকচক্রে রথে সূর্য্য দ্বিপদ্মধৃক্।
মসীভাজনলেখন্যৌ বিভ্রৎকুণ্ডি তু দক্ষিণে॥
বামে তু পিঙ্গলো দ্বারি দণ্ডভৃত সরবের্গণঃ।
বালব্যাজনধারিণ্যো পার্শ্বে রাজ্ঞী তু নিস্প্রভা॥†
ভাস্করো ভগবান্ সূর্য্যশ্চিত্রভানুর্বিভাবসুঃ।
যমতাতোঽশ্রমালীচ যমুনা প্রীতিদায়কঃ॥
দিবাকরো জগন্নাথঃ সপ্তাশ্বশ্চ প্রভাকরঃ।
লোকচক্ষুঃ স্বয়ম্ভূশ্চ ছায়ারতিপ্রদায়কঃ॥
তিমিরারি দিনধবো লোকত্রয়প্রকাশকঃ।
ভক্তবন্ধুর্দয়াসিন্ধু কর্ম্মসাক্ষী পরাৎপরঃ॥‡
লোকসাক্ষী ত্রিলোকেশঃ কর্ত্তা হর্ত্তা তমিস্রহা॥
তপনস্তাপনশ্চৈব শুচিঃ সপ্তাশ্ববাহনঃ॥§
ক্ষত্রিয়ং কাশ্যপং রক্তং কালিঙ্গং দ্বাদশাঙ্গুলম্।
পদ্মহস্তদ্বয়ং পূর্ব্বাননং সপ্তাশ্ববাহনম্॥¶

এই সপ্তাশ্বের ব্যাপারকে ভারতের স্থায়ী সাহিত্যে স্থান দিবার নিমিত্ত অমরাদির কোষগ্রন্থেও সূর্য্যদেব সপ্তাশ্ব বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। প্রাচীন ঋষিদিগের সেই কল্পনা এইরূপে ধীরে ধীরে কত যুগ যুগান্তরের মধ্য দিয়া, কত সমাজ ধর্ম্ম ও রাষ্ট্রবিপ্লবের হস্তে আত্ম রক্ষা করিয়া আমাদের শিল্পিদিগের নিপুণ হস্তের অস্ত্রমুখে প্রস্তরগাত্রে অঙ্কিত রহিয়াছে। আজিও তাই ভারতবর্ষে এমন কি এই উত্তরবঙ্গে যে সকল সূর্য্যমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইতেছে, আমি যে সকল মূর্ত্তি বগুড়া জেলায় প্রাপ্ত হইয়াছি, মালদহ এবং রাজসাহীতে যে সকল মূর্ত্তি দেখা গিয়াছে, তাহার প্রত্যেকটিতেই সপ্তাশ্ব খোদিত রহিয়াছে।

শিল্পকলাবিৎ হাভেল সাহেব যাহাকে "Spiritual contemplation" বলিয়া তাঁহার গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাই আমাদের ভাস্কর্য্যের প্রাণ, তাহাকে আমরা ধ্যান বলিতে পারি। শাস্ত্র কহিতেছেন—

প্রতিমাকারকো মর্ত্ত্যো যথা ধ্যানরতো ভবেৎ।
তথা নান্যেন মার্গেণ প্রত্যক্ষেনাপিবা খলু॥

অগ্রে ধ্যান পশ্চাৎ তদনুরূপ মূর্ত্তিগঠন ইহাই আমাদের শাস্ত্রের শিক্ষা। শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন যে শিল্পী সর্ব্বদা ধ্যান দ্বারা পরিচালিত হইবে। সে ধ্যানের উপরেই একান্তে নির্ভর করিয়া মূর্ত্তি গঠন করিবে, বাহিরের দৃশ্যমান বস্তুর দিকে লক্ষ্য করিবে না। দেবমূর্ত্তি গঠন করিতে যাইয়া কামতুল্য সুন্দর নরমূর্ত্তি গঠন করিলেও শিল্পী নিরয়গামী হইবে। ইহাই এ দেশের শিক্ষা। ভাল হউক, মন্দ হউক, সে শিক্ষা বাস্তব মনুষ্যমূর্ত্তি গঠন করিতে কহে না, তাহার শিরা, পেশী, কেশ, নখ দেখিতে চাহে না। সুন্দর মনুষ্যের অধিক সুন্দর যে আত্মা তাহাকেই ফুটাইয়া তুলিতে কহে। পত্রে হউক, প্রস্তরে হউক, যে শিল্পী সেই আত্মাকে দেখাইতে পারিয়াছে, সেই শিল্পীই আর্য্যদেশের প্রকৃত ভাস্কর।* পাশ্চাত্য কলাবিৎ

* স্কন্দপুরাণ, কাশীখণ্ড, ৯ অধ্যায়।

† অগ্নিপুরাণ।

‡ কপিল সংহিতা।

§ শাম্বপুরাণে সূর্য্যস্তোত্র।

¶ গ্রহযাগ সংস্কার তত্ত্ব।

* Indian art is essentially idealistic,

গণ এই তথ্য অনুধাবন করেন নাই বলিয়াই এ দেশের দেবমূর্ত্তি মধ্যে সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য দেখিতে পান না এবং কখনো কখনো মুর সাহেবের ন্যায় হাস্যোদ্দীপক সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া কহিয়া থাকেন, শরীরবিজ্ঞানে ভারতবর্ষীয় শিল্পিদিগের অভিজ্ঞতা নাই বলিয়াই তাহারা মূর্ত্তি গঠন করিতে পারে না—বাস্তবকে চক্ষের সম্মুখে দেখিয়াও তাহাকে প্রস্তরফলকে তুলিতে অক্ষম, কারণ ভারতবাসীরা সর্ব্বদাই স্নান ও অঙ্গে চন্দনাদি অনুলেপন এবং তৈলাদি মর্দ্দন করিয়া থাকে। এই কারণেই তাহাদের দেহের স্বাভাবিক রেখাগুলি লুপ্ত হইয়াছে, তাই তাহারা আসল দেখিয়াও নকল করিতে অপটু! *

(ক্রমশঃ)

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য।

mystic, symbolic and transcendantal. The artist is both priest and poet. Christian art of the middle ages is only emotional.—Indian Sculpture and Painting.—E. B. Havell.

* The baths and frequent anointings in which Indians indulge had the effect of softening the body and effacing the contours, so that Indian artists were after all really trying to imitate a natural effect.—Moore's Indian Pantheori.

তীর্থযাত্রী। *

(১)

বাঁকুড়া জেলায় গোপালপুর ক্ষুদ্র গ্রাম। গ্রামটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, চারিদিকে শাল মহুয়া গাছের জঙ্গলের মধ্যে ক্ষুদ্র গ্রামখানি নীড়ের মধ্যে পক্ষীটির মত দেখাইত। গ্রামের পাশ দিয়া দামোদর নদ প্রবাহিত—শীত গ্রীষ্মকালে দামোদরের একটি ক্ষীণ স্রোত গোপালপুরের নীচে দিয়া চলিয়াছে, অন্যত্র কেবল বালির চড়া। বর্ষায় দামোদরের মূর্ত্তি অন্যপ্রকার, সে দুর্দ্দমনীয় জল-কল্লোল ভৈরবের প্রলয়-গর্জ্জনের অনুকারী।

গোপালপুর চাষার গ্রাম। এক ঘর মাত্র ব্রাহ্মণ আছেন। গৃহকর্ত্তা নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী গ্রামের পরামর্শদাতা, মহাজন, গুরু এবং পুরোহিত। তাঁর এক শত বিঘা ব্রহ্মোত্তর জমী—ঘরের চাষ। নিজে অত্যন্ত পরিশ্রমী ও হিসাবী। কখন বাজে কাজে সময় নষ্ট করিতে কেহ তাঁহাকে দেখে নাই। ধীর, গম্ভীর, অল্পভাষী লোক—তাঁহাকে সকলে সম্মান করিত—ভয়ও যে না করিত এমন নহে।

তাঁহার প্রতিবেশী গোপাল। সে জাতিতে কৈবর্ত্ত। বয়স প্রায় ষাইট বৎসর, কিন্তু ক্ষুদ্রকায়, গোপাল এখনও বেশ মজবুত! সে সদানন্দ, গল্পপ্রিয়—গ্রামের সকলেই তাকে ভালবাসিত। তার অবস্থা তেমন স্বচ্ছল নহে—বৃহৎ পরিবার লইয়া কোন প্রকারে তার দিন চলিয়া যায়—কিন্তু কেহ কখন তাহাকে বিমর্ষ দেখে নাই। এমন কি নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীও গোপালের সঙ্গে কথা কহিবার সময় তাঁহার গাম্ভীর্য্য রক্ষা

* কাউণ্ট টলষ্টয়ের Two Pilgrims নামক গল্পের অনুকরণে লিখিত।

করিতে পারিতেন না। গোপালকে তিনি খুব স্নেহ করিতেন।

(২)

একদিন দুই জনে সন্ধ্যার পর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের চণ্ডীমণ্ডপের দাওয়ায় বসিয়া তীর্থ-যাত্রার পরামর্শ হইল। চক্রবর্ত্তী মহাশয় খুব আগ্রহ দেখাইলেন, বলিলেন—"এবার ধান কাটার পর মাঘ মাসের শেষে শ্রীক্ষেত্র যাওয়া যাক্ চল।"

গোপাল প্রস্তুত—সে বলিল "দাদা ঠাকুর আমি ত এখুনি যেতে রাজি—ধান কাটার জন্য দেরী করে কি হবে—ছেলে-পুলেরা বড় হয়েছে, তারাই দেখে শুনে সব করবে এখন।" নীলাম্বর হাসিয়া কহিলেন—"পাগল—ওদের উপর ভরসা করে কি যেতে পারি, ছেলে মানুষ—কি করতে কি করবে, কুড়েমী করে ধানগুলা নষ্ট করবে, না হয় জোতদার কৃষাণগুলো ফাঁকি দেবে আর এত তাড়াই বা কি?

সে দিনকার মত কথা এই পর্য্যন্ত হইল। তার পর মাঘ মাস গেল—ধান সব গোলাজাত হইল। গোপাল আসিয়া আবার তীর্থযাত্রার কথা উঠাইল—চক্রবর্ত্তী মহাশয় পুনরায় আক্-কাটা আক্-মাড়াই ইত্যাদি আপত্তি দেখাইয়া তাহাকে ফাল্গুন মাসের শেষে শ্রীক্ষেত্র-যাত্রার কথা বলিলেন, কিন্তু আক্ উঠলে আবার চৈতালীর কথা ভাবিয়া তিনি ইতস্তত করিতে লাগিলেন। চৈতালীর কথা শুনিয়া গোপাল এক দিন বলিল, "দাদা ঠাকুর, আমাদের চাষার ফসল একটার পর একটা লাগিয়াই আছে। তা ভাবিলে কি আর তীর্থে যাওয়া হবে। চোখ-মুখ বুজে বেরিয়ে পড়া যাক্। ওসব ছেলেরা এক রকম করে করেই নেবে। আর বাঁচবই বা কত দিন—ফসল আর ফসল করে কি পরকালের কাজটা করব না? তাহার পর এখন ত ছেলেরা পারবে না বলছ, কিন্তু আমরা গেলে তখন ত ওদেরই সব করতে হবে।"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় গম্ভীর ভাবে চুপ করিয়া থাকিলেন—পরে বলিলেন "দেখ গোপাল, আমি সবই বুঝি কিন্তু এই নূতন গোয়াল-ঘরটা আরম্ভ করেছি। এটা অৰ্দ্ধেক রেখে কি করে যাই—আর মেজো নাতিটার পৈতে দেবো মনে করেছি, তাই বা শেষ না করে যাই কেমন করে। তাহার পরে এই সব কাজে এখন হাতের টাকাও ফুরিয়ে এল। টাকাও ত চাই।"

শেষের কথাটা শুনিয়া গোপাল আর থাকিতে পারিল না। হাসিয়া উঠিল কহিল—"তুমি কি বল দাদা ঠাকুর তোমার হল টাকার টানাটানি আর আমারই যত স্বচ্ছল। আর যাই বল ও কথা মুখে এন না।"

নীলাম্বর চুপ করিয়া রহিলেন, শেষে ঠিক হইল তাঁহার মেজো নাতির উপনয়ন দিয়াই তাঁহারা তীর্থ যাত্রা করিবেন।

(৩)

তাহার পর একদিন ফাল্গুনের প্রাতে তাহাদের যাত্রার শুভদিন স্থির হইল। চক্রবর্ত্তী মহাশয় কত দিন ধরিয়া পুত্রকে সকল বিষয়ে উপদেশ দিতে লাগিলেন। চৈতালীর জমী কোন্ মাঠে কত বিঘা আছে; কত বিঘাতে ছোলা, কত বিঘাতে

মুসুরী, কোন্ জমীতে কত ফসল হওয়া সম্ভব, চৈত্র মাসে কোন্ লোকের টাকা দিবার কড়ার আছে, কার কাছে কত সুদ লইতে হইবে ইত্যাদি, ইত্যাদি। একই কথা বারবার করিয়া ছেলেকে বুঝাইতে লাগিলেন এবং নানাপ্রকারে সাবধান করিয়া দিলেন যেন তাহাকে কেউ না ঠকায়, সে যেন আলস্য করিয়া কোন দিক্ নষ্ট না করে।

আর গোপাল—তার পুঁজীর মধ্যে পঞ্চাশটি টাকা। সে বিশ দুই ধান বেচিল একটা গাই-বাছুর বিক্রয় করিয়া আরও গোটা পঞ্চাশ টাকা সংগ্রহ করিল। গৃহিণী ও ছেলেকে ডাকিয়া বলিল—"দেখ, আমি ত শ্রীক্ষেত্তর চল্লাম কিন্তু যাকে যাকে যে রকম কড়ার করেছি তাকে সেই দিনে তার পাওনা চুকিয়ে দিও আর সাবধানে থেকো।" বাস, উপদেশ ফুরাইল। আর যে কিছু বলতে হবে তা তার জোগাইল না। কেন না গোপালের গৃহিণী সেই সময় রোদনোন্মুখী হইয়া ক্রমান্বয়ে নাক ঝাড়িতে আরম্ভ করিলেন। গোপাল গতিক বুঝিয়া সেখানে আর বিলম্ব মাত্র না করিয়া একবারে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাড়ী পৌঁছিল। চক্রবর্ত্তী মহাশয় ছাতাটি লাঠীটি ও একটি ক্ষুদ্র পুঁটুলীতে দুইখানি কাপড় লইয়া তখনও পুত্রকে উপদেশ দিতেছেন এবং মধ্যে মধ্যে তাঁহার কোমরে বাঁধা টাকার বেটুয়াটিকে সামলাইতেছেন।

তারপর দুই জনে গ্রামের সীমায় আসিয়া সঙ্গীদের আত্মীয় স্বজনদের বিদায় দিয়া বাঁকুড়ার রাস্তা ধরিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। উভয়ে পথ হাঁটিতে বেশ অভ্যস্ত। গোপাল একটু মোটা মানুষ তার উপর তামাক খাওয়ার লোভটা সে সম্বরণ করিতে পারিত না। পথের ধারে মুদীর দোকানে, চটিতে বা চাষার বাড়ীতে কেহ তামাক খাইতেছে দেখিলে বসিয়া দুটো কথা না কহিয়া দুটান তামাক না টানিয়া সে উঠিত না। চক্রবর্ত্তী মহাশয় বিরক্তি প্রকাশ করিলে হাসিয়া বলিত—"দাদা ঠাকুর তামাকের লোভটা আর সাম্‌লাতে পারি না। এবার শ্রীক্ষেত্রে গিয়া তামাকটা জগন্নাথকে দিয়ে আসব।" এমনি করিয়া দুই জনে প্রতিদিন আট-দশ ক্রোশ করিয়া পথ চলিয়া ক্রমে বাঁকুড়া জেলা, মেদিনীপুর জেলা প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া উড়িষ্যায় প্রবেশ করিলেন।

(৪)

এতদিন তাঁহারা যে সকল গ্রামের ভিতর দিয়া আসিতেছিলেন, সকল গ্রামেই লোকে অতিথি-সৎকার করিয়া তাঁহাদের পথশ্রম দূর করিত। কিন্তু উড়িষ্যায় সে বার ভীষণ দুর্ভিক্ষ, গ্রামগুলির অবস্থা অতিশয় শোচনায়, অধিকাংশ গ্রামেই অন্নকষ্ট, জলকষ্ট, প্রায় গ্রাম শূন্য পড়িয়া আছে। যাহারা গৃহ ছাড়িতে পারে নাই তাহারা কঙ্কাল-সার—চাষার দুঃখের সীমা নাই।

একদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে গোপাল পিপাসায় অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িল। চক্রবর্ত্তী মহাশয় পাতলা মানুষ তাঁহার ত তৃষ্ণা পায় না। গোপাল বলিল—"দাদাঠাকুর

তুমি দু-পা এগিয়ে চল আমি একটু জল খেয়ে আসি।" চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাহাকে শীঘ্র আসিতে বলিয়া অগ্রসর হইলেন।

গোপাল গ্রামের মধ্যে একটা ভদ্র গৃহস্থের বাড়ী দেখিয়া দরজায় দাঁড়াইয়া বলিল—"বাড়ীতে কে আছ—একটু জল দিতে পার?" কিন্তু বারবার ডাকা-ডাকি করিয়াও কোন উত্তর পাইল না। অথচ বাড়ীর অবস্থা দেখিয়া মনে হইল ভিতরে লোক আছে। একবার মনে হইল ভিতর হইতে অস্ফুট কান্নার শব্দ আসি-তেছে। গোপাল সাহসে ভর করিয়া বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিল। ভিতরে গিয়া সে যে দৃশ্য দেখিল তাহা জীবনে কখনো দেখে নাই। একটি ঘরের দাওয়ায় একটি বৃদ্ধা বসিয়া; তাহার পার্শ্বে একটি বছর ছয়েকের ছেলে শুইয়া আছে। বৃদ্ধার দেহ অনাহারে শীর্ণ, উঠিবার সামর্থ্য নাই, বালকটি অনশনে মৃতপ্রায়, দেহ কঙ্কালসার। ঘরের ভিতরে একটি অল্পবয়স্কা স্ত্রীলোক যন্ত্রণায় ছট্‌ফট করিতেছে ও মধ্যে মধ্যে কাঁদিতেছে। সে স্বর এত ক্ষীণ যে গোপালের মনে হইল তাহা মুমূর্ষুর গভীর যন্ত্রণা প্রকাশের অন্তিম চেষ্টা মাত্র। গোপাল বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া আর একবার জল চাহিল। তাহার স্বর শুনিয়া একটি মধ্যম-বয়স্ক লোক ঘরের ভিতর হইতে কাঁপিতে কাঁপিতে বাহিরে আসিল। তাহারও শরীর জীর্ণ-শীর্ণ। মুখের গভীর কালিমা অসহ্য শারীরিক এবং মানসিক যন্ত্রণা প্রকাশ করিতেছে। লোকটি গোপালকে দেখিয়া কম্পিত স্বরে বলিল—"আমরা না খাইয়া মরিতেছি, বড় যন্ত্রণা—বড় অসুখ। ছেলেটি বুঝি আর বাঁচে না, ওকে বাঁচাও, কিছু খেতে দাও।" বলিতে বলিতে তাহার বাক্‌রোধ হইয়া আসিল, চোখ দিয়া টস টস করিয়া জল পড়িতে লাগিল, গোপালও অশ্রু সংবরণ করিতে পারিল না। পিতার কণ্ঠস্বর শুনিয়া ছেলেটি বলিল—"বাবা বড় ক্ষিদে কিছু খেতে দাও, আর ত পারি না।' গোপাল তাড়াতাড়ি তার পুঁটুলি খুলিয়া মুড়ি-মুড়কী বাহির করিয়া তাহাকে দিল। সে বলিল—"আমার গলা শুকিয়ে গেছে, একটু জল আগে দাও, নইলে খেতে পারব না।" গোপাল দৌড়িয়া গিয়া পার্শ্বের ডোবা হইতে একটা মাটীর কলসী করিয়া জল আনিয়া সমস্ত মুড়ি ও মুড়কী ভিজাইয়া প্রথমে ছেলেটিকে, পরে বৃদ্ধা ও তাহার পুত্রকে খাওয়াইল। পরে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পীড়িতা স্ত্রীলোকটিকে কিছু খাওয়াইতে গেল। সে অতি কষ্টে বলিল—"ওগো তুমি কে? আমার ননীকে বাঁচাও, ওকে কিছু খেতে দাও। আর উনি আজ চারপাঁচ দিন একটু জলও খাননি। ওঁকে খাওয়াও।" তার পর গোপাল তাহাকে যখন জানাইল যে সকলে খাইয়াছে তখন সে সামান্য কিছু খাইল। সকলে একটু সুস্থ হইলে গোপাল তাদের কাছে বসিয়া সমস্ত কথা জিজ্ঞাসা করিল।

(৫)

বৃদ্ধা বলিল—"বাবা, আমাদের অবস্থা কখনই ভাল ছিল না। কোন রকমে কায়ক্লেশে দিনপাত করিতাম। গত বৎসর অজন্মা হল। তা কোন রকমে ধারধোর

করিয়া জমী বাঁধা দিয়া বৌর গায়ের গহনা বিক্রী করিয়া দিন গেল। কিন্তু এ বৎসর যখন বৃষ্টি হল না তখন ঘট বাটী, শেষে হালের গরু বিক্রী করে যত দিন চলেছিল একবেলা খাইয়া কাটাইলাম। শেষে এক বেলা আধপেটা, তার পর তাও জুটিল না। আর সকলেরই হাহাকার তা কে ভিক্ষা দেবে?—ভিক্ষাও মিলিল না, শেষে উপোস। আজ ছয় সাত দিন আমরা উপোষ করেই আছি, যা জুটেছিল নাতিটিকে দিয়াছিলাম। আজ দু'দিন বাছার পেটে কিছু পড়ে নি। তার পর বাবা তুমি এলে, আমাদের প্রাণ রক্ষা হল।" বলিতে বলিতে বৃদ্ধার চক্ষু দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। গোপাল তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া ছেলেটিকে কোলে লইয়া আদর করিতে লাগিল। তারপর উঠিয়া হাটের রাস্তা জিজ্ঞাসা করিয়া হাটে গেল। সেখান হতে চাল ডাল লবণ তৈল কিনিয়া আনিল। বাড়ী আসিয়া নিজেই ভাত ডাল রাঁধিয়া সকলকে খাওয়াইয়া নিজে আহার করিয়া তামাক খাইতে বসিল। তামাক টানিতে টানিতে সে এই দুঃস্থ পরিবারের কথা ভাবিতে লাগিল। তার নিজের কথাও অনেক ভাবিল। সে যে তীর্থে বাহির হইয়াছে, দাদা ঠাকুর এত ক্ষণ কত দূর গেলেন সে এদের ছেড়েই কেমন করেই বা যায়! এদের যে অবস্থা তাতে সে চলে গেলে এতগুলি লোকের কি দশা হবে? তার না হয় দুদিন দেরীই হবে। গোপাল নিবিষ্ট মনে ভাবিতেছে এমন সময়ে ছেলেটি আসিয়া দাদা, দাদা, বলিয়া তার কোলে উঠিল এবং তাকে নানা প্রশ্নে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল—"তুমি আমাদের কে হও? মা তোমাকে বাবা বলে কেন? তোমার পুঁটুলীতে কি আছে, দিদি কেন কাঁদছে" ইত্যাদি ইত্যাদি। তার পর গোপালের কোলে শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িল। গোপাল ঘুমন্ত শিশুকে কোলে করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল—ভাবিল "যাচ্ছিলাম তীর্থে, এ আবার কি মায়াতে পড়লাম।"

এমনি করিয়া গোপাল প্রায় ৬।৭ দিন সেখানে থাকিয়া গেল। দিনই মনে করিত আজ যাই—কিন্তু একটা না একটা কারণে তাকে যাওয়া স্থগিত করিতে হইত। এক দিন বৈকালে গোপাল গৃহের দাওয়ায় বসিয়া ভাবিতে লাগিল—"এখানে ত আর থাকিলে চলে না, আজ কাল করে সাত দিন হল—তবে কি আমার জগন্নাথ দর্শন হবে না! কেন এ জালে জড়িয়ে পড়লাম। না—আমি কালই যাব।" তার পরই মনে পড়িল—"কাল যদি আমি যাই তবে ঐ পরিবারের কি দশা হইবে? আমি না হয় সাত দিন চালাইয়া দিলাম, কিন্তু তার পর?" ভাবিতে গোপালের চোখে জল আসিল। সে তখন মনে মনে একটা মতলব আঁটিল—তার পর অনেক ক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া মনে মনে বলিল— না, আমার বুঝি এ যাত্রায় আর জগন্নাথ দর্শন হল না। কপালে নেই। মহাপ্রভু আমায় ক্ষমা করবেন—এও ত তাঁরই কাজ। তিনি দয়া করে আমায় এই কাজ দেখিয়ে দিয়েছেন, আমাকে যে ভার দিয়াছেন আমি তাই করি। আবার যখন তিনি টান্‌বেন তখন তাঁকে দেখ্‌তে যাব।"

(৬)

এই সকল কথা ভাবিয়া গোপাল মনকে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু মন ঠিক বুঝিল কি না সন্দেহ—কারণ থাকিয়া থাকিয়া তাহার কেমন একটা অস্বোয়াস্তি হইতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল—সে নিশ্চয়ই পাপী নতুবা এত দূর আসিয়া দেবদর্শনে এ বাধা জন্মিবে কেন? কাতর হৃদয়ে গোপাল আত্ম নিবেদন করিল—"দয়াময় জানি না তোমার পায়ে কত অপরাধ করিয়াছি, কত পাপ করিয়াছি—হে জগন্নাথ, সে পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত বলিয়া দাও—পাপী বলিয়া পায়ে ঠেলিও না। একবার দেখা দাও প্রভু, একবার তোমার শ্রীমূর্ত্তি দেখাও।" এই সব কথা ভাবিয়া আত্মানুশোচনায় তাহার রাত্রে নিদ্রা হইল না। শেষ রাত্রে সে স্বপ্নে দেখিল সে যেন জগন্নাথের মন্দিরে গিয়া পৌঁছিয়াছে—চারি দিকে লোকারণ্য সম্মুখে ভক্তের আকাঙ্ক্ষার বস্তু মহাপ্রভুর মূর্ত্তি—গোপাল যেন ভক্তিবিগলিত হৃদয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতেছে। নিদ্রাভঙ্গে গোপাল সেই স্বপ্নের কথাই ভাবিতে লাগিল—তবে কি মহাপ্রভু এমনি করিয়া তাকে দর্শন দিলেন। এ স্বপ্ন না হইয়া যদি সত্য হইত!

অনিদ্রা ও উদ্বেগে সে দিন গোপালের শরীরটা বেশ সুস্থ ছিল না—সন্ধ্যার পরই সে শয্যা গ্রহণ করিল। আবার সেই স্বপ্ন! গোপাল পুলকিত হইল—মনে মনে বলিল "দেব, আমি তৃপ্ত হইয়াছি—পাপী আমি—তুমি যে আমাকে স্বপ্নেও দেখা দিলে—তাহাতেই আমার জন্ম সার্থক হইল।" তার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল—চাহিয়া দেখে ননি তার মাথার কাছে বসিয়া তার কপালের ঘাম মুছাইয়া দিতেছে। সে সস্নেহে তাহাকে কোলে টানিয়া লইল।

পর দিন প্রত্যূষে সে গামছা খানি কাঁধে ফেলিয়া ধীরে ধীরে হাটের দিকে অগ্রসর হইল। সেখানে গিয়া বিশ দুই ধান, দুটো হালের গরু, কিছু বাসন এবং চাষের জন্য কোদালে, দড়া ইত্যাদি কিনিয়া গরুর পিঠে বোঝাই দিয়া বাড়ী ফিরিল তার পর মহাজনের বাড়ী গিয়া জমী ক'বিঘা খালাস করিল। এই সব করিতেই গোপালের টাকা ফুরাইয়া গেল। কিন্তু সে সে-সব কথা একবারও ভাবিল না। আরো দিন দশেক সেখানে থাকিয়া সে গৃহস্থালীর সব বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া সকলকে বুঝাইয়া আপনার বাড়ী ফিরিবার প্রস্তাব করিল। গোপাল যত সহজে বিদায় লইবে ভাবিয়াছিল কাজে তাহা হইল না। বৃদ্ধার ক্রন্দন ও অনুরোধ, বৌ ও চাষার বিনীত প্রার্থনা সে এক রকম করিয়া কাটাইল—কিন্তু ছোট ছেলেটি যখন তার কোলে উঠিল,—বলিল—"দাদা, তুমি নাকি আমাদের ছেড়ে যাবে? দিদি, বাবা, মা সব কাঁদছে। তুমি ওদের কাঁদাচ্ছ—তুমি বড় দুষ্টু,—তোমাকে যেতে দেবো না, কিছুতেই না।" তখন গোপাল বড় গোলে পড়িল। কিছু না বলিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া রহিল—বালক আপন মনে কথা কহিতে লাগিল। পরদিন ভোরে উঠিয়া কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া আপনার পুঁটুলীটি

লইয়া ধীরে ধীরে আপনার গ্রামের দিকে ফিরিল। তার হাতে মাত্র একটি টাকা আছে—এক টাকা লইয়া পুরী যাওয়া চলে না। সে মনে মনে বলিল "মহাপ্রভূ এবার আমাকে ক্ষমা করবেন।"

(৭)

এ দিকে চক্রবর্ত্তী মহাশয় ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে গাছতলায় বসিয়া গোপালের জন্য অপেক্ষা করিতে করিতে তিনি সন্ধ্যার পূর্ব্বে রাস্তার ধারে একটা দোকানে আশ্রয় লইলেন। ক্রমে সন্ধ্যা হইল, রাত্রি আসিল, কৈ গোপালের ত দেখা নাই। তিনি ভাবিলেন হয় ত গোপাল অন্য রাস্তায় শীঘ্র গিয়াছে—এই ভাবিয়া তিনি প্রাতে উঠিয়া আবার চলিতে লাগিলেন। সুবর্ণরেখা, বৈতরণী, মহানদীর পারঘাটেও এক বেলা করিয়া গোপালের জন্য অপেক্ষা করিলেন, কিন্তু গোপাল আসিল না। তিনি সঙ্গীহীন হইয়া কষ্ট অনুভব করিলেন—নানা চিন্তায় তাঁহাকে উদ্বিগ্ন করিল। পথ চলিতে চলিতে ক্রমাগত তাঁর নিজের বাড়ী, সংসারের কথা মনে পড়িতে লাগিল—ছেলেরা কি করিতেছে, কেমন করিয়া সংসার চালাইতেছে, চৈতালীর কি হইল, পাওনাদারের টাকা দিল কি না, নূতন গোয়ালখানার কি হইতেছে,—বড় ছেলেটার চরিত্র বেশ ভাল নয়, সে হয় ত টাকাকড়ি সব নষ্ট করিতেছে ইত্যাদি। রাত্রেও তাঁর ভাল নিদ্রা নাই—গোপাল যত দিন ছিল ততদিন দুজনে ছিলেন—এত ভয় হয় নাই। এখন রাত্রে চোরের ভয়ে তিনি ঘুমাইতে পারেন না। কেবলই মনে হয় কে তাঁর টাকাগুলি চুরী করিবে। বিদেশ, অজানা পথঘাট—কখন কি হয়, এই ভয়েই তিনি সারা।

ক্রমে ক্রমে তিনি পুরী পৌঁছিলেন, পথে আরো অনেক যাত্রী জুটিল, পাণ্ডার প্রশ্নে প্রশ্নে তিনি ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী সাবধানী লোক, কাহাকেও বিশ্বাস করা তাঁহার স্বভাবের মধ্যে নাই। পাণ্ডা নির্ব্বাচন করা এক মস্ত কাজ হইল। সকলকেই মনে হয়, এ হয় ত আমার টাকা চুরী করবার মতলবে আমাকে ডাকিতেছে। শেষে বেশ করিয়া দেখিয়া শুনিয়া, বাছিয়া একজন ভাল মানুষ পাণ্ডা যোগাড় হইল—তিনি পাণ্ডার সঙ্গে পুরী প্রবেশ করিলেন এবং সেই খানে একটি ক্ষুদ্র কক্ষ ভাড়া লইলেন।

(৮)

পর দিন জগন্নাথের চন্দনোৎসব। পুরী জনাকীর্ণ হইয়াছে—সমগ্র ভারতবর্ষের নানা জাতীয় তীর্থযাত্রীতে জগন্নাথের মন্দির পূর্ণ—সেই বিপুল জনকল্লোলে মুখরিত। নীলাম্বর একবার গোপালের অনুসন্ধান করিবার জন্য বাহির হইলেন, কিন্তু সে জনসমুদ্রে কোন সন্ধান পাইলেন না। শ্রান্তপদে সন্ধ্যার সময় আপনার কক্ষে ফিরিলেন – ভাবিলেন, প্রাতে একবার সিংহদ্বারের কাছে অপেক্ষা করিবেন; গোপাল আসিয়া থাকিলে অবশ্যই এই দরজা দিয়াই প্রবেশ করিবে তখন দেখা পাইবেন। পাণ্ডা রাত্রে তাঁর সঙ্গে দেখা করিল, নানা কথার মধ্যে বলিল, "আজকাল এখানে খুব চুরী হইতেছে, রাত্রে একটু সাবধানে থাকিবেন।" চক্রবর্ত্তী

মহাশয়ের সমস্ত রাত্রি অনিদ্রায় কাটিয়া গেল—টাকার ভাবনায় তাঁর সব ভাবনা ডুবিয়া গেল।

ভোরে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া তিনি মন্দিরের দ্বারের নিকট গোপালের আশায় গিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁর পাণ্ডাকেও তিনি এখানে আসিবার জন্য বলিয়া রাখিয়াছিলেন। ক্রমে সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরে যাত্রীর সমাগম হইতে লাগিল—তখন সেখানে দাঁড়াইয়া থাকাও কঠিন হইয়া উঠিল। এ দিকে তাঁর পাণ্ডা আসিয়া তাগিদ আরম্ভ করিল, আর বেশী দেরী করিলে মন্দিরে প্রবেশ করাই শক্ত হইবে। নীলাম্বর অগত্যা পাণ্ডার সঙ্গে মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। পথে পাণ্ডা তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিল যে এখানে গাঁঠকাটার ভয় বড় বেশী। শুনিয়া চক্রবর্ত্তী বামহস্তে কোমরের বেটুয়াটিকে বেশ শক্ত করিয়া ধরিয়া রহিলেন। বহু কষ্টে ও নানাবিধ উপায়ে পাণ্ডা তাঁহাকে মন্দিরের মধ্যে লইয়া গেল। তখন আরতি আরম্ভ হইয়াছে। নীলাম্বর জগন্নাথ দেখিবেন, না বেটুয়া সামলাইবেন—উদ্বেগে তাঁর ভাল করিয়া ঠাকুর দেখা হইল না। কিন্তু—ও কে? ঐ যে প্রথম সারিতে দাঁড়াইয়া একমনে মহাপ্রভু দর্শন করিতেছে—গোপাল না?—গোপালই ত। চক্রবর্ত্তী মহাশয় মনে মনে গোপালের চেষ্টা ও বুদ্ধির সুখ্যাতি করিলেন—সে কেমন করিয়া মহাপ্রভুর অত কাছে গিয়া পৌঁছিল? তিনি দেখিলেন আরতি শেষে গোপালও সকলের সঙ্গে প্রণাম করিল। তিনি তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া দরজায় গোপালের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে সমস্ত যাত্রী মন্দির হইতে বাহির হইল, কৈ তার মধ্যে ত গোপাল নাই, তবে কি তাঁর ভুল হইয়াছিল? না, তা হইতেই পারে না। অনেক বেলায় ক্ষুণ্ণ মনে, শ্রান্ত দেহে চক্রবর্ত্তী আপনার কক্ষে ফিরিলেন। স্থির করিলেন, সন্ধ্যার আরতির সময় আজ ভাল করিয়া দেখিবেন, গোপাল সন্ধ্যার আরতি দেখিতে নিশ্চয়ই আসিবে।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে নীলাম্বরের পাণ্ডা আসিয়া বলিয়া গেল "আজ শীঘ্র শীঘ্র যাইবেন সন্ধ্যার আরতিতে ভিড় বেশী হয়, দেরী করিলে মন্দিরে প্রবেশ করা অসম্ভব হইবে।

চক্রবর্ত্তী সন্ধ্যার সময় পাণ্ডার সঙ্গে অতি কষ্টে মন্দিরে প্রবেশ করিলেন, এখনও তাঁর একটী হাত বেটুয়াটিতে। ক্রমে আরতির দীপ জ্বলিল, কাঁসর ঘণ্টা এবং জগন্নাথের জয় নিনাদে ও যাত্রীদের কলকণ্ঠে মন্দিরাভ্যন্তর বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। নীলাম্বর শ্রীমূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন, হঠাৎ পূজারীদের দিকে নজর পড়িল। পূজারীদের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ও কে, ঐ ত গোপাল! এবার ত আর ভুল নাই। দীপের আলোকে তিনি গোপালের মুখ স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন! কিন্তু গোপাল ওখানে কেমন করিয়া গেল, সে নিশ্চয়ই খুব ভাল পাণ্ডা যোগাড় করিয়াছে, নতুবা ওখানে যাওয়া ত সকলের ভাগ্যে ঘটে না। পাণ্ডাদের স্বভাব তিনি বেশ জানিতেন। টাকা বেশী না দিলে তাদের কাছে কোন কাজ পাইবার জো নাই।

তা গোপাল এত টাকা কোথায় পাইল? তিনি কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। যেমন করিয়া হউক আজ গোপালের সঙ্গে দেখা করিতেই হইবে। এই ভাবিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয় আবার বাহিরে আসিয়া দরজায় দাঁড়াইলেন। ক্রমে ক্রমে মন্দির জনশূন্য হইল, কিন্তু গোপাল ত তাদের মধ্যে নাই। একি হইল! শেষে স্থির করিলেন হয় ত সে অন্য কোন পথে বাহির হইয়াছে। ভাবিতে ভাবিতে নীলাম্বর নিজকক্ষে ফিরিলেন।

পরদিন নীলাম্বর মন্দিরের নিকটবর্ত্তী সমস্ত বাসা-বাড়ী অনুসন্ধান করিলেন, কত পাণ্ডাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কত পূজারীকে শুধাইলেন কিন্তু কোন খানে গোপালের সন্ধান মিলিল না। তারপর পাণ্ডার সঙ্গে নানা মন্দিরে মন্দিরে ঘুরিলেন, যেখানে যেখানে যাত্রীরা দেবদর্শন করিতে যায় কোনটাই বাদ দিলেন না, কিন্তু কোথাও গোপালকে দেখিতে পাইলেন না।

(৯)

আরো দুই এক দিন পুরীতে বাস করিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয় দেশে ফিরিতে মনস্থ করিলেন। পাণ্ডাকে তার দেনা পাওনা চুকাইয়া শুষ্ক প্রসাদ কিনিয়া তিনি একদল যাত্রীর সঙ্গে পূর্ব্ব পথে এক মাসে স্বগ্রামে প্রবেশ করিলেন।

তাঁহার আগমনে বাড়ীতে আনন্দোৎসব পড়িয়া গেল। নানা কথাবার্ত্তা এবং গৃহের ও পল্লীর সকলকে প্রসাদ বিতরণ করিতে তাঁর দিন কাটিয়া গেল। কিন্তু গৃহস্থালীর অব্যবস্থা দেখিয়া তিনি নিরানন্দ হইলেন। তিনি যাহা ভয় করিয়াছিলেন তাহাই হইয়াছে। ফসলের সময় তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র আমোদ করিতে ব্যস্ত ছিল—ফসল ভাল পাওয়া যায় নাই, পাওনাদারেরা টাকা ঠিক মত দেয় নাই, যাহা দিয়াছিল তাহা খরচ হইয়া গিয়াছে, নূতন গোয়ালখানির অবস্থা দেখিয়া তিনি আন্তরিক ক্ষুণ্ণ হইলেন।

(১০)

সন্ধ্যার পূর্ব্বে কথায় কথায় চক্রবর্ত্তী মহাশয় একজন প্রতিবেশীকে গোপালের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রতিবেশী বলিল—"সে কি দাদা ঠাকুর, সে ত অনেক দিন আগেই ফিরিয়াছে। কেন আপনাকে কি বলিয়া আসে নাই?" নানা সন্দেহ লইয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয় সন্ধ্যার সময় গোপালের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইলেন। চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে দেখিয়া গোপাল আনন্দিত হইল, তার পর পায়ের ধূলা লইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"দাদা ঠাকুর, কবে দেশে ফিরলে?"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় সে কথায় কাণ না দিয়া বলিলেন—"গোপাল, তুমি এত আগে কি করিয়া ফিরিলে?" গোপাল চুপী চুপী বলিল—"দাদা ঠাকুর, সে অনেক কথা। চল বাহিরে গিয়ে বলি।"

বাহিরে আসিয়া গোপাল একে একে সব কথা বলিল। শেষে বলিল,—"দাদা ঠাকুর, বাড়ীতে কাউকে এত কথা বলিনি আজ তোমাকে বল্লাম। আমি পাপী, মহাপ্রভু আমাকে টানলেন না, তাই তাঁর দেখা পেলাম না। মায়ায় জড়িয়ে পড়লাম, শেষে ভাবলাম তা' বেশ, তিনি আমাকে

এই একটা কাজ দেখিয়ে দিলেন, তাই করি; আবার যদি কখনো মহাপ্রভুর দয়া হয় তাঁকে গিয়ে দেখে আসব। কিন্তু বয়েস হয়েছে সে সময় কি সময় আর পাব?"

নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী হিসাব করিয়া দেখিলেন, চন্দনোৎসবের দিনই গোপাল সেই স্বপ্ন দেখিয়াছিল। গোপালের এ স্বপ্ন ত স্বপ্ন নহে। ভাবিতে তাঁরও শরীর রোমাঞ্চিত হইল। তিনি গোপালকে আলিঙ্গন করিয়া বলিয়া উঠিলেন "গোপাল তোমারই তীর্থযাত্রা সার্থক হইয়াছে, মহাপ্রভু নিজে আসিয়া তোমাকে দেখা দিয়াছেন, তোমার পুরী যাওয়ার কি দরকার।"

শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার

প্রেম যদি

প্রেম যদি হইত গোলাপ,
হৃদি যদি হইত পল্লব!—
দুলিত নবীন স্তরে
কত না আনন্দভরে!
হরিতে লোহিত আভা—চিত্রের গৌরব!

২

প্রেম যদি হইত রাগিণী,
হৃদি যদি হ'ত গীত তার!—
ঝঙ্কারে নিখাদে খাদে
মিশে র'ত অবিবাদে,
স্ফুরিত কতই অর্থ অস্ফুট কথার!

৩

প্রেম হ'ত অবাধ কল্পনা,
হৃদি হ'ত আধ জাগরণ!—
মুখে হাসি, চোখে হাসি,
বুকে আছাড়িত আসি,
ছিঁড়ে যেত শিরে শিরে দেহের বন্ধন!

৪

প্রেম যদি হইত ধরণী,
হৃদি যদি হত সমীরণ!—
ঘেরি বেড়ি দলি পিষি
অঙ্গে অঙ্গে দিবানিশি,
তবুও কাতরে শ্বসি,—বিফল জীবন!

৫

প্রেম যদি হইত বনানী,
হৃদি যদি হ'ত দাবানল!—
ক্ষোভে রোষে নিরাশ্বাসে
গ্রাসিতাম গ্রাসে গ্রাসে,
রহিত অস্তিত্ব তার আমাতে কেবল!

৬

প্রেম যদি হইত জীবন,
মরণ হইত যদি হৃদি!—
চা'ক বা না চা'ক ফিরে
আমি রহিতাম ঘিরে—
সুখে দুখে ঘুরিত সে আমারি পরিধি!

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল।

নিশীথে

বেহাগ—একতালা

বিশ্ব যখন নিদ্রা মগন
গগন অন্ধকার।
কে দেয় আমার বীণার তারে
এমন ঝঙ্কার॥
নয়নে ঘুম নিল কেড়ে
উঠে বসি শয়ন ছেড়ে
মেলে আঁখি চেয়ে থাকি
পাইনে দেখা তার॥

গুঞ্জরিয়া গুঞ্জরিয়া
প্রাণ উঠিল পূরে,
কে জানে কোন্ বিপুল বাণী
বাজে ব্যাকুল সুরে।
কোন্ বেদনায় বুঝি না রে
হৃদয়ভরা অশ্রুভারে;
পরিয়ে দিতে চাই কাহারে
আমার কণ্ঠহার॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ভারতীয় ইতিহাসের উপকরণ

ইতিহাস-প্রদীপেন মোহাবরণঘাতিনা।
লোকগর্ভগৃহংকৃৎস্নং যথাবৎসম্প্রকাশিতম্॥
মহাভারত।

A people that can feel no pride in the past in its history and literature loses the mainstay of its national character. When Germany was in the very depth of its political degradation, it turned to its ancient literature and drew hope for the future by the study of its past. Something of the same kind is now passing in India—*Max Muller.*

প্রাচীন ভারতের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ইতিহাস নাই বলিয়া আমাদিগের দেশের অনেকেই, এমন কি অনেক শিক্ষিতাভিমানী ব্যক্তিও ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া থাকেন। এই শ্রেণীর ক্ষোভ-প্রকাশকারীদিগের মধ্যে বোধ হয় অনেকেই অবগত নহেন বা ভুলিয়া যান যে পৃথিবীর কোনও প্রাচীন জাতিই ভাবী বংশধরদিগের জন্য আপনাদিগের সম্পূর্ণ ইতিহাস লিখিয়া রাখেন নাই। অনেকস্থলে পরবর্ত্তী কালের প্রত্নসন্ধিগণের সবিশেষ পরিশ্রমে, ঐ সকল জাতির ইতিহাস, তাঁহাদিগের প্রাচীন শিল্প ও সাহিত্য হইতেই সংকলিত হইয়াছে। প্রাচীন শিল্পে ও সাহিত্যে জাতীয় ভাবের যে প্রতিবিম্ব মুদ্রিত থাকে, তাহাই প্রকৃত জাতীয় ইতিহাসরচনার প্রধান উপাদান, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সকল দেশের ও সকল কালেরই রাজপুরুষেরা আপনাদের কীর্ত্তিকলাপ চিরস্মরণীয় করিবার জন্য অনুগত

কবিদিগের সাহায্যে আপনাদিগের "রাজ-প্রশস্তি" রচনা করাইয়াছেন, শিলালিপি ক্ষোদিত করাইয়া পর্ব্বতগাত্রে, গিরিগুহায় ও মন্দির প্রাচীরাদিতে সন্নিবিষ্ট করাইয়াছেন। প্রাচীন ভারতেও এই প্রথা প্রায় সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল। কিন্তু রাজবংশাবলীর কীর্ত্তিকলাপ বা রাজপুরুষদিগের কার্য্য-তালিকা ও কতিপয় প্রসিদ্ধ যুদ্ধবিগ্রহাদির বিবরণ কোনও দেশেই জাতীয় ইতিহাসের প্রধান অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হয় না—আমাদিগের দেশেও হয় নাই। এই বিশাল ভারতখণ্ডের অসংখ্য ক্ষুদ্রবৃহৎ জনপদের অগণিত "রাজপ্রশস্তি" কালের গর্ভে বিলীন হইলেও এদেশের শিল্পে ও সাহিত্যে আমাদিগের জাতীয় ইতিহাসের যে উপকরণ অদ্যাপি সুরক্ষিত আছে, তাহার পরিমাণ নিতান্ত সামান্য নহে। ভারতের প্রাচীন সাহিত্য যেরূপ বিরাট্ ও বৈচিত্র্যময়, এখানকার স্থাপত্যশিল্প যেরূপ বিপুল ও নানা বিশেষত্বপূর্ণ, সেরূপ আর কোনও দেশেই পরিদৃষ্ট হয় না। সুতরাং সর্ব্বাঙ্গসুন্দর জাতীয় ইতিহাস লিখিবার উপকরণ ভারতবর্ষে অন্য কোনও দেশের তুলনাতেই অধিক ভিন্ন অল্প নহে। কেবল দেশের শিক্ষিতাভিমানী ব্যক্তিগণের আলস্য ও উদাসীনতার জন্যই অদ্যাপি ভারতের একখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ইতিহাস রচিত হইল না। তাই আমাদিগকে এখনও জাতীয়-ইতিহাস-হীনতার কলঙ্ক মস্তকে বহন করিতে হইতেছে। দেশের প্রকৃত ইতিহাসের অভাবে আমাদিগের ভবিষ্যৎ জাতীয় উন্নতির পথও তিমির-সমাচ্ছন্ন রহিয়াছে। ইংরাজীতে একটি কথা আছে যে, History is the mother of rationalism কথাটি অমোঘ সত্য। জাতীয় ইতিহাস পাঠ করিবার সুযোগ না পাইলে জাতীয় ভাবের কুত্রাপি উদ্ভব হয় না। প্রকৃত জাতীয় ভাবের উদ্বোধনের জন্য আমাদিগের জাতীয় ইতিহাস রচনা নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে।

ভারতবর্ষের ন্যায় মহাদেশকল্প বিশাল ভূখণ্ডের একখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ইতিহাস রচনা সহজসাধ্য কার্য্য নহে, ইহা বলাই বাহুল্য। বহুসংখ্যক শিক্ষিত ব্যক্তির জীবন-ব্যাপী পরিশ্রম ভিন্ন এই কার্য্য কখনই সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে না। এ পর্য্যন্ত দেশের কতিপয় সুসন্তান এই কার্য্যে আংশিক ভাবে ব্রতী হইয়া ভারতীয় ইতিহাসের ভিন্ন ভিন্ন যুগের তমসাচ্ছন্ন অংশে আলোকপাত করিয়াছেন। এ বিষয়ে পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্বজিজ্ঞাসুগণও অল্প সহায়তা করেন নাই। তাঁহাদিগের অসাধারণ অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের ফলে অনেক উপকরণ আবিষ্কৃত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টও এ কার্য্যে অর্থ সাহায্য করিতে নিতান্ত কৃপণতা করেন নাই। কিন্তু এইরূপে এ পর্য্যন্ত প্রাচীন ভারত সম্বন্ধে যে সকল ঐতিহাসিক তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা নানা সাময়িক পত্রে ও গ্রন্থে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। এই সকল সাময়িক পত্রের ও গ্রন্থের অধিকাংশই বিদেশীয় ভাষায় মুদ্রিত। এই শ্রেণীর রচনারাশির একত্র সংগ্রহ যেমন ব্যয়সাধ্য, উহার অধ্যয়ন ও আলোচনাও সেইরূপ

শ্রমজনক ব্যাপার। সেই সকল ইতস্ততো-বিক্ষিপ্ত তথ্যসমূহ একত্র সংকলিত হইলে, ভারতীয় ইতিহাস রচনার পথ বহু পরিমাণে সুগম হইবার সম্ভাবনা। জাতীয় ইতিহাস-সংক্রান্ত বিবিধ তত্ত্ব একত্র সংকলিত অবস্থায় পাঠ করিবার সুযোগ পাইলে অনেকের অনেক কুসংস্কারও দূরীভূত হইতে পারে। এই কারণে, আমরা "বঙ্গদর্শনে" জাতীয় ইতিহাসবিষয়ক নানা তথ্যের সংকলন করিবার সংকল্প করিয়াছি। আমাদিগের এই উদ্যম সমুদ্রবন্ধনে কাষ্ঠবিড়ালীর সামান্য সহায়তার অনুরূপ, সন্দেহ নাই। তথাপি স্বর্গীয় বঙ্কিমবাবুর ভাষায় বলি—"যে দরিদ্র, সে সোনারূপা জুটাইতে পারিল না বলিয়া কি বনফুল দিয়া মাতৃপদে অঞ্জলি দিবে না?"

জাতীয় ইতিহাসের উপকরণ-সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলে প্রথমেই বৈদিক কালের প্রতি মনোনিবেশ করিতে হয়। বৈদিক যুগের সময় নির্ণয় প্রসঙ্গে দেশীয় ও বিদেশীয় পণ্ডিতদিগের মধ্যে বহু বাগ্‌বিতণ্ডা হইয়া গিয়াছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনত্ব খর্ব্ব করিবার জন্য সবিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। অধ্যাপক ম্যাক্‌সমূলারের মতে বৈদিক যুগের আরম্ভ খ্রীঃ পূঃ ১৫শ শতাব্দীর অধিক পূর্ব্বে নহে। কেহ কেহ খ্রীষ্টপূর্ব্ব দুই সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া থাকেন। দুই এক জন পাশ্চাত্য পণ্ডিত খ্রীষ্টপূর্ব্ব ২৩শ হইতে ২৮শ শতাব্দী পর্য্যন্ত কালের মধ্যে বৈদিক যুগের আরম্ভ কাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পাশ্চাত্যগণের ধীশক্তি এতদপেক্ষা অধিকতর প্রাচীন কালে বৈদিক যুগের পূর্ব্বসীমা নির্ণয় করিতে সমর্থ হয় নাই, সে যাহা হউক, ম্যাক্‌সমূলারের মতই ইউরোপীয় পণ্ডিত সমাজের নিকট সমধিক আদৃত হইয়াছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বৈদিক কালের উত্তর সীমা খ্রীঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের মতে ঋগ্বেদের মন্ত্রসংহিতা বৈদিক যুগের পূর্ব্ব-সীমায় ও শতপথ ব্রাহ্মণ উহার উত্তর সীমায় অবস্থিত।

আমাদিগের দেশীয় শিক্ষিতসম্প্রদায় এ সকল বিষয়ে এক প্রকার নির্ব্বিচারেই পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মতের অনুবর্ত্তী হইয়া থাকেন। ৺রমেশচন্দ্র দত্ত বৈদিক কালের পূর্ব্বসীমা খ্রীঃ পূঃ বিংশ শতাব্দী বলিয়া স্বীকার করিবার পর হইতে এদেশের অধিকাংশ বিদ্যালয়পাঠ্য বাঙ্গালা পুস্তকে ঐ সিদ্ধান্ত পরিগৃহীত হইয়াছে। কোনও কোনও পাঠ্য পুস্তকে ম্যাক্‌সমূলারের মতকেই প্রাধান্য দান করা হইয়াছে। আমাদিগের দেশীয় মনীষিগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত বালগঙ্গাধর তিলক ও ৺ শঙ্কর বালকৃষ্ণ দীক্ষিত মহাশয়ই সর্ব্বপ্রথম এই বিষয়ে পাশ্চাত্য মোহ অতিক্রম করিয়া অসাধারণ অধ্যবসায় স্বীকার পূর্ব্বক স্বাধীন ভাবে বৈদিক যুগের অভিনব সময় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। তাঁহাদিগের মতের আলোচনা করিলে জানা যাইবে যে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা যে শতপথ ব্রাহ্মণকে বৈদিক যুগের শেষ সীমায় স্থাপন করিয়াছেন, সেই শতপথ ব্রাহ্মণের রচনা-কাল খ্রীঃ পূঃ ২৪শ শতাব্দী অপেক্ষা আধুনিক নহে। এ বিষয়ে দীক্ষিত মহোদয় শতপথ

ব্রাহ্মণ হইতে যে প্রমাণটি সর্ব্ব প্রথম আবিষ্কার করেন, আমরা তাহা পাঠকবর্গের গোচর করা আবশ্যক মনে করি। অধ্যাপক ক্কে কবির ন্যায় ২।১ জন পাশ্চাত্য পণ্ডিত তিলক ও দীক্ষিত মহোদয়দের মত গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় এখনও এদিকে দৃষ্টিপাত করিবার অবসর পান নাই।

শতপথ ব্রাহ্মণের রচনাকাল।

২৩৫০ পূঃ খ্রীঃ—২৮০০ পূঃ খ্রীঃ।

শতপথ ব্রাহ্মণের দ্বিতীয় কাণ্ডের প্রারম্ভে লিখিত আছে,—

একং দ্বে ত্রীণি চত্বারি বা অন্যানি নক্ষত্রাণি। অথৈতা এব ভূয়িষ্ঠা যৎ কৃত্তিকাঃ; তদ্ভূমানমেব এতদুপৈতি তস্মাৎ কৃত্তিকাস্বাদধীত। এতা হ বৈ প্রাচ্যৈ দিশো ন চ্যবন্তে, সর্ব্বাণি হ বা অন্যানি নক্ষত্রাণি প্রাচ্যৈ দিশশ্চ্যবন্তে; তৎ প্রাচ্যামেবৈতদ্দিশ্য হিতৌ ভবত স্তস্মাৎ কৃত্তিকাস্বাদধীত।"

অর্থাৎ অন্যান্য নক্ষত্রের সংখ্যা এক, দুই, তিন বা চারি। কিন্তু কৃত্তিকার সংখ্যাই অনেক। (যিনি কৃত্তিকায় অগ্ন্যাধান করেন, তিনি) বিপুলতা লাভ করেন। এই কারণে কৃত্তিকায় অগ্নির আধান করিবে। ইঁহারাই কেবল পূর্ব্বদিক্ হইতে বিচ্যুত হন না। অপর সকল নক্ষত্রই পূর্ব্ব দিক্ হইতেই বিচলিত হয়। যিনি কৃত্তিকায় অগ্ন্যাধান করেন, তাঁহার পূর্ব্বদিকে দুইবার আধান করা হয়। এই কারণে কৃত্তিকায় অগ্ন্যাধান করিবে।" এই বচনে বলা হইয়াছে যে, কৃত্তিকানামক নক্ষত্রপুঞ্জ পূর্ব্বদিক্ হইতে বিচ্যুত হন না—অর্থাৎ তাঁহারা ঠিক পূর্ব্বদিকেই উদিত হন। এস্থলে "চ্যবন্তে" এই বর্ত্তমান কালবোধক ক্রিয়াপদের প্রয়োগ থাকায় প্রতিপন্ন হইতেছে যে, শতপথ ব্রাহ্মণের পূর্ব্বোক্ত বচনের রচনাকালেই কৃত্তিকাগণ ঠিক পূর্ব্বদিকে বা বিষুবদ্‌বৃত্তে অবস্থিত ছিল। অথবা ঐ নক্ষত্রে সে কালে বিষুবন্ ছিল। কিন্তু এক্ষণে উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রের দ্বিতীয় পাদে বিষুবন্ অবস্থিত দেখা যায়। অয়ন-চলন এই প্রভেদের কারণ। এক্ষণে যদি জানিতে পারা যায় যে, কোন্ সময়ে কৃত্তিকায় বিষুবন্ ছিল বা কৃত্তিকা ক্রান্তিশূন্য ছিল, তাহা হইলে শতপথ ব্রাহ্মণের কাল নির্দ্ধারিত হইতে পারে।

চীনদেশীয় প্রাচীন গ্রন্থাদিতেও এইরূপ কৃত্তিকার বিষুবদ্‌বৃত্তে অবস্থানের উল্লেখ দেখা যায়। [চীনীয়েরা এই কৃত্তিকাদি গণনাপদ্ধতি ভারতীয়দিগের নিকট হইতেই শিক্ষা করিয়াছিলেন।] মিঃ বায়ো তৎকালে কৃত্তিকার সায়নভোগ শূন্য ধরিয়া গণনাপূর্ব্বক দেখাইয়াছেন যে, ২৩৫৭ পূর্ব্ব খ্রীষ্টাব্দে কৃত্তিকা ক্রান্তিশূন্য ছিল। (বর্জ্জেস সাহেবের সূর্য্যসিদ্ধান্তের অনুবাদের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।) "আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ" প্রণেতা শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় এম এ মহাশয় বলেন, "১৮১৬ শকাব্দে (১৮৯৪ খ্রীঃ) কৃত্তিকার মধ্যস্থিত তারার সায়নভোগ ৫৮।৩১ অংশাদি ছিল। স্থূলতঃ ৫৯ অংশ এবং ৭২ বৎসরে অয়নগতি ১ অংশ ধরিলে ৪২৪৮ বৎসর আসে। তাহা হইতে ১৮১৬ হীন করিলে শকপূর্ব্ব ২৪৩২ (২৫১০ খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দ) হয়।" যোগেশবাবু কৃত্তিকার যোগতারার সায়নভোগ ধরিয়া গণনা করিয়াছেন।

কিন্তু শতপথ ব্রাহ্মণে ঠিক কৃত্তিকার যোগ-তারার উল্লেখ নাই; সুতরাং এক আধ অংশের পার্থক্য ঘটনা অসম্ভব নহে। শ্রীযুক্ত বালগঙ্গাধর তিলক মহাশয়ও স্বপ্রণীত "ওরায়েন বা বেদের প্রাচীনত্ব" নামক গ্রন্থে ২৩৫০ পূর্ব্ব খ্রীষ্টাব্দে শতপথোক্ত কৃত্তিকার বিষুবদ্বৃত্তে অবস্থিতি স্থির করিয়াছেন। ৺শঙ্কর বালকৃষ্ণ দীক্ষিত মহাশয় অন্য প্রকার গণনাপদ্ধতি অবলম্বন করিয়া কৃত্তিকায় বিষুবনের অবস্থিতিকাল খ্রীষ্টপূর্ব্ব ২৮শ শতাব্দীতে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সে যাহা হউক, শতপথ ব্রাহ্মণের রচনাকাল ন্যূনকল্পে খ্রীষ্টপূর্ব্ব ২৩৫০ অব্দে নির্দ্ধারণ করিলে কোনও দোষ হয় না।

এত প্রাচীনকালে আসিয়া পড়িতে হয় বলিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা এ গণনা স্বীকার করিতে চাহেন না। তাঁহারা বলেন, এস্থলে কৃত্তিকা অর্থে দৃশ্যমান কৃত্তিকাপুঞ্জ না গ্রহণ করিয়া সমবিভাগাত্মক নক্ষত্র (বা নভোমণ্ডলের ১৩ অংশ ২০ কলা পরিমিত স্থান) গ্রহণ করা উচিত। এই হিসাবে উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রের দ্বিতীয় পাদ হইতে কৃত্তিকার আরম্ভ পর্য্যন্ত ৩৷৷॰ নক্ষত্র বা ৪৬৷৪০ অংশাদি মাত্র ব্যবধান হয়। এই ব্যবধান অতিক্রম করিতে (৭২ বৎসরে অয়নের গতি এক অংশ হিসাবে) প্রায় ৩৩২৫ বৎসর অতিবাহিত হইবার কথা। ইহা হইতে খ্রীষ্টাব্দের ১৯১০ বৎসর বাদ দিলে ১৪১৫ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে উপনীত হওয়া যায়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মতে ইহাই শতপথোক্ত কৃত্তিকার বিষুবদ্বৃত্তে অবস্থিতির কাল।

কিন্তু শ্রীযুক্ত তিলক ও দীক্ষিত প্রভৃতি মনীষীরা বলেন যে প্রাচীন বৈদিককালে নক্ষত্রচক্রের ঐরূপ ১৩৷২০ অংশাত্মক কৃত্রিম বিভাগ প্রথা থাকার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। ঐরূপ বিভাগ পরবর্ত্তীকালে জ্যোতিষশাস্ত্রের সবিশেষ উন্নতির সময় কল্পিত হইয়াছিল। বৈদিক ঋষিগণ সমবিভাগাত্মক নক্ষত্রের বিষয় জানিতেন না—তাঁহারা তারাত্মক নক্ষত্রের কথাই বলিয়াছেন। আলোচ্য বচনে কৃত্তিকাকে "ভূয়িষ্ঠা" বলাতেই বুঝা যায় যে, তারা-পুঞ্জেরই প্রতি তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল। আমাদের প্রাচীন সিদ্ধান্ত শাস্ত্রেও কৃত্তিকা-পুঞ্জের স্থান অশ্বিনীর ৩৭৷৷॰ অংশ পূর্ব্বদিকে নিরূপিত হইয়াছে। বরাহমিহিরের (৪২৭ শকাব্দ বা ৫০৫ খৃষ্টাব্দে) সময়ে রেবতী নক্ষত্রের চতুর্থপাদে বিষুবন্ ছিল। সুতরাং ঐ সময়ের অন্ততঃ শতবৎসর পূর্ব্বে উহা অশ্বিনী নক্ষত্রের প্রারম্ভে ছিল ধরা যাইতে পারে। সেই সময়ের পূর্ব্বেই বিষুবন্ কৃত্তিকা হইতে ৩৭৷৷॰ অংশ পিছাইয়া পড়িয়াছিল। এই ৩৭৷৷॰ অংশ অতিক্রম করিতে বিষুবনের প্রায় ২৭০০ বৎসর লাগিয়াছিল। এই হিসাবেও (২৭০০—৪০০) ২৩০০ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে উপনীত হইতেছি। এ স্থলে আর একটি বিষয় স্মরণ করা উচিত। অভিজ্ঞ জ্যোতিষীরা বলেন যে, অয়নের গতিবেগ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে। এখন এক অংশ অতিক্রম করিতে অয়নের ৭২ বৎসর লাগে; কিন্তু প্রায় তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে তদপেক্ষা অধিক সময় লাগিত। এই অধিক গতিবেগের অল্পতার জন্য ৪০।

৫০ বৎসরের পার্থক্য ঘটা নিতান্ত স্বাভাবিক। ফল কথা যে দিক্ দিয়াই দেখা যাউক, ২৩৫০ পূঃ খ্রীঃ বিষুবন্ কৃত্তিকায় ছিল বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। ঐ সময়েই শতপথ ব্রাহ্মণ—অন্ততঃ উহার যে অংশে কৃত্তিকার পূর্ব্বদিকে উদয়ের কথা আছে, সেই অংশ রচিত হইয়াছিল বলিতে হইবে।

এস্থলে একটি আশঙ্কার সম্ভাবনা আছে। যন্ত্রের সাহায্য না লইয়া দেখিলে পূর্ব্বদিক্ নির্ণয়ে এক আধ অংশের পার্থক্য ঘটিতে পারে। এক অংশের পার্থক্য ঘটিলেই গণনায় প্রায় দুই শত বৎসরের প্রভেদ ঘটিবার সম্ভাবনা। শতপথকারের পূর্ব্বদিক্ নির্ণয়ে এই ভ্রম সংঘটন অসম্ভব নহে। সুতরাং তাঁহার যে সময় নির্দ্দিষ্ট হইল, তদপেক্ষা ২।১ শত বৎসর পূর্ব্বে বা পরেও তাঁহার আবির্ভাব সম্ভবপর। যাঁহারা অধিক প্রাচীনত্বের পক্ষপাতী নহেন, তাঁহারা শতপথকারকে ২৩৫০ পূর্ব্বখ্রীষ্টাব্দ অপেক্ষা ২।১ শত বৎসরের পরবর্ত্তী বলিয়াই নির্দ্দেশ করিবেন। তাহা হইলেও স্থূলতঃ খ্রীষ্টপূর্ব্ব ২২শ শতাব্দী অপেক্ষা শতপথ ব্রাহ্মণের কর্ত্তাকে আধুনিক বলিয়া নির্দ্দেশ করা চলিবে না।

প্রাচ্য মনিষীদিগের এই সকল তর্কের উত্তর দিতে গিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগকে উভয় সঙ্কটে পড়িতে হইয়াছে। একদিকে সমবিভাগাত্মক নক্ষত্রের কথা তুলিয়া শতপথ ব্রাহ্মণকে খ্রীষ্টপূর্ব্ব ১৪শ শতাব্দীর গ্রন্থ বলিয়া স্থির করিতে গেলে স্বীকার করিতে হয় যে, অত পূর্ব্বকালে আর্য্যঋষিগণ জ্যোতিষিক জ্ঞানের চর্চ্চায় যথেষ্ট অগ্রসর হইয়াছিলেন। অন্যদিকে শতপথ ব্রাহ্মণকে ২৩৫০ পূর্ব্ব খ্রীষ্টাব্দে রচিত বলিয়া মানিয়া লইতে হয়। কিন্তু এই উভয় সিদ্ধান্তের কোনটিই তাঁহাদিগের নিকট প্রীতিকর নহে বলিয়া তাঁহারা তর্ক তুলিয়াছেন যে, "চ্যবন্তে" এই বর্ত্তমান কালবোধক ক্রিয়াপদের এস্থলে বিশেষ কোনও অর্থ নাই—অতি প্রাচীনকালের কথা অনেকদিন পরে লিখিত হইয়াছে, ইহা অসম্ভব নহে। আজকাল যেমন উত্তরভাদ্রপদে বিষুবন্ থাকিলেও ভারতবাসীরা অশ্বিনীকেই প্রথম নক্ষত্র বলিয়া বা অশ্বিনীতেই বিষুবন্ আছে বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন, সেইরূপ সেকালেও বিষুবনের কৃত্তিকাত্যাগের বহুদিন পরেও উহা "কৃত্তিকাতেই আছে" এরূপ লিখিত হইয়া থাকিবে। বলা বাহুল্য ওটা অনুমান মাত্র। ফলতঃ বিগত সহস্র বৎসর হইতে ভারতে যে অবনতির স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে,তাহাতে জ্যোতিষবিজ্ঞান-চর্চ্চার পথ নিরুদ্ধপ্রায় হওয়ায় আমরা প্রাচীন সিদ্ধান্তোক্ত অশ্বিনীকেই নিমীলিত নেত্রে প্রথম নক্ষত্র বলিয়া মানিয়া আসিতেছে। কিন্তু যে ব্রাহ্মণ রচনার যুগে যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান ঋষিগণের প্রধান ধর্ম্মকার্য্য ছিল, এবং নক্ষত্রবিশেষে অগ্ন্যাধানের বিশেষ বিশেষ ফল স্বীকৃত হইত, সেই যুগেও যে নক্ষত্রের পরিদর্শনে বর্ত্তমান সময়েরই মত ঔদাস্য প্রকাশিত হইত, একথায় বিশ্বাস করা দুরূহ। কিন্তু অধ্যাপক জেকবি ও ব্লুমফীল্ড প্রভৃতির ন্যায় দুই একজন মনীষী ভিন্ন আর কোনও পাশ্চাত্য পণ্ডিতই বেদের প্রাচীনত্ব

স্বীকারে ইচ্ছুক নহেন। তাঁহারা নানা প্রকার বৃথা তর্ক তুলিয়া বৈদিক সাহিত্যের আধুনিকত্ব প্রতিপাদনে প্রয়াস পাইতেছেন। সংপ্রতি ম্যাকডোনেল সাহেব তাঁহার "সংস্কৃত সাহিত্য" নামধেয় ইংরাজী গ্রন্থে শতপথ ব্রাহ্মণকে খ্রীষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠশতাব্দীর গ্রন্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন! অন্য অনেকে সেই কথারই প্রতিধ্বনি করিতেছেন।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ রচনার কাল।

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় বলেন যে, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ রচনার সময়ে রোহিণী নক্ষত্রে বিষুবন্ ছিল। ঐ ব্রাহ্মণে অদিতি (পুনর্ব্বসু) মৃগশিরা, ও রোহিণী লইয়া কোনও না কোনও উল্লেখ আছে, কিন্তু কৃত্তিকা লইয়া কোনও কথা নাই। কৃত্তিকা ও রোহিণীর অন্তর প্রায় ১২ অংশ। এই ১২ অংশ সরিয়া আসিতে বিষুবনের প্রায় ৮০০ বৎসর লাগিয়াছিল। এই দীর্ঘকালের মধ্যে ঐতরেয় ব্রাহ্মণের মৃগব্যাধবিষয়ক উপাখ্যানটির সৃষ্টি বলা যাইতে পারে। (ঐ ঐ পৃঃ ২৭৭) এই মৃগব্যাধের আখ্যায়িকা শতপথ ব্রাহ্মণের প্রথমাংশে ঐতরেয় অপেক্ষাও অধিকতর পল্লবিত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ শতপথ অপেক্ষা প্রাচীন, সন্দেহ নাই। কিন্তু কত প্রাচীন? যোগেশবাবুর কথায় নির্ভর করিয়া উহাকে শতপথ অপেক্ষা অন্ততঃ ২।৩ শতাব্দী প্রাচীন বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

পরাশর তন্ত্র।

খ্রীঃ পূঃ ১৩০০।

ভারতীয় শাস্ত্রগ্রন্থসমূহের অর্ব্বাচীনত্ব (আধুনিকত্ব) প্রতিপাদন কল্পে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা নানা বিষয়েই এইরূপ কূট অনুমানের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদিগের এই কূট চেষ্টার উদাহরণ স্বরূপ "পরাশরতন্ত্র" নামক একখানি জ্যোতিষ গ্রন্থের প্রসঙ্গ অবতারিত হইতে পারে। এই গ্রন্থ এখন দুর্ল্লভ হইয়াছে। বৃহৎ সংহিতার টীকাকার ভট্ট-উৎপল পরাশরতন্ত্র হইতে অগস্ত্যতারার উদয়াস্তকাল সম্বন্ধে কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। পরাশরের মতে সূর্য্য হস্তানক্ষত্রে প্রবেশ করিলে অগস্ত্যতারার উদয় ও রোহিণীতে প্রবেশ করিলে অস্ত হয়। ইহা হইতে কোল্‌ব্রুক সাহেব গণনা করিয়া বলিয়াছেন যে, খ্রীষ্টপূর্ব্ব ত্রয়োদশ শতাব্দীতে অগস্ত্যতারার এইরূপ উদয়াস্ত হইত। কিন্তু পরাশর তন্ত্রের ঈদৃশ প্রাচীনতা স্বীকার করিলে বেদাদি শাস্ত্রকে আরও অধিক প্রাচীন বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। এই কারণে তিনি বলিয়াছেন যে, পরাশর পূর্ব্বকালের নিয়ম দিয়া গিয়াছেন, বস্তুতঃ তিনি খ্রীষ্টপূর্ব্ব ত্রয়োদশ শতাব্দী অপেক্ষা অনেক অর্ব্বাচীন বা আধুনিক। কিন্তু নিজের সময়ের উদয়াস্তের নিয়ম না জানাইয়া সহস্র বৎসর পূর্ব্বে কি নিয়মে অগস্ত্যের উদয় ও অস্ত হইত, তাহা লিখিবার জন্য পরাশর ব্যগ্রতা প্রকাশ করিবেন কেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। ফল কথা, ভারতীয় শাস্ত্রগ্রন্থ-সমূহের প্রাচীনত্ব স্বীকার করিতে অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিতই যেন অত্যন্ত ক্লেশানুভব করেন বলিয়া বোধ হয়। খ্রীষ্টপূর্ব্ব ত্রয়োবিংশ শতাব্দীতে সমগ্র পৃথিবীব্যাপী জলপ্লাবন হইয়াছিল বলিয়া বাইবেলে

যে আখ্যায়িকা আছে, তাহার প্রতি অন্ধ বিশ্বাস বশেই তাঁহারা এরূপ করেন, অথবা ইহার অন্য কোনও কারণ আছে, তাহা তাঁহারাই বলিতে পারেন। সে যাহা হউক, পূর্ব্বোক্ত বৃথা তর্কের অবতারণা করিয়া অধিকাংশ পাশ্চাত্য পণ্ডিতই পরাশর তন্ত্রকে খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীর গ্রন্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের মধ্যে আবার কাহারও কাহারও মতে গর্গ, পরাশর প্রভৃতি নামগুলি সম্পূর্ণ কাল্পনিক। সে সকল নামে কখনও কোনও ঋষি বিদ্যমান ছিলেন না। বলা বাহুল্য এ সকল কথা নিতান্তই অশ্রদ্ধেয়। তবে পরাশর তন্ত্রের কর্ত্তা কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাসের পিতা না হইলেও পরাশর নামে একাধিক ঋষির অস্তিত্ব অসম্ভব নহে।

পরাশর তন্ত্রে লিখিত আছে মাঘ মাসে গ্রহণ হইলে বঙ্গ, আনর্ত্ত, যবন ও কাশী প্রদেশ উৎসন্ন হয়। এই গ্রন্থে বাহ্লীক গান্ধার চীন প্রভৃতি অনেক দেশের নাম আছে। আমাদিগের দেশের কোনও শাস্ত্রে যবনদিগের উল্লেখ দেখিলেই পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা সেই শাস্ত্রকে ভারতের যবনাগমনের বা আলেক্জাণ্ডারের অভিযানের পরবর্ত্তী বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু তৎপূর্ব্বে যে যবনদিগের সহিত বাণিজ্যসূত্রেও ভারতবাসীর পরিচয় হয় নাই, ইহা কি সম্ভবপর? আর যবনেরাও ত নিতান্ত আধুনিক জাতি নহে। পূর্ব্বে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা গ্রীক সভ্যতার উৎপত্তিকাল খ্রীঃ পূঃ ১২শ শতাব্দীতে নির্দ্দেশ করিতেন, কিন্তু অধুনা খ্রীঃ পূঃ ১৪৫০ অব্দের ক্ষোদিত মিসরদেশীয় শিলাশাসনে গ্রীকদিগের উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে। (ইভেলিন এবট প্রণীত গ্রীসদেশের ইতিহাস দ্রষ্টব্য) এই গ্রন্থে আরও লিখিত আছে যে, স্পার্টার ব্যবস্থাশাস্ত্রপ্রণেতা লাইকার্গস ৮০০ পূর্ব্ব খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন! এই সকল দেখিয়া শুনিয়া অনেকে এখন খ্রীঃ পূঃ ২০০০ হইতে ২৫০০ অব্দের মধ্যে গ্রীক-সভ্যতার অভ্যুদয় স্বীকার করিতেই উৎসাহী হইতেছেন। কিন্তু ভারতীয় পুরাবৃত্তানুসন্ধানে প্রবৃত্ত পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মধ্যে অনেকেই এ বিষয়ে মনোনিবেশ করেন না, ইহাই পরিতাপের বিষয়। মহাবৈয়াকরণ পাণিনি আলেক্জাণ্ডারের বহু শতাব্দী পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াও স্বীয় অষ্টাধ্যায়ী সূত্রে যবনালিপির উল্লেখ করিয়াছেন, এই সকল পাশ্চাত্য মনীষী এ কথা বিস্মৃত হইয়া যান ইহাই বিস্ময়ের বিষয়।

শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর।

জ্যোতিষ্কের জন্মমৃত্যু।

জ্যোতিষ্ক-জগতের সংবাদ লইলে, যে বাষ্পময় জ্বলন্ত পদার্থ হইতে জ্যোতিষ্কের গঠন হইয়াছে, সেই নিহারিকা-স্তূপেই জগতের বীজ দেখিতে পাই। তার পর সেই বীজ কি প্রকারে নানা শ্রেণীর জ্যোতিষ্কের উৎপত্তি করিয়াছে, তাহাও আকাশের অনন্ত নক্ষত্রগুলির পরিচয় গ্রহণ করিয়া বুঝিতে হয়। ক্ষুদ্র বীজ কি প্রকারে অঙ্কুরিত হইয়া ক্রমে অভ্রভেদী মহাতরুতে পরিণত হয়, এবং তার সেটি দুই শত বৎসর ব্যাপী নানা পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া কি প্রকারে ক্রমে চরম অবস্থায় উপনীত হয়, একজন মানুষ তাহার ক্ষুদ্র জীবনে তাহা দেখিবার সময় পায় না। কাজেই তাহাকে মহারণ্যে প্রবেশ করিয়া ছোট বড় নানা প্রকার বৃক্ষ দেখিয়া শুনিয়া মহাতরুর জীবনের এক ধারাবাহিক ইতিহাস সংগ্রহ করিতে হয়। জ্যোতিষ্কগুলির জীবনের ইতিহাস সংগ্রহ করিতে গিয়া জ্যোতির্ব্বিদগণ এই উপায়ই অবলম্বন করিয়াছেন। অতি শৈশব এবং অতি বার্দ্ধক্য এই দুই সীমার মধ্যে যতগুলি অবস্থা থাকিতে পারে, আকাশস্থ নানা জ্যোতিষ্কে তাহার পরিচয় সংগ্রহ করা কঠিন নয়। নিরবয়ব জ্বলন্ত বাষ্পরাশি হইতে কি প্রকারে নক্ষত্রগুলি মূর্ত্তিমান প্রকৃতির কর্ম্মশালা, বিশাল নিহারিকা-স্তূপগুলিতে তাহা দেখা যায়। তার পর সেই রক্তাভ শিশু জ্যোতিষ্ক ক্রমে যৌবনে পদার্পণ করিয়া কি প্রকারে শুভ্র ও উজ্জ্বল হইয়া পড়ে, অভিজিৎ (Vega) প্রভৃতি নক্ষত্রগুলি হইতে তাহা বুঝা যায়। প্রৌঢ় জ্যোতিষ্কের অবস্থা জানিবার জন্য আমাদিগকে অধিক দূর যাইতে হয় না। সূর্য্যই তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। যৌবনের উদ্দামতা ইহাতে আর নাই। প্রৌঢ় গৃহস্থের ন্যায়ই সে স্বজন-পরিবৃত হইয়া এখন গৃহ-কর্ম্মে মন দিয়াছে। রোহিণী (Aldebaran) প্রভৃতি লোহিত তারকাগুলি জরাগ্রস্ত জ্যোতিষ্কের পরিচয় প্রদান করে। কোটি কোটি বৎসর তাপালোক বিকীরণ করিয়া এখন তাহারা নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছে। আর কিছুকাল মধ্যে ইহারা অবশিষ্ট তেজ-টুকু নিঃশেষে ব্যয় করিয়া আমাদের চন্দ্রের ন্যায় মৃত্যুমুখে পতিত হইবে।

যে সকল মহাপণ্ডিত অসার ও অমূলক কাহিনীর আবর্জ্জনা হইতে জ্যোতিঃশাস্ত্রকে উদ্ধার করিয়া, তাহাকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর দাঁড় করাইয়াছেন, তাঁহাদের কথা স্মরণ করিলে কাণ্ট সোয়েডেন্‌বর্গ রাইট এবং লাপ্লাসকে মনে পড়িয়া যায়। নিউটনের পর লাপ্লাসের ন্যায় অসাধারণ গণিতবিদ্‌ বোধ হয় আজও কেহ জন্ম গ্রহণ করেন নাই। ইনিই বহুকাল পূর্ব্বে জ্যোতিষ্কের জন্মমৃত্যু সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহা আজও পরিবর্ত্তিত আকারে স্বীকৃত হইতেছে।

লাপ্লাস্ সাহেব সৌরজগতের জন্মবৃত্তান্ত বিবৃত করিতে গিয়া বলিয়াছিলেন, আমাদের চন্দ্র-সূর্য্য শনি-বৃহস্পতি প্রভৃতি গ্রহ-উপগ্রহ-গুলি যে উপাদানে গঠিত, তাহা অতি প্রাচীন কালে এক গোলাকার প্রজ্বলিত নিহারিকার আকারে মহাকাশে আবর্ত্তন করিতেছিল। আমাদের পৃথিবীর নদী-সমুদ্র অরণ্য-পর্ব্বত প্রাণি-উদ্ভিদ সকলেরই উপাদান ঐ বিশাল নিহারিকা-স্তূপের গর্ভেই ছিল। কত কাল এই আবর্ত্তন চলিয়াছিল অনুমানও করিবার উপায় নাই। জ্যোতিষিক ব্যাপারে কোটি কোটি সংখ্যা লইয়াই হিসাব চলে। নিশ্চয়ই বহু কোটি বৎসর শনি বৃহস্পতি শুক্র পৃথিবী প্রভৃতিকে জঠরে ধরিয়া সেই নিহারিকারাশি আবর্ত্তন করিয়াছিল।

জিনিস যতই উত্তপ্ত থাকুক না কেন, তাপ বিকীরণ করিতে থাকিলে কালক্রমে তাহার উত্তাপের মাত্রা কমিয়া আসে, এবং সঙ্গে সঙ্গে জিনিসটাও সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। আমাদের নিহারিকা রাশিরও সেই দশা হইয়াছিল। তাপ বিকীরণ করিয়া এটি ছোট হইতে আরম্ভ করিয়াছিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে উহার আবর্ত্তন-বেগও বাড়িয়া গিয়াছিল। যখন কোন বায়বীয় জিনিস লাট্টুর ন্যায় ঘুরিতে ঘুরিতে নিজের দেহকে সঙ্কুচিত করিতে থাকে, তখন সকল বাষ্পই কেন্দ্রীভূত হইয়া জমাট বাঁধিতে পারে না। বাষ্পরাশিকে মাঝে মাঝে বলয়াকারে পশ্চাতে ফেলিয়া প্রধান অংশটা কেন্দ্রীভূত হইয়া পড়ে। লাপ্লাস বলিয়াছিলেন, সৌর নিহারিকা যখন দেহকে সঙ্কুচিত করিয়াছিল, তখন সেও দেহের কিয়দংশকে মাঝে মাঝে বলয়াকারে ছাড়িয়া আসিয়াছিল। পূর্ব্বের সেই বলয়াকার বাষ্পরাশি ক্রমে সঙ্কুচিত ও জমাট বাঁধিয়া বৃহস্পতি শুক্র প্রভৃতি গ্রহ-গণের উৎপত্তি করিয়াছে।

চন্দ্র পৃথিবীর সহিত সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে বটে, কিন্তু ইহা পৃথিবীরই আত্মজ। পৃথিবীরই চারিদিকে চন্দ্র ঘুরিয়া বেড়ায়। একা পৃথিবীই চন্দ্রশালিনী নয়, বৃহস্পতি শনি মঙ্গল ইউরেনস্ সকলেরই একাধিক চন্দ্র আছে। চন্দ্র অর্থাৎ উপগ্রহের জন্মতত্ত্বেও লাপ্লাস্ তাঁহার নিহারিকাবাদের প্রয়োগ করিয়াছেন। ইঁহার মতে, গ্রহ-বলয়গুলি সঙ্কুচিত হইয়া যখন জমাট জ্যোতিষ্কের উৎপত্তি করিয়াছিল ইহারাও কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বলয় রাখিয়া গিয়াছিল। এই গুলিই কালক্রমে সঙ্কুচিত হইয়া উপ-গ্রহের সৃষ্টি করিয়াছে। শনিগ্রহের চারি দিকে যে তিনটি বলয় অদ্যাপি দেখা যায়, সেগুলিও পূর্ব্বোক্ত প্রকারে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া লাপ্লাস্ সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। আধুনিক জ্যোতিষিগণ শনির বলয়ের গঠনোপাদানে বাষ্প বা অপর কোন সমঘন পদার্থের সন্ধান পান নাই। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উল্কাপিণ্ডই একত্রিত হইয়া ঐ বলয়গুলির রচনা করিয়াছে। এই কারণে শনির বলয় হয় ত লাপ্লাসের অনুমান অনুসারে উৎপন্ন হয় নাই বলিয়া কেহ কেহ মনে করিতেছেন।

লাপ্লাস্ সাহেব যখন তাঁহার নিহারিকাবাদের প্রচার করেন, তখন তিনি জ্যোতিষ্ক সম্বন্ধীয় সকল তথ্য সংগৃহীত দেখিতে পান নাই। সে সময় উপগ্রহ সম্বন্ধে জ্যোতির্ব্বিদ্-

দিগের জ্ঞান খুবই সংকীর্ণ ছিল। বড় বড় দূরবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা আজকাল যে সকল নূতন তথ্য সংগৃহীত হইতেছে, সেগুলি জানা থাকিলে লাপ্লাসের নিহারিকাবাদ হয় ত আর এক মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিত। নিহারিকাবাদের পুনর্গঠনের ভার আধুনিক জ্যোতিষীদিগের উপরেই পড়িয়াছিল। ইঁহারা নবাবিষ্কৃত জ্যোতিষিক তথ্যগুলির সাহায্যে লাপ্লাসের সিদ্ধান্তের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

এ পর্য্যন্ত আমরা যতগুলি গ্রহের পরিচয় পাইয়াছি, তন্মধ্যে ইউরেনস্ ও নেপ্‌চুন্ সূর্য্য হইতে অনেক দূরবর্ত্তী। ইহারা আমাদের পৃথিবী বা বৃহস্পতির ন্যায় উপগ্রহ পরিবৃত। কিন্তু যে পাকে সৌরজগতের ছোট বড় গ্রহ উপগ্রহ সূর্য্য প্রদক্ষিণ করিতেছে তাহা ত্যাগ করিয়া উহারা ঠিক বিপরীত পাকে আশ্রিত গ্রহকে প্রদক্ষিণ করে। একই নিহারিকা হইতে সমগ্র সৌরজগতের উৎপত্তি হইলে, ইউরেনস্ ও নেপ্‌চুনের উপগ্রহগুলি কখনই বিপরীত গতিবিশিষ্ট হইয়া ভ্রমণ করিত না বলিয়া একটা তর্ক উঠিয়াছিল। তা ছাড়া মঙ্গলের চন্দ্রদ্বয়ের মধ্যে যেটি গ্রহের নিকটতর তাহার বেগ দূরবর্ত্তী চন্দ্রের তুলনায় অত্যন্ত অধিক দেখিতে পাইয়াও নিহারিকাবাদের উপর লোকের সন্দেহ আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। গত শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক ইতিহাসের যাঁহারা একটুও খবর রাখেন, তাঁহাদিগের নিকট মহাপণ্ডিত ফেই (Faye) এবং ডারুইনের পরিচয় প্রদান করা নিষ্প্রয়োজন। এই দুই বিজ্ঞানরথী লাপ্লাসের সিদ্ধান্তের সহিত প্রত্যক্ষ জ্যোতিষিক ব্যাপারগুলির ঐক্য সন্ধান করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। একে একে আরো অনেক অনৈক্য ধরা পড়িয়াছিল। কাজেই সিদ্ধান্তটিকে মূলে ঠিক রাখিয়া তাহার শাখা-প্রশাখার কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইয়াছিল।

ইঁহারা বলিয়াছিলেন, এক এক নিহারিকা হইতেই যে প্রত্যেক নক্ষত্র-জগতের সৃষ্টি তাহা নিশ্চিত। তবে লাপ্লাস্ বাষ্পময় বলয় হইতে গ্রহগণের উৎপত্তির যে একটা কথা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা সম্ভবতঃ ঠিক নয়। ইঁহাদের মতে সেই আবর্ত্তনশীল বিশাল নিহারিকা বলয় রচনা করিতে সঙ্কুচিত হয় নাই। স্থানে স্থানে কতকটা বাষ্প আপনা হইতেই জমাট বাঁধিয়া গ্রহগণের উৎপত্তি করিয়াছে। ইঁহারা আরো অনুমান করিয়াছিলেন, আমাদের পৃথিবীর মত গ্রহগুলি যখন ঐ প্রকার এক একটা কেন্দ্র রচনা করিয়া মূর্ত্তিমান হইয়া পড়িয়াছিল, তখন তাহাতে জল বায়ু শিলামৃত্তিকা প্রভৃতির সকল উপাদানই ছিল না। ক্রমে ক্রমে এই সকল উপাদান চারিদিক হইতে আকর্ষণ করিয়া তাহারা পুষ্টাঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে। এই সকল অনুমানের উপর দাঁড়াইয়া আধুনিক জ্যোতিষিগণ গণিতের সাহায্যে দেখাইয়াছেন, পৃথিবী মঙ্গল বুধ ও শুক্র প্রভৃতি ক্ষুদ্র গ্রহগুলির সৃষ্টি সর্ব্বাগ্রেই হইয়াছিল, এবং ইহার বহুকাল পরে ইউরেনস্ ও নেপ্‌চুন্ জন্মগ্রহণ করিয়া বিপরীত মুখে আবর্ত্তন করিতেছে। এই প্রকার গণিতের সূত্র অবলম্বন করিয়া মঙ্গলের প্রথম চন্দ্রের ক্ষিপ্র বেগেরও সংব্যাখ্যান পাওয়া গিয়াছে।

এই ত গেল জ্যোতিষ্কের জন্মের কথা। এখন কি প্রকারে ইহাদের মৃত্যু সম্ভাবনা তাহা আলোচনা করা যাউক। আমাদের চন্দ্র যে এক কালে অতিশয় উষ্ণ ছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। চন্দ্রমণ্ডলে যে সকল নির্ব্বাপিত আগ্নেয় পর্ব্বতের বিবর এবং জলহীন সমুদ্র দেখা যায়, সেগুলিই উহার অতীত জীবনের অনেক কাহিনী প্রকাশ করে। জ্যোতিষ্কের মৃত্যুর কথা উঠিলেই জ্যোতিষিগণ চন্দ্রের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া বলেন, এক দিন আমাদের পৃথিবী প্রভৃতি গ্রহগণ এবং সূর্য্য প্রভৃতি নক্ষত্রসমূহ ঐ চন্দ্রের ন্যায়ই মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। মৃতাবস্থায় জল বায়ু বা তাপের লেশমাত্র থাকিবে না। সকল শক্তিই নিঃশেষে ব্যয় করিয়া চন্দ্রের ন্যায়ই তাহারা শুষ্ক মহামরু বক্ষে ধরিয়া প্রেতের ন্যায় আকাশে বিচরণ করিতে থাকিবে।

এক চন্দ্রই মৃত জ্যোতিষ্ক নয়। সৃষ্টি-কাল হইতে যে সকল প্রাণী ও উদ্ভিদ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, তাহারা যদি নানা প্রকারে রূপান্তর গ্রহণ না করিত, তাহা হইলে আমরা প্রতি পদক্ষেপেই মৃত-জীবের দেহ দেখিতে পাইতাম। বোধ হয় সমগ্র ভূপৃষ্ঠই মৃতদেহে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িত। আধুনিক জ্যোতিষিগণ মহাকাশকে জ্যোতিষ্কগুলির প্রেতভূমি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। জীবের মৃত দেহ রাসায়নিক ক্রিয়ায় এপ্রকারে রূপান্তরিত হয় যে, পূর্ব্বের অবস্থার কোনই সাদৃশ্য থাকে না। মহাকাশে সে পরিবর্ত্তন চলে না। কাজেই মৃত্যুর পরও জ্যোতিষ্কের দেহ পূর্ব্বের গতিবিধি স্থির রাখিয়া, আকাশে পরিভ্রমণ করে। জ্যোতিষিগণ বলেন, এই প্রকারে অনুজ্জ্বল ভীমকায় মৃত জ্যোতিষ্ক যে কত আকাশে বিচরণ করিতেছে তাহার ইয়ত্তাই হয় না। আমাদের দৃষ্টির সীমার মধ্যে যতগুলি উজ্জ্বল নক্ষত্র আছে, বোধ হয় তাহার সহস্র গুণ মৃত জ্যোতিষ্কের উদয়াস্ত আকাশে নিয়তই চলিতেছে। তাহারা আলোকহীন এবং তাপহীন। কেবল এই জন্যই তাহাদের অস্তিত্ব আমরা দূরে থাকিয়া বুঝিতে পারি না। যখন নির্দ্দিষ্ট পথ এবং নির্দ্দিষ্ট কালে ঘুরিতে ঘুরিতে ইহারা কোন উজ্জ্বল নক্ষত্রকে ঢাকিয়া নিষ্প্রভ করিয়া ফেলে, কেবল তখনি আমরা প্রেত জ্যোতিষ্কের পরিচয় পাই। এই প্রকার নাক্ষত্র গ্রহণের আজকাল অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়। পারসুস্ (Persues) রাশির আল্‌গল্ (Algol) নামক নক্ষত্রটি তাহার উজ্জ্বলতার পরিবর্ত্তনের জন্য চির প্রসিদ্ধ। প্রাচীন আরবীয় জ্যোতিষিগণও তিন দিন কয়েক ঘণ্টা অন্তর উজ্জ্বলতার হ্রাস প্রত্যক্ষ করিয়া উহাকে "দৈত্য তারকা" (Demon star) নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। আধুনিক জ্যোতিষিগণ বলেন, নিশ্চয়ই কোন মৃত জ্যোতিষ্ক আল্‌গলের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তিন দিন অন্তর সেটি যখন মাঝে আসিয়া দাঁড়ায় তখন আল্‌গলের গ্রহণ হয়। কাজেই সে সময় তাহার উজ্জ্বলতা কমিয়া আসে।

আজকাল যে সকল নক্ষত্রকে অতি উজ্জ্বল দেখা যাইতেছে, কত দিনে তাহারা নির্ব্বাপিত হইবে হিসাব করা কঠিন।

সূর্য্যের অধিকারে আমাদের বাস, কাজেই উহার অনেক ঘরের খবর আমরা একে একে জানিতে পারিয়াছি। লর্ড কেল্‌ভিন্ সূর্য্যের শক্তি-ভাণ্ডারের একটা মোটামুটি হিসাব লইয়া দেখিয়াছিলেন, সৌরজগৎ চল্লিশ কোটি বৎসরের অধিক বাঁচিবে না। অনেক দিন ধরিয়া কেল্‌ভিনের এই গণনা-কেই সত্য ভাবিয়া বৈজ্ঞানিকগণ শনি বৃহ-স্পতি প্রভৃতি বড় বড় গ্রহগুলিরও আয়ুকাল নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর হইল রেডিয়ম্ নামক যে একটি অদ্ভুত ধাতুর আবিষ্কার হইয়াছে, সেটি আপাততঃ লর্ড কেল্‌ভিনের কল্পিত মৃত্যুবিভীষিকাকে কতকটা কমাইয়া দিয়াছে। অনেকে বলিতে-ছেন, সূর্য্যমণ্ডলে রেডিয়ম্ জাতীয় যে সকল ধাতু আছে, কেবল সেগুলিই তেজ বিকীরণ করিয়া সূর্য্যকে সহস্র কোটি বৎসর জীবিত রাখিবে। তার পর সূর্য্য তেজহীন হইয়া নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইবে।

হিসাবে দেখা যায় সূর্য্য প্রতি মুহূর্ত্তে যে তাপালোক বিকীরণ করিতেছে, তাহার দুই শত কোটি ভাগের মধ্যে কেবল একভাগ মাত্র আমাদের পৃথিবীতে আসিয়া পড়ে। এই তেজকণিকাই আমাদের ক্ষুদ্র জগৎটির সৃষ্টিরক্ষার পক্ষে যথেষ্ট। অবশিষ্ট সকলই মহাকাশের দিকে ধাবিত হইয়া ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। অপর মহাসূর্য্যগুলিতেও এই প্রকার ক্ষয় অবিরাম চলিতেছে। কেবল ক্ষয় হইলে ক্ষতি ছিল না। কিন্তু ইহাতে অপেক্ষাকৃত শীতল জ্যোতিষ্কগুলি ধীরে ধীরে উত্তপ্ত হইয়া সমগ্র সৃষ্টির উত্তাপের মাত্রা যে সমান করিবার চেষ্টা করিতেছে, তাহাকেই অমঙ্গলের লক্ষণ বলিতে হয়। বিশ্বে শক্তির অসমতা আছে বলিয়াই আমরা শক্তির লীলা দেখিতে পাই। সূর্য্য পৃথিবী অপেক্ষা উষ্ণ তাই পার্থিব জিনিস সূর্য্যের তাপ অনুভব করিতে পারে, এবং তাহাতে নানা প্রাকৃতিক কার্য্য চলে। হাফরের আগুন কলের চেয়ে উষ্ণ, তাই কলে বাষ্প উৎপন্ন করিয়া আমরা কল চালাই। ভূপৃষ্ঠ এক সমতলেই থাকিলে যেমন নদীর প্রবাহ বন্ধ হইয়া পড়ে, সমগ্র বিশ্বের উষ্ণতা এক হইয়া দাঁড়াইলে ঠিক সেই প্রকারে শক্তির কার্য্য লোপ পাইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। এই ব্যাপারটি গত শতাব্দীর শেষে পণ্ডিতদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া তাঁহাদিগকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে। তাঁহারা সুস্পষ্ট দেখিতে পাইয়াছিলেন, যখন সমগ্র সৃষ্টির উষ্ণতা এক হইয়া দাঁড়াইবে, তখন সূর্য্য মহাসূর্য্য সকল শক্তিসম্পন্ন হইয়াও শক্তির ব্যবহার করিতে পারিবে না। কাজেই নিশ্চল শক্তি লইয়া সমগ্র বিশ্ব মৃত হইয়া পড়িবে।

শ্রীজগদানন্দ রায়।

সামাজিক প্রসঙ্গ

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় গত অগ্রহায়ণ মাসের "প্রবাসীতে" একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহার নাম দিয়াছেন "থুড়ি, থুড়ি, মা কালী।" তাঁহার এই প্রবন্ধ পড়িয়া আমার মনে কতকগুলি চিন্তার উদয় হইয়াছে, তাহা নিম্নে বিবৃত করিতেছি।*

শাস্ত্রী মহাশয় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি, এজন্য তিনি সকল সম্প্রদায়েরই সম্মানার্হ। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই প্রবন্ধে তাঁহার উচ্চ পদোচিত ধৈর্য্য ও গাম্ভীর্য্যের যেন কিছু ব্যতিক্রম দেখিলাম। এই প্রবন্ধের অদ্ভুত নামকরণই তাহার প্রমাণ। তিনি বলেন;

"আমি দেখিতেছি এই স্বদেশ-প্রেমের হুজুগে কতকগুলি লোক যেন "থুড়ি, থুড়ি, মা কালী" বলিয়া ভ্রম সংশোধন করিতে যাইতেছেন। তাঁহাদের মনের ভাব যেন এই, "থুড়ি, থুড়ি, রামমোহন রায় ব্রহ্মোপাসনা প্রচার করিয়া ভুল করিয়াছেন, সহমরণ নিবারণ করিয়া ভুল করিয়াছেন, এস আমরা সংশোধন করি। মা কালী, মা কালী, আমাদের মা কালী থাক, ব্রহ্মোপাসনা থাক, আমাদের বিধবাদিগকে আর পুড়িতে দিব না, সুতরাং সহমরণ আর হইবে না; কিন্তু বিদ্যাসাগর যে বিধবা বিবাহ প্রবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা করিয়া ভুল করিয়াছেন। থুড়ি, থুড়ি সেটা সংশোধন কর, বিধবা বিবাহ বন্ধ কর। অর্থাৎ আমাদের মেয়েরা থাক্ সীতা সাবিত্রী, আর আমরা থাকি বহুবিবাহকারী ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্র পুরুষ। কেশবচন্দ্র সেন যে জাতি-ভেদ ভাঙ্গিয়া সব জাতি এক করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, থুড়ি থুড়ি সেটা ভুল হইয়াছে। এস সংশোধন করি, হিন্দু হিন্দু থাক—মুসলমান মুসলমান থাক, ম্লেচ্ছকে বর্জ্জন কর। দূরে পরিহার কর! তেল আর জলে যেমন মেশে না, হিন্দু মুসলমানে তেমনি মিশিবে না; আমরা যে জাতীয় উন্নতি ও স্বায়ত্ত-শাসনের আকাঙ্ক্ষা করিতেছি, তাহা হিন্দুর জাতীয় উন্নতি ও হিন্দুর স্বায়ত্তশাসন; আমরা ভবিষ্যতে যে ভারতবর্ষ দেখিতেছি, থুড়ি থুড়ি তাহা হিন্দু ভারতবর্ষ।" বলা বাহুল্য শাস্ত্রী মহাশয়ের এই ভাষা অসহিষ্ণুতার ভাষা, বিরক্তির ভাষা, ক্রোধের ভাষা। ইহা তাঁহার ন্যায় একজন প্রবীণ বিজ্ঞ নেতার মুখে আদৌ শোভা পায় না।

কিন্তু এইরূপে "থুড়ি" দিয়া ফিরিয়া আসিতেছেন কাহারা?

যাঁহারা চির দিন হিন্দুসমাজের ক্রোড়ে লালিত পালিত হইয়া সেই সমাজের বিধি বিধান ভাল হউক, মন্দ হউক অবিচারে

* এই প্রতিবাদ "প্রবাসীতে" ছাপিবার জন্য প্রথমে পাঠান হইয়াছিল। কিন্তু উক্ত সম্পাদক মহাশয় তাহা পত্রস্থ না করিয়া ফেরত দিয়াছেন। ব্যক্তিগত বা সমাজগত মতভেদের জন্য কি অন্য কারণে সম্পাদক মহাশয় এরূপ করিয়াছেন ঠিক বুঝি নাই। লেখক।

মানিয়া আসিতেছেন, শাস্ত্রী মহাশয় নিশ্চয়ই তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া এ সব কথা বলেন নাই। আবার যাঁহারা পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোক এদেশে প্রথমে প্রবেশ করিলে, সেই আলোকের ছটায় মুগ্ধ হইয়া হিন্দু-সমাজ পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্ম হইয়াছিলেন, এবং এখনও ব্রাহ্মসমাজের মধ্যেই আছেন, নিশ্চয়ই শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহাদিগকেও এই প্রবন্ধে লক্ষ্য করেন নাই। তবে কোন্ শ্রেণীর লোক তাঁহার লক্ষ্যের বিষয়? যাঁহারা ব্রাহ্ম ছিলেন, এই স্বদেশী আন্দোলনের ফলে আবার হিন্দু হইতেছেন, সম্ভবতঃ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহাদিগকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। কিন্তু কই সেরূপ লোক ত একটিও দেখিতেছি না, সম্ভবতঃ এ পর্য্যন্ত তাহার কোন খবর পাওয়া যায় নাই। তবে ইতি পূর্ব্বে কোন কোন খ্যাতনামা ব্রাহ্ম ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করিয়া হিন্দু হইয়াছিলেন, এবং এখনও দুই একটি যে না হইতেছেন এরূপ নহে। কিন্তু এরূপ ঘটনা ত স্বদেশী আন্দোলনের বহুপূর্ব্ব হইতেই হইতেছে। এজন্য "স্বদেশী হুজুগ" কিরূপে দায়ী হইল?

তবে দেখিতে পাই, অনেক শিক্ষিত ভদ্রলোক—হয় ত তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বিলাতও গিয়াছিলেন—তাঁহারা এই স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে গঙ্গাস্নান করিতেছেন, ও কালীঘাটে গিয়া কালীপূজায় যোগদান করিতেছেন। সম্ভবতঃ শাস্ত্রী মহাশয় এ শ্রেণীর লোককে লক্ষ্য করিয়া তাঁহার প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। কিন্তু এরূপ ইংরেজী শিক্ষিত ও বিলাত-ফেরত লোকের মত পরিবর্ত্তন ত বহু পূর্ব্ব হইতেই হইতেছে। ভূতপূর্ব্ব "হোপের" সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমৃত লাল রায় এবং "ইণ্ডিয়ান নেশন" সম্পাদক ৺নগেন্দ্রনাথ ঘোষ ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্থল। সুতরাং এরূপ শ্রেণীর লোকের মত পরিবর্ত্তনের জন্যও স্বদেশী হুজুগ দায়ী নহে।

আর যদিই বা স্বদেশী আন্দোলনের ফলে কোন কোন উচ্চশিক্ষিত লোকের মনে ধর্ম্মবিশ্বাসের উদ্রেক হয়, তবে তাহা এই আন্দোলনের একটি শুভ ফল বলিতে হইবে। তাহার উপর বিদ্রূপবাণ বর্ষণ করিয়া তাহাকে দমন করিবার কোন প্রয়োজন আছে কি? লোকের মনে ধর্ম্মবিশ্বাস জন্মিলেই হইল, তাহা ব্রহ্মের প্রতিই হউক আর মা কালীর প্রতিই হউক। আর আমি অনেক মনীষী ব্যক্তির নিকট শুনিয়াছি, যতদিন আমাদের স্বদেশ-প্রেম ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত না হইবে, তত দিন ভারতবর্ষে ইহা বদ্ধমূল হইবে না।

শাস্ত্রী মহাশয় বলেন—ও সব ভণ্ডামি, ধর্ম্মের ভাণ, প্রকৃত ধর্ম্মবিশ্বাস নহে। প্রকৃত ধর্ম্মবিশ্বাসকে তিনি শ্রদ্ধা করিতে রাজি আছেন, যেমন তাঁহার মাতার ছিল। কিন্তু কোন ব্যক্তির ধর্ম্মবিশ্বাস প্রকৃত কি অপ্রকৃত, তাহা তিনি হঠাৎ বুঝিলেন কিরূপে? আর তাঁহার মাতার যেরূপ প্রগাঢ় ভক্তি ও বিশ্বাস ছিল, তাহা বাস্তবিক পক্ষে সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই বিরল। তাহা সহস্র সহস্র লোকের মধ্যে একটিতে দেখা যায় কি না সন্দেহ। তাহা দীর্ঘকালব্যাপী সাধনার ফল, অথবা বহুজন্মার্জ্জিত পুণ্যের ফল। যদি কোন ব্যক্তির মা কালীর প্রতি

তত প্রগাঢ় ভক্তি ও বিশ্বাস না জন্মিয়া থাকে, অথচ তিনি ভক্তিলাভের আশায় মা কালীর পূজা করেন কি গঙ্গাস্নান করেন, তাহা হইলে কি তিনি ভণ্ড হইবেন? এরূপ লোককে ভণ্ড বলিলে, সকল সম্প্রদায়েই এরূপ ভণ্ডের সংখ্যা খুব বেশী মিলিবে।

তারপরে আর একটি কথা। ব্রাহ্মধর্ম্ম যখন কোন অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকৃত ধর্ম্ম-গ্রন্থের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, ব্যক্তিগত স্বাধীন বিবেকবুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত, তখন ব্রাহ্মধর্ম্মের মধ্যে "থুড়ি, থুড়ি মা কালীর" পথ যতটা খোলা রহিয়াছে, অন্য ধর্ম্মে ততটা নাই। একজনের বিচার-বুদ্ধিতে যতদিন ব্রাহ্মধর্ম্ম যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হইবে, ততদিন তিনি উহা স্বীকার করিবেন; আবার তাঁহার বিচার বুদ্ধিতে যখনই উহা ভ্রান্ত বলিয়া বোধ হইবে সেই মুহূর্ত্তেই তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারেন। ইহাতে তাঁহার কিরূপে দোষ দেওয়া যাইতে পারে? একজনের ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি আন্তরিক বিশ্বাস নাই, অথচ সমাজের খাতিরে তিনি ব্রাহ্ম হইয়া সমাজে থাকেন, বোধ হয় শাস্ত্রী মহাশয় এরূপ লোকের দ্বারা দলপুষ্টি করিতে ইচ্ছা করেন না। সুতরাং ধর্ম্মবিশ্বাসের জন্য যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া মা কালীর পূজা করিতে যান, তাঁহাদিগের জন্য শাস্ত্রী মহাশয়ের এত ক্ষোভের কারণ কি?

তার পরে, একথা সকলেই স্বীকার করিবেন ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাপ্রণালী খ্রীষ্টানদিগের অনুকরণে প্রতিষ্ঠিত। এই অনুকরণ সম্বন্ধে শাস্ত্রী মহাশয় বলেন "একদিকে অনুকরণের দ্বারা যেমন কেহ বড় হয় না, তেমন অনুসরণ ব্যতীতও কেহ বড় হয় না। * * * অনুকরণ নিন্দনীয় হইলেও, অনুসরণ নিন্দনীয় নহে। অপরের অভিজ্ঞতার উৎকৃষ্ট ফল গ্রহণ করিতেই হইবে। আমরা তাহা আপনাদের মত করিয়া লইব, আপনাদের প্রয়োজনানুরূপ করিয়া লইব, ইহার নাম অনুসরণ।"

এখন ব্রাহ্মসমাজে যে উপাসনাপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা খ্রীষ্টানদিগের "অনুকরণ" না "অনুসরণ"? আমি বলি সম্পূর্ণ অনুকরণ, অনুসরণ নহে। কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে ইহা "অনুসরণ"। এস্থলে আমার জিজ্ঞাস্য এই, এতদ্দেশে প্রচলিত শাক্ত ও বৈষ্ণবগণের দিনে দুইবার কি তিনবার নির্জ্জন ধ্যান-ধারণা জপমূলক উপাসনাকে পরিত্যাগ করিয়া এইরূপ সপ্তাহে একদিন সমবেত উপাসনা প্রবর্ত্তিত করিবার কোন প্রয়োজন ছিল কি? জগতের প্রধান প্রধান ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণ—বুদ্ধ বল, খ্রীষ্ট বল, শঙ্কর বল, চৈতন্য বল—তাঁহারা সকলেইত এইরূপ নির্জ্জনে সাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। এখন যদি কোন ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি এই খ্রীষ্টানী অনুকরণের (থুড়ি, থুড়ি—"অনুসরণের") উপাসনাতে কোন রস না পাইয়া স্বদেশী উপাসনা গ্রহণ করেন, তবে সে দোষ কাহার?

কেবল উপাসনা বলিয়া নহে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ বিলাতী সমাজের অনেক বিষয়ের অনুকরণ করিয়াছেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ-রূপ অট্টালিকা যে পাঁচটি স্তম্ভের

উপর প্রতিষ্ঠিত, নিরাকার উপাসনা তাহার কেন্দ্র অন্য স্তম্ভচতুষ্টয় হইতেছে জাতিভেদবর্জ্জন, যৌবনবিবাহ, বিধবাবিবাহ ও স্ত্রী-স্বাধীনতা। বলা বাহুল্য ব্রাহ্মধর্ম্ম এই পঞ্চব্যূহাত্মক বলিয়াই হিন্দুসমাজের সহিত ইহার প্রভেদ—ব্রাহ্মসমাজ হিন্দুসমাজ হইতে দূরে অবস্থান করিতেছে। ব্রাহ্মসমাজের এই পাঁচটি স্তম্ভ স্খলিত হইলে উহা আবার হিন্দুসমাজের সহিত মিশিয়া যাইবে। আর কালক্রমে যদি হিন্দুসমাজ এই পাঁচটি "সংস্কার" (?) গ্রহণ করে তাহা হইলেও ব্রাহ্মসমাজের আর পৃথক অস্তিত্ব থাকিবে না। কিন্তু হিন্দুসমাজ যদি এই সকল "সংস্কার" গ্রহণ করে, তবে হিন্দুজাতি বলিয়া কোন পৃথক্‌জাতি থাকিবে কি ?

"স্বদেশের দোষ-ত্রুটির প্রতি অন্ধতা"কে শাস্ত্রী মহাশয় স্বদেশ-প্রেমের ব্যাধি বলেন। কিন্তু এ সংসারে কোন্‌গুলি গুণ ও কোন্‌গুলি দোষ সে সম্বন্ধে বিলক্ষণ মতভেদ দৃষ্ট হয়, বিশেষতঃ জটিল সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে। কোন ব্যাক্তিবিশেষ হাজার জ্ঞানী ও দূরদর্শী হইতে পারেন, কিন্তু একটা বিশাল প্রাচীন জাতির উৎপত্তি, উন্নতি ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিচার করিতে বসিলে, তাঁহার পদে পদে ভ্রান্তি জন্মিতে পারে। যাঁহার জ্ঞান ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান এই ত্রিকাল দর্শনে সক্ষম, যিনি প্রজ্ঞাবলে মৃত্যুর পরপার পর্য্যন্ত জীবের গতি নিরূপণ করিতে সক্ষম—কেবল তাঁহার কথাই সমাজের মঙ্গল ও অমঙ্গল সম্বন্ধে প্রামাণ্য ! বলা বাহুল্য শাস্ত্রী মহাশয় যে কয়েকজন মহাত্মাকে এ বিষয়ে অভ্রান্ত বলিয়া ধরিয়াছেন, তাঁহারাও অভ্রান্ত নহেন। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়, মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন, মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অসাধারণ প্রতিভাবলে বর্ত্তমান যুগে ভারতের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন সন্দেহ নাই। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহাদিগকে মনু যাজ্ঞবল্ক্য পরাশরের আসনে বসাইতে এদেশ কখনও সম্মত হইবে না। সুতরাং ইঁহারা যে গুলিকে সমাজের দোষ-ত্রুটি বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন, বাস্তবিক সেগুলি দোষ-ত্রুটি কিনা তাহা কে বলিতে পারে ?

বরং দেখিতে পাইতেছি, এই সকল মহাত্মার পদবী অনুসরণ করিয়া শাস্ত্রী মহাশয় যে গুলিকে সমাজের ব্যাধি বলেন, সেই গুলি দ্বারাই প্রকৃতপক্ষে হিন্দুসমাজ জীবিত রহিয়াছে। ব্যাধি দ্বারা সমাজ মৃত্যুমুখে অগ্রসর হয়, কিন্তু কি আশ্চর্য্য জাতিভেদ-ব্যাধিই শত শত বৎসর কত শত প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়া হিন্দুসমাজকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে !

আমাদের সমাজে জাতিভেদ আছে বলিয়া কি আমরা অন্ত্যজ জাতিসকলকে ঘৃণা করি ? আজ সমস্ত ভারতব্যাপী এই প্রকার একটা ধুয়া উঠিয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এরূপ ধারণার কিছুমাত্র মূল নাই। উচ্চশ্রেণীর হিন্দুগণ, বিশেষতঃ যাঁহারা সদাচার পালন করেন, তাঁহারা অনেক নিম্নজাতির জল গ্রহণ করেন না সত্য, নিম্নজাতির সঙ্গে একত্র আহারাদি করেন না সত্য, নিম্নজাতির সহিত আদান-প্রদান নাই সত্য, কিন্তু একথা আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি, এরূপ প্রথা

ঘৃণামূলক নহে। একজন সদাচারী ব্রাহ্মণ আহার করিতে বসিয়া নিজের পুত্রকেও স্পর্শ করেন না তবে তিনি কি তাঁহার পুত্রকে ঘৃণা করেন? যে ব্রাহ্মণের উপনয়ন ও চূড়াকরণ হয় নাই, তাহার আনীত জল দেবকার্য্যে লাগে না তাই বলিয়া কি সেই ব্রাহ্মণসন্তান ঘৃণিত? এমন কি একজন সদাচারী ব্রাহ্মণও স্নান না করিয়া ঠাকুর ঘরে যাইতে পারেন না তবে কি তিনি ঘৃণিত? ফল কথা চিত্তশুদ্ধি ও পবিত্রতা রক্ষার জন্য বিশেষ বিশেষ স্থলে এইরূপ বিশেষ বিশেষ নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। আবার, সেইরূপ, উচ্চতর বর্ণের বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য নিম্নতর বর্ণের সহিত আহার-বিহার ও আদান-প্রদান রহিত হইয়াছে। ইহা কেবল আত্মরক্ষার চেষ্টা। ইহাতে ঘৃণার ভাব কিছুই নাই। সুসভ্য সমাজে যখন কোন সংক্রামক রোগগ্রস্ত ব্যক্তির সহিত সর্ব্ব সাধারণের মেলা-মেশা রহিত করা হয়, তখন সেই রোগীকে সকলে ঘৃণা করে কি?

যাঁহারা বঙ্গদেশের পল্লীগ্রামে বাস করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন অনেক নীচ জাতীয় স্ত্রী-পুরুষের সহিত উচ্চতর জাতীয় স্ত্রী-পুরুষদিগের কত মধুর স্নেহমূলক সম্বন্ধ আছে, কোন নিম্নজাতীয় লোক বিপদে পড়িলে অন্য জাতীয় লোক প্রাণপণে যথাসর্ব্বস্ব দিয়া তাহার সাহায্য করিতে প্রস্তুত। এরূপ কেবল যে হিন্দুজাতির মধ্যে আছে তাহা নহে, হিন্দু মুসলমানের মধ্যেও এরূপ প্রীতির ভাব গ্রামে গ্রামে পাড়ায় পাড়ায় বিদ্যমান। তবে জাতিভেদের দ্বারা ঘৃণার ভাব কোথা হইতে আসিল?

হাঁ—আসিতেছে। তাহা পূর্ব্বে ছিল না, এখন জন্মিতেছে। সে কেবল বাহিরের লোকের বিদ্বেষমূলক প্ররোচনায়। একজন বাড়ীর চাকর তাহার মনিবের সদয় ব্যবহার অথবা একটি পুত্র তাহার পিতার স্নেহে সন্তুষ্ট আছে। এখন একজন বাহিরের লোক আসিয়া যদি সেই চাকরকে ক্রমাগত বলে "ঐ দেখ তোমার প্রভু তোমাকে কত ঘৃণা করেন—তিনি তোমাকে তাঁহার সঙ্গে বসিয়া খাইতে দিলেন না।"

এইরূপে যদি সে সেই পুত্রকে বলে "ঐ দেখ তোমার পিতা তোমাকে আদৌ ভাল বাসেন না, তোমাকে ঘৃণা করেন, কারণ তিনি খাইতে বসিয়াছিলেন, তুমি ছুঁইয়া দিলে তিনি উঠিয়া গেলেন।" এরূপ বলিলে সেই ভৃত্য ও পুত্র যদি অবোধ হয়, তবে তাহারা হয় ত তখনই বিদ্রোহী হইয়া উঠিবে।

প্রকৃতপক্ষে হইতেছেও তাহাই। যে সকল সংস্কারকগণ সময়ে অসময়ে সমাজের নিম্নবর্ণকে এইরূপে "জাগাইয়া" তুলিতেছেন, তাঁহারা মনে করিতেছেন—দেশের বড়ই উপকার করা হইতেছে! কিন্তু তাহার ফলে সমাজের ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে যে একটা গুরুতর বিদ্বেষ ও অশান্তির ভাব জাগিয়া উঠিতেছে. তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতেছেন। সম্প্রতি কোন খৃষ্টীয় মিশনারি সাহেবের প্ররোচনায় ফরিদপুর জেলার দক্ষিণ ভাগে নমঃশূদ্র জাতির মধ্যে এইরূপ ঘোর অশান্তির উৎপত্তি হইয়াছে। তাহার ফলে যে ব্রাহ্মণ-কায়স্থাদি জাতি তাহাদের অসময়ের সহায় ছিল,

যাহাদের সাহায্য পাইয়া তাহারা দুর্ভিক্ষের সময় জীবন রক্ষা করিয়াছিল, তাহাদের বিরুদ্ধে তাহারা অস্ত্রধারণ করিয়াছে, এবং ইংরেজের বিচারে দেশের শান্তিরক্ষার জন্য প্রধানতঃ সেই নমঃশূদ্রদিগের ব্যয়েই পিউনিটিব্ পুলিশ বসিয়াছে। সমাজ সংস্কার করিতে হইলে কি এইরূপেই করিতে হয় ?

শাস্ত্রী মহাশয় বলেন "জাতিতে জাতিতে বিচ্ছেদ রাখিবার জন্য প্রাচীন কালে যে সকল প্রাচীর নির্ম্মিত হইয়াছিল সে সকলকে মেরামত করিয়া দৃঢ় করিয়া গাঁথিবার প্রয়াস দেখা দিয়াছে।"

আমি বলি—সে জন্য দায়ী কে? না এই রিফর্ম্মার দল। পূর্ব্বে হিন্দুসমাজে ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে কোন বিদ্বেষের ভাব ছিল না; বরং প্রত্যেক জাতি নিজ নিজ অবস্থায় বিশেষ সন্তুষ্ট ছিল। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত গুণ ও কর্ম্ম দ্বারাই প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, এবং ইহ জন্মে উৎকৃষ্টতর গুণ ও কর্ম্ম উপার্জ্জন করিলে আবার পুনর্জ্জন্মে উচ্চতর জাতিতে তাহার জন্ম হইতে পারে এই শাস্ত্র বাক্যে সকলের বিশ্বাস থাকায় কোন ব্যক্তিরই নিজ অবস্থার জন্য অসন্তোষের কারণ ছিল না। বরং ভবিষ্যতে উন্নতি লাভের আশায় সকলেই পুণ্যকার্য্য করিত। এই কারণে সমগ্র হিন্দু সমাজে সকল শ্রেণীর মধ্যে এক অপূর্ব্ব সন্তোষ ও শান্তি বিরাজ করিত। কিন্তু জাতিভেদটা ব্রাহ্মণের প্রাধান্যলাভের জন্য কৌশল বিশেষ ও শাস্ত্রবাক্য মিথ্যা ইত্যাদি মত রিফর্ম্মারগণ সমাজে প্রচার করিতেছেন বলিয়া, প্রত্যেক জাতির মধ্যেই অসন্তোষের উৎপত্তি হইয়াছে, এবং সকল জাতিই নিজ নিজ প্রাধান্য বজায় রাখিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছে। তাহার ফলে, বিচ্ছেদের প্রাচীর দৃঢ়ীভূত হইতেছে। দেশের মধ্যে একতা স্থাপনের ইহাই প্রকৃষ্ট পন্থা সন্দেহ নাই!

"তেল আর জলে যেমন মেশে না, হিন্দু মুসলমানে তেমনি মিশিবে না; আমরা যে জাতীয় উন্নতি ও স্বায়ত্তশাসনের আকাঙ্ক্ষা করিতেছি, তাহা হিন্দুর জাতীয় উন্নতি, ও হিন্দুর স্বায়ত্তশাসন, আমরা ভবিষ্যতে যে ভারতবর্ষ দেখিতেছি, খুড়ি খুড়ি, তাহা হিন্দু ভারতবর্ষ।"

শাস্ত্রী মহাশয় মনে করেন, তেলে আর জলে না মিশিলে তাহা এক পাত্রে থাকিতে পারে না। বলা বাহুল্য, তাহা পারে। হিন্দু মুসলমান নিজ নিজ জাতিত্ব বজায় রাখিয়াও একদেশে নির্ব্বিবাদে বাস করিতে পারে, এবং চির দিন বাস করিয়া আসিতেছে। তবে এখন যে সময় সময় ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়, তাহার কারণ ঐ সেই কল্পিত-বিদ্বেষপ্রচারক বাহিরের লোকের দৌরাত্ম্য। দুই বৎসর পূর্ব্বে এইরূপ একদল বিদ্বেষপ্রচারক রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে পূর্ব্ব বঙ্গের অনেক স্থলে বিদ্বেষ বহ্নি প্রজ্বালিত করিয়াছিল—এমন কি তাহার স্ফুলিঙ্গ নদীয়া জেলা পর্য্যন্ত আসিয়াছিল। পরে কর্ত্তৃকপক্ষের চেষ্টায় সেই বহ্নি নির্ব্বাপিত হয়। হিন্দু ও মুসলমান একদেশবাসী ও এক মায়ের সন্তান ইহা কে না জানে? হিন্দু হিন্দু থাকিয়া এবং মুসলমান মুসলমান থাকিয়াও দেশের কাজে যোগদান করিতে বাধা কি?

আর যে সকল সমাজে জাতিভেদ নাই, সেখানেই কি সব সময় একতা দেখা যায়? মুসলমানসমাজে সিয়া-সুন্নী লইয়া ভেদ, আবার সিয়ায় সিয়ায়, সুন্নীতে সুন্নীতে কত ভেদ।* ইংরেজ জাতির সহিত জর্ম্মান জাতির কি ফরাসী জাতির আহার-বিহার কি আদান-প্রদানে কোন পার্থক্য নাই, অথচ রাজনৈতিক ব্যাপারে কত ঘোরতর শত্রুতা। এইরূপে আরও কত শত দৃষ্টান্ত দেখান যাইতে পারে। সুতরাং জাতিভেদ বর্জ্জনই সমস্ত রোগের ঔষধ যাঁহারা মনে করেন, তাঁহারা ভ্রান্ত।

ফল কথা এই সকল অনৈক্যের বীজ মানুষের মনে, বাহিরের আচার-ব্যবহার ও রীতি-নীতিতে নহে। মন যত দিন অজ্ঞানাচ্ছন্ন ও সঙ্কীর্ণ থাকে, তত দিন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারণে মানুষে মানুষে শত্রুতা হয়। আবার সুশিক্ষা দ্বারা মন প্রশস্ত হইলে ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যেও প্রীতির সঞ্চার হইতে পারে। বৈষয়িক স্বার্থও অনৈক্যের এক প্রধান কারণ। মানুষের বৈষয়িক স্বার্থ এক হইলে, ভিন্ন ভিন্ন জাতিও একতাবলম্বন করিয়া সেই স্বার্থ সংরক্ষণে যত্নশীল হয়, আবার বৈষয়িক স্বার্থের ব্যাঘাত ঘটিলে সহোদরে সহোদরেও ঘোর শত্রুতা উপস্থিত হয়। এই ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলমানের বৈষয়িক স্বার্থ এক বলিয়া হিন্দু হিন্দু থাকিয়া এবং মুসলমান মুসলমান থাকিয়াও একতা-সূত্রে আবদ্ধ হইতে পারে, ইহা কোন মতে অসম্ভব নহে। তবে যে এখন সময়ে সময়ে অনৈক্য দেখা যায়, তাহার অন্য কারণ আছে।

তেলে জলে না মিশিয়াও যে এই ভারতবর্ষে একটি নেসন্ সৃষ্ট হইতে পারে, গত ডিসেম্বর মাসের Modern Review তে "A review of the modern world" নামক প্রবন্ধে Mr, C. F. Andrews এর নিম্নোদ্ধৃত সারগর্ভ উক্তি তাহার প্রমাণ—

"In this connexion the question is sometimes asked, will India ever become a nation? Will it not rather develop into a group of nations? The sudden rise of Bengal itself, with individual national consciousness, has made this question of practical consequence. The answer is really in the affirmative in both cases. India can become a nation in the larger sense of the word, just as the United States is a nation, and yet at the same time ample room may be left for the separate parts

* পুরুলিয়া সহরে মহরমের তাজিয়া বাহির হইলে একটি আশ্চর্য্য দৃশ্য দেখা যায়। ভিন্ন ভিন্ন মহাল্লার অনেকগুলি তাজিয়ার অগ্রভাগে পুলিশ কনেষ্টবলদিগের একটি তাজিয়া যায়। অনুসন্ধানে জানিলাম, কোন্ মহাল্লার তাজিয়া সকলের আগে যাইবে ইহা লইয়া কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত মুসলমানদের মধ্যে অনেক বিবাদ-বিসম্বাদ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়; পরে একজন সুচতুর পুলিশ সাহেব মুসলমান কনেষ্টবলদিগের দ্বারার এক তাজিয়া প্রস্তুত করান। এই সরকারী তাজিয়া সকলের আগে যায়, তাহাতে কাহারও কোন আপত্তি হয় না, সকল বিপদ চুকিয়া যায়। এ স্থলে এক জাতীয় একশ্রেণীর লোকের মধ্যে ক্ষুদ্র বিষয় লইয়া কত অনৈক্য দেখিলেন ত?

of India to develop a distinct nationality of their own. This would be wholly in accord with the lines of modern progress."

(Vide *Modern Review* for Decr. 1909, page 520.)

উক্ত লেখক ভারতের ভিন্ন ভিন্ন দেশ সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছেন, ইহার প্রত্যেক দেশে হিন্দু ও মুসলান জাতি সম্বন্ধেও সেই কথা খাটে। এ সম্বন্ধে আর অধিক বাক্য-ব্যয় নিস্প্রয়োজন।

এই জাতিভেদ যেমন হিন্দুজাতির একটা বিশেষত্ব, হিন্দুনারীর একনিষ্ঠ পতিপ্রেমও হিন্দুজাতির একটা বিশেষত্ব। হিন্দুনারীর এই পাতিব্রত্য ধর্ম্ম বহু যুগের সাধনার ফল। আজ কোথায় পৃথিবীর অন্যান্য দেশের রমণীবৃন্দ হিন্দুনারীর নিকট পাতিব্রত্য শিক্ষা করিবে, না সংস্কারকগণ হিন্দুনারীকে সেই বহু জন্মার্জ্জিত তপস্যার ফল বিসর্জ্জন দিতে বলিতেছেন! সমাজে যৌবন-বিবাহ, স্ত্রী-স্বাধীনতা ও বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হইলে হিন্দুনারীর একনিষ্ঠ সতীত্ব-ধর্ম্মের মূলে কুঠারাঘাত হইবে, তাহা কে অস্বীকার করিতে পারেন?

এই প্রসঙ্গে শাস্ত্রী মহাশয় বড় একটা আল্‌গা কথা বলিয়া ফেলিয়াছেন—"আমাদের মেয়েরা থাক সীতা-সাবিত্রী, আর আমরা থাকি বহুবিবাহকারী ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্র পুরুষ।"

ইহার অর্থ কেহ কেহ কি এরূপ বুঝিবেন না, যথা—আমরা পুরুষগণ ইন্দ্রিয়পরায়ণ বলিয়া, আমাদের মেয়েদিগেরও ইন্দ্রিয়-পরায়ণ হইতে হইবে! একি ভয়ঙ্কর কথা! বলা বাহুল্য শাস্ত্রী মহাশয় রাগের মাথায় এরূপ অসাবধান উক্তি করিয়াছেন—ইহা আদৌ তাঁহার মনোগত ভাব নহে।

যাহা হউক, স্বীকার করি আমাদের সমাজে পুরুষগণ একাধিকবার বিবাহ করিতে পারেন ও কেহ কেহ করিয়া থাকেন, আর স্ত্রীগণ তাহা পারেন না। ইহা পুরুষগণের দুর্ব্বলতা সন্দেহ নাই। কিন্তু তাই বলিয়া কোথায় পুরুষগণকে স্ত্রীদিগের আদর্শে উন্নত-চরিত্র হইতে উপদেশ দিবে, না স্ত্রীগণকে পুরুষদিগের নিম্নস্তরে টানিয়া আনিবে? মানবকে দেবীর আদর্শ দেখাইয়া দেবতা কর, কিন্তু দেবীকে মানবের আদর্শে মানবী করিও না। দুর্ব্বলচিত্ত পুরুষ যে পত্নীবিয়োগে হিন্দুবিধবার আদর্শে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিতে পারে, এরূপ দৃষ্টান্ত এখন বিরল নহে। কালক্রমে আরও বাড়িবে আশা করা যায়।

বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে বিগত পঞ্চাশ বৎসর যাবৎ এদেশে ঘোরতর অন্দোলন হইয়াছে, এবং এখনও থাকিয়া থাকিয়া হইতেছে। বিধবা-বিবাহের সপক্ষে ও বিপক্ষে অনেক যুক্তি শুনা গিয়াছে। কিন্তু এ সকল যুক্তি-তর্ক হিন্দুসমাজ গ্রহণ করেন নাই। প্রাচীন কালেও যে বড় বেশী লোকে গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ নাই। আজ যদি সমগ্র হিন্দুসমাজের বিধবা-রমণীদিগকে পুনর্ব্বার বিবাহ করিবার জন্য অনুরোধ করা হয়, তবে আমার বিশ্বাস তাহার শতকরা নব্বই জন রমণী এই প্রস্তাবকে অত্যন্ত ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করিবেন। খ্রীষ্টানসমাজ ও ব্রাহ্মসমাজের সহস্র সহস্র কুমারীগণ বিবাহ না করিয়া যদি অনায়াসে যৌবনকাল

অতিক্রম করিতে পারেন, তবে হিন্দু-বিধবাদিগকে তাঁহাদের চেয়ে কম চরিত্রবলসম্পন্ন মনে করিবার কোন কারণ আছে কি?

শুনিতে পাই খ্রীষ্টান, ব্রাহ্ম ও বিলাতফেরত সমাজে এইরূপ অনূঢ়া যুবতীর সংখ্যা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে। এইরূপ অনূঢ়া রমণীদিগের গতি কি হইবে, ইহা লইয়া সংপ্রতি বিলাতে *Times* সংবাদপত্রে এক ঘোরতর অন্দোলন হইয়া গিয়াছে। এই সম্বন্ধে Mr. H. Hamilton Fyfe বিলাতের *Daily Mail* পত্রে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহা হইতে কিঞ্চিৎ নিয়ে উদ্ধৃত করিতেছি ঃ—

"We have a situation at present which every one must deplore. A very large number of girls, the children of parents belonging to the comfortable classes, are, to put the matter plainly, wasting their lives. Let me illustrate what I mean by a concrete example. I have in mind a place about 30 miles from London which the local auctioneer describes "a grand residential neighbourhood." Here there are to be found some three hundred unmarried girls, living with their parents, doing nothing, storing up for themselves, most of them, discontented unoccupied middle age. * * *

* • *

women heavily outnumber men Men are not so ready to marry as they used to be. The consequence is that of these three hundred unmarried daughters whom I mentioned just now, half at least are likely to remain unmarried. What are they to do?"

এইরূপে দেখা গেল, যে কারণেই হউক, অনেকগুলি রমণীকে সকল সমাজেই পতিহীনা হইয়া জীবন যাপন করিতে হইতেছে এবং ভবিষ্যতেও হইবে। হিন্দুসমাজে ইঁহারা বিধবা, বিলাতী সমাজে ইঁহারা অনূঢ়া ও বিধবা। হিন্দুসমাজে বিধবাবিবাহ প্রচলিত করিলে, বিধবার পরিবর্ত্তে একদল আজীবন কুমারীর সৃষ্টি হইবে। নানা কারণে এই সকল কুমারী অপেক্ষা বিধবার জীবন যে অনেক বিষয়ে শ্লাঘ্য, তাহা সমাজতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন।

যদি বল, কুমারীর বিবাহের আশা আছে, কিন্তু বিধবার কোন আশা নাই। কিন্তু যাবজ্জীবন আশা পোষণ করিয়া ও সেই আশা পুরণের জন্য জীবনকে প্রস্তুত করিয়া যদি তাহা অবশেষে পূর্ণ না হয়, তবে তাহাতেই বেশী দুঃখ, না আশা পূরণ হইবার সম্ভাবনা নাই জানিয়া জীবনকে সেইভাবে গঠিত করিলে বেশী দুঃখ? আমি মনে করি এই সকল অনূঢ়া রমণী অপেক্ষা হিন্দু-বিধবা অনেকাংশে সুখী।

যাহা হউক এই সব বিষয় লইয়া আর বাগ্‌বিতণ্ডার প্রয়োজন নাই। সকল বিষয়েরই যে দুইটি দিক আছে, দুঃখের বিষয় অনেকের তাহা সব সময়ে মনে থাকে না। দেশহিতৈষী হইতে হইলে সকলকেই যে ব্রাহ্মসমাজের মতে মত দিতে হইবে, ইহা অনেকেই এখন অস্বীকার করেন। শাস্ত্রী মহাশয় যথার্থই বলিয়াছেন

"স্বদেশের কার্য্যক্ষেত্র অসীম পড়িয়া রহিয়াছে, কে কত খাটিবে, কে কত খাটিবে!"

সমাজ ও ধর্ম্মসম্বন্ধে যাহার যে মত থাকুক, দেশের এমন কত কাজ পড়িয়া রহিয়াছে, যাহাতে সকল শ্রেণীর লোকই সমান ভাবে যোগদান করিতে পারেন। তবে যে সব কাজের দ্বারা হিন্দুসমাজের মর্ম্মস্থানে আঘাত লাগে, দেশের উদ্ধারের জন্য তাহা যে একান্তই করিতে হইবে অনেকে তাহা স্বীকার করেন না। *

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ।

বিলাতের কথা।

(১)

ইংরেজের রাজভক্তি।

বাহির হইতে ইংরেজকে কখনো বড় রাজভক্ত বলিয়া মনে হয় না। শাসনযন্ত্রেই রাজার স্থান। শাসনের অধীশ্বর রূপেই রাজার পদ ও মর্য্যাদা। রাজা দণ্ডদাতা, রাজা ধর্ম্মাধিকরণ। আমরা রাজাকে চিরদিনই এইভাবে দেখিয়া আসিয়াছি। সমাজের কল্যাণহেতু, লোকস্থিতি-রক্ষার্থে, রাজা দণ্ডধারণ করেন ইহাই আমাদের সনাতন আদর্শ। কিন্তু আধুনিক জগতে, নূতন সভ্যতায়, নিয়মতন্ত্রাধীন দেশে, শাসন-যন্ত্রে, রাজার স্থান অতি সংকীর্ণ। বিশেষতঃ ইংলণ্ডে মন্ত্রীসমাজই শাসনসংরক্ষণের জন্য দায়ী; তাঁহাদের উপরই এভার একান্তভাবে অর্পিত হইয়াছে। রাজা তাঁহাদের পরামর্শানুযায়ী আপনার কর্ত্তব্য পালন করিবেন, ইহাই ইংরেজ রাজনীতির মূলসূত্র। সুতরাং এ ক্ষেত্রে শাসনচক্রের উপরে রাজার প্রভাব অত্যন্ত সামান্য বলিয়াই মনে হয়। বাহির হইতে দেখিলে, ইংলণ্ডে রাজাকে অনেকটা সাক্ষীগোপাল বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। এখানে রাজার প্রতাপ কম, সত্য। কোষ ও দণ্ড হইতেই রাজার প্রতাপের প্রতিষ্ঠা। এখানে কোষ ও দণ্ড, উভয়ই রাজার একান্ত আয়ত্ত নহে। প্রজাপ্রতিনিধিরা কর নির্দ্ধারণ করেন, তাহা হইতেই রাজকোষের পরিপুষ্টি হয়। রাজমন্ত্রিগণ ধর্ম্মাধিকরণ নিযুক্ত করেন, তাঁহারাই মন্ত্রীসমাজের শাসনাধীনে থাকিয়া, দণ্ডবিধান করেন। সাক্ষাৎভাবে, কোষ ও দণ্ড এ দু'এর কিছুরই সঙ্গে রাজার কোন সম্পর্ক নাই। তিনি কেবল নামে মাত্র এ সকল শাসনযন্ত্রের অধীশ্বর। কিন্তু প্রতাপ

---

* প্রবাসীতে প্রকাশিত শ্রদ্ধাস্পদ শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রবন্ধের প্রতিবাদ লেখক মহাশয় "প্রবাসী"তে পাঠাইয়াছিলেন, প্রবাসী-সম্পাদক মহাশয় তাহা প্রবাসীতে প্রকাশ না করিয়া ফেরত দিয়াছেন, এই কথা উল্লেখ করিয়া বঙ্গদর্শনের লেখক ও এই প্রবন্ধের রচয়িতা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ মহাশয় বঙ্গদর্শনে প্রকাশের জন্য এই প্রবন্ধটি পাঠাইয়াছেন। যে প্রসঙ্গে এই প্রবন্ধটি লিখিত হইয়াছে, বর্ত্তমানে তাহা বিশেষভাবে আলোচনার যোগ্য মনে করিয়া ইহা বঙ্গদর্শনে প্রকাশ করিলাম, ইহার বিরুদ্ধে কোন সুলিখিত প্রবন্ধ পাইলে তাহা প্রকাশে আমাদের কোন আপত্তি নাই। বঃ সঃ।

না থাকিলেও এ দেশেও রাজার প্রভাব অল্প নহে। প্রতাপ অপেক্ষা প্রভাব যে বড়, ইহাই বা অস্বীকার করিব কিরূপে?

আর রাজার এই প্রভাব আছে বলিয়াই ইংরেজের রাজভক্তিও আছে। এক সময়ে এ ভক্তি যেন কমিয়া যাইতেছিল। সে বহুদিনের কথা তখন ফরাসীবিপ্লবের দুন্দুভিনাদে, সমগ্র য়ুরোপের প্রজামণ্ডলী উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সে ভীষণ বিপ্লব-তরঙ্গে য়ুরোপের সিংহাসন সকল কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। সে তরঙ্গ ইংলণ্ডকে অভিভূত করে নাই; কিন্তু কিয়ৎ পরিমাণে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল, সন্দেহ নাই। তার পরে বহুকাল ধরিয়া একদল লোক প্রজাতন্ত্রের সুর ভাঁজিয়াছিলেন। কিন্তু আজ সে সুর একেবারে নিঃশেষ নীরব হইয়া গিয়াছে। এখন সমগ্র ইংলণ্ড খুঁজিলেও শতাধিক লোক পাওয়া যাইবে কি না সন্দেহের কথা, যারা বর্ত্তমান রাজতন্ত্রের পরিবর্ত্তে, ফরাসীস্ বা মার্কিণের প্রজাতন্ত্রের ন্যায় একটা শাসনতন্ত্র এদেশে প্রতিষ্ঠিত হউক, এ ইচ্ছা প্রকাশ করিবে। ইংরেজ দেখিয়াছে যে রাজা যদি নিয়মতন্ত্রাধীন থাকেন, তবে এরূপ রাজতন্ত্র নিরবচ্ছিন্ন প্রজাতন্ত্র অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। ইহাতে স্বাধীনতা ও সংযমের সম্পূর্ণ সমাবেশ হয়। এ সমন্বয় এখনো কি ফরাসীসে, কি মার্কিণে কোথাও হয় নাই। যদি কোথাও হয়, তবে ইংলণ্ডেই হইবার সম্ভাবনা এই আশায় ইংরেজ নিয়মতন্ত্র রাজশক্তির পক্ষপাতী। এখানেই ইংরেজের রাজভক্তির মূল।

ইংরেজ তাঁহার রাজাকে যে ভালবাসে, রাজার বর্ত্তমান অসুখে তার বিলক্ষণ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। কাল সন্ধ্যার সময় (৫ই মে) এ সংবাদ সহরে রাষ্ট্র হয়। আর অমনি চারি-দিকে হুলস্থুল পড়িয়া যায়। খবরের কাগজে আজ প্রাতে এ সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে। আর ইহাই লোকমুখে সর্ব্বত্র শোনা যাই-তেছে। লোকে অতিশয় ব্যগ্র হইয়া পর-স্পরকে রাজার কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করি-তেছে। রাজপরিবারের দিকে সকল সম্প্র-দায়ের, সকল স্তরের, সমগ্র সমাজের আন্ত রিক সহানুভূতি একটানে যেন বহিতেছে। সচরাচর ইংরেজের এ ভাব দেখা যায় না। এ সময়ে, ইংলণ্ডের রাজা, ইংরাজমণ্ডলীর হৃদয়ে কি স্থান অধিকার করিয়া আছেন, ইহা কতকটা বুঝা যাইতেছে। এ ব্যাপারের মর্ম্ম কি?

এ অদ্ভুত ব্যাপারের মূল কারণ এই যে, রাজা এখানে সকলেরই রাজা—কারোই বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের অধীন নহেন। রাজশক্তির এই নির্লিপ্ততা ও নিরপেক্ষতাই, ইংরেজের এই রাজভক্তির প্রধান হেতু। ধনীতে দরিদ্রে, আভিজাতে ও জনসাধারণে, ভদ্রে ও ইতরে, ধনে ও জনে, শ্রেণীতে শ্রেণীতে, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, জাতিতে জাতিতে, এখানে একটা নিরবচ্ছিন্ন রেষারেষি চলিয়াছে। কে কাহাকে আপনার নীচে রাখিবে, কে কাহার উপরে চড়িবে, এই যেন সকল শ্রেণী, সকল দল, সকল সম্প্রদায়ের প্রাণান্ত চেষ্টা। কিন্তু এই তুমুল দ্বন্দ্বের ও আন্দোলনের মধ্যে, একমাত্র রাজাই মধ্যস্থ হইয়া রহিয়াছেন। পারিবারিক ও সামাজিক

সম্বন্ধে আভিজাতবর্গের সঙ্গেই তাঁর হৃদ্যতা ও চলাবসা, সত্য। শাসন সম্পর্কে মধ্যবিত্ত মন্ত্রীদলের সঙ্গেই তাঁর নিত্য ব্যবহার, ইহাও সত্য। কিন্তু এ সকল সত্ত্বেও, রাজারূপে রাজা বলিয়া, তিনি দেশের কোনই দল-বিশেষের পৃষ্ঠপোষক নহেন। তিনি সকলেরই রাজা,—সকলেরই রাষ্ট্রশক্তির আধার, সকলেরই প্রতিনিধি। দশের মতই তাঁর মত, দশের ভাবই তাঁর ভাব। দশের মনোরঞ্জনই তাঁর একমাত্র কর্ত্তব্য। এখানে তিনি পরিবারেরও নন, আভিজাতবর্গেরও নন, আর কাহারই নন। তিনি আপনার মন্ত্রীদলের মতাপেক্ষী হইয়া সর্ব্বদা চলেন, এই জন্য যে মন্ত্রীদল যতদিন স্বপদে প্রতিষ্ঠিত থাকেন, ততদিন তাঁরাই দশের প্রতিনিধি বলিয়া গণ্য হন। দেশের লোকের অনুগ্রহের উপরেই তাঁহাদের পদের স্থায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। রাজা যে কোনো দলেরই নন, বড়রও নন, ছোটরও নন, অথচ সমভাবে সকল দলেরই সঙ্গে তাঁর সহানুভূতি আছে, ইহাই ইংলণ্ডের রাজপদের বিশেষত্ব। এবং এই নির্লিপ্ততা ও নিরপেক্ষতার উপরেই রাজার প্রভাব ও প্রজার ভক্তি—উভয়ই প্রতিষ্ঠিত।

ফলতঃ ইংরেজের রাজশক্তি ও রাজভক্তির আলোচনা করিতে গেলে, সর্ব্বদাই আমাদের চণ্ডীর কথা মনে পড়ে। চণ্ডীর ভিতরেও যে একটা গভীর রূপক আছে, ইহা আমরা সকল সময়ে অবহিত চিত্তে বিচার করি না। সাধক চণ্ডীর ভিতরে মহাশক্তির আরাধনার সূত্র প্রত্যক্ষ করেন। তাঁর নিকটে চণ্ডী মহাশক্তির প্রকাশ, আদ্যাশক্তির অবতার। তিনি সেই শক্তির আরাধনা করিয়া সেই "শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে"র চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া কৈবল্য লাভ করেন। আর দার্শনিক চণ্ডীর ভিতরে বেদান্তের সকল তত্ত্ব নিহিত দেখিতে পান। মহামায়ার মধ্যে তিনি মায়িনং মহেশ্বরকে প্রত্যক্ষ করেন। চণ্ডীর উৎপত্তি তাঁর নিকটে বেদান্তের সারতত্ত্ব প্রকাশ করে। দেবতাদিগের শক্তি সঞ্চয়ে, দেবশক্তির সমবায়ে মহাচণ্ডীর সৃষ্টি হয়। দেবতারা প্রত্যেকে আপনাপন শক্তি দানে আপনাদিগের উদ্ধার ও রক্ষার জন্য ব্রহ্মার আদেশে চণ্ডীকে রচনা করেন। ইংরেজ এইরূপ, রাষ্ট্রব্যবহারে, আপনাপন স্বাধীনতা সঙ্কুচিত করিয়া, আপনাপন অধিকার রাজ-আধারে অর্পণ করিয়া রাজার সৃষ্টি করিয়াছে, এমনি মনে হয়। তাহার রাজা পর নহেন, রাজা আপনার জন। রাজশক্তি আত্মশক্তি। আপনার জনকে কে না ভালবাসে? আপনার জনকে উচ্চপদে বরণ করিতে কে না ইচ্ছা করে? এই জন্য ইংরেজ তাহার রাজাকে সমাজের শীর্ষস্থানে প্রতিষ্ঠিত করে। আপনার জনের বশ্যতা স্বীকার করিতে কেই বা কুণ্ঠিত হয়? এই জন্যই ইংরেজ অম্লানবদনে, অকুণ্ঠা সহকারে, রাজার বশ্যতা স্বীকার করে। এই আত্মৈকত্ব বোধই ইংরেজের এই অদ্ভুত রাজভক্তির মূল অর্থ। ইহাই এই রহস্যের চূড়ান্ত মিমাংসা। এই জন্যই ইংরেজের রাজভক্তি এত মূল্যবান বস্তু। এই জন্যই এই ভক্তির আধার, ইংলণ্ডের রাজার এমন মর্য্যাদা। ধন্য এ রাজা! ধন্য এ রাজভক্তি!

এই রাজভক্তি সত্য বস্তু। তাই রাজার

অসুখের সংবাদে আজ সমগ্র সমাজের চিত্ত উৎকণ্ঠায় উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে। রাজা ইংরেজের আপনার জন বলিয়াই, তাঁর রোগের বার্ত্তায় আজ দেশে এই বিষাদের ছায়া পড়িয়াছে।

(২)

রাষ্ট্রীয় আন্দোলন ও আলোচনা।

পার্লেমেণ্ট এখন শূন্য। ইষ্টার পর্ব্বোপলক্ষে সদস্যেরা কিছুদিনের জন্য বিরাম লাভ করিয়া নানা দিক্‌দেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছেন। এজন্য রাষ্ট্রীয় আন্দোলনেও কতকটা ঠাণ্ডা পড়িয়াছে। মাঝে মাঝে কেবল সংবাদপত্র-সম্পাদকেরা নিজ নিজ দলের উৎসাহ ও উদ্যম জাগাইয়া রাখিবার জন্য, পুরাতন বিষয়ের পুনরালোচনা করিতেছেন। ক্বচিৎ কোনো রাজনৈতিক বক্তা ছিন্নাভ্রের ন্যায় সভামণ্ডলে উপস্থিত হইয়া দু' একটা বক্তৃতা করিয়া, আপনাদের অস্তিত্বের প্রমাণ দিতেছেন। কিন্তু এ স্তব্ধতা আসন্ন ঝটিকার পূর্ব্ব লক্ষণ মাত্র। আর কিছুকাল মধ্যেই প্রবলতর বেগে আন্দোলনের বাত্যা উঠিবে, চারিদিক হইতে রাজনৈতিক নেতৃ ও বক্তৃদলকে একত্রিত করিবে, ও উভয় পক্ষের কড়-কড় বজ্রনিনাদে পার্লেমেণ্টের আকাশ ও দেশের অসংখ্য সভামণ্ডপ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিবে। এ ঝটিকা বড় সামান্য নহে। ইহা বিপ্লবের বেগে প্রবাহিত হইবে। ফলতঃ ইংলণ্ড আজ বিপ্লবের দ্বারে উপনীত হইয়াছে। সৌভাগ্যের কথা এই যে এই বিপ্লবে পশুশক্তির অভিনয়ের কোন আশঙ্কা নাই। শতবৎসর পূর্ব্বে এ সমস্যা যদি উঠিত, ও প্রতিদ্বন্দিগণের শক্তি যদি এরূপ ভাবে পরস্পরের সম্মুখীন হইত, তাহা হইলে কিরূপে যে এ বিষয়ের মিমাংসা হইত, বলা কঠিন। কিন্তু সেরূপ কোনো আশঙ্কা এখন আর নাই। এ সংগ্রাম পার্লেমেণ্টের সভ্যনির্ব্বাচনক্ষেত্রেই অভিনীত হইবে। এ সংগ্রামে কণ্ঠই কামান, বাক্যই গুলি-গোলা, নিন্দাবাদই শাণিত অসি, রাজনৈতিক নেতৃবর্গের চরিত্র ও নীতিই অরাতি-দেহরূপে বিদ্যমান থাকিবে। এ সংগ্রামের বিপুল আয়োজন আরম্ভ হইয়াছে। এই অবসর ও অবকাশে এই আয়োজন পূর্ণ হইবে বলিয়াই বোধ হয়।

তবে, বাস্তবিকই যুদ্ধ বাধিবে কি না, এখনও তাহার কোনোই স্থিরতা নাই। সংগ্রাম মাত্রেই শান্তিক্ষয় হয়। এক বৎসর কাল মধ্যে দুইবার নির্দ্ধারণের সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে সহজে কাহারোই প্রবৃত্তি হইবে না। কেবল যে বাক্যব্যয় হয় তাহাও নহে, এখানে কথাও কিনিতে হয়। সংবাদপত্র-সম্পাদকেরা কথা শুনিয়া কিনিয়া থাকেন। হাজার কথায় পঞ্চাশ টাকা, ইহাই বাজার দর। রাজনৈতিক নেতৃবর্গকেও কথা কিনিতে হয়। বক্তৃতার ও বিলক্ষণ কেনা-বেচা চলে। নির্ব্বাচন-সংগ্রামে এই জন্য বিস্তর অর্থক্ষয়ও হয়। কিন্তু বিগত নির্ব্বাচনে সকল দলেরই কোষ প্রায় শূন্য হইয়া গিয়াছে। রক্ষণশীলদলের এজন্য তত ভাবনা নাই। দেশের মহাজনেরা তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষক। তাঁদের অর্থের অভাব থাকিলেও ভাবনা নাই, প্রয়োজন মত অর্থ জুটিতে বিলম্ব হইবে না।

মুস্কিল কিন্তু মন্ত্রীদলের। আর সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন সমস্যা হইবে শ্রমজীবীদলের ও আইরিসদলের। কিন্তু সকল দলেরই স্বল্পবিস্তর অসুবিধা হইবে। এই জন্য কোনো দলই আবার সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছুক নহেন। আর তাহাতে যে বিশেষ কোনো ফলোদয় হইবে, এমনও সম্ভাবনা নাই। জুন জুলাই মাসে যদিই আবার পার্লেমেণ্টের সভ্য নির্ব্বাচিত হয় তাতে যে রক্ষণশীলেরা মন্ত্রীপদে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবেন, তাহার কোনোও আশাই নাই। এখন উদার-নৈতিকদলের যে লোকবল আছে, তাহাতে কোনো ইতর-বিশেষ হইবে এরূপ সম্ভাবনা আদৌ নাই। সুতরাং যে সংগ্রামে কোনোওই ভরসা নাই সে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া লাভ কি? এই সকল বিচার করিয়া মনে হয় যে এ মেঘ যতটা গর্জ্জন করিতেছে, ততটা বর্ষণ করিবে না। তবে এ বিপদের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি কেবল এখন রাজার হাতে রহিয়াছে। তিনি যদি ইচ্ছা করেন তবে আবার নির্ব্বাচন হইবে, তিনি যদি ইচ্ছা না করেন, তবে পুনরায় সভ্য-নির্ব্বাচন ব্যতীতও আভিজাত সভার বর্ত্তমান ক্ষমতা হ্রাস হইয়া যাইবে। এই কারণেও, এতটা রাজার উপরে এ সময়ে নির্ভর করিতেছে বলিয়াও, তাঁহার এই আকস্মিক অসুখের সংবাদে দেশময় এতটা ব্যাকুলতা ও উৎকণ্ঠা প্রকাশিত হইতেছে।

গ্রন্থ-সমালোচনা।

চিত্ররেখা—শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত মূল্য ॥০ আনা। পুস্তকখানি ছয়টি ক্ষুদ্র গল্পের সমষ্টি। ছাপা, কাগজ এবং বহিরাবরণ মনোজ্ঞ। সুধীন্দ্র বাবু সাহিত্যসমাজে সুপরিচিত। প্রাঞ্জল এবং অকারণ বাহুল্য বর্জ্জিত ভাষা তাঁহার লেখার বিশেষত্ব। চিত্ররেখার কয়েকটি গল্প আমাদের বেশ ভাল লাগিয়াছে। তন্মধ্যে 'পিতা ও পুত্র' গল্পটি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহার মধ্যে যে একটি করুন রস ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা নিপুণ লেখকের কবি-হৃদয়ের পরিচায়ক।

ফরিদপুরের ইতিহাস—১ম খণ্ড শ্রীআনন্দনাথ রায় প্রণীত মূল্য ॥৵০ ইতিহাসের উপকরণ যতই সংগ্রহ হয় ততই মঙ্গলের বিষয়। সে হিসাবে সমালোচ্য গ্রন্থখানির উপকারিতা আছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় গ্রন্থকার উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন মাত্র—গ্রন্থখানিকে একটা সমগ্রতা দিতে পারেন নাই। সংগ্রহ করা আবশ্যক কিন্তু নিপুণা গৃহিনীর হস্তে তাহা সুবিন্যস্ত না হইলে সামগ্রীর স্তূপ হয় মাত্র তাহাতে গৃহস্থালী চলে না। উপকরণের সমষ্টি ইতিহাস নহে, লেখকের ইহা মনে রাখা উচিত ছিল। তথাপি এ সংগ্রহের জন্য তিনি আমাদের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র।

শোক-সঙ্গীত।*

যখন ঘন মেঘ গগন হ'তে ধীরে যাইতেছিল অপসারি,
হইতেছিল ক্রমে শান্ত নির্ম্মল প্রপাত-উচ্ছল বারি,
মন্দীভূত হ'য়ে আসিতেছিল যবে সঘন রণভেরী বিশ্বে,
—সহসা আসি কাল লইয়া গেল এক শান্তি ধর্ম্মের শিষ্যে।

কোরাস—এসেছে সেইজন তোমার ক্রোড়ে আজ, ধরণী ধর তায় বক্ষে,
প্রকৃতি কাঁদো আজ মলিন অধোমুখে, আবরি অঞ্চল চক্ষে ॥

হয়নি বিচলিত নিমেষ তরে যার হৃদয় কভু সন্দেহে,
প্রগাঢ় বিশ্বাস মহৎ পরিণামে, গভীর নির্ভর স্নেহে,
শান্তি ছিল যার কর্ম্ম জীবনের, স্বস্তি ছিল যার তন্ত্র,
জগতে আনিবারে প্রীতির ধর্ম্ম এ জীবনে ছিল যার মন্ত্র।

(কোরাস—এসেছে সেইজন তোমার ক্রোড়ে আজ—ইত্যাদি—)

একই সুবিশাল বিশ্বপরিবার—কে পারে করিবারে খর্ব্ব;
ভিন্ন করে তায় সাগর পর্ব্বত, ভিন্ন করে তায় গর্ব্ব,
—আবার হবে এক, ছিল এ বিশ্বাস, (নহে সে বিশ্বাস ভ্রান্তি)
বিশ্বপর' শুধু বহিয়া যাবে এক, স্নিগ্ধ সুগভীর শান্তি!

(কোরাস—এসেছে সেইজন তোমার ক্রোড়ে আজ—ইত্যাদি—)

সুধীর সুব্রত স্বাধীন সংযত, সুজন শ্রমী সুচরিত্র
গিয়াছে চলি সেই বৃটন গৌরব এ দীন ভারতের মিত্র।
গিয়াছে চলি আজ বৃটন মহারাজ, রাখ এ বিদ্বেষ দ্বন্দ্ব,
ধর্ম্ম কর আজ, মর্ম্মবেদনাই, কর্ম্ম কর আজ বন্ধ।

(কোরাস—এসেছে সেইজন তোমার ক্রোড়ে আজ—ইত্যাদি—)

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

* স্বর্গীয় সম্রাটের শোকস্মৃতি উপলক্ষে কলিকাতা ইভিনিং ক্লাবের মেম্বরগণ কর্ত্তৃক গীত।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত।

বঙ্গদর্শন।

সাহিত্যে সমাজসেবা।*

সাহিত্যকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এক শ্রেণীর সাহিত্য মনুষ্যকে জীবন-সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করে, সাহায্য করে, জয়ী করে। উন্নতির পথে যে বিঘ্ন-কণ্টক আছে, দুর্গম জঙ্গল আছে, তাহা অপসারিত করিয়া মানবজাতিকে সত্যের পথে, জ্ঞানের পথে ক্রমবিকাশের দিকে অগ্রসর করে। সমাজের বেদনার সহিত এই সাহিত্যের পূর্ণ সহানুভূতি। কেবল সহানুভূতি নহে, এই সাহিত্য সামাজিক বেদনার ঔষধ; এই সাহিত্য সামাজিক ব্যাধির আয়ুর্বেদ।

আর এক শ্রেণীর সাহিত্য আছে। তাহা জীবন-সংগ্রাম-ক্ষেত্র হইতে দূরে থাকে। এই সাহিত্য আরাম-উদ্যানে বাস করিতে ভাল বাসে। কুসুমের সুষমায়, কোকিলের কুহু-রবে, জ্যোৎস্নার কুহেলিকায়, বীণার ঝঙ্কারে, প্রেমের লিপ্সায়, সুখের স্বপ্নে, সৌন্দর্য্যের উৎসে, সঙ্গীতের ঝরণায়, পরীর ন্যায়, পরী-রাজ্যে বিচরণ করে।

প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যের উদ্দেশ্য কার্য্য, মহৎ কার্য্য, মহৎকার্য্য-বিকশিত-সমাজ, এবং সমাজ-ব্যাপ্ত-বিপুল-আত্মার মহতী স্ফূর্ত্তি। এই সাহিত্যের প্রেরণায় নিষ্কাম কর্ম্ম আছে, মূলে সহানুভূতি বা প্রেম বা ভগবদ্ভক্তি আছে, এবং ফলে কর্ম্মাত্মক, প্রেমাত্মক জ্ঞান আছে। বুঝিয়া দেখিলে এই সাহিত্য অনাদি, অনন্ত, সনাতন ভগবদ্গীতা।

দ্বিতীয় শ্রেণীর সাহিত্য কার্য্যমুখ নহে। ইহা জীবনের কঠোর সংগ্রামে কোন সাহায্য করিতে চাহে না, বরঞ্চ এই সাহিত্য, ইহার গানের মূর্চ্ছনায়, ইহার আত্মবিভোর ভাবের উচ্ছ্বাসে, জীবন-সংগ্রামের কথাটাই ভোগের অগাধ জলে ডুবাইয়া দেয়। কার্য্য এই সাহিত্যের লক্ষ্য নহে, সঙ্গীত ও সৌন্দর্য্য উপভোগই ইহার প্রধান লক্ষ্য।

প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য গভীর-চিন্তা-প্রসূত হইলেও ইহা প্রধানতঃ ব্যবহারিক। দ্বিতীয় শ্রেণীর সাহিত্য গভীর উচ্ছাসময় হইলেও ইহা প্রধানতঃ উপভোগে পর্য্যবসিত।

আমাদের দেশে বর্ত্তমান সময়ে দ্বিতীয় শ্রেণীর সাহিত্যের যেরূপ অনুশীলন হইতেছে, আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বোধ হয়, প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যের সেরূপ অনুশীলন হইতেছে না, কাজেই তাহা তেমন উন্নতি লাভ করিতেছে না। উন্নতি লাভের চেষ্টাও বড় দেখা যায়

* ভাগলপুরের সাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত

না। আমার আশঙ্কা হয় যে আমাদের জাতীয়-জীবনের সহিত জাতীয়-সাহিত্যের অদ্যাপি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হয় নাই।

বিলাতের সাহিত্য মনোনিবেশ পূর্ব্বক অধ্যয়ন করিলে, সেই সাহিত্য-দর্পণে বিলাতের জাতীয়-জীবনের পরিষ্কার প্রতিবিম্ব দেখিতে পাওয়া যায়। ধনবিজ্ঞানের সাহিত্যের প্রতি লক্ষ্য করুন। তাহার প্রধান পুস্তক কয়েকখানি তৎতৎকালীন জাতীয়-জীবনের বা ইতিহাসের প্রতিবিম্ব। বাণিজ্যে যখন গবর্ণমেণ্ট অত্যধিক হস্তক্ষেপ করিতে লাগিলেন, এবং তাহাতে জনসাধারণের ক্ষতি হইতে লাগিল, তখন Adam Smithএর "Wealth of Nations" লিখিত হইল। এই গ্রন্থখানি মূলে তখনকার অবাধ বাণিজ্য-তন্ত্রের, System of Protectionএর প্রতিবাদ। আবার তাহার পরে যখন ইংলণ্ডের মুদ্রাপ্রচলন-প্রণালীতে বড়ই বিভ্রাট ঘটিল, তখন রিকার্ডো (Recardo) মুদ্রা এবং Bank notes সম্বন্ধে গ্রন্থ লিখিলেন। তৎপরে নানা কারণ বশতঃ ইউরোপের পশ্চিম খণ্ডে যখন কৃষিকার্য্যের বড়ই অবনতি হইল, তখন জমির খাজনা-মজুরি-বিষয়ক গ্রন্থ লিখিত হইল। যখনই বিলাতে দারিদ্র্যের বৃদ্ধি হইয়াছিল, তখনই দীনজনের বেদনায় ব্যথিত হইয়া পণ্ডিতগণ কিসে দারিদ্র্যের হ্রাস হয়, এ বিষয় আলোচনা করিয়া গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন।

কিন্তু আমাদের দেশের বিচিত্র অবস্থা। এই যে খাদ্যের মূল্য এত বাড়িয়াছে, এবং নির্দ্দিষ্ট-বেতনাদিভোগী মধ্যবিত্তব্যক্তিগণ তজ্জন্য এত কষ্ট ভোগ করিতেছেন, এমন কি কোথাও কোথাও দরিদ্র ভদ্রসন্তানগণ এক-বেলা মাত্র আহার করিয়া জীবন ধারণ করিতেছেন; তৎসম্বন্ধে আমাদের দেশের কয়জন গণ্যমান্য মনীষী আলোচনা করিয়া থাকেন। এতগুলি মাসিকপত্র, সংবাদপত্র, পুস্তক-পুস্তিকা অনবরত প্রকাশিত হইতেছে, এত সভাতে বিদ্বান্ পণ্ডিতগণ প্রবন্ধ পাঠ করিতেছেন, খাদ্যের মূল বৃদ্ধি সম্বন্ধে কয়টি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে?

এই যে বিলাসের প্রতিযোগিতা দিন দিন বাড়িতেছে, আয়ের অতিরিক্ত সৌখীন দ্রব্য ব্যবহারে, সমাজ আপনার গলায় আপনি ফাঁস টানিতেছে; দান, দয়া, ধর্ম্ম উঠিয়া যাইতেছে, প্রাচীন হিন্দুসভ্যতার নির্ম্মল পবিত্র জীবনপ্রবাহ দিন দিন আবিলতর হইয়া বিষময় হইতেছে; ধনী ভ্রাতা ল্যাণ্ডো "মোটরকার" চালাইয়া, বিদ্যুদ্দীপে গৃহ আলোকিত করিয়া, বিদ্যুৎব্যজনে বিধূনিত হইয়া, বিলাস-সোপান-পরম্পরায় আরোহণ করিতে করিতে, নিম্নে সহোদরের অন্নাভাব লক্ষ্য করিতে পারেন না, লক্ষ্য করিলেও (পাছে electric light ও electric fan-এর খরচ সঙ্কুলান না হয়, পাছে গাড়ি ঘোঁড়ার জাকজমক কমিয়া যায় এই ভয়ে) দীনহীন কৃপাপাত্র সহোদরকেও সামান্য সাহায্য করিতে কুণ্ঠিত, * এই দয়া-ধর্ম্ম-নাশী কর্ত্তব্যজ্ঞানহন্তা, বিলাসোন্মাদ সম্বন্ধে কয় জন বাঙ্গালী পণ্ডিত আলোচনা করিয়াছেন?

এই আত্মঘাতী সঙ্কীর্ণ-স্বার্থ-নিঃসৃত প্রতিযোগিতা, যাহাকে ইংরাজ-সুধী "cut-

* এই স্থানে কোন ব্যক্তিবিশেষকে লক্ষ্য করা হয় নাই।

throat competition" বলিয়াছেন, সমাজে, পরিবারে, পরিব্যাপ্ত হইয়া, বিবাহে পাত্রকে পণ্যসামগ্রী করিয়াছে, এ বিষয় আমাদের গ্রন্থকারগণের মধ্যে, প্রবন্ধলেখকগণের ভিতরে, কয়জন আলোচনা করিয়াছেন। ইংলণ্ডে সাহিত্যে কার্লাইল ও রস্কিনের স্থান অতি উচ্চ, বলা বাহুল্য। কার্লাইল ও রস্কিনের গ্রন্থে সমাজের বেদনার সহিত কি গভীর সহানুবেদনা, সমাজকে উন্নত করিবার, পশুর ভাব হইতে দেবভাবে লইয়া যাইবার কি সাগ্রহ চেষ্টা! তাহা পড়িলে বোধ হয় যেন আকাশে কোন দেবতা, বর্ত্তমান নরকগামী সমাজকে উদ্ধার করিবার জন্য, দৈববাণী করিতেছেন।

আমাদের দেশের বার আনা লোক কৃষক। তাহাদের করুণ আর্ত্তনাদের প্রতি আমাদের সাহিত্য বধির, বিবেকজ্ঞান-শূন্য।* এই দেশেই ভূস্বামীর কর সংগ্রহ করিবার অধিকার আছে, কিন্তু ভূস্বামীর কর্ত্তব্যপালন সম্বন্ধে (বর্ত্তমান) সাহিত্য নির্ব্বাক্। কৃষকদিগের হিতার্থে, শ্রমীদিগের মঙ্গলকল্পে, ইউরোপ ও আমেরিকার সহৃদয় মহানুভব সাহিত্যিকগণ কত চিন্তাশীল হৃদয়গ্রাহী গ্রন্থ লিখিয়াছেন ও লিখিতেছেন, বঙ্গদেশে সেইরূপ গ্রন্থ কয়খানি রচিত হইয়াছে? বিলাতে বিখ্যাত ধনতত্ত্ববিৎ অধ্যাপক নিকলসন (Necholson) কয়েক বৎসর হইল Tenant's Gain not Landlord's Loss নামক একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন, কিন্তু বঙ্গদেশে এরূপ গ্রন্থ রচনা করা দূরে থাকুক, এই গ্রন্থখানি বাঙ্গালী পণ্ডিতের অতি বৃহৎ পুস্তকাগারেও দুর্লভ।

Encyclopœdia Britannicaতে শিক্ষার ইতিহাস পাঠ করিলে দেখা যায় যে শিক্ষার উৎকর্ষ সাধনের জন্য এবং তাহার বিস্তারের জন্য চেষ্টা করায় ইউরোপে কি একটা বিশাল সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে। এই যে এত বড় বঙ্গদেশ, এত কোটি লোক গভীর অজ্ঞান-তিমিরে ডুবিয়া রহিয়াছে, তাহাদের উদ্ধার সম্বন্ধে সাহিত্যিকগণ প্রায়ই নিস্তব্ধ।

প্রকৃত পক্ষে জাতীয় জীবনের সহিত আমাদের জাতীয়-সাহিত্যের সংযোগ নাই। সুতরাং এই সাহিত্যের অধিকাংশই কৃত্রিম—ইহার অধিকাংশ ইংরাজি পুস্তকের খতিয়ান, বা সংস্কৃতগ্রন্থের চর্ব্বিত চর্ব্বণ, বা কোন প্রাচীন জীর্ণ পুঁথির উদ্ধার। সাহিত্যে, যেমন প্রাচীন জীর্ণ গ্রন্থের উদ্ধারের আবশ্যক, জীর্ণদেহের ও জীর্ণ মনের ও জীর্ণ অসুস্থ সমাজেরও উদ্ধার তেমনি আবশ্যক, বা ততোধিক আবশ্যক।

আমার আন্তরিক আশা ও প্রার্থনা যে সাহিত্য-পরিষদের বাৎসরিক অধিবেশনে, বঙ্গীয় সাহিত্যিক পণ্ডিতগণের সমন্বিত চেষ্টায়, জাতীয়-সাহিত্য জাতীয়-জীবনের বীজ হইতে উত্থিত হউক, সামাজিক সহানুভূতির ভিত্তির উপর নির্ম্মিত হউক, সুখ-দুঃখ, নিষ্ফলতা-সফলতা, বেদনা, আকাঙ্ক্ষা, অবনতি, উন্নতি, লক্ষ্য করিয়া, আমাদিগের সামাজিক জীবনকে সুস্থ, উন্নত ও পবিত্র

---

* এই প্রবন্ধে কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায়কে আক্রমণ করা উদ্দেশ্য নহে। সাধারণ মঙ্গলই উদ্দেশ্য। তথাপি তিনটি ছত্র সভার কেহ কেহ ভুল বুঝিয়াছিলেন বলিয়া তাহা পরিত্যক্ত হইল।

করিতে থাকুক। সাহিত্য-পরিষৎ আধ্যাত্মিক সাহিত্যকে ব্যবহারিক করুন। আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় ইহাই সাহিত্য পরিষদের মুখ্য "মিশন", ইহাই সাহিত্য-পরিষদের ঈশ্বরাদিষ্ট কার্য্য।

নিবেদক
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল রায়।

সূর্য্যপূজা।

ঐতিহাসিক আলোচনায় ইহাই স্থির হইয়াছে যে সূর্য্য বা Thorদেব কোনো কোনো স্থানে উচ্চারণভেদে সর্ (Sor) রূপ ধারণ করিয়াছিলেন এবং যেমন সূর্য্য হইতে আমাদের সৌরাষ্ট্র দেশ, তেমনি সর্ হইতে সিরিয়া'র নামকরণ হইয়াছে। অদ্যাবধিও উত্তরায়ণ কালে মহা আড়ম্বরের সহিত রোমক সূর্য্যোৎসব "Yule" বা "Hiul" বা "Houl" উৎসব হইয়া থাকে। সংস্কৃতে সূর্য্যের এক নাম 'হেলি'। এই নামের সহিত উক্ত উৎসবের কোন সম্বন্ধ আছে কি না কে বলিবে। গ্রীকদিগের হেলিয়স্ লাটিনদিগের সল, টিউটনদিগের টির (Tyr), ইরাণীদিগের 'খোর-সেদ', এই সমস্তই সূর্য্যের নামান্তর মাত্র। যেমন আসিয়ায় তেমনি য়ুরোপে সর্ব্ব স্থানেই সূর্য্য-পূজা প্রচলিত ছিল এবং ভারতবর্ষই এ বিষয়ে সকল দেশের শিক্ষা গুরু।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি স্থানভেদে পূজা-বিধিরও তারতম্য ঘটে। তাই আমরা দেখিতে পাই যখন এসিয়ার বলদেবের (সূর্য্যের) মন্দিরে, গল এবং ব্রিটনের বেলে-নাসের বেদী সমক্ষে নরবলি হইত, যখন বাবিলনের মিত্রমন্দির-তলে বলিবর্দ্দ নিহত হইত, তখন জাক্‌জার্টিস্ এবং ভাগীরথীর তীরবর্ত্তী সূর্য্যদেবের মন্দিরে অশ্বমেধ যজ্ঞ ঘটিত। এসিয়ার বলদেব, গল এবং ব্রিটন-বাসী কেল্টদিগের বেলেনাস্, বাবিলনের মিথ্, গঙ্গাতীরবর্ত্তী সূর্য্যদেবেরই নামান্তর মাত্র।* প্রাচীন ভারতের বলনাথের অর্থাৎ সূর্য্যের মন্দির তলে বৃষবলিরও ব্যবস্থা ছিল বলিয়া জানা যায়। এখনো রাজস্থানে এবং সৌরাষ্ট্রে এরূপ অনেক সূর্য্যমন্দির আছে যথায় কোনো কালে বৃষবলিও হইত।† শোণিত না হইলে

* His symbolic worship and offerings varied with clieve and habit; and while the altars of *Bal* in Asia, of *Bellnus* among the Celts of Gaul and Britain, smoked with human sacrifices, the bull bled to Mithros in Babylon, and the stud was the victim to Surya on the Jaxartes and Ganges—Tod's Rajsthan, Vol. I, p. 86.

† As he did (the bull bled) also to *Bal-nath* (the God Bal) in the ancient times of India. The bul-don or gift of the bull to the sun, is well recorded. There are numerous temples Rajsthan of Boalm ; and Balpur (Mahadeo) has several in Sourastra. All represent the sun. — *Ibid*, foot-note

যাঁহার চলিত না, অধুনা তিনি কিরূপে এতদূর বৈরাগ্য অবলম্বন করিলেন যে তাঁহার ভক্তগণ রবিবারে মৎস্য মাংস প্রভৃতি স্পর্শ করে না, ইহা অনুসন্ধান করিবার বিষয়।

বেদে ইন্দ্র, অগ্নি, সোম এবং বরুণের যত অধিক উল্লেখ আছে, সূর্য্যের তত নাই। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে সূর্য্যের পূজা এক সময়ে সমগ্র ভারতবর্ষে, শুধু ভারতবর্ষে কেন সমুদয় পরিজ্ঞাত ভূভাগে প্রচলিত ছিল।* সুতরাং ইহাই অনুমান হয় যে বেদে অধিক উল্লেখ না থাকিলেও সূর্য্যদেব অধিক পরিমাণে নর-হৃদয় অধিকার করিয়াছিলেন। † ঐতিহাসিক রিজ ডেভিডস্ অনুমান করেন যে বৌদ্ধ মহা সুদস্মন নামক ঘাতক ও বৌদ্ধযুগের নহে, উহা বৌদ্ধযুগের পূর্ব্ববর্ত্তী প্রাচীন ভারতের সূর্য্যোপাসনার কাহিনী মাত্র। ইহা হইতেই ভারতবর্ষীয়দিগের হৃদয়ের উপর সূর্য্যের প্রভাব অনুমিত হইবে।

বেদে সূর্য্যের উল্লেখ পাইয়াছি, পুরাণাদি গ্রন্থে সূর্য্যদেবের ধ্যান ও পূজাবিধি পাইতেছি। আবার রামায়ণেও দেখিতেছি যুদ্ধজয়ের নিমিত্ত শ্রীরামচন্দ্র সূর্য্যপূজা করিবার জন্য উপদিষ্ট হইতেছেন।* তার পর অমরাদি কোষগ্রন্থেও সূর্য্যের উল্লেখ পাইতেছি। সুতরাং বৈদিক যুগ হইতে ভারতের ঐতিহাসিক যুগের অব্যবহিত পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সূর্য্য-পূজার প্রচলন যে সমভাবে ছিল এরূপ সিদ্ধান্ত করিলে হয় ত বিশেষ বাধা হইবে না। ইতিহাসও এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন করিতেছে।

ঐতিহাসিক ফিলস্ট্রেটস্ (Philostrates) লিখিয়া গিয়াছেন যে আপোলনিয়স্ (Apollonius) সিন্ধুনদ অতিক্রম করিয়া তক্ষশিলা নগরে সূর্য্যদেবের মন্দির দেখিয়াছিলেন। তিনি যখন জ্বালামুখী গিয়াছিলেন তখনো দেখিয়াছিলেন তথাকার অধিবাসিগণ সূর্য্যের উপাসনা করিয়া থাকে। † সুতরাং ইহাই অনুমান হয় যে আপোলনিয়সের দেখিবার পূর্ব্ব হইতেই তক্ষশিলায় এবং জ্বালামুখীতে সূর্য্যদেবের মন্দির ছিল। আপোলনিয়স্ খ্রীঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীতে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। সূর্য্য-পূজা দেশ মধ্যে সমধিক প্রচলিত না থাকিলে তাঁহার জন্য মন্দির নির্ম্মিত হইত বলিয়া বোধ হয় না। শুনিতে পাওয়া যায়, রাজা অশোক যখন পিতার অধীনে তক্ষশিলার শাসনকর্ত্তামাত্র ছিলেন তখনো তথায় তপনদেবের বিখ্যাত মন্দির

* The universality of Sun worship is shown in Squier's Serpent symbol in America and Macrob. Satura J. C. 22—Elliot's Histoy of India, Vol. V, p. 565 foot-note.

† Even these three (the Moon, and the Sun and Mother Earth) though noticed in the Veda, are put far into back ground compared with Indra, Agni, Soma and Varuna ; but it is highly probable that they really occupied a very much larger share in the minds of the people of India than these sparse notices in the Veda would tend to show.—Budhist India, Rhys Davids—p. 219.

* রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড, ষড়ুত্তরশততমঃ সর্গঃ।

† History of India, Elliot, Vol. V, p.

ছিল। খ্রীষ্টাব্দের সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে বিরচিত হর্ষচরিত নামক গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে শ্রীহর্ষের পিতা প্রভাকর বর্দ্ধন সূর্য্যমন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন। শ্রীহর্ষ খ্রীষ্টাব্দের সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে প্রাদুর্ভূত হন। সুতরাং প্রভাকর বর্দ্ধন ষষ্ঠ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে।

সপ্তম শতাব্দীর প্রমাণ চৈনিক পরিব্রাজক হোয়েন-থ-সঙ্গ স্বয়ং প্রদান করিবেন। তিনি যখন ৬৪০ খৃঃ অব্দে মুলতান * নগর পরিভ্রমণ করিতেছিলেন তখন তথায় একটি সুন্দর সূর্য্যের মন্দির দেখিয়াছিলেন। সেই মন্দির মধ্যে হেমনির্ম্মিত সূর্য্যমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। মন্দিরাধিকারী পুরোহিতদিগের বাসগৃহ ও অবগাহনাদির জন্য তথায় একটি স্বচ্ছসলিলা পুষ্করিণীও বর্ত্তমান ছিল। ভক্তগণ দিবানিশি মন্দিরপ্রাঙ্গণে গান গাহিত। রজনীতে সূর্য্যমন্দির আলোকদামে উদ্ভাসিত হইত। † আরবগণ যখন সিন্ধুতীরে কৃপাণ করে উপনীত হইয়াছিল, তখনো তাহারা সেই সুদৃশ্য মন্দির দর্শন করিয়াছিল। পরিব্রাজক বিরুণী সেই মন্দির ও মন্দিরাধিষ্ঠিত দেবমূর্ত্তি দেখিয়া উহা আদিত্যের মূর্ত্তি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন। তিনি ইহাও কহিয়াছেন যে হিন্দুদিগের সেই অতিপ্রিয় দেবতার অপমান করিয়া তাহাদের অন্ধবিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করিবার মানসে প্রথম আরব-অভিযানকারী মহম্মদ কাশিম মুলতানের সূর্য্যমূর্ত্তির গলদেশে একখণ্ড গোমাংস সংলগ্ন করিয়াছিলেন।* হোয়েন-থ-সঙ্গের কনৌজ-ভ্রমণকাহিনী হইতেও জানা যায় যে তিনি সেখানেও একটি সূর্য্যমন্দির দর্শন করিয়াছিলেন। সহস্র সেবক প্রতিদিন তথায় গীত-বাদ্য করিয়া তপনদেবকে পরিতুষ্ট করিত। † আনন্দগিরি অষ্টম শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহার রচিত শঙ্করবিজয় নামক গ্রন্থের ত্রয়োদশ প্রকরণে তিনি সূর্য্যোপাসকদিগের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

শ্রীশ্রী৺জগন্নাথ দেবের মন্দির হইতে দশ ক্রোশ মাত্র দূরে আজিও যে বিরাট মন্দিরের ভগ্ন চূর্ণ উপকরণাদি ও বৃহৎ বৃহৎ শিলাখণ্ড কোণারকে বঙ্গোপসাগরের বেলাভূমে পতিত রহিয়াছে, ফার্গুসন সাহেব অনুমান করেন যে খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে তথায় সূর্য্যদেবের বিখ্যাত মন্দির বর্ত্তমান ছিল। সেই সুদৃশ্য

* সূর্য্যের নাম হইতেই মুলতান নগরের নামকরণ হইয়াছিল। Multan formally called Kasttrapur, Hanspur, Bagpur, Sanbor, Sanabpur and finally Mulasthan, derives its name from that of the idol and temple of the Sun, a shrine of vast wealth in the pre-Mohamedan period.—Imperial Gazetteer, Vol. XVIII, p. 35.

† Elphinstone's History of India, p. 296 and Elliot's History of India, Vol. V, p. 564.

* Mahammed bin Kasim, the first invador suspended a piece of cow's flesh from its (Sun-God) neck, in order to show his contempt of the superstition of the Indians, and to disgust them with this double insult to the dearest objects of their veneration.—Elliot's History of India, Vol. V, pp. 564-565.

† Elphinstone's History of India, p 297, foot-note.

মন্দির গঠন-সৌষ্ঠবে জগন্নাথদেবের মন্দির অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট ছিল বলিয়াই ফার্গুসন সাহেব এইরূপ অনুমান করেন। তিনি কহিয়াছেন সেই মন্দির গঠন-প্রণালীতে উড়িষ্যার অন্যান্য মন্দিরেরই অনুরূপ। আয়তনে উহা ভুবনেশ্বর বা পুরীর মন্দিরের সমান, ইহাতে যে শিল্প-চাতুর্য্যের পরিচয় রহিয়াছে, পুরীতে বা ভুবনেশ্বরে তাহা নাই। গঠন-নৈপুণ্যে এই মন্দির পৃথিবীর সর্ব্ব মন্দির অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না।*

অষ্টাদশ শতাব্দীতে যখন উড়িষ্যা মহারাষ্ট্রীয়দিগের করতলগত হয়, তখন তাহারা কোণারক মন্দিরের সম্মুখস্থিত বিশাল অরুণ-স্তম্ভ উত্তোলন করিয়া পুরীতে জগন্নাথ দেবের মন্দিরের সিংহদ্বার সমক্ষে স্থাপন করিয়াছিল। অদ্যাপিও তাহা সেই স্থানেই আছে।† ভুবনবিখ্যাত এই মন্দির যে কোন্ সময়ে প্রথমে নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহা জানা যায় না। জগন্নাথ দেবের মন্দিরে রক্ষিত ইতিহাস মাদলাপাঞ্জির মতে * ইহা দ্বিতীয় নরসিংহ দেবের রাজত্বকালে (১৬২৮-৫২ খৃঃ অব্দ) নির্ম্মিত হইয়াছিল। এ বিষয়ে ফার্গুসন সাহেবের অভিমত পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে।

আইন-ই-আকবরী প্রণেতা আবুল ফজল যখন এই বিরাট মন্দির দর্শন করেন, তখন বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া লিখিয়াছিলেন জগন্নাথের নিকটেই সূর্য্যদেবের মন্দির। তাহা নির্ম্মাণ করিতে সমগ্র উড়িষ্যার দ্বাদশ বর্ষের রাজস্ব † ব্যয়িত হইয়াছিল। পৃথিবীতে এমন কেহ নাই যিনি এই মন্দির দেখিয়া বিস্মিত হইবেন না। যে প্রাচীর দিয়া মন্দিরটি বেষ্টিত তাহা উচ্চে ১৫০ হস্ত এবং বেধে ১৯ হস্ত পরিমিত। মন্দির প্রবেশের তিনটি তোরণ। পূর্ব্ব দ্বারে প্রস্তরনির্ম্মিত দুইটী সুন্দর হস্তী শুণ্ডের উপর দুইজন মনুষ্যকে বহন করিয়া দণ্ডায়মান। পশ্চিম দ্বারে বর্ম্ম-চর্ম্মপরিহিত দুইটি আশ্চর্য্য সশস্ত্র অশ্বারোহী মূর্ত্তি। উত্তরদ্বারের শিরোভাগে দুইটি ব্যাঘ্র সদ্যহত হস্তীর পৃষ্ঠদেশে সগর্ব্বে অধিষ্ঠিত। সম্মুখ তোরণের পুরোভাগে ৫০ হস্ত উচ্চ কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরের অষ্টকোণ স্তম্ভ বিরাজিত। নয়টি সোপান অতিক্রম

---

* The temple itself is of the same form as all the Orissa temples and nearly of the same dimensions as the great ones of Bhubaneswar and Puri ; it surpasses, however, both these in lavish richness of detail ; so much so, indeed, that perhaps I do not exaggerate when I say, that it is, for its size, the most richly ornamental building externally at least in the whole world.—Fargusson's Picturesque Illustrations of Ancient Architecture in Hindusthan, p. 27.

† এই স্তম্ভ সম্বন্ধে কটকের ভূতপূর্ব্ব জজ মিঃ ব্রাউন কহিয়াছেন—One of the most beautiful columns in the world......the taste and beauty displayed in the execution and decoration of the whole must be pronounced to be exquisite.—W. B. Brown, B. A., I. C. S.

* ইহাক্কু উত্তারু ইহাক্কু পো লাঙ্গুলীয় নরসিংহদেব ভোগবান ৪৫ বরষ শকাব্দ ১২০০। এ রজা অর্কক্ষেত্ররে কোনার্দ্ধি দেবঙ্কু দেউল তোড়াইলে এ রজার মূদল—

সপুচ্ছ নরসিংহেন ক্ষেমশ্বরেনাংশুমালিনঃ।
প্রাসাদঃ কারিতো রাজ্ঞা শকে দ্বাদশকে মাতে॥

† সরকার কটকের বার্ষিক রাজস্ব ২২,৮৫,৮১৮ মুদ্রা। সুতরাং দ্বাদশবর্ষের রাজস্ব ২৭,৪৬,৯৯,৮১৬ মুদ্রা।

করিলেই একটি সুবৃহৎ প্রাঙ্গণ পাওয়া যায়। তথায় প্রস্তরনির্ম্মিত গম্বুজগাত্রে সূর্য্য ও অন্যান্য গ্রহনক্ষত্রাদি খোদিত রহিয়াছে। তাহাদের চতুর্দ্দিকে যে সীমা-রেখা আছে, তাহার পার্শ্বে মনুষ্যহৃদয়ের ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তিগুলি লিখিত রহিয়াছে। *

এককালে ভারতবর্ষে যত সূর্য্যমন্দির ছিল, একটি ভিন্ন আর কাহারো পরিচয় পাইবার উপায় নাই। জগদ্বিখ্যাত এই মন্দিরের যাহা কিছু ক্ষীণ আভাস পাওয়া যায় তাহাও ইংরাজ এবং মুসলমান ঐতিহাসিকদিগেরই অনুগ্রহে।

১৮২৪ খৃঃ অব্দে যখন ষ্টার্লিং সাহেব কোণারক মন্দিরের স্তূপরাশি সন্দর্শন করেন তখনো দেউলের অংশবিশেষ সগর্ব্বে শির উত্তোলন করিয়া অনন্ত চলোর্ম্মির হা হা রব মধ্যে মৌনে ভারতের পূর্ব্ব মহিমা ও গৌরব স্মরণ করাইয়া দিতেছিল। মন্দির দর্শন করিয়া ষ্টার্লিং সাহেব বলিয়াছিলেন—ইহার কারুকার্য্য এখনো এমন সুন্দরই আছে যে মনে হয়, শিল্পী বুঝি এই সেই দিন আপন কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছে। যে প্রস্তরে মন্দির গঠিত হইয়াছিল, তাহা এতই কঠিন এবং দীর্ঘকালস্থায়ী যে সেই জন্যই এরূপ মনে হয়।* ষ্টার্লিং সাহেবের এই বর্ণনাকে অত্যুক্তি বলা যাইতে পারে না, কারণ ঐতিহাসিক হণ্টার (Hunter) সাহেবও তাঁহার 'উড়িষ্যা' নামক গ্রন্থে কহিয়াছেন—এই মন্দির চারি শতাব্দীর হিন্দুস্থাপত্য-নৈপুণ্যের পরিচয় প্রদান করে। যদিও ইহার বহিঃপ্রাচীর অশ্লীল চিত্রাবলীর জন্য হীন-গৌরব হইয়াছে, তথাপি এই মন্দির বঙ্গদেশের শ্রেষ্ঠ শিল্প-কুশলতার অভ্রান্ত প্রমাণ। ইহা গঠন-নৈপুণ্যে এতই সুন্দর যে মুসলমানগণ পর্য্যন্ত একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও ইহার প্রশংসা করিয়াছেন।†

Near the Jagannath is the temple of the Sun, in the erecting of which was expended the whole revenue of Orissa for 12 years. None can behold this immense edifice without being struck with amazement. The wall which surrounds the whole is one hundred and fifty cubits high, and nineteen cubits thick. There are three entrances to it. At the eastern gate are two very fine figures of elephants, each with a man upon his trunk. To the west are two surprizing figures of horsemen, completely armed, and over the northern gate are carved two tigers, who having killed two elephants are sitting upon them. In the front of the gate is a pillar of black stone, of an octagonal form, fifty cubits high. There are nine flights of steps; after ascending which, you come into an extensive enclosure, where you discover a large dome, constructed of stone, upon which are carved the sun and the stars, and round them is a border, where are represented a variety of human figures, expressing the different passions of the mind.................
—Ayeni-i-Akbari—Gladerin, p. 309.

* The workmanship remains, too, as perfect as if it had just come from under the chisel of the sculptor, owing to the extreme hardness and durability of the stone.

† It concentrates in itself the accumulated beauties of the four architectural centuries among the Hindus. Notwithstanding the indecent sculptures, which disgrace its exterior walls, it forms the

জনহীন সমুদ্রতীরে আজিও সেই মন্দিরের যে সকল বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড এবং কলঙ্কশূন্য লৌহকড়ি (Beam) প্রভৃতি অযত্নে পড়িয়া আছে, তাহা দেখিলে এখনও বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। সেই সেদিনের কথা স্মরণ করিয়া হৃদয় হর্ষে ও গর্ব্বে পূর্ণ হইয়া উঠে যেদিন বঙ্গের বিশ্বকর্ম্মাগণ অনায়াসে সেই সমুদয় উপকরণ প্রস্তুত করিয়া, সেই মন্দির রচনা করিয়া জগতের জন্য অতুল শোভার বিপুল ভাণ্ডার সংস্থাপন করিয়াছিল। পূর্ব্বকথিত জর্জ্জ ব্রাউন সাহেব নিজেই বলিয়াছেন -এই প্রকার বিশাল লৌহকড়ি কিরূপে প্রস্তুত হইতে পারে তাহা অল্পকাল পূর্ব্বেও য়ুরোপীয় লৌহশালাতে পর্যন্ত চিন্তার বিষয় ছিল।* শুনিতে পাওয়া যায় বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট একবার এই মন্দিরের নবগ্রহমূর্ত্তিখোদিত প্রস্তরের একখানি তিন সহস্র মুদ্রাব্যয়ে উহার হইতে নামাইয়া কলিকাতায় লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সেই প্রস্তরখণ্ড দীর্ঘে ১৯ ফিট উচ্চে ৩ ফিট এবং প্রস্থে ৩ ফিট ছিল। উহার গুরুত্ব দেখিয়া গবর্ণমেণ্টকে শেষে সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। এখন মানস-নয়নে নিরীক্ষণ করুন যে বঙ্গের শিল্পিগণ একটি মন্দির রচনা করিয়াছিলেন, যাহার বেষ্টন প্রাচীরের উচ্চতাই প্রায় কলিকাতার সুবিখ্যাত মনুমেণ্টের মত, সুতরাং মন্দির যে প্রাচীর অপেক্ষা অনেক অধিক উচ্চ ছিল তাহা সহজেই অনুমিত হয়। একবার চিন্তা করিয়া দেখুন সেই মন্দির কেমন ছিল, যাহার দ্বারের শিরোভাগের অথবা তন্নিম্নের চৌকাঠই ১৯ ফিট ছিল। দ্বারের শিরোদেশের অথবা তন্নিম্নের চৌকাঠ বলিতেছি —কারণ সেই চৌকাঠে নবগ্রহমূর্ত্তি খোদিত ছিল। সুতরাং দর্শকদিগের দেখিবার সুবিধার জন্য এবং সৌন্দর্য্যবোধের সাধারণ অভিজ্ঞতায় দ্বারের শিরোভাগের অথবা তন্নিম্নের চৌকাঠেই নবগ্রহমূর্ত্তি অঙ্কিত করা সম্ভব ও স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়।

ইংরেজীতে একটি বাক্য আছে "A thing of beauty is a joy for ever' যাহা সুন্দর তাহা চিরদিনই চিত্ত-সুখকর। কবি কিটস্‌ও (Keats) কহিয়াছেন—

Beauty is truth, truth beauty
that is all
Ye know on earth, and all ye
need know.

-যাহা সুন্দর তাহাই সত্য, যাহা সত্য তাহাই সুন্দর। ইহাই জগতের শিক্ষা, ইহাই একমাত্র শিক্ষণীয় বিষয়। সত্যং শিবং সুন্দরং। সুতরাং অনিচ্ছাসত্ত্বেও যে মুসলমানগণ পর্যন্ত কোণারকের ভুবনপ্রসিদ্ধ সমৃদ্ধিসম্পন্ন অতিসূক্ষ্ম কারুকার্য্যসমন্বিত বহু অর্থব্যয়ে গঠিত সুশোভন সূর্য্যমন্দিরের প্রশংসা করিবেন তাহাতে আর বিস্ময়ের বিষয় কি? শুধু ইহাই নহে,

climax of Bengal art and wring an unwilling tribute even from the Mohammedans.—Hunter's Orissa, Vol. I, p. 291.

* Until very recent times it would have baffled the power of European founders to forge such massive beams of iron. —W. B. Brown, B. A., I. C. S.

তপনদেব মুসলমাননৃপতির নিকট পূজাও আদায় করিয়াছেন। ভারতসম্রাট আকবর সূর্য্যের মাহাত্ম্য শ্রবণে এতই আকৃষ্ট হইয়াছিলেন যে রাজ্যাভিষেকোৎসবে সূর্য্যের উপাসনা করিয়াছিলেন এবং নরোজার দিনেও সূর্য্যোৎসব করিতে কুণ্ঠিত হইয়াছিলেন না।

তারিখ-ই-বাদাউনি গ্রন্থে লিখিত আছে, পাষণ্ড বীরবল সম্রাটকে বুঝাইতে লাগিল যে সূর্য্য যখন আলোক দান করেন, সূর্য্যের কিরণস্পর্শে সকল শস্য পাকিয়া উঠে, সূর্য্য যখন মানবজাতির জীবনরক্ষক, তখন তাঁহাকে সসম্মানে পূজা করাই উচিত এবং অস্তাচলোন্মুখ সূর্য্যের দিকে মুখ রাখিয়া উপাসনা না করিয়া, উদয়োন্মুখ সূর্য্যের দিকে মুখ রাখাই বিধেয়। রাজসভার বিজ্ঞসভাসদ্‌গণ বীরবলের কথা সমর্থন করিলেন এবং কহিলেন সূর্য্যই পৃথিবীর প্রধান আলোক, তিনিই নরসমাজের কল্যাণকারী, রাজন্যবর্গের বন্ধু, তাঁহার গতি দেখিয়াই নৃপতিগণ কাল ও শাসন সম্বৎ স্থির করিয়া থাকেন। এই কারণেই নৌরোজ জলালির দিনে সূর্য্যের পূজা হইল এবং রাজ্যাভিষেক উৎসবের জন্যও সম্রাট সূর্য্যপূজা করিতে সম্মত হইলেন। তিনি প্রতিদিন গ্রহসম্রাট্ সূর্য্যের বর্ণের অনুরূপ বর্ণে রঞ্জিত বসন পরিধান করিতে আরম্ভ করিলেন এবং সূর্য্যকে প্রসন্ন রাখিবার জন্য দ্বিপ্রহর রজনীতে ও প্রভাতে মন্ত্রাদি পাঠ করিতেন। হিন্দুরাই তাঁহাকে সে সকল মন্ত্র শিক্ষা দিয়াছিল। তাঁহার রাজ্য-গ্রহণের পঞ্চবিংশতি বৎসরে নববর্ষোৎসবের সময় তিনি সর্ব্ব সমক্ষে সূর্য্য এবং অগ্নিকে ভূলুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করিয়াছিলেন। *

কোণারকের সেই সুবিখ্যাত মন্দির যে শুধু প্রাচীন ভারতের ধর্ম্মমতই সূচিত করিতেছে তাহা নহে। ইহার সহিত ভারতের এবং বিশেষভাবে বঙ্গের শিল্প ও রুচির পরিচয়ও প্রদত্ত হইতেছে। সেই শিল্পনৈপুণ্যের জয়গাথা আজিও বিদেশে গীত হইয়া বঙ্গের গৌরব বৃদ্ধি করিতেছে, আমরাই কেবল তাহার খোঁজ রাখিনা। সূর্য্যপূজার ইতিহাস তাই শুধু কোন এক কালের পূজা-

* The accused Birbal tried to pursuade the king, that since the sun gives light to all, and ripens all grains, fruits and products of the earth and supports the life of mankind, that he should be the object of worship and veneration; that the face should be turned towards the rising not towards the setting sun, ...several wise men at court confirmed what he said, by representing that the sun was the chief light of the world, and the benefactor of its inhabitants, that it was a friend to kings, and that kings established periods and was in conformity with its motion. This was the cause of the worship paid to the sun on the Nou-roz Jalali, and of his being induced to adopt that festival for the celebration of his accession to the throne. Every day he used to put on clothes of that particular colour which accords with that of the regent planet of the day. He began also, at mid night and at early dawn, to utter the spells, which the Hindus taught him.........on the new year festival of the 25th year after his accession, he prostrated himself both before the sun and before the fire in public.........
—Elliot's History of India, Vol. V, p. 531

বিধির ইতিহাস নহে, উহা আমাদের সমাজের, শিল্পের, শিক্ষার, বিদ্যার ও রুচির ইতিহাস। কোণারকের তপনমন্দির বাঙ্গলার সে ইতিহাসকে গৌরবোজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে।

(ক্রমশ)

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য।

ভারতীয় ইতিহাসের উপকরণ।

পাণিনির আবির্ভাব-কাল।

শতপথ ব্রাহ্মণের যে কাল শ্রীযুক্ত তিলক, রায় ও দীক্ষিত প্রভৃতি জ্যোতিষ-শাস্ত্রজ্ঞ দেশীয় মনীষী দ্বারা নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহা যদি যুক্তিসঙ্গত ও যথার্থ বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ পাণিনির আবির্ভাবকাল সম্বন্ধেও আমাদিগকে পাশ্চাত্য মত পরিত্যাগ করিতে হয়। অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার প্রথমে কথা-সরিৎসাগরোক্ত একটি কিম্বদন্তীর উপর নির্ভর করিয়া পাণিনিকে খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৪র্থ শতাব্দীর লোক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। তাহার পর অধ্যাপক গোল্ডষ্টুকার নানা প্রমাণ প্রয়োগ সহকারে প্রতিপন্ন করেন যে, পাণিনিকে কিছুতেই বুদ্ধদেবের পরবর্ত্তী বলিয়া নির্দ্দেশ করা চলে না। এখন ম্যাক্সমূলার শাক্যসিংহের নির্ব্বাণকাল ৪৭৭ পূর্ব্ব খ্রীষ্টাব্দ বলিয়া নির্দ্দেশ পূর্ব্বক পাণিনিকে খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৫ম শতাব্দীর শেষভাগে আবির্ভূত বলিয়া স্বীকার করেন। কিন্তু গোল্ডষ্টুকার সে মতের অযৌক্তিকতা উত্তমরূপে প্রতিপন্ন করায় প্রায় সকল পাশ্চাত্য পণ্ডিতই ম্যাক্সমূলারের মত পরিত্যাগ করিয়া গোল্ডষ্টুকারের মতের পক্ষপাতী হন। তদবধি বুদ্ধদেবের জন্মের এক শতাব্দী পূর্ব্বে বা খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৭ম শতাব্দীতে পাণিনির আবির্ভাবকাল স্বীকৃত হইতেছে। ম্যাক্স-মূলর প্রায় ৪০ বৎসর পর্য্যন্ত সে মতের যাথার্থ্য স্বীকার করেন নাই, কিন্তু পরিশেষে তাঁহার মতের আর কেহ পক্ষপাতী থাকিল না দেখিয়া তিনি গোল্ডষ্টুকারের মত স্বীকার করিতে বাধ্য হন।

গোল্ডষ্টুকারের প্রদর্শিত প্রমাণে পাণিনি শাক্যসিংহের পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন, ইহার অধিক আর কিছুই প্রতিপন্ন হয় নাই। তাঁহার যুক্তির দ্বারা পাণিনির আবির্ভাবকালের উত্তর সীমাই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু উহার পূর্ব্বসীমা কোথায়? ডাঃ ভাণ্ডারকর ও ৺রমেশচন্দ্র দত্ত খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৮ম শতাব্দীতে পাণিনির কাল নির্ণয় করিয়াছেন। ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁহাকে খ্রীষ্টপূর্ব্ব দশম, এমন কি, একাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত টানিয়া গিয়াছেন। কারণ, গোল্ডষ্টুকারই দেখাইয়া-ছেন যে, ব্রাহ্মণ আরণ্যকাদি বহুল বেদাংশ পাণিনির সময়ে আর্য্যসমাজে অপরিজ্ঞাত ছিল; পাণিনির পরে সে সকল বেদাংশ রচিত হইয়াছে। গোল্ডষ্টুকারের এই মতও অধিকাংশ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পুরাতত্ত্ববিদের নিকট যুক্তিসঙ্গত বলিয়া গ্রাহ্য হইয়াছে।

এদিকে ম্যাক্সমূলার বৈদিকগ্রন্থসমূহকে যথাসম্ভব আধুনিক বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াও ব্রাহ্মণগ্রন্থসমূহকে খ্রীষ্টপূর্ব ৮০০ হইতে ১০০০ বৎসরের মধ্যে রচিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। মার্টিন হোগ সাহেবের মতে ব্রাহ্মণগ্রন্থসমূহের রচনারম্ভ কাল খ্রীষ্টপূর্ব ১৪শ শতাব্দীতে। তাই মিত্র মহোদয় খ্রীষ্টপূর্ব ১১শ শতাব্দীতেও পাণিনির সময় নির্দ্দেশ করা দোষাবহ বলিয়া মনে করেন নাই।

ফলতঃ পাণিনির আবির্ভাবকালের এক সীমায় যেরূপ শাক্যসিংহ অন্য সীমায় সেই ব্রাহ্মণগ্রন্থ সমূহ অবস্থিত। বিশেষতঃ শতপথ ব্রাহ্মণের যে সময় জ্যোতিষিক গণনার বলে দেশীয় মনীষিগণের দ্বারা নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহার সাহায্যে পাণিনির আবির্ভাবকালের উত্তর সীমা বহু পরিমাণ নিশ্চিত হইতে পারে বলিয়া আমরা মনে করি। কারণ শতপথ ব্রাহ্মণ যে পাণিনির সময়ে বিদ্যমান ছিল না, থাকিলেও পাণিনির নিকট উহা প্রাচীন গ্রন্থ বলিয়া পরিচিত ছিল না, একথা গোল্ডষ্টুকার মহোদয় এক প্রকার নিঃসংশয়েই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তাঁহার এই মত পাশ্চাত্য পণ্ডিত মাত্রেই ও আমাদের দেশীয় পণ্ডিতগণের মধ্যেও প্রায় সকলেই স্বীকার করিয়াছেন। পাণিনি "পুরাণপ্রোক্তেষু ব্রাহ্মণকল্পেষু" (৪।৩।১০৫) এই সূত্র রচনা করিয়া বলিয়াছেন যে, প্রাচীন ঋষিপ্রোক্ত ব্রাহ্মণ ও কল্পগ্রন্থ বুঝাইতে "ণিনিঃ" প্রত্যয় হইয়া থাকে। যেমন ঐতরেয় ও ভল্লুপ্রোক্ত ব্রাহ্মণগ্রন্থকে যথাক্রমে "ঐতরেয়িণঃ" ও "ভাল্লবিনঃ" এবং পিঙ্গপ্রোক্ত কল্পসূত্রকে "পৈঙ্গী" বলা হয়। তাহার পর "অধিকৃত্য কৃতে গ্রন্থে" (৪।৩।১১৬) এই সূত্র দ্বারা আধুনিক গ্রন্থকারদিগের কৃত গ্রন্থ বুঝাইবার জন্য পাণিনি "অণ" প্রত্যয় করিবার উপদেশ দিয়াছেন। এই সূত্র অনুসারে যাজ্ঞবল্ক-কৃত (শতপথ) ব্রাহ্মণকে 'যাজ্ঞবল্কিনঃ' না বলিয়া "যাজ্ঞবল্কানি ব্রাহ্মণানি" বলা হয়। বার্ত্তিককার কাত্যায়ন পাণিনির প্রথমোদ্ধৃত সূত্রের সমালোচনা স্থলে বলিয়াছেন যে, "যাজ্ঞবল্কাদিভ্যঃ প্রতিষেধঃ," অর্থাৎ যাজ্ঞবল্কাদির পক্ষে এ সূত্র খাটিবে না, একথা পাণিনির বলা উচিত ছিল। কারণ, যাজ্ঞবল্কও পুরাতন ব্রাহ্মণ বক্তাদিগের সমসাময়িক ("তুল্যকালত্বাৎ")। এইরূপ সমালোচনা করিয়া কাত্যায়ন স্পষ্টতই পাণিনি সূত্রের ত্রুটি প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু পাণিনি যেরূপ সুনিপুণ ও সতর্ক বৈয়াকরণ ছিলেন, তাহাতে তাঁহার এরূপ ভ্রম সম্ভবপর নহে। এই কারণে গোল্ডষ্টুকার বলেন, পাণিনির সময়ে যাজ্ঞবল্কপ্রোক্ত শতপথ ব্রাহ্মণ প্রচলিত থাকিলে পাণিনি কখনই কাত্যায়ন-নির্দ্দিষ্ট প্রতিষেধ লিপিবদ্ধ করিতে ভুলিতেন না। কাশিকাবৃত্তিকার জয়াদিত্য এই কথা বুঝিয়াই লিখিয়াছেন যে, "যাজ্ঞবল্কাদয়ঃ নহি চিরকালা ইত্যাখ্যানেষু বার্ত্তা।" অর্থাৎ শতপথকার যাজ্ঞবল্ক আধুনিক লোক, পাণিনির মতানুসারে পুরাণ-প্রোক্তা বা প্রাচীন ব্রাহ্মণবক্তা বলিয়া পরিগণিত হইবার অযোগ্য। সিদ্ধান্ত-কৌমুদী প্রণেতা ভট্টোজি দীক্ষিতও সেই মতে সায় দিয়াছেন। এই মতানুসারে যাজ্ঞবল্ক-প্রোক্ত

ব্রাহ্মণ লোকসমাজে প্রচারিত হইবার পূর্ব্বেই পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী সূত্র রচিত হইয়াছিল বলিতে হয়। অধ্যাপক গোল্ডষ্টুকার এই মতের সমর্থন করিতে গিয়া দেখাইয়াছেন যে, পাণিনির সূত্রে "তৈত্তিরীয়" এই পদটি সাধন করিবার প্রণালী বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু বাজসনেয় বা যাজ্ঞবল্ক-পদ সাধনের নিয়ম কথিত হয় নাই। সুতরাং তৈত্তিরীয় সংহিতা পাণিনির নিকট যেমন সুপরিচিত ছিল, বাজসনেয়ী সংহিতা ও শতপথ ব্রাহ্মণ তেমনই তাঁহার সম্পূর্ণ অগোচর ছিল বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। গোল্ডষ্টুকারের এই যুক্তির অসঙ্গতি এ পর্য্যন্ত কেহই প্রদর্শন করিতে পারেন নাই, বোধ হয় কেহ পারিবেনও না। যতদিন এই মতের অযৌক্তিকতা কেহ প্রতিপন্ন করিতে না পারিবেন, ততদিন পাণিনিকে শতপথ-কারের অপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে। এই সিদ্ধান্তানুসারে পাণিনির আবির্ভাব-কাল ন্যূন পক্ষে খ্রীষ্ট পূর্ব্ব ২৪শ শতাব্দী বলিয়া নির্দ্ধারিত হইতেছে।

ম্যাকডোনেল সাহেব পাণিনিকে খ্রীষ্ট পূর্ব্ব ৭ম শতাব্দীর লোক ভাবিয়া শতপথ ব্রাহ্মণকারকে খ্রীষ্ট পূর্ব্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু জ্যোতিষিক প্রমাণে যখন শতপথ ব্রাহ্মণের কাল অন্যূন খ্রীষ্ট পূর্ব্ব ২২শ শতাব্দী বলিয়া নিঃসংশয়ে নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তখন পাণিনীকে আর কিছুতেই তদপেক্ষা পরস্তন বা অর্ব্বাচীন মনে করা সঙ্গত নহে। পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয় স্বপ্রণীত "নিরুক্তালোচনং" নামক গ্রন্থে স্বতন্ত্র যুক্তিপরম্পরার অনুসরণ করিয়া পাণিনিকে খ্রীষ্টপূর্ব্ব ২৩০০ বর্ষের লোক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

ভারত যুদ্ধের সময়।

পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী সূত্রে মহাভারতের ও কুরুপাণ্ডবের উল্লেখ আছে—কুন্তী, বাসুদেব অর্জ্জুন, যুধিষ্ঠির, নকুল, দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা প্রভৃতিরও সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ আছে। (বঙ্কিম বাবুর "কৃষ্ণচরিত্রের ৭ম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) কাজেই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ যে পাণিনির আবির্ভাবের পূর্ব্বে সংঘটিত হইয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ দৃষ্ট হয় না। কিন্তু পাণিনির কত পূর্ব্বে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল? পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা ভারতসমর ও পাণিনির আবির্ভাবকালের মধ্যে সাধারণতঃ চারি শতাব্দীর ব্যবধান স্বীকার করিয়া থাকেন। "বাসুদেবার্জ্জুনাভ্যাং বুন্" (৪।৩।৯৮) এই সূত্রে পাণিনি বাসুদেবের উপাসক ও অর্জ্জুনের উপাসক, এই অর্থে 'বাসুদেবক' ও 'অর্জ্জুনক' পদের প্রয়োগ করিতে উপদেশ

---

* ঐতরেয় ব্রাহ্মণ পাণিনির সময়েও প্রাচীন গ্রন্থ বলিয়া পরিচিত ছিল! এই কারণে তাঁহার ৪।৩।১০৫ সূত্রানুসারে "ঐতরেয়িণঃ" পদ সিদ্ধ হয়। পাণিনি শিলালি ও কৃশাশ্ব প্রণীত নটসূত্রের উল্লেখ (৪।৩।১১০-১১) করিয়াছেন, এদেশের নাট্যকলা কত প্রাচীন, তাহা পাণিনির এই উল্লেখ হইতেই বুঝিতে পারা যায়। মহাভারতে নাটকের যে উল্লেখ আছে, তাহাকে অপ্রাচীন বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না। পাণিনির সময়ে উপনিষৎসমূহ বর্ত্তমান আকারে সংগৃহীত হইয়া আরণ্যক নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে নাই। ইহা পাণিনির "অরণ্যান্ মনুষ্যে" এই সূত্র পাঠে অনুমিত হয়।

দিয়াছেন। ইহাতে বুঝা যায় যে, পাণিনি-সূত্র-প্রণয়নের পূর্ব্বেই কৃষ্ণার্জ্জুন দেবতা বলিয়া পূজিত হইতেন। বঙ্কিম বাবু দেখাইয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণের জীবদ্দশায় তিনি দেবাবতার বলিয়া স্বীকৃত হন নাই। কৃষ্ণার্জ্জুনের দেবত্ব স্বীকৃত হইতে ও তাঁহাদিগের উপাসক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইতে অবশ্যই কিছু দীর্ঘকাল লাগিয়াছিল। সুতরাং ভারতযুদ্ধ ও পাণিনির মধ্যে চারি শতাব্দীর অন্তর স্বীকার করিলে কোনও দোষ হয় না। শতপথ ব্রাহ্মণের প্রমাণানুসারে পাণিনির যে সময় পাওয়া গিয়াছে, তাহার চারি শতাব্দী পূর্ব্বে ভারত-যুদ্ধ ঘটিয়া থাকিলে উহা কলির প্রারম্ভেই ঘটিয়াছিল বলিতে হইবে। সুতরাং ৫ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারত-সংগ্রাম সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া এদেশের লোকের যে ধারণা আছে, তাহা ভিত্তিহীন বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না।

সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্ আর্য্যভট্টের মতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ও কলিযুগারম্ভ কাল সমসাময়িক ঘটনা। আর্য্যভট্টের অপেক্ষাও প্রাচীনতর গ্রন্থকার গর্গ স্বপ্রণীত সংহিতায় পরীক্ষিৎকে কলিযুগের প্রথম রাজা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। খ্রীষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত গ্রীক দূত ম্যাগাস্থিনীসের রচনা হইতেও বুঝা যায় যে, তাঁহার সময়ের পণ্ডিতেরাও কলিযুগারম্ভকাল ও ভারতযুদ্ধকালকে প্রায় অভিন্ন বলিয়া মনে করিতেন। তিনি এদেশীয় পণ্ডিতদিগের নিকট সংবাদ সংগ্রহ করিয়া লিখিয়াছেন, ডায়নিসাস হইতে মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্ত পর্য্যন্ত ১৫৩ জন হিন্দু রাজা এদেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন, এবং ডায়নিসাসের ১৫ পুরুষ পরে হারকুলেশের জন্ম হইয়াছিল * এই নির্দ্দেশ অনুসারে হারকুলেশ ও চন্দ্রগুপ্তের মধ্যে ১৫৩-১৫ = ১৩৮ জন রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন দেখা যাইতেছে। মহাভারতীয় অনুশাসন পর্ব্বের (১৪৭ অঃ) ও হরিবংশের বর্ণনায় দাক্ষায়ণ মনু ও শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে ১৫ পুরুষেরই অন্তর দৃষ্ট হয়। হারকুলেশের যেরূপ বর্ণনা ম্যাগাস্থিনীস করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে হারকুলেশ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিতে হয়। † "ডায়নিসাস" নামটি যে "দাক্ষায়ণ" পদের গ্রীক অপভ্রংশ, শ্রীযুক্ত বালগঙ্গাধর তিলক তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন, ম্যাগাস্থিনীসের কথায় আমরা জানিতে পারি যে, শ্রীকৃষ্ণ ও চন্দ্রগুপ্তের মধ্যে ১৩৮ জন রাজার (পুরুষের) অন্তর ছিল, খ্রীষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীর হিন্দু পণ্ডিতেরা এইরূপ বিশ্বাস করিতেন। দীর্ঘ বংশতালিকার বিচার কালে ঐতিহাসিকেরা সাধারণতঃ প্রতিপুরুষের রাজ্যকাল গড়ে ২০ বৎসর ধরিয়া থাকেন। তদনুসারে গণনা করিলে ১৩৮ পুরুষের রাজ্যকাল ১৩৮ × ২০ = ২৭৬০ বৎসর

* From the time of Dionysos to Sandrakottos, the Indians counted 153 Kings, and a period of 6042 years. But among these a republic was thrice established. The Indians also tell us that Dionysos was earlier than Heracles by 15 generations.—McCrindli's Ancient India, p, 204.

† This Heracles is held in special honour by the Shourseni Indian tribe who passes two large cities, Mothora and Cleisbora. It is further said that he had a numerous progeny (for, like his Theban namesake he married wives—McCrindli's Ancient India, p. 201.

হয়। চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যারোহণ কাল ৩২২ পূর্ব্বখ্রীষ্টাব্দে নির্ণীত হইয়াছে। তাঁহার ২৭৬০ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-কাল ধরিলে আমরা ২৭৬০ + ৩২২ = ৩০৮২ পূর্ব্ব খ্রীষ্টাব্দে উপনীত হই। কলিযুগারম্ভ ৩১০১ পূর্ব্ব খ্রীষ্টাব্দে হইয়াছিল। সেই সময়েই যে ভারত-সমর সংঘটিত হয়, ম্যাগাস্থিনীসের খ্রীষ্ট পূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীর রচনাতেও একথার নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে।

মহাভারতীয় আদিপর্ব্বের ২।১৩, বন-পর্ব্বের ১৪৯।৩৮, ভীষ্ম পর্ব্বের ১০।১৬, শল্য পর্ব্বের ৬০।২২ শ্লোকে, বিষ্ণুপুরাণের ৩।৪।৫৬ (টীকা) ৪।২৪।৩৪-৪০, ৫।২৩।২৫, ৫।৩৮।৮ শ্লোকে, শ্রীমদ্ভাগবতে ১।১৫।৩৬, ১২।২।২৯-৩২, রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের ৬৩ সর্গে, গরুড়পুরাণের ২২৭ অধ্যায়ে, তিথিতত্ত্বধৃত ব্রহ্মপুরাণীয় বচনে, ও শব্দকল্প-দ্রুম-ধৃত ভবিষ্য, ও ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের বচনে কৃষ্ণাবতার ও ভারতীয় যুদ্ধ-ঘটনার সময় দ্বাপরযুগের শেষ ও কলিযুগের প্রারম্ভ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে।

বিষ্ণু (৪।২৩ অঃ—) ভাগবত (৯।২২ অঃ ও ১২।১ অঃ) বায়ু ব্রহ্মাণ্ডে ও মৎস্যপুরাণে জরাসন্ধ-পৌত্র সোমাপি হইতে মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্ত পর্য্যন্ত যে সকল নরপতি মগধের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নামের তালিকা ও রাজ্যকালের সমষ্টি কীর্ত্তিত হইয়াছে। তদনুসারে ভারত-সমর ও চন্দ্রগুপ্তের মধ্যে ন্যূনাধিক ১৫০০ বৎসর অতীত হইয়াছিল, দেখা যায়। ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয় সেই তালিকার নির্ভর করিয়া খ্রীষ্টপূর্ব্ব বিংশ শতাব্দীকে ভারত-সমরের কাল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আরও অনেক দেশীয় পণ্ডিত ঐমতে সায় দিয়াছেন। বিষ্ণু পুরাণাদিতে সপ্তর্ষি-গণের অবস্থানমূলক আর একটি কিম্বদন্তী উদ্ধৃত দেখা যায়। তদনুসারে পরীক্ষিৎ ও নন্দের মধ্যে সহস্র বৎসর মাত্র অন্তর স্বীকার করিতে হয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা ঐ কিম্বদন্তীকে অযথা প্রাধান্য দান করিয়া ভারত-সমরের কাল খ্রীষ্টপূর্ব্ব ১৩শ শতাব্দীর শেষভাগে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু শতপথ ব্রাহ্মণের ও পাণিনির সময়ের প্রতি মনোযোগ করিলে সে মত অশ্রদ্ধেয় বলিয়া পরিত্যাগ করিতে হয়।

পুরাণের বংশতালিকা সম্বন্ধে এস্থলে আর একটি বিষয় বিবেচ্য। পুরাণকারেরা যে বংশতালিকা সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতে জরাসন্ধ হইতে চন্দ্রগুপ্ত পর্য্যন্ত ৩৮ জন মাত্র রাজার নাম পাওয়া যায়। কিন্তু ম্যাগাস্থিনীসের রচনায় আমরা ১৩৮ জন রাজার উল্লেখ পাইতেছি। পুরাণোক্ত ৩৮ জন রাজার রাজ্যকাল কিম্বদন্তী অনুসারে সহস্র ধরিলে, গড়ে প্রতি পুরুষের রাজ্যকাল ২৬॥০ বৎসর; আর বংশতালিকানুসারে ১৫০০ বৎসর ধরিলে, গড়ে ৪০ বৎসর হয়। বর্ত্তমান পুরাণ-গ্রন্থসমূহে যে বংশতালিকা আমরা দেখিতে পাই, তাহা ম্যাগাস্থিনীসের সময় প্রচলিত থাকিলে হিন্দু পণ্ডিতেরা অবশ্যই সে তালিকা ম্যাগাস্থিনীসকে প্রদান করিতেন। সুতরাং অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে, পুরাণে যে বংশতালিকা আমরা দেখিতে পাই তাহা ম্যাগাস্থিনীসের বহু-

কাল পরে সংকলিত হইয়াছিল, এতকাল পরে উহা সংকলিত হইয়াছিল যে, তখন প্রাচীন বংশবৃত্তান্তসমূহ বিস্মৃতির গর্ভে বিলীনপ্রায় হইতেছিল। তাই পৌরাণিক-সংগ্রাহকেরা ম্যাগাস্থিনীসের ন্যায় দীর্ঘ তালিকা সংগ্রহ করিতে পারেন নাই * এই সংগ্রাহকেরা আন্ধ্র ভৃত্যবংশের ধ্বংস-কাল পর্য্যন্ত ঘটনাসমূহ যেরূপভাবে বিবৃত করিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয়, খ্রীষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীর পূর্ব্বে তাঁহারা কখনই আবির্ভূত হন নাই। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় তাঁহাদিগের আবির্ভাবকাল খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ("আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ" পৃঃ ১৯৭) বলা বাহুল্য, ইহা দ্বারা সমগ্র পুরাণের কাল নির্দ্দেশ করা হইতেছে না। পুরাণের যে অংশে ভবিষ্যকথনচ্ছলে বংশতালিকাদি বিবৃত হইয়াছে, সেই অংশেরই রচনার সময় নির্দ্ধারিত হইতেছে। এই প্রসঙ্গে সপ্তর্ষির গতি ও অবস্থিতি লইয়া পুরাণ-কারেরা গোলযোগ ঘটাইয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, পরীক্ষিতের রাজ্যকালে সপ্তর্ষি-মণ্ডল মঘানক্ষত্রে ছিলেন এবং তাঁহারা পূর্ব্বষাঢ়ায় গমন করিলে নন্দের জন্ম হয়। এই কথায় যুধিষ্ঠির ও নন্দের মধ্যে ১১শত বৎসরের ব্যবধান সূচিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে বরাহমিহির বলেন, যুধিষ্ঠিরের রাজ্যকালে সপ্তর্ষিগণ মঘানক্ষত্রে ছিলেন এবং যুধিষ্ঠিরের ২৫২৬ বৎসর পরে শকাব্দ প্রবর্ত্তিত হয়। এইমতে খ্রীষ্টপূর্ব্ব ২৫শ শতাব্দীতে নন্দের ২১শত বৎসর পূর্ব্বে সপ্তর্ষিগণ মঘানক্ষত্রে ছিলেন স্বীকার করা হইয়াছে। এই মতের অনুসরণ করিয়া রাজতরঙ্গিণীকার কহ্লণ পণ্ডিত কলির ৬৫৩ অব্দে কুরুপাণ্ডবদিগের আবির্ভাব নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু বরাহ-মিহিরের অপেক্ষাও প্রাচীনতর গর্গাচার্য্য স্বকৃত সংহিতায় লিখিয়াছেন যে,—

কলিদ্বাপরসন্ধৌতু স্থিতাস্তে পিতৃদেবতম্॥
মুনয়ো ধর্ম্মনিরতাঃ প্রজানাং পালনে রতাঃ।
ভট্টোৎপলধৃতঃ গর্গোক্তি।

অর্থাৎ কলিদ্বাপরের সন্ধিকালে সপ্তর্ষিগণ পিতৃদৈবত মঘানক্ষত্রে বিদ্যমান্ ছিলেন। সপ্তর্ষিগণের এক এক নক্ষত্রে অবস্থানকাল শত বৎসর বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাকে। (এস্থলে বলা আবশ্যক যে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা সপ্তর্ষির গতি স্বীকার করেন না।) সুতরাং কলির প্রথম শতাব্দীতেই ঋষিগণ মঘায় ছিলেন, ইহাই সু-প্রাচীন আচার্য্য গর্গের মত। এই মতে শ্রদ্ধা স্থাপন করিলে যুধিষ্ঠিরাদিকে কলির প্রথম শতাব্দীর বা খ্রীষ্ট পূর্ব্ব ৩১শ শতাব্দীর লোক বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।

শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর

---

* বিগত ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রপতি দ্বিতীয় বাজীরাও আদেশে মহলার রামরাও চিটনীস পুরাণ হইতে যে বংশতালিকা সংকলন করিয়াছিলেন, তাহাতে পরীক্ষিৎ হইতে নন্দ পর্য্যন্ত ৪৪ জন রাজার নাম দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং বিগত শতবর্ষের মধ্যেই ছয় জন রাজার নাম পুরাণের বংশতালিকা হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে দেখিতেছি। ইহা হইতে সন্দেহ হয় যে, হয় ত প্রাচীন পুরাণের বংশতালিকা ম্যাগাস্থিনীসের সংগৃহীত তালিকারই মত দীর্ঘ ছিল; কালক্রমে লিপিকারদিগের অনবধানতায় বহু রাজার নাম তালিকা হইতে পরিত্যক্ত হইয়া থাকিবে। রাজবংশ তালিকা অপেক্ষা পৌরাণিক আখ্যায়িকাংশের প্রতি সেকালের লেখকদিগের সমধিক মনোযোগও স্বাভাবিক ছিল বলিয়া বোধ হয়।

দাদা মশায়।

(নক্সা)

গোবিন্দপুরের 'সরকারী' দাদা মশায়কে নিকটস্থ দশখানি গ্রামের মধ্যে কে না চেনে? তিনি 'বাঙ্গলা বাহাদুর' লোক। আমাদের পিতা ও পিতৃব্যগণ তাঁহাকে 'দাদা মশায়' বলিয়া ডাকিতেন; তাঁহারা একে একে জীবনের খেলা শেষ করিয়া লোকান্তরে প্রস্থান করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের সেই 'দাদা মশায়'—"বয়সে অনাদি লিঙ্গ, জরাসন্ধ বলে" এখন আমাদের 'দাদা মশায়' হইয়া নাতির নাতিদের লইয়া রঙ্গ করিতেছেন! আমাদের ছোট ছোট ছেলে মেয়েরাও তাঁহাকে 'দাদা মশায়' 'দাদা মশায়' বলিয়া অস্থির করিয়া তোলে। দাদা মশায় আমার ছোট কন্যাটিকে বুকে তুলিয়া তাহার মুখচুম্বন করিয়া বলেন, "শালি, আমি তোদের তিন পুরুষের দাদা মশায়—এই খেতাবে আমার মৌরুসী সত্ব জন্মিয়াছে

সুতরাং দাদা মশায়ের বয়সের পরিমাণ নির্ণয় করিবার জন্য বৃথা চেষ্টা করিব না; তবে এই মাত্র বলিতে পারি তাঁহার ন্যায় প্রাচীন আমাদের পল্লী অঞ্চলে আর নাই। আমাদের এই বয়সেই দাঁত নড়িতেছে এবং চসমা না লইলে কেতাবের হরফগুলা পর্য্যন্ত ঝাপ্‌সা দেখায়, কিন্তু দাদা মশায়ের দাঁতগুলি যেন 'গ্রানাইটে' নির্ম্মিত, চসমা না লইয়া তিনি এখনও রামায়ণ মহাভারত অনর্গল পড়িতে পারেন। মস্তকের কেশ, ভ্রূ-জোড়াটি ও গোফগুলি তুষার-শুভ্র। দাদা মশায়ের দাড়ী রাখিবার সখ কোন কালেই ছিল না, তবে শুনিয়াছি যৌবন-কালে তিনি বাবরি রাখিতেন, এখন সে ফ্যাসানটি 'অব্‌সলিট'—একেবারে অচল,তাই দাদা মশায় মাথার চুল হাল ফ্যাসানে কাটিয়া থাকেন, আর সেকালের 'বাবরী'র জন্য আক্ষেপ করেন।

দাদা মশায়ের 'খোরাক' বার্দ্ধক্যবশতঃ আর পূর্ব্বের মত নাই, কিন্তু এখনও তিনি আমাদের চতুর্গুণ আহার করিয়া পরিপাক করিতে পারেন। তিনি প্রায়ই আক্ষেপ করিয়া বলেন "একালে আর খাইতে পারি না, খাইতে পাইও না; এখন মরিলেই বাঁচি।" তথাপি তাঁহার আহার দেখিয়া মনে হয় ভগবান যে আমাদের আহার কমাইয়া দিয়াছেন—সে ভালই করিয়াছেন; তাঁহার মত ক্ষুধা থাকিলে এই দুর্ভিক্ষের যুগে আমাদের সংসার প্রতিপালন করা কঠিন হইত। দাদা মশায় বলেন, যৌবন-কালে তিনি এক কাঠা মুড়ি (প্রায় পাঁচ সের) আর এক সের গুড় খাইয়া জলযোগ করিতেন, তাহার পর মধ্যাহ্নকালে যথারীতি ভোজন করিতেন। এই বৃদ্ধাবস্থায় তিনি কেমন খাইতে পারেন, অল্প দিন পূর্ব্বে তাঁহার গ্রাম-সম্পর্কীয় এক নাতির বিবাহে তাহার পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। দাদা মশায় চল্লিশখানি লুচি ও তাহার উপযুক্ত পরিমাণ

ডাল তরকারী মাছ, মিষ্টান্ন প্রভৃতি উদরস্থ করিয়া আসন ত্যাগ করিবেন, এমন সময় আমাদের এক বন্ধু পরিবেশন উপলক্ষে এক হাঁড়ি রসগোল্লা লইয়া তাঁহার পাতের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, "দাদা মশায়, গোটাকতক রসগোল্লা দিই ?"—দাদা মশায় একবার দুই পাশে ভোক্তাগণের পাতের উপর দৃষ্টিপাত করিলেন, দেখিলেন সকলেরই আহার শেষ হইয়াছে, তিনি বলিলেন, "না থাক, দেখিতেছি সকলেরই আহার শেষ হইয়াছে, এখন উঠিয়া পড়াই ভাল।"—ভোক্তারা তাঁহার কথা শুনিয়া এক বাক্যে বলিল, "সে কি দাদা মশায়, আর দশ মিনিট আপনার জন্য অপেক্ষা করিতে কি আমাদের কষ্ট হইবে ? দাও হে, দাদা মশায়ের পাতে গোটাকত রসগোল্লা দিয়া যাও।"

সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পাতে বিশ পঁচিশটা রসগোল্লা নিপতিত হইল। পরিবেশক বন্ধু বলিলেন, "আর দেব কি ?" দাদা মশায় বলিলেন, "দাঁড়াও দেখি।"—জোড়া-জোড়া রসগোল্লা দাদা মশায়ের মুখ-বিবরে নিক্ষিপ্ত হইয়া উদর-গহ্বরে সমাধি লাভ করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে পাতা খালি ! বন্ধু বলিলেন, "আর কয়টি দিব ?" দাদা মশায় বলিলেন, "হাঁড়িতে আর কতগুলা আছে ?" হাঁড়ীতে তখনও প্রায় তিন চারি সের রসগোল্লা ছিল। পরিবেশক বলিলেন "তা দুই সের সাত পোয়া হইতে পারে।"—দাদা মশায় গম্ভীরভাবে বলিলেন, "তা ও কটা রসগোল্লা আর ক'জনের পাতে দেবে, আমাকেই দিয়ে যাও।"

দাদা মশায়ের আদেশ মাত্র চারি সের রসগোল্লার স্তূপ তাঁহার পাতায় নিপতিত হইল। দাদা মশায় বলিলেন, "এ যে দেখ্‌চি পাঁচ সেরের ধাক্কা ! আজকাল আর বড় খাওয়ার অভ্যাস নাই, তা দেখি জনার্দ্দন কি করেন।"—দশ মিনিটের মধ্যে দাদা মশায় সেই এক হাঁড়ি রসগোল্লা ধ্বংসপুরে প্রেরণ করিলেন।

ইতিমধ্যে কর্ম্মকর্ত্তা কাঁধে গামছা লইয়া ঘর্ম্মাক্ত দেহে যুক্ত করে ব্রাহ্মণমণ্ডলীর মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইলেন, দাদা মশায়ের পাতের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "দাদা মশায়ের পাত যে একেবারে খালি ! ফলারটা বোধ করি তেমন ভাল হয় নাই, আমিও পাঁচ কাজে ব্যস্ত ! দাদা মশায় আর কি চাই ?"

দাদা মশায় তখনও জলপান করেন নাই শেষ রসগোল্লাটি কণ্ঠস্থ করিয়া বলিলেন, "না আর কিছু চাই না, বেশ পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন হইয়াছে।" কৃতি বলিলেন "ক্ষীরটার সকলেই প্রশংসা করিতেছে আপনার আফিংএর ধাত, একটু ক্ষীর আনাই।"—দাদা মশায়কে প্রতিবাদের অবসর না দিয়া তিনি হাঁকিলেন, "রামকান্ত, ও রামকান্ত, খানিকটে ক্ষীর আন ত।"

কর্ত্তার আদেশে রামকান্ত একটি ছোট গামলায় ক্ষীর লইয়া দাদা মশায়ের পাতের কাছে উপস্থিত হইল। দাদা মশায় পুনর্ব্বার ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া বলিলেন তাই ত সকলেরই আহার শেষ হইয়াছে, আবার ক্ষীর খাব ? আফিংএর ধাতে ক্ষীরটা উপকারী বটে !"

কর্ত্তার ইঙ্গিতে রামকান্ত দাদা মশায়ের পাতে ক্ষীর ঢালিতে উদ্যত হইল। দাদা মশায় পাতের উপর হাত নাড়িয়া বলিলেন "আঃ কর কি, কর কি? পাতে কতটুকু ক্ষীর ধরিবে?" কর্ত্তা বলিলেন "তবে একটা গেলাস আনুক।"—দাদা মশায় বলিলেন, "গেলাস এখন আবার কোথায় খুঁজিতে যাইবে? ও গামলাটায় কতখানি ক্ষীর আছে?"

রামকান্ত বলিল, "বড় বেশী নয় দু'ের আড়াই সের হইবে।"

দাদা মশায় ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "বোঝার উপর আর শাকের আটিতে ভয় কি?—আহারটা ত গুরুতরই হইয়াছে. তা দেখি তোমার গামলাটা, আমার পাতের কাছে রাখ।"

রামকান্ত গামলাটি দাদা মশায়ের পাতের কাছে নামাইয়া রাখিল। সকলের কৌতূহল-পূর্ণ দৃষ্টি দাদা মশায়ের মুখের উপর আবদ্ধ। দাদা মশায় দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী দ্বারা একটু ক্ষীর তুলিয়া লইয়া জিবেয় স্পর্শ করিলেন, তাহার পর বলিলেন, "হ্যাঁ, ক্ষীরটার আস্বাদন বেশ ভালই হইয়াছে, শাস্ত্রে বলিয়াছে, উপস্থিত ত্যাগ করিতে নাই, তা দেখি একবার।"—চক্ষুর নিমিষে দাদা মশায় সেই ক্ষীরের গামলা দক্ষিণ হস্তে তুলিয়া মুখে ধরিলেন, কয়েক মিনিটের মধ্যেই সমস্ত ক্ষীর রসগোল্লাগুলির অনুসরণ করিল। শূন্য গামলাটি পাতের কাছে নামাইয়া রাখিয়া গেলাসের জলে গোঁফের ক্ষীর ধুইয়া দাদা মশায় বলিলেন "বয়স বেশী হইয়াছে আর বড় খাইতে পারি না। তা রামচন্দোর তুমি ফলারের আয়োজনটা ভালই করিয়াছ, এ কালে এমন করিয়া বড় বেশী লোক খাওয়াইতে পারে না। আশীর্ব্বাদ করি, তোমার মেয়ে জামাই সুখে থাক। এখন উঠা যাক, আমার আবার একটু অম্বলের ব্যারাম আছে কি না, জলটা মুখ ধুয়েই খাব।"—আহারের পর দাদা মশায় তামাক খাইতে লাগিলেন। অনেকে বলিল "দাদা মশায় বেশ খাইতে পারেন।"

দাদা মশায় বলিলেন "হাঁ, আগে আগে খাইতে পারিতাম বটে, এখন আহার প্রায় নাই।"

আমি আর হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলাম না, বলিলাম তাহা ত দেখিলাম।"

দাদা মশায় হুঁকা নামাইয়া উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, কি দেখ্‌লি রে শালা! আমার খাওয়া তোরা কি দেখ্‌লি? মুনকে রঘু ও আশানন্দ ঢেঁকির সঙ্গে একত্র বসিয়া খাইয়াছি, তা তাঁরা সাক্ষাৎ ঈশ্বর জানিত লোক, তাঁদের সঙ্গে পারিব কেন?—কিন্তু আমিও বড় কম খাই নাই। একটি রুই মাছ একা খাইয়াছি। তখন যৌবন ছিল, শরীরে শক্তি ছিল। এখন সে শক্তিও নাই, সে খোরাকও নাই। আর এখন খাব কি? আমাদের সে কালে এক একটা গরুর আট দশ সের দুধ হইত, এখন দশটা গরু দুইলে ভাঁড় পোরে না। আমরা বার আনায় এক মণ তোফা মিহী চাল্‌ কিনেছি, টাকায় ষোল সের তেল! টাকায় পাঁচ সের ঘি ত বার মাসই পাওয়া যাইত। একটা দুয়ানী খরচ করলে পাঁচ সের একটা রুই মাছ মিলতো! আট আনার মুগ কিনে রাখ্‌লে

সম্বৎসর আর ডালের জন্য ভাব্‌তে হতো না।—আর শাক-সব্জী তরিতরকারী কি কখন পয়সা খরচ করে কিন্‌তে হয়েছে? যদি কখনো 'পুঁড়ো' পাড়ায় বেগুণ কিনতে গিয়েছি ত এক পয়সার বেগুনের সঙ্গে দশ বারটা ফাউ। আর একালে সজনে খাড়া পর্য্যন্ত বাজারে বিক্রয় হয়! শেষটা এ-ও দেখতে হলো? আর বেঁচে সুখ কি?"

দাদা মশায়ের বক্তৃতায় বাধা দিয়া বলিলাম, "দাদা মশায়, আপনারা হচ্ছেন, সত্যযুগের লোক, এ হ'লো কলিকাল; এ কালে জিনিস মাগ্‌গি, পয়সা সস্তা। আপনি পস্তাইলে চলিবে কেন?"

দাদা মশায় বলিলেন, "হাঁ পয়সা সস্তাই বটে। আমাদের আমোলে পাঁচ টাকা বেতনের তহসিলদারী করিয়া যে দোল দুর্গোৎসব করিত, এখন তার নাতি পুতিরা ডেপুটী কালেক্টরী করিয়া মেয়ের বিবাহ দিয়া উঠিতে পারিতেছে না! পয়সা যে সস্তা হইয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ কি? আমার প্রতিবেশী মানুকে গাড়োয়ান গাড়ী বহিয়া দু'পয়সা উপায় করে, তেল হয় ত নুন হয় না, চালে খড় নাই; একদিন দেখি সে বাজার থেকে এক আঁটি সজনে খাড়া কিনে নিয়ে যাচ্ছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম 'হাঁরে বাপু, তুই এমন জোয়ান মরদ, সজনে গাছে উঠে একটা ডাল কাট্‌লেই ত এক ঝুড়ি সজনে খাড়ার জোগাড় হয়।'—মাণিক দন্ত বাহির করিয়া বলিল, 'কি বলেন আজ্ঞা মশাই, গোটাকত সজনে খাড়ার জন্যে কে এখন হনুমানের মত গাছে গাছে চড়ে বেড়ায়? আধ পয়সা ফেলে দিলাম এক আঁটি সজনে খাড়া নিয়ে চল্লাম।' পয়সা সস্তা হয়েছে তাতে আর সন্দেহ কি?—আমরা সেকালে ঘরের পাশে একটু যায়গা করে তামাকের চারা দিতাম, সেই তামাক চিটে গুড় দিয়ে মেখে রাখলে সম্বৎসর চলে যেত; দা কাটা তামাক ঢেঁকিতে কুটে তৈয়েরী করে রাখ্‌লে কত পয়সা 'সাশ্রয়' হয়; আর এখন পঞ্চাশ রকম 'ভ্যাজ্জাল' মিশানো তামাক পয়সায় এক ছটাক সকলেই কিনে খাচ্ছে, তার উপর বিলেত থেকে এসেছেন তামাকের সল্‌তে দেশের পয়সাগুলো বিদেশী বেণেরা দু'হাতে কুড়িয়ে নিয়ে সাগর পারে চালান দিচ্ছে।'

জিজ্ঞাসা করিলাম, "তামাকের সল্‌তে কি, দাদা মশায়?" দাদা মশায় বলিলেন, "তোমরা যাকে 'সিগারেট' বল, সেই অপূর্ব্ব জিনিস! কালে কালে কতই দেখ্‌বো? মুটে-মজুর-গুলো পর্য্যন্ত এক পয়সায় এক জোড়া সিগারেট কিনে হাতে হাতে মোক্ষ-ফল লাভ করচে। পয়সা সস্তা না হলে কি এমন হয়?—আমরা চিরটা কাল চকমকি ঠুকে তামাক খেয়েছি, আর এখন আমার বাড়ীর কৃষাণ গঙ্গাধর পোদ দেশলাই ভিন্ন তামাক খেতে পারেন না, চকমকী ঠুকতে বল্লে বলেন, 'ও বড় ঝকমারি, কোথায় পাথর, কোথায় ঠুকনি, কোথায় সোলা—এত হাঙ্গামা সহ্য করে কে? এ কেমন মজা, খুট্‌ করে দেশলাই জাল, টিকে ধরাও।'—দুঃখের কথা বলিব কি?—আমরা পয়সা দিয়ে কখন টিকে কিনিনি; মাদার কচা এই সকল বাজে কাঠ কেটে শুকিয়ে তাই পুড়িয়ে মানের পাতা চাপা দিয়ে গর্ত্তে ঢেকে

রাখতাম, আগুন নিবে গেলে তাতে চমৎকার কয়লা হতো; সেই কয়লা কলসী বোঝাই করা থাক্‌তো. তুঁষাস আর ভাবতে হতো না; আর এখন ভদ্র চাষা সকলেই কখন টিকেওয়ালা টিকে বেচ্‌তে আসবে—ভেবে হা'করে বসে থাকে, ছয় পয়সা সাত পয়সা এক হাজার টিকে, তা কিনে কি গৃহস্থ লোকের পোষায়? কিন্তু উপায় কি? সস্তা পয়সা—খরচ করা চাই ত!—কেরোসিন তেলে দেশটা উচ্ছন্ন দিলে, আমরা সে কালে মাটীর প্রদীপে দেশী রেড়ীর তেল পুড়াইতাম, একালে প্রদীপ উঠিয়া গিয়াছে—শলতে পাকানো মালক্ষ্মীরা ভুলে গিয়েছেন; এখন ঘরে ঘরে হরিকেন, নানা রকম ল্যাম্প; যারা ল্যাম্প কিন্‌তে না পারে তারা টিনের ডিমিতে কেরোসিন জ্বালে। এই রকম করে দেশটা উচ্ছন্ন যাচ্ছে—আর তোমরা স্বদেশী স্বদেশী করে চেঁচিয়ে মরচো।"

আমি বলিলাম, "দাদা মশায় আপনি যে যুগের কথা বলচেন, সে ছিল অসভ্যযুগ, এখন হচ্ছে সভ্যযুগ, অসভ্যযুগে যা শোভা পেত, সভ্যযুগে কি তা খাপ্‌ খায়?"

দাদা মশায় বলিলেন, "না. তা কি খাপ্‌ খেতে পারে? সেবার কি কাজে মুন্সীগঞ্জে রেলে চেপে পোড়াদা যাচ্ছিলাম; দেখি একদল মুজুর মাথাল মাথায় দিয়ে কাস্তে হাতে ধান কাট্‌তে যাচ্ছে। জিজ্ঞাসা করে জান্‌তে পারলেম তারা আলমডাঙ্গায় নাম্‌বে। মুন্সীগঞ্জ থেকে আলমডাঙ্গা তিন ক্রোশের বেশী নয়, তিন ক্রোশ দূরে ধান কাট্‌তে যাবে, তা রেলে চেপে!—অথচ সে পাঁচটি পয়সা থাক্‌লে তাদের একদিনের খোরাক হয়। কংগ্রেসে বক্তৃতা কল্লে কি দেশের এ দুর্গতি দূর হবে?"

আমি বলিলাম, "দাদা মশায়, আপনারা সে কালে খুব হাঁট্‌তে পারতেন বোধ হয়। আপনার একদমে কতদূর হাঁটিবার অভ্যাস ছিল?"

দাদা মশায় বলিলেন, "সে কথা আর কেন জিজ্ঞাসা কর? গোয়াড়ী কৃষ্ণনগর থেকে আমাদের গোবিন্দপুর পনের ক্রোশ পথ হবে। আমার বাবা সেকালে গোয়াড়ী কৃষ্ণনগরে মোক্তারী করতেন। আমাকে মধ্যে মধ্যে নানা কাজে তাঁর কাছে যেতে হতো তখন রেল হয় নাই, গোরুর গাড়ীর ভাড়া যাতায়াত পাঁচ টাকার কম নয়, কিন্তু কখন যে গরুর গাড়ীতে গোয়াড়ী গিয়াছি তা স্মরণ হয় না। কতবার বেলা এগারটার সময় গোয়াড়ীর বাজারে ইলিশমাছ কিনে নিয়ে হেঁটে সন্ধ্যার সময় বাড়ী এসেছি, রাত্রে ইলিশমাছের ঝোল দিয়ে ভাত খাওয়া গিয়াছে!—একবার জ্যৈষ্ঠ মাসে গোয়াড়ী থেকে বাড়ী আসছি, আট ক্রোশ পথ পাড়ি দিয়ে বৈদ্যনাথতলায় এসে জলপিপাসা লাগ্‌লো, একটা মুদীর দোকানে এক পয়সার মুড়ী মুড়কী কিনে জল খেলাম। বাবা সেই কথা শুনে অগ্নিশর্ম্মা, বল্লেন, 'পনের ক্রোশ রাস্তার মধ্যে আবার মুড়ী মুড়কী কিনে জল খাওয়া!' আর একালে তোমরা শিয়ালদ থেকে বড়বাজারে যেতে হলে খোঁড়া হও, ট্রামে না উঠ্‌লে যেতে পার না!"

দাদা মশায়ের কথা শুনিয়া বলিলাম,

"দাদা মশায় আপনার শ্রীচরণ যুগলে শত শত নমস্কার! আপনার শরীরে এখনও যে রকম বল আছে, দাঁতগুলি যেরকম শক্ত আছে, চক্ষুর যে রকম জ্যোতি আছে, তাতে আপনাকে বুড়ো বলে কার সাধ্য; ভগবানের বিচার নাই, তাই আপনার গোঁফ আর চুল শাদা করে দিয়াছেন। আপনি যদি একটু কলপ ব্যবহার করেন তা হলে বোধ করি আবার যৌবন ফিরে পেতে পারেন।"

দাদা মশায় ললাটে করাঘাত করিয়া বলিলেন, "সে পুরাণো দুঃখের কথা আর তুলো না, সে সকল কথা মনে হলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। সে বড় শোচনীয় কথা।"

আমি বলিলাম, "দাদা মশায়, ব্যাপারটা কি বলুন না। আপনি ত এখন শোক দুঃখের অতীত, নির্ব্বিকার পুরুষ। কলপ সম্বন্ধে আপনার কিছু অভিজ্ঞতা আছে না কি?

দাদা মশায় বলিলেন, "সে ভুলিবার কথা নয়। তখন গিন্নি বেঁচে ছিলেন। তখন আমার বয়স প্রায় ষাঠ, কিন্তু গিন্নি একটু সৌখীন মেয়েমানুষ ছিলেন—তাই তাঁর মন রক্ষা করবার জন্য আমি নীলপেড়ে ধুতি পরতাম, গোঁফে মধ্যে মধ্যে আতর দিতাম। পাকা চুলে তেরি কাট্‌বার অভ্যাসটিও ছাড়্‌তে পারিনি।—গিন্নি এক দিন ঠাট্টা করে বল্লেন, 'পাকা চুলে টেরি কাট্‌তে লজ্জা হয় না?'—যার জন্য চুরী করি সেই বলে চোর!—গিন্নির কথা শুনে বড় রাগ হলো, একবার মনে হলো ফকিরি নিয়ে সংসার ত্যাগ করে যাই, আবার স্থির করলাম, মাথাটি ন্যাড়া করে ধপা পয়সার মত চেহারা বার করি।—আমার ভাবান্তর দেখে আমার ইয়ার গোপী দত্ত বল্লে 'চুলে কলপ দিতে পার? তা হলে আর আক্ষেপ করতে হবে না।'—কলপের কথা পূর্ব্বে শোনা ছিল বটে, কিন্তু সেই অপূর্ব্ব সামগ্রীটি কখন চক্ষে দেখি নাই।—তখন 'বঙ্গবাসী' কাগজ নূতন কলকাতা থেকে বাহির হতে আরম্ভ করেছে, আমাদের জমীদার পরেশ গাঙ্গুলী তার গ্রাহক ছিলেন। পরেশ বাবুর বৈঠকখানায় এক দিন একখানি 'বঙ্গবাসী' দেখে তামাক টান্‌তে টান্‌তে কাগজখানির বিজ্ঞাপন-গুলোর উপর চোখ বুলোতে লাগ্‌লাম। হঠাৎ চুলের কলপের এক বিজ্ঞাপন নজরে পড়ে গেল। পিপাসাতুর পথিক সম্মুখে এক কলসী ঠাণ্ডা জল দেখ্‌লে যেমন সুখী হয়—আমার মনও সেই বিজ্ঞাপন দেখে তেমনই আনন্দে নেচে উঠ্‌লো। বিজ্ঞাপনে পাঠ করা গেল—'সেই কলপ পাক চুলে লাগাইবামাত্র দুই মিনিটের মধ্যে গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিবে।'—সে সময় ভ্যালু-পেয়েবল প্রথায় ডাকে জিনিস আনাইবার উপায় ছিল না; কিন্তু কলপ এক শিশি না আনাইলে চলে না।—ডাক খরচা সমেত অগ্রিম মূল্য পাঠিয়ে দিলাম; যথাকালে কলপের পার্শেল ডাকঘরে উপস্থিত! আমি পার্শেল খুলে দেখি একটি ছোট শিশিতে টিন্‌চার আইডিনের মত একটু তরল পদার্থ, আর একটি ছোট তুলি। উপদেশ লেখা আছে—তুলি শিশিতে ডুবিয়ে গোপে ও চুলে কলপ লাগাতে হয়। আমি আমার কাঁটাল কাঠের হাতবাক্সটির মধ্যে শিশিটি

রেখে দিলাম। স্থির করলাম, ভোল বদ্‌লিয়ে একেবারে গিন্নিকে অবাক্ করে দেব, আগে কোন কথা প্রকাশ করা হবে না। বৈকালে গিন্নি কলসী নিয়ে ঘাটে জল আন্‌তে গিয়াছে, আমি দরজায় খিল দিয়ে, কলপের শিশিটা খুলে তুলিটা বাগিয়ে ধরলাম, আয়নাখানি খুলে ভাব্‌তে লাগলাম—আগে গোঁফই কাল করি!—অনেক চিন্তার পর স্থির করলাম গোঁফের উপর দিয়েই পরীক্ষাটা হয়ে যাক্, মনে কত আশা, কি উল্লাস!—দুই মিনিটের মধ্যে গোঁফ—আমার এই পাকা, শণের মত গোঁফ জোড়াটা পঁচিশ বৎসরের যুবকের গোঁফের আকার ধারণ করবে! আমি তুলিটা কলপে ডুবিয়ে গোঁফে দু পোঁচ লাগালাম, ঠোটেও খানিকটা কলপ লেগে গেল! খানিক পরে গোঁফ একটু কালো হলো বটে, কিন্তু ঠোঁট জ্বালা করতে লাগলো। প্রথমে কুট্‌ কুট্‌, তার পর কট্‌ কট্‌ কি করি! তুলিটা ফেলে 'হা ফুঁ' 'হা ফুঁ' শব্দে সজোরে ফুঁ দিতে লাগলাম। কিন্তু ফুঁ দিয়ে কে কবে সুঁদরী কাঠের আগুন নিবাতে পারে? ক্রমে জ্বালা বাড়্‌তে লাগলো। আঁচল দিয়ে গোঁফ বার কতক মুছে ফেললাম, কিন্তু সে পাকা কলপ, কটা-রঙ্গ মুছলো না, যন্ত্রণাও কমলো না। বিপদের উপর বিপদ্! গিন্নি গা ধুয়ে ভিজে কাপড়ে দরজা ঠেল্‌তে লাগলো। মনে মনে ভাবলাম, 'মা বসুন্ধরা তুমি দ্বিধা হও, আমি তোমার মধ্যে প্রবেশ করি!'—কিন্তু বসুমতী আমার প্রার্থনায় কর্ণপাত করলেন না, গিন্নি দরজা খুলতে না পেরে চেঁচিয়ে গাঁ মাথায় কল্লে, বোধ হয় মনে কল্লে আমি তার অদর্শনে বিরহ-যন্ত্রনায় ঘরের দরজা বন্ধ করে বসে বসে আত্মহত্যা করচি!—আত্মহত্যাই বটে!—কি করি, অগত্যা তাড়াতাড়ি উঠে দরজা খুলে দিলাম। গিন্নি জলের কলসী কাঁকে নিয়ে আমার মুখ দেখেই হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে রইল, গালে হাত দিয়ে বল্লে, 'পোড়াকপালে মিন্‌সের রকম দেখ, গোঁফে লুকিয়ে লুকিয়ে কি লাগানো হয়েছে?' আমি বল্লাম, "গিন্নি তোমার পায়ে পড়ি, চুপ কর, গোঁফ কাল করচি, কিন্তু ঠোটে আরোক লেগে জ্বলে মলাম, একটু বাতাস কর।' সত্যই তখন আমার চোখ দিয়ে জল বেরুচ্ছিল।—সতী লক্ষ্মী আমার দুর্দ্দশা দেখে তাড়াতাড়ি কাপড় ছেড়ে পাখা দিয়ে বাতাস করতে লাগলো। কিন্তু পাখার বাতাসে কি সে জ্বালা জুড়োয়? আমি বল্লাম, 'গিন্নি শীঘ্র জল আন, আমি মুখটা ধুয়ে ফেলি।" জলে জ্বালা দ্বিগুণ বেড়ে উঠলো। আমি আর স্থির হ'তে না পেরে, নিকটে ছিল মুকুজ্যে-দের পুকুর—পুকুরে লাফিয়ে পড়ে গোফ ডুবিয়ে জলের মধ্যে ঘণ্টা দুই বসে থাক্‌লাম। ক্রমে সন্ধ্যা গাঢ় হয়ে এলো, আমার সর্ব্ব শরীর হী হী করে কাঁপ্‌তে লাগলো, কিন্তু ঠোটের জ্বালা আর জুড়োয় না। শেষে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে উঠে এসে কাপড় ছেড়ে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। বিছানায় পড়ে সমস্ত রাত্রি ছট্‌ ফট্‌ করতে হলো। তার উপর গিন্নির সুমিষ্ট সম্ভাষণ, বেদনার উপর যেন বেলেস্তারার প্রলেপ! সকালে উঠে আয়না দিয়ে দেখি ঠোটে ফোস্কা হয়েছে, মুখখানি ভয়ঙ্কর ফুলে উঠেছে!

দুদিন আর ঠোঁট নাড়বার শক্তি রইল না। লোককে মুখদেখানো দায় হয়ে উঠলো। শেষে ক্ষুর দিয়ে সেই বিবর্ণ গোঁফ কামিয়ে ফেলে কোন রকমে রক্ষা পাই। তার পর কলপের কথা মনে হলে আমার হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হতো।"

দাদা মশায় সে কালের লোক, তাঁহার অভিজ্ঞতাও বিচিত্র। তাঁহার গল্প শুনিয়া কেহই হাস্য সম্বরণ করিতে পারে না। তবে সেকালের গল্প অধিকাংশই অতিরিক্ত রঙ্গদার। একালে শিক্ষিত সমাজের রুচি আর পূর্ব্বের ন্যায় নাই, শিক্ষার পরিবর্ত্তনে রুচির বহু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, কিন্তু দাদা মশায়ের রসিকতা স্থূল হইলেও মজলিসে তাহার বিলক্ষণ আদর আছে।

কিন্তু সুখে-দুঃখে, বিপদে-সম্পদে এত আত্মীয়তা, মমতা ও সহানুভূতি এই সভ্যযুগে বড়ই বিরল। সে আন্তরিতা ও সহৃদয়তা কোন্ ঐন্দ্রজালিকের মন্ত্রে উড়িয়া গেল কে বলিবে? তেমন আমোদ-স্পৃহা, তেমন সরল উপহাস্য, পরকে তেমন আপন করিয়া লইবার শক্তি, এ কালে আর কৈ? বালকেরা পর্য্যন্ত এখন অকাল-বিজ্ঞতার ভারে কুব্জ, গল্পে এখন সেকালের মত রস নাই, তেমন করিয়া গল্প বলিবার লোক নাই। দাদা মশায় তাই একদিন দুঃখ করিয়া বলিতেছিলেন "তোমরা খাইতেও জান না, খাওয়াইতেও জান না, হাসিতেও জান না, হাসাইতেও জান না, তোমাদের এ কালের মজলিসের আধুনিক রসিকতার নমুনা দেখিয়া মনে হয় যেন বাইজি খেমটার সুরে গান ধরিয়াছে 'মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত তোমারই'!"

আত্মীয় প্রতিবেশী দূরের কথা, পল্লীবাসী কাহারও গৃহে কোন বিপদ হইয়াছে শুনিলে দাদা মশায় সর্ব্বাগ্রে সেখানে উপস্থিত হন। রোগীর শিয়রে, মৃতের শয্যাপ্রান্তে, শ্মশানে, চিতার সম্মুখে, সর্ব্বত্র দাদা মশায়! বিবাহ-উৎসবের মধ্যে চূর্ণহরিদ্রায় রঞ্জিত গৌরবর্ণ প্রসন্নবদন দাদা মশায়ের সুদীর্ঘ দেহ দেখিতে না পাইলে মনে হইত, বিবাহের অঙ্গহানি হইয়াছে, আবার নদীতীরস্থ শ্মশানে শোকের অশ্রুপ্রবাহ মধ্যে চিতাশয্যায় সংস্থাপিত মৃতদেহের অদূরে প্রিয়-বিরহ-শোকে ম্রিয়মান, অশ্রুসজলনেত্র, সুদীর্ঘ বংশ-দণ্ডধারী দাদা মশায়ের সেই অনাথশরণ মূর্ত্তি না দেখিলে মনে হয় বুঝি এই প্রেতাত্মার সদ্গতি হইবে না! উৎসবে দাদা মশায় ঘোর সংসারী, শ্মশানে তিনি মহাযোগী। সংসারে তাঁহার কোন বন্ধন নাই; কিন্তু গোবিন্দপুর গ্রামখানিকে তিনি সুকোমল স্নেহের বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। যেন তিনি অতীতের বিস্মৃতপ্রায় সমাজের ভগ্নমন্দিরে ঘৃতের প্রদীপ; প্রকৃতির একটি ক্ষুদ্র ফুৎকারে কখন তাহা নির্ব্বাপিত হইবে কে বলিতে পারে? কিন্তু তিনি বর্ত্তমান ও অতীতের সুগভীর ব্যবধানের উপর যে সুবর্ণময় সেতু নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহার অভাবে সেই সেতুর চিহ্নমাত্র বর্ত্তমান রহিবে না।

দাদা মশায় সংসারে একাকী বাস করেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এক দিন তাঁহার সংসার সুখের সংসার ছিল, পুত্র পরিবার ছিল, কিন্তু নানা পক্ষী এক রাত্রির জন্য তাঁহার স্কন্ধে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল;

বিশাল বনস্পতি এখনও সেই খানে দাঁড়াইয়া আছে কিন্তু তাহার চতুর্দ্দিকে এখন শ্মশান—মহাশ্মশান। দাদা মশায় একে একে সকলকেই শ্মশানে রাখিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার ক্ষুদ্রতা বিশ্বব্যাপী উদারতায় পরিণত হইয়াছে, তাহার স্বার্থ ধরণীর ধূলির সহিত মিশিয়া গিয়াছে। এখন গ্রাম-প্রান্তবর্ত্তী রমজান সেখও তাঁহার আত্মীয়। রমজান বৃদ্ধ, নিতান্ত দরিদ্র, কিন্তু সংসারে তাহার অনেকগুলি কুপোষ্য; দরিদ্রের ক্ষুধা অর্থাভাবের আপত্তি শুনিতে অসম্মত,—রমজানের দুঃখের সীমা নাই। একদিন হরিশ্চন্দ্রপুরের মৌলবী সাহেব আসিয়া গোবিন্দপুরে প্রচার করিলেন আর কোন মুসলমান হিন্দুর মজুরী করিবে না, কোন ভিক্ষাজীবী মুসলমান হিন্দুর গৃহে ভিক্ষা লইবে না। মৌলবী সাহেবের পৃষ্ঠ-পোষক জমীদার জোয়াদ্দার সাহেবরা মুসলমান ভিক্ষুকের জন্য নির্দ্দিষ্ট ভিক্ষার বরাদ্দ বাড়াইয়া দিলেন না, অথচ হিন্দুর গৃহে ভিক্ষা বন্ধ করিলেন। রমজানের দুরবস্থা দেখিয়া দাদা মশায় ভিক্ষা করিয়া আনিয়া তাহার পরিবারবর্গের অন্নকষ্ট দূর করিয়াছেন।

দাদা মশায়ের গৃহখানি যেন তপোবনের কুটীর। তাঁহার বৃদ্ধা মাসী মা তাঁহার গৃহের কর্ত্রী, তিনিই সংসারের সকল কর্ম্ম করেন। বুড়ী পিপীলিকা-পূর্ণ দুগ্ধের বাটী রাত্রে দাদা মশায়ের পাতের কাছে দিয়া আসেন। দাদা মশায় এখনও চসমা গ্রহণ করেন নাই। তিনি বলেন, "মাসী মা, দুধে যে একরাশ পিঁপড়ে।" মাসী মা চটিয়া বলেন, "তোর চোক খারাপ হয়েছে, বলি চসমা নে, তা লোকে বুড়ো মনে করবে ভেবে তুই চসমা ছুঁবিনে।—আমার চোখ খুব ভাল আছে—দুধে একটা পিঁপড়েও নেই, তুই খা।"

দাদা মশায় দুবেলা স্নান করেন। শীত গ্রীষ্ম সর্ব্বকালে সন্ধ্যার পর তাঁহাকে নদীতে নামিয়া স্নান করিতে দেখি। এক দিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম "দাদা মশায়, রাত্রে শীত লাগে না? এ পৌষের শীতে যে বুক কাঁপে!"—দাদা মশায় বলিলেন, "বুক কাঁপে সত্য, যে দিন ঐ কাঁপুনী টুকু থামিবে সে দিন আর অহংজ্ঞান থাকিবে না।—অনেক জলশায়ী যোগী আছেন, তাঁহারা দিবারাত্রি আকণ্ঠ জলে মগ্ন হইয়া ভগবানের তপস্যা করেন। সংসার প্রতিপালনের জন্য তোমরা অহরহ যে কঠিন তপস্যা করিতেছ, পৌষের রাত্রে নদীতে ডুব দেওয়া অপেক্ষা কি তাহা সহজ?"—দাদা মশায়ের তর্কের এইরূপ প্রণালী।

একদিন পূর্ণিমার রাত্রে দাদা মশায়কে নদীজলে আবক্ষ নিমগ্ন হইয়া ধ্যান করিতে দেখিয়াছিলাম; বক্ষস্থলে উভয় হস্ত সংস্থাপিত করিয়া তিনি ঊর্দ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া ছিলেন। পূর্ণচন্দ্রের সুবিমল রশ্মিজাল তাঁহার প্রশস্ত ললাট, জলসিক্ত শুভ্র কেশরাশি, তাঁহার ভক্তি-বিহ্বল প্রশান্ত বদনমণ্ডল চুম্বন করিতেছিল, শ্যামলা প্রকৃতি দূরে স্তব্ধভাবে দণ্ডায়মান; আর চন্দ্রকরোজ্জ্বল নদীজল তাঁহার বক্ষ বেষ্টন করিয়া নাচিয়া নাচিয়া দূরে সরিয়া যাইতেছিল। দাদা মশায়ের সেই শান্ত সৌম্য পবিত্র মূর্ত্তি চিরদিন আমার মনে থাকিবে। বুঝিলাম, এই জন্যই গ্রামের লোক দাদা মশায়কে "ব্রহ্মজ্ঞানী" বলে, এবং তিনি রমজানের নোংরা কালো ছেলে-

টাকেও কোলে লইতে ঘৃণা বোধ করেন না, এই জন্যই সকলে বলে, "লোকটা ক্ষ্যাপা নাকি? ওর কোন রকম বাচ বিচার নাই।" এ সকল অভিযোগ শুনিয়া দাদা মশায় একটু হাসেন, সে হাসি শিশুর হাসির মত সরল, সুন্দর, পবিত্র।

নবযুগে দাদা মশায়কে আর কি ফিরিয়া পাইব?

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

বিলাতের কথা।

"মৃত্যুঃ সর্ব্বহরশ্চাহং।"

সকল সময়ে লোকে মৃত্যুর মঙ্গল প্রভাব অনুভব করিতে পারে না। বিষয়-ভোগে চিত্ত এমনি মোহাচ্ছন্ন হইয়া থাকে যে যখন মৃত্যু আসিয়া এ ভোগের ব্যাঘাত জন্মাইয়া দেয়, তখন তাহার মঙ্গল-আলোক চক্ষে প্রতিভাত হয় না। এও যে ভগবানেরই অনন্ত বিশ্বরূপের অন্তর্গত, ইহাও যে তাঁহারই বিভূতি, তিনি যে একই সঙ্গে মৃত্যু ও মৃত্যুঞ্জয়, এ কথা ধারণা করা কঠিন হইয়া উঠে। কিন্তু শোক যেখানে ব্যক্তিগত সম্বন্ধের সীমা ছাড়াইয়া যায়, বিয়োগে যেখানে সাক্ষাৎভাবে বিষয়-ভোগের ব্যাঘাত উৎপন্ন হয় না, যেখানে মৃত ব্যক্তি আমাদের চিন্তার বিষয়ীভূত হইয়াও সর্ব্বদা বা বহুকাল আমাদের সাক্ষাৎ ইন্দ্রিয় সম্বন্ধের অতীতে থাকেন; যাঁহাকে না দেখিয়াও যাঁর কথা আমরা ভাবি, না শুনিয়াও যাঁর উক্তির আমরা আলোচনা করি, যিনি আমাদিগকে চিনেন নাই, কিন্তু আমরা যাঁহাকে চিনিতাম;—সেখানে শোক একটা প্রশান্ত মূর্ত্তি ধারণ করে। রাজা সপ্তম এডওয়ার্ডের পরলোকে ইংরেজ-সমাজের শোক এই প্রশান্ত মূর্ত্তিতেই প্রকাশিত হইয়াছে।

রাজা সপ্তম এড্‌ওয়ার্ড।

রাজা সপ্তম এড্‌ওয়ার্ড জীবনে যোগী ছিলেন না। এ সভ্যতা ও সাধনার মধ্যে যোগসিদ্ধির অবসর নিরতিশয় সংকীর্ণ। কিন্তু তিনি যোগীজনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যু লাভ করিয়াছেন। প্রহরেক কালও তাঁহাকে রোগশয্যায় বাস করিতে হয় নাই। মৃত্যুর দিন মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত তিনি আপনার প্রকোষ্ঠে পাদচারণ করিয়াছেন। অপরাহ্নে তাম্রকূট ও চা পান করিয়াছেন। সন্ধ্যার প্রাক্কাল পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। যে রোগ তাঁহার জীবনলীলা সাঙ্গ করিয়াছে, সে রোগে লোকে এত স্বল্প সময় মধ্যে মৃত্যু-গ্রাসে পতিত হয় না। মৃত্যুর অব্যবহিত কারণ শ্বাসরোধ না হৃদ্‌রোধ, এবিষয়ে রাজবৈদ্যেরা এখনো কোনো প্রকাশ্য মতামত ব্যক্ত করেন নাই। কিন্তু অপরের বিশ্বাস যে রাজা সপ্তম এড্‌ওয়ার্ড সন্ন্যাস-রোগেই দেহত্যাগ করিয়াছেন। সন্ন্যাস যোগীজন বাঞ্ছিত রোগ। এ রোগে সজ্ঞান

মৃত্যু হয়। মরণের এমন আয়াসহীন পন্থা আর নাই। এরূপ মৃত্যুতে মৃতেরই যে কেবল সদ্গতি হয়, তাহা নহে; জীবিতের উপরেও ইহাতে একটা আধ্যাত্মিক প্রভাব বিস্তৃত হইয়া থাকে। রাজার মৃত্যুতে ইংরেজ-সমাজে ইহারই লক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে।

দেশের শোক।

রাজা সপ্তম এড্ওয়ার্ডের পরলোকে ইংরেজ-সমাজ শোকাচ্ছন্ন হইয়াছে। এ শোক অকৃত্রিম। এ শোক কেবল সংবাদ-পত্রের কলেবরেই যে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা নহে; জনমণ্ডলীর চিত্তেও উদ্বেলিত হইয়াছে। এমন এক দিন ছিল, যখন রাজার মৃত্যুতে ইংরেজ-সমাজে এরূপ শোক-ভাব প্রকাশিত হয় নাই। মৃত্যুর বহু দিন পূর্ব্ব হইতেই রাজা তৃতীয় জর্জ্জ মৃতপ্রায় হইয়াছিলেন; তাঁহার মৃত্যুতে জনগণের প্রাণে কোনোই গভীর শোকের বেদনা অনুভূত হয় নাই। রাজ-দরবারের বিধি-ব্যবস্থা আজ যেমন, তখনও সেইরূপই হইয়াছিল, সত্য; কিন্তু লোকে বাহিরে কাল পোষাক পরিধান করিলেও, অন্তরে শোকের অন্ধকারে অভিভূত হয় নাই। রাজা চতুর্থ উইলিয়মের পরলোকে লোকে যেন হাফ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছিল। সে সময়ে বৃদ্ধ রাজার মৃত্যুতে যত না লোকের হৃদয়ে দুঃখ সঞ্চার হইয়াছিল, রাজকুমারী ভিক্টোরিয়ার সিংহাসনারোহণে তাহাদের মনে তদপেক্ষা অনেক প্রবল আশা ও আরামের সঞ্চার হইয়াছিল। "রাজা মৃত হইয়াছেন, রাণী দীর্ঘজীবন লাভ করুন!"—লোকে সে সময়ে এই বলিয়াই কোলাহল করিয়া উঠিয়াছিল। ফলতঃ দশবৎসর পূর্ব্বে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার পরলোকেই, বহু দিন পরে, ইংরেজ-সমাজে রাজলীলা-সংবরণে প্রকৃত শোকের ভাব প্রকাশিত হইয়াছিল। অদ্যকার শোক যেন তদপেক্ষাও গভীর বলিয়া বোধ হয়। ভিক্টোরিয়া সুদীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়া, চরম বার্দ্ধক্যে, উপযুক্ত সময়ে জীবনলীলা সাঙ্গ করেন। মৃত্যুর বহু দিন পূর্ব্ব হইতেই তিনি ইংরেজ-সমাজ হইতে একরূপ সরিয়া পড়িয়াছিলেন। প্রজামণ্ডলীর দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে তাঁহার কোনো রূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল না। এই জন্য তাঁহার অন্তর্দ্ধানে প্রজার ভক্তিই উচ্ছ্বসিত হইয়াছিল, কিন্তু বিয়োগজনিত যে অভাব-বোধ, তাহা প্রকাশিত হয় নাই। রাজা সপ্তম এড্ওয়ার্ড জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ইংরেজ-সমাজের কেন্দ্রস্থলে দণ্ডায়মান ছিলেন। মৃত্যুর পাঁচ ছয় দিন পূর্ব্বে তিনি রঙ্গালয়ে যাইয়া নাট্য-কলার সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন। রয়াল একাডেমির (Royal Academy) বাৎসরিক চিত্র ও ভাস্কর্য্য-প্রদর্শনীতে যাইয়া বৎসরের শ্রেষ্ঠতম চিত্র ও ভাস্কর্য্য-সৃষ্টির আদর্শ সকল পর্য্যবেক্ষণ ও পর্য্যালোচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার রোগসংবাদের সঙ্গে সঙ্গেই, মৃত্যুর স্বল্প ক্ষণ পূর্ব্বে, তাঁহার অশ্বশালার অশ্ব ঘোড়াদৌড়ে বাজি জিতিয়াছে, সংবাদপত্রে এই বার্ত্তা প্রকাশিত হয়। সপ্তম এড্ওয়ার্ড কেবল এ দেশের রাজা ছিলেন না, দশের সুখের ও সখের, আমোদ-প্রমোদের নায়ক ও সহচর ছিলেন। এই জন্য, তাঁহার এই অকস্মাৎ মৃত্যুতে ইংরেজ-সমাজের একটা অতি বৃহৎ স্থান শূন্য হইয়াছে। মৃত্যু

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যে বিশাল ও নিদারুণ শূন্যতা সৃষ্টি করে, তাহা হইতেই আমাদের শোকের উৎপত্তি হয়। যেখানে মৃত্যু এই শূন্যতার সৃষ্টি করে না, সেখানে শোকেরও তীব্রতা বা গভীরতা জন্মে না। রাজ-বিয়োগে ইংরেজ-সমাজে আজ এই বিশাল শূন্যতার সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়াই, ইংরেজের এ শোক সত্য ও গভীর।

শোক-চিহ্ন।

ভিন্ন ভিন্ন দেশে বিভিন্ন আচার-ব্যবহার। এ সকল আচার-ব্যবহারের উৎপত্তি মানব-অন্তঃকরণে ও মানব-সমাজের সাধারণ সম্বন্ধ সকলের মধ্যেই নিহিত থাকে। কিন্তু একই ভাব যেমন ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিতে বিভিন্ন আকারে অভিব্যক্ত হয়, ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যেও সেরূপ হইয়া থাকে। শোকবস্তু সার্ব্বজনীন। মৃত্যু সর্ব্বহর। কিন্তু এই সার্ব্বজনীন শোক অন্তরে সর্ব্বথাই একই ভাবের হইলেও, বাহিরে ভিন্ন ভিন্ন লোকের মধ্যে বিভিন্ন ভাবে প্রকাশিত হয়। এ জন্য এক দেশের বা এক জাতির লোকেরা অপর দেশের বা অপর জাতির লোকেদের শোকের বহিরঙ্গের প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারে না। আমাদের দেশে শোক সংযমের কঠোরতার ভিতর দিয়া প্রকাশিত হয়। শোকের সঙ্গে সংযমের একটা স্বাভাবিক সম্বন্ধও আছে। এ সম্বন্ধ সার্ব্বজনীন। কিন্তু দেশ-কাল-পাত্রভেদে, এ সংযমও বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়া থাকে। আমাদের সংযম আহার-বিহারে—মহাগুরুনিপাতে, হিন্দু ব্রহ্মচর্য্যের কঠোর সাধন অবলম্বন করিয়া থাকে। সে তখন মধু, মাংস, গন্ধ, মালা, রস, স্ত্রী-সম্ভোগ, এ সকল বর্জ্জন করিয়া চলে। এক অশনে, এক বসনে, দিনাতিপাত করে। প্রতি বৎসর মাতৃ-পিতৃ-শ্রাদ্ধ-বাসরে হিন্দুকে এই সংযম অবলম্বন করিয়া চলিতে হয়। এই আমাদের প্রথা। ইংলণ্ডে কিন্তু শোকের ব্যবহার ও ব্যবস্থা অন্যরূপ। এখানে কৃষ্ণবস্ত্রই শোকের নিদর্শন। দৈনন্দিন আহারাদি এখানে বন্ধ হয় না, কেবল সামাজিক ভোজাদি স্থগিত থাকে। নৃত্য-গীতাদি অবশ্য এখানেও প্রতিষিদ্ধ। কিন্তু মহাগুরু-নিপাতেও ব্রহ্মচর্য্য বিহিত হয় বলিয়া কখনো শোনা যায় নাই। এই বিধান ভারতবর্ষের বিশেষত্ব। এদেশে ধর্ম্ম আছেন, কিন্তু ব্রহ্ম নাই; ঈশ্বরভক্তি আছে, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মজিজ্ঞাসা নাই। সুতরাং ব্রহ্মচর্য্যও নাই।

সপ্তম এড্‌ওয়ার্ডের চরিত্র।

পরলোকগত রাজার চরিত্র বিশ্লেষণ করিবার এ সময় নহে। সে ভার ইতিহাসের স্কন্ধে ন্যস্ত রহিয়াছে। ইতিহাস ভবিষ্যতে সে হিসাব নিকাশ করিবে। আর আমাদের এই সঙ্কীর্ণ দোষগুণ আলোচনার মূল্যই বা কতটুকু। আমরা তো কোনো বস্তুকেই পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে পারি না। আমাদের দৃষ্টি আংশিক, আমাদের বিচার এই আংশিক দৃষ্টির উপরে প্রতিষ্ঠিত। সমগ্রকে যদি দেখিতে পাইতাম, সমগ্রকে যদি ধরিতে পারিতাম, সমগ্রকে যদি বুঝিতে ও জানিতে পারিতাম, তবেই কেবল কোন অংশের কি স্থান ও কি মূল্য, যথার্থভাবে ইহা নিরূপণ করিতে সমর্থ হইতাম। তাহা যখন এ মোহাচ্ছন্ন বুদ্ধির দৃষ্টিসীমার অতীতে ও

অন্তরালে রহিয়াছে, তখন আমাদের লোক-চরিত্রের বিচারে অধিকারই বা কি, আর ফলই বা কি? আমরা যাকে মন্দ বলি, তাহার পশ্চাতে কণ্টক-কোষাবৃত কেতকী ফলের ন্যায় কোন্ সুরসাল ফল লুক্কায়িত আছে, কে জানে? আর আমাদের স্থূল দৃষ্টিতে যাহা ভাল বলিয়া বোধ হয়, তারই বা অভ্যন্তরে, মাকাল ফলের অন্তরস্থ কটুকষায় রসের ন্যায়, কোন্ বিষ নিহিত আছে, তাহাই বা কে জানে? জীবনের দু'দিনের ভালমন্দ, সাধুতা ও অসাধুতা, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম এ সকলই "অবিদ্যাবিষয়িনী।" ব্যবহারিক দৃষ্টিতে ইহার মর্য্যাদা আছে, থাকাই উচিত; পারমার্থিক দৃষ্টিতে তো এ সকলই সমান। দুই পাখাতে যেমন পাখী বিশাল সুনীল আকাশে উড়িয়া যায়, জীব ও সদসৎ, ভালমন্দ, মঙ্গলামঙ্গল, এই দুই পাখাতে ভর করিয়াই আনন্দময় অনন্তে বিচরণ করে। ঐ আনন্দেই তার পরিণতি। ঐ অনন্তই তার শেষ সমাধি। আর সে পরিণামের তুলনায়, ব্যবহারিক জীবনের দু'দিনের সংযম ও অসংযম, শান্তি ও অশান্তি; ভাল ও মন্দ, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, সকলই অতি সামান্য ও অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হয়। মৃত্যু সর্ব্বদাই আমাদের চক্ষে সেই অনন্ত, অমৃত ধামের ছবি প্রতিভাসিত করিয়া থাকে। মৃত্যুর কোলে প্রিয়জনকে দর্শন করিয়া আমরা অমৃতত্বের সন্ধান লাভ করি। মৃত্যু আমাদের প্রেম ও অনুকম্পাকে জাগাইয়া মৃতজনের ভালকেই আমাদের চক্ষে উজ্জ্বলতর ও মন্দকে ক্ষীণতর ও নিষ্প্রভ করিয়া থাকে। রাজা সপ্তম এড্ওয়ার্ড, সাধারণ মর্ত্তজনের ন্যায়, ভাল মন্দ উভয়েরই মিশ্রণ ছিল। তিনি সিদ্ধপুরুষ ছিলেন না। ব্রহ্মচারী ছিলেন না। যোগী ছিলেন না। সন্ন্যাসী ছিলেন না। তিনি মানুষ ছিলেন। সতেজ, সজীব, সবল মানুষ ছিলেন। স্বয়ম্ভু তাঁহাকে মানুষ করিয়াই গড়িয়াছিলেন। সবল দেহ-যষ্ঠি, সতেজ ইন্দ্রিয়গ্রাম, দূরদর্শিনী বিষয়-বুদ্ধি, উদার সহানুভূতি। মানুষের এ সকল লক্ষণই এডওয়ার্ডে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। যারা দেবতার মাপে তাঁহাকে ওজন করিতে গিয়াছে তাহারা তাঁহার প্রতি অবিচার করিয়াছে। যারা তাঁহাকে মানুষের চক্ষে, মানুষের মত, দেহীর স্বাভাবিক দোষগুণ-সমন্বিত বলিয়া দেখিয়াছে, তাহারাই তাঁহাকে সত্য দেখিয়াছে। আর রাজা সপ্তম এড্ওয়ার্ড এইরূপ মানুষ ছিলেন বলিয়াই, তাঁহার প্রজামণ্ডলী তাঁহার প্রতি অনুরক্ত ছিল।

জনসাধারণ নিখুঁত চরিত্রের প্রতি ভক্তিমান হইতে পারে, কিন্তু যাঁহারা তাহাদের অনেক উপরে বাস করেন, তাঁহাদিগের প্রতি প্রীতিমান হইতে পারে না। সাম্যেই প্রীতির প্রতিষ্ঠা। ভিক্টোরিয়া ইংরেজ-সমাজের অনেক উপরে বাস করিতেন। তাঁর চরিত্রে ইংরেজের জাতীয় চরিত্র বিশুদ্ধতর ও উন্নততর হইয়াছিল। তাঁহাকে লোকে শ্রদ্ধা করিত, ভক্তি করিত। শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে যতটুকু প্রীতি থাকে, তাহাও ভিক্টোরিয়াকে তাহারা অর্পণ করিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার সঙ্গে প্রজাবর্গের সৌখ্যের সম্বন্ধ কদাপি প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। রাজা সপ্তম এড্ওয়ার্ডের সঙ্গে সে সম্বন্ধ

জন্মিয়াছিল। ইংরেজ যাহা ভালবাসে, সপ্তম এড্ওয়ার্ড তাহা ভাল বাসিতেন। যে যে বিষয়ে জাতির অনুরাগ, সেই সেই বিষয়ে তিনিও অনুরক্ত ছিলেন। ইংরেজ ঘোড়দৌড় ভালবাসে। গ্রীসীয়দের যেমন অলিম্পিক ক্রীড়া ছিল, ইংরেজের সেইরূপ এই ঘোড়দৌড়। ডার্বি, ইপ্‌সম্‌—এ সকল ইংরেজ-জনমণ্ডলীর নিকট, আমাদের কাশী ও প্রয়াগের ন্যায় মহাতীর্থ-ক্ষেত্র। রাজা সপ্তম এড্ওয়ার্ড সর্ব্বদাই এ সকল ঘোড়দৌড়ে উপস্থিত থাকিতেন এবং আপনি দৌড়ের ঘোড়াও এ সকল খেলায় প্রেরণ করিতেন। ডার্বিতে বাজি জেতা, ইংরেজ আভিজাত-বর্গের জীবনের একটা অতি উচ্চ অভিলাষ। লর্ড রোজবেরী সম্বন্ধে এ কথা শোনা যায় যে, তাঁর জীবনের দুইটি লক্ষ্য ছিল; এক ডার্বিতে বাজি জেতা, অপর প্রধান-রাজমন্ত্রিত্বে বৃত হওয়া। ইহার শেষ অভিলাষ তাঁর পূর্ণ হইয়াছে, প্রথম লক্ষ্য সাধনায় তিনি এখনো নিযুক্ত আছেন। রাজা সপ্তম এড্ওয়ার্ড এ বিষয়ে আপনার প্রজাবর্গের সঙ্গে একরূপ একপ্রাণ হইয়াছিলেন। গত বৎসরে ডার্বির বাজি জিতিয়া তিনি অদ্ভুত অভিনন্দন লাভ করেন। প্রবলতম পররাষ্ট্র-পতিকে সমরে পরাজয় করিলেও, প্রজাবর্গ রাজাকে এরূপ ভাবে অভিনন্দিত করিত কি না, সন্দেহ। ঘোড়দৌড়ের পরেই ক্রিকেট ও ফুটবল ইংরেজের অতি প্রিয় বস্তু। সপ্তম এড্ওয়ার্ড এ সকলেরও অতিশয় অনুরাগী ছিলেন। তার পর, ইংরেজ নাচ তামাসা অতিশয় ভাল বাসে। আমাদের যেমন পূজা-পার্ব্বণ, ইংরেজের সেইরূপ নাট্যাভিনয় ও সঙ্গীতাভিনয়-দর্শন। ইংরেজ মাঝে মাঝে উপবাসে থাকিতেও একান্ত নারাজ নহে, যদি এক দু'দিন উপোস থাকিয়া সে সঙ্গীত-আলয়ে বা Music Hallএ যাইবার দক্ষিণা সংগ্রহ করিতে পারে। ছোটবড় সকলেরই এই নাট্য-নেশা অতিশয় বলবতী। সপ্তম এড্ওয়ার্ড এ বিষয়েও প্রজাবর্গের আদর্শ-স্থানীয় ছিলেন। যখন যে রঙ্গমঞ্চে ভাল নাটকের অভিনয় হইয়াছে, রাজা তখনই তাহাতে উপস্থিত হইয়া, অভিনেতা ও অভিনেত্রী, দর্শক ও শ্রোতৃবৃন্দের চিত্তরঞ্জন করিয়াছেন। রঞ্জধাতু হইতে রাজা শব্দের উৎপত্তি, আর ইংরেজ-মনোরঞ্জনে রাজা সপ্তম এড্ওয়ার্ড যে কৃতিত্ব লাভ করিয়াছিলেন, বহু দিন আর কোনো ইংরেজ রাজা সে কৃতিত্ব লাভ করিতে পারেন নাই। এই কারণে ইংরেজ-সমাজে তিনি একটা অতি বিশাল স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে সে স্থান শূন্য হইয়াছে। ইহাই ইংরেজের এ শোকের কারণ। এ শোক কৃত্রিম নহে, সত্য।

রাজা ও নীতি।

অনেকেরই ধারণা যে ইংরেজের রাজা সাক্ষীগোপাল মাত্র। এ ধারণাটা নিতান্তই ভুল। এখানে রাজা স্বেচ্ছামত রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে পারেন না, সত্য। আইন-কানুন প্রবর্ত্তনে তাঁহার কোন হাত নাই। প্রজাপ্রতিনিধিগণ পার্লেমেণ্টে সমবেত হইয়া রাজ্যের বিধি-ব্যবস্থা প্রণয়ন করেন। রাজাকে এই সকল বিধান অবলম্বনে রাজ্য শাসন করিতে হয়। আর সে শাসনভারও সর্ব্বতোভাবে মন্ত্রিসমাজের

উপরে অর্পিত। রাজা ইচ্ছা করিলে কোন আইন অগ্রাহ্য করিতে পারেন, তাঁহার স্বাক্ষর ব্যতীত পার্লেমেণ্টের বিধান রাজ্যে প্রচলিত হইতে পারে না। কিন্তু যদিও আইনতঃ রাজার এ ক্ষমতা এখনো আছে, কার্য্যতঃ বহু দিন হইতে ইহা কখনো কোন বিষয়ে প্রযুক্ত হয় নাই। কিন্তু যদিও রাজকার্য্যে রাজার স্বেচ্ছাচার একরূপ নিঃশেষ নিরস্ত হইয়াছে, তাই বলিয়া যে রাজা একান্ত সাক্ষীগোপাল হইয়া আছেন, এমন মনে করা সঙ্গত হইবে না। আজ পর্য্যন্ত রাজনৈতিক দলাদলি ভিন্ন কুত্রাপি প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। যেথানেই প্রজা প্রতিনিধি-সভার হস্তে রাজ্যশাসন ভার অর্পিত হইয়াছে, সেথানেই পরস্পর প্রতিযোগী রাজনৈতিক দলেরও সৃষ্টি হইয়াছে। ইহাতে কিয়ৎ পরিমাণে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা মন্ত্রিবিশেষের স্বেচ্ছাচারিতা হইতে রক্ষা পাইয়াছে। কিন্তু এই দলাদলিতে লোকচরিত্র উন্নত বা বিশুদ্ধ হইতেছে কি না, এ এখনো বিশেষ সন্দেহের কথা। ফরাসীসে ও মার্কিণে এই দলাদলির প্রভাব অত্যন্ত প্রবল। তার প্রধান কারণ এই যে ফরাসীসে বা মার্কিণে রাজা নাই। রাজ্যের কর্ম্মাধ্যক্ষ বা প্রেসিডেণ্ট এক দিকে রাজকীয় ক্ষমতা পরিচালন করেন; অন্য দিকে তাঁহারা রাষ্ট্রপতি নহেন, কিন্তু দলপতি মাত্র। যথন যে দল দেশে প্রবল হয়, তখন সেই দলের নেতাই প্রেসিডেণ্ট হইয়া থাকেন। ইহার ফলে রাষ্ট্রীয় নীতিতে কিয়ৎ পরিমাণে একটা চঞ্চলতা জন্মিয়া যায়। নীতির যে স্থৈর্য্যের উপরে সচরাচর প্রজার কুশল বহুল পরিমাণে নির্ভর করে, এক্ষেত্রে কিয়ৎ পরিমাণে সে স্থৈর্য্যের ব্যাঘাত উৎপন্ন হয়। কিন্তু ইংলণ্ডের রাষ্ট্রীয় যন্ত্রের শীর্ষস্থানে এক জন স্থায়ী রাজা আছেন বলিয়া, রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে প্রতিযোগী দলের সংগ্রাম ও সংঘর্ষণ সত্ত্বেও, একটা স্থিরতা ও ধীরতা সর্ব্বদাই বিদ্যমান রহিয়াছে। রাজা রক্ষণশীলও নহেন, উদারনৈতিকও নহেন; তিনি পার্লেমেণ্টের বা দেশের কোনো দলাদলির মধ্যে নাই। সকল দলই তাঁহার নীচে; সকল দলকেই কিয়ৎ পরিমাণে তাঁহার মুখাপেক্ষী হইয়া চলিতে হয়। সকল দলের ক্ষমতা ও আধিপত্য, আইনতঃ রাজা হইতেই প্রসূত হয়। সকল দলেরই শেষ শালিশী তাঁর হাতে। এই যে নির্গুণ ও নির্লিপ্ত ভাব, ইহাই ইংরেজ-সিংহাসনের বিশেষত্ব। লোকে এ জন্য এ দেশে নিয়মতন্ত্র-রাজত্বের এত পক্ষপাতী। এই জন্যই ফরাসীস্ বা মার্কিণের একান্ত প্রজাতন্ত্র-প্রণালী অপেক্ষা ইংলণ্ডের নিয়মতন্ত্র-প্রণালীর শ্রেষ্ঠত্ব। রাষ্ট্রীয় দলাদলির প্রকোপ যখন অতিশয় বাড়িয়া উঠে, তখন সকল দলই রাজার আশ্রয়ে ও রাজার বিচারে আপনাদের বিরোধ নিষ্পত্তির আশা করিয়া থাকেন।

পার্লামেণ্টের বিবাদ ও পরলোকগত রাজা।

এই যে বৎসরাধিক কাল হইতে এ দেশে প্রজাপ্রতিনিধি সভা ও আভিজাত সভার মধ্যে গুরুতর বিবাদ বাধিয়াছে, উভয় দলই রাজা সপ্তম এড্ওয়ার্ডের প্রতি এই বিবাদ-নিষ্পত্তির আশায় এত কাল চাহিয়াছিলেন।

এই বিরোধে ইংলণ্ডের রাজশক্তির প্রভাব যে কতটা ও তাহার মূল কোথায়, ইহা বিলক্ষণ দেখা গিয়াছে। কমন্‌স ও লর্ডদিগের এই বিবাদ একমাত্র রাজাই মিটাইতে পারেন। কমন্‌সসভা লর্ড সভার বর্ত্তমান ক্ষমতা সঙ্কুচিত করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। কিন্তু তাঁরা যে বিধান এ বিষয়ে পাশ করিবেন, যতদিন না তাহা লর্ডসভার দ্বারাও পাশ হইয়াছে, ও সর্ব্বশেষে রাজার দ্বারা গৃহীত ও অনুমোদিত হইয়াছে, তত দিন তাহা প্রবল ও কার্য্যকরী হইতে পারে না। লাটেরা আপনাদের স্বত্বলোপের পরওয়ানায় নিজেরা যে স্বেচ্ছায় স্বাক্ষর করিবেন, ইহা অস্বাভাবিক ও অসম্ভব। অথচ যতদিন না এ বিষয়ের একটা মীমাংসা হইতেছে, তত দিন এ দেশে সুচারুরূপে রাজকার্য্য পরিচালনারও কোনো সম্ভাবনা নাই। আর এ মীমাংসা এক রাজাই করিতে পারেন। রাজা সপ্তম এড্‌ওয়ার্ডের উপরে এ জন্য সকলেই এ সময়ে অপেক্ষা করিয়া রহিয়াছিলেন। রাজার ইঙ্গিতে এ দারুণ বিবাদের নিষ্পত্তি হইবে, সকলেরই এই আশা ছিল। কমন্সসভা ও লাটসভার মধ্যে এরূপ বিরোধ এই যে প্রথম ঘটিয়াছে, তাহা নহে। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে রিফর্ম বিল উপলক্ষে এরূপ বিরোধ ঘটিয়াছিল। তখন লাটেরা কিছুতেই ঐ বিধান পাশ করিতে চাহেন নাই। অথচ তাঁরা যতদিন পাশ না করিয়াছেন, ততদিন তাহা কার্য্যেও পরিণত হইতে পারে নাই। এ সঙ্কটে তদানীন্তন মন্ত্রিসমাজ রাজা চতুর্থ উইলিয়মের নিকট উপযুক্তসংখ্যক লাটের সৃষ্টি করিয়া ঐ বিল যাহাতে লাট সভায় পাশ হয়, তার ব্যবস্থা করিবার প্রস্তাব উপস্থিত করেন। এ ভিন্ন সে সমস্যার মীমাংসা করিবার আর উপায়ান্তর ছিল না। রাজা লাটসভার নেতৃবর্গকে এই বিষয় জ্ঞাপন করিলে তাঁহারা অবনত মস্তকে বিল পাশ করেন। সুতরাং রাজাকে নূতন লাটদলের সৃষ্টি করিতেও হয় নাই। এবারেও অনেকে আশা করিয়াছিলেন যে সপ্তম এড্‌ওয়ার্ড এই চাল চালিয়া বর্ত্তমান বিরোধেরও নিষ্পত্তি করিবেন। এ সঙ্কট সময়ে তাঁহার আকস্মিক মৃত্যুতে এখানকার রাষ্ট্রীয় ব্যাপারেও একটা বিষম সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে। রাজা সপ্তম এড্‌ওয়ার্ড এই সঙ্কট কালে রাজলীলা সংবরণ করিয়া তাঁহার রাজত্বের শেষ পার্লেমেণ্টের জীবন কিয়ৎ পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন। সকলেই বলিতেছে—"এ বৎসর আর পার্লেমেণ্ট ভাঙ্গিবে না। নূতন রাজাকে কিছুকাল শান্তি দেওয়া কর্ত্তব্য।"

শ্রী

মেঘের প্রতি।

এতদিন বারিদানে, যারে বাঁচাইলে প্রাণে,
মুহূর্ত্তে অশনি হানি' লবে প্রাণ তার?
হান বজ্র নাহি ভয়, কিন্তু রুদ্রমূর্ত্তি নয়,
নব জলধররূপে করিও সংহার,
তোমার তুমিই লবে কি যাবে আমার?

মৃগ-তৃষা।

(১)

সদাগর আফিসে ৮০৲ আশি টাকা বেতনের চাকরী, ভবিষ্যতে উন্নতির আশাও যে না ছিল তা নয়, এ হেন চাকরীটা মোহিতকুমার এক কথায় ছাড়িয়া দিল। নির্ব্বোধ! আজকালকার বাজারে বি, এ, এম, এ পাশ করে লোকে ৪০।৫০ টাকার চাকরীর জন্য লালায়িত, আর এল, এ-ফেল এই ছোঁড়া এমন সুখের চাকরীটা কি না হেলায় হারাইল! হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিল!—কুবুদ্ধি আর কাকে বলে? শনির দৃষ্টি আর কার নাম? অপমান? তা না হয় একটু সহলেই বা! মোহিতকুমার এখন আর কোথাও মুখ পায় না, আত্মীয় বন্ধু, স্বজন, কুটুম্ব সবাই তাকে এই সব কথা বলিয়া অনুযোগ করেন!

চাকরী ছাড়ার পর মোহিত প্রথম প্রথম মনে করিয়াছিল, মাসখানেক হাওলাত বরাত করিয়া বাসা খরচ চালান তেমন কষ্টকর হইবে না, কলিকাতা সহরে বন্ধু-বান্ধবের অভাব নাই, আত্মীয় কুটুম্বও যথেষ্ট, প্রত্যেকের কাছে দুই তিন টাকা করিয়া কর্জ্জ লইলেও অন্ততঃ তিন মাস অনায়াসে চলিতে পারে, এক মাস ত কোন্ ছার, আর এর মধ্যে একটা উপায়ই বা কোন্ না হবে, তখন আর দেনা-শোধের ভাবনা কি? কিন্তু মানুষ গড়ে, দেবতায় ভাঙ্গে। দু'পাঁচ দিন যাইতে না যাইতেই মোহিতকুমার বুঝিল, আশার অর্দ্ধেক ফল, সে ত কেবল সান্ত্বনার কথা; আসল কাজের বেলায় তার ষোল কড়াই কাণা—তাই মোহিতের বড় আশায় ছাই পড়িল, ভিক্ষা ত মিলিলই না, শেষ "কুত্তার" তাড়নায় অস্থির হইতে হইল! সকলেরই মুখে সেই পুরাতন কথা, মোহিত কি প্রকাণ্ড নির্ব্বোধ, কি বোম্বাই মূর্খ! মোহিত নিজেও এখন আর এ কথা অস্বীকার করে না, কিন্তু তাহা চাকরী ত্যাগের জন্য নহে, অন্যের ভরসায় বুক বাঁধিয়া ছিল, ইহাই তাহার বিরাট মূর্খতা!

(২)

আজ মোহিতকুমার নিতান্তই রিক্তহস্ত! ঘরে চাল নাই, হাতে পয়সা নাই, আবার পাওনাদারদের তাগিদেরও ক্রটী নাই! মোহিত ঘরে বসিয়া মনের দুঃখে শুষ্ক মুখে, শূন্য দৃষ্টিতে আকাশ পাতাল ভাবিতেছে, বাহিরে বাড়ীওয়ালার দ্বারবান ভৈরবরবে ভাড়ার টাকার জন্য হুঙ্কার দিতেছে; মুদি, কাল বাড়ী যাইবে, তার বাকী টাকা আজই চাই বলিয়া দুয়ারে ধন্না দিয়াছে—আর মাহিনা ফেলিয়া রাখিতে পারি না বলিয়া বারান্দায় কাংসবিনিন্দিত কণ্ঠ সপ্তমে চড়াইয়া ঝি ঝঙ্কার তুলিয়াছে। আজ বাগবাজারের সভায় নিমন্ত্রণ আছে, তাই কাপড়ের জন্য মোহিত রজক-বরকে তাগিদ দিয়াছিল। হায়! "উল্টা বুঝিলি রাম" রজক আসিয়াছে বটে, কিন্তু কাপড় আনা দূরে থাক, সে "ন ভূত ন ভবিষ্যতি" মিঠা

মিঠা বাৎ শুনাইতে লাগিল, মোহিতকুমার এই বাক্‌যুদ্ধে সপ্তরথী-পরিবেষ্টিত অস্ত্রহীন অভিমন্যুর দশা প্রাপ্ত হইয়া এ ব্যূহ হইতে "নির্গমের" উপায় করিতে পারিতেছে না; দূরে দাঁড়াইয়া যে একজন সমবেদনায় আকুল ছল ছল দুটী আঁখি দিয়া তাহার সেই কাতর ক্লান্ত মুখের ম্লানশ্রী ব্যথিত হৃদয়ে আঁকিতে ছিল, সে যে দ্রুত পদে পাশের বাটী চলিয়া গেল, অন্যমনস্ক মোহিত তাহাও দেখিতে পাইল না।

সহসা সেই কিশোরী মোহিতকুমারের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া স্নেহাপ্লুতস্বরে বলিল "বেলা হয়েছে, স্নান করবে না?" মোহিত একবার সে কিশোরীর পানে কাতর দৃষ্টিতে চাহিল, পরে বিষাদের ভাঙ্গা হাসি হাসিয়া কহিল "তার পর—অমিয়া?" অমিয়ার মৃদু হাসিতে অমিয় ঝরিল—হাসিমুখে সে-স্বামীর আরও নিকটে দাঁড়াইল—তাঁর কপালের স্বেদবিন্দুগুলি ধীরে ধীরে অতি যত্নে নিজের অঞ্চল দিয়া মুছাইতে মুছাইতে বলিল, "সে ভাবনা ভগবানের; জীব দিয়াছেন যিনি, আহার দিবেন তিনি!" সে কণ্ঠে এত দৃঢ়তা, সে ভঙ্গীতে এত নির্ভরতা ছিল যে মোহিত মুগ্ধ হইয়া সে মুগ্ধার মুখচুম্বন করিল, সে অমিয়-পানে মোহিতের ক্ষুব্ধ হৃদয় সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল, সে তৃষিত চিত্ত শীতল হইল! "এ কি? এ টাকা কোথায় পেলে?" "সে কথা পরে হবে, এখন এদের বিদায় করে দিয়ে স্নানে চল।" "অমিয়া, তোমার কণ্ঠহার কই?"—"এই যে"—বলিয়া অমিয়া মোহিতকে আলিঙ্গনে বাঁধিল! মোহিতকুমার তখন সব ভুলিয়া গেল, তার তখন কেবলই মনে হইতেছিল—

"তুমি লক্ষ্মী সরস্বতী,
আমি ব্রহ্মাণ্ডের পতি,
হোক্ গে এ বসুমতী
যার খুশী তার।"

"অমিয়া, কেন তুমি দেহভরা এ রূপ, হৃদয়-ভরা এ গুণ লইয়া এই দরিদ্রের গৃহে নির্গুণের হাতে পড়িলে!" "খুব হয়েছে, ও সব কাব্য এখন রেখে দাও—বেলা ঢের হয়েছে!" "সত্য অমিয়া কেন তুমি—" কিন্তু মুখের সে কথা মুখেই রহিয়া গেল, অমিয়া মোহিতের মুখ চাপিয়া ধরিয়া বলিল "ছি! ও আবার কি কথা—যাও!" "যাই" বলিয়া মোহিতকুমার উঠিল।

মনের আবেগে অমিয়া আজ এ কি করিয়া ফেলিয়াছে! সে ত স্নান করিয়া অস্নাত, অশুদ্ধ কাহাকেও স্পর্শ করে না! আবার বা তা'কে স্নান করিতে হয়!

(৩)

মোহিতকুমার সপরিবারে কলিকাতায় ভাড়াটিয়া বাটীতে বাস করিত। পরিবার অর্থে আজ কাল যাহা বুঝায় "সপরিবার মোহিত" বলিলে ঠিক সেই অর্থই বুঝিতে হইবে—হালের পরিবারই বলুন বা সে কালের সংসারই বলুন, মোহিতের সবই সেই স্ত্রী-অমিয়া! দেশে অন্য কোন অভিভাবক অভিভাবিকার অভাবে মোহিত অধিকাংশ সময়ই স্ত্রীকে কাছে রাখিত; 'অধিকাংশ' বলিতেছি এই জন্য, কারণ বাকী অংশ অমিয়া কলিকাতার সন্নিকটে পিতৃগৃহে থাকিত। অমিয়ার একান্ত অনুরোধে এবং নিজের

আগ্রহেও বটে, মোহিত তখন প্রতি শনিবারে "সাগর উদ্দেশে যথা ধায় মন্দাকিনী" শ্বশুরগৃহে গমন করিত. বিবাহের দুই বৎসর মধ্যেই মোহিতের পিতামাতার কাল হয়—বৃদ্ধা স্নেহময়ী পিসি, তিনিও সঙ্গে সঙ্গে স্বর্গারোহণ করেন. মোহিতের নিতান্ত আপনার বলিতে সংসারে তখন আর কেহ রহিল না, রহিল কেবল অমিয়া; অমিয়া তাহার শোকে সান্ত্বনা. দুঃখে সঙ্গিনী. বিপদে ভরসা; সে মোহিতের সংসারের অবলম্বন, একাই একশত. তাই অমিয়াকে ছাড়িয়া মোহিত থাকিতে পারিত না; তাই মোহিতকে ফেলিয়া অমিয়া পিতৃগৃহেও বাস করিতে ভাল বাসিত না। দেশে মোহিতের পৈতৃক বিষয়-সম্পত্তি. জমী-জারাত, বাগ-বাগিচা যাহা ছিল. সে সকলের ব্যবস্থার ভার ছিল তার এক জ্ঞাতি কুটুম্বের উপর। তিনি মাঝে মাঝে সেই সম্পত্তির কিছু কিছু মুনফাও মোহিতকে পাঠাইতেন, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর মোহিতকুমার জানিতে পারিলেন. বাকী খাজনার দায়ে সে সম্পত্তি বহু দিন নিলাম হইয়া গিয়াছে. সম্পত্তির ক্রেতা খুড়ার দ্বিতীয় পক্ষের "সম্বন্ধী"। তিনি আবার তার ভগ্নীর—মোহিতের খুড়ার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর—নিকট সে সম্পত্তি দায়ে আবদ্ধ রাখিয়াছেন। মোহিতের খুড়া মোহিতকে বিষয়ের মুনফা বলিয়া যে টাকা পাঠাইতেন, সে সম্বন্ধে চিঠিপত্রে কোন উল্লেখ থাকিত না. কোন বিশ্বস্ত লোকের দ্বারা টাকা-কড়ি মোহিতের নিকট পাঠাইতেন, সুতরাং মোহিতের বিষয় হইতে টাকা পাওয়ার কোন প্রমাণই ছিল না, অতএব সম্পত্তি উদ্ধারের সকল পথই বন্ধ! দেশে তখন সম্পত্তির মধ্যে অবশিষ্ট রহিল বসতবাটী মাত্র. সেটা ছিল লাখরাজ, তাই সহজে খুড়া মহাশয় তাহার কোন কূল-কিনারা করিয়া উঠিতে পারেন নাই; কিন্তু ভগ্ন গৃহের ও পতনোন্মুখ প্রাচীরের ইষ্টকাদি পাছে পাড়ার লোকে চুরী করে, তাই তিনি তাহার কতকাংশের সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন. সেই সকল "ইট" খুড়ার নূতন বাগানবাটীর প্রাচীরে স্থান পাইয়াছিল। ভগ্নপ্রায় বাটী ফেলিয়া রাখিয়া কোন লাভ নাই, কাজেই মোহিতকুমার জলের দামে পৈতৃক ভিটাটুকু বিক্রয় করিয়া নির্ঝঞ্ঝাট হইয়া চাকরী সার করিয়াছিল, তখন বুঝে নাই, এ তালপাতার ছাওয়ায় বেশি দিন মাথা রাখার সুবিধা হইবে না, এ শরতের মেঘ বেশী ক্ষণ ছায়া দিবে না।*

ক্রমশ)

---

* বহুদিন হইতে শ্রীমান্ বঙ্গদর্শন-সম্পাদক কর্তৃক গল্প লিখিতে অনুরুদ্ধ হইয়াছিলাম। এতদিনে সে প্রতিশ্রুত ঋণ হইতে মুক্ত হইলাম। ইহার নামকরণ সম্বন্ধে একটু রহস্য আছে। মানুষের নামকরণ এবং গল্পের নামকরণের মধ্যে একটা প্রভেদ এই যে, জন্মের পর মানুষের এবং রাম না হইতে রামায়ণ'বৎ জন্মের পূর্ব্বেই গল্পের সাধারণতঃ নামকরণ হইয়া থাকে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সে নিয়মের এবং অধিকারের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। গল্প শেষ করিয়া শ্রীমান্ সম্পাদকের উপর নামকরণের ভার ন্যস্ত করিয়াছিলাম। শ্রীমান্ তাহাতে বিশেষ বিচার-শক্তি এবং দূরদর্শিতা দেখাইয়াছেন। কারণ, এই নামকরণে, সম্পাদক নিশ্চয়ই এই গল্পের জন্য নিজের পশ্চাত্তাপের এবং গল্পপিপাসু পাঠকপাঠিকার ভাবী মনস্তাপের আভাষ দিয়াছেন।—শ্রীলেখক।

নির্ব্বাণ সম্বন্ধে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রকৃত মত।*

যদি কোন শব্দ পণ্ডিতদিগের মধ্যে ঘোর বাদবিসম্বাদ উদ্রেক করিয়া থাকে, এমন কি বিবিধ বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের মধ্যেও মতান্তর উপস্থিত করিয়া থাকে,—তবে সে শব্দটি নির্ব্বাণ। এই শব্দটির লক্ষণ নির্দ্দেশ করা অতীব দুরূহ—এমন কি দুঃসাধ্য বলিলেও হয়। আমি এই কঠিন সমস্যাটির সুমীমাংসা করিতে পারিব—এরূপ অভিমান আমার নাই। তবে, কিরূপ অর্থ ব্যাখ্যা করিলে এই সমস্যার মীমাংসা হইতে পারে, আমি শুধু তাহারই একটু ইঙ্গিত করিব মাত্র।

প্রথমতঃ এই শব্দটির ব্যুৎপত্তি কি?—ইহার শব্দার্থ—নিবিয়া যাওয়া। বাতাসে কিংবা দাহ্য বস্তুর অভাবে যেমন আগুন নিবিয়া যায়— ইহা সেই প্রকার "নিবিয়া যাওয়া"। কিন্তু কি নিবিয়া যায়? এস্থলে নির্ব্বাণের বিষয়টা কি? Burnouf এই প্রশ্নটি এই ভাবে উপস্থাপিত করিয়াছেন;—"যখন মানুষ ধ্যান-সমাধিযোগে বাহ্যজগতের সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করিয়া তাহার নিজস্ব শক্তি পুনঃ-প্রাপ্ত হয়,—যে শক্তি তাহার চতুর্দ্দিকস্থ সমস্ত বাহ্য পদার্থের শক্তি হইতে স্বতন্ত্র—তখন মানুষ যে বিরাম লাভ করে সেই বিরামের অবস্থাই কি নির্ব্বাণ? অথবা ইহা কি আরও একটা উচ্চতর অবস্থা—যে অবস্থায় মানুষ, বাহ্য জগৎ ও অন্তর্জগৎ হইতে আপনাকে প্রত্যাহার করিয়া, ইহ জীবনের ঘটনাবলী হইতে, স্বকীয় আপেক্ষিক জীবনের ঘটনাবলী হইতে—আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া, আপনার অন্তরে শুধু একটা বিশ্বসত্তা অনুভব করে,—যে সত্তার মধ্যে বিশ্বের সমস্ত অংশ সন্নিবিষ্ট?

অথবা, নির্ব্বাণ কি মানুষের ব্যক্তি-জীবনের একটা অবস্থামাত্র? এই অবস্থায় কি তাহার পৃথক্ অহংভাব থাকে?—স্বকীয় ক্রিয়াশীলতা থাকে? অথবা ইহা কি সেই বিশ্বসত্তার অবস্থা—যে অবস্থায়, অহংভাবের সহিত অহংভাবের সমস্ত ক্রিয়াশীলতাও বিনষ্ট হওয়ায়, পূর্ণসত্তার সহিত আর কোন পার্থক্য অনুভব করা যায় না,—সেই পূর্ণসত্তা ব্রহ্মই হউন বা বিশ্বপ্রকৃতিই হউন। অথবা, নাস্তিত্ববাদের সিদ্ধান্ত অনুসারে, কি ব্যক্তিসত্তা, কি বিশ্বসত্তা—সর্ব্বপ্রকার সত্তার বিলোপই কি নির্ব্বাণ?"

বুর্নুফ্ বেশ বিশদভাবে প্রশ্নটি উপস্থাপিত করিয়াছেন বটে, কিন্তু ইহার সম্যক্ মীমাংসা করিতে পারেন নাই। ইহা আমরা পরে দেখিতে পাইব।

আপাততঃ, আমি এই সকল প্রশ্নগুলির পুনর্ব্বার আলোচনা করিব, এবং প্রথমতঃ যাহা নির্ব্বাণ নহে তাহারই আলোচনায় আপনাকে আবদ্ধ রাখিব। আদিম-বৌদ্ধধর্ম্মের মতানুসারেই আমি ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিব।

নির্ব্বাণ কি নাস্তিত্ব? দার্শনিক তর্ক-বিতর্কে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে, আমি এইটুকু উল্লেখ করিতে চাই যে,—আমাদের সহজ বুদ্ধিতে নির্ব্বাণ কখনই নাস্তিত্ব হইতে পারে

---

* La-font এর ফরাসী হইতে।

না। বুদ্ধ স্বধর্ম্ম-প্রচারের নিমিত্ত, জনসঙ্ঘকে যদি নিম্নলিখিত উপদেশ দিতেন, তাহা হইলে তাহার ফল কি হইত, একবার কল্পনা করিয়া দেখ :—এই মর্ত্তালোকে রাশি রাশি অশুভ আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে, জীবন দুঃখরাশি বই আর কিছুই নহে, অতএব সর্ব্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকার কর, সংসারের সমস্ত সুখ বিসর্জ্জন কর, তাহার বিনিময়ে পুরস্কার-স্বরূপ তোমরা নাস্তিত্ব লাভ করিবে।—এইরূপ ভাবে উপদেশ দিলে তাঁহার ধর্ম্ম বেশী লোক গ্রহণ করিত কি না, আমার খুবই সন্দেহ হয়।

তা ছাড়া, বুর্ণুফ্ ঠিকই বলিয়াছেন : — "যে দর্শন নাস্তিত্ব প্রচার করে, এবং এইরূপ প্রতিপাদন করে যে, বিশুদ্ধ জ্ঞানের একমাত্র লক্ষ্য, ও কষ্টসাধ্য ধর্ম্মসাধনের একমাত্র পুরস্কার—চরম ও সম্পূর্ণ নাস্তিত্ব-লাভ, সে দর্শন কখনই কোটি কোটি লোকের ধর্ম্মরূপে পরিণত হইতে পারে না, এবং সেই ধর্ম্ম চব্বিশ-শ বৎসর পর্য্যন্ত কখন টিকিয়া থাকিতে পারে না।"

ফলতঃ, নির্ব্বাণের সমস্যা, একটি সমস্যার উপর নির্ভর করিয়া আছে,—সেটি পৃথক্ ব্যক্তিত্বের সমস্যা কিংবা অহং-সত্তার সমস্যা।

কিন্তু বৌদ্ধদিগের মতটি ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে, আমরা, পাশ্চাত্যবাসী এই অহং-সত্তাকে যে ভাবে বুঝি, সে ভাবে বুঝিলে চলিবে না।

পাশ্চাত্যদিগের নিকট, অর্থাৎ খ্রীষ্টানদের নিকট, এই অহং-সত্তা পূর্ণতার সোপান বলিয়া বিবেচিত হয়। পৃথক্ ব্যক্তিত্বের লক্ষণই—অহং-সত্তা; এই অহং-সত্তাটি, অন্যান্য অহং-সত্তা হইতে ভিন্ন ও পৃথক্। St. Thomas-এর মতে,—ঈশ্বরের সাক্ষাৎ দর্শনেই মানুষের ভাবী সুখ উৎপন্ন হয়, সুতরাং মানব-সত্তা ঐশ্বরিক সত্তায় বিলীন হয় না।

কিন্তু প্রাচ্যবাসীদিগের অন্যরূপ ধারণা। বিশ্বব্রহ্মবাদীদিগের মতে, বস্তু বহু নহে—উহা অদ্বিতীয়, এক ও অসীম। তাহা হইতে দাঁড়াইতেছে—আমার আত্মা, এই অদ্বিতীয় এক বস্তুরই ক্ষণিক অভিব্যক্তি মাত্র; অন্যান্য জীবের সহিত তাহার যে সম্বন্ধ—সেই সম্বন্ধ-সূত্রেই তাহার পৃথক্ অহং-সত্তা। কিন্তু অন্যান্য জীবেরও এই একই অবস্থা, উহাদেরও অহং সত্তা আপেক্ষিক। যদি এই সকল সম্বন্ধ অন্তর্হিত হয়, তাহা হইলে কাজে-কাজেই জীবের অহংও সেই সঙ্গে অন্তর্হিত হইবে; এবং অন্তর্হিত হইয়া সেই এক অদ্বিতীয় সত্তার মধ্যে প্রবেশ করিবে,—যাহা হইতে সে উৎপন্ন হইয়াছিল। মৃত্যুর পরেও আমার অহং-সত্তা অন্য হইতে পৃথক্ ভাবে ও স্বতন্ত্রভাবে অবস্থান করিবে,—এই যে পাশ্চাত্যদিগের বিশ্বাস, এই বিশ্বাস সমর্থন করিবার জন্য পাশ্চাত্যগণ কাহার সাক্ষ্য আহ্বান করেন?—আত্ম-চৈতন্যের সাক্ষ্য। কিন্তু আত্ম চৈতন্য কেবল আমাদের আভ্যন্তরিক ব্যাপারসকলই প্রকাশ করে। ইহা যথেষ্ট নহে বলিয়া যদি আত্ম-চৈতন্যের সাক্ষ্যকে প্রাচ্যদিগের ন্যায় আমরা প্রত্যাখ্যান করি, তাহা হইলে, বস্তুর পৃথক্ সত্তাকে যুক্তির মূলে দাঁড় করান অসম্ভব হইয়া পড়ে।

যেহেতু নির্ব্বাণ কিংবা মুক্তির মতবাদটি সমস্ত ব্রাহ্মণিক দর্শন-সম্প্রদায়ের সাধারণ

সামগ্রী, অতএব আত্মা কিংবা অহং সম্বন্ধে বৌদ্ধদিগের কিরূপ ধারণা তাহা নির্দ্দেশ করিবার পূর্ব্বে, প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণিক দর্শন-সম্প্রদায়ের মতটি সংক্ষেপে বিবৃত করিব।

বৈদান্তিক-সম্প্রদায়ের মতে, জীবাত্মা ব্রহ্ম হইতে সমুৎপন্ন—সেই নিত্য সত্য স্বয়ম্ভূ, স্বপ্রকাশ একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম; এবং এই ব্রহ্মতেই বিলীন হইয়া জীবাত্মা মুক্তিলাভ করে।

যোগীদের মতে জীবাত্মা ও পরমাত্মা অভিন্ন; কেননা, জীবসমূহের ক্ষণিক ভেদ-গুলি অপসারিত হইয়া, জীবসমূহ সেই মূল-সত্তারই মধ্যে প্রবেশ করে—যাহা সকল জীবের মধ্যেই অভিন্নভাবে বিদ্যমান।

যোগীদের মতে, যাঁহার মধ্যে সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সমাবিষ্ট, সেই অনাদি অখণ্ড সত্য ব্রহ্মের সাক্ষাৎ দর্শনেই জীবের মুক্তি লাভ হয়; ইহাই জীবাত্মার সহিত পর-মাত্মার যোগসাধন। পাতঞ্জলী সাংখ্য-সম্প্রদায়ের মতে, যেমন জীবের দেহ প্রকৃতির একটা বিশেষ রূপ মাত্র, সেইরূপ জীবাত্মাও পুরুষের একটা বিশেষ রূপ বই আর কিছুই নহে। পুরুষ ও প্রকৃতির সম্মিলনেই জীবের উৎপত্তি। কিন্তু প্রকৃতি, জীবের একটা সূক্ষ্ম অবস্থা মাত্র বিবেচিত হওয়ায়, জগতের একমাত্র উপাদান-বস্তু যে পুরুষ, মৃত্যু হইলে সেই পুরুষের মধ্যেই জীব পুনর্ব্বার প্রবেশ করে। এই পুরুষ ব্রহ্মেরই রূপান্তর কিংবা নামান্তর বলিলেও হয়।

বাকী রহিল বৌদ্ধমত। এখন দেখা যাক, বৌদ্ধেরা আত্মা ও অহং-এর কিরূপ ব্যাখ্যা করে। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বুদ্ধের মতে, অহং জীবের কোন একটা 'উপ' নহে; মন, ইন্দ্রিয় ও পঞ্চভূত লইয়া যে জীবদেহ গঠিত, সেই জীবদেহও অহং নহে। পক্ষান্তরে,'ভব' অর্থাৎ অস্তিত্ব জিনিস্‌টা কি? না, পঞ্চস্কন্ধ বা পঞ্চ উপাধি—যাহা জন্মের হেতু। অস্তিত্ব কাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে? সেই অহংকে আশ্রয় করিয়া থাকে। অতএব দেখা যাইতেছে, শাক্য-সিংহ চিৎসত্তাকে স্বীকার করেন; কেননা, অস্তিত্ব অস্তিত্বকে আশ্রয় করিয়া আছে, এরূপ বলা যায় না।

পূর্ব্বেই জানা গিয়াছে যে, জগতের বাস্ত-বতা সম্বন্ধে আমাদের যে মিথ্যা বিশ্বাস—কেবল তাহা হইতেই এই ভব বা অস্তিত্বের উদ্ভব; সুতরাং যাহা নিত্যকাল বিদ্যমান, সেই চিৎসত্তার বাহিরে আর সমস্তই শূন্য। অতএব দেখা যাইতেছে, বৌদ্ধগণ মানুষের মধ্যে এমন একটি চিৎসত্তা, এমন একটি প্রাণ, এমন একটি আত্মা স্বীকার করে—যাহা সংসারচক্রে নিয়ত ভ্রাম্যমান হই-তেছে এই আত্মাপুরুষই অমর ও দেহ হইতে স্বতন্ত্র। কেননা, দুইটার মধ্যে একটা না হইয়া যায় না; হয়—এই আত্মা, কোন বস্তুর একটা ক্ষণিক বিকার মাত্র (এবং যদি ক্ষণিক বিকার মাত্র হয়, তবে তাহার যোনিভ্রমণ হইতে পারে না, কেননা, যে দেহের সহিত সংযুক্ত, সেই দেহের সঙ্গেই আত্মার জন্মমৃত্যুর সম্বন্ধ); নয়—উহা একটা পৃথক বস্তু, উহার সত্তা স্বকীয় দেহ হইতে স্বতন্ত্র; সুতরাং উহা দেহ

হইতে দেহান্তরে প্রবেশ করিতে সমর্থ। যোনি ভ্রমণকালে এমন একটা মুহূর্ত্ত আইসে, যখন আত্মা স্বকীয় পরিত্যক্ত দেহের মধ্যেও অবস্থিতি করে না, অপর দেহের মধ্যেও প্রবিষ্ট হয় না। সুতরাং পুরুষ অর্থাৎ চিৎসত্তা তখন প্রকৃতি হইতে পৃথক্‌ভাবে অবস্থিতি করিতে বাধ্য হয়।

সর্ব্বশেষে আমরা যেন ভুলিয়া না যাই, বুর্ণুফের মতে, শাক্যমুনি সাংখ্য-দর্শনের মতানুযায়ী আত্মার নিত্যতা, স্বতন্ত্রতা ও বহুত্ব স্বীকার করিতেন।

এ কথা এতদূর সত্য যে, প্রজ্ঞাপারমিতার ন্যায় বৌদ্ধ-মতবাদের সর্ব্বোচ্চ গ্রন্থাদিতেও এমন একটি চিৎশক্তি, এমন একটি আত্মা, এমন একটি অহং-এর উল্লেখ আছে,—যাহা সত্যকে না জানিতেও পারে, জানিতেও পারে। কার্য্য-কারণ-বাদ স্বীকার করিলে, একজন বুদ্ধিবিশিষ্ট বিষয়ীকেও স্বীকার করিতে হয়, কেননা, বিষয় সম্বন্ধে সেই বিষয়ীর অজ্ঞান কিংবা ভ্রম উৎপন্ন হইতে পারে।

অতএব বৌদ্ধদিগের মতে, অহং কিংবা ব্যক্তি-সত্তাই সেই নিত্য আত্মা, সেই চিৎ-শক্তি। এ সমস্ত যদি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে নির্ব্বাণ কখনই নাস্তিত্ব হইতে পারে না; কারণ, যাহা নিত্য তাহার কখনই ধ্বংস হয় না। (ক্রমশঃ)

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অভিমান।

হাসির তুফান তুলে দিতে পারে সে,
    ফোটায় হৃদে কুসুম শত শত;
নেমে আসে অশ্রু বৃষ্টি ধারে সে,
    গর্জ্জে কভু বজ্রধ্বনির মত;
রবির আলো মেঘের অঙ্গে খেলায়ে,
    মেঘের কোলে ইন্দ্রধনু সাজায়;
অসি খান শমীবৃক্ষে হেলায়ে,
    উদাস প্রাণে মুরলিটি বাজায়।

আরত কৈ সে মুরলিটি বাজে না,
  —এমনই কি, কিসের দুঃখ হেন!
আর ত সন্ধ্যা তেমন করে' সাজে না,
  —তাহার সে দোষ, আমার দুঃখ কেন!
আমারে সে কৈ ত ভাল বাসে না,
    আমার উপর কিসের তাহার দাবী!
সে যে—কৈ ত আমার জন্য আসে না,
    আমি কেন তাহার কথা ভাবি!

-না না তবু বহুদিনের বাসনা,
    বহুদিনের স্মৃতি জেগে আছে।
ওগো তুমি কেন আমার, আস না?
    এসো তুমি এসো আমার কাছে।
বড় রোষে বড় অভিমানে গো
    হয়েছে এ ক্ষণিক ছাড়াছাড়,
সকল ব্যথা গলে' গেছে প্রাণে গো,
    এসো আমার—এসো তোমার—বাড়ি।

হাসির তুফান আবার দাওগো উঠায়ে,
    অশ্রুজলে ভাসিয়ে দাওগো, গুণী।
আবার কুসুম প্রাণে দাওগো ফুটায়ে—
    আবার তোমার গভীর ধ্বনি শুনি।
অরুণ বর্ণ মেঘের সঙ্গে মিশায়ে
    খেলাও আবার ইন্দ্রধনু হাসি;
ছেদি' আমার গভীর অমানিশা এ,
    এসো আবার, বাজাও তোমার বাঁশি।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

অনাত্মজ্ঞতা

আমরা ধর্ম্ম লইয়া শাস্ত্র লইয়া, উপাসনা লইয়া অনেক সময়ে বিচারসমরে প্রবৃত্ত হইয়া থাকি। উত্তম হউক, অধম হউক, নিরর্গল ধারায় সেই সময়ে আমাদের বদনবিবর হইতে যুক্তিপ্রবাহ বহির্গত হইতে থাকে। আমরা যে ধর্ম্ম লইয়া বা যে শাস্ত্র লইয়া বিচার করি, অনেক সময়েই তাহার নামমাত্র বা দুইচারিটি কথামাত্র ভিন্ন আর কিছু আমাদের জানা থাকে না। কিন্তু এমন আমরা তার্কিক, বা তর্ককুশল বা তর্করসিক যে, আমাদিগকে তর্ক করিতেই হইবে। বি-এ, বা এম্-এ-ডিগ্রী পাইলেই, বা স্মৃতি-তীর্থ-ন্যায়তীর্থ হইলেই তোমাকে বুঝিয়া লইতে হইবে যে, আমি সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী ও সর্ব্বধর্ম্মের রহস্যবিৎ হইয়াছি

তোমার ধর্ম্ম আমার ধর্ম্ম অপেক্ষা নিকৃষ্ট, কেননা, তাহা তোমার ধর্ম্ম। তোমার আচার অসদাচার, কারণ তাহা তোমার। আমি হিন্দু, তুমি ব্রাহ্ম; আমায় তোমায় নিন্দা করিতে হইবে, পক্ষান্তরে তুমি যত দূর পার নখাগ্র হইতে কেশাগ্র পর্য্যন্ত আমার যাহা কিছু আছে, তাহার সপিণ্ডীকরণ না করিয়া তুমি জলগ্রহণ করিবে না।

ধর্ম্মের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার সময় আমরা ব্যক্তিবিশেষের আচারের দিকেই সমস্ত দৃষ্টি প্রদান করিয়া থাকি। তথা-কথিত ধর্ম্মের ইতিহাসের গোটাকত উপর-উপর ভাসা-ভাসা কথা জানিয়াই আমরা মনে করি যে সেই ধর্ম্মকে আমরা সম্পূর্ণ জানিয়া বুঝিয়া ফেলিয়াছি। অধিকতর আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আমরা যে ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া চলিতেছি বলিয়া প্রকাশ করিয়া থাকি, যাহার গুণ-গরিমার কথা সহস্র বদনে প্রচার করিয়া থাকি, সর্ব্ব ধর্ম্মের মধ্যে যাহার আসন চরম উচ্চে স্থাপন করি, তাহাকেও আমরা ভাল করিয়া বুঝি না।

সর্ব্বাপেক্ষা ইহাই আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হয় যে, যে কখন দ্রাক্ষারস আস্বাদন করিয়া দেখে নাই, সেও তর্ক করিতে কিঞ্চিন্মাত্রও পরাঙ্মুখ হইবে না যে, দ্রাক্ষারসই অধিকতর মধুর, না মধুই অধিকতর মধুর।

জগতে এ পর্য্যন্ত কোনো ধর্ম্ম আবিষ্কৃত বা আবির্ভূত হয় নাই, হইবে না, এবং হইতে পারেও না যে, সেই ধর্ম্মাবলম্বী সমস্ত লোকই সত্য সত্য তাহার রহস্য বুঝিয়া, তাহার যথোচিত অনুষ্ঠান করিয়া পরম মঙ্গল লাভ করিতে পারিয়াছেন, বা পারিবেন। অধিকাংশই নামে মাত্র সেই সেই ধর্ম্ম অবলম্বন করেন ও দল বাড়াইয়া থাকেন। যথার্থ তত্ত্বজ্ঞ নিতান্ত বিরল। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

"মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ॥"

আবার

"বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ

অতএব যাঁহারা সাধারণকে দেখিয়া কোন ধর্ম্মের যুক্তাযুক্তত্ব বা দোষ-গুণ নির্দ্ধারণ করেন, তাঁহাদের সে নির্দ্ধারণ নির্দ্ধারণই নহে। 'সুদুর্লভ মহাত্মাকে' দেখিয়া

যদি নির্দ্ধারণ করা যায়, তবেই তাহা যথার্থ হইবে। সাধারণ লোকে মুখে বলে আমি অমুক ধর্ম্ম মানিয়া চলি, কিন্তু হৃদয়ে সে তাহা সত্য মানে না, কার্য্যে সে তদনুরূপ চলে না; কেবল মানি বলিয়া মনে তাহার একটা অস্পষ্ট ছায়া থাকে। আমরা মুখে বলিয়া থাকি, ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ ও পরম কারুণিক, কিন্তু সত্য সত্য তাহাতে আমাদের যথোচিত বিশ্বাস নাই। সাধারণ আনুষঙ্গিক বাক্যের ন্যায় কথাপ্রসঙ্গে ঐ কথাটাও আমরা বলিয়া থাকি মাত্র। অতএব আমাদের আচার-ব্যবহার দেখিয়া যদি কেহ ঈশ্বরাশ্রিত ধর্ম্মের সমালোচনা করিতে যায়, তবে তাহা ব্যর্থ হইবে, ইহা বলা বাহুল্য।

কোন ধর্ম্মকে যথার্থরূপে বুঝিতে হইলে তিন প্রকারে বুঝিতে পারা যায়; প্রথম, যথার্থ ধার্ম্মিক পুরুষের সবিশেষ দর্শন; দ্বিতীয়, প্রামাণিক শিষ্টজন-পরিগৃহীত ধর্ম্মশাস্ত্রের অপক্ষপাত হৃদয়ে বিচারপূর্ব্বক অধ্যয়ন; এবং তৃতীয়, সেই ধর্ম্ম যাহা বলিতেছে, স্বয়ং তাহার অনুষ্ঠান করিয়া দেখা।

কিন্তু আমরা যখন কোন ধর্ম্মের বিচারে প্রবৃত্ত হই তখন ধর্ম্মতত্বজ্ঞানের এই ত্রিবিধ সাধনের কোনটিই থাকে না, থাকে শুদ্ধ নিজ নিজ ধর্ম্ম, বা মত, বা বিশ্বাসের সংস্কার। ইহাদের ধারায় যাহা কিছু নিজ হইতে অতি-রিক্ত আসিয়া পড়িবে, তাহাই শত খণ্ডিত হইবে।

আবার বিচিত্রতর এই যে, স্বয়ং এক পক্ষ বিদ্বেষযুক্ত, পক্ষপাতযুক্ত ও সংস্কার-বিশেষ যুক্ত হইয়া অন্যকে ঐ কথাগুলি দ্বারাই অভিনন্দিত করিতে বিরত হইবেন না। "তথাচ লৌকিকানাম্ আভাণকঃ—সূচিকে ভগিনি, সচ্ছিদ্রাসি ত্বম্ ইতি চালনী বদতীতি!"

ইহা আবার আরও অদ্ভুত যে, আমাদের কোন নিশ্চয় নাই; আজ এক, আবার কালই আর এক বলিতে আমরা সঙ্কুচিত হই না। কিন্তু তথাপি প্রচার করা চাই, উপদেশকের আসনে বসা চাই; এই সব করিতে করিতে আমাদের বিবেচনাশক্তি এতদূর তিরোহিত হইয়া যায় যে, প্রতিদিন ভ্রান্ত, বা সন্দিগ্ধ, বা অনিশ্চিত কথা প্রচার করার দায়িত্ববোধও আর কখনো চিত্তে উদিত হয় না।

আমরা যাহা বলিব, কাজে তাহা করিব না। ধর্ম্মের কথা বলিব, যে শাস্ত্রে সে ধর্ম্ম প্রতিপাদিত হইয়াছে কথায় কথায় তাহার বচন ঝাড়িব, অথচ সেই ধর্ম্মলাভ যাহা দ্বারা হইবে, যে সাধন-ভজন, তপস্যা ও ব্রহ্মচর্য্য করিতে হইবে, আমরা তাহার কাছেও যাইব না। কোন্ বৈজ্ঞানিক উপায়ে ধর্ম্মলাভ, ঈশ্বরলাভ হয় কি না, কোনো বিজ্ঞানাচার্য্য মহাশয় এদিকে দৃষ্টিপাত করিলে মন্দ হয় না; বাজারে যন্ত্রটা যেন শস্তা হয় এ বিষয় লক্ষ্য রাখিতে হইবে!

আমরা এইরূপই অধঃপাতে গিয়াছি। স্বয়ং অন্ধ থাকিয়া অন্যকে আমরা পথ দেখাইয়া দিতে যাইতেছি। ঋষিগণ এই জন্যই বলিয়াছেন—

"অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ
স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ।
দন্দ্রম্যমাণাঃ পরিযন্তি মূঢ়া
অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ॥

যাঁহারা অবিদ্যার মধ্যে বর্ত্তমান থাকিয়াও স্বয়ং আপনাকে প্রজ্ঞাবান্ ও পণ্ডিত বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা অন্ধ দ্বারা নীয়মান অন্ধের ন্যায় নানা কুটিল গতি প্রাপ্ত হইয়া পরিভ্রমণ করেন।

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য।

নীলকণ্ঠ।

[পূর্ব্বপ্রকাশিত পরিচ্ছেদগুলির গল্পাংশ :—বল্লভপুরের খাঁ জমীদার বংশের রায় রামেশ্বর খাঁ একবিংশবর্ষীয় পুত্র মন্মথকে তাঁহার পিতৃব্যস্থানীয় প্রবীণ দেওয়ান নীলকণ্ঠ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হস্তে সমর্পণ করিয়া গঙ্গালাভ করিলেন। তৎপূর্ব্বেই, বৃদ্ধবয়সে সংসার-সমুদ্রের "না" হারাইয়া যখন নীলকণ্ঠ হাবুডুবু খাইতেছিলেন, তখন, স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া এবং বরকর্ত্তা সাজিয়া রামেশ্বর সৌন্দর্য্যসারভূতা কুলীন-দুহিতা ষোড়শী 'ষোড়শী'র সহিত 'খুড়া'র উদ্বাহবন্ধন সম্পন্ন করান। কিন্তু এ নবীনা ঠান্‌দিদির সহিত মন্মথর তেমন পরিচয় হইল না! লজ্জাটা উভয়তই ছিল। সরল-হৃদয় বৃদ্ধ তাই ক্ষুব্ধ হইয়া মন্মথকে 'আঙা বউ'র (তাঁহার প্রথমা স্ত্রীর) সহিত তাহার শৈশবের সে প্রণয়ীসুলভ মান-অভিমানের কথা উল্লেখ করিয়া এ নূতন ঠান্‌দিদির সহিত তাহার আত্মীয়তার জন্য সচেষ্ট হইলেন। বৃদ্ধের আগ্রহে, মন্মথ ষোড়শীর শিক্ষার ভার গ্রহণ করিল। ষোড়শী মেধাবিনী, নিজের আগ্রহে এবং মন্মথের যত্নে তাহার শিক্ষা দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিল। এমনি করিয়া ধীরে ধীরে তাহাদের পরিচয় ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হইল। * * কিছুদিন পরে জমীদারী কার্য্যোপলক্ষে নীলকণ্ঠকে পরগণায় যাইতে হইল—ষোড়শীর ভার রহিল মন্মথর উপর। * একদিন সন্ধ্যারাত্রে পাঠ কালে চারিদিকের প্রকৃতির উন্মাদনার মধ্যে উভয়ের চিত্ত একবার বিচলিত হইয়া উঠিল, উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে মন্মথ ডাকিল—'ষোড়শি!' * মুহূর্ত্তের দুর্ব্বলতায় ষোড়শী শিহরিয়া উঠিল। মন্মথর কাছে সে অতঃপর পাঠ বন্ধ করিল। মন্মথের যাতায়াতও বন্ধ হইল। পরগণা হইতে নীলকণ্ঠ, গৃহে ফিরিবার জন্য ষোড়শীর ব্যাকুল পত্র পাইয়া কার্য্যের উপস্থিত মত একটা ব্যবস্থা করিয়া পত্রপাঠ গৃহাভিমুখে রওনা হইলেন। * * ষোড়শী আপনার মনের সহিত অনেক সংগ্রাম করিল। শেষে দেখিল—সে বড় একা; নানারূপে সে মনকে বুঝাইল—শুধু ত সেই সম্বোধন, সম্পর্কে ত তা বাধে না, তাতে এমন কি দোষ, এজন্য মন্মথর সহিত কঠোর ব্যবহার ষোড়শীর উচিত হয় না। তাই পিতার স্বর্গারোহণ তিথিতে ব্রাহ্মণ-ভোজন উপলক্ষ্য করিয়া সন্ধ্যার পর সে মন্মথকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইল। রাত্রে ভীষণ দুর্য্যোগ; মা'র অনুরোধে মন্মথর তখন যাওয়া হইল না। ষোড়শী 'ঘর আর বাহির' করিতে লাগিল। অবশেষে সত্যই অতিথি আসিল—কিন্তু সে মন্মথ নয়, নীলকণ্ঠ! * * অধিক রাত্রে মন্মথও জননী ও জায়ার অজ্ঞাতে নিমন্ত্রণ রক্ষার্থ আসিয়া ষোড়শীর রুদ্ধদ্বার হইতে মনে মনে ধিক্কার লইয়া ফিরিল। সুষুপ্তা স্ত্রীর মুখমণ্ডল আজ সে যেন নবীন আলোকে দেখিল; দেখিল—সে মুখও ত সুন্দর! মন্মথর মোহ কাটিল, সে নিদ্রিতা পত্নীকে চুম্বন করিল। * আর, এদিকে স্বামীর সহিত কথায় কথায় আপনার জীবনের পরাজয় কাহিনী পরোক্ষভাবে স্বীকার করিয়া রুদ্ধ যাতনায় ষোড়শী স্বামীর বক্ষে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল। * * পরদিন হইতে মন্মথর শরীর ভাবান্তর হইল। শ্বশ্রূ চারিদিক বুঝিয়া বধূকে পুত্রের সেবায় নিযুক্ত করিলেন। চির-তৃষিত মন্মথ এতদিনের পর আজ নিজগৃহে আকাঙ্ক্ষিত প্রেম-সুধা সাগ্রহে পান করিতে পাইল। * * স্নেহ-প্রবণ-হৃদয়া ষোড়শী মন্মথর অসুখের সম্বাদে চিন্তিত হইয়া যামি দাসীকে পত্র দিয়া পাঠাইল। মন্মথ তখন পত্নীর সেবাসুখ-মগ্ন; শুধু বলিয়া পাঠাইল—সে

ভাল আছে। তখন উপেক্ষিতা ষোড়শী আপনার অন্তরের সংকীর্ণ দৈন্য বুঝিয়া, চিত্তের বলের জন্য এবং স্বামীর প্রতি অবিচলা ভক্তির জন্য, একান্তমনে বারবার ভগবানকে ডাকিতে লাগিল। * * কিন্তু 'মানুষ গড়ে দেবতায় ভাঙ্গে'; নিষ্ঠুর অদৃষ্ট শুধু বসিয়া বসিয়া হাসে।—সহসা এক টেলিগ্রাম পাইয়া নীলকণ্ঠকে পরগণায় রওনা হইতে হইল। প্রস্থানকালে, অজ্ঞাত কোন বিপদ্‌পাতভয়ে শঙ্কিত হইয়া, স্বামীর পায়ে ধরিয়া ষোড়শী তাহাকে সঙ্গে লইয়া যাইবার জন্য বার বার অনুরোধ করিল। নীলকণ্ঠ হাসিলেন। * শূন্য গৃহে বন্দিনী হরিণীর মত ষোড়শী সন্ত্রস্তা হইয়া রহিল। * * তখন মন্মথ স্ত্রীর প্রেমমুগ্ধ বক্ষমাঝে শান্তি খুঁজিতেছিল! সে খবর ষোড়শী তত জানিত না! সে আত্মহৃদয়ের সহিত সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত হইতেছিল।]

বিংশ পরিচ্ছেদ।

অনাদর, অবহেলা, সর্ব্বত্র অবজ্ঞা,—ষোড়শীর মন ভাঙ্গিয়া পড়িল। স্বামীই যখন ষোড়শীর দুঃখ বুঝিলেন না, তখন অন্যের উপর তার কিসের অভিমান?

ষোড়শী স্বামীর পত্র পাইবার জন্য কয় দিন পথ চাহিয়া রহিলেন, কিন্তু পৌঁছান সংবাদটি পর্য্যন্ত পাইলেন না। কে জানে তিনি কেমন আছেন! পত্র লিখুন না লিখুন, তিনি কুশলে আছেন, সংবাদ পাইলেই যে ষোড়শী বাঁচে! প্রথমে পত্র না পাইয়া ষোড়শীর অভিমান হইয়াছিল, কিন্তু সে অভিমান হৃদয়ে ঠাঁই পাইল না, চিন্তায় উদ্বেগে ষোড়শীর প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল, ষোড়শী তখন স্বামীকে পত্র লিখিয়া ঝিকে তাহা ডাকঘরে দিতে পাঠাইল, আর কাছারীতে যদি কোন পত্র আসিয়া থাকে ত ফিরিবার পথে খবরটা আনিবার জন্য তাকে উপদেশ দিল।

ঝি-রামি, ষোড়শীকে চিনিতে পারিল না। গিন্নিটিত এখন রাত্রি দিন 'স্বামী স্বামী' করিয়াই পাগল—যার জন্য বাবুদের বাটীতে রামির এত গঞ্জনা, সেই মন্মথ বাবুর নামটি পর্য্যন্তও গিন্নি আর করে না। রামি কত আশাতেই না বুক বাঁধিয়া ছিল! সে সব আশার মুকুল ধরিতে না ধরিতে বুঝি বা ঝরিয়া যায়! কে জানে বাপু, এই খুদে মেয়েটার পেটে কি এত বুদ্ধি! সে কি তবে রামিকে লইয়া পুতুল নাচাইবে? এ যে আর কেউ নয়—রামি! যার নাম রামি!! আচ্ছা দেখা যাক্ কোথাকার জল কোথায় মরে! যা হোক কর্ত্তার খবরটা লইবার চেষ্টা রামি করিল,—বাবুদের চাকর ভজহরি,—সে রামির বহু দিনের আলাপী, রামি তাহার কাছে কর্ত্তার সংবাদ লইল।

রামমণি নীলকণ্ঠের যে সংবাদ লইয়া গেল, তাহা কেমন ভাসা-ভাসা, তাহাতে ষোড়শী নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না। কিন্তু উপায় কি? ভাল আছেন, সেই ভাল, আর ষোড়শী যে পত্র আজ লিখিল, তাহার উত্তর নিশ্চয়ই ফেরত ডাকে পাইবে,—সে আর ক'দিন। কিন্তু তাও আর কাটে না, ক্রমে নির্দ্দিষ্ট দিন অতীত হইয়া গেল। কই পত্র ত আসিল না! রামি পত্র ডাকে দিয়াছিল ত? 'রামি, রামি, ও রামি, রামি,'—ডাকের উপর ডাক, রামি বিরক্ত হইয়া, 'রামির "ছেরাদ্দ" কেন হচ্চে, বলিতে বলিতে

হাজির হইল এবং ষোড়শীর প্রশ্ন শুনিয়াই তেলে বেগুণে জ্বলিয়া উঠিল। ‘মা, মা, মা, তোমাদের কি এত অবিশ্বাসী মন গা, ভদ্র-লোকের কাণ্ডই বুঝি এই! আরে দেখো ত ভাল, তুমি দিলে আমায় চিঠি ডাকে দিতে, আর আমি কি চিঠিখানা সিন্ধুকে তুলে রাখব—খাওয়ার জিনিষ নয় যে খেয়ে ফেলব’, ইত্যাদি। ষোড়শী অনেক কষ্টে সে বক্তৃতা-স্রোত বন্ধ করিয়া দিলেন, বলি-লেন,—কর্ত্তার চিঠি পাওয়া গেল না, তাই তোকে জিজ্ঞেস করচি যে তুই নিজে হাতে চিঠিখানা দিয়েছিলি কি না?’ রামি—‘কি বললে তুমি’, বলিয়া তাহার স্বহস্তে চিঠি দিবার প্রমাণের জন্য সাক্ষীর এক সুদীর্ঘ ইশমনবিশী দাখিল করিল। আমরা কিন্তু বিশ্বস্ত সূত্রে জানিয়াছি, ষোড়শীর সন্দেহই ঠিক! রামি পত্রখানি ডাকে দিবার জন্য ভজহরিকে দিয়াছিল, ভজহরি দেয় গদাই মালীকে, গদা পুকুরের ধারে চিঠিখানি রাখিয়া মুখ ধুইতে জলে নামিয়াছিল, এমন সময় দেখে একটা গরু বাগানের গাছ নষ্ট করিতেছে, সে তাড়াতাড়ি সেই দিকে যায়, তার পর চিঠির কথা যখন তার মনে পড়িল, তখন সে পত্র ব্যাতাবিতাড়িত হইয়া সলিলগর্ভে আশ্রয় লইয়াছে। গদা চিঠি-খানি না পাইয়া আর উচ্চবাচ্য করিল না। আর ষোড়শী সেই পত্রের উত্তরের আশায় দিন গণিয়া গণিয়া নিরাশ হইয়া, দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে! অভিমানে তার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু সে অভিমান করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিতে পারিল না। নীলকণ্ঠের কুশল সংবাদ পাইতে তার মন বড়ই আকুল হইয়া উঠিল। সে তখন টেলিগ্রামে সংবাদ লইবার জন্য উদ্যোগী হইল, কিন্তু কে সব করিয়া দেয়, অগত্যা আবার মন্মথকে মনে পড়িল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

ষোড়শী তখন অনেক ইতস্তত করিয়া মন্মথকে পত্র লিখিল। সে পত্র আর কে লইয়া যাইবে? ছাই ফেলতে ভাঙ্গা কুলা, রামি আছে। রামি পত্রখানি লইয়া ভজ-হরির শরণাপন্ন হইল! পত্রে বিশেষ কিছু ছিল না,—

“কল্যাণবরেষু

তোমার দাদা মহাশয়ের কোন সংবাদ পাই নাই। তোমরা তাঁর পৌছা-সংবাদ এবং তাহার পরে আর কোন পত্র পাইয়াছ কি না জানাইবে। যদি কোন সংবাদ আসিয়া না থাকে, তবে অদ্যই টেলি-গ্রামে সংবাদ আনাইবার ব্যবস্থা করিবে। তোমাকে এজন্য বিরক্ত করিতে বাধ্য হই-লাম, মনে কিছু করিও না। টেলিগ্রামের খরচ বলিয়া পাঁচ টাকার নোট এই সঙ্গে পাঠাইলাম।”

ভজহরি পত্র খানি দিয়া অতি ভাল মানুষের মত মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, ‘ঝি একবার দেখা করিতে চায়, ডাকিব কি?’ বাবুর মুখের কথা পাইতে না পাইতে সে রামিকে তাঁর সম্মুখে হাজির করিয়া কার্য্যান্তরে চলিয়া গেল। রামি আধ ঘোমটা টানিয়া গদ গদ কণ্ঠে ষোড়শীর জবানি কত কি বলিল। ষোড়শী কিন্তু তাহাকে কিছুই

বলিতে বলে নাই। মন্মথ রামির অনুযোগের উত্তরে সেই সেদিনকার নিমন্ত্রণের রাত্রিতে যে ভাবে ফিরিয়াছিল সমস্ত কথা বলিল। ষোড়শীর পত্রের সে কোন উত্তর দিল না বটে, কিন্তু তাহার পূর্ব্বদিন নীলকণ্ঠের যে এক খানি পত্র পাইয়াছিল, পাঁচ টাকার নোট সহ খামে পুরিয়া তাহা ষোড়শীর নিকট পাঠাইয়া দিল, আর মুখে বলিয়া দিল, "রাঙ্গা দিদিকে বলিও,—আজ এক সময় যাব।" রামি একে পায় আরে চায়। সে ঘোমটার ভিতর হইতে আড়ে চাহিয়া একটু জোর করিয়া বলিল, "অবিশ্যি অবিশ্যি যাবেন কিন্তু! বৌ ঠাকরুণ মাথার দিব্বি দিয়েছেন!"

ষোড়শী সে পত্র খানি আগ্রহভরে পড়িল—

"ভায়া, সরকারী পত্রে এখানকার সংবাদ সমস্ত রহিল। সেই সকল কার্য্যে আমাকে বড় ব্যস্ত থাকিতে হইয়াছে। তোমার ঠানদিদির সংবাদ প্রত্যহ লইও, এবং আমার কুশল সংবাদ জানাইও। উভয় বাটীর মঙ্গল সংবাদে সুখী করিবে।"

একবার দুইবার বারবার ষোড়শী পত্রখানি পড়িল। তিনি ভাল আছেন সেই ভাল; কিন্তু আমাকে কি এক খানি পত্র লিখিবারও সময় হইল না,—আমি যে পত্র লিখিলাম, দুই ছত্রেও কি তার উত্তর দিতে পারিলেন না? কেন আমি কি তাঁর—অভিমানে ষোড়শীর হৃদয় ভরিয়া উঠিল, ছল ছল চক্ষু দুটি হইতে কয় ফোঁটা জলও পড়িল! "না, আর কাউকে আমার সংবাদ লইতে হইবে না!" ষোড়শীর সে ভাব দেখিয়া রামি অবাক হইয়া রহিল। ব্যাপারও যে সে এক আধটু না বুঝিল, তা নয়। কিন্তু কি জানি, কি মনে করিয়া শেষে ষোড়শীর এই বেদনায় সে যেন কিছু সুখ অনুভব করিল। আষাঢ়ের নব বারিধারায় চাষীর মন যেমন আনন্দে নাচিয়া উঠে, ষোড়শীর এই অশ্রুবিন্দু দর্শনে রামির মনও তেমনি নাচিল! "দেবে" জমী ভিজিয়াছে, এইবার বপনের সময়! রামি সে মাহেন্দ্রক্ষণের অপেক্ষা করিতে লাগিল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

ষোড়শীর অভিমানের প্রথম বেগ প্রশমিত হইয়াছে। নীলকণ্ঠ তাঁহাকে অবজ্ঞা করিতেছেন, থাকিয়া থাকিয়া তাঁহার মনে এই বেদনাই জাগিয়া উঠিতেছে। তবে তিনি কি আর আমায় তেমন ভাল বাসেন না! নয়নের আড় হইলে যাহার জন্য পলকে প্রলয় জ্ঞান করিতেন, যাহার মুখে হাসি দেখিবার জন্য সর্ব্বস্ব পণ করিতেও কুণ্ঠিত ছিলেন না, আজ তাঁর একি হইল! হায়, "সে দিন, এখন রইল কোথা,"—এখন পরে পরে সংবাদ,—সে ত কেবল কথার কথা, তা বেশ, তিনিই যদি আমায় ভুলিয়া থাকিতে পারেন, তবে আমিই বা কেন মন স্থির করিতে পারিব না? আমি নিজের সুখ, বিলাস, সমস্তই ভুলিয়া, তাঁহার চরণ স্মরণ করিতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু তিনি ত চরণে ঠাঁই দিলেন না, আমি আর তবে কি করিব? ষোড়শীর বুকের ভিতরটা যেন খালি হইয়া গেল। তাহার স্বামী তাহাকে প্রকৃতই প্রাণাপেক্ষা ভাল বাসেন, তাঁর মনে মনে এ গর্ব্ব বড়ই ছিল,—দর্পহারী, আজ

কি অবলার সে গর্ব্ব চূর্ণ করিলে! প্রভু—আজ তার

"মুক্ত করহে সকল বন্ধ"

* * * * *

আহারান্তে—ষোড়শী মেঝেয় শুইয়া-মুখের সম্মুখে, বুকের উপর দুই হাতে "চন্দ্রশেখর" খানি ধরিয়া পড়িতে পড়িতে মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হইতেছিল,—এমন সময় রামি ঝি, ধীরে ধীরে সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া ষোড়শীর পদসেবা আরম্ভ করিয়া দিল—সহসা পায়ে হাত দেওয়ায়, ষোড়শী একটু চমকিয়া উঠিয়াছিল—তার পর বইখানি বুকে নামাইয়া দেখিল—রামি।—কে ও রামি, তবু ভাল—আমার ত ভয়ই হয়েছিল! তা তোর আজ যে "অতি ভক্তি!"

রামি এ বিদ্রূপ গায়ে মাখিল না, সে গম্ভীর ভাবে বলিয়া চলিল—"তুমি, একে মুনিব, তায় বামুনের মেয়ে, সাক্ষাৎ দেবতা, তোমাদের সেবা করাই ত পরকালের কাজ, তা অবসর ত পাইনে!" সহসা রামির এ মতি পরিবর্ত্তনের হেতু ষোড়শী খুজিয়া পাইল না, মনটা কিছু ভিজিল, কিন্তু মুখে আর একটু তামাসার লোভ সম্বরণ করিতে পারিল না। রামি, "তোর যে হঠাৎ শাস্ত্র জ্ঞান হ'য়ে উঠ্‌ল, দিন ঘুনিয়েচে না কি!" অন্য দিন হইলে, রামি এই কথায়, সপ্তমে চড়িয়া বাড়ী মাথায় করিত, কিন্তু আজ তার মেজাজটা না কি বড়ই ভাল ছিল, তাই সে একে বারে খাদে নামিয়া উদাসীনার মত বলিল,—"দিদি ঠাক্‌রুণ তা হলে ত বাঁচি! এমন দিন কি আর হবে!" ষোড়শী একটু লজ্জিত হইল—কথাটা বলা তবে ভাল হয় নাই—কিন্তু মুখের কথা আর হাতের ঢিল, একবার ছুটিলে, ফিরাইবার উপায় থাকে না। যা হোক, রামিকে একটু খুসী করার ইচ্ছায়—"এখনই, মরবি কি দুঃখে? সংসারের মায়া, আমাদের মায়া কি এরই মধ্যে ভুলতে পারবি—না এখন তোর মরে কাজ নেই,—এখন মলে যে পেত্নী হয়ে, আমাদেরই ঘাড়ে চাপবি!" "পেত্নী হয়ে ঘাড়ে চাপবি" কথাটায় রামি যেন একটু প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। সে, এতক্ষণ যে "ছুতা" খুজিতেছিল—এতক্ষণে তাহাই যেন মিলিল রামি তখন মহা উৎসাহে বলিল,—"পেত্নীই হই আর শাকচুন্নিই হই, দিদি ঠাক্‌রুণ তোমারই পোষা দাসী থাকব—তা, না মরেই আজ কিন্তু পেত্নী হয়েচি।" "তাতেই বুঝি, আজ অসময়ে আমার ঘাড়ে চেপেচিস"—ষোড়শীর এ কথার উত্তরে, এক মুখ হাসিয়া বলিল, "তোমার ত পায়ে ধরেছি, ঘাড়ে চেপেচি, আর একজনের—" "সে আবার কার লো?"—"এই আমাদের জমিদার বাবুর", "সে কি লো?"—রামি তখন, আরম্ভ করিল—নানা রঙে, নানা ঢঙে, কত ফলাইয়া, কত বানাইয়া, স্থূলের উপর বহু স্থূল চাপাইয়া রামি মন্মথের সহিত তাহার প্রাতঃকালের আলাপের চিত্র উজ্জ্বল বর্ণে ষোড়শীর সম্মুখে আঁকিল!

তবে, তবে, মন্মথ সে দিন নিমন্ত্রণ রক্ষায় আসিয়াছিল,—সেই মুষলধারে বৃষ্টি, তবু মন্মথ আসিয়াছিল! সে দুর্য্যোগে অনাদরে, অনাহারে, মন্মথ অত রাত্রে, অন্ধকারে ফিরিয়াছিল! অভাগী ষোড়শী, তারই নিমন্ত্রণে আসিয়াই ত মন্মথ পীড়িত হইয়া

পড়িয়াছিল! তবে ত মন্মথ অবহেলা করে নাই, বরং অবহেলাই পাইয়াছে! তাই বুঝি এ অভিমান! ষোড়শীর মন কিছু পূর্ব্বে বারিহীন নিদাঘের রবিকরদগ্ধ মৃত্তিকাখণ্ডের ন্যায় কঠিন হইয়াছিল,—এ সংবাদ শ্রাবণের বারিধারার ন্যায় ষোড়শীর মনকে ভিজাইয়া দিল, রামি তাহা বুঝিয়া আরো জল ঢালিল,—শেষ মথিয়া মথিয়া সে কঠিন মৃত্তিকা ধীরে ধীরে কর্দ্দমে পরিণত করিল! তখন সে কাদায় মনের মত ছাঁচ সহজে গড়িতে পারিবে বুঝিয়া বলিল,—"আজ, দিদি ঠাক্রুণ, বকসিস্ চাই কিন্তু",—"বকসিস্ আবার কিসের লো"—"আজ যে শমন ধরিয়ে এসেছি", "আরে মলো! তোর হেঁয়ালি রাখ,—শমন আবার কিসের?" "আ আমার কপাল, এও বুঝ্‌লে না!" বলিয়া সুর করিয়া আরম্ভ করিল,—

'সুদন কয় দিলাম শমন
হাজির হবে রাধারমণ
রফা করে দেব এখন
ধরাইব পায়,'

সহসা জুতার মস্ মস্ শব্দ হইল। 'অই বুঝি, শমনের আসামী হাজির' বলিয়া রামি পিছু কাটাইল। 'কোথা যাস্ লো' বলিতে বলিতে ষোড়শী উঠিয়া বসিয়া কেশ বেশ সংযত করিয়া লইল। বুকটা তার ঢিপ ঢিপ করিয়া উঠিল। "এত দিনের পর তবে—"

ক্রমশঃ

শ্রীশৈলেশচন্দ্র মজুমদার।

মহাভারত।

(পূর্ব্ব প্রবন্ধের অনুবৃত্তি)

জ্যোতিষিক ইতিহ।

ইন্দ্র-বৃহস্পতি—অর্জ্জুন।

অর্জ্জুন চরিতের লক্ষণ এই ঃ—

১। সর্ব্বদেবময় ইন্দ্রদেবের ঔরসে পাণ্ডুরাজ-মহিষী পৃথাদেবীর গর্ভে মধ্যম পাণ্ডবের জন্ম হয়। (মহা ১।১২৩)

২। অর্জ্জুনের দশ নাম এই ঃ—অর্জ্জুনঃ ফাল্গুনঃ জিষ্ণুঃ কিরীটী শ্বেতবাহনঃ। বীভৎসুঃ বিজয়ঃ কৃষ্ণঃ সব্যসাচী ধনঞ্জয়ঃ॥ (মহা ৪।৪৪)

৩। উত্তরফল্গুনি নক্ষত্রে জাত বলিয়া বালকের নাম ফাল্গুন হইয়াছিল। (মহা ৪।৪৪)

৪। রঙ্গভূমিতে কুরু ও পাণ্ডব রাজকুমারগণের অস্ত্রবিদ্যার প্রদর্শনী হইয়াছিল। মাতৃ সন্নিধানে স্থিত ও পিতা মার্ত্তণ্ডদেবের কিরণে পরিবেষ্টিত বীরশ্রেষ্ঠ কর্ণ মেঘচ্ছায়াবৃত অর্জ্জুনকে দ্বন্দযুদ্ধে আহ্বান করিলেন। কর্ণের পালকপিতা সূত অধিরথের আগমনে প্রদর্শনী ভঙ্গ হইল। (মহা ১।১৩৮)

৫। লঘুহস্ততায় ফাল্গুন অদ্বিতীয় ছিলেন।

৬। অর্জ্জুনের ধনুর নাম গাণ্ডীব।

৭। অর্জ্জুনের রথের নাম কপিধ্বজ এবং শ্রীকৃষ্ণ তাহার রথের সারথি ছিলেন। (মহা ৫।৭)

৮। অর্জ্জুন দ্রুপদরাজ যজ্ঞসেনকে রণে বন্দী করিয়া আচার্য্য দ্রোণকে গুরু-দক্ষিণা প্রদান করেন। (মহা ১।১৪০)

৯। মাতা ও ভ্রাতৃগণের সহিত অর্জ্জুন জতুগৃহ হইতে মুক্তি লাভ করেন। (মহা ১।১৪৮)

১০। অর্জ্জুন অঙ্গারপর্ণ গন্ধর্ব্বকে রণে পরাজিত করেন। (মহা ১।১৭০)

১১। অর্জ্জুন-আদি পাণ্ডবগণ দেবল-ভ্রাতা ধৌম্যকে পৌরহিত্যে বরণ করেন। (মহা ১।১৮৩)

১২। কৃষ্ণার স্বয়ম্বরে অর্জ্জুন লক্ষ্যভেদ করেন। (মহা ১।১৮৮)

১৩। নিয়মভঙ্গ হেতু অর্জ্জুন দ্বাদশবর্ষ বনবাস গ্রহণ করেন। (মহা ১।২১৩)

১৪। অর্জ্জুন গঙ্গাদ্বারে (হরিদ্বারে) নাগকন্যা উলূপীর বাসনা পূর্ণ করেন। (মহা ১।২১৪)

১৫। অর্জ্জুন মহেন্দ্র পর্ব্বতের সন্নিহিত সাগরকূলস্থ মণিপুরে রাজা চিত্রবাহনের কন্যা চিত্রাঙ্গদার পাণিগ্রহণ করেন এবং বভ্রুবাহন নামে পুত্র লাভ করেন। (মহা ১।২১৫)

১৬। দ্বারিকানগরীতে অর্জ্জুন বসুদেব-দুহিতা সুভদ্রাদেবীকে হরণ করেন। এবং অভিমন্যুকে পুত্র লাভ করেন। (মহা ১।২২০-২২১)

১৭। অর্জ্জুন ও মহাদেব বরাহ-রূপধারী মূক নামক দানবকে শরাঘাত করেন। (মহা ৩।৩৯)

১৭ (ক)। ইন্দ্রলোকে অবস্থিতি কালে অর্জ্জুন নিবাতকবচ এবং হিরণ্যপুরবাসী পৌলম ও কালখঞ্জকগণ নিধন করেন। (মহা ৩।১৬৮-১৭৩)

১৮। অর্জ্জুন উর্ব্বশীকে প্রত্যাখ্যান করেন। (মহা ৩।৪২)

১৯। অর্জ্জুন চিত্ররথ গন্ধর্ব্বকে পরাভূত করিয়া সস্ত্রীক দুর্যোধনকে উদ্ধার করেন। মহা (৩।২৪২-২৪৪)

২০। বিরাটভবনে অর্জ্জুন ক্লীববেশে বৃহন্নলা নাম ধারণে নৃত্যগীতের শিক্ষক হন। (মহা ৪।১১)

২১। উত্তর গোগৃহযুদ্ধে অর্জ্জুন-বৃহন্নলা বিরাটতনয় উত্তরের সিংহধ্বজরথে সারথি হইয়াছিলেন। (মহা ৪।৪৪)

২২। সমীবৃক্ষতলে দৈবী মায়াময় ভূতগণাশ্রিত সিংহলাঙ্গুল-সমন্বিত কপিধ্বজ আকাশ হইতে সেই রথে পতিত হইল। মহাকাশলাঞ্ছিত রথে উত্তর সারথি ও অর্জ্জুন রথী হইলেন। (মহা ৪।৪৪)

২৩। উত্তর গোগৃহ যুদ্ধে অর্জ্জুন শঙ্খ-ধ্বনি ও অস্ত্রবলে কৌরবগণকে বিমোহিত করিলেন। এবং ভীষ্মদেব ব্যতীত অন্য বীর-গণের বস্ত্রাদি হরণ করিলেন। (মহা ৪।৬৪)

২৪। অর্জ্জুন নিরস্ত্র কেশবকে সারথ্যে বরণ করেন। (মহা ৫।৭)

২৫। শিখণ্ডীকে সম্মুখে রাখিয়া অর্জ্জুন শরাঘাতে ভীষ্মদেবকে রথ হইতে পাতিত করেন। (মহা ৬।১০৬-১১৬)

২৬। ভীষ্মদেবের পানার্থে অর্জ্জুন ভীষ্মদেবের দক্ষিণ পার্শ্বে পৃথিবী বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিয়াছিলেন। এবং শরবিদ্ধ বিবর

হইতে দিব্যগন্ধ ও রসযুক্ত অমৃত তুল্য বারিধারা উত্থিত হইল। তাহা পানে ভীষ্মদেব পরিতৃপ্ত হইলেন। (মহা ৬।১১৮)

২৭। অর্জ্জুন বৃদ্ধ-ক্ষত্রতনয় জয়দ্রথকে বজ্রাস্ত্র দ্বারা বধ করেন। (মহা ৭।১৪৪)

২৮। অর্জ্জুন গুরু দ্রোণকে বাণবর্ষণে মৃতকল্প করেন। (মহা ৭।১৮৬)

২৯। কর্ণের রথচক্র পৃথিবী গ্রাস করিলে অর্জ্জুন তাহাকে বিনাশ করেন। (মহা ৮।৯০)

৩০। মার্ত্তণ্ড-ভীষ্মদেবের পতনের পরে অর্জ্জুন সংশপ্তকগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে নিত্য বিনাশ করেন। (মহা৭-৮)

৩১। অর্জ্জুন অশ্বত্থামার ঐষিক অস্ত্র নিবারণার্থে ব্রহ্মশির অস্ত্র ত্যাগ করিয়া চির ব্রহ্মচর্য্যবলে তাহা প্রতিসংহার করিলেন। (মহা ১০।১৫)

৩২। অন্যায় সমরে অর্জ্জুন দ্রোণ গুরুকে নিপাত করায় তাহার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপে অর্জ্জুন তাম্রধ্বজ রাজপুত্র সুধন্বার সমরে পরাভূত হইলেন। (কাশীদাস)

৩৩। অন্যায় সমরে পিতামহ ভীষ্মকে নিপাত করায় তাহার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপে অর্জ্জুন বভ্রুবাহনের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। (মহা ১৪।৭৯-৮২)

জ্যোতির্ষিক তত্ত্ব ও ইতিহ।

১। বৃহস্পতি গ্রহ প্রকৃত পক্ষে শ্বেত বর্ণ। কিন্তু এই গ্রহের কলঙ্কগুলি লোহিত বর্ণ। এ জন্য গ্রহবিম্ব কনক বর্ণ দেখায়। আবার এই গ্রহের বন্ধনী নীলাভ। দ্বাদশ বর্ষে বৃহস্পতি একবার রাশিচক্র পরিভ্রমণ করে।

২। বৃহস্পতি একবর্ষে একটী রাশি বিচরণ করে। সূর্য্য এক বর্ষে একবার রাশিচক্র বা দ্বাদশ রাশি বিচরণ করে। সুতরাং প্রতি বর্ষে সূর্য্য যেমন ক্রমে বৃহস্পতির নিকটস্থ হইতে থাকে, অমনি বৃহস্পতির তেজ হ্রাস হইতে থাকে। এই অবস্থাকে বৃহস্পতির বার্দ্ধক্য বলে। ক্রমে সূর্য্য বৃহস্পতির সম সূত্র স্থানে উপনীত হয়। তখন বৃহস্পতি অদৃশ্য হয়। পরে সূর্য্য বৃহস্পতিকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে থাকে। বৃহস্পতিও নিষ্কৃতি পাইয়া ক্ষীণ-প্রভা সহ প্রাতে সূর্য্যের পশ্চিমে উদিত হয়। এই অবস্থাকে বৃহস্পতির বাল্যত্ব বলে।

৩। বৃহস্পতির এই অস্তগমন ব্যাপার ইতিহে অজ্ঞাতবাস এবং মরণ বলিয়া পরিকল্পিত হয়।

৪। ভগদেব দৈবত পূর্ব্ব ফল্গুনি বা অর্জ্জুনি নক্ষত্রে বৃহস্পতির জন্ম হয়, এ জন্য বৃহস্পতির "পূর্ব্বফল্গুনি ভব" (ফাল্গুন?) নাম হইয়াছে।

৫। বৃহস্পতি দ্বিবিধ চরিত্রবান্। বৃহস্পতি দেবগণের পুরোহিত বা ব্রহ্মা এবং বৃহস্পতি দেবগণের সেনাপতি বা বজ্রধর ইন্দ্র। এ জন্য বৃহস্পতি ব্রহ্ম অধিদৈবম্ সূর্য্যাস্তম্ ইন্দ্র প্রত্যভিদৈবতম্। (গ্রহযাগ-তত্ত্ব)

৬। ইন্দ্রের চরিত্রের প্রধান উপাদান-গুলি এই

(ক) শতপথব্রাহ্মণ মতে (৫।৪।৩।৭) ইন্দ্রের গুপ্ত নাম অর্জ্জুন।

(খ) ইন্দ্রের নাম। (জিষ্ণু ৫।৪২।৬)

(গ) ইন্দ্র ক্লীব হইয়াছিলেন। (রামায়ণ ১।৪৮)

(ঘ) ইন্দ্র সব্যসাচী ছিলেন। (৮।৩৩.৫)
(ঙ) ইন্দ্র গোগৃহ মোচন করেন। (১।১০।৭)
(চ) ইন্দ্র নৃত্যগীত প্রিয় ছিলেন। (৮।৫০।১৪)
(ছ) ইন্দ্র লক্ষ্য জয় করেন। (২।১২।১৪)
(জ) ইন্দ্র সূর্য্যকে পরাভূত করেন।(১০।৮৫।১৩)
(ঝ) সূর্য্যের অস্ত অন্তে ইন্দ্র দশ সহস্র দেবদ্বেষী বিনাশ করেন। (৮।৮৫।১৫)
(ঞ) ইন্দ্র বরাহ বধ করেন। (৮।৬৬।১০)
(ট) ইন্দ্র গুরু বিশ্বরূপকে বিনাশ করেন। (১০।৮।১৯)
(ঠ) ইন্দ্রের শচী বারম্বার ধর্ষিত হইয়াছিলেন। (১০।৮।১৯) (৪।১৮।১৩)

৭। সিংহরাশিস্থ ২ সিংহস্য (Beta Lionis) তারা এবং কন্যারাশিস্থ ১২ কন্যায়াঃ তারা এই তারাদ্বয়ে উত্তরফল্গুনি নক্ষত্র গঠিত আছে। ২ সিংহস্য তারা এই নক্ষত্রের যোগতারা। এবং এই যোগতারা তারা-সিংহের লাঙ্গুল মূলে অবস্থিত আছে। এই তারার পাশ্চাত্য নাম ডেনেবোলা (Denebola) অর্থাৎ "সিংহ লাঙ্গুল।"

৮। উত্তরফল্গুনি নক্ষত্রের উত্তর পূর্ব্ব কোণে পবন দৈবত স্বাতি নক্ষত্রের তারাগণ অবস্থিত আছে। পবন ওরফে রুদ্রদেব মরুৎগণের পিতা বেদ মতে রুদ্রদেব মরুৎগণে পরিবেষ্টিত থাকেন। পুরাণে এই মরুৎগণ ভূতগণ বানরগণ বা রাক্ষসগণ নাম ধারণ করে।

৯। বৃহস্পতি কর্কটরাশিস্থ পুষ্য ওরফে তিষ্য নক্ষত্রের অধিপতি। পুষ্যা নক্ষত্রের অনতিদূরে আকাশগঙ্গার উত্তর শাখা প্রবাহিত আছে। এই উত্তর শাখার নাম ভদ্রা। ভদ্রা চ উত্তরত্র বৈ।" (ব্রঃ বৈঃ পুঃ ১।৫৮৮) ভদ্রা ইতিহে সুভদ্রা নাম ধারণ করেন। সুভদ্রা-গর্ভে কর্কট-চন্দ্র অভিমন্যু নামে জন্ম গ্রহণ করেন।

১০। এই সুভদ্রা দেবীর অনতিদূরে মিথুন রাশিতে দূর্ব্বাদল-শ্যামবর্ণ বিষ্ণু-তারা (Castor) এবং পীতবর্ণ সোম তারা (Pollux) অবস্থিত আছে। এই তারাদ্বয়ে প্রাচীন পুনর্ব্বসু নক্ষত্র গঠিত ছিল। এবং এই তারাদ্বয় হইতে মিথুন রাশির নামকরণ হইয়াছে।

১১। রাশিচক্রের মীন রাশি বৃহস্পতি গ্রহের গৃহ। মীন রাশিতে পূষন্ দেব দৈবত মৎস্যাকৃতি রেবতী নক্ষত্র এবং অহির্বুধ্ন্য দৈবত উত্তরভাদ্রপদনক্ষত্রে অবস্থিত আছে।

১২। অগ্নির নাম চিত্ররথ (১০।১।৫) বিমানে ব্রহ্মমণ্ডলে (Auriga) রথীতম পূষন্ দেব অগ্নির প্রতিকৃতিরূপে প্রতিষ্ঠিত আছেন।

১৩। ইতিহে অগ্নি—পূষন্ দেব চিত্রবাহন রাজা নাম ধারণ করিয়াছেন। এবং মৎস্যাকৃতি রেবতী ইতিহে চিত্র-অর্দ্দা নাম গ্রহণ করিয়াছেন।

১৪। ছায়াপথবাসী অহির্বুধ্ন্য ইতিহে কৌরব্য নাগ নাম ধারণ করেন। এবং উত্তরভাদ্রপদ ইতিহে "উ-লু-পী" নাম ধারণ করেন। *

---

* অযোধ্যাপতি সম্বরণ রাজা (মহা ১।১৭২) গরুড়ের ঐতিহিক প্রতিমা। (মহা ১।২৩) এই গরুড় সম্বরণ রাজার পুত্র কুরু। (মহা ১।১৭৪) কুরুবংশীয়গণ কৌরব্যনামে খ্যাত আছে। (মহা ১।১৭৪)

উপপত্তি।

১। বেদে ইন্দ্রের চরিত্র যে যে উপকরণে গঠিত হইয়াছে মহাভারতে অর্জ্জুন-চরিত্রও সেই সেই উপকরণে গঠিত হইয়াছে। তবে ইতিহের মানবতা রক্ষার্থে যে যে উপকরণ ত্যাগ বা রূপান্তরিত করা প্রয়োজন হইয়াছে তাহাই করা হইয়াছে। তথাপি বিচক্ষণ চিন্তাশীল পাঠকের অগোচরে সত্য গোপন হয় নাই এবং চিন্তাশীল পাঠকের নিকট সত্য গোপন করা মহাকবির উদ্দেশ্যও ছিল না।

২। ইতিবৃত্তবাদী বলিতে পারেন যে, পুত্র অর্জ্জুনে পিতা ইন্দ্রের সমস্ত গুণ আবির্ভূত হইয়াছিল। এ কথা শুনিতে সুমধুর বটে কিন্তু এ ভবে ত কুত্রাপি উপলক্ষিত হয় না।

(ক) প্রলয় পবন মাতলি হনুমান্ রূপে অর্জ্জুনের রথধ্বজে স্থান পাইলেন। কারণ ইতিহে স্বয়ম্ শ্রীকৃষ্ণ সারথ্যে নিযুক্ত হইয়াছেন।

(খ) জ্যোতিষ-উক্ত অন্ধ ভগ দৈবত পূর্ব্বফল্গুনি নক্ষত্রে জাত-"পূর্ব্বফল্গুনি ভব" (বৃহস্পতি) ইতিহে অন্ধ ভগ দৈবত উত্তরফল্গুনি নক্ষত্রে জাত ফাল্গুন এই ইতিহের নায়ক হইয়াছেন।

(গ) অন্ধ ভগদেব ইতিহে শ্রীকৃষ্ণ রূপ ধারণ করিয়াছেন।

(ঘ) 　　　ন লক্ষ্যভেদ করেন

(ঙ) ইন্দ্র-অর্জ্জুন সব্যসাচী ছিলেন, জগতে আর কেহ কখন সব্যসাচী ছিল না।

(চ) ইন্দ্র-অর্জ্জুন গোগৃহ মোচন করেন।

(ছ) ইন্দ্র-অর্জ্জুন নদী ঊর্দ্ধে প্রবাহিত করেন। (মহা ১।৮৫।১১ ; মহা ৬।১১৮)

(জ) ইন্দ্র-অর্জ্জুন গুরু নিপাত করেন।

(ঝ) ইন্দ্র-অর্জ্জুন মার্ত্তণ্ড পাতিত করেন।

(ঞ) মার্ত্তণ্ড-ভীষ্মদেবের পতন-অন্তে ইন্দ্র-অর্জ্জুন দশ সহস্র সংশপ্তক * বিনাশ করেন।

(ট) ইন্দ্র-অর্জ্জুনের রথ শ্বেতবর্ণ অশ্বে বহন করে।

(ঠ) ইন্দ্র-অর্জ্জুন নৃত্য-গীত-বিশারদ ছিলেন।

(ড) ইন্দ্র-অর্জ্জুন ক্লীব হইয়াছিলেন।

(ঢ) ইন্দ্র-অর্জ্জুন বজ্র ক্ষেপ করেন।

(ণ) ইন্দ্র-অর্জ্জুন বরাহ বধ করেন।

(ত) 　　　র্জ্জুন ইন্দ্রজাল বিস্তার করেন।

(থ) ইন্দ্র অর্জ্জুন উভয়ের সহধর্ম্মিণী ধর্ষিত হয়

(ক্রমশ)

* সন্ধ্যাকালে রাক্ষসগণ সূর্য্যকে গ্রাস করিতে চাহে। প্রজাপতির প্রদত্ত শাপে সেই রাক্ষস প্রত্যহই বিনাশ প্রাপ্ত হয়, আবার পুনর্জীবিত হয়। যথা

সন্ধ্যাকালে তু সংপ্রাপ্তে রৌদ্রে পরমদারুণে
মন্দেহাঃ রাক্ষসাঃ ঘোরাঃ সূর্য্যম্ ইচ্ছন্তি খাদিতুম্।
প্রজাপতি কৃতঃ শাপঃ তেষাম্ মৈত্রেয় রক্ষসাম্
অক্ষয়ত্বম্ শরীরাণাং মরণম্ চ দিনে দিনে।

(বিষ্ণু পুঃ ২।৮।৪৫-৪৬)

প্রজাপতির শাপ হইতে নারায়ণী সেনা "সংশপ্তক" নাম ধারণ করে।

ভীষ্মদেবের পতনের পূর্ব্বে সংশপ্তকগণ রণে অবতীর্ণ হয় না। বীরবর কর্ণও ভীষ্মদেব জীবমানে অস্ত্র গ্রহণ করে না। এ সব কবির রচনা। খাঁটী ইতিহ।

সাহিত্য-প্রসঙ্গ।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ।

গত ২৫শে পৌষের অধিবেশনে ডাক্তার চন্দ্রশেখর কালী একটি সম্পূর্ণ নূতন বিষয়ে সাহিত্যিকগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছেন। সংস্কৃতে, ইংরাজীতে, এবং আরও কতকগুলি ভাষায় 'আমি' 'তুমি' ব্যতীত অন্য কতকগুলি সর্ব্বনাম পদের লিঙ্গভেদে রূপভেদ হয়। হিন্দী ও পারসী ভাষায় লিঙ্গভেদে ক্রিয়াপদের রূপভেদ হয়, সুতরাং ক্রিয়াপদ ধরিয়া 'আমি'-'তুমি'র উদ্দেশ্য পদের লিঙ্গও সহজে বুঝা যায়, কিন্তু যে সকল ভাষায় কোন সর্ব্বনামের লিঙ্গভেদে রূপভেদ, তাহাদের লিঙ্গ নির্ণয় করা অনেক স্থলে কষ্টসাধ্য ও বর্ণনীয় বিষয় বুঝিবার পক্ষেও বাধা উৎপাদন করে। ডাক্তার চন্দ্রশেখর কালী পরিষদের ঐ অধিবেশনে বাঙ্গলায় প্রথম বা তৃতীয় পুরুষের সর্ব্বনামপদের লিঙ্গভেদে রূপভেদের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। তিনি বলেন,—আমাদের ভাষায়

স্ত্রী-সর্ব্বনামের

স্বতন্ত্র রূপ না থাকায় চিকিৎসাশাস্ত্রের ব্যবহারে ও চিকিৎসা সম্বন্ধীয় গ্রন্থ রচনায় অনেক স্থলে সঙ্কটে পড়িতে হয়। তিনি তাঁহার স্বরচিত গ্রন্থে এই সঙ্কটমোচনের জন্য প্রথম পুরুষের সর্ব্বনামের স্ত্রীরূপ কল্পনা করিয়া লইয়া স্বতন্ত্র শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। ডাক্তার বাবু বলেন, ইহাতে না কি তাঁহার কার্য্য ও উদ্দেশ্যের অনেক সুবিধা হইয়াছে। তিনি এজন্য কোন নূতন শব্দ গঠন করেন নাই। পুংলিঙ্গে তিনি 'সে' ও 'তিনি'ই রাখিয়াছেন এবং স্ত্রীলিঙ্গে সংস্কৃত 'সা' পদটি লইয়াছেন। সংস্কৃতের 'তস্যা' পদটিও তিনি বাঙ্গলায় গ্রহণ করিয়াছেন। এই পদটি বাঙ্গলায় লিখিত প্রাচীন দলীল দস্তাবেজ ও ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের লেখায় ব্যবহৃত আছে। এক্ষণে ইহাদিগকে বাঙ্গলা সাহিত্যে চালাইতে পারা যায় কি না, তাহার প্রস্তাব উপস্থিত হইয়াছে। চন্দ্রশেখর বাবু স্বীয় গ্রন্থে উহাদের অবাধ ব্যবহার করিতেছেন। পরিষৎ এ বিষয়ে আপাততঃ কোন কর্ত্তব্য স্থির করিতে পারেন নাই। সভাপতি মহাশয় বলিয়াছিলেন,—ডাক্তার বাবুর অভাব হইয়াছে, তিনি তাঁহার গ্রন্থে চালাইতেছেন,—সাধারণের সেরূপ অভাব বোধ হইয়াছে কি না, তাহা বুঝা যায় না। ডাক্তার বাবুর প্রস্তাবে যদি অভাবের উপলব্ধি হয়, তাহা হইলে পরিষৎ এ বিষয়ে আলোচনা করিতে পারিবেন।

সংস্কৃত সর্ব্বভাষার আদি জননী

ঐ অধিবেশনেই পণ্ডিত উমেশচন্দ্র গুপ্ত বিদ্যারত্ন নানা ভাষায় শব্দতত্ত্ব আলোচনা করিয়া সংস্কৃত ভাষাকেই যাবতীয় আর্য্য, অনার্য্য ও সেমিতীয় ভাষার আদি জননী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। এ সম্বন্ধে বহু মতভেদ দৃষ্ট হয়, কিন্তু বিদ্যারত্ন মহাশয় যে ভাবে ঐ প্রস্তাবের আলোচনা করেন, তাহাতে ভারতবর্ষীয় ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ যদি বিষয়টিকে গবেষণার বিষয়ীভূত করিয়া লয়েন, তাহা

হইলে অনেক রহস্য যে উদ্ঘাটিত হইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বিক্রমপুরে সূর্য্যমূর্ত্তি।

পরিষৎ-পত্রিকার ১৬শ ভাগ ৩য় সংখ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ মহাশয় "সূর্য্যপদে উপানৎ" নামে একটি গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। উহাতে ভারতের প্রাচীন কালে উৎকীর্ণ বহু সূর্য্য-প্রতিমার বিবরণ পাওয়া যায়। বিক্রমপুরের ইতিহাস-লেখক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় ঢাকা-মূলচর গ্রামে একটি প্রাচীন সূর্য্যপ্রতিমা দেখিতে পান। উহার ফটোগ্রাফ দেখাইয়া যোগেন্দ্র বাবু ঐ অধিবেশনে পরিষদে বলেন,—বিক্রমপুরের গ্রামে গ্রামে এরূপ প্রতিমা আরও পাওয়া যায়। কিরূপে সে কালে বিক্রমপুরে এই শাকদ্বীপীয় সূর্য্য-পূজা প্রচলিত হয়, তাহা অনুসন্ধানের বিষয়। এই সকল সূর্য্যপ্রতিমা এখন নানা নামে দেবতারূপে পূজিত হইয়া থাকে। আউটশাহী গ্রামের এক পুষ্করিণী গর্ভে ৭।৮ হাত উচ্চ এক সূর্য্যপ্রতিমা পাওয়া গিয়াছে,—উহা ৫০।৬০ জন লোকেও স্থানান্তরিত করিতে পারে নাই। বাঙ্গলার পূর্ব্বাংশে সূর্য্যপূজা মগ ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা প্রথম প্রচারিত হইয়াছিল কি না, তাহা জানা আবশ্যক। সভাপতি মহাশয় বলিয়াছিলেন—বঙ্গের সূর্য্যপূজা মগ ব্রাহ্মণের প্রতিষ্ঠিত নহে। বৈদিক সূর্য্যোপস্থান হইতেই উদ্ভাবিত। সূর্য্যমূর্ত্তি-গুলি সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান আবশ্যক।

গাজীর গান।

ডায়মণ্ডহারবার অঞ্চলে নবাব সায়েস্তা খাঁর আমলে সুপ্রসিদ্ধ বারুইপুরের রায় চৌধুরী বংশের অভ্যুদয় হয়। গাজী মবারক আলী পীরও ঐ সময়ে ঐ অঞ্চলে প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিলেন। চৌধুরী বংশের প্রতিষ্ঠাতা রাজা মদন রায়ের সহিত এই পীর গাজীর যুদ্ধ হইয়াছিল। রাজপুরে রাজা মদন রায়ের রাজধানী ও গড় ছিল, তাহার ধ্বংসাবশেষ এখনও বর্ত্তমান আছে। এই সকল ব্যাপার লইয়াই ঐ অঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ গাজীর গান নামক পালা গানের উৎপত্তি হইয়াছে। এখনও রাজপুর, বারুইপুর, সোনারপুর, হরিনাভী, চাঙ্গড়ি-পোতা প্রভৃতি বহু গ্রামে নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে "গাজীর গানের" বিশেষ আদর আছে। এখনও ঐ সকল স্থানের কৃষককুলের মজলিসে "গাজীর গান" গীত হয়, ও নানা স্থান হইতে হিন্দু মুসলমান বহু লোক শুনিতে আসে। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বাঙ্গলার একটি রাজন্যবংশের ইতিহাস-বিজড়িত এই গাজীর গানের এক প্রস্থ পালা সংগ্রহ করিয়াছেন।

পরিষদের চিত্রশালা ও মুদ্রা-সংগ্রহ।

পরিষদের চিত্রশালায় এ মাসে আবার কতকগুলি প্রাচীন প্রস্তরমূর্ত্তি এবং প্রাচীন মুদ্রা সংগৃহীত হইয়াছে। মূর্ত্তি-গুলির মধ্যে হিন্দু ও বৌদ্ধমূর্ত্তি আছে। হিন্দুমূর্ত্তির মধ্যে বিষ্ণুপ্রতিমাগুলি বঙ্গের বিভিন্ন জেলা হইতে প্রাপ্ত। উহাদের পরস্পরের সাজ সজ্জা ও অলঙ্কারের প্রকার ভেদ হইতে বুঝা যায় যে, উহা বিভিন্ন শিল্পীর গঠিত, এবং এত দ্বারা সে কালের বিভিন্ন শিল্পীর হাতের কাজের নমুনা ও কল্পনার

অভিব্যক্তির নিদর্শন পাওয়া যাইবে বৌদ্ধ-মূর্ত্তিগুলির মধ্যে ভাগলপুরে প্রাপ্ত ভূমিস্পর্শ মুদ্রায় উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্ত্তিটি বেশ বড় এবং মঞ্জুঘোষ বোধিসত্ত্ব মূর্ত্তিটি অদৃষ্টপূর্ব্ব প্রতিমা। একখানি প্রস্তরের পাটায় কুলুঙ্গী কাটিয়া তন্মধ্য হইতে মূর্ত্তিটিকে কাটিয়া পাটার পৃষ্ঠ হইতে উচ্চ করিয়া গড়িয়াছে। ইংরাজীতে এরূপ উৎকীরণ-প্রণালীর নাম "Alto-relievo." এরূপ প্রতিমা বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটির কোন চিত্রশালায় তো নাই-ই, কোন ইউরোপীয় চিত্রশালাতেও নাই। এই মূর্ত্তিটির জন্য পরিষদের গৌরব অতিশয় বর্দ্ধিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের শককুষণ-বংশীয় সম্রাট্ কনিষ্ক, হুবিষ্ক, প্রথম ও তৃতীয় বাসুদেব এবং গুপ্তবংশীয় সম্রাট্ প্রথম কুমার গুপ্তের স্বর্ণমুদ্রা পরিষদে সংগৃহীত হইয়াছে। মোগলসম্রাট্ আকবর শাহ ও পাঠানসম্রাট্ শের শাহের দুইটি স্বর্ণ মুদ্রাও পরিষৎ সংগ্রহ করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন বহুবিধ তাম্র মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। মঞ্জুঘোষের প্রস্তর প্রতিমার ন্যায় পরিষৎ আরও দুইটি এমন আদরণীয় ও কৌতূহলোদ্দীপক দ্রব্য পাইয়াছেন যে যাহা দ্বারা পরিষৎ বিশেষ গৌরব অর্জ্জন করিবেন। এ পর্য্যন্ত যত তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, প্রথম কুমার গুপ্তের তাম্রশাসন অপেক্ষা কোনখানিই প্রাচীন নহে। আবিষ্কৃত তাম্রশাসনগুলির মধ্যে এখনকার এই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন তাম্রশাসনখানিও পরিষদের সম্পত্তি হইয়াছে। ১৮৭৫ ওয়েষ্টমেকট সাহেব দিনাজপুরের তর্পণদীঘীতে লক্ষ্মণসেনের যে তাম্রশাসনখানি পাইয়াছিলেন, সেখানি সম্প্রতি বিক্রয়ার্থ আসিয়াছিল। পরিষৎ এই তাম্রশাসনও সংগ্রহ করিয়া যশস্বী হইয়াছেন।

জাতীয়-সাহিত্য-সঞ্চয়।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ভগবানের কৃপায় দিন দিন জাতীয় সাহিত্যালোচনার প্রধান ক্ষেত্র হইয়া উঠিতেছে। এখানে যে পুস্তকালয়ের সূত্রপাত হইয়াছে, তাহাকে বাঙ্গালীর জাতীয়-সাহিত্যের সঞ্চয়-ক্ষেত্র করিয়া তুলিতে পারিলেই বেশ শোভন হয়। একাল পর্য্যন্ত যেখানে যত বাঙ্গলা পুস্তক-পত্রিকা ছাপা হইয়াছে, তাহা সংগ্রহের চেষ্টা হইতেছে। প্রাচীন কালের ছাপা বহু পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে। অন্যান্য গ্রন্থ সংগ্রহেরও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। পরিষদের অর্থ-স্বচ্ছলতা এ কার্য্যের উপযোগী কোন দিনই নহে এবং শীঘ্রও যে হইবে তাহার সম্ভাবনা নাই, কাজেই এই শুভ সঙ্কল্প সাধন করিতে পরিষৎকে সমস্ত গ্রন্থকার ও প্রকাশকবর্গের দয়ার, স্নেহের ও শ্রদ্ধার উপর নির্ভর করিতে হইবে। উঁহারা যেমন গভর্ণমেণ্টে এক খণ্ড পুস্তক দান করিতে আইনে বাধ্য, সেইরূপ প্রীতি ও কর্ত্তব্যবুদ্ধির প্ররোচনায় যদি পরিষদেও এক এক খণ্ড পুস্তক দান করেন, তাহা হইলে সচ্ছন্দে উক্ত সঙ্কল্প সিদ্ধ হইবে, সন্দেহ নাই।

গ্রন্থ-সমালোচনা।

সিন্ধুগৌরব—শ্রীকুমুদিনীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় বি, এ, প্রণীত। মূল্য ১।০ আনা। মহম্মদ-বিন-কাশেম কর্ত্তৃক সিন্ধুবিজয়-কাহিনী অবলম্বনে এই উপন্যাসখানি রচিত। মুসলমানদিগের সর্ব্ব প্রথম ভারতবর্ষে অধিকার লাভ ঐতিহাসিক ঘটনা। কাজেই সিন্ধু-গৌরবের গল্পাংশ সকলেরই পরিচিত,তাহার উল্লেখ বাহুল্য। এই কাহিনী অবলম্বন করিয়া গ্রন্থকার যে উপন্যাস রচনা করিয়াছেন তাহাতে কৃতিত্ব আছে। বোগদাদের খালিফ-কন্যা জোবেদীর কাশেমের প্রতি উদ্দাম-প্রেম, কাশেমের পত্নী মর্জ্জিনার সুগভীর পতিপ্রেম এবং কাশেমের স্ত্রীর প্রতি অটুট ভালবাসা, এই ত্রিধারা লইয়া গ্রন্থকার যে চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা তাঁহার দক্ষতার পরিচায়ক। উপন্যাসের অন্যান্য পাত্রপাত্রীগণের মধ্যে দাহিরের সেনাপতি ভৈরব ও তৎপত্নী ভীমার এবং বিশ্বাসঘাতক কণাদের বীরপত্নী কৃষ্ণার চরিত্র গ্রন্থকার সুনিপুণ তুলিকাপাতে ফুটাইয়াছেন। আধুনিক উপন্যাস-নবন্যাস-প্লাবিত দেশে এমন একখানি পুস্তক পাঠে আমরা পরম প্রীত হইয়াছি। সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় এরূপ গ্রন্থের প্রকৃত সম্মান দেওয়া সম্ভব নহে, তবে এই টুকু বলিতে পারি যে ইহা উপন্যাসপাঠকের মনোরঞ্জন করিতে পারিবে। পরিশেষে একটা কথা বলিতে চাহি, গ্রন্থকার বোধ হয় এ ব্যাপারে নূতন, তাই তিনি কতকগুলি চরিত্রে সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারেন নাই। কল্হন ঠাকুর বিষয়ভোগনিস্পৃহ উদাসীন, তাঁহাকে স্বদেশরক্ষার জন্য বিবাহ দিয়া তিনি ভাল করেন নাই। এ ছাড়া আরো অনেক ক্ষুদ্র ত্রুটি আছে, কিন্তু তাহা না ধরাই ভাল সে সকল ত্রুটিসত্ত্বেও সমালোচ্য গ্রন্থখানি আধুনিক অনেক উপন্যাস অপেক্ষা অনেক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ।

বিক্রমপুরের ইতিহাস—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত। মূল্য ২॥০ টাকা। নিজের দেশ সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতা আমাদের একটা প্রধান কলঙ্ক। উদাসীনতা এবং আলস্যই তাহার কারণ। সে সকল সুসন্তান এই কলঙ্কমোচনের চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারা আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা-ভাজন। সমালোচ্য গ্রন্থের ভূমিকা-লেখক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয় যথার্থই বলিয়াছেন "একটা আক্ষেপ-বাণী—আমাদের ইতিহাস নাই। এই কথাটা দেশে এতটা প্রচলিত হইয়া গিয়াছে, ইহা স্বীকার করিতে আমরা এতটা অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছি যে, আজ কালকার এই সুলভ শিক্ষার দিনে, এই উচ্চতর শিক্ষার প্রভাবের দিনে, ঐ আক্ষেপের পশ্চাতে যে একটা তীব্র লজ্জা লুকায়িত আছে, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলেও অনুভব করি না, বা সে লজ্জা নিবারণের কল্পনাও করি না। * * * *। তাই প্রতিদিন ইতিহাসের উপযুক্ত উপকরণ চোখের সামনে দৃষ্টিপথ হইতে বিলুপ্ত হইতেছে।" বাংলা দেশের সম্পূর্ণ ইতিহাস প্রণয়নের দিন এখনও আসে নাই,

কেননা তাহার উপকরণ বিক্ষিপ্ত। কিন্তু যোগেন্দ্র বাবু যে ভাবে বিক্রমপুরের ইতিহাস লিখিয়াছেন, এমনি করিয়া যদি প্রত্যেক জেলার ইতিহাস লিখিত হয় তবে সমগ্র বাংলার ইতিহাস অচিরে গঠিত হইবে। শুভক্ষণে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় যে পথপ্রদর্শন করিয়াছেন, আমরা যেন সে পথ ত্যাগ না করি। যোগেন্দ্র বাবু যাহা লিখিয়াছেন তাহার সমস্তই যে অভ্রান্ত তাহা বলি না, কিন্তু সে সমস্ত ভ্রান্তিসংশোধনের উপায় আছে। কিন্তু তিনি যে উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন ও যে দক্ষতার সহিত তাহা গ্রথিত করিয়াছেন তাহা প্রশংসনীয়। ভাষার এবং সাজাইবার গুণে পুস্তকখানি উপন্যাসের মত মনোজ্ঞ ও সহজ পাঠ্য হইয়াছে।

গার্গী।—শ্রীপ্যারীশঙ্কর দাসগুপ্ত প্রণীত। মূল্য ৵০ আনা। ইহা ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্না বিদুষী গার্গীর কাল্পনিক জীবনী। গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য ছিল যে ধর্ম্ম ও কর্ম্মের, জ্ঞান ও প্রেমের সমাবেশই যে স্ত্রী-জীবনের আদর্শ, গার্গীচরিত্রে তাহাই দেখান। তাই উপনিষদের তত্ত্বজ্ঞান, বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রেম এবং সীতার পতিভক্তি একত্র করিয়াছেন। উদ্দেশ্য মহান সন্দেহ নাই, কিন্তু তিনি সফল হইতে পারেন নাই।

পূর্ণ মিলন।*

ভৈরবী—কাওয়ালী।

কেড়ে লহ নয়নের আলো,
পাপ নয়ন কর অন্ধ ;
চির যবনিকা পড়ে যাক্ হে,
নিভে যাক্ রবি তারা চন্দ্র।
হরে লহ শ্রবণের শক্তি,
থেমে যাক্ জলদের মন্দ্র ;
সৌরভ চাহি না বিধাতা,
রুদ্ধ কর হে নাসারন্ধ্র।
স্বাদ হর হে কৃপাসিন্ধু,
চাহি না ধরার মকরন্দ ;
স্পর্শ হর হে হরি,
লুপ্ত করে দাও—অসাড় নিস্পন্দ।
(তুমি) মূর্ত্তিমান্ হয়ে এস প্রাণে—
শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ,
এনে দাও অভিনব চিত্ত
ভুঞ্জিতে সে মিলনানন্দ।

শ্রীরজনীকান্ত সেন।

* কবির রোগ-শয্যায় রচিত।

ভ্রম সংশোধন।

এই সংখ্যার ৬৮ পৃষ্ঠার প্রথম স্তম্ভের ১৩ লাইনে "সেই" স্থলে "সেইরূপ" এবং ১৭ লাইনে "উত্তর সীমা" স্থলে "পূর্ব্ব সীমা" হইবে এবং ৭০ পৃষ্ঠার প্রথম স্তম্ভের ১২শ লাইনে "চারি শতাব্দী" স্থলে "চারি পাঁচ শতাব্দী" হইবে।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত।

বঙ্গদর্শন।

বঙ্কিমচন্দ্র *

আজ এই দিনে বঙ্গ-সাহিত্য-পঙ্কজরবি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৩০ বৎসর ধরিয়া নিজের নির্ম্মল আলোকে বঙ্গ-সাহিত্য-গগন আলোকিত করিয়া, বাঙ্গালীর হৃদয়ে অমৃত-ময় সাহিত্য ও কবিত্ব-সুধা সিঞ্চন করিয়া, বাঙ্গালীর সাহিত্যকে জগতের সমক্ষে মুখ তুলিয়া দাঁড়াইবার উপযুক্ত করিয়া অস্তাচল-চূড়া অবলম্বন করিয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের মধুর স্মৃতি, তাঁহার গম্ভীর প্রকৃতি, তাঁহার সারগর্ভ উপদেশ আজ আমাকে এই কার্য্যে প্রণোদিত করিয়াছে, আজ স্পষ্ট মনে পড়িতেছে, যে দিন বঙ্কিম-চন্দ্রের ভাস্বরমূর্ত্তি প্রথম দেখিয়াছিলাম, সে দিন কত আনন্দ হইয়াছিল। কেবল বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখিবার জন্য প্রায় দুই ঘণ্টা কাল গোলদিঘীর ধারে দাঁড়াইয়াছিলাম তিনি তখন সেনেটে মিটিংএ গিয়াছিলেন, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া যে ক্লান্তিটুকু অনুভব করিয়াছিলাম, তাহা তাঁহার দীপ্তিময় বদন-মণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে পাইয়া অচিরাৎ দূরী-ভূত হইয়াছিল "ক্লেশঃ ফলেন হি পুনর্নবতাং বিধত্তে।" তার পর যখন সোসাইটী ফর দি হায়ার ট্রেনিং অব্ ইয়ং মেন (Society for the higher training of young men)—যাহা এখন ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউট (University Institute) নাম ধারণ করিয়াছে—সংগঠিত হয়, তখন প্রথম তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত উপদেশবাণী শ্রবণ করিলাম। তিনি ইহার সাহিত্যবিভাগের সভাপতি ছিলেন এবং আমি প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে একজন ডেলিগেট মনোনীত হইয়াছিলাম। সেই দিন তিনি একটি অমূল্য উপদেশ দিয়াছিলেন যে, আত্মীয়-বন্ধুদিগকে পত্র লিখিতে হইলে কখনও বিদেশী ভাষার ব্যবহার করিও না। আরও বলিয়াছিলেন যে, যে সাহিত্যচর্চ্চায় আদর্শ উন্নত হয়, হৃদয় মহত্ব লাভ করে, সেইরূপ সাহিত্যই চর্চ্চা করা উচিত। তাহার পর তাঁহার বৈদিক সাহিত্য (Vedic literature) সম্বন্ধে ইংরাজী বক্তৃতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউট নামক সভায় দুইবার শুনিয়াছিলাম। যতবার তাঁহাকে দেখিয়াছি, যতবার তাঁহার কথা শুনিয়াছি, ততবারই মনে হইয়াছে

* রাঁচি লিটরারী সোসাইটিতে পঠিত।

যে আজ কৃতার্থ হইলাম, ততবারই তাঁহার সেই ভীমকান্ত মুখচ্ছবি আমার হৃদয়পটে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে। তাঁহার কৃপালাভও আমার অদৃষ্টে ঘটিয়াছিল, তিনি এই ক্ষুদ্র লেখকের একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়া লিখিয়াছিলেন "as a literary man he is undoubtedly promising" সে সকল promise এখন কালচক্রের প্রতিকূল পরিবর্ত্তনে কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে, আছে কেবল লেখকের মনে সেই উৎসাহবাণীর স্মৃতি মাত্র।

তার পর একদিন সন্ধ্যার সময় হঠাৎ শুনিলাম যে বঙ্কিমচন্দ্র আর ইহলোকে নাই—আকস্মিক বজ্রাঘাতের ন্যায় এই নিদারুণ সংবাদ সমগ্র বঙ্গদেশকে যেন বিদীর্ণ করিয়া ফেলিল, বঙ্গবাসী কত আশা করিয়াছিল, তিনি তাঁহার পরিণত জীবনে আরও কত বহুমূল্য রত্নে বঙ্গ-সাহিত্য-ভাণ্ডার উজ্জ্বল করিবেন, সে সকল আশা সহসা অকালে নির্ম্মূল হইয়া গেল। বাঙ্গালীর হৃদয়ে সেই দিন যেমন নিরাশার হুতাশ দেখিয়াছিলাম, তেমন বোধ হয় আর কখনও দেখিব না। বাঙ্গালী সেই দিন বুঝিয়াছিল যে যাঁহার অমিত প্রভাবশালিনী লেখনীর কৃপায় বঙ্গদেশে সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছিল, যাঁহার সৃষ্ট সাহিত্য আজ সভ্যতাভিমানী ইউরোপখণ্ডেও বাঙ্গালীর নাম প্রচার করিয়াছে, বাঙ্গালীর প্রতিভাকে সুদূর বিদেশে সম্মানিত করিয়াছে, তাঁহার অকালমৃত্যুতে বঙ্গদেশের কি ক্ষতি হইল, তাই সমগ্র বাঙ্গালী জাতির হৃদয়ে সেদিন একটা নৈরাশ্যের তুফান উঠিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবদ্দশায় যাহা হয় নাই তাহা তাঁহার অন্তর্ধানের দিন হইতে হইয়াছে, সেই দিন হইতে বাঙ্গালী বঙ্কিম বাবুর শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হইতে শিখিয়াছে, সেই দিন হইতে বাঙ্গালীমাত্রই বঙ্কিমচন্দ্রের মধুর ও উন্মাদক স্মৃতি হৃদয়ে সযত্নে পোষণ করিয়া আসিয়াছে। আজ আমরা সেই স্মৃতির পূজার জন্য অগ্রসর হইয়াছি।

কেহই কালের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন না। কিন্তু প্রতিভাশালী ব্যক্তিরা নিজের প্রভাবের দ্বারা নিজ নিজ সময়ের চিন্তাস্রোত নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকেন। যখন বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমে নিজ শিক্ষা-দীক্ষা এবং অমিতপ্রতিভা, ভক্তি-মিশ্রিত অনুরাগের সহিত বঙ্গসাহিত্যের চরণ সেবায় নিয়োজিত করেন, তখন বাঙ্গলাভাষার ও সাহিত্যের নিতান্ত হীনাবস্থা। রবি বাবু লিখিয়াছেন, "সংস্কৃত পণ্ডিতেরা তাহাকে গ্রাম্য ও ইংরাজী পণ্ডিতেরা তাহাকে বর্ব্বর মনে করিতেন।" তখন ইংরাজী লিখিতে পারাই একটা গৌরবের বিষয় ছিল, যে যত বাঙ্গলা না জানিত বা না পড়িত সেই তত শিক্ষিত বলিয়া পরিচিত হইত। তখনকার শিক্ষিত বাঙ্গালী দীনবন্ধুর নিমচাঁদ দত্তে প্রতিফলিত, তাহাদের গর্ব্ব ছিল যে তাহারা think in English, talk in English, write in English, dream in English and speechify in English. রবিবাবু যথার্থই লিখিয়াছেন—"এমন সময়ে তখনকার শিক্ষিত-শ্রেষ্ঠ বঙ্কিমচন্দ্র আপনার সমস্ত

শিক্ষা, সমস্ত অনুরাগ, সমস্ত প্রতিভা উপহার লইয়া সেই উপেক্ষিতা সঙ্কুচিতা দীনহীনা বঙ্গভাষার চরণে সমর্পণ করিলেন। তখনকার কালে তিনি কি যে অসামান্য কাজ করিলেন, তাহা তাঁহারই প্রসাদে আজিকার দিনে আমরা সম্পূর্ণ অনুমান করিতে পারি না।"

ফলতঃ ইংরাজীর মোহে জীবন না কাটাইয়া, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বি এ উপাধিধারী নব্য ডেপুটী আশৈশব ইংরাজীশিক্ষিত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যে বাঙ্গলাসাহিত্য-সৃজনে নিজশক্তিকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, ইহাই বঙ্কিম বাবুর আদি ও মহীয়সী কীর্ত্তি। এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল; সংস্কৃত পণ্ডিতের দল ও ইংরাজীনবিশের দল দুই দল হইতেই তাঁহার তথাকথিত ধৃষ্টতার উপর বহুবিধ বাক্যবাণ প্রযুক্ত হইয়াছিল। কিন্তু বঙ্কিম বাবু, গিরিজাপ্রসন্ন বাবুর ভাষায় বলিতে গেলে, চিরদিনই পাঠক সমালোচকবর্গ হইতে এক সোপান উচ্চে অবস্থিত। তাই তিনি এই সকল বাধা-বিপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া নিজের মহাব্রত উদ্‌যাপনে অকুণ্ঠিতভাবে অগ্রসর হইতে পারিয়াছিলেন, আর তাই আজ বঙ্গসাহিত্য এত সমৃদ্ধিশালী হইতে পারিয়াছে।

বঙ্কিম বাবুর ইংরাজী ভাষার জ্ঞান অতি অদ্ভুত, হেষ্টির সহিত তিনি যখন হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে ঘোরতর তর্কে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তখন অনেক ইংরাজও বুঝিতে পারেন নাই যে উহা বাঙ্গালীর লেখা, ইংরাজের লেখা নহে। বঙ্কিম বাবু নিজেও বলিতেন যে বরাবর বাঙ্গালা অপেক্ষা ইংরাজী লেখা ও বলা তাঁহার পক্ষে সহজসাধ্য। তাঁহার ইংরাজীর পরিচয় আমরা 'অনুশীলনে' কিছু কিছু পাই, তাহা হইতে বেশ জানা যায় যে তিনি ইংরাজী লেখায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। এমন প্রলোভন পরিত্যাগ করিয়া তিনি যে বঙ্গসাহিত্যের উন্নতিকল্পে জীবন ব্যয় করিয়াছিলেন তাহা বাঙ্গালীর পক্ষে বড়ই সৌভাগ্যের বিষয় সন্দেহ নাই।

বঙ্গসাহিত্যের অভাব বঙ্কিম বাবু ভালরূপে বুঝিয়াছিলেন, তাই তিনি পাঠক-সংগ্রহের জন্য প্রথমেই ইংরাজী ভাষার কাছ হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন যে যাহা ইংরাজীর অনুকরণে না হইবে তাহা দ্বারা শিক্ষিত বাঙ্গালী কখনই আকৃষ্ট হইবে না। তাই তিনি ইংরাজী নভেলের অনুসরণ করিয়া তাঁহার 'দুর্গেশনন্দিনী' রচনা করিয়াছিলেন।

"দুর্গেশনন্দিনী" অপূর্ব্ব সৃষ্টি! কিন্তু ইহা তাঁহার প্রথম সৃষ্টি নহে, বোধ হয় 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত' তাঁহার প্রথম উপন্যাস, কিন্তু তিনি ইহার অকিঞ্চিৎকরত্ব বুঝিয়া জীবদ্দশায় কখনও নাম দিয়া ছাপান নাই। ইহারও পূর্ব্বে তাঁহার "ললিতা ও মানস" নামক কাব্যগ্রন্থ লিখিত হইয়াছিল, এটিও বহুদিন অপ্রকাশিত ছিল। বঙ্কিম বাবু পঠদ্দশাতেই এই কাব্য লিখিয়াছিলেন। তিনি তখন দীনবন্ধু ও দ্বারকানাথ অধিকারীর সহিত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কাছে কবিতা-রচনার শিক্ষানবিশী করিতেন। বঙ্কিমচন্দ্র বুঝিয়াছিলেন যে শিক্ষিত

বাঙ্গালীর মন ঐশ্বর্য্যশালী ইংরাজী সাহিত্য হইতে ফিরাইতে হইলে এমন জিনিষ তাহাদের সম্মুখে ধরিতে হইবে যাহাতে সেই সাহিত্যের অভাব পাঠক বিস্মৃত হইতে পারে। সেই উদ্দেশ্যে তাঁহার "দুর্গেশনন্দিনী", "কপালকুণ্ডলা" ও "মৃণালিনী" লিখিত। ইহাদিগের রচনায় কোনও গভীর দার্শনিক বা অন্য কোনও উদ্দেশ্য ছিল না বলিয়া মনে হয়। ইহাদিগের উদ্দেশ্য কেবল নিরাবিল সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি—যে সৌন্দর্য্যাগ্নির চারিপাশে বাঙ্গালী পাঠক অবিরত উন্মত্তভাবে ঘুরিয়া বেড়ায়। বলা বাহুল্য যে বঙ্কিম বাবুর উদ্দেশ্য সফল হইয়াছিল। বঙ্কিম বাবুর উপন্যাস পাইয়া শিক্ষিত বাঙ্গালী বাঙ্গলা পড়িতে শিখিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার গ্রন্থাবলীর কবিত্ব-বিষয়ে কিছু বলিবার পূর্ব্বে তাঁহার ভাষার সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। বঙ্কিম বাবুর ভাষা এক অপরূপ নূতন ভাষা, তাহা বাঙ্গলা-সাহিত্যে পূর্ব্বে ছিল না। তিনিই তাহার সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাঁহাকে ভাষা সৃষ্টি করিতে হইয়াছিল। তাহার কারণ পরে বলিতেছি।

বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বে বাঙ্গলা গদ্য দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। প্রথম ভাগ সংস্কৃতবহুল শব্দের পক্ষপাতী ছিলেন। দ্বিতীয়ভাগ একেবারে সংস্কৃত বর্জ্জনের পক্ষপাতী ছিলেন। একদিকে ছিল বিদ্যাসাগর-সংস্কৃত, সংস্কৃতবহুল সুশ্রাব্য অথচ দুরূহ ও কথঞ্চিৎ জটিল বাঙ্গলা গদ্য, যাহা বিষয়বিশেষে অর্থাৎ গম্ভীর বিষয়াদি রচনায় বিশেষ উপযুক্ত; অপরদিকে ছিল প্যারীচাঁদ মিত্রের আলালী ভাষা, এই ভাষায় তাঁহার সমগ্র গ্রন্থাবলী রচিত। বঙ্কিমের পূর্ব্বে এই দুই বিধ ভাষার সামঞ্জস্য কোথাও হয় নাই। সত্য বটে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার তাঁহার পুস্তকগুলিতে এই দুই বিধ ভাষারই ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার ভাষা যখন সংস্কৃতকে আশ্রয় করিয়াছে তখন তাহা আর বুঝিবার উপায় নাই, নমুনা দেখুন—"অতএব শাস্ত্রে কহিয়াছেন 'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী'তি এইরূপে ধনুর্বিদ্যা জিজ্ঞাসুর হস্তজড়তা দূরীকরণ পুরঃসর শীঘ্রহস্ততা সম্পাদনার্থ কর্ণ পর্য্যন্ত করাকর্ষণাভ্যাস প্রায় মহিষী ভাবনাভ্যাসবশতঃ অনবস্থিতচিত্ততা নিরাকরণ পূর্ব্বক অনন্যমনস্কতা সম্পাদন করাইয়া শিষ্যকে শাস্ত্র পাঠ করাইতে লাগিলেন।" আবার যখন তাহা সংস্কৃত বর্জ্জন পূর্ব্বক সহজের দিকে ফুটিয়াছে তখন তাহা একেবারে অসভ্যতায় গিয়া উপস্থিত হইয়াছে। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের সংস্কৃতানুকারিণী ভাষার সংস্কার করিলেন বিদ্যাসাগর মহাশয়, সে অতি সুন্দর সংস্কার। বিদ্যাসাগরের ভাষা শুনিলে মনে হয় যেন কানের কাছে স্বরাধ্যায়ে বাজিতেছে "এই গিরির শিখরদেশ আকাশপথে সতত সঞ্চরমান জলধর-মণ্ডলীর সংযোগে নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলঙ্কৃত; অধিত্যকা-প্রদেশ ঘনসন্নিবিষ্ট বিবিধ বনপাদপসমূহে আচ্ছন্ন থাকাতে সতত স্নিগ্ধ, শীতল ও রমণীয়; পাদদেশে প্রসন্ন-সলিলা গোদাবরী তরঙ্গ বিস্তার করিয়া প্রবল বেগে গমন করিতেছে।"

বিদ্যালঙ্কারের সংস্কৃতবর্জ্জিত ভাষার

সংস্কার করিয়াছিলেন প্যারীচাঁদ মিত্র ; কিন্তু তাহা সংস্কার মাত্র। সে ভাষা আবিষ্কার অথবা ব্যবহার করিয়াছিলেন প্রথমে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার।" এসো না দিব্যমাংস রাখিয়াছি, লও না পেট ভরিয়া খাও না, আমাকে মুখ ভেঙচাও না, পা চাপিয়া বস না, হাত নাড়িয়া কোঁদল কর না, হামাগুরাড়িয়া, পোড়াকপালে চুলোয় যা, তোর মুখে পোড়া গোঁজলা দি, তোর মাথায় বাঁ পায়ের লাথি মারি, এখন ছাই খাও, এই তোর ঘাড়ের রক্ত খায়, মাথা কড়মড় করিয়া চিবায়।" ইহারই রূপান্তর আলালী ভাষা "শামের নাগাল পালাম গো সই, ওগো মরমেতে মরে রই ; টক্ টক্ পটাস্ পটাস, মিয়াজান গাড়োয়ান এক একবার গান করিতেছে, টিট্‌কারি দিতেছে ও 'শালার গরু চল্‌তে পারে না ব'লে লেজ মুচড়াইয়া সপাৎ সপাৎ মারিতেছে। একটু একটু মেঘ হইয়াছে, একটু একটু বৃষ্টি পড়িতেছে, গোরু দুটা হন্ হন্ করিয়া চলিয়া একখানা ছেক্‌ড়া গাড়ীকে পিছে ফেলিয়া গেল। সেই ছেক্‌ড়ায় প্রেমনারায়ণ মজুন্দার যাইতেছিলেন, গাড়ীখানা বাতাসে দোলে, ঘোড়া দুটা বোটা ঘোড়ার বাবা, পক্ষিরাজের বংশ, টংয়স টংয়স ডংয়স ডংয়স করিয়া চলিতেছে, পটাপট্ চাবুক পড়িতেছে কিন্তু কোন ক্রমেই চাল্ বেগড়ায় না।" প্যারীচাঁদেরও চাল বেগড়ায় নাই ; তিনি আগাগোড়াই একচালে চলিতেছেন সর্ব্বত্রই এই ভাষার ব্যবহার করিয়াছেন। কালীপ্রসন্ন সিংহও হুতোমে এইরূপ ভাষাই আগাগোড়া ব্যবহার করিয়াছেন।

কিন্তু একথা বলিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন নাই যে এ ভাষা অত্যন্ত হাল্‌কা ভাষা, এ ভাষায় কোনও গভীর বিষয় বলিবার সুবিধা হয় না, হওয়া উচিতও নহে। অথচ অনেক স্থলে বিদ্যাসাগরী ভাষা ব্যবহার করিলেও তেমন ভাল হয় না। শ্রীরামচন্দ্রের মুখে "দুর্ম্মনায়মানা হইলে কিরূপে তাঁহার চিত্তবিনোদন করিতে হয় তাহা তুমিই বিলক্ষণ জান" বেশ শুনিতে হয় ; কিন্তু সীতাদেবীর মুখে "এরূপ না হইলেই বা আর্য্যপুত্র রঘুকুলধুরন্ধর হইবেন কেন ?" শুনিতে কি তত ভাল হয় ?

তাই বঙ্কিমচন্দ্র এই দুইয়ের মধ্যবর্ত্তী পন্থা অবলম্বন করিলেন। এই দুইরূপ ভাষার সমীচিন সংমিশ্রণে তাঁহার অপরূপ ভাষার সৃষ্টি। যেখানে প্রয়োজন হইয়াছে সেখানে বিদ্যাসাগরের সুসংস্কৃত ভাষার অনুসরণ করিয়াছেন, এমন কি কোথাও কোথাও তাঁহার উপরেও উঠিয়াছিলেন, "এই দিব্য পুষ্পমাল্যাভরণভূষিত, বিকম্পিত চোলাঞ্চলপ্রবৃদ্ধ সৌন্দর্য্য, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর গঠন, পৌরুষের সহিত লাবণ্যের মূর্ত্তিমান্ সম্মিলনস্বরূপ পুরুষমূর্ত্তি যাহারা গড়িয়াছে তাহারা কি হিন্দু ? এই কোপ-প্রেম-গর্ব্ব-সৌভাগ্য-স্ফুরিতাধরা চীনাম্বরা তরলিতারত্নহারা, পীবরযৌবনভারাবনত দেহ,

'তন্বী শ্যামা শিখরি দশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী মধ্যেক্ষামা চকিতহরিণী প্রেক্ষণা নিম্ননাভিঃ' এই সকল স্ত্রীমূর্ত্তি যাহারা গড়িয়াছে তাহারা কি হিন্দু ?" বিদ্যাসাগরের ভাষা বঙ্কিম বাবুর গ্রন্থাবলীতে সর্ব্বত্রই মিলিবে, কেবল বঙ্কিম সেই ভাষাতেই একটু হিল্লোল, একটু অধিক মাত্রায় সরসতা প্রদান করিয়াছেন।

বঙ্কিম বাবুর ভাষার পরিচয় নূতন করিয়া দিবার আবশ্যক নাই; তদীয় গ্রন্থাবলীর কবিত্বাদির বিষয় বলিবার সময় এই ভাষার অনেক উদাহরণ মিলিবে। তাই এ স্থলে আর উদ্ধৃত করিলাম না।

আলালী ভাষাও বঙ্কিম বাবু ব্যবহার করিয়াছেন, তবে তাঁহাকে অনেক পরিমাণে সংস্কার করিয়া লইয়াছেন। ভাষা সহজ ও স্বাভাবিক হওয়া ভাল, কিন্তু নিতান্ত গ্রাম্য হওয়া ভাল নহে। বঙ্কিমচন্দ্র সেই পন্থার অনুসরণ করিয়াছেন। তাঁহাতে বিদ্যাসাগরের ও প্যারীচাঁদ মিত্রের ভাষার সামঞ্জস্য হইয়াছে। অবিরত একই প্রকার ভাষা তিনি ব্যবহার করেন নাই। ভাষার বৈচিত্র্যে তাঁহার গ্রন্থাবলী সমধিক সমৃদ্ধ। বঙ্কিমের ভাষা ভাবের ও অবস্থার ও পাত্রাপাত্রের সম্পূর্ণ উপযোগী, কোথাও তরঙ্গবিক্ষেপবিহীন সাগরবৎ প্রশান্ত, কোথাও রণবাদ্যের ন্যায় উত্তেজনাময়ী, কোথাও বীচিসংক্ষুব্ধা চঞ্চলা তরঙ্গিণীর ন্যায় লীলাময়ী, কোথাও আবার সুবিমল চন্দ্রিকার ন্যায় শুভ্রস্মিতশালিনী, কোথাও তাঁহার ভাষা লজ্জানম্র-নববধূ সম, কোথাও বা সে প্রগল্‌ভা, কোথাও সর্ব্বাঙ্গবিভূষিতা বহুসম্পদময়ী, কোথাও নিরাভরণা দরিদ্রবধূ। ভাষার বৈচিত্র্য বঙ্কিমচন্দ্রে যেমন আছে, তেমন বোধ হয় কালিদাস ভিন্ন আর কোনও কবিতে নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষার ইহা অতিপ্রশংসা নহে, তাহা সকলেই জানেন।

কিন্তু বঙ্কিমের ভাষার সর্ব্বোচ্চ গুণ তাহার সরলতা ও সহৃদয়তা। বঙ্কিম বাবুর বক্তব্য কি, তাহা স্থির করিবার জন্য আমাদিগকে কখনও মাথা ঘামাইতে হয় না, তাঁহার বক্তব্য কুত্রাপি অস্পষ্টভাবে উক্ত হয় নাই, যাহা বলিবার তাহা তিনি সাদাসিধা রকমেই বলিয়া থাকেন, কখনও সোজা কথা বাঁকা করিয়া বলেন না। ভাব ব্যক্ত করিতে গিয়া ভাষার অভাব কখনও তাঁহার হয় নাই, তাই তিনি কোথাও গোলোক-ধাঁধার সৃষ্টি করেন নাই। নিবিড় বাক্যমেঘে তাঁহার ভাব-শশধর কখনও প্রচ্ছন্ন হয় না; যখন তিনি সমাসবহুল শব্দ প্রয়োগ করেন, তখনও তাঁহার ভাবের হানি হয় না, বরং জলদজাল-বেষ্টিত চন্দ্রমার ন্যায় আরও সুরম্য, আরও মর্ম্মস্পর্শী, আরও আনন্দদায়ক হয়। আজকালকার বাঙ্গলা গদ্যে এই সুন্দর গুণের বড় অভাব হইতেছে, আজকাল যে যাহা বলিতে চাহেন তাহা সোজাভাবে বলিতে চাহেন না, সোজা কথা ঘনাইয়া ফেনাইয়া তাহাকে জটিল করিয়া তোলেন। ইহাতে ভাবের যথার্থ ক্ষতি হয়।

বঙ্কিম বাবুর ভাষার বিষয়ে আর একটা বিশেষ লক্ষ্য করিবার জিনিষ আছে, তাহা এই—বঙ্কিমচন্দ্রের সমগ্র গ্রন্থাবলীর মধ্যে কোথাও একটিও ইংরাজী-বাঙ্গলা নাই, তাঁহার বাঙ্গলা বাঙ্গালীরই বাঙ্গলা, তাহাতে ইংরাজীর ভাবানুবাদ নাই। ইহাও আজকাল একটা অতীত বস্তুর ভিতর দাঁড়াইতেছে। বড় দুঃখের বিষয় যে আজকালকার সাহিত্যরথীরা বঙ্গভাষার জাতীয়তা বজায় রাখিবার তত চেষ্টা করিতেছেন না। ফলে এই হইতেছে যে আধুনিক বাঙ্গলাভাষা প্রাণস্পর্শী হইতেছে

না। কেন জানি না আজকালকার বাঙ্গলা-ভাষায় বড় বেশী বিক্ষিপ্ততা প্রবেশ করিতেছে। ইহা যে কিরূপ ফলপ্রদ হইবে, তাহা এখনও বুঝা যাইতেছে না। কিন্তু আশা হইতেছে, আমরা আবার ভাল পথে ফিরিতে পারিব, কারণ আজকাল আমরা বঙ্কিমচন্দ্রকে বুঝিতে শিখিতেছি। সমস্ত দিক্ দিয়া দেখিলে ইহাই সাব্যস্ত করিতে হয় যে বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষাই আদর্শ বঙ্গ-গদ্য-ভাষা। বঙ্কিম বাবুর ভাষার আদর্শ বঙ্গদেশেই ছিল, তাঁহাকে কোনও বিদেশীর কাছ হইতে ভাষা ধার করিতে হয় নাই। আমাদের সকল প্রিয় কবিগণ, কৃত্তিবাস, কাশীদাস, ঘনরাম, রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্র ইঁহারা সকলেই বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শ, সহৃদয়তা ও স্বাভাবিক বুদ্ধি তাঁহার পরিচালক, গভীর স্বজাতি-প্রেম তাঁহার পথপ্রদর্শক ও গবেষণা তাঁহার পাথেয়। এমন সুন্দর উপকরণ-সমবায়ে যে ভাষা গঠিত সেই ভাষাকে আদর্শ না করিয়া অন্য ভাষা সৃষ্টি করিবার চেষ্টা বা ইচ্ছা করা কতদূর সঙ্গত তাহা বুঝিতে পারি না। কিন্তু আমাদের একটা নূতন কিছু করিবার ইচ্ছা এতই প্রবল যে পুরাতন দেখিলেই আমরা তাহা ভাঙ্গিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠি, তা তাহার স্থানে যাহা গড়ি তাহা ভালই হউক বা মন্দই হউক। ফল এই হইতেছে যে বঙ্কিমের ভাষায় যে প্রগাঢ়ত্ব বিদ্যমান আছে তাহা আজকালকার বাঙ্গলা গদ্যে প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না, বঙ্কিমের ভাষায় যে অকপট সারল্য সর্ব্বদা বিরাজিত তাহা আজ বাঙ্গলা গদ্যে বহু অন্বেষণে খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়। বহুদিন ধরিয়া আমরা নিজের ঘর হইতে বৈদূর্য্যমণি পরহস্তে বিলাইয়া দিয়া তাহার পরিবর্ত্তে মূল্যহীন কাচ ঘরে আনিয়া চরিতার্থ বোধ করিতেছি, বুঝি ভাষা সম্বন্ধেও এইরূপ অবিবেকচালিত হইয়া এতদিন কার্য্য করিয়াছি। কিন্তু এখন সু-পবন বহিয়াছে বাঙ্গালী নিজের জিনিষ চিনিতে শিখিয়াছে। তাই আশা হইতেছে যে এ বিষয়েও উন্নতি আমাদিগের পক্ষে অনতিদূরবর্ত্তিনী। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষাকে আদর্শ করিলেই অচিরে সে আশা ফলবতী হইবে সন্দেহ নাই, এবং সেই উদ্দেশ্যেই বঙ্কিম বাবুর ভাষার বিষয়ে এত কথা বলিলাম।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে বঙ্কিমবাবুর প্রথম তিনটি উপন্যাসের উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্যসৃষ্টি। ইহাদিগের গঠনকালে তাঁহার কোনও গভীর দার্শনিক বা আধ্যাত্মিক লক্ষ্য ছিল বলিয়া মনে হয় না। এই তিনখানি উপন্যাসকে আমি বঙ্কিমবাবুর প্রথম স্তরের উপন্যাস বলিয়া মনে করি। এই তিনটির ভিতর যে পাত্র-পাত্রীগুলি সৃষ্ট হইয়াছে, তাহাদের চরিত্র বিশ্লেষণ জন্য গভীর মনস্তত্বের সাহায্য লওয়ার প্রয়োজন হয় না। কয়েকটি রেখাতেই বঙ্কিম বাবু তাহাদের চরিত্র বিশদ করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু তাই বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে মনস্তত্বের সমস্যা এগুলিতে নাই; বিমলার চরিত্রে, আয়েষার চরিত্রে, মতিবিবির চরিত্রে, মনোরমার ও পশুপতির চরিত্রে সেই সমস্যার যথেষ্ট অস্তিত্ব আছে। আমার বলিবার উদ্দেশ্য এই যে এ গুলিতে

তাঁহার প্রধান লক্ষ্য ছিল সৌন্দর্য্যসৃষ্টি। সে সৌন্দর্য্য নানাবিধ উপায়ে ফুটিয়াছে, ভাষার মনোহারিত্বে, গল্পের আকর্ষণী শক্তিতে, বর্ণনার পারিপাট্যে ও চরিত্র-চিত্রণের কৌশলে ও বৈচিত্র্যে সৌন্দর্য্য উথলিয়া উঠিয়াছে। সকলগুলির সমস্ত কথা বলিবার বা বুঝাইবার আবশ্যক বা অবসর আজ আমার নাই, কেবল কপালকুণ্ডলার বিষয় দুই একটি কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে। কপালকুণ্ডলা কবির অপূর্ব্ব সৃষ্টি, কাব্যাংশে ইহার তুলনা বঙ্গসাহিত্যে একটিও নাই, অপর সাহিত্যে আছে কি না তাহাতে আমার বিশেষ সন্দেহ আছে, আছে কেবল কালিদাসে ও ভবভূতিতে। কপালকুণ্ডলা মিরাণ্ডার অনুস্থতি বটে, কিন্তু কপালকুণ্ডলার চরিত্রে অসঙ্গতি আদৌ নাই, মিরাণ্ডায় তাহা আছে। মিরাণ্ডায় "How bashful cunning", "You play me false my lord" এই সকল কথায় তাহার চরিত্রের সঙ্গতি নষ্ট হইয়াছে। কপালকুণ্ডলায় এই রকম অস্বাভাবিকতা কোথাও নাই। আদি হইতে শেষ পর্য্যন্ত কপালকুণ্ডলা নির্জ্জনবনপালিতা, সংসারানভিজ্ঞা, সংসারপ্রলোভনে অনাকৃষ্টা, সৌন্দর্য্যময়ী প্রকৃতিলালিতা সরলা বালিকা। কপালকুণ্ডলা বঙ্কিমবাবুর অপূর্ব্ব মানসী কন্যা।

কপালকুণ্ডলার প্রকৃতি বর্ণনা-নিরতিশয় সৌন্দর্য্যময়ী। কপালকুণ্ডলার রূপবর্ণনা আরও সমুজ্জ্বল, কপালকুণ্ডলার ঘটনাবলী ও অবস্থাসকল যেমন কাব্যময় তেমনি ঔৎসুক্য-জনক। কপালকুণ্ডলার সমুদ্রবর্ণন পাঠ করিলে হৃদয় বিমল আনন্দে পরিপূর্ণ হয়। "* * * সম্মুখেই সমুদ্র। অনন্ত বিস্তার নীলাম্বুমণ্ডল সম্মুখে দেখিয়া উৎকটানন্দে হৃদয় পরিপ্লুত হইল। * * * ফেণিল নীল অনন্ত সমুদ্র, উভয় পার্শ্বে যতদূর চক্ষু যায় ততদূর পর্য্যন্ত তরঙ্গ-ভঙ্গ-প্রক্ষিপ্ত ফেণার রেখা হেম-কান্ত সৈকতে ন্যস্ত হইয়াছে। কপাল-কুণ্ডলা ধরণীর উপযুক্ত অলকাভরণ। নীল জল মধ্যে সহস্র স্থানেও সফেণ তরঙ্গ ভঙ্গ হইতেছিল। যদি কখন এমত প্রচণ্ড বায়ু বহন সম্ভব হয় যে তাহার বেগে নক্ষত্রমালা সহস্রে সহস্রে স্থানচ্যুত হইয়া নীলাম্বরে থাকে তবেই সে সাগর-তরঙ্গ-ক্ষেপের স্বরূপ দৃষ্ট হইতে পারে।" সমুদ্রের এই বর্ণনা পড়িতে পড়িতে রঘুবংশের সমুদ্রবর্ণনা মনে পড়িয়া যায়—

> বৈদেহি পশ্য মলয়াদ্ বিভক্তং
> মৎসেতুনা ফেনিলমম্বুরাশিম্।
> ছায়াপথেনেব শরৎপ্রসন্নম্
> আকাশমাবিষ্কৃতচারুতারম্॥

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রকৃতি-বর্ণনা ও প্রকৃতি-সম্ভোগ অতি উপাদেয়, এখানে সেই বিষয়ের দু'একটা কথা বলা অবশ্যক মনে করিতেছি। বঙ্কিম বাবুর প্রকৃতি-বর্ণনা শুধু তালিকা নহে, ইহার ভিতরও প্রাণ আছে। প্রকৃতি-বর্ণনা মহা-কবিদিগের চিরপ্রিয় বস্তু। কিন্তু মহাকবি-গণ প্রকৃতিকে প্রাণময়ী রূপে চিত্রিত করিয়াছেন, কেবল নির্জ্জীব দৃশ্য মাত্র করিয়া আঁকেন নাই। মহাকবিগণ যে প্রকৃতি-চিত্র দেখাইয়াছেন তাহাতে আর একটি বিশেষত্ব এই যে সে চিত্র কাব্যগত পাত্রগণের মনের অবস্থানুযায়ী বিষণ্ণ বা প্রফুল্ল নহে।

মানুষ কাঁদিলেও প্রকৃতি হাসে, মানুষের সুখ-দুঃখ বিচার করিয়া প্রকৃতির পরিবর্ত্তন ঘটে না; তাই যে কবিরা নিজসৃষ্ট পাত্রগণের সুখ-দুঃখের পরিমাণে প্রকৃতির মূর্ত্তি কল্পনা করেন, তাঁহারা প্রকৃতির সত্য চিত্র প্রদর্শন করেন না। স্বাভাবিকতার পরিবর্ত্তে কৃত্রিম কবিত্বকে মহাকবিগণ কখনও আদরের চক্ষে দেখেন নাই। তাঁহাদের কাছে প্রকৃতির একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে, তাহার নিজের সুখ দুঃখ আছে, তাহার সম্ভোগ-ক্ষমতা আছে, তাহাদের প্রাণ আছে। বঙ্কিম বাবুর প্রকৃতিচিত্র এই উচ্চসুরে বাঁধা। বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীতে যখনই প্রকৃতির মূর্ত্তি দেখিতে পাই, তখনই তাহার এই স্বাতন্ত্র্য দেখিতে পাই। কপালকুণ্ডলায় সমুদ্রের চিত্র পূর্ণরূপে চিত্রিত হইয়াছে, কিন্তু তখন সমুদ্র-দ্রষ্টা নবকুমারের মনের অবস্থা কিরূপ? সম্পূর্ণ নৈরাশ্যময়—সেই বিজন বনে সঙ্গিগণ কর্ত্তৃক একাকী পরিত্যক্ত নবকুমারের মনের ভাব নিতান্ত হীনাবস্থ ছিল, কিন্তু তাই বলিয়া সমুদ্রও গম্ভীর হয় নাই, আর নবকুমারের সমুদ্রদর্শনজনিত তন্ময়তারও অভাব হয় নাই। "কতক্ষণ যে নবকুমার তীরে বসিয়া জলধি-শোভা দৃষ্টি করিতে লাগিলেন, তদ্বিষয়ে তিনি তৎকালে পরিমাণ-বোধরহিত।" বঙ্কিমচন্দ্রের প্রকৃতি-চিত্রণের ইহাই বিশেষত্ব। মৃণালিনী হইতে আর একটি প্রকৃতি-চিত্র উদ্ধৃত করিয়া আমাদের বক্তব্য বিশদ করিতেছি। মৃণালিনী-বিয়োগবিধুর হেমচন্দ্র প্রকৃতিকে কেমন দেখিতেছেন, কবি তাহা বর্ণনা করিয়াছেন—

"নবীন শরদুদয়। রজনী চন্দ্রিকাশালিনী, আকাশ নির্ম্মল, বিস্তৃত, নক্ষত্রখচিত, কচিৎ স্তরপরম্পরা বিন্যস্ত শ্বেতাম্বুদমালায় বিভূষিত। বাতায়নপথে অদূরবর্ত্তিনী ভাগীরথীও দেখা যাইতেছিল; ভাগীরথী বিশালোরসী, বহুদূরবিসর্পিণী, চন্দ্রকর-প্রতিঘাতে উজ্জ্বলতরঙ্গিণী, দূরপ্রান্তে ধূমময়ী, নববারি-সমাগম-প্রহ্লাদিনী। নববারিসমাগম-জনিত কল্লোল হেমচন্দ্র শুনিতে পাইতেছিলেন। বাতায়নপথে বায়ু প্রবেশ করিতেছিল। বায়ু গঙ্গাতরঙ্গে নিক্ষিপ্ত জলকণাসংস্পর্শে শীতল, নিশাসমাগমে প্রফুল্লবন্যকুসুম-সংস্পর্শে সুগন্ধি; চন্দ্রকর-প্রতিঘাতী শ্যামোজ্জ্বল বৃক্ষপত্র বিধূত করিয়া, নদীতীর-বিরাজিত কাশকুসুম আন্দোলিত করিয়া, বায়ু বাতায়নপথে প্রবেশ করিতেছিল। হেমচন্দ্র বিশেষ প্রীতিলাভ করিলেন।"

চন্দ্রশেখরে বঙ্কিমবাবু প্রকৃতির রহস্য বুঝাইয়া বলিয়াছেন—"তুমি গ্রাহ্য কর না কর তাই বলিয়া যে জড়প্রকৃতি ছাড়ে না, সৌন্দর্য্য তো লুকাইয়া রয় না। তুমি যে সমুদ্রে সাঁতার দাও না কেন জল-নীলিমার মাধুর্য্য বিকৃত হয় না, ক্ষুদ্র বীচির মালা ছিঁড়ে না, তারা তেমনি জ্বলে, তীরে বৃক্ষ তেমনই দোলে, জলে চাঁদের আলো তেমনি খেলে। জড়প্রকৃতির দৌরাত্ম্য স্নেহময়ী মাতার ন্যায় সকল সময়েই আদর করিতে চায়।"

এইকথাটি স্মরণ রাখিয়া বঙ্কিম বাবুর চিত্রিত সকল প্রকৃতি-চিত্রগুলি বুঝিতে চেষ্টা করিলেই তাহাদিগকে বেশ বুঝা যাইবে।

সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির একটা প্রধান উপকরণ প্রকৃতির ছবি তোলা, তাই কপালকুণ্ডলায়

আমরা বহুরূপিণী প্রকৃতির অনেকগুলি নিখুঁত ছবি দেখিতে পাই। সকলগুলিই কবিত্বের চরম দৃষ্টান্ত। ফল কথায় বঙ্কিম বাবু একজন প্রকৃতি-সুন্দরীর নিপুণ চিত্রকর, তাঁহার প্রকৃতির সহিত বিশেষ সদ্ভাব আছে, সহানুভূতি আছে। প্রকৃতির প্রতি তাঁহার আন্তরিক টান আছে। বঙ্কিম বাবু সৌন্দর্য্য-পিপাসু, সৌন্দর্য্যের উপাসক। তিনি সৌন্দর্য্যের উপর সৌন্দর্য্য স্তূপীকৃত করিতে ভালবাসেন, ও পাঠকগণকে সেই সৌন্দর্য্য-সমষ্টির মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া তাহাদিগের সৌন্দর্য্যোপভোগ-পিপাসা চরিতার্থ করিবার ইচ্ছা করেন এবং নিজের অপরিসীম কবিত্ব বলে পাঠকগণের চিত্ত সেই সৌন্দর্য্যরাশির দিকে জোর করিয়া আকর্ষণ করেন। নবকুমারের প্রথম কপালকুণ্ডলা-সাক্ষাৎকার এমনি একটি সৌন্দর্য্যের বিরাট প্রতিকৃতি। সমুদ্র-সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ নবকুমার নয়ন ফিরাইয়াই আবার সৌন্দর্য্য-সমুদ্রে নিমগ্ন হইলেন, "ফিরিবা মাত্র দেখিলেন অপূর্ব্ব মূর্ত্তি! সেই গম্ভীরনাদী বারিধিতীরে সৈকতভূমে অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে দাঁড়াইয়া অপূর্ব্ব রমণীমূর্ত্তি! কেশভার অবেণী-সংবদ্ধ, সংসর্পিত, রাশীকৃত, আগুল্‌ফলম্বিত কেশভার, তদগ্রে দেহ-রত্ন; যেন চিত্র-পটের উপর চিত্র দেখা যাইতেছে। অলকাবলীর প্রাচুর্য্যে মুখমণ্ডল সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ হইতেছিল না, তথাপি মেঘবিচ্ছেদ-নিঃসৃত চন্দ্ররশ্মির ন্যায় প্রতীত হইতেছিল। বিশাল লোচনে কটাক্ষ অতি স্থির, অতি গম্ভীর, অথচ জ্যোতির্ম্ময়; সে কটাক্ষ সাগর-হৃদয়ে ক্রীড়াশীল চন্দ্রকিরণ-লেখার ন্যায় স্নিগ্ধোজ্জ্বল দীপ্তি পাইতেছিল। কেশরাশিতে স্কন্ধদেশ ও বাহুযুগল আচ্ছন্ন করিয়াছিল, স্কন্ধদেশ একেবারে অদৃশ্য; বাহুযুগলের বিমলশ্রী কিছু কিছু দেখা যাইতেছিল। রমণী-দেহ একেবারে নিরাভরণ। মূর্ত্তিমধ্যে যে একটি মোহিনী শক্তি ছিল, তাহা বর্ণিতে পারা যায় না। অর্দ্ধচন্দ্র-নিঃসৃত কৌমুদীবর্ণ, ঘনকৃষ্ণ চিকুরজাল, পরস্পরের সান্নিধ্যে কি বর্ণ, কি চিকুর উভয়েরই যে শ্রী বিকশিত হইতেছিল, তাহা সেই গম্ভীরনাদী সাগর-কূলে, সন্ধ্যালোকে না দেখিলে, তাহার মোহিনী শক্তি অনুভূত হয় না। * * * 'পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ'? এই ধ্বনি নবকুমারের কর্ণে প্রবেশ করিল। কি অর্থ কি উত্তর করিতে হইবে কিছুই মনে হইল না। ধ্বনি যেন হর্ষবিকম্পিত হইয়া বেড়াইতে লাগিল, যেন পবনে সেই ধ্বনি রহিল; বৃক্ষপত্রে মর্ম্মরিত হইতে লাগিল, সাগরনাদে যেন মন্দীভূত হইতে লাগিল! সাগরবসনা পৃথিবী সুন্দরী, রমণী সুন্দরী, ধ্বনিও সুন্দর; হৃদয়তন্ত্রী মধ্যে সৌন্দর্য্যের তার মিলিতে লাগিল।" নবকুমারের হৃদয়-তন্ত্রীতে যে লয় মিশিয়াছিল সেই লয় পাঠকগণের হৃদয়-তন্ত্রী পর্য্যন্ত আসিয়া পঁহুছিয়াছে, আমরা সৌন্দর্য্য-সাগরে নিমগ্ন হইয়া গিয়াছি। এমনি বিরাট সৌন্দর্য্য আমরা কুমারসম্ভবের তৃতীয় সর্গে দেখিতে পাই, সেখানেও এমনি ধারা সুন্দর দৃশ্যপটের পর আরও সুন্দর দৃশ্যপট উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি

কালিদাসের অনুরূপ, ইহা অপেক্ষা অধিক প্রশংসা আর আমি জানি না।

যে তিনটি উপন্যাস বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম স্তরের বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি, তাহাদিগের প্রকাশ কাল এইরূপ ঃ—

দুর্গেশনন্দিনি—১৮৬২
কপালকুণ্ডলা—১৮৬৭
মৃণালিনী—১৮৭০

এই তিনটি গ্রন্থেই প্রণয়, সহজ সরল গভীর প্রণয় চিত্রিত হইয়াছে। পাত্র-ভেদে সেই প্রণয়েরই নানাবিধ রূপান্তর ঘটিয়াছে। তিলোত্তমায় তাহা একরূপ, আবার আয়েষায় তাহার অন্যরূপ, বিমলায় সম্পূর্ণ নূতন রূপ। তিলোত্তমায় স্নিগ্ধ, কোমল ও ব্রীড়ানম্র, আয়েষায় তীক্ষ্ণ ও তেজস্বী, বিমলায় ভয়চকিত ও লুক্কায়িত, তিনজনেই অপার, প্রশান্ত ও হৃদয়ব্যাপী। কপালকুণ্ডলায় ইহার অস্তিত্ব নাই, মতিবিবিতে ইহার প্রথম প্রবেশেই অনন্ত-বিস্তার ও প্রভূত-ক্ষমতা-প্রকাশিত—প্রণয়বেগে ইন্দ্রিয়-সুখ পরাভূত। মেহের উন্নিসায় আত্মগোপনে অক্ষম, শ্যামাসুন্দরীতে আশাহীন ও আকাঙ্ক্ষাময়। মৃণালিনীতে অনন্ত-প্রবাহশালী স্থির, গম্ভীর ও অচঞ্চল; মনোরমায় রহস্যময়, ধরা দিতে চাহে না। মনোরমার চরিত্র একটু বাঁধা আনে, কিন্তু অনেকে যে তাহাকে অস্বাভাবিক মনে করেন তাহা নহে, যাঁহারা বিদ্যাপতির শ্রীরাধার বয়ঃসন্ধির বর্ণনা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা মনোরমা-চরিত্রের রহস্য সহজেই বুঝিতে পারিবেন। মনোরমা কখনও বালিকা, কখনও যুবতী, কখনও গম্ভীর, কখনও হাস্যময়ী, কখনও স্থির, কখনও চঞ্চল।

বালা শৈশব তরুণ ভেট
লখই না পারিয়ে জ্যেঠ কণ্ঠে।
* * *
শৈশব যৌবনে উপজল বাদ
কোই না মানই জয় অবসাদ॥

মনোরমার বর্ণনা বঙ্কিম বাবু প্রাণ ভরিয়া করিয়াছেন, কারণ মনোরমার চরিত্রের বৈচিত্র্য বুঝাইবার জন্য তাহা প্রয়োজন হইয়াছিল। রমণীরূপ-বর্ণনে বঙ্কিম বাবুর অপার আনন্দ ও তাহাতে তিনি প্রায় কালিদাসের মতই সিদ্ধহস্ত। পুরুষের চিত্রও বঙ্কিম বাবু অনেক আঁকিয়াছেন। জগৎ সিংহ, ওসমান, নবকুমার, হেমচন্দ্র, মাধবাচার্য্য এইগুলি মহৎচিত্র। কাপালিক, পশুপতি, কতলুখাঁ পাপচিত্র। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে এই তিনটি উপন্যাসের উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্য-সৃষ্টিমাত্র, অতএব সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির নমুনা দেখাইবার জন্য যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকুই এই স্থলে সবিশেষ বিবৃত হইল।

(ক্রমশ)

শ্রীজিতেন্দ্রলাল বসু।

ভারতীয় ইতিহাসের উপকরণ।

মহাভারতের রচনা-কাল

কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ ৫ হাজার বৎসরের প্রাচীন ঘটনা হইলেও বর্ত্তমান সৌতি-প্রোক্ত লক্ষশ্লোকাত্মক মহাভারতের বয়ঃক্রম সার্দ্ধ দ্বিসহস্র বৎসরের অধিক নহে বলিয়া অনেকে মনে করেন। সর্ব্বাদৌ ২৪ সহস্র শ্লোকযুক্ত ভারতসংহিতা যে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ-ঘটনার অনতিদীর্ঘকাল পরেই মহর্ষি বেদব্যাস দ্বারা রচিত হইয়াছিল, একথায় অবিশ্বাস করিবার কোনও কারণ নাই। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী সূত্রে (৬।২।৩৮) "মহাভারত"গ্রন্থের উল্লেখ দেখা যায়। সুতরাং পাণিনির আবির্ভাবের পূর্ব্বে ভারতসংহিতা "মহাভারত" নামে জনসমাজে প্রচারিত হইয়াছিল বলিতে হইবে। পাণিনি অপেক্ষাও প্রাচীনতর গ্রন্থকার আশ্বলায়ন, স্বপ্রণীত "গৃহ্যসূত্রে" তর্পণ-প্রসঙ্গে যাঁহাদিগের নামে জলাঞ্জলি-দানের ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে মহাভারতকারের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

"সুমন্তু জৈমিনি-বৈশম্পায়ন-পৈল-সূত্র-ভাষ্য-ভারত-মহাভারত-ধর্ম্মাচার্য্যাস্তৃপ্যন্তু।"

এই সূত্রে ভারতাচার্য্য ও মহাভারতাচার্য্যের স্বতন্ত্র উল্লেখ থাকায় স্বীকার করিতে হইতেছে যে, আশ্বলায়নের আবির্ভাবের পূর্ব্বেও মহাভারতের প্রচার হইয়াছিল, তদ্ভিন্ন এই এক শুদ্ধ "ভারত"নামক গ্রন্থও বিদ্যমান ছিল। ইহাতে বর্ত্তমান সময়ের প্রায় ৪৮ শত বৎসরের পূর্ব্বে মহাভারতের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হইল।

মহাভারতে লিখিত আছে যে ধৃতরাষ্ট্রের মৃত্যুর পর মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কুরুপাণ্ডবদিগের বৃত্তান্তমূলক একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। ঐ গ্রন্থ-রচনা-কার্য্যে তাঁহার তিন বৎসর অতীত হইয়াছিল।

ত্রিভির্ব্বর্ষৈঃ সদোত্থায়ী কৃষ্ণদ্বৈপায়নো মুনিঃ।
মহাভারতমাখ্যানং কৃতবানিদমদ্ভুতম্॥

আদিপর্ব্ব ৬২ অঃ।

ত্রিভির্ব্বর্ষৈর্ব্বিদং পুণ্যং কৃষ্ণদ্বৈপায়নঃ প্রভুঃ।
অখিলং ভারতং বেদং চকার ভগবান্ মুনিঃ॥

স্বর্গারোহণ ৫ম অঃ

এইরূপ শ্রম স্বীকার পূর্ব্বক গ্রন্থরচনার পর মহর্ষি তাহা সুমন্তু, জৈমিনি, বৈশম্পায়ন ও পৈল প্রভৃতি শিষ্যকে এবং স্বীয় পুত্র শুকদেবকে অধ্যয়ন করান। (আদি ৬৩ অঃ) অতঃপর ঐ পাঁচজনেই পৃথক্ পৃথক্ ভারতসংহিতা রচনা করিয়া প্রকাশ করেন।

সংহিতাস্তৈঃ পৃথক্ত্বেন ভারতস্য প্রকাশিতাঃ।

১।৬৩।৯০

আশ্বলায়ন সূত্রেও সুমন্তু, জৈমিনি, বৈশম্পায়ন ও পৈলকে "ভারতাচার্য্য" বলা হইয়াছে। সুতরাং আশ্বলায়নের সময়েই ব্যাসবিরচিত ভারতসংহিতা ভিন্ন আর অন্ততঃ চারিটি স্বতন্ত্র ভারতসংহিতা প্রচলিত ছিল, দেখা যাইতেছে। কালক্রমে সুমন্তু, পৈল ও

শুকদেব প্রভৃতির ভারত বিলুপ্ত হইয়াছে। জৈমিনির প্রচারিত ভারতের অশ্বমেধপর্ব্ব ভিন্ন আর সমস্ত অংশই লোপ পাইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে আমাদিগের দেশে যে মহাভারত প্রচলিত, তাহার অধিকাংশই বৈশম্পায়ন-প্রচারিত। "অধিকাংশ" বলিবার কারণ এই যে, প্রচলিত মহাভারত লোমহর্ষণ-পুত্র সৌতির প্রোক্ত। বৈশম্পায়ন জনমেজয়ের যজ্ঞে যে মহাভারত পাঠ বা বিবৃত করিয়াছিলেন, তদতিরিক্ত অনেক কথা সৌতিপ্রোক্ত মহাভারতে দেখিতে পাওয়া যায়। সৌতি ও শৌনকাদির প্রশ্নোত্তরে মহাভারতের কলেবর স্ফীত হইয়াছে। মহাভারতের প্রথম ৬২ অধ্যায় বৈশম্পায়নের সময় রচিত হয় নাই, উহা সৌতি ও শৌনকের প্রশ্নোত্তরেই পরিপূর্ণ। আবার জনমেজয়ের প্রশ্নের উত্তরে হয় ত যযাতি প্রভৃতির উপাখ্যানের ন্যায় এমন অনেক পৌরাণিক কথা বৈশম্পায়নকে বলিতে হইয়াছিল, যাহা ব্যাসরচিত মূল মহাভারতের অন্তর্ভুক্ত ছিল না বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। এইরূপে বিচার করিলে দৃষ্ট হয় যে, কৃষ্ণদ্বৈপায়নের মূল ভারতসংহিতা প্রথমে বৈশম্পায়নের দ্বারা ও পরে সৌতির দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হয়। পূর্ব্বে ব্যাসের মহাভারত শত পর্ব্বে বিভক্ত ছিল, কিন্তু সৌতি উহাকে অষ্টাদশ পর্ব্বে বিভক্ত করিয়া প্রচার করেন।

সৌতির প্রচারিত মহাভারতের তৃতীয় সংস্করণের পরও ঐ মহাগ্রন্থে সময়ে সময়ে নানা প্রাচীন ও নবীন আখ্যায়িকা সংযোজিত হইয়াছে। ইহার ফলে যে এক হিসাবে মহাভারতের উপযোগিতা বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ঐ সকল আখ্যায়িকার বা আখ্যায়িকাযুক্ত অংশের রচনাকাল নির্দ্ধারণ করা দুরূহ ব্যাপার হইলেও জ্যোতিষশাস্ত্রের সাহায্যে কোনও কোনও অংশের সময় নির্দ্ধারিত হইতে পারে।

মহাভারতের বনপর্ব্বে (২২৯ অ:) স্কন্দোপাখ্যানে লিখিত আছে যে—

> ধনিষ্ঠাদিস্তদা কালো ব্রহ্মণা পরিকল্পিতঃ।
> রোহিণী হ্যভবৎ পূর্ব্বমেবং সংখ্যা সমাভবৎ ॥১০॥

এ স্থলে রোহিণ্যাদি ও ধনিষ্ঠাদি কালগণনার উল্লেখ আছে। শতপথ ব্রাহ্মণ ও তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণাদির রচনাকালে কৃত্তিকাদি গণনা প্রচলিত ছিল, এ কথার আভাস পাঠকগণকে পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (১।১।২।১ ও ১।১।২।৬) কৃত্তিকাপুঞ্জকে "নক্ষত্রগণের মুখ" বলা হইয়াছে। রোহিণ্যাদি কালগণনা তৎপূর্ব্বে প্রচলিত থাকিবার কথা। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে রোহিণী সম্বন্ধে যে সকল আখ্যায়িকা আছে, তাহা হইতেও জানা যায় যে, এককালে আর্য্যসমাজে রোহিণীই নক্ষত্রচক্রের আদি বলিয়া গণ্য হইত। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ যে শতপথ অপেক্ষা প্রাচীনতর, এ কথা পূর্ব্বেই প্রতিপাদিত হইয়াছে। কিন্তু ধনিষ্ঠাদি কালগণনা কখন প্রচলিত হয়?

বেদাঙ্গ-জ্যোতিষে দেখা যায়, ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে সূর্য্য গমন করিলে উত্তরায়ণ ও নববর্ষারম্ভ হইত।

> প্রপদ্যেতে শ্রবিষ্ঠাদৌ সূর্য্যাচন্দ্রমসাবুদক্।
> সার্পার্দ্ধে দক্ষিণার্কস্তু মাঘশ্রাবণয়োঃ সদা ॥ ৬ ॥
> মাঘশুক্ল প্রপন্নস্য পৌষকৃষ্ণসমাপিনঃ।
> যুগস্য পঞ্চবর্ষস্য কালজ্ঞানং প্রচক্ষতে ॥ ৩২ ॥

সে সময়ে মাঘ শুক্লা প্রতিপৎ তিথিতে বর্ষারম্ভ হইত একথাও এখানে বলা হইয়াছে। ধনিষ্ঠায় দক্ষিণায়ন ও নববর্ষারম্ভ হইত বলিয়া সেকালে ধনিষ্ঠাদি গণনা প্রচলিত ছিল, এ কথা বলিতে হয়। শ্রীযুক্ত তিলক ও যোগেশ বাবু বেদাঙ্গ-জ্যোতিষের রচনাকাল ১৩০০ পূর্ব্বখ্রীষ্টাব্দে নিরূপিত করিয়াছেন। ৺শঙ্কর বালকৃষ্ণ দীক্ষিত মহাশয়ের মতে খ্রীঃ পূঃ ১০০০ অব্দে বেদাঙ্গ-জ্যোতিষ রচিত হয়। সে যাহা হউক, মহাভারতের স্কন্দোপাখ্যানে ধনিষ্ঠাদি কাল-গণনা পুরাকালীন ঘটনা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হওয়ায় প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ঐ উপাখ্যান যে সময়ে রচিত হইয়াছিল, সে সময়ে ধনিষ্ঠাদি গণনা প্রচলিত ছিল না।

ধনিষ্ঠার পরেই শ্রবণাদি গণনা প্রচলিত হইবার কথা। মহাভারতের আদি পর্ব্বে (৭১ অঃ) বিশ্বামিত্রের তপঃপ্রভাব বর্ণন প্রসঙ্গে শকুন্তলার মুখে নিম্নলিখিত শ্লোকার্দ্ধটি সন্নিবেশিত হইয়াছে—

"প্রতিশ্রবণ-পূর্ব্বাণি নক্ষত্রানি চকার যঃ ॥" ৩৪ ॥

আবার অশ্বমেধপর্ব্বেও দৃষ্ট হয়—

অহঃ পূর্ব্বং ততো রাত্রির্মাসাঃ শুক্লাদয়ঃ স্মৃতাঃ।
শ্রবণাদীনি ঋক্ষাণি ঋতবঃ শিশিরাদয়ঃ ॥

৪৪ অধ্যায়।

এখানেও শ্রবণাদি গণনার স্পষ্টই উল্লেখ দেখা যাইতেছে। বর্ত্তমান সময়ে পূর্ব্বাষাঢ়ায় দক্ষিণায়ন আরম্ভ হয়, কিছুদিন পূর্ব্বে উত্তরাষাঢ়ায় হইত। তৎপূর্ব্বে কোনও সময়ে শ্রবণায় অবশ্যই উত্তরায়ণের আরম্ভ ছিল। দীক্ষিত মহাশয় গণনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, খৃষ্টপূর্ব্ব ৫ম শতাব্দীর মধ্যভাগে শ্রবণায় উত্তরায়ণ আরব্ধ হইত। সুতরাং মহাভারতের যে যে অংশে শ্রবণাদি গণনার উল্লেখ আছে, সেই সেই অংশ খ্রীষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীর অপেক্ষা প্রাচীনতর হইতে পারে না। পূর্ব্বকথিত স্কন্দোপাখ্যানও সম্ভবতঃ শ্রবণাদি গণনা আরব্ধ হইবার পর রচিত ও মহাভারতে সংযোজিত হইয়াছিল।

এই সকল কারণে অনেকে মনে করেন যে, মহাভারতের একটি সংস্করণ সম্ভবতঃ শেষ সংস্করণই খ্রীষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ ও তৃতীয় শতাব্দীতে হইয়াছিল। আমরা বর্ত্তমান সময়ে মহাভারতের যে আকার দেখিতেছি, সেই আকার উহা খ্রীষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে ধারণ করে, মোটামুটি এরূপ নির্দ্দেশ করিলে কোনও দোষ হয় না। ঐ সময়ের পর মহাভারতের অতি সামান্যই পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। কোনও কোনও মনীষী মহাভারতের এই শেষ সংস্করণকেই সৌতির প্রচারিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। এই মত যতদূর সমীচিন হউক, প্রচলিত মহাভারতে সৌতির মুখে আমরা নিম্নলিখিত শ্লোকটি শুনিতে পাই—

মন্বাদি ভারতং কেচিৎ আস্তীকাদি তথাপরে।
তথোপরিচরাদ্যন্যে বিপ্রাঃ সম্যগধীয়তে ॥ ৫২ ॥

আদিপর্ব্ব প্রথমাধ্যায়।

অর্থাৎ কেহ কেহ মন্বাদি বা মনুবংশ বর্ণন হইতে, কেহ কেহ আস্তীকোপাখ্যান হইতে, আর কেহ কেহ বা উপরিচর রাজার উপাখ্যান হইতে মহাভারত পাঠ করিয়া থাকেন। এতাবত সৌতির সময়ে মহাভারতের তিন প্রকার আরম্ভ প্রচলিত

ছিল বুঝিতে পারা যায়। আস্তীকোপাখ্যান আদিপর্ব্বের ১৩শ অধ্যায় হইতে আরম্ভ হইয়াছে; উপরিচর রাজার উপাখ্যানের আরম্ভ ৬৩তম অধ্যায়ে। এই উপাখ্যানে মূল-ভারতসংহিতা-কার মহর্ষি কৃষ্ণ-দ্বৈপায়নের উৎপত্তিকথা বর্ণিত হইয়াছে। মনুবংশকীর্ত্তন ৭৫তম অধ্যায়ে আরব্ধ হইয়াছে দেখা যায়। বোধ হয় মহাভারতের সর্ব্বপ্রাচীন সংস্করণের এইখানেই আরম্ভ ছিল। শকুন্তলোপাখ্যানে যখন শ্রবণাকে আদি নক্ষত্র বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, তখন ঐ উপাখ্যান জনমেজয়ের যজ্ঞসভায় বিবৃত হইয়াছিল, ইহা কখনই সম্ভবপর নহে। কারণ তাহা হইলে জনমেজয়কে খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৫মশতাব্দীর পরভাবক বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। পক্ষান্তরে ৭৫ম অধ্যায়ের আরম্ভ যেরূপ, তাহাতে তৎপূর্ব্ববর্ত্তী শকুন্তলো-পাখ্যানের সহিত উহার কোনও সম্বন্ধই পরিলক্ষিত হয় না। এখন ঐ শকুন্তলো-পাখ্যান অন্ততঃ তদন্তর্গত বিশ্বামিত্রের তপঃ-প্রভাব-বর্ণনাংশ যদি সৌতি-প্রোক্ত মহা-ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহা হইলে সৌতিকে খ্রীষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় বা চতুর্থ শতাব্দীর অপেক্ষা প্রাচীনতর বলিয়া মনে করা যায় না।

মহাভারতে ভীষ্মের ইচ্ছামৃত্যু-বিষয়ক উপাখ্যান আছে। তিনি উত্তরায়ণের অপেক্ষায় ৫৮ দিন শরশয্যায় শয়ান ছিলেন, এ আখ্যায়িকা কত প্রাচীন? এ আখ্যায়িকা যে মহাভারতের মৌলিক স্তরের অন্তর্ভূত ছিল না, তাহা সহজেই সপ্রমাণ করা যায়। কারণ ঐ আখ্যায়িকায় লিখিত আছে যে তখন মাঘমাসে উত্তরায়ণ হইয়া-ছিল।—

> মাঘোঽয়ং সমনুপ্রাপ্তো মাসঃ সৌম্যো যুধিষ্ঠির।
> ত্রিভাগশেষঃ পক্ষোঽয়ং শুক্লো ভবিতুমর্হতি॥

এখানে সৌম্য-পদের অর্থ মনোহর ও "চান্দ্র" উভয়ই হইতে পারে। বঙ্কিম বাবু মনোহর অর্থ গ্রহণ করিয়া সৌর মাঘ ধরিয়াছেন। কিন্তু টীকাকার নীলকণ্ঠ বলেন,—"সৌম্য-শ্চান্দ্রো, মাসস্য চতুর্ভাগকরণে সার্দ্ধসপ্তভাগ-ত্বাৎ অষ্টম্যর্দ্ধস্য অনতীত্বেন প্রথমভাগস্য বিদ্যমানত্বাৎ ত্রিভাগশেষো ভবিতুমর্হতি, তেনাদ্যাষ্টমীত্যর্থঃ।" অর্থাৎ চান্দ্রমাঘের শুক্লাষ্টমীতে মাসের প্রথমাংশ শেষ হইতেছিল, এবং মাসের তিনভাগ অবশিষ্ট ছিল। কারণ, মাসকে চারিভাগ করিলে এক এক ভাগে ৭॥০ দিন বা তিথি হইয়া থাকে। সুতরাং সপ্তমী শেষ হইয়া অষ্টমীর অর্দ্ধাংশ অতীত হইলে ভীষ্ম প্রাণ ত্যাগ করিয়া-ছিলেন। এই ব্যাখ্যা সুসঙ্গত সন্দেহ নাই। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি, বেদাঙ্গ-জ্যোতিষ-কালে মাঘ শুক্লা প্রতিপৎ তিথিতে উত্তরায়ণ আরম্ভ হইত। সু-প্রাচীন জ্যোতিষী গর্গও এ কথার উল্লেখ করিয়াছেন,—

> যদা মাঘস্য শুক্লস্য প্রতিপদুত্তরায়ণং।
> সহোদয়ং শ্রবিষ্ঠাভিঃ সোমার্কৌ প্রতিপদ্যতঃ॥

তাহার সাতদিন পরে ভীষ্মের তনুত্যাগ স্বীকার না করিলে অষ্টমী পাওয়া যায় না, মাসের ত্রিভাগ অবশিষ্ট আছে এ কথা বলাও চলে না; আর "সমনুপ্রাপ্ত" পদটিরও সার্থকতা থাকে না।

শতপথ ব্রাহ্মণ রচনাকালে মাঘী পূর্ণিমায় উত্তরায়ণ ও নববর্ষারম্ভ হইত। এ কথা

তিলক মহাশয় তাঁহার ওয়ারেন গ্রন্থে প্রতিবাদ করিয়াছেন। বেদাঙ্গ-জ্যোতিষ রচনাকালে সে অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। বেদাঙ্গ-জ্যোতিষের সহিত মহাভারতের পূর্ব্বোদ্ধৃত অংশের অবিকল সামঞ্জস্য লক্ষিত হইতেছে। সুতরাং ভীষ্মের উত্তরায়ণের জন্য অপেক্ষা-বিষয়ক আখ্যায়িকাটি বেদাঙ্গ-জ্যোতিষ রচনাকালের পূর্ব্বে কখনই উদ্ভূত হইতে পারে না। বেদাঙ্গ-জ্যোতিষ খ্রীঃ পূঃ ১৪শ শতাব্দীর অপেক্ষা প্রাচীন নহে ও মহাভারতীয় যুদ্ধঘটনা ৩১শত পূঃ খ্রীঃ অপেক্ষাও আধুনিক নহে, এ কথা পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন করা গিয়াছে। কাজেই যুদ্ধান্তে ভীষ্মের ৫৮ দিবস শরতল্পে শয়ন ও উত্তরায়ণের জন্য অপেক্ষা-বিষয়ক আখ্যায়িকাটি মহাভারতীয় যুদ্ধঘটনার অন্যূন ১৭০০ বৎসর পরে এমন কি তাহারও পূর্ব্বে উৎপন্ন হইয়াছিল বলিতে হয়।

শ্রীযুক্ত কানাইলাল ঘোষাল মহাশয় বিগত ১৩০২ সালের ভারতীর প্রথম সংখ্যায় "যুধিষ্ঠির ও মহাভারত" শীর্ষক প্রবন্ধ লিখিয়া দেখাইয়াছিলেন যে, উদ্যোগপর্ব্বের ১৪১ অধ্যায়ে কৃষ্ণকর্ণ-সংবাদে কার্ত্তিক মাসের রেবতী নক্ষত্রে শরতের অবসানের উল্লেখ রহিয়াছে। শুক্লপক্ষে মাসারম্ভ স্বীকার করিয়া গণনা করিলে দেখা যায়, কৃষ্ণপক্ষের দশমী তিথিতে চন্দ্র রেবতী নক্ষত্রে অবস্থান করিতেছিলেন। আবার ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দৌত্যকার্য্যের সপ্তমদিনে অমাবস্যা বা মাসের শেষ হইতেছে ও তৎপর দিন অগ্রহায়ণ মাসের আরম্ভ হইয়াছে। সেই দিন হইতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধারম্ভ হয়। সুতরাং যুদ্ধারম্ভের ৬৮ দিন পরে ভীষ্মদেবের মৃত্যু হয়। তাহার ৭ দিন পূর্ব্বে শরৎ শেষ হইয়াছিল। অর্থাৎ শরতের শেষ ও ভীষ্মদেবের দেহত্যাগের মধ্যে ৭৫ দিন গত হইয়াছিল। শরৎ শেষ হইবার ৬০দিন পরে উত্তরায়ণ হইবার কথা। এই হিসাবে ভীষ্মের মৃত্যুকালে উত্তরায়ণের ১৫ দিন হইয়াছিল বলিতে হইবে। কিন্তু ভীষ্মের মৃত্যুর ৭ দিন পূর্ব্বে উত্তরায়ণের আরম্ভ হইয়াছিল, এ কথা ভীষ্মের "ত্রিভাগশেষঃ" প্রভৃতি উক্তি হইতে জানা যায়। সুতরাং বলিতে হয় যে, এখন চান্দ্র অগ্রহায়ণে অয়ন পরিবর্ত্তন হইলেও আমরা যেমন প্রাচীন রীতির অনুসরণ করিয়া পৌষী পূর্ণিমাতেই উত্তরায়ণের আরম্ভ স্বীকার করিয়া থাকি, সেইরূপ সেকালে মাঘ প্রবৃত্তির ৮দিন পূর্ব্বে (বা পৌষকৃষ্ণা নবমীতে) প্রকৃতপক্ষে উত্তরায়ণের আরম্ভ হইলেও বেদাঙ্গ-জ্যোতিষের অনুসরণ করিয়া মাঘশুক্লা প্রতিপদে উত্তরায়ণের আরম্ভ হইয়াছিল। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে মহাভারতের সময়ে অয়নচক্র বেদাঙ্গ-জ্যোতিষ-কালের অপেক্ষা প্রায় ৭ অংশ পূর্ব্বে অগ্রসর হইয়াছিল, তাই উত্তরায়ণ প্রবৃত্তিতে ৭।৮ দিনের পার্থক্য ঘটিয়াছে। এই ৭ অংশ অগ্রসর হইতে অয়নের ৭×৭২=৫০৪ বৎসর লাগে। সুতরাং বেদাঙ্গ-জ্যোতিষ রচনাকালের (খ্রীঃ পূঃ ১৪শ শতাব্দীর) পঞ্চ শতাব্দী পরে অয়নের ঐরূপ অবস্থা হইয়াছিল।

কানাই বাবু এই সকল কথার বিচার করিয়া বলেন যে, মহাভারত খ্রীঃ পূঃ নবম শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল। কিন্তু আমরা

পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, পাণিনি ও আশ্বলায়নের সময়েও মহাভারত ছিল, আবার মহাভারতে শ্রবণাদি গণনারও উল্লেখ আছে। শ্রবণাদি গণনা খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৫ম শতাব্দীর অপেক্ষা প্রাচীন নহে তাহা দেখাইয়াছি, কাজেই বলিতে হয় যে, খ্রীষ্টপূর্ব্ব নবম শতাব্দীতে মহাভারতে অনেক কথা—বিশেষতঃ উদ্যোগপর্ব্বের ১৪১ অধ্যায় ও তৎসংসৃষ্ট অন্যান্য কথা এবং ভীষ্মের ইচ্ছামৃত্যু, উত্তরায়ণারম্ভকাল পর্য্যন্ত ৫৮ দিবস কাল শরশয্যায় তাঁহার অবস্থান ও তদবস্থায় শান্তি ও অনুশাসন-পর্ব্বের অন্তর্গত অধিকাংশ উপাখ্যান—সংযোজিত হইয়াছিল। এই সকল উপাখ্যান ও শ্রবণাদিগণনামূলক উপাখ্যানাদি যখন পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে, তখন পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায়টি খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৫ম শতাব্দীর পূর্ব্বে কখনই রচিত হয় নাই, ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। সৌতি যদি পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায়ের কর্ত্তা হন, তাহা হইলে তিনি ঐ সময়ের পরে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন বলিতে হইবে। এইরূপে জ্যোতিষ-শাস্ত্রের সাহায্যে মহাভারতীয় ভিন্ন ভিন্ন অংশের বা আখ্যায়িকার রচনাকাল ও মহাভারতের শেষ সংস্করণের রচনাকাল নির্দ্ধারিত হইতে পারে।

এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে, একদিকে যেমন নানা নূতন আখ্যায়িকার সংযোগে মহাভারতের আকার বৃদ্ধি পাইয়াছে, অপরদিকে আবার প্রাচীন মহাভারতের অনেক অংশ বিলুপ্তও হইয়াছে। পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায় মতে সৌতির সময়ে মহাভারতে (হরিবংশ ছাড়া) সর্ব্বশুদ্ধ ৮৪,৮৪৬ শ্লোক ছিল দেখা যায়। কিন্তু বর্ত্তমান মহাভারতের মুদ্রিত সংস্করণে ৮৩,২৪৬টির অধিক শ্লোক পাওয়া যায় না। আদি, উদ্যোগ, ভীষ্ম, সৌপ্তিক, শান্তি, অনুশাসন, অশ্বমেধ, আশ্রমবাসিক, মৌসল ও মহাপ্রস্থানিক পর্ব্বের যে শ্লোকসংখ্যা সৌতির পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায়ে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, প্রচলিত মহাভারতে তদপেক্ষা ২৯১৯টি শ্লোক কম দৃষ্ট হয়। অবশিষ্ট পর্ব্বসমূহে সৌতির নির্দ্দিষ্ট শ্লোক অপেক্ষা ১৮৯২টি শ্লোক বাড়িয়াছে দেখিতে পাই। এই অতিরিক্ত ১৮৯২টি শ্লোক যেমন সৌতির প্রচারিত শেষ সংস্করণের পর মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, অন্যদিকে সেইরূপ অন্যান্য পর্ব্বের প্রায় তিন হাজার প্রাচীন শ্লোক বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে এক শান্তি পর্ব্বেরই অন্যূন এক সহস্র শ্লোক লুপ্ত হইয়াছে। পক্ষান্তরে হরিবংশের শ্লোকসংখ্যা সৌতির আমলে ছিল ১২ হাজার, এখন বাড়িয়া হইয়াছে ১৬ হাজার। বোম্বাই সংস্করণে এই বৃদ্ধির পরিমাণ অতি সামান্য। অর্থাৎ ১২ হাজারের স্থলে ১২৫৮০ শ্লোক হইয়াছে।

মহাভারতে মেষাদি রাশির সংজ্ঞা।

এই সকল বিলুপ্ত শ্লোকের মধ্যে কতিপয় শ্লোক প্রাচীন লেখকদিগের রচনায় আমরা সময়ে সময়ে উদ্ধৃত দেখিতে পাই। দুই একটি উদাহরণ দিতেছি। "নির্ণয়-সিন্ধুর" দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ মহালয়-প্রকরণে নিম্নলিখিত শ্লোকটি মহাভারত হইতে উদ্ধৃত বলিয়া লিখিত হইয়াছে—

যাবচ্চ কন্যাতুলয়োঃ ক্রমাদাস্তে দিবাকরঃ।
শূন্যং প্রেতপুরং তাবদ্বৃশ্চিকং যাবদাগতঃ॥

"নির্ণয়ামৃত" নামক ধর্ম্মশাস্ত্র-বিষয়ক সংগ্রহ-

গ্রন্থে নিম্নলিখিত মহাভারতীয় রচনাটি উদ্ধৃত দেখা যায়—

> বার্ষিকাংশ্চতুরোমাসান্ ব্রতং কিঞ্চিৎ সমাচরেৎ।
> অসম্ভবে তুলার্কে তু কন্যায়াং তু বিশেষতঃ॥

এতদ্ভিন্ন "জলঘড়ি"র জন্য ঘটিকাপাত্র কিরূপে নির্ম্মাণ করিতে হয়, তাহার বর্ণনা-মূলক কয়েকটি শ্লোক মহাভারত হইতে এই গ্রন্থকার উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু প্রচলিত মহাভারতের কুত্রাপি ঐ সকল শ্লোক পরিদৃষ্ট হয় না। এ স্থলে এ কথার বিশেষভাবে উল্লেখ করিবার কারণ এই যে, বৈদেশিক মনীষিগণ প্রচলিত মহাভারতের কুত্রাপি দ্বাদশ রাশির উল্লেখ দেখিতে না পাইয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৪র্থ শতাব্দী পর্য্যন্ত বা মহাভারতের শেষ সংস্করণ সংকলিত হইবার সময় পর্য্যন্ত ভারতীয় আর্য্যগণের রাশিজ্ঞান হয় নাই; পরে গ্রীক জ্যোতিষী হিপার্কসের সময়ে (১৫০ পূঃ খ্রীঃ) গ্রীকদিগের নিকট হইতেই তাঁহারা রাশিজ্ঞান লাভ করেন। ফলতঃ নির্ণয়ামৃত ও নির্ণয়-সিন্ধুকারেরা মহাভারত হইতে যে সকল বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে যখন কন্যা, তুলা ও বৃশ্চিক রাশির উল্লেখ পাইতেছি, তখন পাশ্চাত্য মনীষীদিগের সিদ্ধান্তে কিরূপে বিশ্বাস স্থাপন করিব? রবি-সোমাদি বার সম্বন্ধেও পাশ্চাত্যগণ ঐ প্রকার মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু সৌতির মহাভারতের যে তিন সহস্র শ্লোক বিনষ্ট হইয়াছে, তাহার পুনরুদ্ধার সাধিত না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা এরূপ সিদ্ধান্ত করা সঙ্গত বলিয়া মনে করি না।

রামায়ণের রচনাকাল।

রামায়ণে মেষাদি রাশির সংজ্ঞা দেখিয়া অনেকে মনে করেন যে, গ্রীকদিগের সহিত ভারতবাসীর পরিচয় ঘটিবার পরে রামায়ণ রচিত হইয়াছে। ৺কাশীনাথ ত্র্যম্বক তেলঙ্গ মহাশয়ের মতে রামায়ণের বর্ত্তমান আকারে সংকলন বা রচনাকাল ৩০০ পূর্ব্ব-খ্রীষ্টাব্দে। কোনও কোনও বৌদ্ধপক্ষপাতী লেখক খ্রীষ্টজন্মের ৩ শত বৎসর পরে রামায়ণের শেষ সংস্করণের কাল নির্দ্দেশ করিতেও সমুৎসুক। শ্রীযুক্ত কানাই লাল ঘোষাল কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের ২৭শ ও ২৮শ সর্গের বর্ষা-বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, রামায়ণের সময়ে পুষ্যা পৌর্ণমাসী দিবসে দক্ষিণায়নের শেষ ও আষাঢ়ের পূর্ণিমায় উহার আরম্ভ হইত। নারায়ণের শয়নও ঐ দিবস আরব্ধ হইত। ভরত ঐ ব্রতাচরণ করিতেন বলিয়া (৪।২৮।৫৫) রামায়ণে উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু মহাভারতের সময়ে আষাঢ়ী একাদশীর দিন হরির শয়ন হইত।

> আষাঢ়ে তু সিতে পক্ষে একাদশ্যামুপোষিতঃ।
> চাতুর্ম্মাস্যং ব্রতং কুর্য্যাৎ যৎকিঞ্চিৎ প্রযত্নোনরঃ॥

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, রামায়ণোক্ত কালের ৪ দিবস পূর্ব্বে মহাভারতীয় কালে দক্ষিণায়ন ও নারায়ণের শয়ন আরম্ভ হইত। সুতরাং রামায়ণ মহাভারতের প্রায় ৪ × ৭২ = ২৮৮ বৎসর পূর্ব্বে বা ১১৬৫ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে রচিত হয়। বেদাঙ্গ-জ্যোতিষের সময়ে ঋতুপরিবর্ত্তনের যেরূপ নিয়ম ছিল, রামায়ণেও প্রায় সেইরূপই দেখিতে পাওয়া যায়।

সুতরাং রামায়ণের অন্ততঃ এই অংশ খ্রীষ্টপূর্ব্ব ১২০০ বৎসরে রচিত হইয়াছিল বলিতে হয়।

আদিকাণ্ডের ১৮শ সর্গে ভগবান্ রামচন্দ্রের জন্মসময়ের যে নির্দ্দেশ আছে, তদবলম্বনে মহারাষ্ট্রের জনৈক প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী ৺জনার্দ্দন বালাজী মোড়ক মহাশয় খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৫০০০ অব্দে রামচন্দ্রের আবির্ভাব-কাল নির্ণয় করিয়াছেন। পক্ষান্তরে কানাই বাবু লিখিয়াছেন যে, ঐ বর্ণনা হইতে কোনও মতেই রামচন্দ্রের আবির্ভাব নির্দ্ধারিত হইতে পারে না। "বাল্মীকি ও তৎসাময়িকবৃত্তান্ত"-লেখক বলেন,—"যে সময়ে ভারতে সূত্র-গ্রন্থের প্লাবন এবং তদনুসারিণী ক্রিয়াকলাপের বিস্তার, সেই সময়ে মহর্ষি বাল্মীকি প্রাদুর্ভূত হইয়া তাঁহার অতুলনীয় কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ পাণিনির গ্রন্থে মহাভারতীয় নায়কদিগের মধ্যে অন্ততঃ কয়েকজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির নাম উল্লিখিত দেখা যায়; কিন্তু রামায়ণোক্ত নায়কদিগের কাহারও নাম দৃষ্ট হয় না। এ কারণে অনেকেই রামচন্দ্রের প্রাচীনত্বে ও কোনও কোনও পণ্ডিত তাঁহার অস্তিত্বেও সন্দেহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিয়া দেখিলে ঐরূপ সন্দেহ সম্পূর্ণ অমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। সন্দেহকারীদিগের প্রতি আমাদের প্রথম প্রশ্ন এই যে, পাণিনি বৈয়াকরণ ছিলেন, অথবা আভিধানিক ছিলেন? দ্বিতীয়তঃ বৈয়াকরণ কি ভাষায় প্রচলিত যাবতীয় নামবাচক বিশেষ্য পদের উল্লেখ করিতে বাধ্য? অথবা সেরূপ করিবার তাঁহার কোনও প্রয়োজন থাকে? তিনি বহুসংখ্যক এক প্রকৃতি বা এক শ্রেণীভুক্ত শব্দের জন্য এক একটি সাধারণ সূত্র রচনা এবং যে সকল শব্দের মধ্যে কোনও প্রকার বিশেষত্ব থাকে, সে সকল শব্দের জন্য বিশেষ বিশেষ সূত্রের অবতারণা করিয়া থাকেন, ইহা কি সত্য নহে? যদি সত্য হয়, তবে পাণিনি যাহার নামোল্লেখ করেন, সেই দেশ, বস্তু, বা মনুষ্যবিশেষ তাঁহার সময়ে জনসমাজে অপরিজ্ঞাত ছিল, ইহা বলিব কেমন করিয়া? এ বিষয়ে অনুমানমূলক তর্কের প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া আমরা কয়েকটি বিশিষ্ট উদাহরণ দ্বারা আমাদের সিদ্ধান্তের যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করিতেছি। কৃষ্ণের নাম ঋগ্বেদের মন্ত্র-সংহিতার ৪।৫ স্থানে উক্ত হইয়াছে; তথাপি পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীতে "কৃষ্ণ" শব্দের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। রামের নাম সম্বন্ধেও সেই কথা। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৯৩ সূক্তের ১৪ মন্ত্রে পৃথুর পুত্র তান্বঋষি বলিতেছেন—

প্রতদ্দুঃশীমে পৃথবানে বেনে প্র রামে বোচমসুরে মঘবৎসু।
যে যুক্ত্বায় পঞ্চশতাস্ময়ু পথা বিশ্রাব্যেষাম্॥

"যে সকল দেবতা পঞ্চশত রথে অশ্বযোজনা করিয়া আমাদিগের জন্য যজ্ঞমার্গে আগমন করেন, তাঁহাদিগের বর্ণনাযুক্ত স্তোত্র আমি দুঃশীম, পৃথবান্, বেন ও বলশালী রাম প্রভৃতি রাজার ও অন্যান্য ধনশালী রাজার নিকট পাঠ করি।" এই মন্ত্রে রাম-নামক জনৈক আর্য্য নরপতির উল্লেখ পাইতেছি। মন্ত্রকৃৎ ঋষি তাঁহাকে "অসুর" বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন। ভাষ্যকার সায়ণ অসুর অর্থে "বলবান্" লিখিয়াছেন। ঋগ্বেদের সু-বহু স্থলে অসুর শব্দ ঐ

অর্থে ও দেবমহিমা-জ্ঞাপক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। (৺রমেশ বাবুর বেদানুবাদের ৭।২ সূক্তের ও ৯।৭৩ সূক্তের টীকা দ্রষ্টব্য।) আলোচ্য সূক্তের শেষ মন্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, তান্ব, পার্থ্য (যুবনাশ্বপুত্র) ও মায়ব ঋষি পূর্ব্বোক্ত নরপতিগণের নিকট সপ্তসপ্ততি-সংখ্যক গবী প্রার্থনা করিয়াছিলেন। (৺রমেশ বাবু এ স্থলে সায়ণের সম্পূর্ণ অনুসরণ না করায় তাঁহার অনুবাদ অস্পষ্ট হইয়াছে।) এই বলবান্ মহিমান্বিত রাম কোন্ বংশীয় নরপতি ছিলেন, ঋষির কথায় তাহা বুঝা যায় না। তথাপি তিনি যে বৈদিক দেবতার ভক্ত ছিলেন ও গোধন-দানে ঋষিদিগের বাসনা পূর্ণ করিতেন সে বিষয়ে সংশয় নাই। বলা বাহুল্য,'বেদজ্ঞ পাণিনির নিকট এই মহিমান্বিত রাম-নামক নরপতি অপরিচিত ছিলেন না; তথাপি তিনি স্বীয় অষ্টাধ্যায়ীর কোনও সূত্রেই রাম-নামের উল্লেখ করেন নাই। ঐ শব্দে ব্যাকরণগত বিশেষত্ব কিছু নাই বলিয়াই তিনি উহার উল্লেখ করা আবশ্যক মনে করেন নাই। ফল কথা, পাণিনি-সূত্রে কোনও বিষয়ের উল্লেখ না থাকিলেই যে ঐ বিষয়টি পাণিনির সময়ে অপরিজ্ঞাত ছিল, এরূপ মনে করা ঘোর-ভ্রান্তিমূলক।

শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর।

মানবের জন্মকথা। *

পূর্ব্ববর্ত্তী অন্য কোন জীব পরিবর্ত্তিত হইতে হইতে মানব উৎপন্ন হইয়াছে কি না? এই প্রশ্নের উত্তর যিনি মীমাংসা করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি বোধ হয় প্রথমেই অনুসন্ধান করিবেন যে মানব নিজে পরিবর্ত্তিত হয় কি না, যত অল্পই হউক মানবের দেহ ও মন কালক্রমে পরিবর্ত্তিত হয় কি না। যদি হয়, তবে ঐ পরিবর্ত্তন অন্য জীবের ন্যায় বংশানুক্রমে চলিয়া আসে কি না, তার পর আমরা যতদূর বুঝিতে পারি তাহাতে মানবের এবং ইতর জীবের একই সাধারণ কারণে, একই সাধারণ নিয়মাধীনে ঐ পরিবর্ত্তন ঘটে কি না। কখন কখন দেখা যায় যে, দেহের একাংশ পরিবর্ত্তিত হইলে তাহার

* ডারুইন প্রণীত Descent of Man-গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ। এই অনুবাদে নিম্নলিখিত পরিভাষা ব্যবহৃত হইবে।

Family—পরাজাতি।
Genus—গণ।
Species—জাতি
Varieties—প্রকার, ভেদ।
Race—বর্গ।
Sub-varieties—বিশেষ প্রকার।
Sub-race—বিশেষ বর্গ।
Correlation—সহ-পরিবর্ত্তন।
Mal-conformation—অসমসংস্থান।
Reversion—পূর্ব্বানুবৃত্তি।
Reduplication—অধিকাঙ্গত্ব।
Rudiments—অব্যবহার্য্য অঙ্গ।
Nascent—বিকাশশীল।
Ruminant—রোমন্থী।

সঙ্গে সঙ্গে অস্থাংশও পরিবর্ত্তিত হয়; এক অঙ্গের অধিক ব্যবহার হইলে তাহা সবল এবং ব্যবহার না থাকিলে তাহা দুর্ব্বল হইয়া ক্রমে লোপ হয় এবং ঐ রূপ ফল বংশানুগত হয়। * এই সকল এবং অন্যান্য নিয়ম কি মানবে এবং অপর জীবে তুল্য রূপে খাটে? কখন কখন দেখা যায়, সচরাচর যেরূপ ভাবে ও যেরূপ স্থানে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও দেহযন্ত্রাদি থাকে তাহার ব্যতিক্রম হইয়া গেল; কখন বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি রীতিমত পুষ্ট হইল না, কখন বা কোন অংশ বাড়িয়া গেল অথবা অধিক হইল; এ সকল নিয়ম কি অন্য জীবের ন্যায় মানবেও খাটে? যে স্থলে তাহার দেহগঠনের নিয়ম ব্যতিক্রম হয়, তদ্রূপ স্থলে কি পূর্ব্ববর্ত্তী কোন ইতর জীবের দেহের ন্যায় হইয়া থাকে? যিনি মানবের সম্বন্ধে জানিতে ইচ্ছা করিবেন তিনি ইহাও অনুসন্ধান করিবেন যে অনেকানেক ইতর জীবের ন্যায় মানবেরও কি প্রকার-ভেদ এবং বিশেষ-বর্গ-ভেদ হইয়াছে? যেরূপ হইলে পরস্পরের মধ্যে বড় বেশী প্রভেদ থাকে না সেইরূপ কি হইয়াছে? অথবা যেরূপ বর্গ-বিভাগে পরস্পরের মধ্যে এত অধিক বিভিন্নতা হয় যে এক জাতি বলিয়াই সন্দেহ হইতে পারে, তদ্রূপ বিভাগ ও কি মানবের মধ্যে হইয়াছে? এই সকল মানবীয় বর্গ ধরাতলে কিরূপ ভাবে ছড়াইয়া পড়িয়া বসবাস করিতেছে? আর, এই সকল বিভিন্ন বর্গীয় মানবের সংসর্গে পুত্র-কন্যা জন্ম গ্রহণ করিলে তাহাদিগের সংমিশ্রণে যদি আবার সন্তান-সন্ততি উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে কিরূপ নিয়মানুসারে হইয়া থাকে? এ সকল স্থলে বংশানুক্রমের নিয়ম কি? উপরের লিখিত প্রশ্নজিজ্ঞাসু ব্যক্তি এই সকল বিষয় এবং আরোও অনেকানেক বিষয় স্বভাবতই জানিতে ইচ্ছা করিবেন।

তৎপর তিনি এক গুরুতর বিষয় জানিতে ইচ্ছা করিবেন—'মানব কি এত অধিক পরিমাণে বংশ বৃদ্ধি করিয়া বাড়িয়া উঠে যে তন্নিমিত্ত সময় সময় জীবন-সংগ্রাম উপস্থিত হয়, অর্থাৎ আহার পাইবার জন্য পরস্পরে বিবাদ-বিসম্বাদ বাধিয়া উঠে;—এবং পরিণামে যে সকল মানবের দেহ অথবা মন জয়ী হইবার উপযুক্ত রূপে পরিবর্ত্তিত ও গঠিত হইয়াছে, তাঁহারা বাঁচিয়া যান এবং অনুপযোগিগণ মৃত ও পরিত্যক্ত হয়? মানবের মধ্যে কি কোন বর্গ অথবা জাতি অপর বর্গ অথবা জাতির উপর এরূপ ভাবে আক্রমণ করে যে প্রথমোক্তগণ শেষোক্তগণের স্থান অধিকার করিয়া লয়, আর শেষোক্তগণ সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়া যায়!' আমরা দেখাইব যে এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তরই—হাঁ। এ সকলের কতকগুলির যে হাঁ উত্তর হইবে, তাহা ত অনায়াসেই বুঝা যাইতেছে। নিম্নজীবগণের ন্যায় মানবের সম্বন্ধেও এ সমস্ত প্রশ্নের হাঁ উত্তর দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু এই সকল প্রশ্নের উত্তর

* ব্যবহার ও অ-ব্যবহারের ফল বংশানুগত হওয়া এখন আর জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ পূর্ব্বের ন্যায় বিশ্বাস করেন না। ওয়াইসম্যান-প্রমুখ পণ্ডিতগণ ঐ নিয়ম একবারেই স্বীকার করেন না।

পরে দেওয়াই সুবিধাজনক। এক্ষণে, কোন নিম্নপ্রাণী হইতে মানব উৎপন্ন হওয়ার কি প্রমাণ তাহার দেহে বর্ত্তমান আছে তাহাই প্রথমে দেখা যাউক। নিম্ন জীবগণের মনোবৃত্তির সহিত তুলনায় মানবের মনোবৃত্তির বিষয় পরবর্ত্তী অধ্যায় সকলে আলোচনা করিব।

মানবের দেহগঠন।

অন্য সমস্ত স্তন্যপায়ী জীবের দেহ যে আকারে গঠিত, যে ছাঁচে ঢালা, মানবেরও যে তদ্রূপই, তাহা সকলেই জানেন। তাহার দেহের সমস্ত অস্থির অনুরূপ অস্থিসকল বানরের, বাদুরের অথবা সিলের দেহে পাওয়া যায়, অর্থাৎ তাহার দেহাস্থির সহিত উহাদিগের দেহাস্থি তুলনীয়। তাহার পেশি, স্নায়ু, রক্তকোষসকল (blood vessels) এবং নাড়ী-ভুঁড়ি ইত্যাদি আভ্যন্তরিক যন্ত্রসকলও উহাদিগের অনুরূপ। তাহার মস্তিষ্কও উহাদিগের ন্যায় একই নিয়মাধীন, ইহা হাক্সলি এবং অন্যান্য অস্থিবিদ্যাবিদ্‌গণ দেখাইয়াছেন। বিস্‌কফ বিরুদ্ধমতাবলম্বী, তথাপি তিনিও স্বীকার করেন যে মানবমস্তিষ্কের প্রত্যেক (fissure and convolution) নালী ও আবর্ত্ত ওরাঙ্গের মস্তিষ্কের অনুরূপ। কিন্তু তিনি এই সূত্রে বলেন যে মানবের এবং ওরাঙ্গের মস্তিষ্ক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবার সময় কখনই সম্পূর্ণরূপে ঐক্য হয় না। কিন্তু সম্পূর্ণ একতা আশাও করা যায় না, কারণ তাহা হইলে মানবের ও ওরাঙ্গের মনোবৃত্তি সমানই হইত। * * * এ স্থলে মস্তিষ্কের এবং দেহস্থ অন্যান্য অংশের গঠন সম্বন্ধে মানবের সহিত উচ্চশ্রেণীস্থ অপরাপর স্তন্যপায়ী জীবের যে ঐক্য দেখা যায়, তদ্বিষয় সবিস্তার বর্ণনা করা বাহুল্য মাত্র।

তথাপি, কয়েকটি কথা এস্থলে উল্লেখ করা সঙ্গত বোধ হইতেছে। যদিও সে সকল কথার সহিত দেহ-গঠনের স্পষ্টতঃ অথবা নিকটভাবে যোগ না থাকুক, তথাপি উহা হইতে উপরি-উক্ত একতা বিলক্ষণ বুঝা যাইবে।

জলাতঙ্ক, বসন্ত, কণ্ঠপ্রদাহ, * উপদংশ, কলেরা, জ্বরঠুঁটো প্রভৃতি কতিপয় পীড়া ইতর জীবদিগের নিকট হইতে মানবে এবং মানব হইতে ইতর জীবে সংক্রমিত হইতে পারে। ইহা হইতেই মানবের এবং ইতর জীবের দেহকোষসকলের ও রক্তের সমতা প্রমাণিত হয়। ঐ সকলের অতি ক্ষুদ্রাংশের গঠন অথবা উহাদিগের উপাদানসকলের বিশেষ সমতা এই বৃত্তান্ত হইতে যেরূপ প্রমাণিত হয়, উৎকৃষ্ট অনুবীক্ষণ যন্ত্র অথবা রাসায়নিক বিশ্লেষণ দ্বারাও তদ্রূপ হয় না। যে সকল পীড়া সংক্রামক নহে, তাহার মধ্যে অনেকগুলি মানুষের যেমন হয়, বানরের ও তেমনি হইয়া থাকে। সিবাস এঝারি শ্রেণীর বানরদিগকে তাহাদিগের জন্মস্থানেই রেংগার বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়াছেন। তিনি দেখিয়াছেন যে উহাদিগের সর্দ্দি হইয়া থাকে, সর্দ্দির সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়, এবং পুনঃ পুনঃ সর্দ্দি হইলে শেষে

* অশ্বের।

কয়কাশি জন্মে। এই সকল বানরের সন্তান-যোগ ও মলভাণ্ডের (bowels) প্রদাহ হয় এবং চক্ষে ছানি পড়ে। ইহা-দিগের শিশুরা দুধের দাঁত পড়িবার সময় অনেকে জ্বররোগে মরিয়া যায়। ঔষধের ফল আমাদিগেরও যেমন হয়, উহাদিগের ও তেমনি হয়। অনেক প্রকার বানর চা, কফি এবং মাদক সরাপ খাইতে ভালবাসে। আমি নিজেই দেখিয়াছি, উহারা আহ্লাদের সহিত তামাক খায়। ব্রেস্ বলেন, আফ্রিকার উত্তরপূর্ব্ব ভাগের অধিবাসিগণ বাহিরে বিয়ার মদের পাত্র রাখিয়া দেয়, তাহা খাইয়া বানরেরা মাতাল হইলে উহাদিগকে ধরিয়া ফেলে। তিনি এইরূপ কতিপয় মাতাল বানরকে দেখিয়া তাহাদিগকে আবদ্ধ করেন। এই অবস্থায় তাহারা যেরূপ আচরণ এবং মুখভঙ্গী করিয়াছিল, তাহা তিনি বিলক্ষণ হাস্যোদ্দীপক ভাবে বর্ণনা করিয়া-ছেন। পর দিন প্রাতে তাহারা অতি খিট্-খিটে ও বিষণ্ণ হইয়াছিল, তাহারা দুই হাতে মাথা ধরিয়াছিল, বোধ হয় শিরঃপীড়া হইয়া থাকিবে; তাহাদিগের মুখের চেহারা অতীব শোচনীয় হইয়াছিল। তৎপর যখন আবার বিয়ার কিম্বা অন্য কোন মদ তাহা-দিগকে দেওয়া হইয়াছিল, তাহারা বিরক্ত হইয়া তাহা হইতে সরিয়া গেল; কিন্তু নেবুর রস খাইতে বেশ সুখ বোধ করিয়াছিল। এর্টেলিক শ্রেণীর এক যুনানী বানর ব্রাণ্ডি খাইয়া মাতাল হইবার পর আর কখনও উহা স্পর্শও করিত না। এ হিসাবে সে অনেক মানুষ অপেক্ষা সুবুদ্ধি ছিল। এই সকল সামান্য সামান্য বৃত্তান্ত হইতেও প্রমাণ হয় যে বানরের ও মানবের শ্বাস-উৎপাদক স্নায়ুসকল একই প্রকার; এবং উভয়েরই স্নায়ুমণ্ডল একভাবেই আক্রান্ত হয়।

মানবের দেহ মধ্যে পরপুষ্ট জীব * আছে, উহারা সময়ে সময়ে মানবের প্রাণনাশও করে। তাহার ত্বকেও ঐ শ্রেণীর জীব উপদ্রব করে। এ সকল অন্য স্তন্যপায়ী জীবদিগের দেহেও আছে। মানবের এবং অপর স্তন্যপায়ীর দেহস্থ পরপুষ্টেরা একই গণ এবং একই পরাজাতিভুক্ত। আর যে পরপুষ্ট কীট স্ক্যাবি-নামক চর্ম্মরোগ উৎপন্ন করে, তাহাও মানবে এবং অন্য স্তন্যপায়ী জীবে একই জাতীয়। অমা-বস্যা, পূর্ণিমা ইত্যাদি তিথির সহিত † গর্ভ-স্থিতি-কালের এবং অনেকানেক পীড়ার ভোগকালের ও পূর্ণতার কি যেন এক দুর্ব্বোধ্য সম্বন্ধ আছে; সেই দুর্ব্বোধ্য নিয়ম মানবের উপরও যেরূপ ক্রিয়া করে, অন্যান্য স্তন্যপায়ী জীব, পক্ষী, এমন কি কীটাদির উপরও তেমনি ক্রিয়া করে। মানবের এবং উহাদিগের ক্ষতসকল একই প্রণালী মত আরোগ্য হয়। মানবের, বিশেষতঃ মানব-ভ্রূণের, হস্তপদাদি কাটিয়া ফেলিলে গোড়ায় যে ভাগ থাকিয়া যায় সেই মূল ভাগ কখন কখন আবার ঐ অঙ্গ গঠন করিয়া লইতে সক্ষম হয়। এই রূপ নষ্টের পুনর্গঠন-শক্তি অতীব নিম্নতম জীবের ন্যায় মানবেরও কখন কখন দেখা যায়।

* দেহমধ্যে কৃমি ও দেহত্বকের উপর উকুন ইত্যাদি।
† অর্থাৎ চন্দ্রের গতির সহিত।

বংশবৃদ্ধি বিশেষ গুরুতর কার্য্য। এই অতীব গুরুতর কার্য্যের প্রণালী সকল স্তন্যপায়ী জীবেরই এক প্রকার। পুরুষগণ স্ত্রীগণকে প্রথম হইতেই যে ভাবে সম্মত করিবার চেষ্টা করে, সেই সময় হইতে অপত্য-প্রসব ও তাহার প্রতিপালন পর্য্যন্ত সমস্তই এই শ্রেণীর জীবে একই প্রকার। আমাদিগের শিশুরা যেমন অসহায় অবস্থায় জন্ম গ্রহণ করে, বানরেরও তাহাই, এবং কোন কোন গণভুক্ত বানরশিশু পূর্ণবয়স্ক বানর হইতে আকৃতিতে যতদূর বিভিন্ন, আমাদিগের মধ্যেও তদ্রূপই। কোন কোন লেখক, মানব এবং ইতর জীব সকলের এই প্রভেদটি বিশেষভাবে উল্লেখ করেন যে, মানব উহাদিগের অপেক্ষা অধিক বয়সে প্রাপ্তবয়স্ক হয়। কিন্তু এই প্রভেদ বেশী নহে, কারণ গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ওরাঙ্গও ১০ হইতে ১৫ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে প্রাপ্তবয়স্ক হয় না। স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষের দেহ বড়, বলিষ্ঠ এবং লোমশ। উহাদিগের মধ্যে মানসিক প্রভেদও আছে। তদ্রূপ অন্যান্য স্তন্যপায়ী জীবগণের মধ্যেও স্ত্রী-পুরুষের দেহ ও মন পৃথক্ ভাবাপন্ন। এই সমস্ত কথা বিবেচনা করিলে দেখা যায় যে দেহ-গঠনে (অস্থি, পেশী, শিরা ও স্নায়ু বিধানে) এমন কি অতি ক্ষুদ্র কোষ অথবা কোষগুচ্ছ রচনায়, দেহের রাসায়নিক উপাদানে এবং ধাতুতে, উচ্চশ্রেণীস্থ পশুগণের, বিশেষ বানরদিগের, সহিত মানবের বিশেষ সমতা এবং নৈকট্য আছে।

ভ্রূণের দেহগঠন।

অনুপ্রাণিত * স্ত্রীকোষ হইতে মানব গঠিত হয়। ঐ কোষের আয়তন এক ইঞ্চির ১২৫ ভাগের এক ভাগ। ইতর জীবগণেরও তাহাই, এ সম্বন্ধে উভয়ের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই। অন্যান্য স-মেরু † জীবগণের ভ্রূণের সহিত মানব-ভ্রূণের প্রথম অবস্থায় প্রভেদ বুঝিতে পারা বড় কঠিন। এই অবস্থাতে শিরাগুলি নানা শাখায় বিভক্ত হইয়া ইতস্তত: চলিয়া যায়, যেন কল্সাতে bronchiæ রক্ত বহিয়া লইবে; কিন্তু উচ্চ-শ্রেণীস্থ সমেরু প্রাণীদিগের কল্সাই নাই। তাহাদিগের ভ্রূণের কেবলমাত্র গলার পার্শ্ব-দেশে কয়েকটি ফাটার মত রন্ধ্র আছে। ইহাতেই বুঝা যায় যে ঐ স্থানই কল্সার স্থান। ভ্রূণ আরও কিছু বড় হইলে অর্থাৎ যখন হস্ত ও পদাদি প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হয়, তখন মানবের হস্তপদ এবং টিকটিকি, গিরগিটি শ্রেণীর ও স্তন্যপায়ী শ্রেণীর পদ, পক্ষিগণের পদ ও পাখা—এ সমস্তই এক মৌলিক অবয়ব হইতে উৎপন্ন হয়। বিখ্যাত ভন বেয়ার বলেন এক আকারের দেহাংশ হইতেই ঐ সকল গঠিত হয়। অধ্যাপক হাক্সলি বলেন যে, অবয়ব-গঠনের প্রায় শেষ সময়ে মানবশিশুর সহিত বানর-শিশুর পার্থক্য দেখা যায়, আর বানরশিশু

* স্ত্রী-কোষ পুং-কোষ কর্ত্তৃক অনুপ্রাণিত হইয়া যে যুক্ত-কোষ উৎপন্ন হয়, তাহার বিবর্দ্ধনেই ভ্রূণদেহ গঠিত হয়।

† যাহাদিগের মেরুদণ্ড আছে।

ও মানবশিশু উভয়েই কুকুরের বাচ্চার দেহ-গঠনের সহিত তুল্যরূপে বিভিন্ন হইয়া যায়। এই শেষ কথাটি অতীব বিস্ময়জনক হইলেও ইহার সত্যতা প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা দর্শিত হইতে পারে। * * * * * ‡ এই সকল বিশিষ্ট পণ্ডিতগণের মত উল্লেখ করিবার পর, এ বিষয়ে অর্থাৎ সমস্ত স্তন্যপায়ী জীবের ভ্রূণ-গঠনের সমতা দেখাইবার নিমিত্ত আর অধিক বিস্তৃতভাবে মতামত উদ্ধৃত করা আমার পক্ষে নিষ্প্রয়োজন। তবে এই মাত্র বলিতে ইচ্ছা করি যে, দেহগঠনের নানা অংশে মানবের ভ্রূণের সহিত কোন কোন পূর্ণবয়স্ক ইতর জীবের সমতা লক্ষিত হয়। মানবের ভ্রূণের হৃৎপিণ্ড প্রথম অবস্থায় একটা কুঞ্চন-প্রসারণ-বিশিষ্ট কোষমাত্র থাকে। মলাদি নিম্নভাগস্থ একটি থ'লের রন্ধ্র দিয়া নির্গত হয়; এবং মেরুদণ্ডের নিম্নতমভাগ ঠিক লেজের মত দেখা যায়। ঐ লেজবৎ অংশ ভ্রূণের প্রাথমিক পদ-যষ্টির স্থান ছাড়াইয়া অনেক দূরে আসে। যে সকল স-মেরু জীব বায়ু দ্বারা নিশ্বাস প্রশ্বাস করে, তাহাদিগের ভ্রূণ-দেহে কর্পোরা উল্‌ফিয়ানা নামক কতিপয় স্নায়ুগণ্ড (glands) পূর্ণদেহ মৎস্যের মূত্রাধারের অনুরূপ এবং উভয়ের ক্রিয়াও একপ্রকার। ভ্রূণের প্রায় পরিণত অবস্থায়, মানুষের সহিত নিম্নপ্রাণিগণের কোন কোন বিষয়ে বিশেষ সমতা দেখা যায়। বিস্‌কফ্ বলেন যে মানবভ্রূণের মস্তিষ্কের ভাজ ও ছাঁচ (convolutions) সপ্তম মাসের শেষ ভাগে যেরূপ পরিণতি প্রাপ্ত হয়, ব্যাবুন বাঁদরের পূর্ণ-যৌবনকালে তদ্রূপ হইয়া থাকে। অধ্যাপক ওয়েন বলেন, পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ, যাহাতে বল রাখিয়া মানুষ দাঁড়ায় ও হাঁটে, উহাই মানব-দেহের একটা চিহ্ন-জ্ঞাপক বিশেষত্ব। কিন্তু অধ্যাপক ওয়াইম্যান দেখিয়াছেন যে প্রায় এক ইঞ্চি দীর্ঘ মানবভ্রূণে পদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ অন্য অঙ্গুলিগুলি অপেক্ষা ছোট, এবং উহাদিগের সহিত সমান্তরাল ভাবে স্থিত নহে, বরং পায়ের একপার্শ্বে একটি কোণ সৃষ্টি করিয়া, বানরগণের বৃদ্ধাঙ্গুলির ন্যায় কোণাকোণি ভাবে ছড়াইয়া থাকে। এ বিষয় শেষ করিবার সময়ে এস্থলে আমি হাক্‌স্‌লির গ্রন্থ * হইতে একটি অংশ উদ্ধৃত করিব। তিনি প্রশ্ন করিতেছেন যে "মানুষ কি কুকুর, পক্ষী, ভেক ও মৎস্য হইতে পৃথক ভাবে জন্মে?" তাহার উত্তর এই—"এ প্রশ্নের উত্তরে একটুও সন্দেহ করিবার স্থল নাই। উৎপত্তির প্রণালি ও ভ্রূণের প্রাথমিক বিবর্দ্ধন মানবেরও যেমন, তাহার নিকটবর্ত্তী নিম্নজীবগণেরও তেমনই, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। নিশ্চয় এ সকল বিষয়ে বানর কুকুরের মত নিকটবর্ত্তী ও একভাবাপন্ন, মানব তাহা অপেক্ষা বানরের অধিকতর নিকটবর্ত্তী ও সমভাবাপন্ন।"

(ক্রমশ)

শ্রীশশধর রায়।

‡ ডারুইন এই স্থলে একটি মানব-ভ্রূণের ও একটি কুকুরের ভ্রূণের চিত্র দিয়াছেন, উহা দেওয়া গেল না।

* Man's place in Nature.

বঙ্গদেশে হিন্দুজাতির হ্রাসের কারণ

এবং তাহার প্রতিকার।

ভারতের লোকসংখ্যা।

এক্ষণে প্রতি দশ বৎসরে ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা গণনা দ্বারা নির্দ্ধারিত করা হইয়া থাকে। গত ১৮৭০ সালের লোক-গণনার সময় হইতে ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা নিম্নের তালিকা হইতে জানিতে পারা যাইবে।

সন	লোকসংখ্যা
১৮৭০	১৫, ৫৫, ৩৭, ৮৯৮ জন
১৮৮১	১৯, ৮৭, ৯০, ৮৫৩ ,,
১৮৯১	২২, ১১, ৭২, ৯৫২ ,,
১৯০১	২৩, ১০, ৮৫, ১৩১ ,,

উক্ত তালিকা দৃষ্টে দেখিতে পাওয়া যায় যে বিগত দশ বৎসরে (১৮৯১-১৯০১) সমগ্র ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা শতকরা গড়ে ২॥০ জন হিসাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। উহার পূর্ব্ববর্ত্তী দশ বৎসরে (১৮৮১-১৮৯১) কেবল মাত্র ব্রীটীশ ভারতেই লোকসংখ্যা শতকরা ১১।০ জন হারে বাড়িয়াছিল।

অন্যান্য দেশের তুলনায় এই লোক-বৃদ্ধি নিতান্তই অল্প।

ইংলণ্ডীয় যুক্তরাজ্যে ও অষ্ট্রেলিয়ায় প্রতি দশ বৎসরে গড়ে প্রতি সহস্রে ২৮ জন এবং ইটালী ও জর্ম্মাণীতে যথাক্রমে ৩৫ ও ৩৬ জন করিয়া লোক বৃদ্ধি পাইতেছে। ভারত গভর্ণমেণ্ট গত ১৮৮৪ সালে ভারতীয় প্রজা-বর্গের তৎকালীন অবস্থা দৃষ্টে অনুমান করিয়া-ছিলেন যে এ দেশে প্রতি বৎসর গড়ে প্রতি সহস্রে ১০ হইতে ১৫ জন হারে বৃদ্ধি পাইতে পারে। প্রকৃত পক্ষে যুদ্ধবিগ্রহহীন শান্তি-পূর্ণ উর্ব্বর দেশে বৎসরে শতকরা ১॥০ জন হিসাবে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি বৃদ্ধিই নহে। এতদনুসারে ও ১৯০১ সালের গণনায় আমাদের দেশের অধিবাসীর সংখ্যা ২৮, ২১,৭৯,৮৮৬ জন হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু বাস্তবিক তাহা না হইয়া তদপেক্ষা ৫,১০, ৯৪,৭৫৪ জন কম হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন ১৮৮১ সালে ব্রহ্মদেশ ব্রীটীশ-রাজ্যে যুক্ত হয় নাই। ১৯০১ সালের গণনায় তথাকার লোকসংখ্যা ৯২।০ লক্ষ স্থির হয়। উহা বাদ দিলে ১৮৯১ ও ১৯০১ সালে এ দেশের লোকসংখ্যা আরও কম হইবে।

ভারতে মৃত্যুসংখ্যা-বৃদ্ধি।

মাননীয় শ্রীযুক্ত গোখলে মহোদয় বড়লাট সাহেবের ব্যবস্থাপক সভায় সরকারী কাগজ-পত্র অবলম্বনে দেখাইয়াছিলেন যে বিগত ত্রিশ বৎসরে ভারতবাসীর মৃত্যুসংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতেছে। নিম্নের তালিকা হইতে কয়েক বৎসরের মৃত্যুসংখার হার জানা যায়—

১৮৮০	সাল	হাজার করা মৃত্যুসংখ্যা	২৩ জন
১৮৮৫	,,	,,	২৬ ,,
১৮৮৯	,,	,,	২৮ ,,
১৮৯৪	,,	,,	৩৫ ,,
১৮৯৭	,,	,,	৩৬ ,,
১৯০০	,,	,, ,,	৩৯ ,,

উপরি উক্ত বিবরণী হইতে ভারতবর্ষে দিন দিন কিরূপ অধিক হারে মৃত্যুসংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে, তাহা বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে।

বঙ্গদেশের অবস্থা।

বঙ্গদেশেও লোকসংখ্যা-বৃদ্ধির হার বিগত ত্রিশ বৎসরে অনেক কমিয়াছে। এই সময়ের মধ্যে বৃদ্ধির পরিমাণ প্রথম দশ বৎসরে শতকরা ১১॥০ জন, পরবর্ত্তী দশ বৎসরে ৭।০ জন, শেষ দশ বৎসরে উহা শতকরা ৫ জনে ঠেকিয়াছে। অর্থাৎ বিগত দশ বৎসরে লোকবৃদ্ধি প্রায় অর্দ্ধেক কমিয়াছে। তদ্ভিন্ন বাংলা দেশে মৃত্যুর হারও দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। গত অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে সকল স্থানেই উচ্চশ্রেণীর লোক প্রায় অর্দ্ধেক কমিয়াছে। প্রতি গ্রাম দেখিলেই বুঝা যায় ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর জাতিগণ প্রায় সকলেই লোপ পাইতে বসিয়াছে।

অপর দেশে লোকক্ষয়ের একমাত্র কারণ যুদ্ধ।

য়ুরোপীয় কোন দেশে যদি কোন বৎসরে লোকসংখ্যা তাদৃশ বৃদ্ধি না পায় তাহা হইলে এ কথা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে যে উহার একমাত্র কারণ যুদ্ধ। যে সকল জাতির পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ হয়, তাহাদের উভয়েরই মধ্যে অত্যল্প কাল মধ্যে বিস্তর লোকক্ষয় ঘটে। এবং যুদ্ধে পুরুষগণের মৃত্যু হওয়ায় তত্তদ্দেশে অন্ততঃ কিছু কালের জন্য অধিক সন্তান জন্মাইবার সম্ভাবনা থাকে না।

আমাদের দেশে যুদ্ধ ত অনেক কাল হয় নাই। ব্রিটীশ-শাসনগুণে আমরা সুখ-শান্তিতেই জীবন যাপন করিতেছি। এরূপ অবস্থায় অন্যান্য দেশে এরূপ প্রজাবৃদ্ধি হয় যে তদ্দেশীয় শাসনকর্ত্তাগণকে এই অতিরিক্তসংখ্যক প্রজাগণের আহারীয় দ্রব্য যোগাইবার ভাবনায় বিশেষরূপে চিন্তিত হইতে হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের এরূপ শান্তি সত্বেও বংশলোপ পাইবার সম্ভাবনা উপস্থিত।

এদেশে দুর্ভিক্ষ।

সমগ্র ভারতের সকল প্রদেশে এইরূপে লোকক্ষয়ের প্রধান কারণ দুর্ভিক্ষ। নিম্নের তালিকা হইতে গত শতাব্দীতে ভারতে দুর্ভিক্ষ জন্য কত লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, তাহা জানা যাইবে।

১৮০১-১৮২৫ সালে—মৃত্যুসংখ্যা—		১০ লক্ষ।
১৮২৬-১৮৫০ ”	”	৫ লক্ষ।
১৮৫০-১৮৭৫ ”	”	৫০ লক্ষ।
১৮৭৫-১৮৯০ ”	”	২ কোটী ৬০ লক্ষ।

ভারতহিতৈষী মহামতি ডিগবী মহোদয় তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে দেখাইয়াছেন যে বিগত ১৭৯৩ হইতে ১৯০০ সাল পর্য্যন্ত একশত সাত বৎসরে সমগ্র পৃথিবীতে যুদ্ধ-বিগ্রহে সর্ব্বসমেত মোট ৫০ লক্ষের অধিক লোক নিহত হয় নাই। কিন্তু ঐ সময়ের মধ্যে আমাদের দেশে অনশনে ৩ কোটী ২৫ লক্ষ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

আধি ও ব্যাধির প্রকোপ।

দুর্ভিক্ষ ছাড়িয়া দিলেও নানা প্রকার

আধি-ব্যাধির প্রকোপও দিন দিন বৃদ্ধি পাইয়া ভারতবর্ষে ভয়ঙ্কর প্রজাক্ষয় করিতেছে। প্লেগ ত সেদিন আসিয়া এখানে চিরকাল বাসের চেষ্টায় আছে। গত ১৮৯৬ সালে উহার এ দেশে প্রথম সূচনা প্রকাশ পায়। তৎকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত গত এগার বৎসরে অন্যূন ৪০ লক্ষ লোককে উহা যমালয়ে প্রেরণ করিয়াছে। ম্যালেরিয়া-জ্বরে বঙ্গদেশ উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে। বঙ্গদেশের কতিপয় বিশেষ জেলা ঐ কারণে ক্রমশঃ জনশূন্য হইতেছে। ছোটলাট সাহেবের ব্যবস্থাপক সভায় মাননীয় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের আগ্রহে কর্তৃপক্ষ যে তালিকা দাখিল করেন, তাহা বস্তুতই বিশেষ ভয়প্রদ। উহা হইতে জানিতে পারা যায় যে একমাত্র যশোহর জেলার অধিবাসীর মধ্যেই ১৮৯১—১৯০১ এই দশ বৎসরে ৭৫ হাজারের অধিক লোক কমিয়াছে। নদীয়া জেলার অবস্থাও মোটের উপর ঐরূপ। মালদহ, খুলনা, ফরিদপুর, বরিশাল প্রভৃতি বহুনগরের জন্ম-মৃত্যুর তালিকায় এই ভীষণ লোকক্ষয় প্রকাশ পাইতেছে। এক দিকে ম্যালেরিয়া, কলেরা, বসন্ত, প্রভৃতি রোগে তথাকার অধিবাসিগণের জীবন নাশ করিতেছে, অন্য দিকে জন্মসংখ্যাও ক্রমশঃ হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে।

ভারতে হিন্দুজাতি-ক্ষয়।

পূর্ব্বোক্ত কারণে ভারতবর্ষবাসী হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, জৈন প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে সমভাবে লোকক্ষয় হইতেছে এবং তজ্জন্য সকল জাতিরই যে সংখ্যায় বৃদ্ধি হওয়া উচিত, তাহা হইতেছে না। কিন্তু গত ১৯০১ সালের গণনায় এক অতীব ভীষণ তথ্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ১৮৯১-১৯০১ এই দশ বৎসরে ভারতে হিন্দুর সংখ্যা বৃদ্ধি না পাইয়া বরং হ্রাস হইয়াছে।

নিম্নের তালিকা হইতে ভিন্ন ভিন্ন গণনার সময় হিন্দুজাতির সংখ্যা জানিতে পারা যাইবে।

১৮৮১ সালে	১৮,৮৬,৮৫,৯১৩ জন
১৮৯১ ,,	২০,৭৭,৩১,৭২৭ ,,
১৯০১ ,,	২০,৭১,৪৭,০২৬ ,,

অর্থাৎ ১৮৯১-১৯০১ এই দশ বৎসরের মধ্যে হিন্দুজাতির সংখ্যা ৫, ৮৪, ৭০১ কমিয়াছে। উহার পূর্ব্ব দশ বৎসরে (১৮৮১-১৮৯১) হিন্দুজাতির সংখ্যা শতকরা ১০ জন হারে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কিন্তু তৎপরে শেষ গণনার সময় ·৩ হারে কমিয়াছে। যদি এই হারে হিন্দুর সংখ্যা হ্রাস না হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় বৃদ্ধি পাইত, তাহা হইলে ১৯০১ সালে ২২,৮৫,০৪,৮৯৯ জন হিন্দু দেখা যাইত, কিন্তু তাহা না হইয়া ২০,৭১,৪৭,২৬ জন হইয়াছে। অতএব এক হিসাবে ধরিতে গেলে, হিন্দুজাতির সংখ্যা দশ বৎসরের মধ্যে ২,১৩,৫৭,৮৭৩ জন কমিয়াছে। এ হিসাব ছাড়িয়া দিলেও প্রকৃতপক্ষে দশ বৎসরের মধ্যে প্রায় ছয় লক্ষ কম হওয়া বিশেষ ভাবনার বিষয়।

বঙ্গদেশে হিন্দুজাতি-ক্ষয়।

সমগ্র ভারতবর্ষের ন্যায় বঙ্গদেশেও হিন্দুজাতির যেরূপ হারে বৃদ্ধি হওয়া উচিত, তাহা না হইয়া বৃদ্ধির হার দিন দিন কমিতেছে। ইহাতে অত্যল্প কাল মধ্যে যে এ দেশেও

হিন্দুসংখ্যা কমিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। কয়েক বৎসর লোক-গণনার সময় বাংলার হিন্দুজাতির সংখ্যার তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল—

১৮৭২ সালে	১,৭১,১২,৯৪৫	জন
১৮৮১ ,,	১,৭২,৫৪,১২০	,,
১৯০১ ,,	১,৮০,৬৮,৬৫৫	,,

মাননীয় শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় গত পাবনা কন্‌ফারেন্সে এই বিষয়ে সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

গত সেন্‌সাস রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে, ভারতবর্ষে অন্যান্য জাতির সংখ্যা হিন্দু-জাতির ন্যায় কমে নাই। বরং বৃদ্ধি পাইয়াছে। ঐ গণনার দশ বৎসরে মুসলমান-সংখ্যা শতকরা ৮·৯ হারে বাড়িয়াছে। খ্রীষ্টানেরা ২৭·৯ হারে বাড়িয়াছে। অন্যান্য জাতীয়েরাও ঐ প্রকারে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

মুসলমান-সংখ্যা-বৃদ্ধি।

নিম্নের তালিকা হইতে মুসলমান-সংখ্যা কিরূপ বৃদ্ধি হইয়াছে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে। বঙ্গদেশের হিন্দুজাতির বিভিন্ন সময়ে সংখ্যা কত ছিল তাহা পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে। এক্ষণে তত্তৎ সময়ে ঐ প্রদেশে মুসলমানদিগের সংখ্যার তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল। এতদুভয়ের তুলনা আবশ্যক।

১৮৭২ সাল—	১,৬৬,৮০,৬৪৩ জন।
১৮৮১	১,৭৮,৬৩,৪১১
১৯০১	১,৯৫,৮২,০৪৯

পূর্ব্বের দুই তালিকা হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে ১৮৭২ সালে হিন্দুর সংখ্যা মুসলমানের অপেক্ষা মোটামুটী হিসাবে প্রায় সাড়ে চার লক্ষ অধিক ছিল। তৎপরে ১৮৮১ সালে দশ বৎসরের মধ্যে মুসলমান-সংখ্যা হিন্দুর অপেক্ষা ছয় লক্ষ বেশী হয়। অতএব দশ বৎসরের মধ্যে এক হিসাবে হিন্দুর সংখ্যা দশ লক্ষ কমিয়াছে। সর্ব্বশেষে গত ১৯০১ সালে মুসলমান-সংখ্যা হিন্দুর অপেক্ষা পনের লক্ষের অধিক বৃদ্ধি হইয়াছে। ঐ হিসাবে ধরিতে গেলে ১৯০১ সালের পর এই কয় বৎসরে মুসলমান-সংখ্যা হিন্দু-দিগের অপেক্ষা প্রায় ২৫ লক্ষ বেশী হইবে।

সমগ্র ভারতে যে সকল কারণে লোক-সংখ্যা-বৃদ্ধির হার দিন দিন কমিতেছে, তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে। সে সকল কারণ এদেশীয় সর্ব্ব সম্প্রদায়ের লোকের উপর সমভাবেই কার্য্য করিতেছে। সকলেই সমভাবে তৎকর্তৃক আক্রান্ত। দুর্ভিক্ষের দরুণ হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টীয়ান বৌদ্ধ, শিখ, জৈন, প্রভৃতি সকল জাতীয় বা সম্প্রদায়ের লোকেই সমভাবে অনশনে বা অর্দ্ধাশনে দিন যাপন করিতে করিতে অবশেষে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। ম্যালেরিয়া-জ্বরে বঙ্গদেশে হিন্দু, মুসলমান প্রভৃতি সকল জাতিই সমভাবে আক্রান্ত। প্লেগ জাতি-নির্ব্বিশেষে সকলকেই উৎসন্ন দিতে বসিয়াছে। কিন্তু সমভাবে আক্রান্ত হইয়াও অন্যান্য জাতির সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু হিন্দুজাতির বেলা সে নিয়মের ব্যত্যয় হয় কেন? অপর সকল জাতিই দুর্ভিক্ষ ও আধি-ব্যাধির প্রকোপে পড়িয়াও বৃদ্ধি হইতেছে, কিন্তু হিন্দুজাতির কেন হ্রাস হইতেছে?

লোকক্ষয়ের প্রধানতঃ দুই কারণ। ১ম—জন্ম-সংখ্যা-হ্রাস; ২য়—মৃত্যু-সংখ্যা-বৃদ্ধি।

অতএব হিন্দুদিগের মধ্যে কি কি কারণে মৃত্যুর আধিক্য ও জন্মসংখ্যার হ্রাস হইতেছে তাহার অনুসন্ধান আবশ্যক।

প্রথমতঃ সেন্‌সাস রিপোর্টে হিন্দুদিগের সংখ্যা-হ্রাসের যে সকল কারণ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহা বিশেষভাবে বর্ণনা করা যাইতেছে। তৎপরে সে সম্বন্ধে বিচার করা যাইবে।

সেন্‌সাস রিপোর্ট অনুসারে হিন্দু-জাতি ক্ষয়ের কারণ।

গত সেন্‌সাস রিপোর্টানুসারে নিম্নলিখিত কারণে হিন্দুজাতির ক্ষয় হইতেছে। ১ম—হিন্দুপ্রধান স্থানে (গণনার দশ বৎসরে) দুর্ভিক্ষের প্রকোপ যেরূপ অধিক হইয়াছিল, মুসলমান-প্রধান স্থানে সেরূপ হয় নাই। ২য়—যে সকল স্থানে দুর্ভিক্ষ হয় নাই সে সকল স্থানেও হিন্দুর অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যা বাড়িয়াছে। অথচ মুসলমান প্রায়ই হিন্দুর অপেক্ষা দরিদ্র। এ স্থলে মুসলমানের বংশবৃদ্ধির কারণ বিধবা-বিবাহ। হিন্দুসমাজে অনেক গর্ভধারণক্ষমা রমণী নিঃসন্তান থাকিতে বাধ্য হন। ৩য়—হিন্দু-সমাজে বাল্যবিবাহ। ৪র্থ—অনেক হিন্দুর ধর্ম্মান্তর-গ্রহণ। এই কারণগুলির বিস্তারিত বিচার করা যাইতেছে।

হিন্দুপ্রধান স্থানে দুর্ভিক্ষ-প্রকোপ।

১ম—দুর্ভিক্ষ। গত গণনায় সমগ্র ভারতের লোকসংখ্যা শতকরা ২·৪ হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু ঐ সময়ে কেবলমাত্র মুসলমান-সংখ্যা শতকরা ৮·৯ হারে বাড়িয়াছে। সেন্‌সাস রিপোর্টানুসারে মুসলমান-বৃদ্ধির প্রধান কারণ এই যে, উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গ, পঞ্জাবপ্রদেশের পশ্চিমাংশ, সিন্ধুদেশ, যুক্তপ্রদেশের মীরাট ও রোহিলখণ্ড বিভাগ প্রভৃতি মুসলমান-প্রধান স্থানে গণনার দশ বৎসরের মধ্যে দুর্ভিক্ষ হয় নাই। এজন্য ঐ সকল প্রদেশে ও অন্যান্য যে সকল স্থানে দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল সেই সকল স্থানের তুলনায় হিন্দুজাতিরও সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে, এতদ্ভিন্ন সিন্ধুপ্রদেশ বাদে সমুদয় বোম্বাই অঞ্চল, রাজপুতানা, মধ্য প্রদেশ, প্রভৃতি দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত স্থানে অত্যন্ত কম হারে বাড়িয়াছে।

দুর্ভিক্ষ হিন্দুক্ষয়ের একমাত্র কারণ নহে।

কিন্তু দুর্ভিক্ষ হিন্দুজাতির সংখ্যা-হ্রাসের একমাত্র কারণ নহে। কারণ যে সকল প্রদেশে দারুণ দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল তথায়ও মুসলমানেরা হিন্দুদের অপেক্ষা অধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। এবং যেখানে দুর্ভিক্ষ হয় নাই সেখানেও হিন্দুদিগের সংখ্যা মুসলমানদিগের অপেক্ষা কম হইয়াছে। নিম্নে কয়েকটি প্রদেশে হিন্দু ও মুসলমান উভয় জাতির বৃদ্ধির হার দেওয়া গেল।

বৃদ্ধির হার (শত করা)

	হিন্দু	মুসলমান
আসল বাংলা	৪	৭·৭
পূর্ব্ববঙ্গ	৬.৯	১২·৩
যুক্তপ্রদেশ	১	৬
মান্দ্রাজ	৬·৩	৯·১

এতদ্ভিন্ন পূর্ব্বোক্ত প্রকারে হিন্দুর হ্রাস ও মুসলমানের বৃদ্ধি বাংলার সকল

বিভাগেও দেখা যায়। কেবল আসাম প্রভৃতি স্থানে চা-আদি ব্যবসার জন্য অন্যান্য প্রদেশ হইতে লোক যাইয়া বাস করায় ঐ নিয়মের ব্যত্যয় ঘটিয়াছে। মান্দ্রাজ, পঞ্জাব, যুক্তরাজ্যের প্রায় সকল বিভাগেই ঐরূপ হইয়াছে। কেবল দুই এক স্থানে কোন বিশেষ লৌকিক কারণে মুসলমান-সংখ্যা ঠিক পূর্ব্বোক্ত হারে বৃদ্ধি পায় নাই। বোম্বাই প্রদেশে মুসলমানসংখ্যা হিন্দুর অপেক্ষা আরও অধিক হারে বাড়িয়াছে। তথায় মুসলমানবৃদ্ধির হার শতকরা ৫ জন, কিন্তু হিন্দু শতকরা ৭ জন হারে কমিয়াছে। তাহার কারণ বোম্বায়ের সামীল সিন্ধু-প্রদেশ মুসলমান-প্রধান স্থান, এবং তথায় গণনার দশ বৎসরের মধ্যে দুর্ভিক্ষ হয় নাই। কিন্তু ঐ অঞ্চলেও হিন্দুর সংখ্যা মুসলমান অপেক্ষা কমিয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত অবস্থা দৃষ্টে ইহা এক প্রকার স্থির হয় যে কেবলমাত্র দুর্ভিক্ষই হিন্দু-জাতি-হ্রাসের কারণ হইতে পারে না। কারণ, তাহা হইলে যে সকল স্থানে দুর্ভিক্ষ হয় নাই সে সকল স্থানেও হিন্দুর অপেক্ষা মুসলমান-সংখ্যা এত অধিক বৃদ্ধি হইত না। এ সকল প্রদেশে মুসলমান-বৃদ্ধির কয়েকটি বিশেষ কারণ সেন্সাস রিপোর্টে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এক্ষণে উহাদের বিচার আবশ্যক। এবং তৎসহ ঐ সকল স্থানে যে কারণে হিন্দুজাতির ক্ষয় হইতেছে, তাহারও বিচার করিতে হইবে।

হিন্দুজাতির স্বধর্ম্ম-ত্যাগ ও পর-ধর্ম্ম-গ্রহণ।

উক্ত কারণগুলির মধ্যে হিন্দুজাতির স্বধর্ম্ম-ত্যাগ ও পরধর্ম্ম-গ্রহণ একটি কারণ। বিগত গণনার দশ বৎসরে (১৮৯১-১৯০১) হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী অনেক লোক স্বধর্ম্ম ত্যাগ পূর্ব্বক পরধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। উহাদের মধ্যে যাহারা মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের সংখ্যা সেন্সাস রিপোর্টানুযায়ী সমগ্র ভারতে অতি অল্প। কেবলমাত্র মালাবার প্রদেশে কিছু অধিক। তাহার কারণ তথায় মাপীল্লাদিগের মধ্যে মুসলমান-ধর্ম্মপ্রচারে যাদৃশ যত্ন ও আগ্রহ দেখা যায়, অন্য কোথাও তাদৃশ দেখা যায় না।

হিন্দুসন্তানের ধর্ম্মান্তর-গ্রহণে হিন্দু-জাতির ও সমাজের বিশেষ ক্ষতি হইতেছে। গত সেন্সাস রিপোর্ট অনুসারে দশ বৎসরে অন্যূন ছয় লক্ষ হিন্দু কেবল খ্রীষ্টান হইয়াছে। এইরূপে খ্রীষ্টধর্ম্ম-গ্রহণের বিশেষ কারণ আছে। যে সকল হিন্দু খ্রীষ্টান হইয়াছে, তাহাদের অধিকাংশের স্থান হিন্দু-সমাজে অতি নিম্নে। এজন্য উহাদের পক্ষে স্বধর্ম্ম-ত্যাগে কিছু মাত্র ক্ষতি নাই। বরং লাভ অনেক। হিন্দুসমাজের অপরাপর জাতীয়েরা উহাদিগকে অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষে দেখে এবং নিতান্ত অস্পৃশ্য মনে করে। এমন কি, উহাদের ছায়া পর্য্যন্ত মাড়াইলে পাপ হয় ভাবে। উহাদের বিদ্যাশিক্ষা নিষেধ। বিদ্যার্জ্জন দ্বারা তাহাদের নিজের বা নিজবংশধরের অবস্থার উন্নতি করার পথ তাহাদের পক্ষে বদ্ধ। বর্ত্তমান সময়ে জাতীয়-ব্যবসাবলম্বনে তাহাদের অবস্থার উন্নতির কোন আশা নাই। তদ্দ্বারা কোন প্রকারে স্বীয় পরিবারবর্গের অন্নসংস্থান মাত্র হইতে পারে। তথাপি তাহারা জাতীয়

ব্যবসা পরিত্যাগ করিতে পারে না। কিন্তু খ্রীষ্টধর্ম্ম-গ্রহণে তাহাদের অবস্থা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হয়, বিদ্যাশিক্ষার পথ তাহাদের পক্ষে একেবারে উন্মুক্ত, অপর কোন অর্থকরী ব্যবসা অবলম্বনে আর কোন প্রকার বাধা থাকে না, কিছু উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে পারিলেই অপরাপর উচ্চবর্ণীয় ন্যায় অন্ততঃপক্ষে কেরাণী-পদলাভও তাহাদের পক্ষে বিচিত্র নহে। সংসারের কার্য্যক্ষেত্রে সকল বিষয়েই তাহাদের উচ্চ-জাতীয়গণের সহিত সমান অধিকার। পাদরী-সম্প্রদায় তাহাদিগকে সাক্ষাৎকালে সাদরে সম্ভাষণ ও অভ্যর্থনা করেন। এমন কি, অনেক সময় তাঁহাদের সহিত বিশেষ হৃদ্যতাও দেখান। এরূপ ক্ষেত্রে যখন লাভের পরিমাণ এত অধিক তখন মানুষের পক্ষে তাহার লোভ সম্বরণ করা দুরূহ। এই সকল কারণে হিন্দুসমাজের নিম্নস্তর হইতে বহুল পরিমাণে লোক খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছে। বাখরগঞ্জ, ফরিদপুর, প্রভৃতি জেলায় নমশূদ্রেরা এবং অপরাপর স্থান হইতে চামার, মেথর, ডোম, চণ্ডাল প্রভৃতি জাতীয়েরা অধিক সংখ্যায় খ্রীষ্টান হইতেছে।

সেন্‌সাস রিপোর্ট হইতে আরও জানা যায় যে এদেশে দুর্ভিক্ষের সময় খ্রীষ্টধর্ম্ম অধিক প্রচারিত হয়। দুর্ভিক্ষের সময় খ্রীষ্টান মিশনারীগণ এদেশীয় পিতৃমাতৃহীন অনেক অনাথ বালকবালিকাগণের যাবজ্জীবন ভরণ-পোষণের ভার গ্রহণ করেন। উহারা মিশনারী-প্রতিষ্ঠিত অনাথাশ্রমের আশ্রয়ে লালিত ও পালিত হইয়া খ্রীষ্ট[illegible] গ্রহণ করে। [illegible] জেলায় ১৮৯১ সালের লোকগণনার সময় খ্রীষ্টানদের সংখ্যা মোটে দুই হাজারের কিছু উপরে ছিল। গত ১৯০১ সালের গণনায় তথায় খ্রীষ্টানদিগের সংখ্যা একবারে পঁচিশ হাজারের অধিক হইয়াছে। এইরূপ, আহমদাবাদে ১৮৯১ সালে খ্রীষ্টান সংখ্যা ছয় হাজার হইতে ১৯০১ সালে ২১ হাজার হইয়াছে। সেন্‌সাস রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে যাহারা খ্রীষ্টান হইয়াছে, তাহাদের বয়স অধিকাংশ স্থলে পাঁচ হইতে পনের বৎসর মধ্যে। ১৮৯১-১৯০১ সাল মধ্যে এদেশে ঘন ঘন দুর্ভিক্ষের আবির্ভাব হওয়ায় এত অধিক সংখ্যক খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে।

এইরূপে যাহারা সামাজিক অবস্থায় প্রপীড়িত হইয়া অথবা দুর্ভিক্ষের সময়ে হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া হিন্দুসমাজ হইতে বহির্গত হইয়া খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করে, তাহারা ভিন্ন অপর এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহারা অন্য ধর্ম্ম বা সমাজ গ্রহণ করুন বা না করুন, অন্ততঃ হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী বা হিন্দু-সমাজভুক্ত বলিয়া পরিচয় দেন না। তাঁহা-দের অধিকাংশই বিদ্যা বা উচ্চপদ লাভাশায় বিলাতে গমনপূর্ব্বক তথায় অবস্থানকালে হিন্দুজাতির আচার ব্যবহার পরিত্যাগ এবং হিন্দুশাস্ত্র-নিষিদ্ধ খাদ্যাদি গ্রহণ করেন। এ কারণ তাঁহারা এদেশে ফিরিয়া আসিয়া আর হিন্দুদিগের সহিত মিশিতে পারেন না বা চাহেন না। হিন্দুসমাজও তাঁহাদিগকে অবাধে গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক নহে। এরূপ [illegible] তাঁহাদের হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজ ত্যাগ [illegible] অনেকেই ব্রাহ্ম [illegible] করেন।

অনেকেই আবার কোন সমাজভুক্ত না হইয়া নিজেরাই এক স্বতন্ত্র-সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া থাকেন। এক্ষণে এই শ্রেণীর লোকেরই সংখ্যা অধিক।

পূর্ব্বে হিন্দুজাতির-ক্ষয়ের যে সকল কারণ নির্দ্দেশ করা হইল, তাহাদিগকে বাহ্যিক কারণ বলা যাইতে পারে। নিম্নে যে সকল কারণের বিষয় বর্ণিত হইবে, তাহাদিগকে আভ্যন্তরীণ কারণ বলা যাইতে পারে। এ সকল কারণ হিন্দুজাতির সামাজিক অবস্থার উপর নির্ভর করে।

হিন্দু ও মুসলমান এই দুই জাতির সামাজিক নিয়ম সকল তুলনা করিলে দুইটি বিশেষ পার্থক্য উপলব্ধি হয়। প্রথমতঃ মুসলমানদিগের মধ্যে বালিকা ও বালকদিগের বিবাহ একেবারে প্রচলিত নাই বলিলেই হয়। কিন্তু হিন্দুদিগের মধ্যে বাল্যবিবাহই নিয়ম। দ্বিতীয়তঃ মুসলমানদিগের ভিতর বিধবা-বিবাহ প্রচলিত আছে, হিন্দুদিগের মধ্যে উহা একেবারে নিষিদ্ধ। এই দুই কারণে হিন্দুদিগের মধ্যে জন্মসংখ্যা কম।

বিধবা-বিবাহ।

গত ১৯০১ সালের সেন্সাস রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে ১৫ হইতে ৪০ বৎসর বয়সের বিধবা, হিন্দুদের মধ্যে শতকরা ১৬ জন, এবং মুসলমানদিগের মধ্যে শতকরা ১২ জন। হিন্দুদিগের মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত না থাকায় অনেক রমণী, যাঁহারা বিধবা না হইলে অথবা পুনর্ব্বিবাহ করিতে পাইলে অনেকগুলি সন্তানের জননী হইতে পারিতেন, তাঁহারা নিঃসন্তান থাকেন। এ কারণ মুসলমানদিগের মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত থাকায়, হিন্দুদিগের মধ্যে জন্মসংখ্যা মুসলমানদিগের অপেক্ষা কম।

বাল্য-বিবাহ।

হিন্দুদিগের মধ্যে জন্মসংখ্যা কম হওয়ার অপর এক কারণ তাহাদের বাল্য-বিবাহ-প্রথা। মুসলমানদিগের মধ্যে ৫ হইতে ১০ বৎসর বয়সের মধ্যে শতকরা ৭ জনের, হিন্দুদিগের মধ্যে এ বয়সে শতকরা ১২ জনের বিবাহ হয়। মুসলমানদের মধ্যে ১০ হইতে ১৫ বৎসর বয়সের মধ্যে শতকরা ৩৯ জনের, হিন্দুদের মধ্যে ঐ সময়ে শতকরা ৪৭ জনের বিবাহ হয়। অর্থাৎ ১০ হইতে ১৫ বৎসর বয়সের মধ্যে প্রায় অর্দ্ধেক হিন্দু বালিকাগণেরই বিবাহ হইয়া থাকে। অপেক্ষাকৃত অধিক বয়সে বিবাহ হওয়ায় মুসলমানদিগের মধ্যে গর্ভধারণের বয়স থাকিতে অত্যল্পসংখ্যক স্ত্রীলোক বিধবা হয়। এবং বিধবা হইবার পূর্ব্বেই তাহারা তাহাদের সমবয়স্কা হিন্দু স্ত্রীলোকগণের অপেক্ষা অধিক সন্তান প্রসব করিয়া থাকে। কাহার কাহার মতে বাল্যকালে বিবাহ হইলে সন্তানোৎপত্তি অধিক হওয়া সম্ভব। কিন্তু বাস্তবিক এ কথা ঠিক নহে। যদি দেশের সমুদয় জনসংখ্যার উপর পড়তা না করিয়া কেবলমাত্র বিবাহিত স্ত্রীলোকদিগের সংখ্যার উপর পড়তা করিয়া জন্মসংখ্যার পড়তা স্থির করা যায়, তাহা হইলে ইংলণ্ডের জন্মসংখ্যা ভারতবর্ষের অপেক্ষা অনেক অধিক দেখিতে পাওয়া যাইবে। অথচ ইংলণ্ডে ভারতের ন্যায় বাল্যবিবাহ চলিত নাই। এতদ্ভিন্ন মুসলমান ও অন্যান্য যে

সকল জাতির মধ্যে বাল্যবিবাহ হয় না তাহাদেরও মধ্যে জন্মসংখ্যা অধিক। অপর পক্ষে হিন্দুদের মধ্যে উত্তরবিহারে বাল্য-বিবাহ সর্ব্বস্থানাপেক্ষা অধিক প্রচলিত। কিন্তু তথায় বহুকালাবধি লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পায় নাই, এক ভাবেই আছে। ইহা হইতে সপ্রমাণ হয় যে বাল্যবিবাহে অধিক সন্তান-উৎপাদনের সম্ভাবনা নাই। অনেক ডাক্তারের মতে বাল্যকালে সহবাস হেতু অপরিণত বয়সে গর্ভ হওয়ায় বালিকাগণের অতি শীঘ্রই গর্ভধারণ-ক্ষমতা একেবারে লুপ্ত হয়। তবে কোন কোন স্থানে বাল্যে বিবাহ হইলেও বালিকা যৌবনের প্রারম্ভ কাল পর্য্যন্ত পিতৃগৃহে বাস করে এবং স্বামী সহবাস করিতে পায় না। এ কারণ তাঁহা-দের সন্তান উপযুক্ত বয়সেই হইতে আরম্ভ হয় এবং তাঁহারা অপেক্ষাকৃত অধিক বয়স পর্য্যন্ত সন্তান প্রসব করিতে পারেন। অতএব বাল্যবিবাহই সন্তানজন্মের বিশেষ অন্তরায় নহে। বরং বাল্যে স্বামী-সহবাসই উহার প্রধান অন্তরায়। বাল্যে বিবাহ হইলে অপরিণত বয়সে স্ত্রীসহবাস হেতু পুরুষ-দিগেরও সন্তানোৎপাদন-ক্ষমতা অতি শীঘ্রই লোপ পায়। এ বিষয়ে অধিক লেখা বাহুল্য।

সেন্‌সাস্ রিপোর্ট অনুসারে যে সকল কারণে প্রধানতঃ হিন্দুদিগের মধ্যে জন্ম-সংখ্যা কম হইতেছে, তাহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন সেন্‌সাস্ রিপোর্টে উহার আর কতকগুলি কারণের উল্লেখ আছে। সেগুলি এক্ষণে সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাইতেছে।

বিবাহিত-স্ত্রীপুরুষের বয়স-তারতম্য।

হিন্দুদিগের মধ্যে বিবাহিত স্ত্রীপুরুষের বয়সের অত্যন্ত তারতম্য দৃষ্ট হয়। অনেক স্থলেই বিবাহকালে পুরুষের বয়স স্ত্রীলোকের বয়সের প্রায় দ্বিগুণ থাকে। এ কারণ এতদুভয়ের মধ্যে যতগুলি সন্তান হওয়া সম্ভব তাহা হয় না। প্রথমতঃ স্ত্রীলোকেরা, বালিকা বয়সে বিবাহ হওয়ায়, অপরিণত বয়সে সন্তান প্রসব করিতে করিতে অত্যল্প কাল মধ্যে এবং অল্প বয়সে গর্ভধারণ-ক্ষমতা হারায়। আর স্ত্রীলোকের গর্ভধারণের উপযুক্ত বয়স হইতে হইতেই পুরুষের সন্তানোৎপাদনোপযোগী বয়স চলিয়া যায়। তাহার আর তখন সন্তানোৎপাদনের ক্ষমতা থাকে না। এ কারণেও হিন্দুদিগের মধ্যে জন্ম-সংখ্যা মুসলমানদিগের অপেক্ষা কম।

খাদ্যের তারতম্য।

এতদ্ভিন্ন খাদ্যের তারতম্য হেতু মুসলমান-রমণী হিন্দু-রমণী অপেক্ষা বলবতী। এজন্য তাঁহারা তাঁহাদের হিন্দুভগিনী অপেক্ষা অধিক সংখ্যায় সন্তান প্রসব করিতে সক্ষম হন। *

(ক্রমশ)

শ্রীরাধারমণ মুখোপাধ্যায়।

* শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় "বঙ্গদেশে হিন্দুজাতির ক্ষয়ের কারণ ও তাহার প্রতীকার" সম্বন্ধে সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধের জন্য এক শত টাকা পুরস্কার দিবেন বলিয়া বিজ্ঞাপন দিয়া-ছিলেন। প্রবন্ধ-পরীক্ষার ভার শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী মহাশয়দিগের হস্তে

পরিচয়।

'তোমার কেবল্ ঐ এক কথা। তুমি যা হয় কর। আমি কিছু বলব না।' গৃহিণী কামিনী দেবী এই বলিয়া প্রস্থানোদ্যত হইলে স্বামী বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহাকে নিবৃত্ত করিয়া বলিলেন "আমি কি কিছু অন্যায় বলছি, তুমি একবার ভেবেই দেখ। সরলা বার বছরে বিধবা হয়েছে, তখন তার কি জ্ঞান ছিল? আর ধর্ম্মাধর্ম্ম যা বলছ, আমি কি তা ভাবিনি? বরং তোমার চেয়ে বেশীই ভেবেছি। তা তাকে একবার বুঝিয়ে বলতে কি কিছু দোষ আছে? মেয়েকে জোর করে এ রকম যন্ত্রণা দেওয়াটা কি পাপ নয়?" কামিনী দেবী স্বামীর এ কথা শুনিয়া বলিলেন, 'বেশ আমি সরলাকে বুঝিয়ে বলতে পারি, কিন্তু তার অমত থাকলে প্রাণান্তে আমি তার বিয়ে দিতে দেব না। তা তুমি যাই বল আর যাই কর।' শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ওরফে মিঃ বনারজী পত্নীর এ উত্তর পাইয়া আর কোন কথা বলিলেন না। পত্নীর মন যখন কিছু ফিরিয়াছে তখন ক্রমে তাহাকে যে স্বমতে আনিতে পারিবেন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের এ বিশ্বাস ছিল। কাজেই এ প্রসঙ্গে আর বেশী কিছু বলা তিনি সমীচিন মনে করিলেন না; আশঙ্কা, কি জানি বেশী জেদে আবার পত্নী যদি বিরূপ হইয়া বসেন।

ইহার পর হইতে কন্যার বিবাহ লইয়া প্রতি রাত্রে স্বামীস্ত্রীতে বাদানুবাদ চলিতে লাগিল। কন্যার দীনবেশ ও দুঃখ দেখিয়া মাতার চক্ষের জল শুখাইত না; একাদশীর দিন কামিনী দেবীও সরলার মত ফলমূল খাইয়া কাটাইতেন। নিরাভরণা কন্যার দুঃখ ভাবিয়া জননী অলঙ্কার খুলিয়া ফেলিয়াছিলেন। বিবাহাদি আনন্দ উৎসবে কন্যার মত কামিনী দেবীকেও আর বড় দেখা যাইত না। কন্যার বৈধব্য-যন্ত্রণা দেখিয়া সধবা জননীও তাঁহার সকল সুখাভিলাষ বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। তথাপি এ পর্য্যন্ত কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে স্বামীর সহিত কামিনী দেবী একমত হইতে পারেন নাই। কিন্তু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাহাতে বিরক্ত হইতেন। তিনি কুমারী-সুলভ বেশ-ভূষায় সরলাকে সজ্জিত করিতে প্রয়াস পাইতেন। কন্যার আনত আঁখি এবং মলিন মুখ দেখিয়া তাঁহার বুক ফাটিয়া যাইত। মিঃ বনারজী পূর্ব্বে শাস্ত্রের ধার বড় ধারিতেন না। কিন্তু তিনি এখন ধর্ম্মশাস্ত্র মথিত করিয়া খ্যাতনামা পণ্ডিতমণ্ডলীর অধীত গ্রন্থ হইতে

অর্পিত হয়। প্রাপ্ত প্রবন্ধসমূহের মধ্যে বিচারকগণের মতে শ্রীযুক্ত রাধারমণ মুখোপাধ্যায়ের লিখিত এই প্রবন্ধই পুরস্কারের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়। পূর্ব্ব প্রকাশিত বিজ্ঞাপন অনুসারে ইহা বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইল; এজন্য শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্র বাবুর নিকট আমরা কৃতজ্ঞ। লেখকের মতামতের সহিত পুরস্কারদাতা, পরীক্ষকগণ এবং আমরা অনেক স্থলে একমত হইতে পারি নাই। বং সং।

শাস্ত্র-ব্যাখ্যা সংগ্রহ করিয়া কামিনী দেবীকে বুঝাইতেন—বিধবা বালিকার বিবাহ শাস্ত্র-সম্মত, ও তাহাতে পাপ নাই। ক্রমে নানা শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও যুক্তিতে কামিনী দেবীর মত পরিবর্ত্তন হইল।

সরলা প্রথম যে দিন জননীর নিকট তাহার বিবাহের প্রস্তাব শুনিল সে দিন সে কোন কথাই বলিতে পারিল না, ঘরে বসিয়া নিম্ন দৃষ্টিতে কি ভাবিতে ভাবিতে অন্যমনা হইয়া পড়িল। কামিনী দেবী কন্যাকে নিরুত্তর দেখিয়া সে দিন আর বড় কিছু বলিলেন না; ভাবিলেন কন্যা এখন বড় হইয়াছে, দু'দিন ভাবিয়া দেখুক, তার পর আবার না হয় এ কথা তুলিবেন। কিন্তু সরলা কোন দিনই জননীর প্রস্তাবে কোন কথাই বলিল না। সে যে ইহার কি উত্তর দিবে কিছুই ত ভাবিয়া পায় না। জননীকে সে বাধা দিতেও পারে না, লজ্জায় তার মুখ লাল হইয়া ওঠে।

বিলাত প্রত্যাগত অক্সফোর্ডের এম্ এ ব্যারিষ্টার মোহিনীমোহনকে কামিনী দেবী যে দিন দেখিলেন, সে দিন হইতে তাঁহার অধিকতর আগ্রহ প্রকাশ পাইতে লাগিল। দুধের মেয়ে সরলা। এই তার সবে চৌদ্দ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছে! এ কচি বয়সে সে স্বামীর মর্ম্ম আর কি বুঝিয়াছে? বিবাহের পর সে সবে মাত্র পনের দিন শ্বশুর-ঘর করিয়াছিল। সে-ও আজ তিন বছরের কথা। কৈ বিবাহের প্রস্তাবে সরলা ত বিশেষ কোন অমত করে নাই? লজ্জায় সে না হয় তাঁহাকেই কিছু না বলিতে পারুক, কিন্তু তেমন অমত হইলে অবশ্যই কিছু না কিছু বোঝা যাইত। জননীরও যখন মনোভাব এইরূপ দাঁড়াইল, তখন আর সরলার বিবাহের আয়োজনের বিলম্ব হইল না। কথা যখন স্থির হইয়া গেল তখন তাহা অচিরেই প্রকাশ হইয়া পড়িল। পাড়ায় রটিয়া গেল সরলার আবার বিবাহ।

স্বামীর মৃত্যুর কিছু পর হইতেই পিতার নিকট সরলা প্রায়ই শুনিত বিধবা বালিকার বিবাহ শাস্ত্রসম্মত, তাহাতে পাপ নাই। তিনি উপযুক্ত পাত্র পাইলে সরলারও বিবাহ দিবেন। সরলা সে কথায় বড় কান দিত না। হিন্দুর কন্যা বিবাহের নামেই লজ্জায় জড়সর হইয়া যায়, তাহাতে এ আবার বৈধব্যের পর বিবাহ। তাই তার বিবাহ সম্বন্ধে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কোন কথা উত্থাপন করিলে বালিকা সে স্থান হইতে চলিয়া যাইত। কিন্তু সরলা যে দিন মাতার নিকট শুনিল, তিনিও তাহার বিবাহের পক্ষপাতী, সেদিন হইতে কি একটা অব্যক্ত বেদনা তাহার হৃদয়কে পীড়িত করিতে লাগিল। সরলা এখন প্রতিদিনই পিতা ও মাতার অলক্ষ্যে তাহার বিবাহ সম্বন্ধে যে কথা হইত তাহা শুনিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। সে একদিন শুনিল এ বিবাহ যখন তাহার অমতে হইতেছে না, বিশেষ তাহার মনে যখন তাহার স্বামীর স্মৃতি এমন কিছু নাই তখন ইহাতে কোনই পাপ নাই; বরং জোর করিয়া তাহাকে বৈধব্য-যন্ত্রণায় রাখাতেই প্রত্যবায় আছে। এখন কিন্তু সারা নিশি দিনই সরলার মনে তাহার মৃত স্বামীর কথা আপনিই উদয় হয়। বিবাহের পর শ্বশুরালয় হইতে তাহার কলিকাতায় ফেরার

কথা মনে পড়িল। সেই নদীর উপর নৌকায় করিয়া তাহারা উভয়ে আসিতেছিল—সে আজ কত দিনের কথা। সরলা জীবনে তাহার পূর্ব্বে কখন কলিকাতার বাহির হয় নাই। সে স্থির নয়নে নদীবক্ষে চঞ্চল তরঙ্গ-ভঙ্গ দেখিতেছিল। নদীর দুইধারে খর্জ্জুর তাল অশ্বত্থ গাছের সারি, কোথাও আম্র-বাগান, কোথাও দু'একটি বৃক্ষ নদীগর্ভে হেলিয়া পড়িয়াছে; কোথাও বা আকণ্ঠ-মগ্ন ঝাউশীর্ষে স্থির নেত্রে বক বসিয়া আছে, চঞ্চল নদী-স্রোত খর বেগে কাশ-গুচ্ছ কাঁপাইয়া তরতর শব্দে বহিয়া যাইতেছে; সন্ধ্যালোকে শ্বেত, নীল, পিঙ্গল বর্ণের পক্ষীদল দিগদিগন্তর হইতে ঝাঁকে ঝাঁকে নীড়াভিমুখে চলিয়াছে;—ক্রমে সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল। পরপারে মন্দিরাভ্যন্তর হইতে আরতির শঙ্খ-ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল; সে শব্দ নদী বক্ষে সহস্র প্রতিধ্বনিতে ভাসিতে ভাসিতে ছুটিয়া চলিল। বালিকা তন্ময় হইয়া তাহাই লক্ষ্য করিতেছিল। এমন সময় পশ্চাত হইতে শশাঙ্ককুমার বালিকাকে বাহুযুগলে বেষ্টন করিয়া বলিলেন—'কি সরলা, ভয় লাগছে?' সরলা কেবল একটি ছোট্ট উত্তর দিল 'না'। শশাঙ্ককুমার তাহাতে ছাড়িল না, তাহার ইচ্ছা সরলা তাহার সহিত একটু ভাল করিয়া কথা কয়। কিন্তু বিয়ের কনে, তার কি বেহায়ার মত স্বামীর সহিত কথা কহা ভাল দেখায়?—বড় লজ্জা করে। দাসী বামা-ই বা কি ভাবিবে। ধীরে অতি ধীরে স্বামীর বাহুতে মুখ রাখিয়া সরলা বলিল 'ছি! বামা দেখ্‌ছে।' শশাঙ্ক হাসিয়া বলিল—'কলিকাতায় তোমাদের বাড়ীতে গেলে ত কথা কইবে?' স্মিত মুখে সরলা বলিল—'কব।' বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সরলাকে বাটী লইয়া যাইবার জন্য ষ্টেসনে আসিয়াছিলেন; শশাঙ্ককুমার তাঁহাদের রেলে উঠাইয়া দিয়া অনিমেষ নেত্রে যতদূর দৃষ্টি চলে সরলার প্রতি চাহিয়াছিল। সরলা এখনও যেন সে দৃষ্টি ভুলিতে পারে নাই। ক্রমে আজ তাহার হৃদয়ে সকল সুপ্ত স্মৃতিই জাগিয়া উঠিল। জলভরে তাহার চক্ষু ভরিয়া আসিল। বালিকা তাহার পর কতদিন তাহার স্বামীর কথা ভাবিয়াছে। সে কতবার মনে করিয়াছে এ বার স্বামী আসিলে মন খুলিয়া তাঁহার সহিত কথা কহিবে। কিন্তু হায়! বালিকার সে আশা আর পূরিল না। এইরূপে এখন প্রতি রাত্রেই তাহার স্বামীর কথা সরলার মনে হইত। কখন তাঁহার স্মিত আনন, কখন তাঁহার প্রেমপূর্ণ দৃষ্টি বালিকার মানসপটে ফুটিয়া উঠিত। কখন তাহার মনে হইত সে যেন শশাঙ্ককুমারের স্বর শুনিতেছে। বালিকা এমনি করিয়া স্বামীর ছোট ছোট স্মৃতি মনে আনিত—কিন্তু "ভাবি' তার মুখখানি গোটা মনে পড়ে না"—সে পূর্ণ মূর্ত্তি মনে আনিতে পারিত না। ইহাই বুঝি ভালবাসার ধর্ম্ম।

কিন্তু এদিকে সরলার বিবাহ একরূপ পাকাপাকি স্থির হইয়া গেল। পাড়ার প্রতিবাসী রমণীমহলে বড় গোল উঠিল। গৃহিণীরা বন্দ্যোপাধ্যায়-দম্পতীর উদ্দেশে নানা প্রকার তীব্র সমালোচনা করিতে ছাড়িল না। তাঁহাদের স্বামী-মহলেও

প্রায় এইরূপই হইল। দু'এক জন বা সহানুভূতি দেখাইলেন; কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যাই বা কত! কিন্তু সরলা কি যে করিবে কিছুই ত ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না। পিতামাতা বলিয়াছেন—এ বিবাহে দোষ নাই, যেখানে মৃত স্বামীর কথা মনে পড়ে না সেখানে বিবাহে কি পাপ? কিন্তু লোকে যা-ই বুঝুক, সরলা ত শশাঙ্ককুমারকে ভুলিতে পারে নাই। আজও যে শশাঙ্কের লেখা তাহার হৃদাকাশে ফুটিয়া আছে। দ্বিধাপীড়িতচিত্তে সরলা একদিন মধ্যাহ্নে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। সে স্বপ্নে দেখিল তাহারা উভয়ে যেন আবার নৌকাযোগে কোথায় চলিয়াছে। সরলা আর তেমনটি নাই। এবার তার মুখ ফুটিয়াছে; স্বামীর এ দীর্ঘ অদর্শনের জন্য যেন সে তাঁহাকে অনুযোগ করিতেছে; অভিমানে বালিকার কপোল বাহিয়া অশ্রু ঝরিতেছে। শশাঙ্ক আদর করিয়া তাহা মুছাইয়া দিতেছেন; এমন সময়ে দ্বারদেশে জননী ডাকিলেন,—'সরলা!' বালিকা চক্ষু মেলিল। তাহার সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। কিন্তু তাহার চক্ষু তখনও ছল ছল করিতেছিল; আঁখির পাতা দুটিও বুঝি ভার হইয়াছিল। কামিনীদেবী সবই লক্ষ্য করিলেন। প্রকাশ্যে সরলাকে বিশেষ কিছু বলিলেন না, ভাবিলেন প্রতিবেশীরা কেহ কিছু বলিয়া থাকিবে। কন্যাকে শুধু বলিলেন,—দেখ্ লোকে পরের ভাল দেখ্‌তে পারে না। আর আমরা বাপ-মা হয়ে তোর কিছু অন্যায় করতে পারি? তোর পক্ষে যা অন্যায় আমরাই তা করতে দেব কেন? প্রথমে ত বাছা কিছু বলিসনি। এখন আবার একি? ছি মা, অমন কত্তে নেই।' পত্নীর নিকট হইতে এ কথা মিঃ বনারজীর কানে উঠিল। তিনি কথাটা উড়াইয়াই দিলেন, বলিলেন—'ও কিছু নয়; বিয়ে হয়ে গেলে, ভাল স্বামীর হাতে পড়লে ওসব সেরে যাবে। পাঁচ জনার পাঁচ কথায় ছেলে মানুষের মন খারাপ হতে কতক্ষণ? তা তুমি ওকে আর যার তার কাছে যেতে দিও না।' কামিনীদেবী বলিলেন—'তা এখনও বোঝ, সত্যই মেয়ের যদি মত না থাকে তা হলে এ বিয়েতে সে সুখী হতে পারবে না। আর এতে আমাদেরও জোর করতে নেই।' বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গম্ভীর ভাবে বলিলেন—"একেই ত বলে স্ত্রী-বুদ্ধি! দু'টো হিংসুক লোকের কথায় মেয়ের মন ভাল নেই, আর অমনি ঠিক হ'ল মেয়ের সম্পূর্ণ অমত। আমি ত কতবার ও কথা বলেছি। পাড়ার লোকদের ত চেন, ক'জনা পরের ভাল দেখ্‌তে পারে?"

পিতার সান্ত্বনায় ও মাতার আশ্বাসে সরলা যদিও তাহার পর হইতে আপনাকে দৃঢ় করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহার হৃদয়ে মৃত স্বামীর স্মৃতি ক্রমেই গাঢ় হইতে গাঢ়তররূপে প্রতিফলিত হইতে লাগিল। তাহার পিতামাতাও তাহাকে তাহার নূতন জীবনের উপযোগী করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়া উঠিলেন। উভয়ে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সরলার বিবাহ পর্য্যন্ত তাঁহাদের খিদিরপুরের পুরাতন বাটীতে যাওয়াই স্থির করিলেন। সরলা সে বাটীতে ছেলেবেলায় কয় বৎসর মাত্র কাটাইয়াছিল।

খিদিরপুরে যাইয়া সরলা আপনাকে বড়ই একা বোধ করিতে লাগিল। সেও যে সাধ্যমত তাহার মনকে সংযত করিতে চেষ্টা একেবারেই করে নাই, তাহা নহে; কিন্তু এখন শশাঙ্ককুমারকে আর তার ভাবিতে হয় না। ক্ষুদ্র কয় মাসের সে অস্পষ্ট স্বামী-স্মৃতিই এখন ধীরে ধীরে তাহার হৃদয়াকাশে পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছিল। মাতার নিকট সে মোহিনীমোহনের গুণাবলি শুনিয়াছিল। সে নিজেও মোহিনীমোহনকে দেখিয়াছে, কন্দর্পের মত রূপবান অর্থশালী মোহিনীর তুলনায় শশাঙ্ককুমারের স্মৃতি অতি ম্লান বলিয়াই প্রতিভাত হইত। তথাপি সরলার নিকট তাহার দেবতারই আদর যে বড় বেশী। সরলা হাজার চেষ্টা করিয়াও শশাঙ্ককুমারকে ভুলিতে পারিল না।

বিবাহের আর বড় বেশী দেরী নাই। মিঃ বনারজীর মুখে হাসি ফুটিয়াছে, তাঁহার সে বিমর্ষভাব আর নাই। তিনি এখন হর্ষোৎফুল্লবদনে কন্যার বিবাহের উদ্যোগে ব্যস্ত। গৃহিণীও ভাবী জামাতার জন্য কার্পেটের জুতা, ফুলের তোড়া, উলের আসন প্রভৃতি লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন; বাড়ীতে কাজের বিরাম আর নাই। মজুরের হুড়াহুড়ি, মিস্ত্রীর ডাকাডাকি, সরকারের বকাবকিতে সে সুপ্ত বাটী মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। দেখিতে দেখিতে ম্রিয়মাণ 'বনারজী-কুটীর' বিবিধবর্ণে নবীন দীপ্তিতে হাসিয়া উঠিল। সরলাও এখন কোনরূপে অন্যমনা হইতে চায়। সে আর ভাবিতে পারে না। ভগবান যাহা করিবেন তাহাই হইবে। তাহার সাধ্য কি? সে ক্ষুদ্র বালিকা, বৃথা ভাবিয়া আর কি করিবে? মনের অবস্থা যখন এরূপ, তখন একদিন সে শুনিল, তার সইয়া বহুদিন পরে আবার খিদিরপুরে আসিয়াছে। সরলা তাহার মাতাকে ধরিল, বলিল—সে একবার তার সইমাদের দেখিয়া আসিবে,—অনেক দিন তার সইকে দেখে নাই, তাহার সংবাদ লইয়া আসিবে। মাতা আপত্তি করিলেন না। সরলাকে কোন প্রকারে অন্যমনা করা তাঁহারও অভিপ্রেত। সরলা গাড়ী হইতে নামিয়া সইমার বাটীতে প্রবেশ করিয়া কাহাকেও বড় চিনিতে পারিল না। যাহারা সেখানে উপস্থিত ছিল তাহারা সরলার অপরিচিত। এ অবস্থায় পড়াতে সরলার নিজের ভিতর একটু সঙ্কোচের ভাব আসিয়া পড়িল। সে যেন কি বলিতে যাইতেছিল এমন সময় একটি ক্ষুদ্র বালিকা উপর হইতে নামিয়া আসিয়া 'সলুদিদি' বলিয়া সরলাকে জড়াইয়া ধরিল। কিন্তু তথাপি সে যেন কিছু আশ্চর্য্য হইয়া তাহার সলুদিদির মুখপানে তাকাইয়া রহিল। বৃদ্ধা হারুর মা সরলাকে কতবার দেখিয়াছে, সে-ও তাহার এ বেশভূষা-পরিবর্ত্তনে প্রথমে সরলাকে চিনিতে পারে নাই; তাই যেন কিছু বিস্মিত হইয়া সরলাকে অপাঙ্গে নিরীক্ষণ করিয়া বলিয়া উঠিল, "গিন্নি মা গঙ্গা নাইতে গেছেন, একটু পরেই আস্‌বেন। দিদি সবই ত শুনেছ, দিদিমণির,—' তাহার কথা শেষ হইতে না হইতে বালিকা সরলার অঞ্চল টানিয়া উপরে লইয়া গেল, বলিল 'দিদি ঐ

ঘরে পূজো করছে।' 'সই আবার এত পূজা করতে কবে শিখলি লো' বলিয়া সরলা তাহার কক্ষে প্রবেশ করিল; কিন্তু তথায় যাহা দেখিল তাহাতে তাহার বাক্য রুদ্ধ হইয়া আসিল। তাহার চক্ষু ফাটিয়া জল ঝরিতে লাগিল এবং নিমেষালসপক্ষ্মনেত্রে সে মুণ্ডিতকেশা গৈরিকবসনা ধ্যাননিরতা খিন্নদেহা সইকে দেখিয়া সবই বুঝিতে পারিল। দেখিল সম্মুখে—তাহার সইএর মৃত স্বামীর এক বৃহৎ তৈলচিত্র। সরলা কথা কহিতে পারিল না। সজল নেত্রে ধীর পদে সে কক্ষ ত্যাগ করিল। গৃহের বাহিরে আসিয়া কম্পিত কণ্ঠে খুকীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, 'সইকে বলিস কাল আবার আসব।' নিম্নে গাড়ী প্রস্তুত ছিল, বিনা বাক্যে সরলা সে গৃহ ত্যাগ করিল।

পথে সরলা তাহার সইএর কথা ভাবিতে ভাবিতে তন্ময় হইয়া পড়িল। সে ত আজ ছয় মাসেরই কথা—তখন সে সইকে দেখিয়াছিল, যেন একটি সদ্য প্রস্ফুটিত কুসুম, উন্মেষিত জীবনের যৌবন ছটা তাহার অঙ্গে অঙ্গে উছলিয়া পড়িতেছিল। এখনও সরলার মানসপটে তাহার সইএর সে মূর্ত্তি ভাসিতেছিল। আর আজ, ভীষণ বাতাঘাতে সে ফুল্ল কুসুম ধূলিমলিন হইয়াছে। তাহার সইএর দশা আজ কি হইয়াছে! নীরবে কয় ফোঁটা অশ্রু কপোল বাহিয়া তাহার হস্তে পড়িল; সে তপ্ত অশ্রুস্পর্শে সরলার যেন চমক ভাঙ্গিয়া গেল; সে চাহিয়া দেখিল, গাড়ী তাহার গৃহদ্বারে আসিয়া লাগিয়াছে; একবার আপনার বেশভূষার উপর তাহার দৃষ্টি পড়িল; বালিকা কাঁপিয়া উঠিল। একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া নিঃশব্দে সরলা আপন কক্ষে চলিয়া গেল।

আজ সরলার আশীর্ব্বাদ। জননী সরলার আসিতে বিলম্ব দেখিয়া উদ্বিগ্ন হইতেছিলেন। পরিচারিকাদের মুখে সরলা বাটী ফিরিয়াছে শুনিয়া কামিনী দেবী সরলাকে সাজাইবার উদ্দেশে ব্যস্তসমস্ত হইয়া অলঙ্কারাদি হস্তে কন্যার কক্ষে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু সরলা কোথায়? বিস্ময়বিহ্বলনেত্রে জননী দেখিলেন কক্ষপ্রান্তে যোগিনীর মত নিরাভরণা সরলা একটি ক্ষুদ্র আলেখ্য হস্তে বসিয়া আছে, এবং দরদর ধারে নীরবে তাহার অশ্রু ঝরিতেছে; আর তাহার চতুষ্পার্শ্বে কর্ত্তিত ঘন কৃষ্ণ কেশদাম সাদ্যঃছিন্ন কালো আঙ্গুরগুচ্ছের ন্যায় ইতস্ততঃ পড়িয়া রহিয়াছে। কক্ষের ম্যাটিং সাজ-সজ্জা সবই সে উঠাইয়া ফেলিয়াছে, তাহার স্থলে একটি পরিত্যক্ত ছিন্ন কম্বলাসন পড়িয়া রহিয়াছে। এ দৃশ্য দেখিয়া কামিনী দেবীর হস্তস্থিত অলঙ্করণ-সামগ্রী খসিয়া পড়িল, তিনি সরলাকে ক্রোড়ে করিয়া লইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। সরলা মাতৃবক্ষে মুখ লুকাইয়া তাঁহার অঞ্চল সিক্ত করিতে লাগিল।

শ্রীপ্রফুল্লনারায়ণ রায়।

পল্লী-স্মৃতি।

সেই ঘাট, সেই বাট
সেই সে শ্যামল মাঠ
ছিল সে যেমন ;
সেই বধূ সন্ধ্যা হ'লে
ভরাকুম্ভ লয়ে চলে
আগের মতন।

প্রশান্ত আকাশ তলে
অপরাহ্নে কুতূহলে
সেই বর্ণবেশে
আরক্ত-পাটল ছবি
সেই ফোটে আজো সখি
দিবসের শেষে ;

দু'ধারে নদীর তীরে
বাঁশবন চুমে নীরে
অন্ধকার মাঝে,
মাদলের তালে তালে
সঙ্গীতের স্রোত চলে
আজো নিত্য সাঁঝে।

সারাদিন ঘুরে ফিরে
পাখীরা কুলায়ে ফেরে
অশথের শাখে ;
মেঘপথে বলাকার
শ্রেণী চলে সারে সার
ক্ষীণ সন্ধ্যালোকে।

গৃহে ফেরে ধেনুগুলি
প্রান্তরে উড়ায়ে ধূলি
সুদূর পথের,
পরিচিত মেঠো গানে
কত স্মৃতি জাগে প্রাণে
—যুগ যুগান্তের।

ধূসর বিটপি 'পরে
ম্লান আলো খেলা করে
নিভন্ত রবির,
পশ্চিম গগন কোণে
একটী তারকা জ্বলে—
কম্পিত অস্থির।

অতীত স্মৃতির মত
মিলায় আলোক যত
আকাশের পটে,
বিচিত্র বর্ণের রেখা
রেখে যায় ক্ষীণ লেখা
নীলিমার তটে।

চারিদিকে শঙ্খ বাজে
মঙ্গল কামনা মাঝে
সন্ধ্যার আহ্বানে,
বধূরা তুলসী তলে
মাটীর প্রদীপ জ্বালে
চর্চ্চিত প্রাঙ্গণে।

পট্টবস্ত্র পরিহিতা
গৃহকর্ত্রী শুচিস্মিতা
ক্ষুদ্র পূজা-ঘরে
সাজান ফুলের মালা
সাজান নৈবেদ্য থালা
নিত্য পূজা তরে।

সন্ধ্যার গভীর ছবি
কোথা আর অনুভবি—
হেথায় যেমন ?
জন্ম-মৃত্যু সন্নিক্ষণ
স্বর্গ-মর্ত্ত্য সম্মিলন
কি আছে এমন ?
সকলি ত আছে তাই,
মাঝে শুধু সে ত নাই
আমার অঙ্গনে ;

আমারি নাই সে দেবী,
নাই সে স্বরগ-ছবি
মর্ত্ত্যের প্রাঙ্গণে !
ম্লান গেহ পূজা-ঘর,
নাহি সে মঙ্গল কর,
নাহি দীপ-ছায়—
হায়, একসাথে দু'জনায়
সেই বসা অর্চ্চনায়
এমন সন্ধ্যায় !

শ্রীসুধীরচন্দ্র মজুমদার।

সূর্য্য-পূজা

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

কেহ হয় ত কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, উড়িষ্যায় এত স্থান থাকিতে লাঙ্গুলীয় নরসিংহ রাজ বা তাঁহার কোনো পিতৃপুরুষ কোণার্কের ন্যায় জনহীন স্থানে আবর্ত্তসঙ্কুল বঙ্গোপসাগরের তরঙ্গভঙ্গরব-মুখরিত বেলাভূমে এত অর্থ ব্যয় করিয়া তপনদেবের মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন কেন? এই প্রশ্নের উত্তরের সহিত একমাত্র ভারতবাসী কর্ত্তৃক বহুদিন পূর্ব্বে কল্পিত সূর্য্যের যে মূর্ত্তি প্রকাশিত হইবে, সূর্য্যদেব কোথাও সে মূর্ত্তিতে পূজা পাইয়াছেন কি না জানি না, বোধ হয় পান নাই।

অধুনা কোণার্ক পদ্মক্ষেত্র বলিয়া সুপরিচিত। যে ক্ষেত্রে বিষ্ণু তাঁহার হস্তধৃত পদ্ম ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহারই নাম পদ্মক্ষেত্র। কিন্তু পূর্ব্বকালে ঐ স্থান মিত্রবন নামে পরিচিত ছিল। পূর্ব্বেই কহিয়াছি মিত্র সূর্য্যদেবের নামান্তর মাত্র। শাম্ব-পুরাণে কথিত হয় যে, শ্রীকৃষ্ণপুত্র শাম্ব এক দিন অনবধানতাবশতঃ তাঁহার জননীদিগের অবগাহন-স্থানের সন্নিকটে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কৃষ্ণরমণীগণ তখন তথায় স্নানাদি করিতেছিলেন। এই অপরাধে শাম্ব, কুপিত শ্রীকৃষ্ণের অভিসম্পাতে, কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হইয়া শাপমুক্তির জন্য চন্দ্রভাগাতীরে মিত্রবনে গমন পূর্ব্বক সূর্য্যের আরাধনা করিবার জন্য উপদিষ্ট হইয়াছিলেন। সূর্য্যদেব তখন যে শুধু ধ্বান্তারি বলিয়া পরিচিত ছিলেন তাহা নহে, তিনি যে শুধু বীরপুরুষদিগের আরাধ্য দেবতা বলিয়াই পূজিত হইতেন তাহা নহে, কুষ্ঠাদি সর্ব্বপ্রকার ব্যাধি-প্রশমনকারী সর্ব্বমঙ্গলমাঙ্গল্য বলিয়াও তিনি পরিচিত

ছিলেন। এইরূপ সূর্য্যের কল্পনা ভারতে নূতন নহে, পরন্তু বহু পুরাতন। ঋগ্বেদে দেখিতে পাই আর্য্যঋষি কহিতেছেন—

"হে শোধনকারী অনিষ্টনিবারক, তুমি যে আলোক দ্বারা, প্রাণীগণের পোষণকারী রূপে, এই জগৎকে সৃষ্টি কর। (৫০.৬) এই আদিত্য সমস্ত তেজের সহিত উত্থিত হইয়াছেন, তিনি আমার অনিষ্টকারী (রোগ) বিনাশ করিয়াছেন, আমি সে অনিষ্টকারীকে বিনাশ করি না।" * (৫০.১৩)

রামায়ণে দেখি বিজয়কামী চিন্তাক্লিষ্ট শ্রীরামচন্দ্র উপদিষ্ট হইতেছেন—

রাম রাম মহাবাহো শৃণু গুহ্যং সনাতনম্।
যেন সর্ব্বানরীন্ বৎস সমরে বিজয়িষ্যসে॥
আদিত্য হৃদয়ং পুণ্যং সর্ব্বশত্রু-বিনাশনম্।
জয়াবহং জপং নিত্যমক্ষয়ং পরমং শিবং॥
সর্ব্বমঙ্গলমাঙ্গল্যং সর্ব্বপাপপ্রনাশনম্।
চিন্তাশোকপ্রশমনমায়ুর্ব্বর্দ্ধনমুত্তমম্॥ †

ইত্যাদি

কূর্ম্মপুরাণে—

ক্ষয়াপস্মারকুষ্ঠাদ্যৈর্ব্যাধিভিঃ পীড়িতোঽপি সন্।
জপ্তা শতগুণং স্তোত্রং স শ্লাঘ্যো ভবতি দ্রুতম্॥ ‡

স্কন্দপুরাণে—

প্রতিমন্ত্রং নমস্কুর্য্যাচ্ছদয়াস্তময়ে রবিম্।
অনয়ানাম সপ্তত্যা মহামন্ত্র রহস্যয়া॥
এবং কুর্ব্বন্নরো জাতু ন দরিদ্রো ন দুঃখভাক্।
ব্যাধিভির্ম্মুচ্যতে ঘোরৈরপি জন্মান্তরার্জ্জিতৈঃ॥ §

নরসিংহ-পুরাণে—

হস্তযুক্তে অর্কদিনে সৌরণক্তং সমাচরেৎ।
স্নাত্বা অর্কং সমভ্যর্চ্য নীরোগী চিরজীবতি॥ *

মার্কণ্ডেয়পুরাণে মার্ত্তণ্ডমাহাত্ম্যনামক অধ্যায়ে দেখিতে পাই—

ত্বাং স্ম যজন্তি যে মর্ত্ত্যা মোক্ষস্তে তে মহাপদঃ
ক্ষেমং, বৃদ্ধিং, সুখং, রাজ্যং, আরোগ্যং কীর্ত্তিমুন্নতিম॥

গরুড়পুরাণের ৫০ অধ্যায়েও এইরূপ শ্লোক দৃষ্ট হইয়া থাকে। সূর্য্যের অর্চ্চনা করিলে সকল রোগ, শোক, বিপদ দূর হয়, এই বিশ্বাসের জন্যই হিন্দুদিগের মধ্যে সূর্য্যকবচ ধারণ ও রবিবারে সূর্য্যকে স্মরণ করিয়া হবিষ্য গ্রহণের নিয়ম প্রচলিত হইয়াছে।

পূর্ব্বেই কহিয়াছি পঞ্চনদবিধৌত ভূমি হইতে তপনপূজার স্রোতঃ প্রবাহিত হইয়া সমস্ত পৃথিবী মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। তাই রাজস্থানের ইতিহাস তপন ও চন্দ্রদেবের বংশধরগণের গৌরবে সমুজ্জ্বল। রাজপুতানার সামাজিক ইতিহাস আলোচনা করিলে ইহা দেখা যাইবে যে সূর্য্যের প্রতি ভক্তি ও সম্মান জাগরুক রাখিবার জন্য সূর্য্যের জন্মতিথিতে † এখনো বাসন্তী পঞ্চমীর পর ভানু-সপ্তমী নামক উৎসব হইয়া থাকে। সে উৎসব ভাস্কর-সপ্তমী নামে পরিচিত। এই উৎসব কালে সূর্য্যদেব বিষ্ণুর অংশ বলিয়া কল্পিত

* ঋগ্বেদ—৺রমেশচন্দ্র দত্ত।

† রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড ষড়ুত্তরশততমঃ সর্গঃ।

‡ কূর্ম্মপুরাণে উপরিভাগে ১৭ অধ্যায়।

§ স্কন্দপুরাণে—কাশীখণ্ডে ৯ অধ্যায়।

* নরসিংহপুরাণের ৬৪ অধ্যায়ে সৌরণক্তব্রত।

† Maccari from the Sun entering the constellation Maccara (Piscus), the first of the Solar Magh—Asiatic Researches, Vol. III, p. 273.

হইয়া থাকেন। * কিন্তু এই কল্পনার মূল কোথায়? অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে যে ইহার মূল সভ্যজগতের আদিম ইতিহাস ঋগ্বেদে। প্রথম মণ্ডলের ২২ সূক্তে আছে—

"বিষ্ণু সপ্ত কিরণের সহিত যে ভূপ্রদেশ হইতে পরিক্রম করিয়াছিলেন সেই প্রদেশ হইতে দেবগণ আমাদিগকে রক্ষা করুন।" † ঋগ্বেদে আরও আছে—"ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং। সমূঢ়মস্য পাংসুরে।" অর্থাৎ, "বিষ্ণু এই (জগৎ) পরিক্রম করিয়াছিলেন, তিন প্রকার পদবিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাঁহার ধূলিযুক্ত (পদে) জগৎ আবৃত হইয়াছিল।" অন্যত্র, "ত্রীণি-পদা বিচক্রমে বিষ্ণু গোপা অদাভ্যঃ। অতো ধর্ম্মাণি ধারয়ন্।" অর্থাৎ "বিষ্ণু রক্ষক, তাঁহাকে কেহ আঘাত করিতে পারে না। তিনি ধর্ম্ম-সমুদায় ধারণ করিয়া তিন পদ পরিক্রম করিয়াছিলেন।"

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, তিন প্রকার পদবিক্ষেপে বিষ্ণুর জগৎ পরিক্রম করিবার অর্থ কি? নিরুক্তকার খৃঃ পূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ব্যাখ্যা করিয়াছেন "যদিদং কিঞ্চ তদ্বিক্রমতে বিষ্ণুঃ ত্রিধা নিধত্তে পদং। ত্রেধা ভাবায় পৃথিব্যাং অন্তরীক্ষে দিবি ইতি শাকপূণিঃ। সমারোহণে বিষ্ণুপদে গয়শিরসি ইতি ঔর্ণনাভঃ।" (নিরুক্ত, ১২।১৯) অর্থাৎ, "বিষ্ণু এই সমগ্র জগৎ পরিক্রম করেন, তিনি তিন প্রকার ভাব গ্রহণার্থ তিনবার পদ বিক্ষেপ করেন। শাকপূণি বলেন (বিষ্ণু) ভূলোক, ভুবর্লোক ও স্বর্গলোকে পদ বিক্ষেপ করেন। ঔর্ণনাভ কহেন, উদয়স্থান মধ্যাকাশে ও অস্তগমনস্থলে পদার্পণ করেন। অতএব ঔর্ণনাভের মতে এই বিষ্ণু সূর্য্য ও তাঁহার ত্রিপদবিক্ষেপ, উদয়, অস্ত ও মধ্যাহ্নকালের গতি বই আর কিছুই নয়।"

নিরুক্তের উক্ত অংশের উপর দুর্গাচার্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"বিষ্ণু সূর্য্য, কেননা তিনবার পদবিক্ষেপ করেন। কোথায়? শাকপূণি বলেন, ভূলোকে, দ্যুলোকে ও অন্তরীক্ষে। তিনি পার্থিব অগ্নিস্বরূপ হইয়া পৃথিবীতে যৎকিঞ্চিৎ গমন ও অধিষ্ঠান করেন। অন্তরীক্ষে বিদ্যুৎস্বরূপ ও দ্যুলোকে সূর্য্যস্বরূপ হইয়া গমন ও অধিষ্ঠান করেন। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, দেবগণ সেই (সূর্য্যস্বরূপ) অগ্নিকে তিন প্রকার ভাবে বিদ্যমান করিয়া দেন। ঔর্ণনাভ আচার্য্য বিবেচনা করেন, উদয়কালে উদয়াচলে উদয়স্থানে এক পাদ বিক্ষেপ করেন, মধ্যাহ্নকালে বিষ্ণুপাদে অর্থাৎ মধ্য আকাশে অপর এক পাদ এবং অস্তাচলে গয়শিরে অর্থাৎ অস্তগমন স্থলে অন্য এক পাদ বিক্ষেপ করেন।" * য়ুরোপীয় পণ্ডিতদিগের

* Two days following the initiative fifth (*i. e.* opening of the spring) is the *Bhanu-Saptami* or Seventh (day) of the Sun, also called the birth of the Sun with various other metaphysical denomination.—Tod's Rajasthan, *Vol.* I, p. 595.

† ঋগ্বেদ—৺রমেশচন্দ্র দত্ত।

* ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, উপক্রমণিকা, প্রথমভাগ।

আলোচনাতেও এই মতই গৃহীত হইয়াছে।*

এই সূর্য্যরূপ বিষ্ণুর ত্রিপাদবিক্ষেপরূপ বৈদিক উপমা অবলম্বন করিয়া বহুবিধ উপাখ্যান বিরচিত হইয়াছে এবং ক্রমে ক্রমে আমাদের শাস্ত্রে স্থান লাভ করিয়াছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আছে যে দেব ও অসুরদিগের মধ্যে এই জগত-বিভাগকালে ইন্দ্র বলিলেন 'বিষ্ণু যতটুকু তিন পদে বিক্রম করিতে পারেন, ততটুকু দেবগণের, অবশিষ্ট অসুরদিগের। অসুরগণ সম্মত হইল এবং বিষ্ণু তিনপদবিক্রমে জগৎ ও বেদ ও বাক্য ব্যাপ্ত করিলেন।" শতপথব্রাহ্মণে অসুরগণ বলিতেছে বামনরূপ বিষ্ণু শয়ন করিলে যতটুকু স্থান ব্যাপ্ত হয় ততটুকু দেবগণের; দেবগণ সেই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া সমস্ত জগৎ পাইলেন। উক্ত উপমা হইতেই জনপ্রসিদ্ধ বলিরাজ-কাহিনী রচিত হইয়া আমাদের পুরাণাদিতে স্থান পাইয়াছে এবং তথা হইতে সংগৃহীত হইয়া রঙ্গমঞ্চ, যাত্রা ও পাঁচালীর কল্যাণে বঙ্গের গৃহে গৃহে সুপরিচিত হইয়াছে। আমরা প্রতিদিন সে কাহিনী শ্রবণ করিতেছি এবং বিষ্ণুর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি। সূর্য্যের আকাশ পরিভ্রমণের একটি মাত্র বৈদিক উপমা হইতেই এইরূপে বঙ্গের সাহিত্য কিয়দংশে পুষ্ট হইয়াছে এবং সমাজ বলিরাজকে স্মরণ করিয়া সংযত হইয়াছে।

* The stepping of Visnu is emblematic of the rising, the culminating and the setting of the Sun.—Max Muller's Translation of the Rigveda, Vol. I, p. 117.

সূর্য্যের সহিত আর একটি প্রসিদ্ধ আখ্যান দৃঢ় সম্বন্ধে আবদ্ধ। উহা শুধু যে ভারতবর্ষেই প্রচলিত, তাহা নহে। বৈদেশিকদের গ্রন্থেও উহা অবস্থান্তরিত হইয়া স্থান লাভ করিয়াছে। ঋগ্বেদের ২২ সূক্তের পঞ্চম ঋকে আছে—

"হিরণ্যপাণি সবিতাকে আমি রক্ষণার্থ আহ্বান করি, সেই দেব (যজমানের প্রাপ্য) পদ জানাইয়া দিবেন।"

"সূর্য্য কোন যজ্ঞে অগ্ন্যায়রূপে হব্য গ্রহণ করায়, তাঁহার হস্ত ছিন্ন হইয়া পড়ে, তাহাতে ঋত্বিকেরা তাঁহার একটি সুবর্ণের বাহু নির্ম্মাণ করিয়া দেন, এইরূপ আখ্যান আছে।" *

আমাদের ন্যায় "মৃগয়া-প্রিয় জর্ম্মাণগণ কল্পনা করিলেন যে, তাঁহাদিগের Tyrদেব ব্যাঘ্রের মুখে হস্ত স্থাপন করায় ব্যাঘ্র সেই হস্ত দংশন করিয়া ফেলে।" †

ইহাও অনুমান করা যাইতে পারে যে পূর্ব্ববর্ণিত সূর্য্যরূপ বিষ্ণুর গয়শিরে অর্থাৎ অস্তগমনস্থলে পাদবিক্ষেপের প্রসঙ্গ হইতেই সম্ভবতঃ পৌরাণিক কাহিনী "গয়াসুরের মস্তকে পদস্থাপন" এবং তাহা হইতেই 'গয়াসুরের পাদপদ্মলাভ'-নামক যাত্রা বা নাট্যাভিনয়ের জন্ম।

(ক্রমশ)

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য।

* ঋগ্বেদ—৺রমেশচন্দ্র দত্ত।

† Max Muller's Science of Languages, Vol. II, p. 416.

নীল-কণ্ঠ।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

অতুল ঐশ্বর্য্যেও সরলার এতদিন কিছু মাত্র সুখ ছিল না। স্বামীর স্নেহ, স্বামীর আদরই রমণীর বিপুল বিভব; তা যার নাই, সে বড় অভাগী। সংসারের কোন সুখেই তার আনন্দ নাই, কোন ঐশ্বর্য্যেই তার তৃপ্তি নাই, কোন ভোগেই তার শান্তি নাই! সরলারও এ সব এত দিন ছিল না। আর আজ?—আজ সরলা বড় সুখী! সরলা এখন স্বামী-সোহাগিনী; তার জীবন, যৌবন, রূপ আজ সব সার্থক হইয়াছে। তাহার পূজার সকল অর্ঘ্যই স্বামী হৃষ্টচিত্তে গ্রহণ করিয়াছেন। সরলা ধন্য হইয়াছে! তাই আজ সে বড় সুখী। সে ত নিজে সুখী হইয়াছে, এখন স্বামীকে কিসে সর্ব্বাংশে সুখী করিতে পারিবে সেই চিন্তাই তাহার জপমালা হইয়াছে, সেই চেষ্টাতেই সে প্রাণ-পাত করিতেও প্রস্তুত হইয়াছে! স্বামী যাহা চাহেন তাহা এমন কিছু বেশী নহে, কিছু অন্যায়ও নহে। তিনি চান—সরলা তাঁর সঙ্গে প্রাণ খুলিয়া মিশে, আর যত্ন করিয়া লেখা পড়া শিখে। স্বামীর এ কামনা সরলা না পূরাইবে কেন? স্বামীকে সুখী করিতে, উদ্ধার করিতে এ টুকুও না করিলে চলিবে কেন? সরলা সহজে লজ্জাবতী লতা, স্পর্শ মাত্রে মুদিয়া আসে, কিন্তু স্বামীর মনো-রঞ্জনের জন্য সে আপনার স্বভাব পরিবর্ত্তন ঘটাইতে অভ্যাস করিতে লাগিল। অভ্যাসে স্বভাবেরও ব্যতিক্রম হয়, সরলারও হইল। কিন্তু এ পরিবর্ত্তন কেবল তার স্বামীর নিকটে হইয়াছিল, অন্যত্র নহে; সখীদের কাছেও নহে—সেখানেও

"হাস্য অমৃতের সিন্ধু
ভুলায় বিদ্যুৎ ইন্দু;
কদাচ অধর বিনা, অন্য দিকে ধায় না।"

সরলা লেখা পড়া শিখিবার জন্য, স্বামীর মনের মত হইবার জন্য এতদিন যে

"রাতি কৈল দিবস, দিবস কৈল রাতি"

আজ তাহা সফল হইল। মন্মথ এত দিন যাহা চাহিতেছিলেন, সরলায় তাহা পাইলেন। আকাশের চাঁদ হাতে মিলিল! মন্মথের অন্তর যে সঙ্গিনীর জন্য তৃষিত, ষোড়শীর সাহচর্য্যে তাহার সে পিপাসা কতক মিটিতেছিল; তাই ষোড়শীর সঙ্গ মন্মথের এত বাঞ্ছনীয় মনে হইত। অহিফেন-সেবী যেমন 'মৌ-তাতের' সময় হইলে আর স্থির থাকিতে পারে না, মন্মথেরও সেই দশা ঘটিয়াছিল। মধ্যাহ্নে আহারান্তে শত কাজ ফেলিয়াও মন্মথ ষোড়শীর সদনে উপস্থিত হইত; সেখানে লেখা পড়ার চর্চ্চা, কাব্য নাট্য উপন্যাস কত রকমের আলোচনা,—তাহাতে কত তৃপ্তি! 'সমজদার' না মিলিলে, রসগ্রাহী না জুটিলে, এ সকলের প্রসঙ্গে আনন্দ উথলিয়া উঠে না, হৃদয় উচ্ছ্বসিত হয় না; তখন সত্যই মনে হয়,—অরসিকের নিকট

রসিকতার প্রসঙ্গ, ভগবান, এ পরিহাস অদৃষ্টে লিখিও না, লিখিও না।' কিন্তু যোড়শী কাব্য-রসে বঞ্চিতা ছিল না, সুতরাং সে মন্মথের উপযুক্ত সঙ্গিনীই জুটিয়াছিল। মন্মথ তাই তাহার সঙ্গ বড় দুর্লভ মনে করিয়া অনেকটা আত্মবিস্মৃত কর্ত্তব্যচ্যুত হইতেছিল, সহসা সে গতি ফিরিয়া গেল, সে উচ্ছ্বসিত প্রবাহ অন্য খাদে বহিল। মন্মথ সৌভাগ্য-বলে সত্বরেই আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইল যে, যে সঙ্গিনীর জন্য সে বাহিরে ছুটাছুটি করিতেছে তাহার গৃহেই সে সঙ্গিনী বর্ত্তমান! দিবানিশি সে সঙ্গ লাভ করিয়া মন্মথের হৃদয় অমৃতরসে পূর্ণ হইয়া উঠিল! একবার যে সুধার স্বাদ পায় সে কি আর কখনও সুধার মোহ কাটাইতে পারে? পিপাসায় 'ছাতি' ফাটিলেও চাতক জল-ধরের পানেই বারি-বিন্দুর আশায় চাহিয়া থাকে—বিপুলপরিধি বারিধিও তাহাকে প্রলুব্ধ করিতে পারে না। সরলার প্রেমসুধা-পানে মন্মথ এখন পরিতৃপ্ত, সে এখন যোড়শীর পানে আর চাহিবে কেন? এখন সরলাই মন্মথের সর্ব্বস্ব, যোড়শী কেহ নহে!

যোড়শী কেহ নহে ত সত্য, কিন্তু একটা লৌকিকতা ত আছে। যদি একে-বারেই তাহার সহিত যাতায়াত দেখা-সাক্ষাৎ বন্ধ করা যায়, তবে নীলকণ্ঠ কি মনে করিবেন, লোকেই বা কি বলিবে? মন্মথের মনে মাঝে মাঝে এই চিন্তারই উদয় হয়, সেই সঙ্গে সঙ্গে যোড়শীর সংবাদ লইবার জন্য তাহার গৃহাভিমুখে যাইতেও সে প্রস্তুত হয়, কোন দিন বা দুই এক পদ অগ্রসরও হয়,—অমনি যেন সরলার প্রেম-প্রতিমাখানি সম্মুখে উদয় হয়, তাহার সেই করুণা-ভিখারী কমল আঁখি দুটি যেন ছল ছল করিয়া উঠে! মন্মথ তাড়াতাড়ি সরলার ঘরে ফেরে, যোড়শীর গৃহে আর যাওয়া হয় না। সরলাকে না বলিয়া যোড়শীর গৃহে যাওয়া কিছুতেই উচিত নহে,—সে সরলা নিতান্তই সরলা, সে এ কথা জানিলে কোমল প্রাণে কঠিন আঘাত পাইবে তাই আর যাওয়া হয় না। আবার, 'বলি বলি' করিয়া, যোড়শীকেও যাওয়ার কথা বলা যায় না; তাই যাওয়া হয় না।

যাওয়া হয় না, কিন্তু যাওয়া ত উচিত।

আজ সুযোগ উপস্থিত হইল। যোড়শী যে পত্র লিখিয়াছিল, মন্মথ সে পত্রখানি সরলাকে দেখিতে দিলেন। "পত্রের উত্তর দিয়াছ?" "না"—"ছি, কেন দাও নাই" বলিয়া সরলা স্বামীকে অনুযোগ করিল। তার পর স্বামী-স্ত্রীতে অনেকক্ষণ কথা-বার্ত্তা হইল, সরলা শেষে বলিয়া উঠিল —'তোমার কিন্তু প্রত্যহ একবার সংবাদ লইতে সেখানে যাওয়া উচিত।' সে কথায় কোন শ্লেষের ধার ছিল না, সে কণ্ঠে বিদ্রূপের বিষ ছিল না, মন্মথ অবাক হইয়া সরলার পানে চাহিয়া চাহিয়া বলিলেন—"সরলা, সত্যই বলিতেছ আমার যাওয়া উচিত?"—"হাঁ, আজই, এমনই!" —"একা যাব?"—"কেন? তাতে দোষ কি?" "চল না দুজনে যাই?"—"বেশ, কিন্তু মা'কে আগে জিজ্ঞাসা কর।"

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

এ কে! সরলাকে সে ভাবে নিজগৃহে দেখিয়া যোড়শী প্রথমে বুঝিতে পারে

নাই, কে সে অবগুণ্ঠিতা। তারপর পশ্চাতে মন্মথকে দেখিয়া, তাহার আর সন্দেহের স্থল রহিল না, তাড়াতাড়ি উঠিয়া হাসিমুখে সরলাকে গৃহ মধ্যে আনিয়া বসাইল। সরলাও স্মিতমুখে অভিবাদন করিল। সরলার হটাৎ আবির্ভাবে যোড়শী যেন একটু থতমত খাইয়াছিল মন্মথকে কিরূপে সম্ভাষণ করিবে সেটা সহসা তাহার মাথায় আসে নাই, মন্মথ সেটা বুঝিয়া একটু রঙ্গ করিবার অভিপ্রায়ে বলিল—"ঠান্ দি, আমি তবে এখন যাই!"

"না না, যাবেন কেন? ঘরে আসুন না?" বলিয়া যোড়শী এক খানি চেয়ার অগ্রসর করিয়া দিল। মন্মথ লক্ষ্য করিল, "যাবেন কেন?" এত দিনের পর আবার কি 'আপনি' বলিয়া কথা আরম্ভ হইল? যোড়শী মন্মথের দিকে মুখ তুলিতে পারিল না, নতমুখে বাম হস্তের মধ্যম অঙ্গুলির নখ দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলিদ্বয়ের মধ্যে নিষ্পেষিত করিতে লাগিল। তাহার কম গণ্ডদ্বয় আরক্তিম হইয়া উঠিল, কপালে স্বেদ বিন্দু দেখা দিল।—সে প্রথমে কি কথা কহিবে ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছিল না, অথচ কোন কথাও না বলা ভাল হইতেছে না, ইহা বেশ বুঝিতেছিল! মন্মথ যোড়শীর এ বিপদ বুঝিল,—তাই সে নিজেই আরম্ভ করিল, "ঠাকুরদাদার চিঠি দেখেছেন ত! রোজই তাঁর সংবাদ পাঠাইব, কোন চিন্তা নাই।" যোড়শী আরও বিপন্ন হইল—কোন উত্তর দিতে পারিল না; সে প্রসঙ্গ ছাড়িয়া অন্য কথা তুলিবার জন্য চেষ্টা করিল, কিন্তু ওষ্ঠ-প্রাচীর ভেদ করিয়া কোন কথাই নিঃসৃত হইল না! যোড়শী বড়ই মুস্কিলে পড়িল—মন্মথ যোড়শীর এ সঙ্কট বেশ উপলব্ধি করিয়া বলিয়াই চলিল—"অসুখ-বিসুখে নানা ঝঞ্ঝাটে তোমার সংবাদ লইতে নিজে আসিতে পারি নাই, কিন্তু খবরাখবর প্রত্যহই লই!" যোড়শীর এবার মুখ ফুটিল, অনেক চেষ্টায় নিজেকে প্রকৃতিস্থ করিয়া যোড়শী অন্য দিকে চাহিয়া যেন একটু চাপা কণ্ঠে কহিল "তা ত নেবারই কথা, আপনাদেরই ত ভরসা।" সে স্বরে কিঞ্চিৎ শ্লেষের আভাস পাইয়া মন্মথ বলিল—"আমার কথা যদি বিশ্বাস না হয় ত তোমার নাতবৌকে জিজ্ঞাসা করো,—সাক্ষী সঙ্গেই এনেছি!" যোড়শী এবার একটু হাসিয়া সরলার দিকে চাহিল—সরলার হাস্য প্রফুল্ল চক্ষুর সহিত যোড়শীর দৃষ্টি বিনিময় হইল, উভয়ের ওষ্ঠেই শুভ্র হাস্য ফুটিয়া উঠিল! বিকচ কুসুমে যেন জ্যোৎস্না খেলিয়া গেল! মন্মথ সে দৃশ্য দেখিল,—বড় সুন্দর। এ সুন্দরের মধ্যে তাঁর মত অসুন্দর বড় অশোভন মনে করিয়া, মন্মথ বলিল "ঠান্ দি, তোমাদের চোখে চোখে কি কথা হইতেছে, 'এক জনে মুখ নাড়ে আর জনে মাথা' এ সব বুঝিবার ক্ষমতা ত আমার নাই, আমি এখন তোমার পড়ার ঘরে গিয়া বসি,—তোমরা মন খুলে কথা কও।'—"পড়ার ঘর," এ কথায় যোড়শীর পুরাতন স্মৃতি সহসা আবার জাগিয়া উঠিল। কত দিন সে আজ? ক্ষণ কালের জন্য সে কিছু অন্যমনস্ক হইল, এই অবকাশে সরলা দশনে অধর দংশন করিয়া স্বামীর পানে একবার কোপ কটাক্ষে চাহিল।

মন্মথ এ শাসনের অর্থ বুঝিল, রামায়ণ মহাভারতের বিদ্যা সে সরলার নিকটই শিখিয়াছে, আজ সেই রামায়ণের কথা দিয়াই সরলাকে বিদ্রূপ করা হইতেছে! —শেষে বুঝি এই গুরুমারা বিদ্যা! মন্মথ সরলার মনের ভাব অনুমান করিয়া লইয়া বলিল,—"ঠান্ দি, আমি কিন্তু কাউকে কিছু বলিনি, কেউ গায়ে পড়ে নিলে আমার দোষ নাই!" ষোড়শী এতক্ষণ আপনার ভাবেই ভোর ছিল,—এখন তার চমক ভাঙ্গিল! মন্মথের রহস্যের অর্থ বোধ করিয়া ষোড়শী বলিল, "নাতবৌকে অমন করে লেগেছেন কেন?"—মন্মথ বিদ্রূপটুকু গায়ে রাখিল না, বলিল—"ঠান্ দিদিও কি ঐ দলে গেলে! একাই রক্ষা নাই, আবার সুগ্রীব দোসর! এখন তবে আমার রণে ভঙ্গ দেওয়াই ভাল"—বলিয়া মন্মথ অন্য ঘরে প্রবেশ করিল ষোড়শী; "বসুন না, বসুন না" দুই একবার বলিল, কিন্তু মন্মথ ফিরিল না।

এতক্ষণে ষোড়শী যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। তখন নাতবৌয়ের সঙ্গে ষোড়শীর আলাপ-আপ্যায়িত আরম্ভ হইল, সরলা 'ষোড়শী' হইলেও ষোড়শী অপেক্ষা বয়সে কিছু ছোট, কিন্তু এ প্রভেদে বড় ভেদাভেদ থাকে না, বিশেষত রমণীমহলে।

কিছু ক্ষণের মধ্যেই উভয়ের মধ্যে বেশ একটু ঘনিষ্ঠতা জন্মিল। তার পর সরলাদের বাড়ী ফিরিবার পালা। ষোড়শী তাহাদিগকে জল না খাওয়াইয়া কিছুতেই ছাড়িল না।

সরলা যাইবার সময় পরদিন ষোড়শীকে তাহাদের বাটী যাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া বেলা ১০টার সময় গাড়ী আসিবে বলিয়া গেল।

মন্মথ ও ষোড়শীর বহুদিনের পর এই প্রথম সাক্ষাতের ব্যাপার যে এত সহজে মিটিবে, এ আশা বড় ছিল না।

(ক্রমশ)

শ্রীশৈলেশচন্দ্র মজুমদার।

সাহিত্য-প্রসঙ্গ।

কাশীরাম-স্মৃতি-সমিতি।

বাঙ্গলার মহাকবি কাশীরাম দাসের জন্মস্থান লইয়া যে গোলযোগ বাধিয়াছিল, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ও কাটোয়া সমিতির চেষ্টায় তাহার মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। ইন্দ্রাণী পরগণার অন্তর্গত বর্দ্ধমান সিঙ্গি গ্রামই যে তাঁহার জন্মভূমি, ইহা নিঃসংশয়ে স্থিরীকৃত হইয়াছে। এক্ষণে ঐ গ্রামে তাঁহার স্মৃতি-নিদর্শন স্থাপনের ব্যবস্থা করা হইবে। গত ১৫ই জ্যৈষ্ঠ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দিরে এই উদ্দেশ্যে একটি সাধারণ সভা আহূত হইয়াছিল। সভায় মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর, মাননীয় শ্রীযুক্ত

সারদাচরণ মিত্র, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, ডাক্তার মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি বহু গণ্য মান্য লোক উপস্থিত ছিলেন; কাটোয়া হইতে কাটোয়ার সবডিভিসানাল অফিসার শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায়, প্রসূন-পত্রিকার শ্রীযুক্ত জ্যোতিঃপ্রসাদ সিংহ প্রভৃতি কতিপয় গণ্য মান্য ব্যক্তিও আগমন করিয়াছিলেন। স্থির হইয়াছে, কাশীরামের বাস্তু ভিটায়, তাঁহার মহাভারত রচনাস্থানে কোনরূপ সুদৃশ্য স্মৃতি-নিদর্শন নির্ম্মাণ করাইতে হইবে, তাঁহার খনিত একটি দীর্ঘিকা আছে তাহার পঙ্কোদ্ধার করাইতে হইবে, তাহার তীরে ঘাটনির্ম্মাণ, সুদৃশ্য চাঁদনী নির্ম্মাণ, পাড় বাঁধান ইত্যাদি করিতে হইবে, আর এই সকল ব্যাপারের বার্ষিক মেরামতের জন্য কিছু টাকার একটি স্থায়ী ভাণ্ডার করিতে হইবে। ইহার জন্য ন্যূনাধিক দশহাজার টাকার প্রয়োজন, প্রত্যেকে ১৲ টাকা করিয়া দান করিলে সাতকোটী বাঙ্গালীর মধ্য হইতে দশহাজার টাকা সংগ্রহ করা বড় বেশী কথা নহে। কাটোয়া অঞ্চলে অনেকগুলি বৈষ্ণব মহাপুরুষের বাসগ্রাম বর্ত্তমান। সেই সকল স্থানে বৎসর বৎসর মেলা হয়। কেশেপুকুরের তীরে কাশীরামের নামে বর্ষে বর্ষে একটি মেলা স্থাপন করা বড় কঠিন কথা নহে। মেলায় যাহা আয় হইবে, তাহা হইতে কাশীরামের স্মৃতিনিদর্শনগুলির বার্ষিক মেরামতব্যয় নির্ব্বাহিত হইয়াও আরো কিছু উদ্বৃত্ত হইতে পারে। তদ্দারা বৈষ্ণব সাহিত্যিকগণের জন্মস্থানগুলিতেও ক্রমশ স্মৃতি-নিদর্শন স্থাপনাদি করা যাইতে পারে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের যত্নে এই জাতীয় গৌরবের ব্যাপারটি সুসম্পন্ন হইবে, ইহা সকলেই আশা করিতেছেন। এজন্য একটি সমিতি গঠিত হইয়াছে। বঙ্গের বিভিন্ন জেলার গণ্য মান্য লোক তাহাতে সদস্যরূপে গৃহীত হইয়াছেন। মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর ঐ সমিতির সভাপতি এবং শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী উহার সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন। সভাস্থলে সেই দিনই প্রায় ৯ শত টাকা সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে।

এ কার্য্যে বিদ্যোৎসাহী এবং বিদ্যানুরাগী মহারাজ বাহাদুর যখন ব্রতী হইয়াছেন, তখন ইহার সফলতা সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ আশা আছে। যে বঙ্গকবি তাঁহার অমৃতনিঃস্যন্দিনী বীণার ঝঙ্কারে কোটি কোটি বঙ্গবাসীর প্রাণে সুধাসিঞ্চন করিয়া, লক্ষ লক্ষ নরনারী চরিত্র-গঠনের সহায়তা করিয়াছেন, তাঁহার স্মৃতি-পীঠ সংস্কারের এই উদ্যোগের জন্য মহারাজা বাহাদুর এবং অন্যান্য সুধীগণ বঙ্গবাসীমাত্রেরই ধন্যবাদের পাত্র।

বক্রেশ্বর তীর্থে নূতন আবিষ্কার।

বীরভূম-সিউড়ী সহর হইতে ৭ মাইল দূরে অষ্টাবক্র ক্ষেত্র বক্রেশ্বর তীর্থ বর্ত্তমান। ইহার নাম গুপ্তকাশী। বক্রেশ্বর শিবমন্দির ও কতকগুলি উষ্ণ প্রস্রবণ এখানকার প্রধান তীর্থ। উষ্ণ প্রস্রবণগুলির কয়েকটি কুণ্ড মধ্যে এবং কয়েকটি বক্রেশ্বর নামক ক্ষুদ্র নদীগর্ভে অবস্থিত। বক্রেশ্বর

তীর্থ দর্শনে গিয়া শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় মূল মন্দিরের গর্ভ-গৃহের দ্বারের উপরের প্রস্তরফলকে লুপ্তপ্রায় একখানি শিলালিপি আবিষ্কার করিয়াছেন। উহার দুই এক স্থানের পাঠোদ্ধার করিয়া এবং স্থানীয় অনুসন্ধানে চতুষ্পার্শ্ব হইতে তিনি যে সকল নিদর্শন পাইয়াছেন, তাহার প্রমাণ-বলে তিনি স্থির করিয়াছেন যে বক্রেশ্বর মন্দির উড়িষ্যারাজ নরসিংহদেবের সময়ে নির্ম্মিত। এক সময়ে সমস্ত মন্দির প্রস্তর-নির্ম্মিত ছিল, এখনকার ইষ্টক মন্দিরের চূড়ায় সেই মূল মন্দিরের প্রস্তরনির্ম্মিত আমলক (কদমা) বসু শিরোভূষা, মন্দিরের গর্ভগৃহের দ্বারের মস্তকে বৃহৎ প্রস্তরের গোবরাট, উভয় পার্শ্বে সুদৃশ্য পাথরের থাম এবং মন্দির প্রাঙ্গণে বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড গাঁথা রহিয়াছে। এই স্থানে অক্ষয় বট-মূলে একটি শ্বেত প্রস্তরের ভগ্ন হরপার্ব্বতী মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে, তাহার কারুকার্য্যাদি উড়িষ্যায় প্রাপ্ত হরপার্ব্বতী মূর্ত্তিগুলির ন্যায়। পাণ্ডা মহাশয়গণ অনুগ্রহপূর্ব্বক এই ভগ্ন মূর্ত্তিটি মূল পরিষদের চিত্রশালায় দান করিয়াছেন।

রাঢ়-অনুসন্ধান।

রাঢ়ের নানা স্থানে বাঙ্গলার বহু প্রাচীন কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে। আজও পর্য্যন্ত সেগুলির সবিশেষ অনুসন্ধান করা হয় নাই। কলিকাতার প্রদর্শনীর সময় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ যখন রাঢ়ের একাংশ মুরশিদাবাদ ও বর্দ্ধমান হইতে প্রাচীন স্থান গুলির ফটোগ্রাফ সংগ্রহ করেন, তখন হইতেই পরিষদের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হইয়া আছে। সম্প্রতি যখন 'বীরভূম শাখা' স্থাপনের উদ্দেশ্যে পরিষদের কতিপয় সদস্য বীরভূমে যান, তখন বিদ্যোৎসাহী কুমার মহিমারঞ্জন চক্রবর্ত্তী বাহাদুর কথাপ্রসঙ্গে এই ব্যাপার অবগত হইয়া রাঢ়ের প্রাচীন কীর্ত্তি অনু-সন্ধানের ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছেন। নদীয়া জেলায় "বল্লাল ঢীপি" নামে মহারাজ বল্লালসেনের নাম সংশ্লিষ্ট স্থান আছে, পরিষৎ হইতে তাহার খননাদি করিয়া তথ্য নিষ্কাশনের কল্পনা হইয়াছে। স্থানীয় অধিবাসী উকিল শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি এল মহাশয় এ বিষয়ে পরিষদকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন।

বরেন্দ্র-অনুসন্ধান।

গত ইষ্টারের ছুটিতে, বিদ্যোৎসাহী, বঙ্গসাহিত্যের অকৃত্রিম বন্ধু, পরিষদের পরম হিতৈষী এবং রাজসাহী শাখা-পরিষদের সভাপতি দীঘাপতিয়ার কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম্ এ বাহাদুরের কল্পনায়, ব্যয়ে, নেতৃত্বে এবং উৎসাহে প্রাচীন ইতিহাসের লীলাক্ষেত্র বরেন্দ্রভূমির নানা স্থানে প্রাচীন তত্ত্ব অনুসন্ধানের জন্য একটি অভিযান-সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছে। গত ইষ্টারের ছুটিতে কুমার শরৎকুমার, তাম্বু ও গোযান লইয়া বহুস্থানে বহু তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন; রাজসাহীর সতের-খানি গ্রাম ঘুরিয়া তাঁহারা বল্লাল সেনের পিতা বিজয় সেনের প্রতিষ্ঠিত প্রদ্যুম্নেশ্বরের মন্দিরের ভিত্তিমূল ও মন্দিরের বৃহৎ প্রস্তরময় দ্বার ফলকাদি আবিষ্কার করিয়াছেন। সেখানে বহু প্রাচীন দেবমূর্ত্তির

ভগ্নাবশেষ এবং বহু কারুকার্য্যখোদিত প্রস্তরখণ্ড পাওয়া গিয়াছে। কুমার বাহাদুর গোশকটে বোঝাই দিয়া আনিয়া এই সকল ভগ্নমূর্ত্তি ও প্রস্তরাদি আপাতত রাজশাহী শাখা পরিষদের হস্তে রাখিয়াছেন, সাধারণ পুস্তকালয়ে এখন সেগুলি আছে। এই গুলির সম্পূর্ণ বিবরণ-পুস্তক লিখিত হইতেছে। এই সকল ব্যাপার হইতে অনেক ঐতিহাসিক তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। কুমার বাহাদুরের এই অভিযানে বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিৎ শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, রাজশাহী শাখা-পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত শশধর রায়, প্রসিদ্ধ জাতিতত্ত্বের অনুসন্ধানকারী শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ ছিলেন এবং মূল পরিষদের অন্যতম সহকারী-সম্পাদক মুদ্রাতত্ত্ববিৎ শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে কুমার বাহাদুর নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন।

আষাঢ়।

আবার এসেছে আষাঢ় আকাশ ছেয়ে,—
এল বৃষ্টির সুবাস বাতাস বেয়ে।
এই পুরাতন হৃদয় আমার আজি
পুলকে দুলিয়া উঠেছে আবার বাজি
নূতন মেঘের ঘনিমার পানে চেয়ে।
আবার এসেছে আষাঢ় আকাশ ছেয়ে।

রহিয়া রহিয়া বিপুল মাঠের 'পরে
নব তৃণদলে বাদলের ছায়া পড়ে।
"এসেছে, এসেছে," এই কথা বলে প্রাণ,
"এসেছে, এসেছে," উঠিতেছে এই গান,
নয়নে এসেছে, হৃদয়ে এসেছে ধেয়ে,
আবার এসেছে আষাঢ় আকাশ ছেয়ে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মৃগ-তৃষা।

(৪)

স্বামী আর স্ত্রী, অভাব বেশী ছিল না, স্ত্রীটি আবার লক্ষ্মী; একমাত্র 'ঠিকে' ঝির সাহায্যেই অমিয়া সব কাজ করিত। দশ টাকায় একটি ছোটখাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বাড়ীও মিলিয়াছিল। নীচে দু'টি ঘরের মধ্যে একটি বসিবার ঘর, অপরটি রান্নার ও ভাঁড়ারের; বাহিরের ঘরটি আবশ্যক মত অন্দরের কাজেও লাগান যাইতে পারে। উপরের একটি ঘর একটু বড়, সেটি শয়ন কক্ষ, অন্য ঘরটি ছোট, সেখানে খাওয়া ও মেয়েদের বসা চলে, এবং দায়ে, দৈবে কষ্টে স্বষ্টে দুই একজনের শয়নের জন্যও যে ব্যবহার করা না যায় এমন নহে। এই ক্ষুদ্র গৃহটি একটি বৃহৎ বাটীর একটা ক্ষুদ্র অংশ। সেখানে বাড়ীওয়ালা নিজে বৃহৎ পরিবার লইয়া বাস করেন। সে বাটীর বৌ-ঝির কল্যাণে অমিয়া একা থাকার কষ্ট অনুভব করিতে পারে না। অনেক সমবয়সী; তাহাদের সহিত হাসি, তামাসা, গল্প, খেলায় আর স্বামীর স্নেহ-আদরে অমিয়ার দিন বেশ আমোদেই কাটিতেছিল, কিন্তু এ সুখের দিন বড় বেশী দিন রহিল না, "সে সুখের সাগর দৈবে শুকাইতে লাগিল।"

মোহিতকুমার আত্মসম্মানে আঘাত পাইয়া চাকরী ছাড়িয়াছিল, সেজন্য আত্মীয় বন্ধু প্রায় সকলেই তাহাকে অনুযোগ করিয়াছিলেন; অমিয়া কিন্তু একদিনের জন্যও এ জন্য স্বামীকে কিছু বলে নাই, বরং তাহার কার্য্যে সহানুভূতিই দেখাইয়াছিল; কিন্তু সব চেয়ে কাজ ছাড়িবার যে ফল, যে কষ্ট, তাহা অমিয়াকেই ভোগ করিতে হইল, তবু অমিয়া সাধ্য পক্ষে সাংসারিক কোন কষ্টের কথা স্বামীর কানে তুলিত না। অমিয়ার পিতার অবস্থা ভাল, সে বাপ মা'র আদরের মেয়ে। মোহিতকুমার কার্য্যত্যাগের পরে তাহাকে তাহার পিত্রালয়ে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিল, অমিয়া স্বামীর অবাধ্য কখনও হয় নাই, কিন্তু এখন স্বামীর এ ব্যবস্থার সে ঘোর প্রতিবাদ করিল। অমিয়া যখন বলিল "তোমায় এ অবস্থায় একা ফেলিয়া যাইতে পারিব না, এই সময়েই তোমার কাছে থাকা আমার প্রয়োজন, যে কষ্ট তাহা দু'জনায় ভোগ করিব।" মোহিতকুমার তখন সে কথায় তেমন কান দিল না, সংকল্পের পরিবর্ত্তনও করিল না। কিন্তু অমিয়া আবার যখন বলিল "দুরবস্থায় পড়িয়া স্ত্রীলোকের পিত্রালয়ে সহজে যাইতে নাই, এ দিন চিরদিন থাকিবে না, ভগবানের ইচ্ছায় আবার দিন অবশ্যই ফিরিবে, কিন্তু আজ যদি তোমার স্ত্রী হইয়া দায়ে পড়িয়া কোথাও—হোক্ না সে পিত্রালয়—কোথাও আমায় যাইতে হয়, তবে এ কষ্ট চিরদিনই থাকিবে, এ শেল চিরদিন আমার বুকে বিঁধিবে।" ইহার উপর আর কথা চলে না। এবার মোহিতকুমারকে হার মানিতে হইল।

অমিয়া যতদূর সম্ভব অন্ত সকল ব্যয় কমাইল। কিন্তু তাহার এমন একটা শৃঙ্খলা, এমন একটা ব্যবস্থা ছিল যে মোহিতকুমার নিজের আহার, পরিচ্ছদে, ব্যয়-লাঘবের কোন চিহ্নই বুঝিতে পারিল না। 'ঠিকা' ঝিটি বিদায় পাইল, বাজারে বা বাহিরের ফরমাইসের জন্ত বাড়ীওয়ালার ঝিকে সামান্ত কিছু দিতে হইত। অমিয়া কি ভাবে ব্যয় লাঘব করিল, তাহার দুই একটা দৃষ্টান্ত দেখিলে বুঝা যাইবে। আগে অমিয়া দু'বেলা রাঁধিত, এখন সে এক বেলাতেই দুইবেলার রান্না রাঁধে। দিবসের রান্না শেষ করিয়া অমিয়া সেই উনানেই দু'জনার মত রুটি বা পরোটা সেকিয়া লয়, এ বেলার তরকারি ওবেলার জন্ত পৃথক করিয়া রাখে, বেশীর ভাগ দুই একটা 'ভাজা' হয়। ঐ সঙ্গেই মোহিতকুমারের জলযোগের জন্য হয় একটু মোহনভোগ, না হয় দু'খানা গজা বা আর কিছু করিয়া রাখে। রাত্রে আহারের সময় খাবারগুলি 'ষ্টোভে' এক বার গরম করিয়া দেয়। সুতরাং মোহিত-কুমারের ভোগের কোন ত্রুটি হয় না। কিন্তু বাড়ীভাড়া এ অবস্থার পক্ষে বড় বেশী, তার কি করা যায়? 'আচ্ছা, বাহিরের ঘরটির কি এখন তেমন আবশ্যক? ও টাকে ভাড়া দেওয়া চলে না?' 'চলে বৈ কি?' অমিয়ার প্ররোচনায় মোহিতকুমার চেষ্টা করিয়া একটি ভাড়াটিয়া ঠিক করিল। পাড়ার 'চন্দর মাষ্টার' গুটি পনের ষোল ছোট ছোট ছেলেদের পড়াইত, একটি খোলার ঘরে এক স্কুল খুলিয়া ছেলেগুলির মস্তক ভক্ষণ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত; তার সে খোলার স্কুল ঘর জমীদার ভাঙ্গিয়া দিতেছে, তাই সে মোহিতকুমারের বাহিরের ঘরটি মাসিক চারি টাকা ভাড়ায় ভাড়া লইল। অমিয়ার চিন্তা কিছু কমিল।

মোহিতকুমারও নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া ছিল না, কিন্তু এবার কেরাণীগিরির জন্য সে বিশেষ ব্যগ্র নহে, ব্যবসায়ের দিকে তাহার ঝোঁক। যে বিভাগে সে দীর্ঘকাল সদাগর আফিসে কাজকর্ম্ম করিয়াছে, তাহার সে বিভাগের শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতাও কোন কোন ব্যবসায়ের অনুকূল ছিল।

(৫)

একজন প্রসিদ্ধ ডাক্তার মোহিতকুমারের সহায় ছিলেন। তাঁহার 'পশার' এবং সঙ্গে সঙ্গে উপার্জ্জনও যথেষ্ট। লোকটিও আবার খুব সদাশয়। কিন্তু লোকে বলে তাঁহার প্রধান দোষ নিজের অবস্থায় তিনি সন্তুষ্ট নন। ডাক্তারী ব্যবসায়ের উপর তাঁর অনেকগুলি ব্যবসায় আছে,—কয়লার খনি, চা'র বাগান, ইত্যাদি, ইত্যাদি। উপার্জ্জনের উদ্বৃত্ত টাকা ত সমস্তই এ সব ব্যবসায়ে তিনি ঢালিয়াছেন, ইহার উপর এজন্ত আবার তাঁকে ঋণ করিতেও হইয়াছে, ঋণের পরিমাণও নিতান্ত কম নহে। ব্যবসায়ে যে লাভ হয় না, ঠিক তাও বলা যায় না, তাঁহার ব্যবসায়ের ব্যবস্থার ভিতর কোথায় যে ছিদ্র রহিয়া গিয়াছে, কোন্ অদৃশ্য পথ দিয়া যে মূল ধন পর্য্যন্ত বাহির হইয়া যাই-তেছে, ডাক্তার বাবু তাহা ধরিতেই পারি-তেছেন না; রোগীর নাড়ী-জ্ঞানে তিনি অদ্বিতীয়, কিন্তু ব্যবসায়ের নাড়ীতে তিনি সম্পূর্ণ আনাড়ি। মোহিতকুমারের

সহিত তাঁহার বহুদিনের, বোধ হয় পাঠ্যা-বস্থার, পরিচয়। সে পরিচয় ক্রমে ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হইয়াছিল। ডাক্তার বাবু বয়োজ্যেষ্ঠ হইলেও এই ঘনিষ্ঠতা ক্রমে বন্ধুত্বে দাঁড়াইল। মোহিতকুমারের কতকগুলি গুণ ছিল—সে স্পষ্টবাদী, কিন্তু কর্কশ নহে। তার আত্মা-ভিমান খুব পূরা, কিন্তু তার প্রকৃতি ছিদ্রান্বেষী বা কলহ-পরায়ণ নহে। তার মত সৎ, তার মত বিশ্বাসী সংসারে বড় বিরল তেমন হৃদয়বানও বড় অধিক দেখা যায় না —এইখানে ডাক্তার বাবুর সহিত তার মিলিয়াছিল—ডাক্তারবাবুর মন পরদুঃখে সদাই বিচলিত হয়, পরদুঃখ-মোচনে নিয়তই মুক্ত। এইখানেই আবার উভয়ের প্রভেদ। ডাক্তারবাবুর দয়ার উদ্রেক দীনের দুঃখ-মোচনের জন্য, মোহিতকুমারের দয়া দরিদ্রের মনোরথের ন্যায় কেবল পরদুঃখ অনুভব করিয়া নিজের যন্ত্রণা বাড়াইবার জন্য। দুঃখমোচনের ক্ষমতা তার ছিল না—তার সাধ ছিল, কিন্তু তার সাধ্য ছিল না। মোহিতের হৃদয়ের এই পরিচয় পাইয়াই ডাক্তারবাবু তার বড় পক্ষপাতী হইয়া-ছিলেন।

মোহিতকুমারের কার্য্যত্যাগের পর হইতে ডাক্তারবাবুর মাথায় আসিয়াছে, মোহিত-কুমারকে তার ব্যবসায়ে টানিয়া আনিতে হইবে। কিন্তু চাকরীর কথা ত মোহিতকে বলা যায় না, তবে? ব্যবসায়ে লাভের অংশীদার করা? কিন্তু ব্যবসায়ে লাভ পাওয়া দূরের কথা—এখনও ডাক্তারবাবুকে টাকাই যোগাইতে হইতেছে। ব্যবসায়ের প্রতি ডাক্তারের এমন একটা নেশা—ব্যবসাগুলি ছাড়িয়া দিবার কথা একবারও তাঁর মনে উদয় হয় না। এজন্য ঘরে গঞ্জনা, মহাজনের তাড়না; সাধ করিয়া এ বিড়ম্বনা কেন? কিন্তু কিছুতেই তিনি সে পথ হইতে মন ফিরাইতে পারেন না।

যে কোন প্রকারেই হোক্ মোহিত-কুমারকে তাঁর ব্যবসায়ের ভার দিতে হইবে, মোহিতের উপকার যাহাতে হয়, তাহা করিতেই হইবে। কিন্তু মোহিতের নিকট এ প্রস্তাব করি করি করিয়া অনেক দিন কাটিয়া গেল, বলি বলি করিয়া দীর্ঘ কাল বলা হইল না।

(৬)

অমিয়ার দিন একপ্রকারে কাটিতে ছিল। অমিয়া মনে মনে একটা এষ্টিমেট করিয়া কলিকাতায় থাকিতে সাহসী হইয়া-ছিল। সে মনে করিয়াছিল কোন প্রকারে তিন মাস সে চালাইবে, ইহার মধ্যে কি তার স্বামীর কাজকর্ম্মের কোন সুবিধা হইবে না? অবশ্যই হইবে। মনে মনে এই প্রকার স্থির করিয়া সে মুদির ও আর আর পাওনাদারদের খুজরা দেনা শোধ দিবার জন্য ও সংসার চালাইবার জন্য বাড়ী-ওয়ালার এক বধূর নিকট "হার" বাঁধা রাখিয়া দেড়শত টাকা পর্য্যন্ত লওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছিল। পঞ্চাশ টাকারও কম দেনা ছিল, সেগুলি শোধ দিয়া এক মাসের মত খরচ হাতে রাখিবার জন্য প্রথমে সে আশী টাকা কর্জ্জ করিল, বেশী সুদের ভয়ে একে-বারে দেড়শত টাকা লইল না। যে সত্তর টাকা বাকি রহিল, তাহাতে আর দুই মাস চালাইবে, মনে মনে এ সংকল্প করিল। এই

ব্যবস্থা অনুসারে প্রায় এক মাস চলিল—মোহিতের এ পর্য্যন্ত কোনও সুবিধা হইল না। এ ভাবে কয়দিন চলিবে, মনে করিয়া মোহিত উপার্জ্জনের একটা উপায় স্থির করিবার জন্য কেবলই এখানে সেখানে ঘুরিতে লাগিল; হিম কি রৌদ্র, মধ্যাহ্ণ কি রাত্রি, কিছুই গ্রাহ্য করিত না। অমিয়া তাহাকে এত ঘুরিতে নিষেধ করিত; সে কত সাহস দিত, কিন্তু মোহিতকুমার স্ত্রীর গহনা বন্ধক দিয়া এ ভাবে সংসার চালাইতে বড়ই অনিচ্ছুক। অমিয়ার গুণে সে মুগ্ধ বটে, কিন্তু তার মনে যে কিছুতেই শান্তি নাই। অমিয়া যেমন আত্মত্যাগে বিমুখ নহে, মোহিতেরও ত তেমনি কর্ত্তব্য আছে। যাই হোক্ এমনি করিয়া কোনরূপে দিন কাটিতে লাগিল। দুঃখে হউক, কষ্টে হউক দিন ত কাটিতেছিল, কিন্তু সহসা এক বিপদ উপস্থিত হইল। একদিন মোহিত-কুমারের প্রবল জ্বর দেখা দিল, তেমন জ্বর মোহিতকুমারের ত কখন হয় নাই। কি জ্বর, কি উত্তাপ, শরীরের ভিতর কি জ্বালা, সর্ব্বাঙ্গে কি বেদনা! জ্বরের ভাব দেখিয়া অমিয়ার ভয় হইল। সে কোন ডাক্তার ডাকিবার ব্যবস্থা করিতেছে, এমন সময় সেই ডাক্তার বাবুর বাটী হইতে মোহিতকুমারের সংবাদ লইবার জন্য লোক আসিল। ডাক্তার বাবুর বিশেষ আগ্রহে মোহিতকুমার প্রত্যহ দুইবার তাহার কাছে যায়, কিন্তু আজ দুই দিন হইতে মোহিত-কুমারের দেখা নাই কেন? বড় উদ্বিগ্ন হইয়া ডাক্তার বাবু তাই লোক পাঠাইয়া-ছেন। মোহিতকুমারের জ্বরের সংবাদ পাইবামাত্র ডাক্তার বাবু সকল কাজ ফেলিয়া হাজির হইলেন। মোহিতকে দেখিয়া ডাক্তার বাবু উদ্বিগ্ন হইলেন; লুকাইবার চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁহার মুখে সে উদ্বেগের লক্ষণ প্রকাশ পাইল। ডাক্তারবাবু প্রথম দুই দিন ৪।৫ বার আসিলেন। বাটীতে অন্য কেহই নাই, সুতরাং অমিয়াকে তাঁহার সম্মুখেও রোগীর নিকট থাকিতে হইত।

ডাক্তারকে বার বার আসিতে দেখিয়া এবং তার রকমে সকমে অমিয়ার বড় ভাবনা হইল। সে মনে মনে প্রমাদ গণিল। (ক্রমশ)

২৭ নং হরিতুকি বাগান কমারশিয়াল প্রেসে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র আইচ দ্বারা মুদ্রিত।

বঙ্গদর্শন।

বঙ্কিমচন্দ্র।

বঙ্কিম বাবুর দ্বিতীয় স্তরের উপন্যাস চন্দ্রশেখর, রজনী, বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল ও ইন্দিরা। ১২৭৯ সালে বিষবৃক্ষ ও ইন্দিরা, ১২৮০ সালে চন্দ্রশেখর ও যুগলাঙ্গুরীয়, ১২৮১ সালে রজনী, ১২৮৪ সালে কৃষ্ণকান্তের উইল প্রকাশিত হয়। এই সকল উপন্যাসে দর্শন ও মনস্তত্ত্ব-সম্বন্ধীয় অনেক জটিল রহস্য নিহিত আছে। কিন্তু তাই বলিয়া যে সৌন্দর্য্যসৃষ্টি এ সকলে নাই, তাহা নহে—সৌন্দর্য্যের কবি যেখানে অবসর পাইয়াছেন, সেই খানেই নিরাবিল সৌন্দর্য্যের ছবি তুলিয়াছেন—তাঁহার প্রকৃতি-সম্ভোগক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন—চন্দ্র-শেখরের "অগাধ জলে সাঁতার," বিষবৃক্ষের "না," রজনীর পঞ্চম ও ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে "শচীন্দ্রের" কথায়, কৃষ্ণকান্তের উইলের সপ্তম পরিচ্ছেদের "বারুণী-পুষ্করিণী"-বর্ণনায়, ইন্দিরার "বাজিয়ে যাব মলে" সৌন্দর্য্য উছ-লিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু বঙ্কিম বাবুর উদ্দেশ্য এ স্থলে শুধু সৌন্দর্য্যসৃষ্টি নহে, মনুষ্যহৃদয়ের প্রতিবিম্ব গ্রহণ ও মনুষ্যহৃদয়স্থ কয়েকটী বৃত্তির পরিচয় প্রদান। এই উপন্যাসগুলির ভিতর বিষবৃক্ষ ও কৃষ্ণকান্তের উইল সামাজিক। কিন্তু সামাজিক উপন্যাস বলিতে সকলে যাহা বুঝি, তাহা বিষবৃক্ষ ও কৃষ্ণকান্তের উইল নহে, ইহাদের রচনায় গভীর উদ্দেশ্য আছে, ইহাদের ideal ঠিক realistic নহে। উভয় গ্রন্থের প্রতিপাদ্য—প্রেমের জয়, লালসার পরাজয়। উভয় গ্রন্থেরই প্রতিপাদ্য হিন্দুস্ত্রী, আর্য্যনারীর সনাতন আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া বিদেশী শিক্ষায় বিদেশী আদর্শ গ্রহণ করিলে সুখ পান না, তাহাতে বরং বিষময় ফলই উৎপন্ন হয়। উভয়েরই প্রতিপাদ্য ধর্ম্মবন্ধন ভিন্ন প্রণয় বা অন্য কোনও বৃত্তিতে সুখ নাই। বিষ-বৃক্ষে নগেন্দ্রনাথের হৃদয়ে কুন্দনন্দিনীর প্রতি লালসা ও তজ্জনিত তাঁহার পতন অতি সুন্দররূপে বর্ণিত আছে। গোবিন্দলালের ও রোহিণীর রূপসম্ভোগ-জনিত পতন নিপুণভাবে চিত্রিত হইয়াছে। কিন্তু নগেন্দ্রনাথের পরিণাম ও গোবিন্দ-লালের পরিণাম বিভিন্ন প্রকার। ইহাতেই বঙ্কিম বাবুর মনুষ্য-হৃদয়-চিত্রণ-প্রতিভা বিশেষভাবে প্রকাশ পাইতেছে। এই পরি-ণাম-বিভিন্নতার হেতু সূর্য্যমুখী ও কুন্দনন্দিনী, ভ্রমর ও রোহিণী। কুন্দনন্দিনী লালসাময়ী

নহে, কুন্দের হৃদয়ে ভালবাসা অগাধ, লজ্জানম্র ও নিঃস্বার্থ, তাই কুন্দনন্দিনী নগেন্দ্রনাথের ভাল বই মন্দ খোঁজে নাই। কুন্দনন্দিনী ভালবাসা নিজের হৃদয়ে পোষণ করিতেছিল, রোহিণী যেমন গোবিন্দলালকে আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, সে তেমন করে নাই। রোহিণী লালসাময়ী, তাই তাহার সর্ব্বনাশের সহিত গোবিন্দলালেরও সর্ব্বনাশ হইল। গোবিন্দলাল নারীহত্যাকারী হইলেন। নগেন্দ্রনাথ শীঘ্রই পথ চিনিয়া লইলেন, কেননা কুন্দনন্দিনী তাঁহাকে ভোলাইবার জন্য কোনও কৌশল বিস্তার করে নাই! নগেন্দ্রনাথের লালসা তাঁহার প্রণয় দ্বারা পরাজিত হইল, সূর্য্যমুখীর গৃহত্যাগে তাঁহার সেই প্রণয় মাথা তুলিয়া উঠিল, তিনি বুঝিলেন সূর্য্যমুখী তাঁহার হৃদয়ের কতখানি অধিকার করিয়াছিল। তাঁহার কুন্দনন্দিনী-সম্ভোগের নেশা কাটিয়া গেল, লালসা পরাজিত হইল, কুন্দনন্দিনী মরিল। যে দিন নগেন্দ্র বুঝিতে পারিলেন যে সূর্য্যমুখীই তাঁহার সব, কুন্দনন্দিনী কেবল লালসার পাত্র মাত্র, সেই দিনই কুন্দনন্দিনী মরিয়াছিল, বিষবৃক্ষ কাব্যে আর তাহার অস্তিত্ব ছিল না। লালসাময়ী রোহিণীর প্রাণের মমতা বড় বেশী, তাই মৃত্যুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া সে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিয়াছিল। কুন্দনন্দিনীর প্রাণের মমতা ছিল না; কারণ সে নগেন্দ্রনাথকে যথার্থই ভাল বাসিয়াছিল। কিন্তু যদি নগেন্দ্রনাথকে যথার্থই সে ভাল বাসিয়াছিল তবে বিষ খাইল কেন? নগেন্দ্রনাথের সুখে সুখী হইয়া থাকিতে পারিল না কেন? তাহার কারণ সে তাহার হিন্দুত্ব হারাইয়াছিল, তাহার আর্য্য-আদর্শ নষ্ট হইয়াছিল। বঙ্কিম বাবু দেখাইয়াছেন যে বিধবা-বিবাহ ঠিক আর্য্যাদর্শ অনুযায়ী নহে, সেরূপ বিবাহে সুখ নাই ও সে বিবাহে উচ্চ আদর্শ খর্ব্ব হইয়া যায়। তাই কুন্দনন্দিনী অভিমান করিয়া মরিল।

কিন্তু নগেন্দ্রনাথের হৃদয়ে সুখের সম্ভাবনা হইল, কেবল সূর্য্যমুখীকে ফিরিয়া পাইয়া। এই স্থলে সূর্য্যমুখীর সহিত ভ্রমরের পার্থক্য আমাদিগকে স্মরণ করিতে হইবে। সূর্য্যমুখীর সমস্ত হৃদয় পতিময় ছিল, তাঁহার গঠন আর্য্যনারীর অনুরূপ, কিন্তু সেই আদর্শ কিছু বিদেশী শিক্ষায় বিকৃত হইয়াছিল, তাই সূর্য্যমুখী নগেন্দ্রনাথের বিবাহের পর গৃহ ত্যাগ করিয়াছিল, তবে সে গৃহত্যাগ প্রণয়েরই জন্য, অন্য কোনও কারণে নহে। কিন্তু ভ্রমর গৃহ ত্যাগ করিল কেন? স্বামীকে অপরাধী ও পাপী ভাবিয়া। ভ্রমরের হৃদয়েও স্বামী-প্রেম যথেষ্ট ছিল, কিন্তু নিজের ধর্ম্মজ্ঞানের উপর কিছু বেশী রকম নির্ভর ছিল। তাহার মনে হইয়াছিল যে পতিকে অতিক্রম করিয়া তাহার স্বতন্ত্র ধর্ম্ম আছে, পতি যদি ধর্ম্মপথভ্রষ্ট হন, তবে তিনি তাহার পরিত্যজ্য। ভ্রমরে বিদেশী শিক্ষার প্রভাব বড় বেশী, তাই ভ্রমর আর্য্যরমণী হইলেও আর্য্যরমণীর সকল গুণের অধিকারিণী ছিল না। সূর্য্যমুখী থাকিতে না পারিয়া আবার ঘরে ফিরিয়া আসিয়া নগেন্দ্রনাথকে উদ্ধার করিল। আর ভ্রমর স্বামীর কাতর প্রার্থনায় কর্ণপাত না করিয়া নিজের ও স্বামীর এবং সঙ্গে সঙ্গে রোহিণীরও সর্ব্বনাশ

করিল। সীতা, দময়ন্তী, শকুন্তলা ও সাবিত্রীর দেশে কোনও বিদেশী আদর্শ সুফল প্রসব করিবে না, মহাকবি সূর্য্যমুখী, ভ্রমর ও কুন্দনন্দিনীর চিত্রে তাহাই দেখাইয়াছেন। এই কথা বুঝাইবার জন্যই তাঁহাকে সূর্য্যমুখী ও ভ্রমরকে একটুখানি বিলাতী ধাঁজের করিয়া গড়িতে হইয়াছে। সময়ের প্রভাবে যে আর্য্যরমণীর পরম পবিত্র আদর্শ তিরোহিত হইতে বসিয়াছে, তাহাতে যে কত কুফল ফলিবার সম্ভাবনা, তাহাই বঙ্কিম বাবু বিষবৃক্ষ ও কৃষ্ণকান্তে শিখাইয়াছেন। এই শিক্ষা দিবার জন্য যদি তাঁহাকে তাঁহার নায়িকাগণকে বিদেশী ভাবাপন্ন করিতে হইয়া থাকে, তাহাতে আমি মনে করি না যে তিনি ইংরাজী প্রভাবের বশবর্ত্তী হইয়া এরূপ করিয়াছেন।

বিষবৃক্ষ ও কৃষ্ণকান্তে যেমন লালসার চিত্রের ছড়াছড়ি, রজনী ও চন্দ্রশেখরে তেমনি আত্মসংযমের চিত্র দেদীপ্যমান্। অমরনাথের আত্মসংযম, লবঙ্গলতার আত্মসংযম, রজনীর আত্মসংযম, প্রতাপের আত্মসংযম, চন্দ্রশেখরের আত্মসংযম। বঙ্কিম বাবু দেখাইয়াছেন যে সংসারে আত্মসংযমেই সুখ—তাহার অভাবই দুঃখ। শৈবলিনী যখন অতৃপ্ত বাসনা চরিতার্থ করিবার কামনায় অস্থির হইয়া বেড়াইতেছিল, তখন তাহার হৃদয়ে সুখ ছিল না; জ্ঞান ছিল না বলিয়া সুখ ছিল না; জ্ঞান ভিন্ন সুখ আসে না। তাহার পর একদিন প্রতাপের পীড়াপীড়িতে অগাধ জলে সাঁতার দিতে দিতে সে এক ভীষণ প্রতিজ্ঞা করিল, তাহার প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইল এবং তাহার জ্ঞান আসিল। অমরকবি অমৃতময় ভাষায় শৈবলিনীর সে জ্ঞানোদয় বর্ণনা করিয়াছেন। শৈবলিনী দেখিল "এ কি রূপ। এই দীর্ঘ শালতরুনিন্দিত সুভুজবিশিষ্ট, সুন্দর গঠন, সুকুমারে বলময়, এ দেহ যে রূপের শিখর! এই যে ললাট প্রশস্ত চন্দনচর্চ্চিত, চিন্তারেখাবিশিষ্ট, এ যে সরস্বতীর শয্যা, ইন্দ্রের রণভূমি, মদনের সুখকুঞ্জ, লক্ষ্মীর সিংহাসন, ইহার কাছে প্রতাপ? ছি! ছি! সমুদ্রের কাছে গঙ্গা! ঐ যে নয়ন জ্বলিতেছে, হাসিতেছে, ফিরিতেছে, ভাসিতেছে, দীর্ঘ, বিস্ফারিত, তীব্রজ্যোতিঃ, স্থির, স্নেহময়, করুণাময়, ঈষৎ রঙ্গপ্রিয়, সর্ব্বত্র তত্ত্বজিজ্ঞাসু, ইহার কাছে কি প্রতাপের চক্ষু? কেন আমি ভুলিলাম, কেন মজিলাম, কেন মরিলাম! এই যে সুন্দর সুকুমার বলিষ্ঠ দেহ, নবপত্রশোভিত শালতরু, মাধবীজড়িত দেবদারু, কুসুমপরিব্যাপ্ত পর্ব্বত, অর্দ্ধেক সৌন্দর্য্য অর্দ্ধেক শক্তি, আধ চন্দ্র আধ ভানু, আধ গৌরী আধ শঙ্কর, আধ রাধা আধ শ্যাম, আধ আশা আধ ভয়, আধ জ্যোতিঃ আধ ছায়া, আধ বহ্নি আধ ধূম, কিসের প্রতাপ? কেন না দেখিলাম, কেন মজিলাম, কেন মরিলাম! এই যে ভাষা পরিষ্কৃত, পরিস্ফুট, হাস্যপ্রদীপ্ত, ব্যঙ্গরঞ্জিত, স্নেহপরিপ্লুত, মৃদু, মধুর, পরিশুদ্ধ, কিসের প্রতাপ? কেন মজিলাম, কেন মরিলাম, কেন কুল হারাইলাম? সেই যে হাসি, ঐ পুষ্পপাত্রস্থিত মল্লিকারাশিতুল্য, মেঘমণ্ডলে বিদ্যুত্তুল্য, দুর্ব্বৎসরে দুর্গোৎসব তুল্য, আমার সুখস্বপ্ন তুল্য, কেন দেখিলাম না, কেন মজিলাম, কেন মরিলাম না, কেন বুঝিলাম না? সেই

যে ভালবাসা সমুদ্রতুল্য অপার অপরিমেয়, অতলস্পর্শ, কেন বুঝিলাম না, কেন হৃদয়ে তুলিয়া লইলাম না, কেন আপনা খাইয়া প্রাণ দিলাম না? কে আমি? তাঁহার কি যোগ্য? বালিকা, অজ্ঞান, অনক্ষর, অসৎ, তাঁহার মহিমা জ্ঞানে অশক্ত, তাঁহার কাছে আমি কে? আমি মজিলাম, মরিলাম না কেন?"

শৈবলিনী-চিত্রণের ইহাই সার্থক পরিসমাপ্তি। শৈবলিনী-চরিত্র বিলাতি ছাঁচে ঢালা নহে। মহাকবি আর্য্যাদর্শ-ভ্রষ্টা রমণীর কুগতি ও তাহার পুনঃপ্রাপ্তিতে সদ্‌গতি উজ্জ্বলবর্ণে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রায়শ্চিত্ত-শুদ্ধা শৈবলিনী চন্দ্রশেখরকে পাইল। অবিরত পতিচিন্তায়—যে শৈবলিনী একদিন বলিয়াছিল যে চন্দ্রশেখরকে সে কখন ও ভালবাসিতে পারিবে না—সেই শৈবলিনী পতিপ্রেমপাগলিনী হইল। মহাপুরুষের উপদেশ ফলিল। বঙ্কিমসৃষ্ট এই সন্ন্যাসী-চরিত্রগুলি অভিজ্ঞানশকুন্তলের কণ্বচরিত্রের ন্যায় অনেক স্থলেই পুস্তকের মেরুদণ্ড স্বরূপ।

এই স্থলে বঙ্কিম বাবু একটী অমূল্য উপদেশ দিয়াছেন তাহা এই "মনুষ্যের ইন্দ্রিয়-পথ রোধ কর, ইন্দ্রিয় বিলুপ্ত কর, মনের শক্তি অপহৃত কর, মন কি করিবে, সেই এক পথে যাইবে, তাহাতে স্থির হইবে, তাহাতে মজিবে।" মহর্ষি পাতঞ্জলি ভগবদ্‌প্রাপ্তির এই পথই নির্দ্দেশ করিয়াছেন, "চিত্তবৃত্তিনিরোধো যোগঃ।" আমাদের শাস্ত্রকারগণও স্ত্রীগণকে পতিচিন্তনে এইরূপ ভাবেই নিযুক্ত করিয়াছেন। কবিবর বঙ্কিমচন্দ্রও সেই পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তবুও কি বলিতে হইবে বঙ্কিম বাবু বিলাতি আদর্শে অনুপ্রাণিত? বঙ্কিম বাবু রজনীতে বলিয়াছেন—"তোমাদের একটী ভ্রম আছে, তোমরা মনে কর যে যাহা ইংরাজেরা জানে তাহাই সত্য, যাহা ইংরাজেরা জানে না তাহাই অসত্য, তাহা মনুষ্যজ্ঞানের অতীত, তাহা অসাধ্য। বস্তুতঃ তাহা নহে।" বঙ্কিম বাবু অন্ধভাবে ইংরাজভক্ত ছিলেন না, অথবা তিনি এতটা নির্ব্বোধ ছিলেন না যে ইংরাজী ভাবানুযায়ী চরিত্র বঙ্গসাহিত্যে কখনও স্থায়িত্ব লাভ করিবে না, এই সহজ কথাটুকু বুঝিতে পারিতেন না। তাঁহার মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য যদি বা তিনি অসামাজিকতা (অস্বাভাবিকতা বলিতে পারি না) দোষে দূষিত হইয়াই থাকেন, তাহার জন্য তাঁহার কাব্যের কিছুমাত্র ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া বোধ করিতে পারি না।

চন্দ্রশেখর ও রজনীতে কবির উদ্দেশ্য অনেক পরিমাণে দার্শনিক। রজনী Nydiaর ছায়াবলম্বনে রচিত বটে, কিন্তু Nydiaতে ও রজনীতে প্রভেদ বিস্তর। রজনী মনস্তত্ত্বের কতকগুলি সমস্যার সজীব মূর্ত্তি, তাহার সহিত কতকগুলি দার্শনিক তত্ত্বও মিশিয়াছে—মিশিয়া একটা অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যময়ী অন্ধবালিকার সৃষ্টি হইয়াছে। এই অন্ধ রজনীর হৃদয়ে প্রণয়োৎপত্তি রহস্যময়—লোকে দেখিয়া ভালবাসে, গুণমুগ্ধ হইয়া ভালবাসে, অথবা সঙ্গজ অভ্যাস বশতঃ ভালবাসে, অন্ধ রজনী ভালবাসিল কথা শুনিয়া, স্পর্শসুখে মুগ্ধ হইয়া। অন্ধ রজনীর মুখ দিয়া

কবি বলিতেছেন "রূপ দর্শকের একটী মনের সুখমাত্র, শব্দও শ্রোতার একটী মনের সুখমাত্র, স্পর্শও স্পর্শকের মনের সুখমাত্র। যদি আমার রূপ-সুখের পথ বন্ধ থাকে, তবে শব্দ স্পর্শ গন্ধ কেন রূপ-সুখের ন্যায় মনোমধ্যে সর্ব্বময় না হইবে?

এই চক্ষুবিহীনা রজনী প্রণয়-পরিপ্লুতা, কিন্তু অসাধারণ তেজস্বিনী ও স্বার্থত্যাগ-পরায়ণা। রজনীতে স্বার্থত্যাগের ও আত্মসংযমের বড় সুন্দর ছবি আছে। লবঙ্গ-লতা আত্মসংযম দ্বারা একটা সংসারকে সুখী করিল, রজনী অনায়াসে শচীন্দ্র-প্রেম-মুগ্ধ হৃদয় অমরনাথের করে সমর্পণ করিতে প্রস্তুত হইল, অমরনাথ শচীন্দ্রের সুখের জন্য অনায়াসে রজনীপ্রাপ্তিকামনা ত্যাগ করিল। কবি দেখাইয়াছেন যে আত্ম-ত্যাগেই সুখ, আত্মজয়েই পরিতৃপ্তি। চন্দ্রশেখর ও প্রতাপের আত্মবিসর্জ্জন অতুল ও রোমাঞ্চকর।

প্রণয়বর্ণনে কবি সিদ্ধহস্ত। এই স্তরের পুস্তকগুলিতে প্রণয়জাত কত বিভিন্নতাই চিত্রিত হইয়াছে, তাহা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ মধ্যে বর্ণিত হওয়া অসম্ভব। এই টুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, বঙ্কিম বাবু নিজের কথায় প্রায়ই এই প্রণয় বর্ণনা করেন না। হয় অবস্থা বিশেষ দ্বারা অথবা একটী রেখাপাত দ্বারা তাহা প্রকটিত করেন। চন্দ্রশেখরের পুস্তকরাশি ভস্মীকরণ দ্বারা তাঁহার যে অগাধ প্রণয় ফুটিয়া পড়িয়াছে, তাহা একশত সাজান কথায় বর্ণিত হইত না। জর্জ্জ এলিয়টের মতন তিনি নিজের সৃষ্ট চরিত্রের সমালোচনা করেন না, থ্যাকারের মত তিনি তাহাদিগকে গালাগালি করেন না। অথচ কোন চরিত্রের কোনও অংশই অপ্রকাশিত বা অকথিত থাকে না। এই বিষয়ে কবির ক্ষমতা অসীম। নাটকীয় তুলিকা স্পর্শে তাঁহার চরিত্রগুলি সমুজ্জ্বল হইয়া উঠে। বিষবৃক্ষে "না" পরিচ্ছেদ এমনি চিত্র—সুন্দর মোহন হৃদয়গ্রাহী চিত্র —কুন্দনন্দিনীর হৃদয় এই "না"র ভিতর দিয়া একেবারে উন্মুক্ত হইয়া পড়িয়াছে।

মনুষ্যচরিত্র-চিত্রণে বঙ্কিম বাবুর ক্ষমতা অসীম। তাঁহার চরিত্রগুলি এত জীবন্ত যে আমরা তাহাদের সুখদুঃখে সুখদুঃখ অনু-ভব না করিয়া থাকিতে পারি না। তাহারা এত সত্য যে আমরা তাহাদের দোষগুণ বিচার না করিয়া থাকিতে পারি না। জগৎ-সিংহ, তিলোত্তমা, আয়েষা, কপালকুণ্ডলা, নবকুমার, চন্দ্রশেখর, প্রতাপ, শৈবলিনী, লবঙ্গলতা, রজনী ইহারা সকলেই আমাদের যেন চির পরিচিত আত্মীয়। কোন আত্মীয়ের মৃত্যুতে আমাদের যে মনদুঃখ হয়, কপালকুণ্ডলার মৃত্যুতেও সেইরূপ দুঃখ হয়, এমন কি কেহ কেহ আবার তাহাকে বাঁচাইয়া ঘরকন্না করাইবার প্রলোভনও সামলাইতে পারেন নাই, ভাগ্যে সেই রকম আর কেহ কুন্দনন্দিনীর বিষটা ঝাড়াইয়া লন নাই, কিন্তু আমাদের সেই রকম ইচ্ছাই হয় বটে! কবির কি অলৌকিক শক্তি!

এই চরিত্র-গঠনের পারিপাট্য ও সফলতার মূলে কবির সহৃদয়তা ও সুমহতী রসাবতারণশক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে। কবি যখনই যে চরিত্র চিত্রিত করিতে ইচ্ছা করেন, তখনই নিজের অসাধারণ কল্পনা বলে তিনি

সেই চরিত্রের সাযুজ্য প্রাপ্ত হন, তাই চরিত্র-গুলি নির্জীব হয় না। আবার তিনি যখনই যে রসের অবতারণা করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন তাহাতেই অশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। করুণ রস তাঁহার লেখনীর মুখে উছলিয়া উঠে, সরস শুভ্র পরিহাস-রসিকতায় বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গসাহিত্যে অদ্বিতীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অন্যান্য সকল রসই তাঁহার দাসের ন্যায় তাঁহার কাজের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত। রসাত্মকং বাক্যং যদি কাব্য হয় তবে বঙ্কিম বাবুর উপন্যাসগুলি গদ্য হইলেও কাব্য।

গদ্যে লেখা হইলেই যে কাব্য হয় না তাহা নহে—বঙ্কিম বাবুর এই স্তরের অন্তর্গত আর একটী উপাদেয় গদ্য কাব্য আছে তাহা কমলাকান্তের দপ্তর; কমলাকান্তের দপ্তর বাঙ্গলা সাহিত্যে অদ্বিতীয়, উহার অনুসরণে লিখিত অপরের লেখাগুলি ইহার ছায়ামাত্র। কমলাকান্তের ভাবা ভাবসম্পদ, সরসতা ও আন্তরিকতা এতজ্জাতীয় আর কোনও বাঙ্গলা পুস্তকে দেখি নাই, দেখিব কি না জানি না। কমলাকান্তের দপ্তরে বঙ্কিম বাবুর গভীর মাতৃভূমিপ্রেম প্রথম প্রকাশিত হইয়াছে। কমলাকান্তেই বঙ্কিম বাবুর দেশের দুর্দ্দশায় হৃদয়োত্থিত ক্রন্দন-ধ্বনি প্রথম ধ্বনিত হইয়াছে—

"আর বঙ্গভূমি! তুমিই বা কেন মণি-মাণিক্য হইলে না, তোমায় কেন আমি হার করিয়া কণ্ঠে পরিতে পারিলাম না? তোমায় যদি কণ্ঠে পরিতাম মুসলমান আমার হৃদয়ে পদাঘাত না করিলে তাহার পদরেণু তোমায় স্পর্শ করিতে পারিত না। তোমায় সুবর্ণ আসনে বসাইয়া, হৃদয়ে দোলাইয়া দেশে দেশে দেখাইতাম। ইউরোপে, আমেরিকে, মিসরে, চীনে দেখিত তুমি আমার কি উজ্জ্বল মণি।"

আবার "চাহিবার এক শ্মশানভূমি আছে, নবদ্বীপ। বঙ্গমাতাকে মনে পড়িলে আমি সেই শ্মশানভূমির দিকে চাই, গঙ্গাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করি, তুমি আছ সে রাজ-লক্ষ্মী কই? * * * বুঝি তোমারই অতল গর্ভ মধ্যে সেই লক্ষ্মী ডুবিয়াছেন, বুঝি কুপুত্রগণের আর মুখ দেখিবেন না বলিয়া ডুবিয়া আছেন, যদি গঙ্গার অতল জলে না ডুবিলেন, তবে আমার সেই দেশলক্ষ্মী কোথায় গেলেন?" এই আকুল অনুসন্ধিৎসার, এই হৃদয়ভেদি ক্রন্দনের ফলে বঙ্কিমচন্দ্র মাতৃ-মূর্ত্তির দর্শন পাইয়াছিলেন। সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা স্বর্গাদপি গরীয়সী বরাভয়প্রদা জন্মভূমি তাঁহার আনন্দমঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, বন্দেমাতরম্ তাহার মন্ত্র, প্রত্যক্ষ-দ্রষ্টা ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র সন্তান মাত্রকেই এই মহামন্ত্র জপে বিনিয়োগ করিয়াছেন। আমরা অতঃপর আনন্দমঠের কথা বলিয়া কৃতার্থ হইব।

আনন্দমঠ বঙ্কিম বাবুর তৃতীয় স্তরের পুস্তক। এই স্তরের অন্তর্গত তিনটী উপ-ন্যাস, আনন্দমঠ, দেবী-চৌধুরাণী ও সীতা-রাম। রাজসিংহকেও এই স্তরের মধ্যেই ফেলা যাইতে পারে, কিন্তু রাজসিংহ ঐতিহাসিক উপন্যাস, উদ্দেশ্য কিন্তু এই চারিটীর প্রায়ই সমান। আনন্দমঠ ১২৮৮ সালে, দেবী-চৌধুরাণী ১২৯১ সালে ও সীতারাম ১২৯৩

সালে এবং পরিবর্দ্ধিত রাজসিংহও অল্প পরেই প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থগুলিতে বঙ্কিম বাবুর স্বদেশপ্রীতি উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত এবং এই গুলিতে বঙ্কিম বাবু আর্য্যনারীর আদর্শ আঁকিয়াছেন ও কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই তিন গ্রন্থের স্ত্রীচরিত্রগুলি সূর্য্যমুখী, ভ্রমর, দলনী, তিলোত্তমা প্রভৃতি প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের স্ত্রীচরিত্রের ন্যায় কেবল প্রণয়িনী নহে, ইহাদের উদ্দেশ্য অতি উচ্চ, সাধনা অতি মহৎ, ইহারা সহধর্ম্মিণী, কেবল পত্নীমাত্র নহে। শান্তি, কল্যাণী, শ্রী, জয়ন্তী, প্রফুল্ল, নিশা, ইহারা সকলে নিষ্কাম কর্ম্মকারিণী আর্য্যস্ত্রী। ইহাদিগের সৃজন-কালে বঙ্কিম বাবুর হৃদয়ে গীতোক্ত অমৃতময় উপদেশ জাগরূক ছিল। ইহাদের হৃদয়ে নিজের সুখদুঃখ, মান-অভিমান, অহমিকা কিছু মাত্র কার্য্য করে না। ইহারা কেবল পতির হিত চিন্তায় বা পরার্থে জীবন উৎসর্গ করিয়াছে। নিজের স্বার্থের জন্য কখনও পতির কর্ত্তব্যে বাধা দেয় নাই। ভ্রমর ইহা-দের কাছে দাঁড়াইতে পারে না। রমা, নন্দা, কল্যাণী, প্রফুল্ল ইহারা যথার্থ হিন্দুস্ত্রী।

পতিত সীতারামকে নন্দা বলিতেছে ঃ— "তোমার মহিষী হইয়া আমি কার সঙ্গে পলাইব মহারাজ ? তোমার পুত্রকন্যা আমি তোমাকে না বলিয়া কাহার হাতে দিব! পুত্র বল কন্যা বল, সকলই ধর্ম্মের জন্য। আমার ধর্ম্ম তুমি। আমি তোমাকে ফেলিয়া পুত্রকন্যা লইয়া কোথায় যাইব ?"

শ্রী আপনাকে প্রিয়প্রাণহন্ত্রী ভাবিয়া যে স্বামীর ত্রিসীমানায় আসিতে চাহিত না, তাঁহারই মৃত্যু উপস্থিত ভাবিয়া তাঁহার সহিত মরিতে আসিল, সীতারামের ভৎর্সনায় তেজস্কর উত্তর দিল "আমার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম আছে, তাই করিতে আসিয়াছি, আজ তোমার মৃত্যু উপস্থিত, তাই তোমার সহিত মরিতে আসিয়াছি।"

স্বামীর সহিত আর একজনকে পরিণীত দেখিয়া সূর্য্যমুখী গৃহ ত্যাগ করিয়াছিল, কিন্তু প্রফুল্ল স্বামীকে ডাকিয়া বলিয়াছিল "আমি একা তোমার স্ত্রী নই। তুমি যেমন আমার, তেমনি সাগরের, তেমনি নয়ান বৌয়ের। আমি একা তোমায় ভোগদখল করিব না। স্ত্রীলোকের পতি দেবতা, তোমাকে ওরা পূজা করিতে পায় না কেন? * * আমায় যেমন ভালবাস, উঁহাদিগকেও তেমনি ভাল-বাসিতে না পারিলে আমার উপর তোমার ভালবাসা সম্পূর্ণ হইল না। ওরাও আমি!"

পতি-ধর্ম্মসঙ্গিনী কল্যাণী ও শান্তির মুখেও আমরা এইরূপ কথাই শুনিতে পাই। কল্যাণী বলিতেছে—মৃত্যুর সময় অকাতরে বলিতেছে "আমি ভালই করিয়াছি, ছার স্ত্রীলোকের জন্য পাছে তুমি দেবতার কাজে অযত্ন কর! তুমি যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছ, কায়মনোবাক্যে তাহা সিদ্ধ কর, পুণ্য হইবে, দুইজন একত্রে অনন্ত স্বর্গ ভোগ করিব।

শান্তিও সগর্ব্বে বলিয়াছিল "আমি আপনার দক্ষিণ হস্তে বল বাড়াইতে আসিয়াছি। আমি ব্রহ্মচারিণী, প্রভুর কাছে ব্রহ্মচারিণীই থাকিব। আমি কেবল ধর্ম্মাচরণের জন্য আসিয়াছি, স্বামীদর্শনের জন্য নয়। বিরহ-যন্ত্রণায় আমি কাতর নই। স্বামী যে ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন আমি তাহার ভাগিনী হইব না কেন? তাই আসিয়াছি।"

শান্তি, কল্যাণী, প্রফুল্ল কেবল স্নেহময়ী পত্নী নহে, পতির ধর্ম্মসহায়িনী বীররমণী। রাজসিংহ ঐতিহাসিক উপন্যাস বটে, কিন্তু চঞ্চলকুমারী ও নির্ম্মলকুমারীকেও আমার এই দলেই ফেলিতে ইচ্ছা করে। ইহারাও আর্য্যরমণী। বঙ্কিম বাবুর শেষ স্তরের উপন্যাসগুলিতে আমরা যে কতকগুলি স্ত্রীচরিত্র দেখিতে পাই, তাঁহারা সীতা, সাবিত্রী প্রভৃতি আমাদের চিরপরিচিতা আর্য্যনারীদিগকে স্মরণ করাইয়া দেয়, ইহাই আমাদের পরম লাভ, পরম সৌভাগ্য। এই স্তরের উপন্যাসগুলি লিখিবার সময় বঙ্কিমচন্দ্রের হৃদয়-কন্দর স্বদেশ-প্রেমে সর্ব্বতোভাবে আপ্লুত হইয়া উঠিয়াছিল।

এ গ্রন্থগুলিতেও সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির অভাব নাই, চরিত্রগুলিও যথেষ্ট সজীব। সীতারাম, ব্রজেশ্বর, জীবানন্দ, ভবানন্দ, রমা, নন্দা, শ্রী, প্রফুল্ল, শান্তি, কল্যাণী, ইহারাও আমাদের ঘরের লোক, ইহাদেরও সুখদুঃখ আমাদিগের হৃদয়ে ঘাত প্রতিঘাতের সৃষ্টি করে। আর সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির তো কথাই নাই। যখন যে সৌন্দর্য্য-কল্পনা নয়নের সমক্ষে পড়িয়াছে, নিপুণ কবি তাহার নিখুঁত ছবি তুলিয়াছেন। প্রকৃতির সহিত সহানুভূতি তাঁহার কিছুমাত্র কমে নাই বরং উত্তরোত্তর বাড়িয়া গিয়াছে, আরও সরস হইয়াছে, দৃষ্টি আরও সূক্ষ্মতর হইয়াছে, বর্ণনাশক্তি আরও বাড়িয়াছে। বর্ণনা তুলিয়া দেখাইবার অবসর নাই, আনন্দমঠের দুর্ভিক্ষ বর্ণনা, সীতারামের উদয়গিরি-বর্ণনা, দেবী চৌধুরাণীর ভরা-নদীতে প্রফুল্লের বজ্‌রার বর্ণনা পাঠ করিলেই এই সকল কথা পরিষ্কার রূপে বুঝা যাইবে। কিন্তু এক আধটা বর্ণনার কথা কেন বলিতেছি, আনন্দমঠ, দেবী-চৌধুরাণী, সীতারামের প্রতি ছত্রে যে শক্তি দেদীপ্যমানা, তাহা পরিণত বুদ্ধি কবির নিপুণ তুলিকা সর্ব্বত্রই বর্দ্ধিত নিপুণতার পরিচয় দিতেছে।

আমরা মাঝে মাঝে শুনিতে পাই যে বঙ্কিমচন্দ্র গৃহচিত্র প্রদান করেন নাই, স্বর্ণলতা যে ভাবের গৃহচিত্র সেরূপ চিত্র বঙ্কিমচন্দ্রে নাই। যাঁহারা এই মত প্রকাশ করেন, তাঁহাদিগকে পরিবর্দ্ধিত ইন্দিরার "সুভাষিণী" চরিত্র ভাল করিয়া পাঠ করিতে অনুরোধ করি এবং আনন্দমঠের পঞ্চদশ পরিচ্ছেদের যেখানে জীবানন্দ সুকুমারীকে লইয়া ভগিনী নিমির কাছে রাখিতে গিয়া তাহার সহিত কথোপকথন করিতেছেন, সেই স্থানটি পাঠককে পড়িতে অনুরোধ করি।

এই পরিচ্ছেদের সমস্তটাই তুলিয়া দিতে ইচ্ছা করে। গিরিজাপ্রসন্ন বাবু যথার্থই বলিয়াছেন "এই কয়েক পাতা পড়িতে পড়িতে আমাদের চক্ষের উপর যেন নিমাইয়ের চেহারাটা শুদ্ধ প্রতিফলিত হইতেছে।" দুই চারিটী রেখাপাতে এমন সজীব চিত্র অঙ্কন বঙ্কিম বাবুরও অন্য পুস্তকে নাই।

এইরূপ গৃহচিত্র দেবী-চৌধুরাণীর প্রথমাংশেও আমরা দেখিতে পাই। "অ পি অ প্রফুল্ল অ পোড়ার মুখি!' মা ডাকিল মেয়ে কাছে আসিল।" এই রেখাপাতে সেই গৃহ-চিত্র আরম্ভ হইয়াছে। এই

সকল চিত্রের তুলনা বাঙ্গলা সাহিত্যে আর কোথাও আছে কি?

কিন্তু এখন অন্য কথা বলা যাক্, যে দেশ-ভক্তির কথা আগে বলিয়াছি সেই কথা একটু বিস্তৃতভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করা যাউক। এই স্বদেশ-প্রেম বঙ্কিম বাবুর সকল কার্য্যের মূলে বিদ্যমান, স্বদেশ-প্রেমবশতই তিনি স্বজাতীয় সাহিত্য সৃজন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, স্বদেশ-প্রেমবশতই তিনি তাঁহার পুস্তকে জাতীয়-আদর্শ বজায় রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই প্রেম-বশতই তিনি কবি ও সমালোচক, প্রবন্ধ-প্রণেতা, প্রত্নতত্ত্ব-মীমাংসু, নীতিবেত্তা ও ঐতিহাসিক হইয়া সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ভুল ভ্রান্তি কাহার নাই? তাঁহার অনেক ভ্রমপ্রমাদ আছে। ভ্রমপ্রমাদ আছে সত্য, কিন্তু তথাপি তাঁহার গ্রন্থাবলী অশেষ অনুসন্ধিৎসা, গবেষণা ও মনস্বিতার পরিচায়ক। তাঁর সমালোচনা অনেক স্থলে মর্ম্মন্তুদ ছিল সত্য, কিন্তু তাহা না করিয়াও তাঁহার উপায় ছিল না। যে শিশুসাহিত্যসৃজনে তিনি লিপ্ত ছিলেন, তাহার শরীরে আগাছা না জন্মায়, তাহা তাঁহাকে বাধ্য হইয়া করিতে হইয়াছিল। বঙ্কিমের পূর্ব্বে সমালোচনা ছিল না, এখনও বড় একটা নাই। তাই তখন ও আজকাল সাহিত্য মধ্যে 'আগাছা'র এত প্রাদুর্ভাব। দেশহিতৈষিতা তাঁহার জীবনের মূল মন্ত্র। নানাবিধ উপায়ে তিনি এই দেশহিতৈষিতার কার্য্য করিয়াছেন, কখনও প্রবন্ধ লিখিয়া, কখনও উপন্যাস লিখিয়া, কখনও লোকরহস্যের মত শ্লেষাত্মক পুস্তক, কখনও কমলাকান্তের মত গদ্য কাব্য লিখিয়া, কখনও ধর্ম্মতত্ত্বের মত নীতিবিষয়ক পুস্তক লিখিয়া, কখনও বা কৃষ্ণচরিত্রের মত ঐতিহাসিক প্রত্নতত্ত্ব দ্বারা জাতীয় ধর্ম্মের উন্নতি সাধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া তিনি নিজের ব্রত সাধন করিয়াছেন। তাঁহার মতের সহিত সকলের মত না মিলিলেও, এই সকল বিরাট গ্রন্থ বাঙ্গলায় যুগান্তর আনিয়াছে, বাঙ্গলা-সাহিত্যে মণিমাণিক্যের আমদানি করিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র যাহা স্পর্শ করিতেন তাহাই সোনা হইত। ধর্ম্মতত্ত্বের মত আর্য্যনীতিবিষয়িণী রচনা, অথবা কৃষ্ণ-চরিত্রের মত প্রত্নতত্ত্ব, নির্ভীক প্রত্নতত্ত্ব, প্রকাশক পুস্তক বাঙ্গলা ভাষায় ছিল না ও নাই, হইবে কি না জানি না। বঙ্গসাহিত্যে সকল বিষয়েই বঙ্কিমচন্দ্র পথপ্রদর্শক। যে মহতী দেশ-ভক্তির বলে তিনি এত বড় হইতে পারিয়াছেন, সেই দেশ-ভক্তি তাঁহার গ্রন্থনিচয়ে কিরূপ প্রতিফলিত, আমরা এখন তাহাই অতি সংক্ষেপে দেখাইবার চেষ্টা করিব।

বঙ্কিমচন্দ্রের দেশভক্তির সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি আনন্দমঠে। কমলাকান্তে আমরা ইহার প্রথম অভিব্যক্তি দেখিতে পাইয়াছি। দেখিতে পাইয়াছি যে মাতৃভূমির দুর্দ্দশায় বঙ্কিমচন্দ্রের হৃদয়ে কত মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা হইত, দেখিয়াছি যে মাতৃভূমির দুঃখে তাঁহার অন্তঃকরণের অন্তস্তল হইতে কি হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদ উত্থিত হইত! আমরা আবার দেখিব যে সেই সময়েই তিনি জননী জন্মভূমিকে দেবতার আসনে বসা-ইয়া হৃদয়মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন—

"স্নিগ্ধ মন্দ পবন বহিল সেই তরঙ্গসঙ্কুল জলরাশির উপর দূর প্রান্তে দেখিলাম, সুবর্ণ-মণ্ডিতা, এই সপ্তমীর সারদীয়া প্রতিমা! জলে হাসিতেছে, ভাসিতেছে, আলোক বিকীর্ণ করিতেছে! এই কি মা? হাঁ এই মা। চিনিলাম এই আমার জননী জন্মভূমি, এই মৃণ্ময়ী মৃত্তিকারূপিণী অনন্তরত্ন-ভূষিতা একক্ষণে কালগর্ভে নিহিতা।"

"তোমায় কি বলিয়া ডাকিব মা! এই ছয় কোটী কণ্ঠে হুঙ্কার করিব, এই ছয় কোটী দেহ তোমার জন্য পতন করিব, না পারি এই দ্বাদশ কোটী চক্ষে তোমার জন্য কাঁদিব। এসো মা গৃহে এসো, যাঁহার ছয় কোটী সন্তান, তাঁহার ভাবনা কি?

"দেখিতে দেখিতে আর দেখিলাম না, সেই অনন্তকাল-সমুদ্রে প্রতিমা ডুবিল! অন্ধকারে সেই তরঙ্গসঙ্কুল জলরাশি ব্যাপিল, জলকল্লোলে বিশ্ব সংসার পুরিল! তখন যুক্ত করে সজলনয়নে ডাকিতে লাগিলাম, উঠ মা, হিরণ্ময়ি বঙ্গভূমি! এবার সুসন্তান হইব, সৎপথে চলিব, তোমার মুখ রাখিব। উঠ মা, দেবি দেবানুগৃহীতে, এবার আপনা ভুলিব, ভ্রাতৃবৎসল হইব, পরের মঙ্গল সাধিব, অধর্ম্ম, আলস্য, ইন্দ্রিয়ভক্তি ত্যাগ করিব, উঠ মা একা রোদন করিতেছি, কাঁদিতে কাঁদিতে চক্ষু গেল মা! উঠ উঠ মা বঙ্গ-জননি!

"এস ভাই সকল! আমরা এই অন্ধকার কালস্রোতে ঝাঁপ দিই! এস আমরা দ্বাদশ কোটী ভুজে ঐ প্রতিমা তুলিয়া ছয় কোটী মাথায় বহিয়া ঘরে আনি। এস অন্ধকারে ভয় কি? ঐ যে নক্ষত্রসকল মধ্যে মধ্যে উঠিতেছে, নিবিতেছে, উহারা পথ দেখাইবে। চল! চল! অসংখ্য বাহুর প্রক্ষেপে এই কালসমুদ্র তাড়িত, মথিত, ব্যস্ত করিয়া আমরা সন্তরণ করি, সেই স্বর্ণ-প্রতিমা মাথায় করিয়া আনি। ভয় কি? না হয় ডুবিব, মাতৃহীনের জীবনে কাজ কি?"

এই অনন্যসাধারণ, অনুচিন্তাপরায়ণ, জীবনব্যাপী মাতৃ-সাধনার ফলে বঙ্কিমচন্দ্রের মানসনয়নে মা জগদ্ধাত্রী জননী জন্মভূমি প্রত্যক্ষ হইয়াছিলেন—শুধু প্রত্যক্ষ হইয়াছিলেন তাহা নহে, তাঁহার অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্য মূর্ত্তিও প্রকাশিত করিয়াছিলেন, অমর কবি সেই সব ছবি আনন্দমঠে তুলিয়া রাখিয়াছেন, আমরা সেই মূর্ত্তি দেখিয়া লইব।

"তখন ব্রহ্মচারী মহেন্দ্রকে কক্ষান্তরে লইয়া গেলেন সেখানে মহেন্দ্র দেখিলেন, এক অপরূপ সর্ব্বাঙ্গসম্পন্না, সর্ব্বাভরণভূষিতা জগদ্ধাত্রীমূর্ত্তি। মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন ইনি কে?

ব্রহ্মচারী—মা যা ছিলেন।

মহেন্দ্র—সে কি?

ব্রহ্মচারী—ইনি কুঞ্জর কেশরী প্রভৃতি বন্য পশু সকল পদদলিত করিয়া বন্য পশুর আবাসস্থানে আপন আবাসস্থান স্থাপিত করিয়াছিলেন। ইনি সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা হাস্যময়ী সুন্দরী ছিলেন। ইনি বালার্ক-বর্ণাভা সকল ঐশ্বর্য্যশালিনী। ইঁহাকে প্রণাম কর। তার পর ব্রহ্মচারী মহেন্দ্রকে কালী মূর্ত্তি দেখাইলেন। ব্রহ্মচারী বলিলেন 'দেখ মা যা হইয়াছেন।'

"তার পর মহেন্দ্র দশভুজা মূর্ত্তি দেখিলেন, ব্রহ্মচারী কহিলেন এই মা যা হইবেন। দশভুজ দশদিকে প্রসারিত, তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত, পদতলে শত্রু বিমর্দ্দিত, পদাশ্রিত বীরকেশরী শত্রু-নিপীড়নে নিযুক্ত। দিগ্‌ভুজা—বলিতে বলিতে সত্যানন্দ গদ্‌গদকণ্ঠে কাঁদিতে লাগিলেন। দিগ্‌ভুজা নানা প্রহরণধারিণী, শত্রুবিমর্দ্দিনী বীরেন্দ্র পৃষ্ঠবিহারিণী, দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী, বামে বিদ্যা বিজ্ঞানদায়িনী, সেই বাণরূপী কার্ত্তিকেয়, কার্য্যসিদ্ধিরূপী গণেশ; এস আমরা উভয়ে মাকে প্রণাম করি।"

কোন্ সাধনার ফলে বঙ্কিমচন্দ্র মার এই উজ্জল ভবিষ্যমূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন? আনন্দমঠের উপক্রমণিকায় তাহা ব্যক্ত হইয়াছে।

"সেই সূচীভেদ্য অন্ধকার নিশীথে, সেই অননুভবনীয় নিস্তব্ধতা মধ্যে শব্দ হইল 'আমার মনস্কাম কি সিদ্ধ হইবে না?'

"এইরূপ তিনবার সেই অন্ধকার-সমুদ্র আলোড়িত হইল। তখন উত্তর হইল তোমার পণ কি?

"প্রত্যুত্তরে বলিল, পণ আমার জীবন সর্ব্বস্ব। প্রতিশব্দ হইল জীবন তুচ্ছ, সকলেই ত্যাগ করিতে পারে।

"আর কি আছে আর কি দিব?

তখন উত্তর হইল 'ভক্তি'।"

এই ভক্তি কেমন করিয়া আসিবে? বঙ্কিম বাবু তাহাও সীতারামে বলিয়া দিয়াছেন, "তখন মনে পড়িল উপনিষদ, গীতা, রামায়ণ, মহাভারত, কুমারসম্ভব, শকুন্তলা, পাণিনি, কাত্যায়ন, সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদান্ত, বৈশেষিক, এ সকলই হিন্দুর কীর্ত্তি! তখন মনে করিলাম হিন্দুকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া জীবন সার্থক করিয়াছি।" এমনি করিয়া আমাদের যাহা ছিল তাহা আমাদের হৃদয়ে হৃদয়ে ধারণ করিতে হইবে, বুঝিতে হইবে যে আমরা কি ছিলাম কি হইয়াছি, যে জাতির নিজের মহত্ত্বে নিজের অতীত গৌরবে আদর ও উৎসাহ নাই সে জাতির উন্নতির আশা নাই। তাই বঙ্কিম বাবু সর্ব্বদা আমাদিগকে সেই অতীত গৌরব স্মরণ করাইয়া দিতেছেন। অতীতে সুমহদতীতে বিশ্বাসবান্ ও শ্রদ্ধাবান না হইলে মার প্রতি ভক্তি আসিবে কিসে?

আমাদের কর্ত্তব্য কি? আমরা কেমন করিয়া আবার মায়ের সেই মনোহারিণী ভবিষ্যমূর্ত্তি দেখিতে পাইব? বঙ্কিম বাবু সে পন্থাও নির্দ্দেশ করিয়াছেন "কাজ কর, কাজ করিয়া মর" ইহাই তাঁহার উপদেশ। কমলাকান্তের দপ্তরে ভ্রমর বলিতেছে "তোমায় সত্য বলিতেছি কমলাকান্ত! তোমাদের জাতির ঘ্যানঘ্যানানি আর ভাল লাগে না, * * * একটু বকাবকি, লেখালেখি কম করিয়া কিছু কাজে মন দাও, তোমাদের শ্রীবৃদ্ধি হইবে।"

এই উপদেশ আনন্দমঠে বিশেষরূপে প্রদত্ত হইয়াছে। বঙ্কিম বাবু দিব্য চক্ষে দেখিয়াছিলেন যে একদিন বাঙ্গালী ঘ্যানঘ্যানানি ছাড়িয়া কাজে মন দিবে, তাই আনন্দমঠ সর্ব্বত্র আশার উজ্জল আলোকে উদ্‌ভাষিত; ধনগ্রন্থের মত বঙ্কিমচন্দ্র ভাব-রূপ কুবের-ভাণ্ডার তাঁহার অব্যর্থ লক্ষ্যে ভেদ করিয়া অসংখ্য

ভাবচম্পকে মাতৃভাষার শিবপূজার ব্যবস্থা করিয়াছেন, আজি তাঁহারই প্রসাদে বাঙ্গালী, সাহিত্য-গৌরবে গৌরবান্বিত, জন্মভূমির যথার্থ পূজা করিতে শিখিতেছে, তাঁহারই প্রদত্ত "বন্দে মাতরম্" মহামন্ত্রবলে বাঙ্গালী, ভারতবাসী একতার অকাট্য পাশে বদ্ধ হইতে চলিয়াছে। তাঁহার গুণ আমি কি ব্যাখ্যা করিব, আমি কি বলিতে পারি? শুধু আজ সেই অলৌকিক মহিমামণ্ডিত মহাপুরুষকে ভক্তিমিশ্র স্মৃতিপুষ্প উপহার দিয়া তাঁহারই কথায় যুক্ত করে জননী জন্মভূমিকে ডাকিয়া বলিতেছি "এস মা! নবরাগ-রঙ্গিণি, নববলধারিণি! নব দর্পে দর্পিণি! এসো মা, গৃহে এসো, মা প্রসূতি! অম্বিকে! ধাত্রি! ধনধান্যদায়িকে! নগাঙ্কশোভিনি! নগেন্দ্রবালিকে! শরৎসুন্দরি! চারুপূর্ণচন্দ্র-ভালিকে!" তিনিই যে মাকেই ডাকিতে শিখাইয়াছেন। তবে এসো ভাই সব! আজ তাঁহার এই বাৎসরিক স্মৃতিসভায় সম্মিলিতি আমরা সকলে সন্তানশ্রেষ্ঠ সত্যা-নন্দের মত উচ্চকণ্ঠে ডাকি—

সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি! নারায়ণি নমোস্তুতে॥

এসো সকলে মিলিয়া সাহিত্যগুরু, আমাদের গুরু বঙ্কিমচন্দ্রের শেখান মহামন্ত্র ভক্তি-বিগলিতচিত্তে উচ্চারণ করি, বল—

বন্দে মাতরম্।
সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং
শস্যশ্যামলাং মাতরম্॥

শ্রীজিতেন্দ্রলাল বসু।

নিদ্রাহীন।

আমারে যদি জাগালে আজি, নাথ—
ফিরো না তবে ফিরো না, কর
করুণ আঁখিপাত।

নিবিড় বন-শাখার পরে
আষাঢ় মেঘে বৃষ্টি ঝরে,
বাদল ভরা আলস ভরে
ঘুমায়ে আছে রাত।
ফিরো না তুমি ফিরো না, কর
করুণ আঁখিপাত।

বিরামহীন বিজুলিঘাতে
নিদ্রাহারা প্রাণ
বরষাজলধারার সাথে
গাহিতে চাহে গান।

হৃদয় মোর চোখের জলে
বাহির হল তিমিরতলে,
আকাশ খোঁজে ব্যাকুল বলে
বাড়ায়ে দুই হাত;—
ফিরো না তুমি ফিরো না, কর
করুণ আঁখিপাত।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আমার ডায়েরী।

১লা শ্রাবণ।

তাহার সহিত ক'দিনেরই বা পরিচয়? কিন্তু সেই 'ক্ষণিকে'র পরিচয়েই 'অনন্ত' বাঁধা পড়িয়াছিল।

পূজায় কি সুখ তোমরা জান কি? আমি তা জানিয়াছিলাম। ভক্ত আপনার আরাধ্য নিশ্চল পাষাণ মূর্ত্তিতে প্রাণসঞ্চার করে; আমিও আমার মানসী দেবীমূর্ত্তি ঘিরিয়া জীবনের সকল সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা, ভয়-ব্যথা সৃজন করিতেছিলাম।

* * * *

তাহাকে ত এ জগতের জীব বলিয়া মনে হইত না। সে যেন কোন্ শাপভ্রষ্টা দেবী, আ-সুকৃতিফলভোগ কালান্ত আমার কাছে ছিল; আজ 'ক্ষীণে পুণ্যে' তাহাকে হারাইয়াছি। বিস্মিত হইয়া আমি তাহার প্রতি চাহিয়া থাকিতাম। ক্রীড়াকৌতুক মধ্যে তাহার সারল্যের ছবিখানি ফুটিয়া উঠিত; শিশু-সুলভচাঞ্চল্যে তাহার সর্ব্ব-দেহ আনন্দোচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত। মৃদু সমীরণের লীলাহিল্লোলে তাহার কুঞ্চিত অলকদাম ক্ষুদ্র ললাটে এবং স্নিগ্ধ রক্তিম কপোলে দুলিতে থাকিত; তাহার অরুণ অধরপুটে কোন্ অকথিত রাগিণী নীরবে খেলা করিত; সে সুনীল নয়নের প্রশান্ত দৃষ্টির মাঝে অনন্ত বিশ্বের কোন্ মহারহস্য স্তব্ধ হইয়া থাকিত। আমি নির্ব্বাক বিস্ময়ে তাহার পানে চাহিয়া চাহিয়া জাগ্রতে স্বপন বড় একটা সুখের আশা জীবনে পোষণ করিতাম। তখন দেখি নাই, বুঝি নাই নিষ্ঠুর ভবিতব্যতা অলক্ষ্যে বসিয়া বসিয়া হাসিতেছে।

আজ অতীতের পানে চাহিয়া সেই কথাই ভাবি; আর ভাবি—সে 'স্বপ্নো নু, মায়া নু, মতিভ্রমো নু?'—বুঝি সে এ তিনেরই সংমিশ্রণ! তাই সে স্মৃতি এত মধুর!

*

এ কি হইল?—বুঝি 'সকলই করম লেখা!' —নহিলে আমার সুখের ঘর আগুণে পুড়িবে কেন? ক্ষুদ্র এক স্ফুলিঙ্গে এ বাড়বাগ্নি জ্বলিবে কেন? সামান্য ছলসূত্রে দুই পরিবারের মধ্যে মনান্তর ঘটিয়া এ 'মন্বন্তরে'র সৃষ্টি করিবে কেন? রাজায় রাজায় যুদ্ধ বাধিয়া এ উলুখড়ের প্রাণ যাইবে কেন? হায়, অর্থলোভ! অর্থ, অলঙ্কার—কাহাদের জন্য?

বাহিরের বন্ধন ছিন্ন হইয়াছে; কিন্তু অন্তরের বন্ধন ছিঁড়িল কই? হৃদয় হইতে সে স্মৃতি মুছিল কই?—এই সুদীর্ঘ বিচ্ছেদ; কেমন করিয়া আছি? সেই বা কিরূপে আছে?

সে যে একই গৃহতলে কতদিন একত্রাবস্থান, একই অন্নথালে আহার্য্যগ্রহণ, একই আশা-নিরাশাকম্পিত ক্ষুদ্র দুইটি প্রাণ!—ভাবিতাম, চিরদিনই বুঝি তেমনি থাকিবে, নহিলে বিধাতা দু'টিকে এমনভাবে মিলাইবেন কেন? তখন জানি নাই 'ঘটনা' বিধাতার অপেক্ষাও বলবান্ 'ভবিতব্যতা' দুর্ব্বল মানবের পক্ষে অজেয়। নহিলে, আজও সে বিরোধ মিটিল না কেন? নহিলে, আমার করতলগত রত্ন আজ অতল জলে ডুবিবে কেন? নহিলে

আমার যৌবনের প্রথম স্বপ্ন এমন ভাবে টুটিয়া জীবনকে আমার মরুভূমি করিবে কেন? নহিলে, এ চিরতৃষিত বুকে তৃষ্ণা-বারি সম্মুখে পাইয়াও ট্যান্‌ট্যালাসের মত জলিয়া, জীবনের এই প্রথম-যৌবনেই কাঁদিয়া গাহিব কেন—"এ যে মরণ অধিক শেল।"

১২ই আশ্বিন।

একটা খোস্‌ খবর!—শুনিতেছি, 'পাত্রী খুব সুন্দরী, দেখে শোবেও বেশ,' চাই কি 'দরকার হলে অনিলকে (অর্থাৎ আমাকে) বিলেত পাঠাতেও তারা স্বীকার।' তাই পিতার এ বিবাহে এত আগ্রহ। কিন্তু মা সর্ব্বদাই মুখটি ম্লান করিয়া আছেন। তাঁর সে মুখের পানে আমি চাহিতে পারি না। মাধবী যে কয়টি দিনেই তাঁহার বুকের সবটা অধিকার করিয়া লইয়াছিল। কিন্তু শত সাধ্য-সাধনা, অনুনয়-অনুযোগেও, মা, পিতার মন টলাইতে পারিলেন না। শেষে বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া পিতা বলিলেন—'আমার কথার উপরে যে কথা বলিতে আসিবে, সে আমার শত্রু!'

ইহার উপর আর কথা চলে না। সুতরাং সম্বন্ধ স্থির হইতে লাগিল। কিন্তু, আমার কি একটা মতামত নেই? না, ও সব ছেলেমি, sentimental nonsense? হয় ত তাঁরা জানেন, আমি চিরদিনের 'বাধ্য ছেলে,' যে দিকে ফিরাইবেন সেই দিকেই ফিরিব। কিন্তু যেখানে বৃহত্তম ধর্ম্মাধর্ম্মের কথা, সেখানে বাধ্যতারও একটা সীমা আছে, তা তাঁহারা মানেন না। তত্রাচ পিতার মুখের উপর কথা কহি সে সাহস আমার নাই; কেন নাই, বুঝি না। হয় ত তাহা এই দীর্ঘ ত্রয়োবিংশবর্ষব্যাপী বদ্ধ-সংস্কার এবং অভ্যাসের ফল। সুতরাং, এতদিন যে সাহস হয় নাই, আজও তাহা হইল না। তবু একবার এ অন্যায় বিবাহে আমার আপত্তির কথা জানাইয়াছিলাম—পরোক্ষে। পিতা হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। তখন পিঞ্জরবদ্ধ শার্দ্দূলবৎ আপনার নিষ্ফল প্রয়াসে এবং ব্যর্থ আশায় সংসারের কঠোর লৌহ-বেষ্টনীর মধ্যে লুটাইতে লাগিলাম।

তবে আর কেন, মাধবী? আর কেন সে স্মৃতি? আর কেন সে চঞ্চলচকিতনেত্রে অতীতের তীর হইতে চাও? সেই পরস্পরাপেক্ষী উন্মুখ হৃদয়বৃত্তি, সেই অনির্দ্দিষ্ট-ভবিষ্যতচিন্তোদ্ভূত আশানিরাশা-সৃষ্টি—আজ সকলই তোমার সঙ্গে ভাসিয়া যাক্। সে সবে বুঝি কি অভিসম্পাত আছে! মাধবী যাক্, অনিল যাক্। অনিলের ছায়া থাকিবে; সংসারের কুটিল স্বার্থের দ্বারে পিতামাতার ক্রোধাগ্নিতে সে আপনাকে আহুতি প্রদান করিবে।

শরতে দেবী আসিয়াছেন, কিন্তু আমার সে দেবী কই? পাষাণি, আজ মহানবমীর মহা হোমকুণ্ডে কি আমার এ জীবন আহুতি লইবি?

* * *

১১ই পৌষ।

কতদিন এ ডায়েরী লইয়া বসি নাই। মাথামুণ্ড কি লিখিব ভাবিয়া ত পাই না। তবু মনের ব্যথা কাগজের উপর ফুটাইয়া

তোলাতেও একটা সুখ আছে; সুখও আছে, ব্যথাও আছে।

দিন স্থির হইয়াছে—আগামী মাসে আমার বিবাহ।—বড় দুঃখেই হাসি আসে। বিবাহ জীবনে আবার কয় বার হয়?—এ বিবাহ, না তাহার বিজয়া? তাই ভাবিতেছিলাম। সেই কথাই ত একদিন হইয়াছিল। স্তব্ধ নির্জ্জনতার মাঝে, জননী ধরিত্রীর দিগন্তবিস্তৃত প্রান্তর পানে চাহিয়া, কোটি-কোটি-গ্রহতারামণ্ডিত অনন্তব্যাপ্ত নীলনভঃতলে দাঁড়াইয়া, একের হাত অপরের হাতের উপর রাখিয়া, আধিব্যাধি প্রতিকূলঘটনাচক্রের কথা ভাবিয়া, অনন্তকে সাক্ষী করিয়া, নূতন করিয়া উভয়ের মাঝে সেই প্রতিজ্ঞাই হইয়াছিল। পরস্পরের হৃদয়কে সাক্ষী করিয়া সেই কথাই হইয়াছিল যে, একের সুখ অন্যের সুখ, একের দুঃখ অন্যের দুঃখ, একের প্রাণ অন্যের প্রাণ, একের মৃত্যু অন্যের বৈধব্য; মিলনের পথে যদি চির-বিচ্ছেদ আসে তবে সেই বিচ্ছেদের প্রথম মুহূর্ত্ত হইতেই সাধনা-সংযমের মধ্য দিয়া নবজীবনের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। প্রেমকে সার্থক করিতে হইবে, বিরহকে সার্থক করিতে হইবে। জীবন অনন্ত, আশা অনন্ত, জন্ম অনন্ত; এক জন্মের তুচ্ছ সুখ দুঃখই সব নহে। অনন্ত জীবনের পথে, জীবনের অনন্ত আশার এবং প্রেমের তৃষার পরিতৃপ্তি একদিন আছেই—

প্রতিজ্ঞা ত বুঝি; কিন্তু মন মানে কই? হায়, একবার দেখা হয় না কি? বাহিরের ঘটনা যদি এত বলবান, তবে মনোরাজ্যের সহিত তাহার একটা সামঞ্জস্য থাকে না কেন?

শুনিলাম, সে একবার দেখা করিতে আসিতে চাহিয়াছিল—পিতার ভয়ে পারে নাই! আমার সমস্ত অন্তরাত্মা বুঝি বিদ্রোহী হইয়া উঠে!—এ কি নির্ম্মম শাসন-পাশ!

১২ই মাঘ, সন্ধ্যা।

জ্যোৎস্নাকরবিধৌত উজ্জ্বল রাত্রি। অদূরে মঞ্চস্থ নহবতে চিত্তবিভ্রমকারী সুরে 'ইমন' রাগিণী বাজিতেছিল। আপন চিন্তা লইয়া আপনার নির্জ্জন কক্ষে বাতায়ন পার্শ্বে দাঁড়াইয়া শূন্য দৃষ্টিতে আমি নিম্নে রাজপথপানে চাহিয়া ছিলাম।

"দাদা—!"

সে উদ্বেলিত কণ্ঠস্বরে শিহরিয়া আমি ফিরিলাম—

'কি নলু?'

সে উত্তর দিতে পারিল না; তাহার চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিয়াছিল। আমি বুঝিলাম, তাহার ব্যথা কি?—সহানুভূতিতে তাহাদের একের প্রাণ অপরের দুঃখে কাঁদিত। সে যে তাহার খেলার সাথী, সখী; সে ত সব কথাই তাহাকে বলিয়াছিল। কিন্তু আমাকে নলু বোঝে নাই।

"ন্যায় অন্যায় তুমি জান দাদা। কিন্তু তোমার কাছে সে কি অপরাধ করলে, একবার শেষ দেখা করতে দোষ কি?"

একবার ঊর্দ্ধে রজতধারাপ্লুত আকাশের প্রতি চাহিলাম; সহস্র সহস্র চূর্ণিত নীহারিকা-পুঞ্জালোক সেথায় ছায়াপথে স্বর্গদ্বারের পথ রচনা করিতেছিল। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া শুধু বলিলাম—"ভবিতব্য!"

তোমরা হয় ত ভাবিবে—'এ কাহিনী শুনিয়া কি লাভ? বিনা প্রতিবাদে স্বেচ্ছায় সব চুকাইতে বসিয়াও যে আবার দুর্ব্বল-চিত্তের মত অতীতকে বুকে ধরিয়া এমন করিয়া কাঁদিতে বসে, তার কাহিনী শুনিয়া কি লাভ? তার আবার মনুষ্যত্ব?' মাটীর গড়া যে দেহ মন—বহির্জগত নিত্য ঘাতপ্রতিঘাতে নানারূপে ঘুরাইয়া যাহাকে গড়িয়া তুলিতেছে, তাহার আবার পুরুষকার কোথায়? বড় হইয়া উঠিয়াছ বলিয়া আজ তুমি 'ঘটনা'র শাসন এড়াইবে, সে সাধ্য তোমার কোথায়? তাই ত এত বিরোধ, এত পরাজয়!

১২ই মাঘ; রাত্রি তখন ৯টা। পর রাত্রে বিবাহ। বিবাহোপলক্ষে সে রাত্রে মহিলাদের নিমন্ত্রণ ছিল।

আহারান্তে মহিলারা একে একে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন। উজ্জ্বল শুভ্র গ্যাসালোক তাঁহাদের দ্রুতগামী গাড়ী গুলির উপর পড়িয়া চক্ চক্ করিয়া উঠিতেছিল; ধরিত্রীর শিশিরাশ্রু পথিপার্শ্বস্থ নিশ্চল বৃক্ষপত্রশীর্ষে এবং পথের ধূলিরাশির উপরে সঞ্চিত হইতেছিল। এবং কুণ্ডলিত-দেহ, কুঞ্চিতকেশ, কুঞ্চিতবসনাগ্রধৃতকর কোন যুবক দীপ্তশির-সিগারেট টানিতে টানিতে রাজবর্ত্ম দিয়া গাহিতে গাহিতে চলিয়াছিল—

'মধুরাতি পূর্ণিমার
আসে ফিরে বারেবার,
সে জন ফেরে না আর
যে গেছে চলে!'

হায় স্মৃতি! এক বিন্দু অশ্রু আমার কপোল বাহিয়া নিঃশব্দে গড়াইয়া পড়িল! কে যেন তীক্ষ্ণ শলাকা দিয়া আমার অন্তঃস্থল বিঁধিয়া দিল! জীবনে বড় একটা গ্লানি আসিল।

আমি কি এমনই পশু, এমনই হৃদয়হীন? যাহার সকল সুখদুঃখের ভার একদিন গ্রহণ করিয়াছি, তাহাকে আজ নির্ম্মম চিত্তে বিস্মৃতির জলে ভাসাইয়া দিয়া, নূতন সুখের তরণী বাহিয়া চলিয়া যাইতে পারি? না—না—না!—শাসনের কঠোর পাশ অত্যধিক টানে আজ সহসা ছিন্ন হইয়া গেল! জীবনে সর্ব্বপ্রথম এই মুক্তির চেতনায় সমস্ত আমার চিত্ত আনন্দোন্মত্ত হইয়া উঠিল। বুঝিলাম—সে আমার, আমি তার; মিথ্যা গর্ব্বের দ্বারে স্বার্থের যূপকাষ্ঠে আমাদের বলি দেয়, এমন সাধ্য কার আছে? ভাবিলাম—এত দিনের এই নির্জ্জীব অধীনতাপাশরূপ অকর্ম্মণ্যতার প্রায়শ্চিত্ত করিব। মনে মনে এক দৃঢ় সঙ্কল্প আঁটিলাম। সমস্ত প্রাণের সহিত গভীর স্বরে একবার ডাকিয়া উঠিলাম—'মাধবী!—আমার মাধবী!—'

সহসা কাহার মৃদু পদশব্দে আমি চকিত হইয়া উঠিলাম। দ্বার প্রান্তে—ও-কে?

"মাধবী?"—

নিমেষের মধ্যে সে আমার পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িল; অস্ফুটকণ্ঠস্বরে একবার ডাকিল—"দেবতা আমার!"

মা কি জন্য আমাকে ডাকিতে আসিতেছিলেন। দ্বারদেশে আসিয়া কক্ষতলে চাহিয়াই বিস্ময়-চকিত হইয়া উঠিলেন—

'কে, বৌ—মা!'

তাঁহার চক্ষু ছল ছল করিয়া উঠিল; কম্পিত-গাঢ়স্বরে তিনি বলিলেন—

"আজ এলি, মা!"

শ্রীসুধীরচন্দ্র মজুমদার।

বঙ্গদেশে হিন্দুজাতির হ্রাসের কারণ

এবং তাহার প্রতিকার

সেন্‌সাস রিপোর্ট অনুসারে পূর্ব্বলিখিত কয়েকটী কারণে হিন্দুদিগের মধ্যে মুসলমান-দিগের অপেক্ষা জন্মসংখ্যা কম। এতদ্ভিন্ন তদনুসারে নিম্নের কয়েকটী কারণে হিন্দু-দিগের মধ্যে মুসলমানগণের অপেক্ষা মৃত্যু-সংখ্যা অধিক। এ গুলির উৎপত্তি পূর্ব্ব গুলির ন্যায় হিন্দুদিগের সামাজিক রীতিনীতি হইতে।

হিন্দুসমাজে ভ্রূণহত্যা।

প্রথমত—যে সকল হিন্দুরমণী পাপপথে পড়িয়া সমাজ-শাসন ও ধর্ম্মকে লঙ্ঘন করিয়াছে, সমাজ তাহাদিগকে ক্ষমা করে না বা তাহাদের সম্ভাবিত সন্তানকে রক্ষার ব্যবস্থা করে না। এমনি করিয়া যে লোকক্ষয় হয় তাহা নিবারণের ব্যবস্থা অন্য সমাজে আছে, হিন্দুসমাজে নাই।

বালিকাগণের লালনপালনে যত্নের অভাব।

দ্বিতীয়ত—হিন্দুদিগের মধ্যে বালিকা-গণের লালনপালন বিষয়ে বিশেষ যত্নের অভাব। হিন্দুদিগের বর্ত্তমান অবস্থায় হিন্দুর সংসারে কন্যা জন্মিলে উহার পিতা মাতা আনন্দিত হইবার স্থলে "কন্যাদায়" ভাবনায় বিশেষ ম্রিয়মাণ হন, এরূপ স্থলে বিশেষ অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্বাভাবিকই কন্যার প্রতি তাদৃশ যত্ন হয় না এবং বাল্যকালে যত্নের অভাবে অনেক কন্যাই অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। মুসলমানদিগের মধ্যে ঐ কারণ একেবারে নাই।

তৃতীয়ত—বাল্যবিবাহের দরুণ হিন্দু-দিগের মধ্যে অল্প সন্তান জন্মে, এ কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন এ কারণে ইহাদের মধ্যে শিশুগণের মৃত্যুর আধিক্যও দৃষ্ট হয়। বালিকাবয়সে 'ছেলের মা' হওয়ায় উহারা সন্তান-লালনপালনে উপযুক্ত যত্ন করিতে জানে না এবং পারে না। যাহারা নিজ শরীরেরই যত্ন করিতে শিখে নাই তাহারা কিরূপে ছেলের যত্ন করিবে? বিশেষ, উহাদের অল্প বয়সে ও অপরিণত অবস্থায় সন্তানের জন্ম হওয়ায় ঐ সকল সন্তানগণও অত্যন্ত রুগ্ন হয় এবং অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

পূর্ব্বোক্ত কারণে হিন্দুদিগের ভিতর শিশুর সংখ্যা মুসলমানদিগের অপেক্ষা অনেক কম। সেন্‌সাস রিপোর্টে প্রকাশ যে হিন্দুজাতীয় দশ হাজার স্ত্রী অথবা পুরুষের মধ্যে ১০ বৎসরের কম বয়সের বালকের সংখ্যা ২৫৬৭ এবং বালিকার সংখ্যা ২৬৩২ কিন্তু ঐ সংখ্যক মুসলমানদিগের মধ্যে ঐ বয়সের বালক ২৮৮৯ জন, ও বালিকা ৩০০৫ জন। এতদ্ভিন্ন ৫ বৎসর বয়সের দশ হাজার হিন্দুশিশুগণের মধ্যে ১২০৬ জন বালক, ১২৮৪ জন বালিকা। মুসলমান মধ্যে ১৩৪০ জন বালক ও ১৪৯৫ জন বালিকা।

পূর্ব্ববঙ্গে মুসলমান-বৃদ্ধির কারণ।

ভারতবর্ষের যে সকল প্রদেশে হিন্দুর অপেক্ষা মুসলমান অত্যন্ত অধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে, তন্মধ্যে পূর্ব্ববঙ্গই প্রধান। ঐ প্রদেশে সাধারণত মুসলমানদিগের অবস্থা হিন্দুদিগের অপেক্ষা অনেক উন্নত, তাহার কারণ মুসলমানেরা হিন্দুদিগের অপেক্ষা অধিক শ্রমশীল ও উদ্যমশীল। অত্যল্প কাল মধ্যে পূর্ব্ববঙ্গে যে পাটের চাষ ও ব্যবসার উন্নতি হইয়াছে তাহার প্রধান কারণ মুসলমান প্রজার পরিশ্রম ও অধ্যবসায়। ঐ ব্যবসার দরুণ তথাকার অনেক মুসলমান কিঞ্চিৎ ধন সঞ্চয় করিতে সক্ষম হইয়াছে। হিন্দুদিগের মধ্যে উহার চাষ ও ব্যবসার তাদৃশ চলন নাই। তাহারা পুরুষানুক্রমে প্রচলিত ধান্যের চাষের জন্য ব্যস্ত। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত উপর্য্যুপরি কয়েক বৎসর ধান্যের ফসল কিছুমাত্র হয় নাই। এজন্য উত্তরোত্তর হিন্দুপ্রজার অবস্থা মন্দ হইয়াছে। হিন্দুজাতির আর একটী বিশেষত্ব এই যে তাহারা পৈত্রিক ভিটার ও গ্রামের মমতায় এরূপ আকৃষ্ট যে তাহারা তাহা কিছুতেই ত্যাগ করিতে চাহে না। মুসলমানদিগের অবস্থা কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত। পূর্ব্ববঙ্গে পদ্মা, মেঘনা, ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি বিশাল নদনদীর চর সকল মুসলমানেরাই উপনিবেশ স্থাপন পূর্ব্বক শস্য-শ্যামল করিয়া তুলিয়াছে। এই প্রকারে অবস্থার উন্নতি সহ উহাদের বংশও বৃদ্ধি হইতেছে।

পূর্ব্বোক্ত কারণে হিন্দুজাতির ক্ষয় আংশিক হইলেও সম্পূর্ণরূপে ক্ষয় হয় নাই।

সেন্‌সাস রিপোর্ট অনুসারে যে সকল কারণে হিন্দুদিগের দিন দিন বংশক্ষয় হইতেছে তাহাদের সবিস্তর উল্লেখ করা হইল। কিন্তু ঐ সকল কারণে হিন্দুজাতির কতকাংশ হ্রাস হইলেও সম্পূর্ণ হয় নাই। এ কথা, নিম্নের কয়েকটী বিষয় বিশেষরূপে বিবেচনা করিলে, হৃদয়ঙ্গম হইবে। সামাজিক যে সকল কারণ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে তন্মধ্যে বিধবাবিবাহনিষেধ ও বাল্যবিবাহ-চলনই প্রধান।

প্রথমত—বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে দেখা যায় যে হিন্দুসমাজের নিম্নশ্রেণীস্থ শ্রমজীবী-দিগের মধ্যে প্রদেশ ভেদে অধিক বা অল্প পরিমাণে বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে। এবং মুসলমানেরাও স্থানে স্থানে হিন্দুদিগের অনুকরণে বিধবাবিবাহ নিষেধ করিয়াছে। এতদ্ভিন্ন আদমসুমারীর কাগজ-পত্রে হিন্দু বিধবার সংখ্যা মুসলমান বিধবার সংখ্যা অপেক্ষা অত্যন্ত অধিক বলিয়া প্রকাশ নাই। গত ১৮৯১ সালের গণনায় বিধবার সংখ্যা হিন্দুজাতির মধ্যে শতকরা ১৭, মুসলমানের মধ্যে ১৫, জৈনের ২১·৪, খ্রীষ্টানের ১২·৪, আদিমদিগের ১০·৭। গত ১৯০১ সালের গণনায় ১৫ হইতে ৪০ বৎসরের বিধবার সংখ্যা হিন্দুদিগের মধ্যে শতকরা ১৬ জন, আর মুসলমানদের মধ্যে শতকরা ১২ জন। অর্থাৎ তখন হিন্দু বিধবার সংখ্যা মুসলমান বিধবার অপেক্ষা শতকরা ৪ জন অধিক। অতএব বিধবা-

বিবাহ চলিত থাকিলে এবং উহাদের পুনর্ব্বিবাহ হইলে হিন্দুজাতির সংখ্যা অল্পই বৃদ্ধি হইতে পারিত।

বাল্যবিবাহ।

দ্বিতীয়ত—এ দেশে হিন্দুদিগের মধ্যে পূর্ব্বে যেরূপ অল্পবয়সে বিবাহ প্রচলিত ছিল, এখন আর সেরূপ নাই। এখন দিন দিন স্ত্রী-পুরুষের উভয়ের অধিক বয়সে বিবাহ হইতেছে, 'অষ্টমে গৌরীদান' অনেক দিন উঠিয়া গিয়াছে। বিবাহের সময়ে এখন সচরাচর কন্যার বয়স ১০ ও পাত্রের বয়স ১৮ বৎসর থাকে। এতদ্ভিন্ন বঙ্গদেশে মুসলমানদিগের মধ্যে বাল্যবিবাহ একেবারে চলিত নাই, একথা বলা যাইতে পারে না। সেন্‌সাস রিপোর্ট হইতেই জানা যায় যে মুসলমানদিগের মধ্যে ৫ হইতে ১০ বৎসর বয়সে শতকরা ৭ জন এবং ১০ হইতে ১৫ বৎসর বয়সে ৩৯ জনের বিবাহ হয়। অবশ্য ঐ বয়সে হিন্দুদিগের মধ্যে বিবাহের সংখ্যা কিছু অধিক।

তৃতীয়ত—'কন্যাদায়ে'র কথা উল্লেখ না করিলেই ভাল হইত। বাঙ্গালীর আর্থিক অবস্থা যতই শোচনীয় হউক উহারা এখনও স্নেহমায়া-বৰ্জ্জিত পশুভাবাপন্ন হয় নাই। পূর্ব্বকালে এ দেশে গঙ্গাসাগরে কন্যা নিক্ষেপ প্রথা প্রচলিত ছিল বটে, কিন্তু উহা বহুদিন হইল রহিত হইয়াছে।

চতুর্থত—বিবাহ-বয়োবৈষম্যের সম্বন্ধে কিছু বলায় প্রয়োজন নাই। ঐরূপ বৈষম্য মুসলমানদিগের মধ্যেও দেখা যায়।

পঞ্চম—আচার-ব্যবহার, সামাজিক রীতিনীতিতে এদেশীয় হিন্দুগণের, অন্যদেশীয় মুসলমানগণের সহিত যেরূপ পার্থক্য আছে, এদেশীয় মুসলমানের সহিত তাদৃশ বিভিন্নতা দৃষ্ট হয় না। বহুকালাবধি এদেশে বাসহেতু মুসলমানগণ ধীরে ধীরে হিন্দুদিগের অনেক রীতিনীতি গ্রহণ করিয়াছেন বিশেষত বঙ্গদেশীয় মুসলমানগণের পূর্ব্বপুরুষ অনেক স্থলেই হিন্দু ছিলেন। পরে কোন বিশেষ কারণে মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এরূপ ক্ষেত্রে বঙ্গদেশে হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই আচার-ব্যবহার প্রায়ই একরূপ। বাল্যবিবাহ অনেক প্রদেশে মুসলমানদিগের মধ্যে চলিত আছে এবং বিধবা-বিবাহও অনেক স্থানে উহাদের মধ্যে নিষিদ্ধ হইয়াছে। এ কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। সুতরাং কেবলমাত্র সামাজিক রীতিনীতির পার্থক্যে একজাতির বংশক্ষয় ও অপর জাতির বংশবৃদ্ধি হওয়া সম্ভব নহে।

ষষ্ঠ—এতদ্ভিন্ন সেন্‌সাস রিপোর্ট ও অন্যান্য সরকারী কাগজ পত্র হইতে জানা যায় যে সমগ্র ভারতেও দিন দিন অধিক হারে প্রজাক্ষয় হইতেছে। ভারতবর্ষে মৃত্যুর হার ১৮৮০ সালে শতকরা ২৩ জন হইতে ১৯৮০ সালে শতকরা ৩৯ জন হইয়াছে। লোক-বৃদ্ধির হার দিন দিন কমিতেছে। শতকরা ১৷৷০ জন হিসাবে বৃদ্ধি কিছুই অধিক নহে। কিন্তু গত গণনায় তাহাও হয় নাই। এ কথা পূর্ব্বেই বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা গিয়াছে। ভারতে হিন্দু ভিন্ন অন্য অনেক জাতির বাস। তাহাদের মধ্যে এ সকল প্রথা চলিত নাই। অথচ তাহাদের মধ্যে

মৃত্যুর হার বৃদ্ধি ও জন্মের হার কম কেন দেখা যায় তাহার বিচার আবশ্যক।

সপ্তম—মুসলমানদিগেরও যে হারে বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহা অন্যান্য দেশের জনসংখ্যা-বৃদ্ধির তুলনায় কিছু অধিক নহে। গত সেন্‌সাস রিপোর্টে প্রকাশ মুসলমান সংখ্যা শতকরা ৮·৯ হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে। য়ুরোপীয় অন্যান্য দেশের লোকবৃদ্ধির হার প্রতিবৎসর হাজার করা ২৮ হইতে ৩৬ জন, অথবা শতকরা গড়ে ৩·২ জন। সেই হিসাবে দশবৎসরে গড়ে শতকরা ৩২ জন হয়। অর্থাৎ অন্যান্য দেশের লোক যে হারে বৃদ্ধি পায় এদেশে মুসলমান সংখ্যা বৃদ্ধি তাহার চতুর্থাংশ হইয়াছে।

হিন্দুজাতিক্ষয়ের মূলকারণ পাশ্চাত্য জাতির সংসর্গ।

সমগ্র ভারতের এইরূপ প্রজাক্ষয়ের প্রকৃত কারণ কি তাহা নির্ণয় না করিলে হিন্দুজাতির হ্রাসের মূল কারণ স্থির হইবে না। সে কারণ আমাদিগের পাশ্চাত্য জাতির সংসর্গ হইতে উৎপন্ন। এ কথা মাহাত্মা ডারউইন তাঁহার সুবিখ্যাত গ্রন্থগুলিতে অতি বিশদভাবে সপ্রমাণ করিয়াছেন। উহাদের স্থানের স্থানের অনুবাদ নিম্নে দেওয়া গেল।

ডারউইনের মতে দুই বিভিন্ন জাতির সংসর্গের ফল।

তাঁহার Descent of Man নামক পুস্তকে ডারউইন দুই বিভিন্ন জাতির পরস্পর সংসর্গের ফল অতি বিস্তৃত ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন—"অতি দূরবর্ত্তী পৃথক শ্রেণীভুক্ত মানবগণ যখন পরস্পরের সহিত প্রথম মিশিতে আরম্ভ করে, তখন কিছু দিন কি এক অজ্ঞাত কারণে উহাদের মধ্যে নূতন পীড়ার আবির্ভাব হয়। স্পেট সাহেব ভ্যাঙ্কোবর দ্বীপে এই বিষয় বিশেষরূপে অনুশীলন করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে য়ুরোপীয়গণের সমাগম জন্য ঐ দেশ আদিমবাসীদিগের পক্ষে অস্বাস্থ্যকর হইয়াছিল।

নূতন পীড়ার আবির্ভাব।

আমাদের দেশেও পাশ্চাত্য জাতির আবির্ভাবের পূর্ব্বে ম্যালেরিয়া, কলেরা, প্লেগ, টাইফয়ড প্রভৃতি দুরারোগ্য রোগ ছিল না বলিয়া অনুমিত হয়। শুনিতে পাওয়া যায় যে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে ঐ সকল রোগের উল্লেখ নাই। ঐ সকল রোগের প্রাদুর্ভাবে বৎসর বৎসর এদেশে কিরূপ ভয়ঙ্কর লোকক্ষয় হইতেছে তাহা পূর্ব্বেই বিশেষরূপে ব্যক্ত হইয়াছে। এইরূপে লোকসংখ্যা যে পরিমাণে ক্ষয় হয় জন্মসংখ্যা দ্বারা তাহার পূরণ হয় না। কারণ রুগ্ন নির্জ্জীব লোকের সন্তান সম্ভাবনা কম। আর সন্তান হইলেও বাঁচিবে কেমন করিয়া?

পীড়ার আবির্ভাবের কারণ দূষিত জল বায়ু নহে।

কাহার কাহার মতে পীড়ার আবির্ভাবের কারণ দূষিত জল বায়ু। তাঁহারা বলেন বঙ্গদেশে ম্যালেরিয়া আবির্ভাবের কারণ প্রায় অধিকাংশ পুরাতন গ্রাম জঙ্গলাকীর্ণ হওয়া এবং তথাকার জল-নিকাশের স্বাভাবিক পথ সকল রেল লাইন

প্রভৃতি দ্বারা বদ্ধ হওয়া। এ কারণ এ সকল স্থানে বর্ষার ও নদীর বন্যার জল বহির্গত হইতে না পারায় উহারা অত্যন্ত আর্দ্র হইয়াছে এবং জঙ্গল ও দিন দিন আরও নিবিড়তর হইতেছে। যে সকল স্থান পূর্ব্বে জনাকীর্ণ ছিল এখন তাহারা প্রায় জনশূন্য। এজন্যও তথায় জঙ্গল হইতেছে।

কিন্তু মহাত্মা ডারউইন তাঁহার পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থে প্রমাণ করিয়াছেন যে উপরি উক্ত কারণে পীড়ার প্রকোপ বৃদ্ধি হইলেও পীড়ার মূলকারণ ইহারা নহে। প্রমাণ স্বরূপ তিনি দেখাইয়াছেন যে সময়ে ভ্যাঙ্কোবর দ্বীপের আদিম অধিবাসিগণ হাজারে হাজারে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে লাগিল গভর্ণমেণ্ট পক্ষ হইতে উহাদিগের অবশিষ্ট লোকদিগকে অন্য স্বাস্থ্যকর স্থানে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু তথাপি তাহাদিগের মধ্যে মৃত্যুসংখ্যা কিছুমাত্র কমে নাই।

আহারের ও জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের প্রণালীর পরিবর্ত্তনের ফলে শিশুগণের স্বাস্থ্য-ভঙ্গ।

এতদ্ভিন্ন ডারউইন ট্যাসমেনিয়া, নিউজিলাণ্ড, স্যাণ্ডুইচ দ্বীপ প্রভৃতি স্থানের আদিম অধিবাসীদিগের ধ্বংসের ইতিবৃত্ত হইতে প্রমাণ করিয়াছেন যে "উহার প্রধান কারণ আহারের এবং জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহের প্রণালীর পরিবর্ত্তন। জীবন-যাত্রার, আচার ব্যবহারের, চালচলনের পরিবর্ত্তন এবং নূতন পথ অবলম্বন করিলে অনভ্যস্তের পক্ষে পরিণাম ধ্বংস। অপেক্ষাকৃত অসভ্য মানবগণের পক্ষে শুধু আচার-ব্যবহার, ক্রিয়াকলাপের পরিবর্ত্তনবশত বিশেষ স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়া থাকে। প্রাচীন আচারাদির পরিবর্ত্তে নূতন যে সকল আচারাদি প্রবর্ত্তিত হয় তাহা আপাতত অনিষ্টকর না হইলেও উহা হইতে পরিণামে সকলেরই বিশেষত শিশুগণের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়।"

যুবতী ও যুবকগণের বন্ধ্যত্ব।

"যে জীব যে অবস্থায় জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে, তাহার পরিবর্ত্তন ঘটিলে তাহার দেহস্থ জননযন্ত্র সকল বিশেষরূপে আক্রান্ত হয়।" ডারউইন এ কথা তাঁহার 'Variation of animals and plants under domestication', Part II, chapter XVIII-তে অনেক উদাহরণ দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন গৃহপালিত অবস্থায় অনেক জন্তুর বন্ধ্যত্ব আনয়ন করে। অবস্থা পরিবর্ত্তনের সহিত জননশক্তির পরিবর্ত্তন বানরের মধ্যে বিশেষরূপ লক্ষিত হইয়া থাকে। তাহাতে আদিম অবস্থায় মানবও যে অবস্থা পরিবর্ত্তন বশত বন্ধ্যত্ব প্রাপ্ত হইবে, সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ করা যায় না। সুতরাং যে কোন জাতীয় মানব হউক অসভ্য অবস্থায় তাহার আচার-ব্যবহার, চালচলন পরিবর্ত্তিত হইলে ন্যূনাধিক বন্ধ্যত্ব প্রাপ্ত হইবে এবং তাহাদের সন্তানগণের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইবে। তবে অসভ্য অপেক্ষা সভ্যজাতি ঐ প্রকার পরিবর্ত্তন অধিকতর সহ্য করিতে পারে। এ বিষয়ে সভ্য মানব গৃহপালিত পশুর ন্যায়। উহারা যে পরিবর্ত্তিত অবস্থাতে জননশক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে, তাহার কারণ সম্ভবত এই যে তাহারা বন্য পশু অপেক্ষা অনেক

পরিবর্ত্তনের মধ্যে জীবন যাপন করে এবং সেই হেতু পরিবর্ত্তিত অবস্থাতে অভ্যস্ত হইয়া যায়।"

মানবসমাজে সর্ব্বত্রই দেখা যায় যে একজাতীয় মানব বিভিন্নজাতীয় মানবের সহিত সংসৃষ্ট হইলে পরস্পরের মধ্যে খাদ্য, আচার, ব্যবহার ইত্যাদির অল্পাধিক পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। আপনা হইতেই উভয়ের মধ্যে অনুকরণ-বৃত্তি প্রবল হইয়া উঠে। ভালমন্দ, ইষ্টানিষ্ট বিবেচনা করিবার অবসর থাকে না। নব্য ব্যবহার সকল নূতনত্ব-বশতই এক হইতে অপর কর্ত্তৃক গৃহীত হয়। দুইয়ের মধ্যে বিজিত জাতিই অধিক পরিমাণে জেতৃগণের আচার-ব্যবহার, চালচলন, খাদ্য-পরিচ্ছদ প্রভৃতি গ্রহণ করিতে অতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকে এবং অনুকরণও করিয়া থাকে।

পাশ্চাত্য জাতির সংসর্গে হিন্দুজাতির আচারাদির সবিশেষ পরিবর্ত্তন।

আমাদের দেশেও পাশ্চাত্য জাতির সংসর্গে আসিয়া হিন্দুসমাজে অত্যল্পকাল মধ্যে সমধিক পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে হিন্দুদিগের মধ্যে পূর্ব্ব কালের আহার-বিহার, আচার-আচরণ, চালচলন, ধর্ম্মকর্ম্ম, প্রভৃতি সকল বিষয়েই পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। পাশ্চাত্য বিদ্যায় শিক্ষিত হিন্দু যুবক যে সকল বিষয়ে সাহেবদিগের অনুকরণ করিবে তাহার আর বিচিত্রতা কি? এক কথায় বলিতে গেলে খাটি বাঙ্গালী হওয়া ঘৃণা বিবেচনা করিয়া নকল সাহেব হইবার ব্যর্থ চেষ্টা অধুনা শিক্ষিত বাঙ্গালীর জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হইয়াছিল। উহার বিষময় ফল ডারউইন সাহেব প্রমাণ করিয়াছেন। প্রথমত শিশুদিগের স্বাস্থ্যহানি ও তজ্জন্য মৃত্যুসংখ্যার আধিক্য; দ্বিতীয়ত জননশক্তির খর্ব্বতা ও তজ্জন্য জন্মসংখ্যা হ্রাস। এতদুভয়ের ফলে পরিণাম বংশলোপ।

বংশ লোপ।

বাঙ্গলা দেশে হিন্দুজাতির মধ্যে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের এই কারণেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে বংশক্ষয় হইতেছে। এতদ্ভিন্ন তাঁহাদিগের স্ত্রীলোকদিগেরও রীতিনীতি, আচার-ব্যবহারের অত্যন্ত পরিবর্ত্তন হইয়াছে। পূর্ব্বে আমাদের দেশে একান্নবর্ত্তী পরিবার মধ্যে রন্ধনাদি গৃহস্থালীর যাবতীয় পরিবারস্থ রমণীগণকে মিলিয়া পালা করিয়া করিতে হইত, তজ্জন্য তাঁহাদের শারীরিক যে পরিশ্রম হইত তাহাতে অন্তঃপুরে অবরোধজনিত সর্ব্বপ্রকার স্বাস্থ্যহানি দোষ কাটিয়া যাইত। এক্ষণে একসঙ্গে বাস প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। স্ত্রীলোকেরা নিজ নিজ স্বামী সহ বাস করেন এবং অধিকাংশ স্থলেই তাঁহাদিগকে আর কোন প্রকার শ্রমসাপেক্ষ কায-কর্ম্ম করিতে হয় না। এ কারণ আলস্যে অন্তঃপুরে কাল যাপন করিতে হওয়ায় তাঁহাদেরও দিন দিন গর্ভধারণ-ক্ষমতা লোপ পাইতেছে।

অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল জাতি বিস্ময়াপন্ন ও আত্মবিহ্বল হয়। এবং সর্ব্ব বিষয়ে আত্মনির্ভরতা হারায়

এবং ভীত, ত্রস্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়ে।

দুই বিভিন্ন জাতির পরস্পর সংঘর্ষের কয়েকটী ফল পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন মহাত্মা ডারউইন উহার আর এক বিষম ফলের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন "বিভিন্ন জাতির মানবগণের পরস্পরের প্রথম সম্মিলনে উভয়ের মনে প্রথমত কৌতূহল, বিস্ময় প্রভৃতি ভাবের উদ্রেক হয়। কিন্তু যাহারা দূরদেশ হইতে আগত তাহারা নূতন স্থানে আসিয়া নূতন চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকায় ঐ সকল ভাবস্রোতে নিশ্চেষ্ট ভাবে ভাসিয়া যায় না বিশেষত তাহারা উদ্যোগী, সাহসী, কর্ম্মী। তাহারা অর্থলাভাশায় নানা স্থানে নানা কর্ম্মে নিযুক্ত হয় এবং দেশীয়গণের জীবনোপায়ের যাবতীয় কর্ম্ম তাহারা স্বহস্তে গ্রহণ পূর্ব্বক স্বীয় উপার্জ্জনের পথ পরিষ্কার করে। এ কারণে দেশবাসিগণের কর্ম্মক্ষেত্র ক্রমশ সঙ্কীর্ণ হইতে থাকে। যদি এক সমাজ অন্য পরাক্রান্ত সমাজ কর্ত্তৃক এরূপ ভাবে দলিত হয় যে উহার আর কোন বিষয়েই স্ববশতা থাকে না, সকল বিষয়েই ঐ পরাক্রান্ত সমাজের মুখাপেক্ষী হইতে হয়, তাহা হইলে সেই সমাজস্থ জনগণের দেহ ও মন ক্রমে অধঃপতনের দিকে অগ্রসর হয়, আত্মবশে সকল কর্ম্মেই জীবন্ত উৎসাহ ও নির্ভীকতা থাকে। সুতরাং মনও প্রফুল্ল রহে। আর পরবশ হইলে ভয়ে ভয়ে জীবন অতিবাহিত করিতে হয়। কর্ম্মের সুযোগ ও স্বাধীনতা থাকে না। প্রত্যেক কর্ম্মেই পরমুখাপেক্ষী হইতে হইতে মনের উদ্ভাবনী শক্তি ও উদ্যম একেবারে নাশ প্রাপ্ত হয়। মনে ক্রমে অবসন্নতা আসে। দেহও দুর্ব্বল ও ক্ষীণ হয়। ডারউইন এরূপ অবস্থাকে dullness of the mind বলিয়াছেন। এরূপ অবস্থা যে সমাজের হয় তাহা শীঘ্র ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। ডারউইন বলেন অধিকাংশ অসভ্য জাতি পরাক্রান্ত সভ্যজাতির সংঘর্ষে এই কারণে লোপ পাইতেছে। সভ্যাবস্থায় কোন সমাজ সহজে ধ্বংস হইতে চাহে না। তথাপি যখন কোন সভ্যসমাজও আত্মবশে কোন গুরুতর কর্ম্ম করিতে পারে না বা করিবার সুযোগ ও ক্ষেত্র পায় না তখন অবশ্য তাহার মন অল্পাধিক জড়তা প্রাপ্ত হয় এবং উহার দেহও তৎসঙ্গে অবসাদগ্রস্ত হইয়া থাকে।

উভয় জাতির মধ্যে যদি ধর্ম্ম ও নীতির আদর্শের বৈষম্য থাকে, তাহা হইলে তন্মধ্যে যাহারা দুর্ব্বল তাহাদের মনে একটা অবসাদ আসিয়া পড়ে। ডারউইন এই অবসাদকে dullness of the spirits বলিয়াছেন।

তজ্জন্য মৃত্যু আধিক্য ও অপত্যোৎপাদনে অক্ষমতা।

এরূপ অবস্থাপন্ন হইলে দেশীয়গণের আর কোন কর্ম্মে উৎসাহ থাকে না। এমন কি জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ জন্য যে শ্রম আবশ্যক তাহাও তাহারা করিতে চায় না। অবশেষে তাহাদের উদরান্নের সংস্থান পর্য্যন্তও চলিয়া যায়। তখন তাহারা ক্ষুধায়, পীড়ায় ও নৈরাশ্যে ক্রমে ক্রমে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। আর যাহারা জীবিত থাকে তাহারা অপত্যোৎপাদনে ক্রমেই অক্ষম হইয়া পড়ে। এবং তাহাদের যে সকল

সন্তান জন্মায় তাহারাও বাল্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

আমাদের পূর্ব্বোক্তরূপ অবস্থা।

বর্ত্তমান সময়ে হিন্দুদিগের দেহ ও মনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝা যায় যে, যে অবস্থাকে ডারউইন dullness of the mind অথবা depression of the spirits বলিয়াছেন উঁহাদের ঠিক সেই অবস্থা পূর্ণ মাত্রায় হইয়াছে। কর্ম্মে উৎসাহ নাই, কর্ম্মক্ষেত্রও সঙ্কীর্ণ, সর্ব্ব কর্ম্মই পরায়ত্ত; সুতরাং এই নিষ্কর্ম্মা ভাব, জড়তা ও অবসাদ আসিয়াছে। তাহাদের দেহ নানারূপ পীড়ায় অবসন্ন। জন্মের সংখ্যা ক্রমে হ্রাস হইতেছে, মৃত্যুর সংখ্যাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। যে সমাজের এরূপ অবস্থা হয় তাহার ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী।

হিন্দুসমাজে বিপ্লব দুই বিভিন্ন সভ্যতার সংঘর্ষের ফল।

এতদ্ভিন্ন পাশ্চাত্যদিগের সংসর্গে আসিয়া হিন্দুগণ বিস্ময়াবিষ্ট ও বিহ্বলচিত্ত হইয়া পড়িয়াছে। তাহার কারণ তাহাদের মনে দুই বিভিন্ন প্রকার আদর্শ ও সভ্যতার সংঘর্ষ এবং তাঁহাদের দিকে এতদুভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টার অভাব। এজন্য বর্ত্তমান হিন্দুসমাজে এখন বিপ্লব উপস্থিত। বিগত দেড়শত বৎসরে আমাদের সমাজে যে প্রকার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তাহা জগতে অপর কোন জাতির ইতিহাসে এ পর্য্যন্ত ঘটে নাই। বহুকাল পূর্ব্বে একবার রোমীয়-গণ গ্রীসীয়দিগকে জয় করিলে এতদুভয় জাতির সমাজে অশেষ বিধ পরিবর্ত্তন ঘটে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে হিন্দুসমাজে যেরূপ সুদূর-ব্যাপী বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে, তাহা আর কোথাও কখন হয় নাই। গ্রীসীয়েরা তখন রোমানদিগের অপেক্ষা অধিকতর সভ্য ছিল এবং রোম বাহুবলে গ্রীস জয় করিলেও গ্রীস স্বীয় সভ্যতা দ্বারা রোমকে জয় করে। এ স্থলে গ্রীসের পরাজয়ের পরিবর্ত্তে বরং জয়ই হইয়াছিল, এ কথা বলা যাইতে পারে। সভ্যতার অপেক্ষাকৃত নিম্নতর সোপান হইতে রোমাণগণ উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিল এবং গ্রীসও স্বীয় জাতীয়ত্ব বজায় রাখিয়া রোমাণগণকে স্বীয় শিষ্যে পরিণত করিল। কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতার সংসর্গে আসিয়া হিন্দুসমাজের অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত হইয়াছে। তাহার কারণ এখানে দুইটী তুল্য সভ্যজাতির সংঘর্ষ উপস্থিত। কিন্তু সভ্যতায় তুল্য হইলেও এই দুই জাতির সভ্যতা মূলে ও আদর্শে সম্পূর্ণ বিভিন্ন—কেবলমাত্র বিভিন্ন নহে সম্পূর্ণ বিপরীত। হিন্দু এই জগৎকে তুচ্ছ জ্ঞানে সংসার পরিত্যাগ পূর্ব্বক সংসার হইতে মুক্তিলাভের চেষ্টায় প্রাণপাত করিতেও কুণ্ঠিত নহে, পাশ্চাত্য সংসারকে যথাসর্ব্বস্বজ্ঞানে, এই সংসারেই সুখভোগ পরমার্থতা জ্ঞানে জীবন বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত। হিন্দুর জীবনের উদ্দেশ্য ত্যাগ, পাশ্চাত্য জাতির জীব-নের উদ্দেশ্য ভোগ। হিন্দু সংসারকে নগণ্য জ্ঞানে তুচ্ছ করিত, তাই আজ সংসার বৈদেশিক সভ্যতারূপে সহসা আসিয়া তাহার ঘাড়ে চাপিয়াছে। তাই আজ হিন্দু ভীত, চকিত, বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। ত্যাগ ভাল, কি ভোগ ভাল; সংসার ভাল,

কি স্বর্গ ভাল ; ইহকাল ভাল, কি পরকাল ভাল, হিন্দু তাহার কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছে না। এতদ্ভিন্ন হিন্দু বরাবর ব্যক্তির অপেক্ষা সমাজকেই উচ্চ জ্ঞানে সমাজের মঙ্গলকে যথার্থ মঙ্গল মনে করিয়া ব্যক্তিগত মঙ্গলকে সামাজিক মঙ্গলের পদে বলি দিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। পাশ্চাত্যের নিকট ব্যক্তিই সমাজের অপেক্ষা বড়। এ জন্য তাহারা ব্যক্তিগত স্বার্থরক্ষাকে যথার্থ হিতজ্ঞানে তজ্জন্যই সমাজের অস্তিত্ব মনে করিয়া সমাজ-হিতকে ব্যক্তিগণের হিতের জন্য বিসর্জ্জন দিতে কুণ্ঠিত নহে। এই দুই বিভিন্ন আদর্শে গঠিত দুই বিভিন্ন সভ্যতার পরস্পর সংঘর্ষে হিন্দুসমাজে মহা বিপ্লব আসিয়াছে। হিন্দুসমাজ-ভুক্ত ব্যক্তিগণের মন আর সমাজের স্বার্থের দিকে নাই। সকলেই নিজ নিজ স্বার্থ সাধনে ব্যস্ত। তাই আজ গ্রামস্থ দেবালয় জীর্ণ-সংস্কার করিবার কেহ নাই, জলাশয়গুলি দূষিত, পঙ্কোদ্ধার করিবার কেহ নাই। আজ আমাদের সমাজের সহিত ব্যক্তির বিরোধ উপস্থিত। উহার ফলে হিন্দুসমাজ-বন্ধন শিথিল হইয়াছে। ব্যক্তিগণ যথেচ্ছাচারী হইয়া উঠিয়াছে। সমাজের আর ব্যক্তি-গণের উপর পূর্ব্বের ন্যায় শাসন নাই। এক দিন এমন ছিল যে অপরাধীকে রাজ-দণ্ডে দণ্ডিত হইয়া সমাজের নিকট পুনরায় দণ্ডগ্রহণ করিতে হইত। নচেৎ সমাজ তাহাকে পুনর্ব্বার গ্রহণ করিতে চাহিত না। এখন আর সেদিন নাই। এখন সকলে স্ব-স্ব প্রধান, পূর্ব্বের ন্যায় কেহ কাহাকেও মানে না, কেহ কাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করে না, কাহার প্রতি কাহার কোন কর্ত্তব্য নাই, একের দুঃখে অপরের কিছুমাত্র সহানুভূতি নাই। এই কারণে দিন দিন আমাদের জীবনভার গুরুতর হইয়া উঠিতেছে। পূর্ব্বে বাঁচিয়া থাকার যে আনন্দ ছিল এখন আর তাহা নাই। এখন বাঁচিয়া থাকা বিড়ম্বনা মাত্র।

তাহার ফলে আয়ুক্ষয়।

এরূপ অবস্থায় আমাদের আয়ুক্ষয় অনি-বার্য্য। যে বলে বলবান হইয়া হিন্দুজাতি এতদিন ধরিয়া নানাপ্রকার নির্যাতন সহ্য করিয়াও এ পর্য্যন্ত বাঁচিয়া আছে, আজ তাহারা সেই বল হারাইতে বসিয়াছে। বর্ত্তমান কালের নিদারুণ জীবন-সংগ্রামে এই কারণে হিন্দুজাতি দিন দিন পরাস্ত হইতেছে। যাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ সর্ব্ব বিষয়ে মহাত্যাগী ছিলেন তাহারা আজ পাশ্চাত্য সভ্যতার কুহকে পড়িয়া অত্যন্ত ভোগী, বিলাসী ও স্বার্থপর হইয়া উঠিয়াছে। এত ভোগ, এরূপ ঘোরতর বিলা-সিতা ও স্বার্থপরতা হিন্দুজাতির 'ধাতে' সহ্য হইতে পারে না। এই কারণে আজ হিন্দুজাতির বংশক্ষয় হইতে আরম্ভ হই-য়াছে।

ইংরাজী আমলে মুসলমানসমাজের ও জাতির অবস্থা।

বর্ত্তমান সময়ে পাশ্চাত্য জাতি ও সভ্যতার সংঘর্ষে হিন্দুজাতির কিরূপ শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে তাহা বিশদভাবে বর্ণিত হইল। এক্ষণে ঠিক এই একই কারণাধীনে মুসলমান জাতির কিরূপ অবস্থা তাহা

বিচার করিয়া দেখা উচিত। কারণ হিন্দু ও মুসলমান উভয় জাতিই এক সঙ্গে একই সময় হইতে পারিপার্শ্বিক অবস্থার অধীন। বিশেষত বঙ্গদেশে অধিকাংশ স্থলেই হিন্দু মুসলমান এতদুভয়ের প্রকৃতিগত কোন পার্থক্য নাই। কারণ অনেক মুসলমান-গণের পূর্ব্বপুরুষ হিন্দু ছিলেন, পরে বিশেষ কোন কারণ বশত মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। এরূপ ক্ষেত্রে একই শিক্ষা ও সভ্যতা উভয়জাতির উপর সমভাবে কার্য্য করিলেও এক জাতির বংশক্ষয় এবং অপর জাতির বংশ বৃদ্ধি হওয়ার কারণের অনু-সন্ধান করা আবশ্যক।

হিন্দুদিগের অবস্থার সহিত বিভিন্ন-তার কারণ।

গত সেন্‌সাস রিপোর্টে প্রকাশ যে ১৯০১ সালের গণনার দশ বৎসরে সমগ্র ভারতবর্ষে মুসলমানসংখ্যা শতকরা ৮·৯ হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে। হিন্দুজাতির এ সময়ে কিন্তু ক্ষয় হইয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে য়ুরোপীয় সংসর্গে আসিয়া মুসলমানজাতির এখনও হিন্দুজাতির ন্যায় অবস্থা হয় নাই। উভয় জাতির বর্ত্তমান অবস্থার এরূপ পার্থক্যের বিশেষ কারণ বিদ্যমান আছে। ১ম—হিন্দুজাতির তুলনায় মুসলমানজাতির এখন কৈশোর অবস্থা। হিন্দুজাতির বয়স এখন চারি-হাজার বৎসর আর মুসলমান জাতির বয়স এখন চৌদ্দশত বৎসর। মুসলমানসমাজের তুলনায় হিন্দুসমাজের এখন বৃদ্ধাবস্থা। এরূপ বয়সে হিন্দুজাতির বিভিন্ন বিপরীত সভ্যতার সংঘর্ষ সহ্য করিবার শক্তি উহার না থাকা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। এ হিসাবে মুসলমানসমাজ স্বল্প দিনের। উহার এখন সে আঘাত সহ্য করিবার ক্ষমতা থাকাই সম্ভব। ২য়—য়ুরোপীয় সভ্যতা অনেকাংশে ইসলাম ধর্ম্ম ও সভ্যতার নিটক ঋণী। য়ুরোপের ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে মহম্মদের অভ্যুদয়ের অত্যল্পকাল মধ্যে মুসলমানগণ স্বধর্ম্ম প্রচারার্থ দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া ভূমধ্যসাগরের দক্ষিণস্থ সমুদয় ভূভাগ জয় করত পরিশেষে স্পেন দেশ পর্য্যন্ত রাজ্য স্থাপন করে এবং তৎসহ তত্তৎ প্রদেশে ইসলামসভ্যতাও বিস্তার করে। য়ুরোপ এই ইসলাম সভ্যতার ভিত্তির উপর নিজ সভ্যতা নির্ম্মাণ করে। এ কারণে হিন্দুসভ্যতার সহিত ইংরাজী-সভ্যতার যেরূপ মন-গত প্রভেদ, মুসলমান-সভ্যতার সহিত উহার সেরূপ প্রভেদ নাই। এ কারণে য়ুরোপীয় সভ্যতার সংসর্গে মুসল-মানসমাজে হিন্দুসমাজের ন্যায় আদর্শের সংঘর্ষ ও তজ্জনিত বিপ্লব উপস্থিত হয় নাই। ৩য়—ইংরাজজাতির রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার, চালচলন প্রভৃতি অনেক বিষয়ে প্রায় মুসলমান জাতির তুল্য। পরি-চ্ছদ পোষাকে মুসলমান ও য়ুরোপীয়ের বিশেষ প্রভেদ নাই। আহার বিহারেও তদ্রূপ। বিলাতী ও মুসলমান দুই সমাজে হিন্দুসমাজের ন্যায় জাতিভেদ নাই। অবশ্য বঙ্গদেশে অনেক মুসলমানগণের আচার ব্যবহার অনেকাংশে হিন্দুজাতির তুল্য, কিন্তু শিক্ষা ও অবস্থার উন্নতির সহ উঁহারা

বাঙ্গলাদেশের রীতিনীতি ত্যাগ পূর্ব্বক অন্যান্য দেশের মুসলমান-সমাজের রীতি-নীতি গ্রহণ করিয়া থাকেন। ৪র্থ—হিন্দু-সমাজের মধ্যে ইংরাজীশিক্ষিতগণেরাই সাহেবিয়ানা সমধিক গ্রহণ করিয়াছেন। মুসলমানদিগের মধ্যে অনেকেই এ অনুকরণ করেন নাই।

মুসলমানসংখ্যাও উপযুক্ত হারে বৃদ্ধি হয় নাই।

পূর্ব্বোক্ত কারণে মুসলমানসমাজের পাশ্চাত্য জাতির সংসর্গে হিন্দুসমাজের ন্যায় অবস্থা না হইলেও, মুসলমানসংখ্যা যেরূপ হারে বৃদ্ধি হওয়া উচিত ছিল, সেরূপ হয় নাই। য়ুরোপীয় সর্ব্বদেশে লোকবৃদ্ধির হার আমাদের দেশের মুসলমানবৃদ্ধির হারের প্রায় চারি গুণ। এ কথা পূর্ব্বে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। এ দেশে মুসলমান সংখ্যা যে হারে বর্দ্ধিত হইয়াছে, সে হারে বৃদ্ধি হওয়ার কারণ, সেন্সাস কর্ত্তৃপক্ষগণের মতে, উহাদের সামাজিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। ইহা হইতে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে মুসলমানদিগের মধ্যে অত্যল্প হারে বংশ বৃদ্ধির এই একই কারণ। (ক্রমশ)

শ্রীরাধারমণ মুখোপাধ্যায়।

মহাভারত।

জ্যোতিষিক ইতিহমালা।

অশ্বিদ্বয় { বুধগ্রহ—নকুল।
শুক্রগ্রহ—সহদেব।

নকুল ও সহদেবের চরিত্র লক্ষণ এই :—

১। অশ্বিদ্বয়ের ঔরসে পাণ্ডুরাজপত্নী মাদ্রী দেবীর গর্ভে যমজ নকুল সহদেবের জন্ম হয়। (মহা ১।১২৪)

২। মাদ্রীদেবীকে স্পর্শ করিবা মাত্র পাণ্ডুরাজ দেহত্যাগ করেন। (মহা ১।১২৫)

৩। নকুল ধর্ম্মার্থের বিনিশ্চয়জ্ঞ, মনীষী, ধীমান্ এবং রূপে অদ্বিতীয় ছিলেন। (মহা ৩।২৬৮)

৪। সহদেব শূর, কৃতাস্ত্র, মতিমান্, মনস্বী, চন্দ্র ও সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী এবং বুদ্ধিতে, বাক্‌পটুতাতে ও ন্যায়মীমাংসাতে অদ্বিতীয় ছিলেন। (মহা ৩।২৬৮)

৫। সহদেব উলূক ও তৎপিতা শকুনিকে রণে নিহত করেন। (মহা ৯।১৮)

জ্যোতিষিক তত্ত্ব ও ইতিহ।

১। চারি হাজার বর্ষ পূর্ব্বে সুমেরু-বাসী তারাদর্শক দেখিতেন যে ষট্‌ মাস-ব্যাপী দিবার অবসানে সূর্য্য বৃশ্চিক রাশি স্থিত ছায়াপথে উপনীত হইবামাত্র অস্তমিত হইত।

২। এই বৃশ্চিক রাজ্যে ত্রিত (মঙ্গল গ্রহ) দেব সোম প্রস্তুত করিতেন। (ঋঃ বেঃ

৯।৩৪।৮) বেদমতে (১।৮৪।৪) সোমের অপর নাম মদ। এজন্য বৃশ্চিক রাজ্য ইতিহে মদ্ররাজ্য নাম গ্রহণ করিয়াছে।

৩। বৃশ্চিক রাজ্য স্থিত ছায়াপথ ওরফে সোমধারা ইতিহে মদ্ররাজ্যবাসিনী মাদ্রী দেবী নাম গ্রহণ করিয়াছেন।

৪। বেদমতে (১০।১৭।২) ছায়াদেবী বিবস্বান্ দেবের দ্বিতীয় পত্নী। পুরাণে মাদ্রী দেবী পাণ্ডুরাজের দ্বিতীয় পত্নী।

৫। বৃশ্চিক পুচ্ছস্থ শ্যাম শবল তারাদ্বয় (৮ এবং ৭ বৃশ্চিকস্য) ছায়া পথের ক্রোড়ে অবস্থিত আছে, এই শ্যাম শবল অশ্বিদ্বয়ের (বুধ ও শুক্র গ্রহ) নাক্ষত্রিক প্রতিমা।

৬। উশনা (শুক্র গ্রহ) দেবরাজ ইন্দ্রের জন্য বজ্র নির্ম্মাণ করেন। (ঋঃ বেঃ ১। ১২১।১২) "যম্ তে কাবাঃ উপনাঃ * * ততক্ষ বজ্রম্" এবং কৃতাস্ত্র উপাধি লাভ করেন।

উৎপত্তি।

১। মহাভারতে বর্ণিত নকুল সহদেবের চরিত্র এবং জ্যোতিষোক্ত বুধ ও শুক্র গ্রহের চরিত্র তুলনা করিলে তাহাদের স্বরূপতার প্রতি কিছুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না।

২। ছায়া ওরফে মাদ্রীদেবীর স্পর্শে পাণ্ডুরাজের মরণ কি কারণে কল্পিত হইয়াছে, তাহা পাঠক সহজেই অনুমান করিতে পারেন।

জ্যোতিষিক ইতিহাস।

পূর্ণচন্দ্র—অভিমন্যু।

অভিমন্যুর চরিত লক্ষণ এই—

১। অর্জ্জুনের ঔরসে সুভদ্রা দেবীর গর্ভে অভিমন্যুর জন্ম হয়। (মহা ১।২১৬)

২। অভিমন্যু বিরাটরাজের কন্যা উত্তরা দেবীর পাণি গ্রহণ করেন। (মহা ৪।৭০)

৩। অভিমন্যুর বধার্থে দ্রোণাচার্য্য চক্র-ব্যূহ রচনা করেন। (মহা ৭।৩২)

৪। অভিমন্যু চক্রব্যূহ ভেদ করিতে জানিতেন কিন্তু তিনি চক্রব্যূহ হইতে নির্গম জানিতেন না। (মহা ৭।৩৪)

৫। অভিমন্যু-সারথির নাম সুমিত্র। (মহা ৭।৩৪)

৬। অভিমন্যুর রথ কর্ণিকার ধ্বজ শোভিত ছিল। (মহা ৭।৩৫)

৭। দ্রোণ গুরু কর্ণকে উপদেশ দিলেন যে অভিমন্যুকে বিরথ ও ধনুর্বিহীন না করিলে উঁহাকে পরাজিত করিতে পারিবে না। (মহা ৭।৪৭)

৮। কর্ণ, কৃতবর্ম্মা, কৃপাচার্য্য, দ্রোণাচার্য্য, বৃহৎবল এবং অশ্বত্থামা এই ছয় মহারথ অভিমন্যুকে আক্রমণ করিলেন। রথ ও অস্ত্রশূন্য হইয়া অভিমন্যু আকাশে বিচরণ করিতে লাগিল। (মহা ৭।৪৭)

৯। দুঃশাসনের পুত্রের গদাঘাতে অভিমন্যু নিহত হইল (মহা ৭।৪৮)

১০। মরণকালে অভিমন্যু ষোড়শ-বর্ষীয় শিশু ছিল। (মহা ৭।৪৯)

জ্যোতিষিক তত্ত্ব ও ইতিহ।

১। মহাভারত মতে মহর্ষি অত্রি সোম পবমানের রূপ ধারণ করেন।

২। এবং পুরাণ মতে অত্রির নেত্রবারি হইতে চন্দ্রের উৎপত্তি হয়।

৩। চন্দ্র ষোড়শ কলায় পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়। তৎপরে ভূচ্ছায়ায় পতিত হইয়া তাহার গ্রহণ হয়। গ্রহণান্তে চন্দ্র কৃষ্ণ পক্ষে দিন দিন ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। ভূচ্ছায়ার জোতিষিক নাম কেতু গ্রহ।

৪। বরুণ দেবের রাজ্যের নাম বিরাট্। বরুণস্য বিরাট্।

৫। বিরাটরাজ বরুণের কন্যার নাম উত্তরা দিক্। এই উত্তরা দিকের পতি চন্দ্রদেব। এজন্য উত্তরা দিকের নাম সৌম্য দিক্।

৬। ধ্রুবতারা উত্তরা দিকের ক্রোড়ে অবস্থিতি করেন। যম-ধ্রবতারার (Alpha Draconis) ধ্রুবত্ব শেষ হইলে পরীক্ষিৎ তারা (I O. Draconis) ধ্রুব সিংহাসনে আরোহণ করেন। পরীক্ষিৎ তারাটি ঔজ্জ্বল্যে অতি সূক্ষ্ম। এমন কি, সন্ধ্যাকালে তারাটি দৃষ্টিগোচর হয় এবং চন্দ্রবিহীন রাত্রে তারাটির উদয় হয়। অর্থাৎ চন্দ্রবিহীন রাত্রি কালে তারাটি দৃষ্টিগোচর হয়।

৭। চন্দ্র ভিন্ন অপর ছয়টি গ্রহের বিলোম গতি আছে। গ্রহ পঞ্চকের বক্র গতিকে বিলোম গতি বলে এবং সূর্য্যের বিলোম গতিকে অয়নাংশ গতি বলে। সপ্ত গ্রহ মধ্যে কেবল চন্দ্রের বিলোম গতি নাই।

৮। ভূচ্ছায়া আকারে সর্পের লাঙ্গুলের (=কেতু=Noclus) মত। এই ভূচ্ছায়া-কেতুতে চন্দ্র প্রবেশ করিলে চন্দ্রের গ্রহণ হয়।

উপপত্তি।

১। সোম পবমানের চন্দ্র দেব। সোমধারা সোম পবমানের নারীমূর্ত্তি। সোমধার সুভদ্রার পুত্র অভিমন্যু।

২। চন্দ্র ষোল কলায় পূর্ণ হইলে গ্রহণ গ্রস্ত হয় ও ক্ষয় পাইতে থাকে। অভিমন্যু ষোড়শ বর্ষে কেতু-দুঃশাসন পুত্র কেতু-হস্তে বিনাশ প্রাপ্ত হইল।

৩। চন্দ্রের বিলোম গতি নাই। তাই অভিমন্যু চক্রব্যূহ (নক্ষত্র চক্র) হইতে নির্গম জানিতেন না।

৪। নক্ষত্র চক্রে চন্দ্রের ক্ষয় প্রাপ্তি হয়। চক্রব্যূহে অভিমন্যু নিহত হইল।

৫। চন্দ্র উত্তরা দিকের অধিপতি। অভিমন্যু উত্তরার পতি।

৬। উত্তরা দিকের ক্রোড়ে ধ্রুবতারা অধিষ্ঠিত থাকে। অভিমন্যুর জায়া উত্তরার গর্ভে পরীক্ষিতের জন্ম কল্পিত হইয়াছে।

৭। সন্ধ্যাকালে ধ্রুবতারা দেখা যায়, কিন্তু রাত্রি না হইলে পরীক্ষিৎ ধ্রুব দেখা যায় না। তাই পরীক্ষিতের মাতা উত্তরা মৃত সন্তান প্রসব করিলেন।

৮। চন্দ্রবিহীন রাত্রি ভিন্ন পরীক্ষিৎ-ধ্রুব দেখা যায় না। তাই অভিমন্যুর মরণান্তে পরীক্ষিতের জন্ম হইল।

৯। যম-ধ্রুবতারার ধ্রুবত্ব বিলুপ্ত হইলে পরীক্ষিৎ তারা ধ্রবত্ব লাভ করে। ধর্ম্মরাজ পরীক্ষিতকে সিংহাসনে বসাইয়া স্বর্গে গমন করিলেন।

তারাদর্শক।

মানবের জন্মকথা।

(২)

অব্যবহার্য্য অঙ্গ।

এই বিষয়টি যদিও পূর্ব্বের লিখিত দুইটি বিষয় হইতে আসলে অধিক গুরুতর না হউক, তথাপি নানা কারণে ইহার একটু বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিব। উচ্চশ্রেণীস্থ জীবমধ্যে এমন একটিরও নাম করা যায় না যাহার দেহে কোন-না-কোন অব্যবহার্য্য অংশ নাই। মানুষের দেহেও এরূপ অংশ আছে। অব্যবহার্য্য অঙ্গ এবং বিকাশশীল অঙ্গে প্রভেদ বুঝা যদিও কোন কোন স্থলে কঠিন, তথাপি এতদুভয়ের প্রভেদ বুঝা আবশ্যক। অব্যবহার্য্য অঙ্গ হয় ত একেবারেই বৃথা, কোন কাজেই লাগে না, যেমন পুংজাতীয় চতুষ্পদের স্তন, অথবা কর্ত্তন-দন্তহীন জাবর-কাটা * পশুর দন্ত, যাহা মাড়ি ভেদ করিয়া উঠে না। অথবা অব্যবহার্য্য অঙ্গ এমনও হইতে পারে যে উহা অতীব সামান্য উপকারে আসে,—এত সামান্য যে উহা বর্ত্তমান অবস্থায় উৎপন্ন হওয়া বিবেচনা করাই কঠিন। এই শেষোক্ত প্রকারের অঙ্গ সম্পূর্ণ অব্যবহার্য্য নহে, কিন্তু অব্যবহার্য্য হইবার দিকে যাইতেছে। পক্ষান্তরে, বিকাশশীল অঙ্গ পূর্ণমাত্রায় বিকাশ প্রাপ্ত নহে, তথাপিও দেহীর অনেক উপকার সাধন করে; আর উহার বিকাশ প্রাপ্ত হইবার শক্তি আছে। অব্যবহার্য্য অঙ্গ সকল নানারূপে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। ইহা কিয়ৎ পরিমাণে বুঝাও যায়। কারণ ইহারা সম্পূর্ণ অথবা প্রায় নিষ্প্রয়োজনীয়, সুতরাং প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের † অধীন নহে। এরূপ অঙ্গ অনেক সময় একবারেই লোপ হইয়া যায়। কিন্তু লোপ হইয়া গেলেও কদাচিৎ পুনরায় দেখা দেয়। ইহাকে পূর্ব্বানুবৃত্তি বলে। এই ঘটনা বিশেষরূপে প্রণিধান করা উচিত।

কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পূর্ণগঠিত হইলেই তাহার অধিক ব্যবহার হয়। যে বয়সে ঐ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে সেই সময় যদ্যপি উহা ব্যবহার না করা যায়, আর পর-পর বংশে ঐ বয়সে কি তদ্রূপ সময়েই ঐ অব্যবহার-জনিত ফল চলিয়া আসে,—তাহা হইলে উহা (কালে) অব্যবহার্য্য হইবার কারণ উপস্থিত হয়। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অব্যবহার্য্য হইবার প্রধান কারণই এই যে, ব্যবহারোপযোগী কালে ব্যবহার না করা এবং ঐ অব্যবহারের ফল [তদ্রূপ কালে] বংশানুগত হওয়া। কেবল যে পেশি সকলের ব্যবহার কম করিলেই "ব্যবহার না করা" হইল তাহা নহে, কোন অঙ্গে কি কোন অংশে যদি রক্ত চলাচল কম হইল তাহা হইলেও "ব্যবহার কম"

* রোমন্থী।

† যে অঙ্গ উপকারে লাগে, তাহার উন্নতি এবং যাহা তদ্রূপ নহে তাহার অবনতি হয়, সংক্ষেপে ইহাই প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন।

বলা যাইতে পারে। রক্তের গতি তাহার চাপের ইতর বিশেষের উপর নির্ভর করে। এই চাপের সংখ্যা হ্রাস হইলে, অথবা কোন অঙ্গের ক্রিয়া অভ্যাসবশত কমিয়া গেলে, রক্ত চলাচলও কমিয়া যায়। দেহের কোন অংশ পুরুষে যথাযোগ্য পূর্ণ ভাবে বর্ত্তমান থাকিলেও স্ত্রীজাতির মধ্যে অব্যবহার্য্যরূপে থাকিতে পারে; আবার স্ত্রীগণের মধ্যে যথাযোগ্য ভাবে পরিপুষ্ট অঙ্গও পুরুষে অব্যবহার্য্য অবস্থায় থাকিতে দেখা যায়। কিন্তু সে সকল অপুষ্টাঙ্গ অনেক সময়ই উপরের লিখিত অব্যবহার্য্য অঙ্গ অপেক্ষা বিভিন্ন প্রকারে উৎপন্ন হয়। কোন জাতীয় জীবের অভ্যাস পরিবর্ত্তনের ফলে কোন অঙ্গ তাহার অনিষ্টজনক হইয়া উঠিল; এই সকল স্থলে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের নিয়মে ঐ অঙ্গ কালে অব্যবহার্য্য হইয়া যায়। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ক্রমে অপুষ্ট ও অব্যবহার্য্য হইয়া যাইবার আরও দুইটি প্রণালী আছে। জীব-দেহে এক অঙ্গ বর্দ্ধিত হইলে, যেন তাহার ক্ষতি পূরণের নিমিত্ত অন্য অঙ্গ ক্ষীণ হইয়া যায়। ইহাকে ক্ষতি-পূরণ-বিধি বলা যাইতে পারে। আর, জীবের প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোন অঙ্গই স্বাভাবিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না, অর্থাৎ যত কম শক্তি ব্যয়ে কার্য্য হইতে পারে, দেহ যেন, তাহাই করিয়া থাকে। ইহাকে দেহবৃদ্ধির মিতব্যয়িতা বলা যায়। এই মিতব্যয়িতা ও ক্ষতিপূরণ বিধি অনুসারেও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অপুষ্ট এবং অব্যবহার্য্য হইয়া উঠে, এমত বিবেচনা হয়। কিন্তু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যখন ক্রমে অনেকটা ক্ষীণ ও অব্যবহার্য্য হইয়া আসিল, ব্যবহার না করিতে করিতে যতদূর ক্ষীণ ও অপুষ্ট হইতে পারে, তাহা যখন হইয়া উঠিল, ঐ অঙ্গ আরও অধিক ক্ষীণ ও অপুষ্ট হইলে যখন জীবদেহের আর বিশেষ কোন লাভ দেখা যায় না, তখন উহা যে আরও অপুষ্ট ও অব্যবহার্য্য কেন হইবে তাহা বুঝা কঠিন। যে সকল দেহাংশ কোন কাজে লাগে না, এবং আয়তনও অনেক পরিমাণে ক্ষুদ্র হইয়া গিয়াছে, তাহারা একেবারে অব্যব-হার্য্য হইয়া যাওয়া Pangenisis * বিধানা-নুসারে বোধ হয় বুঝা যাইতে পারে; কিন্তু পূর্ব্বকথিত মিতব্যয়িতা অথবা ক্ষতি-পূরণ-বিধি এস্থলে কার্য্যকর হয় না। অব্যবহার্য্য অঙ্গ সম্বন্ধে আমার পূর্ব্ব-প্রকাশিত গ্রন্থসমূহে বিশেষ রূপে আলোচনা করিয়াছি, সুতরাং এ স্থলে আর অধিক নিষ্প্রয়োজন।

মানবদেহের অনেক স্থানে অব্যবহার্য্য পেশি সকল দেখা যায়; এবং নিম্নতর জীব-দেহে যে সকল পেশি সচরাচরই বিদ্যমান থাকে তাহার মধ্যেও কতকগুলি মানবে লক্ষিত হয়, কিন্তু সে গুলি আর তেমন পুষ্ট অথবা কর্ম্মঠ অবস্থায় থাকে না। সকলেই দেখিয়াছেন যে অশ্ব প্রভৃতি কতি-পয় জন্তু তাহাদিগের দেহ-চর্ম্ম নাড়িতে ও কুঞ্চিত করিতে পারে; এই কার্য্য প্যানিকিউ-লাস্ কার্ণোসাস্ (Panniculus Carnosus)

---

* Pangenisis (প্যান্‌জেনেসিস্‌বাদ)—এই মতে দেহের প্রত্যেক কোষ হইতে অত্যতিক্ষুদ্র অতীন্দ্রিয় কণিকা সকল (Gemmutis) সঞ্চিত ও মিলিত হইয়া শুক্রকীট ও স্ত্রীডিম্ব গঠিত করে। এই মত এক্ষণে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

নামক পেশি দ্বারা সিদ্ধ হয়। এই পেশি কার্য্যক্ষম অবস্থায়, আমাদিগের দেহেও স্থানে স্থানে একটু একটু বর্ত্তমান আছে, যথা কপালের পেশি, যাহার কুঞ্চন দ্বারা ভ্রূ-যুগল তোলা যাইতে পারে। স্কন্ধের প্ল্যাটিস্‌মা মাইওডিস্ (Platysma myoides) নামক পেশি এই প্যানিকিউলাস্ শ্রেণীর অন্তর্গত। এডিন্‌বারার অধ্যাপক টার্নার আমাকে বলিয়াছেন যে তিনি এই শ্রেণীর পেশি বগলে, পৃষ্ঠে (ঘাড়ের নীচে উভয় পার্শ্বে) ইত্যাদি পাঁচটি স্থানে প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে মাস্‌কিউলাস্ ষ্টার্ণালিস্ (Musculus sternalis) নামক বক্ষের খণ্ডাস্থি লগ্ন পেশিও প্যানিকিউলাসের ন্যায়, এবং তিনি তাহা ৬০০ শত দেহ মধ্যে ১৮ টি দেহে অর্থাৎ শতকরা ৩টি দেহে প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি বিবেচনা করেন যে, "কখন কখন দেহ মধ্যে যে সকল অব্যবহার্য্য অংশ পাওয়া যায় তাহাদিগের সংস্থান অতীব পরিবর্ত্তনশীল"—এই বিধির উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্থল প্যানিকিউলাস্ নামক পেশি।

কেহ কেহ মাথার উপরিভাগের পেশি সঙ্কুচিত করিতে পারেন। এই পেশি প্রায় অব্যবহার্য্য অবস্থায় আছে, এবং ইহা পরিবর্ত্তনশীল। মাথার পেশি সঙ্কোচনের ক্ষমতা দীর্ঘকাল বংশানুগত হইয়া অসাধারণ কার্য্যক্ষম ভাবে চলিয়া আসিতে পারে; ইহার একটি অদ্ভুত দৃষ্টান্ত এম্, এ, ডি কণ্ডোলা আমাকে জানাইয়াছেন। তিনি একটি পরিবার চিনেন, সেই পরিবারের বর্ত্তমান কর্ত্তা যৌবন কালে অনেকগুলি ভারি পুস্তক মাথার উপর হইতে কেবল পেশি সঙ্কোচন দ্বারা ফেলিয়া দিতে পারিতেন। তিনি এইরূপ কাণ্ড দেখাইয়া অনেক বাজি জিতিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা, পিতামহ, পিতৃব্য, এবং তিনটি পুত্র—সকলেরই এই ক্ষমতা ঐ রূপ পরিপুষ্ট ভাবেই আছে। আটপুরুষ পূর্ব্বে এই পরিবার দুইটি শাখায় বিভক্ত হয়; এ নিমিত্ত উক্ত উল্লেখিত পরিবারের বর্ত্তমান কর্ত্তা অপর শাখাস্থ পরিবারের বর্ত্তমান কর্ত্তার সপ্তম পুরুষ দূরবর্ত্তী জ্ঞাতি ভাই হন। ইনি ফ্রান্স দেশের আর এক ভাগে বাস করেন। তাঁহার ঐ ক্ষমতা আছে কি না জিজ্ঞাসা করায় তৎক্ষণাৎ ঐ ক্ষমতা দেখাইয়াছিলেন। নিতান্ত নিষ্প্রয়োজনীয় বৃত্তিও দীর্ঘ কাল কেমন স্থায়ী ভাবে বংশানুগত হইয়া আইসে, তাঁহার একটা উত্তম দৃষ্টান্তস্থল এই পরিবার। এই বৃত্তি বোধ হয় আমাদিগের বহু পুরাতন অর্দ্ধমানব পূর্ব্বপুরুষগণ হইতে প্রাপ্ত; কারণ অনেক বানরগণের এই ক্ষমতা আছে, এবং তাহারা মাথার উপরকার পেশি অনেক সময় কুঞ্চিত করিয়া মাথার চামড়া উপর নীচে নাড়াচাড়া করে।

যে সকল বাহিরের পেশি দ্বারা কাণ নাড়িতে পারা যায়, এবং যে সকল আভ্যন্তরীয় পেশিদ্বারা কাণের ভিতরকার অংশ সকল নাড়া যায়, তাহারা প্যানিকিউলাস্ শ্রেণীভুক্ত। মনুষ্যের এই সকল পেশি অব্যবহার্য্য এবং গঠনেও পরিবর্ত্তনশীল; অন্তত ইহাদিগের কর্ম্মক্ষমতা মানবে নানা রূপ হইয়া উঠিয়াছে। আমি একজন লোক দেখিয়াছি, সে সমস্ত কাণটাই সম্মুখের দিকে আনিতে পারিত।

কেহ কেহ কাণ উপরের দিকে তুলিতে পারে, কেহ পিছনের দিকে লইয়া যাইতে পারে উহাদিগের মধ্যে এক জন যেরূপ আমাকে বলিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয় যে আমরা অনেকেই যদি কাণ স্পর্শ করি এবং স্পর্শের সঙ্গে সঙ্গে কাণের দিকে একাগ্রভাবে মনোযোগ দেই, তবে পুনঃ পুনঃ ঐরূপ করিতে করিতে কাণ নাড়াইবার যে শক্তি আমাদিগের লোপ হইয়াছে তাহার কিয়দংশ পুনঃ প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব। কাণ খাড়া করিবার এবং এদিক ওদিক ঘুরাইবার শক্তি নিশ্চয়ই অনেক পশুর বিশেষ উপকারজনক, কারণ এইরূপে উহারা কোন্ দিকে বিপদাশঙ্কা তাহা বুঝিতে পারে। কিন্তু আমি বিশ্বস্ত রূপে ইহা শুনি নাই যে কোন মানুষের এইরূপ ক্ষমতা আছে, অথবা সে এতদ্দারা কোনও উপকার প্রাপ্ত হইয়াছে। মনুষ্যের কর্ণপত্র অব্যবহার্য্য অঙ্গ, উহার ঢেঁক, বেঁক, চোঁথা বেঁকা এবং গোলভাগ—সমস্তই অব্যবহার্য্য; এই সকলই পশুরা পরিচালন করিয়া কাণ খাড়া করিতে পারে, তাহাতে কাণের ওজন বাড়ে না। কোন কোন গ্রন্থকার বিবেচনা করেন যে কর্ণের কোমলাস্থির (Cartilege) যোগে বায়ুমণ্ডলের শব্দতরঙ্গ শব্দবহ স্নায়ুতে উপনীত হয়; কিন্তু মিষ্টার টয়েন্‌-বি এ সম্বন্ধের সমস্ত প্রমাণ সংগ্রহ করত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে কর্ণের বহিরংশ বিশেষ কোন উপকারে আসে না। শিম্পাঞ্জি এবং ওরাং-ওটাঙ্গের কাণ মানুষের কাণের মত; এবং কাণসংস্পৃষ্ট পেশিসকলও মানুষের মতই অতি অল্পপুষ্ট। পশুশালার রক্ষকদিগের নিকট আমি অবগত হইয়াছি যে, উহারা কখনই কাণ খাড়াও করে না, কাণ নাড়েও না; সুতরাং কর্ম্মক্ষমতা বিষয়ে উহাদিগের কাণও মানুষের মতই অব্যবহার্য্য। এই সকল প্রাণী এবং মানুষের পূর্ব্বপুরুষ কাণ খাড়া করিবার ক্ষমতা কেন হারাইয়াছে তাহা বলা যায় না। এমন হইতে পারে যে উহারা বিশেষ বলশালী এবং গাছে উঠিতে পটু হওয়ায় বিপদাশঙ্কা কম ছিল; এ নিমিত্ত দীর্ঘকাল কাণ নড়াইবার কমই প্রয়োজন হইত; সুতরাং ঐ ক্ষমতা ক্রমে লোপ হইয়াছে। এই অনুমান আমার নিকটে বড় ভাল বোধ হয় না। ইহার একটা অনুরূপ দৃষ্টান্ত-স্থল কতিপয় সামুদ্রিক পক্ষী; পক্ষিগণ বৃহৎ-কায় এবং ওজনে ভারী; ইহারা সমুদ্রের দ্বীপভূমিতে বাস করায় হিংস্র জন্তুর আক্রমণ হইতে নিরাপদ। সুতরাং ক্রমে ইহাদিগের পক্ষ উড়িবার শক্তি হারাইয়াছে। মানুষ এবং কতিপয় বানর কাণ নাড়িতে অক্ষম, কিন্তু মাথা ইচ্ছামত এদিক ওদিক ঘুরাইয়া ফিরাইয়া সকল দিকের শব্দই শুনিতে পারে। তাহাতেই ইহাদের ঐ অক্ষমতার ক্ষতিপূরণ হয়। কেহ কেহ বলেন যে কেবল মানুষেরই কাণের নতি (lobule) আছে কিন্তু গরিলারও নতির মূল দেখা যায়; আর অধ্যাপক প্রেয়ারের নিকট শুনিয়াছি যে অনেক কাফ্রিরও কাণের নতি নাই।

বিখ্যাত স্থপতি মিষ্টার উল্‌নার্ কর্ণের বহিরংশের একটি ক্ষুদ্র বিশেষত্বের কথা আমাকে জানাইয়াছেন। তিনি ইহা নর-নারী উভয়ের মধ্যেই লক্ষ্য করিয়াছেন, এবং

ইহার প্রকৃত মর্ম্মও অনুভব করিয়াছেন। পাক্ নামক বানরের মূর্ত্তি প্রস্তুত করা কালে এই বিষয়ে তাঁহার মনোযোগ প্রথম আকৃষ্ট হয়। তিনি পাকের কর্ণের উপরিভাগ চোঁথা * করিয়া গড়িয়াছিলেন, সেই উপলক্ষে তাঁহার অনেকগুলি বানরের কর্ণ পরীক্ষা করা আবশ্যক হয়; এবং তৎপর অধিকতর মনোযোগ সহকারে মানুষের কর্ণও পরীক্ষা করিয়াছিলেন। ঐ বিশেষত্বটি এই কর্ণপত্রের বাহিরের দিকস্থ সীমায় যে দুইটি বৃত্তাভাসের ন্যায় দেখা যায় তন্মধ্যে যে বৃত্তভাগটি অপেক্ষাকৃত ভিতরের দিকে তাহার নাম হেলিক্স্। † উহার উপরের দিকে একটি ছোট অগ্রহীন স্থূল কোণ আছে; যে স্থানে হেলিক্সের কাঁধা ভিতরের দিকে আসিয়াছে উহা তথা হইতে বাহির হইয়াছে। ঐ কোণটি যখন থাকে তখন আজন্মই থাকে, এবং স্ত্রীলোকের অপেক্ষা পুরুষেরই বেশী থাকে। এই সকল কোণ কাণের মধ্য দিকে হেলিয়া রহিয়াছে, এবং অনেক সময় বাহিরের দিকেও একটু হেলে; সুতরাং সম্মুখ হইতে দেখিলে এবং পশ্চাৎ হইতে দেখিলেও ইহাদিগকে দেখা যাইতে পারে। ইহাদিগের আয়তন পরিবর্ত্তনশীল এবং কখন একটু উপরের দিকে কখন বা একটু নীচের দিকে থাকে; কখন বা এক কাণে থাকে অন্য কাণে থাকে না। এই সকল কোণ যে কেবল মানুষেরই থাকে তাহা নহে, কারণ আমি আমাদিগের পশুশালার একটি বানরের কাণেও এইরূপ দেখিয়াছি। মিষ্টার ই:, রে, ল্যাঙ্কেষ্টার আমাকে বলিয়াছেন যে হ্যাম্‌বার্গের বাগানেও তিনি এইরূপ একটি শিম্পাঞ্জি দেখিয়াছেন। কর্ণপত্রের বাহিরের কিনারা একটু ভিতরের দিকে ভাঁজ হইয়া হেলিক্স গঠিত হইয়াছে; আর কোন প্রকারে কাণটি স্থায়ীরূপে পশ্চাৎদিকে ব্যাঁকাইয়া যাওয়ায় ঐ প্রকার ভাঁজ হইয়া থাকিবে। ব্যাবুন এবং কোন কোন জাতীয় ম্যাকেকাস্ ইত্যাদি নিম্ন-শ্রেণীস্থ বানরের কাণের উপরিভাগ একটু চোঁথা, এবং কাণের কিনারায় ভিতরের দিকে ভাঁজ নাই। কিন্তু যদি ঐরূপ ভাঁজ করিয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে কাণের ভিতরের দিকে একটু ছোট কোণ অথবা বিন্দু অবশ্যই উৎপন্ন হইবে; আর বোধ হয় উহা একটু বাহিরের দিকেও হেলিবে। আমার বিশ্বাস যে উহা ঐ রূপেই জাত হইয়াছে। পক্ষান্তরে অধ্যাপক এল্ মায়ার সম্প্রতি প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে এই মত সমর্থন করিয়াছেন যে কাণের এই সমস্ত অবস্থা স্বতঃ-পরিবর্ত্তন-বিধির দৃষ্টান্ত মাত্র; কোণ অথবা চোঁথা ভাগগুলি প্রকৃত কোণ নহে; কিন্তু উহাদিগের উভয় পার্শ্বের মধ্যকার কোমলাস্থি পূর্ণ মাত্রায় পরিপুষ্ট না হওয়াতেই ঐরূপ দেখায়। অনেক স্থলে এই কথাই যে ইহার প্রকৃত ব্যখ্যা তাহা আমি স্বীকার করিতে সর্ব্বথা প্রস্তুত আছি। অধ্যাপক মায়ার যে সকল চিত্র প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাতে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোণ দেখা যায়। তদ্ধেতু কাণের সমস্ত কিনারাটাই বেঁকা বেঁকা দেখায়। এরূপ

* সূচল (ছুঁচল)
† Helix

স্থলে ঐরূপ ব্যাখ্যা প্রকৃত বলিয়া স্বীকার করি। ডাক্তার এল ডাউন্ দয়া করিয়া আমাকে একজন আজন্ম-জড়-বুদ্ধি লোকের কাণ দেখাইয়াছেন, 'তাহাতে হেলিক্সের বাহিরের দিকে একটু বিস্তৃত কোণ ছিল, কিনারার ভিতরের ভাঁজে নহে; সুতরাং এই কোণ অথবা বিন্দুটির সহিত কাণের উপরিস্থ চোঁখা ভাগের * কোন সম্বন্ধ নাই। তথাপি কোন কোন স্থলে আমার পূর্ব্বমত এখনও সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়, অর্থাৎ কাণের এই সকল কোণ অথবা বিন্দু নিম্নতর জীবের খাড়া চোঁখা কাণের অগ্রভাগের লুপ্তাবশিষ্ট চিহ্ন মাত্র। এইরূপ বিবেচনা করার কারণ এই যে ঐ সমস্ত কোণ অথবা বিন্দু অনেক স্থলেই দেখা যায়, আর চোঁখা কাণের অগ্রভাগ যে স্থানে ছিল এসকলও সেই স্থানেই থাকে। একটি কাণের ফটোগ্রাফ্ আমার নিকট প্রেরিত হইয়াছে। তাহাতে এই কোণ এত বড় দেখা যায় যে, অধ্যাপক মায়ারের মত সত্য মনে করিয়া যদি কাণের সমস্ত কিনারাতে কোমলাস্থি তুল্যরূপে পুষ্ট করিয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে মোট কাণের এক তৃতীয়াংশ জুড়িয়া ঐ বিস্তৃত কোণই হয়। উত্তর আমেরিকার একটি কাণে এবং ইংলণ্ডের অপর একটি কাণে দেখিতেছি যে, উপরের কিনারায় ভিতরের দিকে একটুও ভাঁজ নাই; বরং সেই স্থান চোঁখা। সুতরাং চতুষ্পদ জন্তুর চোঁখা কাণের ছাঁচের সহিত বিশেষ মিল হয়। এই দুইটি আমার নিকট প্রেরিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে একটি ছোট শিশুর কাণ; তাহার বাপ বলেন যে সাইনপিথিকাস্-নিগার (cynopy-thicasnigar) নামক যে বানরের চিত্রটি আমি আমার একটি গ্রন্থে * অঙ্কিত করিয়া দিয়াছি তাহার কাণের সহিত উহার কাণের খুব মিল আছে। এই দুই স্থলে, যদি কাণের বাহিরের কিনারা সোজাসুজি ভিতরের দিকে ভাঁজ করা যায় তাহা হইলে ভিতরের দিকে একটি কোণ উৎপন্ন হইবেই। আর দুইটি কাণের সম্বন্ধে আমি বলিতে ইচ্ছা করি যে তাহার বাহিরের কিনারা এখনও কিয়ৎ পরিমাণে চোঁখা দেখা যায়, কাণের উপরভাগের কিনারায় ভিতরের দিকে ভাঁজ করা আছে; একটিতে ভাঁজ অতি কম; তথাপিও দুইটিরই কিনারা চোঁখা। ডাক্তার নিশ্চে দয়া করিয়া আমাকে একটি ওরাং-ওটাঙ্গের ভ্রূণের ফটোগ্রাফ্ পাঠাইয়াছেন। ইহাতে দেখা যাইতেছে যে যদিও পূর্ণবয়স্ক ওরাং-ওটাঙ্গের কাণের সহিত মানুষের কাণের সাধারণতঃ খুব মিল আছে, তথাপি ভ্রূণ অবস্থায় ইহার কাণের উপরিভাগের কিনারা কত চোঁখা, এবং মানুষের কাণ হইতে কত বিভিন্ন। উহাদিগের পূর্ণবয়সে এরূপ থাকেই না। বয়োবৃদ্ধি সহকারে কাণের উপরকার ভাঁজ বিশেষ পরিবর্দ্ধিত

* গো অশ্ব ইত্যাদি পূর্ব্বতন জীবের কর্ণে এই চোঁখাভাগ আছে।

* The Expression of the Motions, p. 135.

না হইলে উহা হইতেই ভিতরদিকে চৌথা বিন্দুর উৎপত্তি হইবে। যাহা হউক, কাণের এই চৌথা অংশ কোন কোন স্থলে, বানরের ও মানুষের উভয়েরই পূর্ব্বাবস্থার চিহ্ন স্বরূপ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে, ইহা আমার এখনও সম্ভবপর বোধ হয়।

শ্রীশশধর রায়।

প্রকৃত নির্ব্বাণ কি?

(পূর্ব্ব প্রবন্ধের অনুবৃত্তি)

তা ছাড়া, নির্ব্বাণ একটা অবস্থা বিশেষ;—যে অবস্থায় মনুষ্যের, কার্য্যকারণ-শৃঙ্খল হইতে বিমুক্ত হওয়ায়, পরিবর্ত্তনশীল সংসারচক্রের মধ্যে ফিরিয়া আসিবার আর আশঙ্কা থাকে না। অতএব, নির্ব্বাণ যদি একটা অবস্থা-বিশেষ হয়, তাহা হইলে ইহা কথনই নাস্তিত্ব হইতে পারে না। বুদ্ধ ক্রমাগতই এই কথা বলিয়া আসিয়াছেন:—অস্তিত্বও নাই, নাস্তিত্বও নাই। প্রকৃতি অবিরত রূপান্তরিত হইতেছে, ইহা কার্য্যকারণ সমূহের পরিণাম ভিন্ন আর কিছুই নহে। প্রকৃতি আছে এবং যাহা কিছু আছে তাহা কথনই বিনষ্ট হয় না। এ বিষয়ে আমি (Schaebel) শেবেলের মতাবলম্বী; তাঁহার বৌদ্ধধর্ম্মের আলোচনায় তিনি এইরূপ বলিয়াছেন:—"নির্ব্বাণ কি?—না, উহা রূপহীন বিশ্বজনীন পদার্থ, মূল প্রকৃতির আদিম অবস্থা, জগতের পরমাণু,—যাহা হইতে সমস্ত উৎপন্ন হয়, এবং যাহার মধ্যে সমস্তই পুনঃ প্রবেশ করে। ইহা বিশ্ব-পদার্থ সংগ্রহ ও ধারণ করিবার একটা যন্ত্র-বিশেষ; ইহা 'নিদানের' জটিল চক্রসমূহ—যাহাতে করিয়া কার্য্যকারণের ক্রিয়া অবিরত চলিতেছে; সমস্ত সত্তা, যতক্ষণ না বিশ্বজনীন মূল সত্তায় গিয়া উপনীত হয়, ততক্ষণ উহা অবস্থা হইতে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়। মূল-সত্তা কিছুই নহে, কেননা, উহাই যাহা কিছু-সব। বৌদ্ধধর্ম্ম ধর্ম্মমতের আকারে যে কথা ব্যক্ত করিয়াছেন, আধুনিক বিজ্ঞান তাহাকেই (equivalence of forces) "শক্তিসাম্য" বলিয়া থাকেন...Prob-Mayer, শক্তিসমূহের কিংবা ক্রিয়াসমূহের সাম্য সম্বন্ধে যে সূত্রটি ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা জীব সম্বন্ধে প্রয়োগ করিলে, উহা বৌদ্ধমতে পরিণত হয়; অর্থাৎ জীব, অবস্থা হইতে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া অবশেষে ফিরিয়া ঘুরিয়া আবার সেই আদিম পদার্থে প্রবেশ করে, যাহা সকল সত্তার মূল উপাদান, এবং যাহা অবিমিশ্র ও রূপহীন......এইরূপে নির্ব্বাণ, কতকটা বৈজ্ঞানিক সূত্রের আকার ধারণ করিতে পারে, এবং যে বুদ্ধি সূক্ষ্ম-ভাবের কোন তত্ত্ব গ্রহণ করিতে চাহে না,

সে বুদ্ধিও এই কথা সহজে বুঝিতে পারে (৬২)।”

নির্ব্বাণ নাস্তিত্ব কিংবা শূন্যতা নহে; কেননা, ইহা সেই পরম পুরস্কার, যাহা জীবনমুক্ত সাধুব্যক্তি এই লোকেই অর্জ্জন করিতে সমর্থ।

“সুত্তসঙ্গহ” গ্রন্থে এইরূপ উক্ত হইয়াছে:—যে শিষ্য সুখ ও বাসনা হইতে আপনাকে বিনির্ম্মুক্ত করিয়াছেন, যিনি জ্ঞানে সমৃদ্ধ, তিনি ইহলোকেই মৃত্যু হইতে মুক্তি লাভ করিয়া, বিরাম লাভ করেন, নির্ব্বাণ লাভ করেন, নিত্যধামে প্রবেশ করেন।”

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, নির্ব্বাণ শব্দের অর্থ—নিবিয়া যাওয়া। কিন্তু ইহা হইতে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে হইবে না যে, নির্ব্বাণের অর্থ, শূন্যে অস্তিত্বের নির্ব্বাণ হওয়া।

আর একথা যেন মনে থাকে যে, এই নির্ব্বাণের মতটি ভারতের সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই বিদ্যমান।

হিন্দু-দার্শনিকেরা, নির্ব্বাণ শব্দটি যে ভাবে প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তাহাতে, জীবের অস্তিত্ব নাশ দূরে থাকুক, জীব দুঃখানল হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া, শান্তি-সুখ উপভোগ করে। “ব্রহ্মজাল-সূক্ত” হইতে Oldenberg একটা স্থান উদ্ধৃত করিয়াছেন; তাহাতে স্পষ্ট এই কথা বলা হইয়াছে যে, নির্ব্বাণ—পরমানন্দের অবস্থা, উহা নাস্তিত্ব-ধারণার একেবারে বাহিরের, কেননা ইহলোকেই সেই পরমানন্দ উপভোগ করা যায়। “হে শিষ্যগণ! অনেক শ্রামণ ও ব্রাহ্মণেরা এইরূপ শিক্ষা দেন ও এইরূপ বিশ্বাস করেন:—পঞ্চ ইন্দ্রিয় বিদ্যমানেও, যদি কাহারও আমিত্বের লোপ হয়, তখন তাহার আত্মা এই মর্ত্ত্যলোকে থাকিয়াও নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয় (৬৩)।”

পণ্ডিতপ্রবর মোক্ষমূলর বলেন,—নির্ব্বাণ—জীবনের পরম সার্থকতা, পরম পুরুষার্থসাধন—উহা জীবনের বিলোপ নহে। তিনি বলেন,—বুদ্ধের মতে ও আদিম বৌদ্ধসম্প্রদায়ের মতে, নির্ব্বাণ অর্থে, আত্মার সেই পরম-আনন্দময় শান্তির অবস্থা, যাহা সর্ব্বপ্রকার পার্থিব সুখ ও পার্থিব দুঃখকে অনন্তগুণে অতিক্রম করে।

যে ধর্ম্ম স্পষ্টাকারে নাস্তিত্ব কিংবা শূন্যতায় পর্য্যবসিত হয়, সে কি আর ধর্ম্ম নামের যোগ্য হয়? ধর্ম্মমাত্রই সসীম ও অসীমের মধ্যে সেতুস্বরূপ; শূন্যতা যে ধর্ম্মের মত, সে ধর্ম্ম কখনই এরূপ সেতু হইতে পারে না।

আর এক প্রকারে নির্ব্বাণের ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। বৌদ্ধেরা নির্ব্বাণ অর্থে,—বাসনার নির্ব্বাণ, জীবনতৃষ্ণার নির্ব্বাণ বুঝিয়া থাকেন।

আমি দেখাইয়াছি, নির্ব্বাণ নাস্তিত্ব নহে, শূন্যতা নহে; এখন আমার শুধু বুঝাইতে বাকি আছে,—মানুষ মুক্তিলাভ করিলে পর, মানুষের ব্যক্তি-সত্তা, অহং সত্তা থাকে কি না।

এ সম্বন্ধে দুইটি অনুমান অবলম্বন করা যাইতে পারে:—হয়, এই অহং-এর নিজ-সত্তা সম্বন্ধে জ্ঞান থাকে, নয়,—এই জ্ঞান হারাইয়া বিশ্ব-সত্তার অবস্থা লাভ করিয়া, অহং পূর্ণ-অস্তিত্বের মধ্যে প্রবেশ করে।

"মিলিন্দ পান্‌হা"র একটা বচন অনুসারে মনে হয়, মৃত্যুর পরেও অহং-জ্ঞানটা থাকিয়া যায়; বুদ্ধের একজন শিষ্য এই সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন :—"আমি মরণকেও ইচ্ছা করি না, জীবনকেও ইচ্ছা করি না; ভৃত্য যেমন ভৃতি-কালের প্রতীক্ষা করে, আমিও সেইরূপ কালের প্রতীক্ষা করিতেছি। আমি মরণকেও ইচ্ছা করি না, জীবনকেও ইচ্ছা করি না, আমি শুধু সজ্ঞানে ও সতর্ক-চিত্তে কালের প্রতীক্ষা করিতেছি।" এই বচনটিতে অবশ্য এরূপ বুঝায় না যে, একবার নির্ব্বাণের মধ্যে প্রবেশ করিলে, আত্মচৈতন্য থাকিবে; কিন্তু যদি মনে করা যায়, ধ্যান-সমাধিকে চূড়ান্ত সীমায় লইয়া গেলে মানুষ মুক্তির পথে উপনীত হইতে পারে, তাহা হইলে বলিতে হইবে, এই সমাধির অবস্থাই এক প্রকার নির্ব্বাণের অবস্থা; কেননা নির্ব্বাণ ইহলোকেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। এ কথা স্বীকার করা অসম্ভব নহে যে, সমাধির অবস্থায় যদি মানুষের আত্মচৈতন্য থাকে, তাহা হইলে এই ভাবটি নির্ব্বাণের মধ্যেও স্থায়ী হইতে পারে।

এ কথা স্বীকার করিলে যুক্তিবিরুদ্ধ হয় না যে,—মানুষ এমন একটা সমাধির অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে, যে অবস্থায়, আর সংসারে ফিরিয়া আসিতে হইবে না নিশ্চিত জানিয়া, তাহার চিত্ত সেই চির-শান্তির মধ্যে অসীম আনন্দ অনুভব করে।

কিন্তু একটা অত্যন্ত গুরুতর সমস্যা যেন আমাদের দৃষ্টি এড়াইয়া না যায়; সেই সমস্যাটি ব্যক্তি-সত্তার সমস্যা। এই বিষয় সম্বন্ধে প্রাচ্যবাসীদিগের ধারণা, বিশেষত বৌদ্ধদিগের ধারণা, আমাদের ধারণার অনুরূপ নহে।

আমরা এমন কোন অহং-সত্তা বা ব্যক্তি-সত্তার কল্পনা করিতে পারি না যাহা অমর নহে; এবং এই ধারণাটি আমাদের মধ্যে এরূপ বদ্ধমূল যে, আমরা স্বর্গসুখও চাই না যদি আমাদের অহং-সত্তার বিলোপ হয়। তাছাড়া, আমাদের মধ্যে অনেকে, দেহের পুনরুত্থানের মতটি বিশ্বাস করে—শরীর ও মনের পৃথক-সত্তা রক্ষা করিবার প্রতি আমাদের এমনি আসক্তি। এ বিশ্বাসটি কেবল আমাদের অহংকার হইতেই উৎপন্ন হয়, কেননা, অহং অহংকারেরই নামান্তর। এ কথা সত্য, মৃত্যুর পরেও আমাদের অহং-সত্তা থাকিবে—এই বিশ্বাসটি আমাদের মধ্যে অন্তরের একটি গভীর স্পৃহারূপে বিদ্যমান, কিন্তু মোটের উপর ইহা কোন যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে; অন্তত এই ধারণাটি বিশ্বজনীন ধারণা নহে। ফলত প্রাচ্যবাসী-দিগের মতে, বিশেষত বৌদ্ধদিগের মতে, এই অহং-সত্তার বিলয়-ব্যাপারে এমন কিছুই নাই, যাহাতে কেহ শিহরিয়া উঠিতে পারে। তাহাদের মতে, অনুসন্ধানের একমাত্র যোগ্য বিষয় কি?—না, চিরশান্তি বা নির্ব্বাণ, এবং একমাত্র ত্রাসের বিষয় কি?—না, সাগর ঝটিকাহত দিগ্‌ভ্রান্ত ভগ্নতরীর ন্যায় সংসার-আবর্ত্তে অনন্তকাল বিঘূর্ণিত হওয়া। অতএব, এ কথা বিশ্বাস করা যাইতে পারে যে, বৌদ্ধেরা, একটা ঘোর বিষাদের ভাব অন্তরে পোষণ করিয়া, গভীর নৈরাশ্যের হাতে আত্মসমর্পণ করিয়া,

নির্ব্বাণের প্রতি উন্মুখ হয় না ; পরন্তু যেখানে কোন অশান্তি নাই, বিভ্রাট নাই, এইরূপ একটা নিরাপদ বন্দরে পৌঁছিবে বলিয়া তাহাদের যে ধ্রুব বিশ্বাস, সেই বিশ্বাস জোরেই তাহারা হর্ষ ও আনন্দের সহিত নির্ব্বাণের পথে অগ্রসর হয়। "ধম্মপদে"র এই শ্লোকগুলির প্রতি একবার কর্ণপাত কর :—"আমরা এই বিদ্বেষপূর্ণ জগতে নিঃশত্রু হইয়া পূর্ণানন্দে বিচরণ করি ; ভ্রান্ত লোক-দিগের মধ্যে আমরা অভ্রান্ত হইয়া পূর্ণানন্দে অবস্থিতি করি। আমাদের কিছুই নাই—তবু আমরা পূর্ণানন্দে জীবন যাপন করি। দেবতাদিগের ন্যায় আনন্দই আমাদের খাদ্য (৬৫)।" একথা নিশ্চয়ই আধুনিক শূন্যবাদীদিগের কথা নহে।

অতএব বৌদ্ধদিগের মতে,—আমাদের অহং-জ্ঞান অর্থাৎ আমাদের পৃথক্ ব্যক্তিত্বের জ্ঞান বিলুপ্ত হইতে পারে। কেননা, আমার আমিত্ব বিলুপ্ত হইলেও, আমার মানব-সত্তা যে মূল হইতে পরিণাম-পরম্পরাক্রমে উৎপন্ন হইয়াছে, সে মূলটি তখনও বিদ্যমান থাকিবে।

(Schaebel) শেবেল বলেন,—"যাহা প্রকৃতির মৌলিক উপাদান সেই মূলটি থাকিয়া যায়, উহা অবিমিশ্র, রূপহীনপদার্থ, জগতের উপাদান, বিশ্বজনীন বস্তু,—অকৃত অসংযুক্ত,—এই মূল শব্দটি "ধম্মপদে"র মতে, নির্ব্বাণেরই অনুরূপ।"

নির্ব্বাণ যে নাস্তিত্ব কিংবা শূন্যতা নহে তাহার প্রমাণ স্বরূপ "সাম্যুক্তা নিকায়" হইতে একটি অংশ উদ্ধৃত করিয়া এই বিষয়ের আলোচনা সমাপ্ত করিব। শাক্যসিংহের একজন শিষ্য সারিপুত্ত ও ভিক্ষু যমক—এই দুই জনের মধ্যে যে বাক্যালাপ হইতেছিল উহা তাহারই একটি অংশ। "এই সময়ে যমক নামক একজন ভিক্ষু বৌদ্ধধর্ম্মের বিরুদ্ধ একটি মত গ্রহণ করিয়াছিলেন ; বুদ্ধদেবের প্রচারিত মতটি আমি এইভাবে বুঝিয়াছি,—যে ভিক্ষু পাপ হইতে মুক্ত হইয়াছে, তাহার দেহের যখন ধ্বংস হয়, সেই সঙ্গে তাহারও ধ্বংস হয়, সে জীবলোক হইতে অন্তর্হিত হয়, মৃত্যুর পরে তাহার অস্তিত্ব থাকে না।" সারিপুত্ত প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া তাহাকে দেখাইল যে সে গুরুদেবের মতটি ঠিক বুঝিতে পারে নাই। তখন অনুতপ্ত হইয়া ভিক্ষু যমক বলিয়া উঠিল :—"আমি অজ্ঞানতা বশত এইমাত্র তোমার নিকট একটি ধর্ম্মবিরুদ্ধ মত ব্যক্ত করিয়াছি। কিন্তু এক্ষণে এইমতটি সম্বন্ধে আর্য্য সারিপুত্তর ব্যাখ্যান শুনিয়া, ধর্ম্মবিরুদ্ধ মতটি আমার মন হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে, আমি এখন প্রকৃত মতটির মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়াছি।"

নির্ব্বাণ সম্বন্ধে আমার মতামত ব্যক্ত করিলাম, এখন "ধম্মপদে"র সহিত একত্র মিলিত হইয়া আমিও এই কথা বলি :—"যে ব্যক্তি কোন জীবের অনিষ্ট করে না, যে চিরদিন শরীরকে দমন করে, সেই সাধু পুরুষ অনন্তধামে যাত্রা করে। সেখানে যে কেহ গমন করে, সে আর দুঃখ পায় না। মঙ্গলের দ্বারা যে অনুপ্রাণিত হইতেছে, সে-ই বৌদ্ধধর্ম্মের ভক্ত, সে-ই শান্তিরাজ্যের অভিমুখে, পরমানন্দের অভিমুখে যাত্রা করে যেখানে অনিত্যতা চিরকালের মত বিরাম লাভ করিয়াছে!"

পরিশেষে বক্তব্য, বৌদ্ধেরা যখন কার্য্যের নৈতিক ফলাফলে বিশ্বাস করে, তখন একেবারে অহং এর ধ্বংস হইবে—এই মতে তাহারা কখনই সায় দিতে পারে না। কেননা, যদি আপনারাই ধ্বংস হইল, তাহা হইলে কার্য্যের ফলাফল কাহাতে বর্ত্তাইবে? বৌদ্ধেরা এই পৃথক্ ব্যক্তি-সত্তার গুরুত্ব আদৌ উপলব্ধি করে না, পরন্তু উহারা মনে করে, পৃথক্ অহং সত্তার জ্ঞানই উহাদিগকে জন্ম-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া রাখে; এই জন্ম-শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইবার জন্যই উহারা এত দূর আত্মত্যাগের সাধনা করে, যে অবশেষে আত্মবিলোপে গিয়া উপনীত হয়।

এইবার উপসংহার করিব। নির্ব্বাণ কি? —না, জীবসমূহের মৌলিক সাম্যাবস্থা, ইহা সেই সম্পূর্ণ সমাধির অবস্থা যাহাতে চিত্ত-বৃত্তি নির্ব্বাপিত হয়। 'এবং কেবল নৈতিক বীরত্বের দ্বারাই এই সমাধির সাধনায় সিদ্ধি লাভ করা যাইতে পারে। ইহা নৈতিক বীরত্বেরই ফল। কেননা, নির্ব্বাণ লাভ করিতে হইলে অহং-কে, কি না অহঙ্কারকে উচ্ছেদ করা নিতান্তই আবশ্যক। আবার নীতি, বিজ্ঞান ও ধর্ম্মের সাধনা ব্যতীত অহংকে সম্পূর্ণরূপে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে না।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সূর্য্যপূজা।

রাজপুতদিগের অসীম তপনভক্তি। তাহারা তপনদেবের নামে উল্লসিত হইয়া অম্লানবদনে সমরক্ষেত্রে হৃদয়-শোণিত দান করিতে পারে। তাহারা জানে যে সংগ্রাম মৃত্যু ঘটিলে ভানুস্থানে—যেখানে সূর্য্যদেব স্বয়ং বাস করেন—সেই পরম স্বর্গে স্থান লাভ ঘটে। *

ইতিহাস-বিশ্রুত উদয়পুরের প্রধান প্রবেশ তোরণের নাম সূর্য্য-পোল। রাজ-প্রাসাদের প্রধান কক্ষের নাম সূর্য্যমহল। রাজসিংহাসনের পুরোভাগে কক্ষপ্রাচীরে জিপসায় নির্ম্মিত সূর্য্যমূর্ত্তি চিত্রিত রহিয়াছে। তাঁহার মস্তকের চতুর্দ্দিক হইতে তীব্ররশ্মি বিচ্ছুরিত হইয়া দিগন্তে প্রধাবিত হইতেছে। রাণার বিজয়পতাকা সূর্য্যমূর্ত্তি বক্ষে ধারণ করিয়া জয়গর্ব্বে উড্ডীয়মান রহিয়াছে। সূর্য্যকিরণের নামানুকরণে আজিও রাণার রাজ-ছত্র কির্ণী নামে খ্যাত। এই সকল হইতেই অনুমিত হইবে যে সূর্য্যদেব আমাদের বসন, ভূষণ, সম্পদ ও প্রসিদ্ধির সহিত কতদূর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ। তাই হিন্দুমাত্রেই প্রতিদিন 'জবাকুসুমসঙ্কাশং' মন্ত্রে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া থাকে। আমরা জন্মগ্রহণ করিলে সূর্য্যার্ঘ্য প্রদান করিয়া

* In his honor they fearlessly expend their blood in battle from the hope of being received into his mansion. Their highest heaven is accordingly the *Bhanu-sthan or Bhanu-loke.*

Tod's Rajsthan, Vol. I, p. 596.

শুচি হইতে হয়, আবার মরিলেও সূর্য্যেরই অর্ঘ্য দিতে হয়। হিন্দুর সর্ব্ব যাগ-যজ্ঞ-পূজার পূর্ব্বেই গ্রহাদি সহ সূর্য্যদেবতার পূজা হইয়া থাকে।

অধুনা যে ভূখণ্ডকে আমরা Indore বলিয়া জানি, এক সময়ে তাহাই ইন্দ্রপুর নামে প্রখ্যাত ছিল। সেই ইন্দ্রপুরের বর্দ্ধমান নৃপতি স্কন্দগুপ্তের শাসন সময়ে (খ্রীঃ পূঃ ৪৬৫) তথায় একটি সূর্য্যমন্দির ছিল। মন্দির মধ্যস্থিত প্রদীপ প্রজ্বালিত রাখিবার জন্য যে ব্যক্তি তৈল যোগাইত, রাজা স্কন্দগুপ্ত তাহাকে একখণ্ড ভূমি দান করিয়াছিলেন, যে তাম্রশাসনে ভূমি প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহার প্রারম্ভেই সূর্য্যের নিকট প্রসাদ ভিক্ষা করিয়া নিম্নলিখিত রূপ আশীর্ব্বচন ছিল—

যং বিপ্রা বিধিবৎ প্রবুদ্ধমনসো
ধ্যানৈকতানাস্তুবঃ
যস্যান্তং লোকো বহুরোগবেগনিবেশঃ
সংশ্রত্য চেতোলভঃ
পায়াদ্বঃ স জগৎপিধান পুটভিৎ
রশ্ম্যাকরো ভাস্করঃ॥

এইরূপ আশীর্ব্বাদের পরই আছে—পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজ শ্রীস্কন্দগুপ্তস্যাভ-বর্দ্ধমান বিজয়রাজ্য সম্বৎসরশতে ষট্‌-চত্বারিংশদুত্তরতমে ফাল্গুণমাসে............ ইত্যাদি।

যদিও বৌদ্ধগণ প্রথমে মূর্ত্তি পূজা করিতেন না, কিন্তু যুগধর্ম্ম প্রভাবে স্বতই যে ধর্ম্মমত সমন্বয় হইয়া থাকে তাহারই ফলে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রারম্ভ হইতেই সর্ব্বসাধারণের সংস্কার ও ধারণাগুলি অলক্ষিতে বৌদ্ধধর্ম্মমতের সহিত সংযুক্ত হইয়াছিল। তাই আমরা বৌদ্ধমন্দিরেও সূর্য্যমূর্ত্তির অস্তিত্ব দেখিতে পাই। কখনো দেখি মন্দিরের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত অষ্ট-গ্রহসহ সূর্য্যদেব স্বয়ং মন্দিরগাত্রের নানা স্থানে শোভা পাইতেছেন, আবার কখনো দেখি সূর্য্যদেবেরই মন্দির মধ্যে বৌদ্ধদিগের শিলালিপি ও তাম্রশাসন ও অন্যান্য নিদর্শন। বুদ্ধগয়ার সূর্য্যের মন্দির মধ্যে কানিংহাম সাহেব একখানি শিলাফলক দেখাইয়াছিলেন। * উহাতে "ভগবতি পরিনিবৃত্তি সম্বৎ ১৮১৯" এইরূপ লিখিত ছিল। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বপুদেব শাস্ত্রী মহাশয় গণনা করিয়া কহিয়াছেন পরিনির্ব্বাণ সম্বৎ ১৮১৯ খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৪৭৮; বুদ্ধগয়ার সূর্য্যমন্দির মধ্যে আবিষ্কৃত এই শিলাফলকই পরিনির্ব্বাণ বৎসরের এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত এক মাত্র শিলাফলক। † সুতরাং সেই সূর্য্য-মন্দির তাহারও পূর্ব্বের বলিয়া অনুমান হয়। এই মন্দির মধ্যেই আর একখানি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে তাহা ১৩৭২ খ্রীষ্টাব্দের, সুতরাং দিল্লীশ্বর ফিরোজসাহ তোঘলকের শাসন-সময়ের। শুধু শিলা-ফলক নহে, এই মন্দিরে সূর্য্যদেবের মূর্ত্তিও

* ফল্গুতীরে বামনি ঘাটে যে সকল অপেক্ষাকৃত অল্পায়তন দেবমন্দির আছে তন্মধ্যে একটি সূর্য্যমন্দিরে কানিংহাম সাহেব একটি ৫ ফিট ১১ ইঞ্চ সূর্য্যমূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন।—*Ibid*, p. 112.

† The only record yet found which is dated in the Buddhist era of the Nirvan. ——Cunningham's Areheological Report, Vol. III.

কানিংহাম সাহেব দেখিয়াছিলেন এবং তাহার চিত্রও তাঁহার গ্রন্থে দিয়াছেন। * উল্লিখিত দ্বিতীয় শিলালিপির প্রথম পংক্তির মধ্যস্থলে "সূর্য্যায় নমঃ" এই রূপ লেখা আছে। মূর সাহেবের Hindu Pantheon † এবং কোলম্যান সাহেবের Mythology of the Hindus ‡ নামক গ্রন্থদ্বয়ে নানাবিধ সূর্য্যমূর্ত্তি অঙ্কিত রহিয়াছে। উত্তর বঙ্গে যে প্রথম সূর্য্যমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছিল, বুকানন সাহেব তাঁহার Eastern India নামক গ্রন্থে § তাহার চিত্র দিয়াছেন। সেই মূর্ত্তি এখন কোথায় কি ভাবে আছে তাহার আলোচনা উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনের কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। উত্তর-বঙ্গে যে সৌর রাজবংশ এককালে রাজত্ব করিতেন, তাঁহাদের কাহারো সহিত সে মূর্ত্তির কোনো সম্বন্ধ আছে কি না তাহাও আলোচনার বিষয়।

সূর্য্যদেব যতদিন হইতে পৃথিবীর পূজা পাইয়া আসিতেছেন তাঁহার মন্দিরও বোধ হয় তত প্রাচীন। ঠিক কোন্ সময়ে তাঁহার প্রথম মন্দির মস্তক উত্তোলন করিয়া ভক্ত-হৃদয় আনন্দপরিপ্লুত করিয়াছিল, তাহা জানিবার কোনো উপায় আছে কি না বলিতে পারি না। কেহ কেহ অনুমান করেন যে সত্য যুগে রাজা মান্ধাতা-দেব পাঞ্চাল প্রদেশে সূর্য্যের প্রথম মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। যে নগরে এই মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহাকে কন্দোলা বলিত। সমৃদ্ধি, আয়তন ও জনসংখ্যায় কন্দোলা তখন ভারতবর্ষ মধ্যে একটী অন্যতম শ্রেষ্ঠ নগর বলিয়া পরিচিত ছিল। * উত্তরবঙ্গে যেরূপ বৃহৎ ও সুন্দর সূর্য্যমূর্ত্তি আমি প্রাপ্ত হইয়াছি তাহা দেখিয়া মনে হয় সূর্য্যের মন্দিরও এ দেশে ছিল। কিন্তু কোথায় ছিল, কে নির্ম্মাণ করিয়াছিল,

* এই মন্দির সম্বন্ধে কানিংহাম সাহেব লিখিয়াছেন—The temple itself is only the remains of the one building repeatedly repaired and white washed. It consists of an entrance portion and hall 39 feet long by 25½ feet broad, and a small sanctum at the west end 8⅔ feet square. The walls are of brick, but the pillars are all single blocks of granite 10 feet in height and well proportioned but without ornament. The enshrined image is a fine figure of the sun god with two arms, and with seven horses driven by Aruna the pedestal. ——Archeological Report, 1871-72, Vol. III, p. 110.

† Plates 87, 88, 89.

‡ Plate 27, fig. 2.

§ I. 86. fig. 2.

* The first temple of the Sun was built at Kondara in Than, one of the most ancient places in India, by Rajah Mandhata in the Saty-juga. The city is said then to have covered many square miles and to have contained a pnplation of 2,50,000. Than is sitnated in the part of Sourastra (Kathiwar) anounce as Deb Panchal, so called, it is said from having been the native country of Draupadi—Imperial Gazetteer, Vol. XXIII, p. 288.

সে সকল তথ্য এক পক্ষ মধ্যে সংগৃহীত হওয়া অসম্ভব। এই প্রবন্ধ লিখিবার জন্য মাত্র পক্ষকাল পূর্ব্বে পূজনীয় শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়াছি, তাই সেই সকল সংবাদ অত্যাবশ্যক হইলেও সংগ্রহ করিতে পারি নাই। ভরসা করি কোনো উদ্যমশীল লেখক এই বিষয়ের আলোচনা করিবেন।

সূর্য্যের নানাবিধ ধ্যান ও সূর্য্যের প্রতিমা-গঠন-প্রণালি * শাস্ত্রে লিখিত আছে। কিন্তু উত্তরবঙ্গে, বিশেষত বগুরা জেলায় আমি যে সকল সূর্য্যমূর্ত্তি দেখিয়াছি † সে গুলি অনেকাংশে নিম্নলিখিত ধ্যানানুমোদিত বলিয়াই অনুমান হয়।

(১) রক্তাব্জ যুগ্মাভয়দানহস্তং
কেয়ূর হারাঙ্গদকুণ্ডলাঢ্যম্।
মাণিক্যমৌলিং দিননাথমীড়ে
বন্ধুককান্তিং বিলসত্রিনেত্রম্॥

ত্রিনেত্র সম্বলিত মূর্ত্তি এপর্য্যন্ত আমার নয়ন গোচর হয় নাই। প্রস্তরমূর্ত্তি বন্ধুককান্তি কি না তাহাও নিরূপণ করা দুরূহ।

(২) রক্তাম্বুজাসনমশেষগুণৈকসিন্ধুং
ভানুং সমস্তজগতামধিপং ভজামি।
পদ্মদয়াভয় বরান্ দধতং করাব্জি-
র্মাণিক্য মৌলিমরুণাঙ্গরুচিং ত্রিনেত্রম্

বঙ্গে দ্বিভুজ, চতুর্ভুজ, সহচর সহ বা সহচরহীন নানাবিধ সূর্য্যমূর্ত্তি দেখা যাইতেছে এবং অনুসন্ধান করিলে আরোও অনেক রকম পাইবার সম্ভাবনা। কিছু দিন পূর্ব্বে আমি বগুরা জেলার আদমদীঘি থানার অন্তর্গত রাইকালী গ্রামের নিকটে একটি বৃহৎ সূর্য্যমূর্ত্তি পাইয়াছিলাম। মূর্ত্তিটী এত বড় যে অষ্টজন বলশালী ব্যক্তি অতিকষ্টে বৃক্ষতল হইতে স্থানান্তর করিয়াছিল। উল্লিখিত মূর্ত্তি স-সহচর সূর্য্যমূর্ত্তি। সূর্য্যদেব অসিচর্ম্মধারী, সপ্তাশ্বসংযোজিত, রথারূঢ়, সম্মুখে সারথী অরুণ রথচালনায় নিযুক্ত। পার্শ্বে চামরধারিগণ ব্যাজননিরত। তপনদেবের দুই হস্তে রক্তাব্জ বক্রভাবে উঠিয়া কর্ণের নিম্নে স্থান লাভ করিয়াছে। অপর দুই হস্ত বরাভয় সূচিত করিতেছে। অন্যান্য অঙ্গ যথোপযুক্ত রূপে কেয়ূরহার কুণ্ডল সুশোভিত চিকণ বহুমূল্য বস্ত্র যোদ্ধৃবেশের উপযুক্ত করিয়া দৃঢ়ভাবে পরিহিত, পদদ্বয় বুটের ন্যায় এক প্রকার পাদুকায় সমাবৃত। উত্তরবঙ্গে যে সকল সূর্য্যমূর্ত্তি আছে সে গুলির সন্ধান করিয়া একত্রে মিলাইয়া দেখিতে পারিলে, কোন অধ্যবসায়শীল ঐতিহাসিক হয় ত এ প্রদেশের এক যুগের রুচি ও বেশভূষার ইতিহাস লিখিবার উপকরণ সংগ্রহ করিতে পারিবেন।

মুঙ্গের, গয়া, পাটনা জেলা প্রভৃতি পশ্চিমোত্তর প্রদেশের নানাস্থানে কার্ত্তিক মাসে ছট্‌বরত্ নামে একটী ব্রত অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তাহা সূর্য্যব্রত বই আর কিছুই নয়। যে দিবসে ঐ ব্রত সম্পন্ন হয়, তাহার ছয় দিন পূর্ব্বাবধি ব্রতধারী ব্যক্তি মাত্রেই হবিষ্যান্ন ভোজন করে। পরে নির্দ্দিষ্ট

* প্রভাকরস্য প্রতিমামিদানীং শৃণুত দ্বিজাঃ।
রথস্থং কারয়েদ্ দেবং পদ্মহস্তং সুলোচনম্॥ ইত্যাদি
মৎস্যপুরাণ

† মৎসংগৃহীত সূর্য্য এবং অন্যান্য দেবমূর্ত্তি বগুরার উড্‌বরণ সাধারণ পুস্তকালয় গৃহে রক্ষিত হইয়াছে।

দিবসে সূর্য্যাস্তের প্রায় চারি দণ্ড পূর্ব্বে নানাবিধ পূজার দ্রব্য সঙ্গে লইয়া নদীতীরে উপস্থিত হয় ও তথায় যথাবিধানে মন্ত্রোচ্চারণ সহকারে ঐ সকল সামগ্রী নিবেদনাদি দ্বারা সূর্য্যপূজা সম্পাদন পূর্ব্বক নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া থাকে। কলিকাতায়ও ঐ সময়ে চাঁদপাল ও মল্লিকের ঘাটে হিন্দুস্থানীদিগকে মহাসমারোহ পূর্ব্বক এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে দেখা যায়।" * অধুনা বগুরা জেলায় সূর্য্যপূজার বিশেষ কোন আড়ম্বর নাই। তৈলিক, বানিয়া, গোয়াল প্রভৃতিরা এই পূজা করিয়া থাকে। ব্রতধারী প্রত্যূষে স্নান করিয়া সূর্য্যের অর্ঘ্য প্রদান করে এবং একটি তৈল-প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করে। সূর্য্যদেব যতক্ষণ অস্তাচলে গমন না করেন ব্রতধারীর ততক্ষণ বসিবার নিয়ম নাই। সূর্য্যাস্তের পর স্নানাদি করিয়া ব্রত সম্পন্ন করিতে হয়; প্রদীপও তখন নির্ব্বাপিত হয়। শুনিয়াছি, পাবনা এবং নাটোর অঞ্চলেও এইরূপ ব্রতের নিয়ম আছে। কোনো কোনো স্থানে প্রচলিত ছড়া এবং গানও এই সূর্য্যোৎসবে গীত হইয়া থাকে। সে গুলি সংগ্রহ করিতে পারিলে ভাল হয়। শুনিয়াছি মালদহে বিশেষ আড়ম্বরের সহিত সূর্য্যোৎসব সম্পন্ন করা হয়।

* ভারতবর্ষীয় উপাসকসম্প্রদায়, ২য় ভাগ, ২১২ পৃঃ।

বোম্বাই প্রদেশের মালি নামক স্থানে একটি সূর্য্যের মন্দির আছে। সূর্য্যদেব তথায় মাধব রায় নামে পূজিত হইয়া থাকেন। * শুনিয়াছি মালদহের কোন কোন স্থানে সূর্য্যদেব 'ধর্ম্ম' বলিয়া পূজিত। সূর্য্য যাঁহাদের ইষ্টদেবতা, তাঁহাদের নাম সৌর। তাঁহারা গলদেশে স্ফটিক-মালা ধারণ করেন ও ললাটে একরূপ রক্তচন্দনের তিলক করিয়া থাকেন। তাঁহারা রবিবারে ও সংক্রান্তির দিবসে লবণ-বর্জ্জিত একাহার করেন। কোন দিন সূর্য্যদর্শন না করিয়া জল গ্রহণ করেন না।

আমরা স্মরণাতীত কাল হইতে সূর্য্যপূজার সহিত যেরূপ ভাবে জড়িত, যদিও সে হিসাবে বঙ্গদেশে সূর্য্যপূজার প্রচলন আর তেমন নাই, তথাপি ভরসা হয় উত্তরবঙ্গের সাহিত্যিকগণ এ বিষয়ে একটু যত্নবান হইলে আগামী বর্ষে অনেক জ্ঞাতব্য ও নূতন আবিষ্কারের কাহিনী শুনিয়া শিক্ষা লাভ করিতে পারা যাইবে। সেই দিকে যাহাতে সুধী-সমাজের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, এই আশাতেই বর্ত্তমান প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে।

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য।

* There is a temple of the Sun-god at Mali in the province of Bombay, which is worshipped there under the name of Madhab Rai.—Imperial Gazetteer, Vol. XVI, p. 21

বঙ্গদেশে হিন্দুর সংখ্যা।

("ধ্বংসোম্মুখ জাতি"র প্রতিবাদ)।

১৮৯১ অব্দের আদম-সুমারীর পর হইতে একটা রব উঠিয়াছে যে, বঙ্গদেশে হিন্দুর সংখ্যা দিন দিন হ্রাস পাইতেছে। সেবারকার আদম-সুমারী-ব্যাপারের অধ্যক্ষ মিঃ সি, জে, ওডোনেল সর্ব্বপ্রথম এই কিম্বদন্তীর প্রচার করেন। তিনি অতি বিজ্ঞের ন্যায় গণনা করিয়া বলেন যে, হিন্দুর সংখ্যা দিন দিন যেরূপ কমিতেছে, তাহাতে আর সাড়ে ছয় শত বৎসর পরে বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যায় কুত্রাপি হিন্দুর অস্তিত্ব থাকিবে না—সব মুসলমানময় হইয়া যাইবে; আর পূর্ব্ববঙ্গ ৪ শত বৎসর পরে হিন্দুশূন্য হইবে। বলা বাহুল্য, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ এই ভবিষ্যদ্বাণীর অন্তরালে রাজনীতিক উদ্দেশ্যের আভাস দেখিয়া মনে মনে কিঞ্চিৎ হাসিয়াছিলেন; সাধারণ শিক্ষিত লোকে এ বিষয়ে মনোযোগ করা আবশ্যক বলিয়া মনে করিলেন না।

১৯০১ অব্দের আদম-সুমারীর বিবরণে হিন্দুর সংখ্যা-হ্রাস অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যা-বৃদ্ধির বিষয় বিশেষরূপে আলোচিত হইল। মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি দেখিয়া কেহ কেহ শঙ্কিত হইলেন। তাহার পর বঙ্গ-ভঙ্গের আন্দোলন-প্রসঙ্গে পূর্ব্ববঙ্গের নানা স্থানে হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা হইল। পূর্ব্ববঙ্গে চিরকাল—অন্ততঃ শতাধিক বর্ষকাল—হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যা অধিক হইলেও ঐ অঞ্চলে হিন্দু-মুসলমানে কখনই বিরোধ ছিল না। কিন্তু এবার রাজনীতিচক্রের আবর্ত্তে পড়িয়া অঘটন-সংঘটন হইল। তখন পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দু-জন-শক্তির অল্পতা সম্বন্ধে দেশবাসীর প্রথম দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। এই সুযোগে অবসর-প্রাপ্ত লেফ্‌টেন্যাণ্ট কর্ণেল শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় "A Dying Race" নাম দিয়া "বেঙ্গলী" পত্রে একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধমালা প্রকাশ করিলেন। ঐ প্রবন্ধমালার অনুবাদ "ধ্বংসোম্মুখ জাতি" নাম দিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকার সাহায্যেও হিন্দুজাতির ধ্বংসোম্মুখতা ঘোষণা করা হইয়াছে। ফলে অর্দ্ধশিক্ষিত জনসমাজে একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে। অনেকে মনে করিতেছেন যে, ওডোনেল সাহেবের ভবিষ্যদ্বাণী বুঝি বা ৫০ বৎসরের মধ্যেই ফলবতী হয়। কর্ণেল মুখোপাধ্যায় হিন্দুজাতির ধ্বংসবিষয়িণী কিম্বদন্তীর প্রচারে যেরূপ উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন, তাহাতে এরূপ আতঙ্কের সঞ্চার না হওয়াই বিচিত্র। কিন্তু প্রকৃতই কি বাঙ্গালায় হিন্দুর সংখ্যা-হ্রাস ঘটিতেছে? বিচার করিয়া দেখা যাউক।

১৮৭২ অব্দের আদম-সুমারীর বিবরণ-গ্রন্থে দেখিতে পাই, সেবার খাস বাঙ্গালায় হিন্দু-মুসলমানের সংখ্যা এইরূপ গণিত হইয়াছিল; যথা—

হিন্দু ১,৮১,০০,৪৩৮

মুসলমান ১,৭৬,০৯,১৩৫

প্রথমবারের আদম-সুমারীর সময় খাস বাঙ্গালা বা 'বেঙ্গল প্রপার' বলিতে বর্দ্ধমান, প্রেসিডেন্সি, রাজশাহী, ঢাকা, চট্টগ্রাম, এই কয়টি বিভাগ ও মালদহ, শ্রীহট্ট, কাছাড় প্রভৃতি জেলার সমাবেশ বুঝাইত। অবশ্য রাজপুরুষেরাই এইরূপ বুঝিতেন। কিন্তু সামাজিক বাঙ্গালীর নিকট বঙ্গদেশের বিস্তার আর একটু অধিক ছিল। মানভূম ও কুচবিহার প্রদেশও তাঁহাদিগের নিকট বঙ্গদেশের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া পরিগণিত ছিল। কারণ মানভূমের তের লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে প্রায় ৯৷৷০ লক্ষ লোকের মাতৃভাষা বাঙ্গালা ও কুচবিহারের শতকরা ৯৯ জন বাঙ্গালা-ভাষাভাষী। এই সকল প্রদেশেরই লোকের সঙ্গে বাঙ্গালীর ঘনিষ্ঠ সামাজিক সম্বন্ধ বিদ্যমান। সুতরাং সরকারি বেঙ্গল প্রপারের মোহে মুগ্ধ না হইয়া যদি আমরা প্রকৃত সামাজিক বঙ্গের জনগণনার ফলের প্রতি মনোযোগ করি, তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে, ১৮৭২ অব্দে হিন্দু-মুসলমানের সংখ্যা এইরূপ পরিগণিত হইয়াছিল :—

হিন্দু

বেঙ্গল প্রপার	১,৮১,০০,৪৩৮
মানভূম	৮,২৭,৯৩৬
কুচবিহার	৩,৮০,৫০০
	১,৯৩,০৮,৮৬৪
মুসলমান	১,৭৬,০৯,১৩৫
	৩৩,৬২২
	১,৫২,০০০
	১,৭৭,৯৪,৭৫৭

কিন্তু ইহাই সেবারকার হিন্দু-মুসলমানের প্রকৃত সংখ্যা নহে। কারণ, আদম-সুমারীর বিবরণে স্বীকৃত হইয়াছে যে, প্রথমবারে নোয়াখালি, চট্টগ্রাম, বাখরগঞ্জ, ময়মনসিংহ ও যশোহরের অনেক স্থানে লোকের গণনা হয় নাই। এই সকল স্থানই মুসলমান-প্রধান। এ বিষয়ে রাজপুরুষেরা যে সকল কথা লিখিয়াছেন, তাহা হইতে দৃঢ় প্রতীতি হয় যে, সেবারকার লোক-গণনায় প্রায় ৭ লক্ষ মুসলমান বাদ পড়িয়াছিল। সেই সঙ্গে কিছু হিন্দুরও বাদ পড়িবার সম্ভাবনা। মুসলমান-সমাজে শিক্ষিত লোকের অভাব হেতু মুসলমান-প্রধান স্থানে লোক-গণনার সুব্যবস্থা করিতে পারা যায় নাই। এই তথ্যের প্রতি মনোযোগ করিয়া বিচার করিলে প্রথমবারের আদম-সুমারী-কালে সামাজিক বঙ্গে হিন্দু-মুসলমানের সংখ্যা মোটামুটি এইরূপ ছিল, দৃষ্ট হইবে :—

হিন্দু	১,৯৩,৫০,০০০
মুসলমান	১,৮৪,৯৪,৭৫৭
	৮,৫৫,২৪৩ জন হিন্দু অধিক।

দ্বিতীয়বারের আদম-সুমারীতে মুসলমান-প্রধান স্থানে শতকরা প্রায় তিন জন লোক গণনায় বাদ পড়িয়াছিল বলিয়া আদম-সুমারীর অধ্যক্ষ মহাশয় অনুমান করিয়াছেন। তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া গণনা করিলে সামাজিক বঙ্গের লোক-গণনার ফল দ্বিতীয় বারে এইরূপ হইয়াছিল, দেখা যায় :—

হিন্দু	২,০৩,৩৩,৫০০
মুসলমান	১,৯৭,৩০,৭৪২
	৬,০২,৭৫৮ জন হিন্দু অধিক।

তৃতীয়বারের আদম-সুমারীতে অধ্যক্ষ ওডোনেল সাহেব একটি গোল করিয়াছিলেন। হিন্দুর সংখ্যা খুব কমিয়াছে,

ইহা দেখাইবার অভিপ্রায়ে তিনি নিম্ন-শ্রেণীর অন্যূন ২॥০ লক্ষ হিন্দুকে, তাহারা ভূত-প্রেতের পূজা করে, এই অপরাধে হিন্দু-সমাজ হইতে বাদ দিয়াছিলেন। কারণ, তাহার মতে ভূত-প্রেতের উদ্দেশে পূজা দেওয়া বৈদিক ধর্ম্মের অঙ্গ নহে! এইরূপ বিচারে যে ২॥০ লক্ষ হিন্দু বাদ পড়িয়াছিল, তাহাদিগকে লইয়া গণনা করিলে তৃতীয় বারের জন-গণনার ফল এইরূপ দাঁড়ায়—

হিন্দু	২,১৪,৫৮,৬৩২
মুসলমান	২,১৪,৬৫,২৮৬
	৬, ৬৫৪ জন মুসলমান অধিক।

চতুর্থবারে জন-গণনায় সবিশেষ কোনও গোল ঘটে নাই। সেবার কেবল ৮৩.০ হাজার নিম্নশ্রেণীর হিন্দু পূর্ব্ববারের ন্যায় বাদ পড়িয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়। তাহাদিগকে হিন্দুসমাজ হইতে বাদ না দিলে চতুর্থবারে সামাজিক বঙ্গে হিন্দু-মুসলমানের সংখ্যা এইরূপ ছিল, দেখা যায়:—

হিন্দু	২,২৭,৪৩,৪১০
মুসলমান	২,৩৩,২৬,৯৮০
	৫,৮৩,৫৭০ জন মুসলমান অধিক।

এই হিসাবে দেখা যাইতেছে যে, ত্রিশবৎসর পূর্ব্বে সামাজিক বঙ্গে মুসলমানের অপেক্ষা হিন্দুর সংখ্যা প্রায় ৮॥০ লক্ষ অধিক ছিল। ২০ বৎসর পরে হিন্দু-মুসলমানের সংখ্যা প্রায় সমান হইয়াছিল। শেষ আদম-সুমারীর গণনায় মুসলমানের সংখ্যা হিন্দুর অপেক্ষা প্রায় ৬ লক্ষ বাড়িয়াছে। অর্থাৎ মোটের উপর ত্রিশ বৎসরে হিন্দুর অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যা ১৪ লক্ষ ৩৮ হাজার ১৮৩ জন বাড়িয়াছে।

সামাজিক বঙ্গের বিগত চারি বারের লোক-গণনার ইহাই প্রকৃত ফল। বলা বাহুল্য, এই সংখ্যায় বঙ্গদেশস্থ হিন্দু-মুসলমান-মাত্রই অন্তর্ভূত হইয়াছে; কিন্তু বঙ্গদেশের হিন্দু মুসলমান-মাত্রই বাঙ্গালী হিন্দু-মুসলমান নহে। সামাজিক বঙ্গেও বিহার, উড়িষ্যা ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের অনেক হিন্দু ও মুসলমান জীবিকার্জ্জনাদি উপলক্ষে স্থায়ী ও অস্থায়ী ভাবে বাস করিয়া থাকেন। সেইরূপ আবার অনেক বাঙ্গালী হিন্দু ও মুসলমান সামাজিক বঙ্গের বহিঃস্থ নানা স্থানে স্থায়ী ও অস্থায়ী ভাবে বাস করিয়া জীবিকার্জ্জনাদি করিয়া থাকেন। সুতরাং সামাজিক বঙ্গের হিন্দু-মুসলমান-সংখ্যা হইতে বৈদেশিক হিন্দু-মুসলমানের সংখ্যা বাদ দিয়া, অবশিষ্ট সংখ্যায় প্রবাসী বাঙ্গালীদিগের সংখ্যা যোগ না করিলে প্রকৃত বাঙ্গালী হিন্দু ও বাঙ্গালী মুসলমানের হ্রাস-বৃদ্ধির পরিমাণ নির্ণীত হইতে পারে না। আদম-সুমারীর বিবরণ-গ্রন্থে মুদ্রিত ভাষা-বিষয়ক তালিকাসমূহের সাহায্যে খাঁটি বাঙ্গালী হিন্দু-মুসলমানের সংখ্যা নির্ণয় করিয়া নিম্নে প্রকাশ করা গেল:—

	হিন্দু।	মুসলমান।
১৮৭২ অঃ	১,৯২,১৩,০০০	১,৮৫,৬৯,৮০০
১৮৮১ অঃ	১,৯৯,২৮,২০০	১,৯৪,৭৯,৮০০
১৮৯১ অঃ	২,০৬,৫৯,৪১২	২,১২,৬৫,২৮৬
১৯০১ অঃ	২,২০,৫১,৫০০	২১,৩১,৭৯,০৯৯

বৃদ্ধির পরিমাণ

	হিন্দু	মুসলমান
১৮৮১	—৭,১৫,২০০	৯,১০,০৫০
১৮৯১	—৭,৩১,২১২	১৭,৮৫,৪৩৬
১৯০১	—১৩,৯১,০৮৮	১৯,১৩,৮১৩

উল্লিখিত তালিকায় নেত্রপাত করিলে দৃষ্ট হইবে যে, বাঙ্গালী হিন্দুর বৃদ্ধির পরিমাণ বাঙ্গালী মুসলমানের অপেক্ষা অল্প হইলেও হিন্দুর বংশ ক্ষয়োন্মুখ নহে,—উত্তরোত্তর বর্দ্ধনোন্মুখ। ১৮৯১ অব্দে মুসলমান যখন পূর্ব্ববারের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ বাড়িয়াছিল, তখন হিন্দুর বৃদ্ধি নাম মাত্র হইয়াছিল, কিন্তু ১৯০১ অব্দের গণনায় হিন্দুর বৃদ্ধি পূর্ব্বাপেক্ষা প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছিল, কিন্তু সেবার মুসলমানের বৃদ্ধি অধিক হয় নাই; বরং পূর্ব্ব তুলনায় মুসলমানের সংখ্যা শতকরা ·১৭ হিসাবে হ্রাস পাইয়াছে! বাঙ্গালী হিন্দুর এই দ্বিগুণ বৃদ্ধি কি ধ্বংসোন্মুখতার লক্ষণ?

কর্ণেল মুখোপাধ্যায় বঙ্গদেশস্থ হিন্দু-মুসলমানের (বাঙ্গালী হিন্দু-মুসলমানের নহে) গণনাফল উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছেন যে, "ত্রিশবৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালা দেশে হিন্দুদিগের সংখ্যা মুসলমান অপেক্ষা ৪ লক্ষ অধিক ছিল। ৩০ বৎসর পরে সেই মুসলমানের সংখ্যা হিন্দু অপেক্ষা ২৬ লক্ষ বেশী হইয়াছে।" অর্থাৎ তাঁহার মতে ত্রিশ বৎসরে মুসলমানের সংখ্যা হিন্দুর অপেক্ষা মোটের উপর ২৬+৪=৩০ লক্ষ বাড়িয়াছে। কিন্তু আমি উপরে খাঁটি বাঙ্গালী হিন্দু-মুসলমানের যে সংখ্যা উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে মনোযোগ করিলে দৃষ্ট হইবে যে, বাঙ্গালী মুসলমানের বৃদ্ধির পরিমাণ ১৭ লক্ষ ৭০৮০ হাজারের অপেক্ষা অধিক নহে।

পাঠক জিজ্ঞাসা করিবেন যে, ত্রিশ বৎসরে বাঙ্গালী হিন্দু অপেক্ষা বাঙ্গালী মুসলমানের সংখ্যা ১৭ লক্ষ ৭০৮০ হাজারই বা বাড়িল কেন? হিন্দু জনসংখ্যা-বিষয়ে মুসলমানের অপেক্ষা অগ্রবর্ত্তী থাকিয়াও ত্রিশ বৎসরের মধ্যে কেন এরূপ পশ্চাৎপদ হইল? এই প্রশ্নের উত্তরে মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলেন, —"স্বধর্ম্মী ও স্বজাতির প্রতি দুর্ব্যবহারের মূলেই আমাদিগের ধ্বংসলাভের বীজ নিহিত আছে।" অর্থাৎ নমঃশূদ্রাদি নিম্ন-শ্রেণীর হিন্দুদিগের স্পৃষ্ট জল উচ্চবর্ণের হিন্দুগণ সেবন করেন না বলিয়াই হিন্দু জাতি ধ্বংসোন্মুখ হইয়াছে! অবশ্য নমঃশূদ্রাদির প্রতি ঘৃণা বা দুর্ব্যবহারের পক্ষপাতী কোনও শিক্ষিত ব্যক্তিই হইতে পারেন না, বরং তাহাদিগের অবস্থার উন্নতি বিধানের জন্য সকলেরই বিশেষভাবে যত্নপরায়ণ হওয়া উচিত, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাই বলিয়া নমঃশূদ্রের জলসেবন বা অন্যরূপে তাহাদের উন্নতি-সাধন করিলেই হিন্দুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে—এমন কথায় কেমন করিয়া বিশ্বাস করিব? কর্ণেল মুখোপাধ্যায় একজন বহুদর্শী চিকিৎসক বলিয়া জনসমাজে প্রসিদ্ধ; তিনি বংশবৃদ্ধির জন্য এইরূপ ব্যবস্থা-পত্রের অবতারণা করিবেন, এমন আশা আমরা করি নাই।

দীর্ঘকাল মানবদেহতত্ত্ব ও রোগতত্ত্বের আলোচনা করিয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, বঙ্গায় হিন্দুর সংখ্যা-হ্রাস-ব্যাপারে "জাতি-বিচারের" কার্য্যকারিতাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছে। কিন্তু এবিষয়ে তদানীন্তন স্যানিটারি কমিশনার মহোদয়গণের মত দেশবাসীর নিকট নিতান্ত উপেক্ষণীয় বলিয়া

বিবেচিত হইবে না। তাঁহাদিগের রিপোর্টের সার সংগ্রহ করিয়া আদম-সুমারীর বিবরণ-লেখকেরা এই ঘটনার যে কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা এই—১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু-প্রধান পশ্চিমবঙ্গে ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রাদুর্ভাব হয়। সেই জ্বর ক্রমশঃ মহামারীর আকার ধারণ করে। সেই সময়ে যাহারা জ্বরাক্রান্ত হইয়াছিল, ২৪ ঘণ্টা হইতে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তাহাদের প্রাণাত্যয় ঘটিত। পশ্চিমবঙ্গ-বাসী ১৮৮৭ অব্দ পর্য্যন্ত এই জ্বরের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করেন নাই। এই মহামারী সরকারি কাগজ পত্রে The Great Burdwan fever নামে আখ্যাত হইয়াছে। মিঃ রিজলী বলেন,—

The decline of nearly 3 per cent. in West Bengal during these years was caused by the epidemic of Burdwan fever which ravaged the alluvial tracts of the division and was estimated at the time to have caused about two million deaths besides materially impairing the reproductive capacity of the population.

এই মহামারীতে প্রায় ২০ লক্ষ লোক অকালে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল ও দীর্ঘকাল রোগ ভোগ করায় পশ্চিমবঙ্গবাসীর বংশ-বৃদ্ধির শক্তিও হ্রাস পাইয়াছে। এই মহা-মারীর বিস্তারিত বর্ণনা ১৮৮১ ও ৯১ অব্দের আদম-সুমারীর বিবরণ গ্রন্থে পাঠক দেখিতে পাইবেন। পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদিগের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা অষ্টমাংশের অধিক নহে। সুতরাং ঐ আধিদৈবিক বিপদে বিনষ্ট হিন্দুর সংখ্যা ১৭॥০ লক্ষের অপেক্ষা ন্যূন ছিল না। ঐ আধিদৈবিক বিপদে পতিত না হইলে হিন্দুর বৃদ্ধির গতি এরূপ কুণ্ঠিত হইত না। মুসলমানপ্রধান পূর্ব্ব-বঙ্গে এরূপ দীর্ঘকালব্যাপী মহামারী ও ম্যালেরিয়ার কখনও সঞ্চার হয় নাই। কাজেই নির্ব্বিঘ্নে মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৮৯১ অব্দে আদম-সুমারীর বিবরণী-লেখক মিঃ ওডোনেল লিখিয়া-ছিলেন,—

There is nothing to mar the general progress of the population of Eastern Bengal, every district and tract showing a great and in most cases a very great increase.

এখন কর্ণেল মুখোপাধ্যায় মহোদয়ের প্রতি জিজ্ঞাস্য এই যে, তিনি সমাজ-সংস্কারের আগ্রহাধিক্যে রাজপুরুষদিগের এ সকল মন্তব্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার অবসর পান নাই, অথবা তাঁহাদিগের মন্তব্যকে ভিত্তিহীন অলীক উপন্যাস বলিয়া তিনি তদুল্লেখে উপেক্ষা প্রকাশ করিয়াছেন? অথবা হিন্দুপ্রধান পশ্চিমবঙ্গের মহামারীকে তিনি হিন্দুর জাতি-বিচার-প্রথারই গৌণ ফল বলিয়া মনে করেন?

ইতঃপূর্ব্বে বঙ্গীয় হিন্দুর বৃদ্ধির পরিমাণ-বিষয়ক যে তালিকা প্রকাশ করিয়াছি, তৎপ্রতি নেত্রপাত করিলে পাঠক দেখিতে পাইবেন যে, হিন্দুর বৃদ্ধির পরিমাণ দিন দিন বাড়িতেছে। হিন্দুপ্রধান পশ্চিম-বঙ্গে যতদিন মহামারীর প্রকোপ অত্যন্ত

অধিক ছিল, ততদিন হিন্দুর বৃদ্ধি নামমাত্র হইয়াছে এবং সেই সুযোগে প্রকৃতির আনুকূল্য লাভ করিয়া পূর্ব্ববঙ্গের মুসলমান-সমাজ জন-সংখ্যা-বিষয়ে অনেকটা অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছেন। ১৮৯১ অব্দের পর পশ্চিমবঙ্গে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ হ্রাস পাইবামাত্র হিন্দুর বৃদ্ধির পরিমাণ দ্বিগুণ বাড়িয়াছে। ১৮৯১ অব্দে হিন্দু মুসলমানের বৃদ্ধি-পরিমাণের মধ্যে যে ১০॥০ লক্ষের পার্থক্য ছিল, তাহা ১৯০১ অব্দে কমিয়া ৫।০ লক্ষে পরিণত হইয়াছে। ফলতঃ মহামারীর কবল হইতে উদ্ধার পাইবার পর হইতেই হিন্দুজাতি জন-সংখ্যা-বিষয়ে মুসলমানের সমীপবর্ত্তী হইবার চেষ্টা করিয়াছে। ইহা কি ধ্বংসোন্মুখ জাতির লক্ষণ?

কর্ণেল মুখোপাধ্যায়ের নিজের গণনা-মতেই প্রথমবারের আদম-সুমারীর পর যে হিন্দুজাতি দেড় লক্ষের অধিক বৃদ্ধি পায় নাই, সেই হিন্দুজাতি দ্বিতীয় ও তৃতীয় আদম-সুমারীর পর যথাক্রমে ৭ লক্ষ ও ১৪ লক্ষ বাড়িয়াছিল। এইরূপ উত্তরোত্তর বর্দ্ধনশীল জাতিকে তিনি "ধ্বংসোন্মুখ" নামে অভিহিত করিয়াছেন। ইহা তাঁহার অত্যুক্তি-প্রিয়তার পরিচায়ক, অথবা দেশবাসীর হৃদয়ে অলীক আতঙ্কের সঞ্চার-চেষ্টার নিদর্শন? হিন্দু আধিদৈবিক বিপদে পতিত হওয়ায় কিছু দিনের জন্য তাহার উন্নতির গতি কুণ্ঠিত হইয়াছিল। সেই অবসরে মুসলমান বহু পরিমাণে অগ্রসর হইতে পারিয়াছে বলিয়াই কি হিন্দুকে 'ধ্বংসোন্মুখ' জাতি নামে অভিহিত করা ন্যায়সঙ্গত? হিন্দুর বৃদ্ধির হার দ্বিগুণ বাড়িয়াছে দেখিয়াও তিনি হিন্দুসমাজকে "ক্ষয়রোগগ্রস্ত" রোগীর সহিত তুলিত করিয়াছেন। মনে করুন রাম দীর্ঘকাল রোগ ভোগ করায় ক্ষীণকায় হইয়াছিল; রোগ-মুক্তির পর সে ক্রমেই অধিকতর পুষ্টিলাভ করিতেছে, কিন্তু এখনও শ্যামের ন্যায় সে বলিষ্ঠ ও সুস্থকায় হইতে পারে নাই—এরূপ অবস্থায় কি রামকে কেহ ক্ষয়রোগগ্রস্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারেন? কর্ণেল মুখোপাধ্যায় এ বিষয়ে চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া স্বীয় মতের সমর্থন করিলে আমরা উপকৃত হইব।

"ধ্বংসোন্মুখ জাতি"-নামক পুস্তকের প্রথম পৃষ্ঠায় মুখোপাধ্যায় মহাশয় খাস বাঙ্গালার জনগণনার যে ফল উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা এই ঃ—

১৮৭২ অঃ	হিন্দু	১,৭১,০০,০০০
,,	মুসলমান	১,৬৭,০০,০০০

১৮৭২ অব্দের আদমসুমারীর বিবরণীতে দৃষ্টিপাত করিলে পাঠক দেখিতে পাইবেন যে, এই সংখ্যায় মানভূম, শ্রীহট্ট, কাছাড় ও কুচবিহারের অধিবাসিগণ স্থান লাভ করে নাই—কিন্তু মালদহবাসীর সংখ্যা উহার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। অভিজ্ঞ পাঠকের অবিদিত নহে যে, মালদহ অপেক্ষা মানভূম ও শ্রীহট্টে বাঙ্গালীর সংখ্যা অধিক। তথাপি কর্ণেল মুখোপাধ্যায় মালদহের অধিবাসীকে বাঙ্গালীর অন্তর্ভুক্ত করিয়া মানভূম ও শ্রীহট্টবাসীকে বঙ্গীয় সমাজ হইতে বাদ দিয়াছেন। তিনি কেন এরূপ করিলেন, দয়া করিয়া বুঝাইয়া দিবেন কি?

তাহার পর ১৮৮১ অব্দের হিসাব। ঐ অব্দের জন-গণনার ফল লিপিবদ্ধ করিবার

সময় মুখোপাধ্যায় মহাশয় মালদহবাসীর সংখ্যা খাস বাঙ্গালার জন সংখ্যা হইতে বাদ দিয়াছেন! হঠাৎ তিনি মালদহবাসীর প্রতি এরূপ বিরূপ হইলেন কেন, বুঝিলাম না। কিন্তু মালদহবাসীকে একবার বঙ্গীয় সমাজভুক্ত ও পর বারে "সমাজচ্যুত" করিয়া জন-গণনার ফল প্রকাশ করায়, হিন্দুর সংখ্যা আশানুরূপ বৃদ্ধি পায় নাই, ইহা প্রতিপন্ন করিবার সুবিধা হইয়াছে সত্য; কিন্তু এইরূপ বিচার-পদ্ধতি কি ন্যায়-সঙ্গত?

পূর্ব্ববারের ন্যায় মালদহবাসীর সংখ্যা ধরিয়া গণনা করিলে ১৮৮১ অব্দের ফল এইরূপ হইত:—

হিন্দু ১,৭৬,৩৩,২৭৩
মুসলমান ১,৮১,৯২,৯৩৬

৫,৫৯,৬৬৩ জন মুসলমান অধিক।

৯ বৎসরে বৃদ্ধির পরিমাণ—

হিন্দু ৫।০ লক্ষ।
মুসলমান ১৫ লক্ষ।

অর্থাৎ মুসলমানের বৃদ্ধি হিন্দুর দ্বিগুণ অধিক।

মানভূম, শ্রীহট্ট, কাছাড় ও কুচবিহার প্রদেশে মুসলমানের অপেক্ষা হিন্দুর সংখ্যা অনেক অধিক। সেই সকল সংখ্যা যোগ করিয়া গণনা করিলে মুসলমানের অপেক্ষা হিন্দুরই আধিক্য দৃষ্ট হইত এবং প্রকৃত সামাজিক বঙ্গের জন-গণনার ফল পাওয়া যাইত—ইহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু কর্ণেল মুখোপাধ্যায় সে পন্থা অবলম্বন করা সুবিধাজনক বিবেচনা করেন নাই। শুদ্ধ তাহাই নহে, দ্বিতীয় বারের জনগণনার অঙ্ক হইতে তিনি মালদহবাসীর সংখ্যাও বাদ দিয়াছেন। তাহার ফল কিরূপ দাঁড়াইয়াছে দেখুন:—

হিন্দু ১,৭২,৫০,০০০
মুসলমান ১,৭৯,০০,০০০

৬॥০ লক্ষ মুসলমান অধিক।

৯ বৎসরে বৃদ্ধির পরিমাণ—

হিন্দু ১,৫০,০০০
মুসলমান ১২,০০,০০০

এই সময়ে, হিন্দুপ্রধান পশ্চিমবঙ্গে মহামারীর জন্য যে ভয়ঙ্কর লোকক্ষয় ঘটিয়াছিল, ঘুণাক্ষরেও তাহার উল্লেখ না করিয়া তিনি যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা এই—"অর্থাৎ এই দশ বৎসরে মুসলমানের সংখ্যা প্রায় ১২ লক্ষ বৃদ্ধি পাইয়াছিল, পক্ষান্তরে হিন্দুর সংখ্যা মোট দেড় লক্ষ বৃদ্ধি হইয়াছিল।" অর্থাৎ হিন্দুর অপেক্ষা মুসলমানের বৃদ্ধি ৮ গুণ অধিক হইয়াছিল! প্রথমবারে মালদহ ধরিয়া দ্বিতীয় বার উহা ছাড়িয়া দেওয়ায় হিন্দু-মুসলমানের বৃদ্ধির অনুপাতে এইরূপ পার্থক্য ঘটিয়াছে। ফলে হিন্দু-জাতিকে "ধ্বংসোন্মুখ" বলিয়া প্রতিপন্ন করিবারও সুবিধা হইয়াছে।

মুখোপাধ্যায় মহাশয় অবশ্যই হিন্দু-হিতৈষণার বশীভূত হইয়াই "ধ্বংসোন্মুখ জাতি"-নামধেয় পুস্তক প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার হিতৈষণা-প্রকাশের পদ্ধতি কিঞ্চিৎ অভিনব বলিয়া বোধ হইল। আদমসুমারীর তালিকায় যেথানে মুসলমানের সংখ্যা ১ কোটী ৭৮ লক্ষ ৬৩ হাজার

৪১১ বলিয়া লিখিত আছে তিনি স্বীয় পুস্তকে সেখানে স্থূলতঃ ১ কোটী ৭৯ লক্ষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন ; যেখানে ২ কোটী ১৯ লক্ষ ৫৪ হাজার ৯৭৭ আছে, সেখানে ২ কোটি ২০ লক্ষ ধরিয়াছেন। কিন্তু হিন্দুর সংখ্যা যেখানে আদম-সুমারীর তালিকায় ১ কোটী ৮০ লক্ষ ৬৮ হাজার ৬৫৫ আছে, সেখানে উহা ১ কোটী ৮০ লক্ষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মুসলমানের বেলায় কিঞ্চিন্ন্যূন ৫৫ হাজারেই লক্ষ পূর্ণ হইয়াছে। কিন্তু হিন্দুর বেলায় ৬৮০ হাজারেও লক্ষ পূর্ণ হয় নাই, ইহার কারণ কি? তাই বলিতেছিলাম, মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের হিতৈষণা-প্রকাশের পদ্ধতি কিছু অভিনব। মুসলমানের তুলনায় হিন্দুর শিক্ষা-দীক্ষা, ধনসম্পত্তি, স্বাস্থ্য-পরমায়ু প্রভৃতি নানা বিষয়ের নির্দ্দেশ প্রসঙ্গে তিনি এইরূপ হিতৈষণার পরিচয় দান করিয়াছেন। তাহার বিস্তারিত আলোচনার স্থান মাসিকপত্রের একটি প্রবন্ধে হইতে পারে না, যাহারা এ বিষয়ের সম্যক্ সমালোচনা দেখিবার অভিলায করেন তাঁহারা প্রবন্ধ-লেখক প্রণীত "হিন্দুজাতি কি ধ্বংসোন্মুখ"-নামক পুস্তক পাঠ করিবেন। *

শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর।

নীল-কণ্ঠ।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

যা বল আর যাই কও, এতটা ন্যাকাপণা কিন্তু রামির ভাল লাগে না! এতদিনের পরে এলেন দেখা কর্ত্তে, তা আবার "ইস্ত্রিকে" ন্যাজে বেঁধে! কেনরে বাপু, এত ভয় কিসের? পুরুষ মানুষত বটিস! ঐ যে কথায় বলে "ঢাকে ঢোলে বিয়ে, উলু দিতে মানা!" তা শাক দিয়ে মাছ ঢাকবে কত!" রামির মনে মনে এই প্রকার কত কথারই তোলা পাড়া হচ্চে! সে আজ ষোড়শীর কাছে কত বড়াই না করেছিল! সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে লক্ষ্মা ভাগ করে কত আশার পুটলিই না বেঁধেছিল, সে সবই যে বৃথা হ'ল! তাই শিকার-ভ্রষ্টা ব্যাঘ্রিনীর মত রামি রাগে গর গর করিতে করিতে ষোড়শীর কাছে গেল, উদ্দেশ্য,—মন্মথের উপর গায়ের ঝালটা ষোড়শীর সমক্ষে একবার ভাল করিয়া ঝাড়িবে, সরলাকেও অবশ্য ছাড়িবে না! ইহাতে কি লাভ, অসাক্ষাতে বা অন্যের সাক্ষাতে অনুপস্থিত আসামীর উদ্দেশে বচন-বাণ প্রয়োগে কাহার কি আসে যায়? রামি অত শত বুঝিতে চায় না—সে চায়, মনের রাগ বাহিরে প্রকাশ করিতে। তা যে আর চাপা যায় না! ইহাতে ষোড়শীত নিশ্চয়ই সুখী হইবে! সে সেই আশা করিয়াই আসিয়াছে, আরও মনে করিয়াছে

* এই পুস্তক এখনও যন্ত্রস্থ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

মুখ ভার ভার, চোখ ছল ছল দেখিবে—আর তার ক্রোধাগ্নিতে নিজের শাণিত-বচনের ঘৃতাহুতি দিবে, কিন্তু ও হরি,—ষোড়শী যে বেশ প্রফুল্ল ভাবেই রামির সহিত কথা বলিল! * * *

তবে কি ষোড়শী এই সাক্ষাতে সুখী হইয়াছে?

ষোড়শী একা একা বসিয়া আজিকার এই ব্যাপার সম্বন্ধে মনে মনে আলোচনা করিতেছিল, মন্মথের আবার এ কি খেলা? এ খেলায় যে সরলার কোন হাত নাই, সে সরলা নিতান্তই সরলা, ষোড়শী আজ তাহা বেশ বুঝিয়াছে, পূর্ব্বেও কিছু কিছু জানিত! এ বুদ্ধি মন্মথের—কিন্তু এ সুবুদ্ধি! সঙ্গী-শূন্য হইয়া ষোড়শীর মন পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষিনীর মত সদাই ছটফট করিতেছিল, অথচ মন্মথের সঙ্গও যে তাহার পক্ষে নিরাপদ নহে, তাহাও সে বেশ বুঝিয়াছে, তাই "মারিচ কুরঙ্গের" ন্যায় ষোড়শী বড় ইতস্ততে পড়িয়াছিল!

মন্মথ আজ যদি একা আসিত, মনে মনে যত দৃঢ় প্রতিজ্ঞাই ষোড়শী করুক না, সে যে নিশ্চয়ই অধিক সুখী হইত, এবং এই সুখের, এই আনন্দের দৈনিক আস্বাদনের জন্য যে তাহাকে একান্ত উৎসুক হইয়া থাকিতে হইত তাহাও সে বেশ উপলব্ধি করিল! যাইবার সময় মন্মথ ষোড়শীর বা সরলার গৃহে প্রায়ই এই প্রকার দেখা সাক্ষাতের প্রস্তাব করিয়া গিয়াছে। তা বেশ, এ প্রস্তাব ভাল! এত দিন একা, নিতান্তই একা, ষোড়শীর ইহা বড়ই অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল, তাই মন্মথের এই বন্দোবস্তে ষোড়শী মনে মনে একান্ত "সোয়াস্তি" অনুভব করিল!

কিন্তু, মন্মথের সহিত এ ভাবেও সর্ব্বদা দেখা সাক্ষাৎ কি ভাল? কেন তাহাতে আর দোষ কি? সরলা ত কাছেই থাকিবে!

অনেক দিনের পর ষোড়শীর মনে একটু হর্ষের সঞ্চার হইল! কিন্তু সে মুহূর্ত্তের জন্য! তখনই আবার স্বামীর এবারের ব্যবহার মনে পড়িল, সে অবজ্ঞা ষোড়শীর বড় বাজিয়াছে! কিন্তু সে চিন্তা বড় যন্ত্রণা-দায়ক, বড় মর্ম্মভেদী, তাই ষোড়শী বিষয়া-ন্তরে মন দিতে চেষ্টা করিল—আবার—"চন্দ্রশেখর" পড়িতে আরম্ভ করিল। "চন্দ্র-শেখর" ষোড়শীর এত ভাল লাগিত কেন? কে জানে কেন? ষোড়শী উহার ভাষা পর্য্যন্ত মুখস্থ করিয়াছিল। শৈবলিনী সত্যই কি প্রতাপকে ভুলিয়াছিল? সে কি ভুলিবার! শৈবলিনী প্রতাপকে ভুলে নাই, প্রতাপও শৈবলিনীকে ভুলিতে পারে নাই! ভুলিবে কেমন করিয়া? একবার ভাল বাসিলে কি ভুলা সহজ? "এ ভুল প্রাণের ভুল, মর্ম্মে বিজড়িত মূল!"

সহসা এ সব কথা কেন ষোড়শীর মনে আসিতেছে—সে তখন নিজের প্রতি বিরক্ত হইয়া পুস্তক বন্ধ করিল! আর আপনার মনে আপনি হাসিয়া যখন দ্বারের দিকে চাহিল, তখনও তাহার অধরে সে ক্ষীণ হাসির মলিন জ্যোতিঃ একেবারে লীন হয় নাই—রামি সে হাসির রেখা দেখিল, দেখিয়া তাহার পিত্ত জ্বলিয়া উঠিল! মন্মথ ও সরলার বিরুদ্ধে অভিযোগ-পত্রের যে খসড়া মনে মনে সে করিয়াছিল তাহা মুছিয়া

ফেলিল, ষোড়শীর হুজুরে তাহা আর পেশ করিল না! যে জালে, ষোড়শীকে জড়াইবে ভাবিয়াছিল তাহা আর ফেলিল না, গুটাইয়া লইল! ষোড়শী রামির ভাবান্তর লক্ষ্য করিল, তাহার কারণও কতকটা যে না বুঝিল তাহা নহে, কিন্তু ষোড়শী আজ আর সে প্রসঙ্গের আমল দিল না, কেবল বলিল রামি, "কাল যে আমার নিমন্ত্রণ—সঙ্গে যাবি ত!" রামি গম্ভীর ভাবে বলিল "বাড়ীতে আছে, রামি কুকুর অবশ্যি যাবে, কিন্তু কোথায়?"

"কেন, তোদের বাবুদের বাড়ী, তোদের বৌ-ঠাক্‌রুণ যে নিজে নেমতন্ন করেছেন—খেতে যাবিনে!" রামি তাড়াতাড়ি বলিল "তা যাব না? কিন্তু ভাত খেতে নয়!"—"তবে, কি খাবে? উনুনের ছাই না কি!" রামি কিঞ্চিৎ উত্তেজিত হইয়া উত্তর দিল—"না সেই উনুনমুখীর মাথা!"

"কি বল্লি, ছোট মুখে বড় কথা, কি বল্লি?" ষোড়শী সহসা রাগিয়া উঠিল, রামির এই ধৃষ্টতায় ষোড়শী বড়ই বিরক্ত হইয়া বলিল—!

"রামি, তোর ত দেখি বড় আস্পর্দ্ধা হয়েচে। ফের যদি অমন কথা আর মুখে আনবি ত ভাল হবে না!"

ষোড়শীর এ মূর্ত্তি রামি কখনই দেখে নাই! এতদিন বুঝে নাই, কিন্তু রামি আজ বুঝিল, যে মেঘে জল দেয়, সেই মেঘই সময়ে বাজ হানে! রামি সত্যসত্যই কিছু ভীত হইল, একথা যদি বাবুর বাড়ী পর্য্যন্ত যায়, তবে ত আর রক্ষা রাখবে না! তখন আঁটা-আঁটি দেখিয়া রামি কাঁদিয়া মাটি ভিজাইল! কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল 'আমার পোড়া কপাল, নইলে যার জন্যে চুরী করি সেই বলে চোর! আজ হ'তে কোন বেটি, আর ভদ্রলোকের কথায় থাকে! এই নাকে কাণে খৎ!" রামি সত্যই, নাকে খৎ দিল—! তার আকার-প্রকার, ভাব ভঙ্গী, দেখিয়া ষোড়শীর এই রাগের মুখেও হাসি আসিল—অতি কষ্টে ষোড়শী সে হাসি সম্বরণ করিয়া গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু মুখের হাসি, চোখে একটু খেলিল, চতুরা রামির তাহা বুঝিতে বাকি রহিল না! তখন তার বুক হইতে যেন একটা বোঝা নামিয়া গেল! এতক্ষণ বাবুদের নগদীর "জিন চামড়ার" ভয়ে সে চক্ষে সরিষার ফুল দেখিতেছিল।

আজ আর একবার রামি ষোড়শীর নিকট হারি মানিল! ষোড়শী, কখন মনোমোহিনী ভুবনেশ্বরী, কখন বা ধূমাবতী! রামি ষোড়শীকে চিনিতে পারিল না। স্বয়ং নীলকণ্ঠই চিনিতে পারেন নাই তা রামি ত রামি। কিন্তু রামি কাল-নাগিনী, সে অপমান সে তুলিয়া রাখিল, বিষ সঞ্চিত রহিল।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ।

জমিদারের গৃহে নিমন্ত্রণ—সুতরাং আয়োজন-উদ্যোগের কথায় আর কাজ কি? ষোড়শীর জন্য ষোড়শোপচারেই সরলা আহারের ব্যবস্থা করিয়াছিল, তা বড় ঘরে, সে আর বড় বেশী কথা কি? কিন্তু—সরলার আলাপ, আপ্যায়িত, যত্ন, আদর, বড় ঘরে বড় বেশী পাওয়া যায় না, তাই ষোড়শী আজ সরলার গুণে মুগ্ধ

হইয়াছে। মন্মথের জননীও ষোড়শীকে আজ জননী-সুলভ স্নেহ-মমতা দেখাইয়া, তাহার বিশুষ্ক হৃদয়কে আর্দ্র করিয়া দিয়াছেন! আজ ষোড়শীর হৃদয় সত্যই বড় সরস—সেই সরস ব্যবহারে, সরস রসিকতায় আজ সরলার গৃহখানি সমস্ত দিন আনন্দময় করিয়া, আনন্দময়ী ষোড়শী, সন্ধ্যার সময় গৃহে প্রত্যাগত হইল। রায়গৃহিণী বলিলেন, ষোড়শী ষোড়শীই বটে, সারাদিন বাড়ীখানা আলো করিয়া রাখিয়াছিল এখন যেন অন্ধকার করিয়া চলিয়া গেল। সরলা ভাবিল, এত গুণ, এত রূপ। ষোড়শীও আজ বড় প্রীতি লাভ করিয়াছে, তাহার এই স্ফূর্ত্তির অনেকগুলি কারণ ঘটিয়াছিল। ষোড়শীর ধারণা ছিল, জমিদার-গৃহিণী, বোধ হয়, তার উপর তেমন সদয় নন! মন্মথ সর্ব্বদা তাহাদের গৃহে যাতায়াত করিত, এজন্য গৃহিণী বড় বিরক্ত, ষোড়শীর কানে নানা সূত্রে এ কথা উঠিয়াছিল—ষোড়শী আজ বুঝিল যে সকল গুজবই মিথ্যা! তারপর সরলা যে ব্যবহার করিল, তাহাতে সে বাটীর কাহারো মনে যে কোন সন্দেহ নাই, ষোড়শী ইহা বেশ উপলব্ধি করিল, তাহার মনের মেঘ কাটিয়া গেল! ইদানীং এই আশঙ্কাতেই সে বাবুদের বাটীতে আসিত না, দুই একবার নিমন্ত্রণ সত্বেও দুই একটা ওজর করিয়া কাটাইয়া দিয়াছে। আজ তার সে লজ্জা ভাঙ্গিল! মনের ভিতর কেমন একটা শান্তি অনুভব করিল।

তারপর মন্মথের কথা! মন্মথের স্নেহ ত তেমনই প্রবল, সে ত তবে অবজ্ঞা করে নাই! বুকের পাথরখানা আজ সরিয়া গেল! মন্মথ নিজে আসিয়া ষোড়শীকে গাড়ীতে তুলিয়া দিল। এই অবকাশে উভয়ের দুই একটা কি কথা হইল।

ষোড়শীও বড় সুখের, বড় আনন্দের স্মৃতি লইয়া অন্ধকার গৃহে ফিরিল। রামি, রামি—দেখ দেখি, একবার রামির আক্কেল খানা, সন্ধ্যা উতরাইয়া গেল এ পর্য্যন্ত সন্ধ্যা পড়িল না—তুলসীতলায় প্রদীপটা পর্য্যন্ত দেওয়া হয় নাই! কূপের জলে তাড়াতাড়ি কাপড় কাচিয়া পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া, ক্ষিপ্র হস্তে, গৃহে গৃহে ধূপ-ধুনা, গঙ্গাজল দিয়া, তুলসী-বেদীতে প্রদীপ জ্বালিয়া, গললগ্নী-কৃতবাসে, ভক্তিভরে সাষ্টাঙ্গে ষোড়শী তুলসীতলায় প্রণাম করিল! তাহার পর ঘরে ঘরে প্রদীপ জ্বালিল—! ষোড়শী সহসা এমন করিয়া উঠিল কেন? আবার যে তুলসীতলায় যায়! কিছু হারাইয়াছে বুঝি! না, তা ত নয়! ঐ আবার প্রণাম করে যে! প্রতিদিন সন্ধ্যা দিবার সময় এই তুলসীতলায় প্রণাম করিতে করিতে ষোড়শী প্রবাসী স্বামীর কুশল কামনা করিয়া দেবতার নিকট কায়-মনোবাক্যে প্রার্থনা করে, আজ তাড়াতাড়িতে ষোড়শী সে প্রার্থনা করিতে ভুলিয়া গিয়াছিল। এমন ত হয় না! আজ কেন হইল—তিনি ভাল আছেন ত? ষোড়শী এবার বহুক্ষণ ধরিয়া তুলসীতলায় ধন্না দিয়া একে একে তেত্রিশ কোটী—প্রায় সকলগুলি বলিলেই হয়—অনেকগুলি দেবতার নিকট স্বামীর মঙ্গলের জন্য কামনা করিল, হরির লুট, ষোল কলা দেবতাদের তুষ্টির

জন্য কোনটি মানিতেই যোড়শী ভুলিল না।

অন্তরাল হইতে রামি এ সকলই দেখিল, আজ যে ঠাকরুণটির ঠাকুর দেবতার প্রতি বড় ভক্তি! কিসের জন্য "এত মাথা" কুটাকুটি হচ্চে! তবে "অবুধ" নিশ্চিতই ধরেছে! আচ্ছা দেখা যাক্! কোথাকার জল কোথায় মরে, কিন্তু রামি আর সহজে ওদিকে ঘেস্‌চেনা! সে আর হচ্চে না!

*　　*　　*　　*

যোড়শী সমস্ত কাজ ফেলিয়া স্বামীকে তাড়াতাড়ি একখানি পত্র লিখিল! মান-অভিমান ভুলিয়া নিতান্ত কাতর প্রাণে স্বামীকে অবিলম্বে কুশলসংবাদ জানাইবার জন্য মিনতি করিল।

রামির আশঙ্কা হইতেছিল, বিলম্বে আসার দরুণ আজ যোড়শী তাকে নিশ্চয়ই ভর্ৎসনা করিবে—কিন্তু যোড়শী তাকে কিছুই বলিল না, যোড়শীর মনটা ভাল ছিল না!

যোড়শী আজ সকাল সকাল শয়ন করিল। রামির শয়নের জন্য অন্য গৃহ নির্দ্দিষ্ট থাকিলেও নীলকণ্ঠ মফস্বলে যাওয়ার পর হইতে যোড়শী নিজের শয়ন গৃহেই রামির শয়নের ব্যবস্থা করিয়াছিল, কিন্তু আজ আর যোড়শী রামিকে ডাকিল না, রামি দুই একবার দুয়ার ঠেলিল, কিন্তু দেখিল ভিতর হইতে উহা বন্ধ! সে দুই একবার যোড়শীকে ডাকিলও, কিন্তু কোন উত্তর পাইল না—তবে ইহারই মধ্যে কি যোড়শী ঘুমাইয়া পড়িল! না, তা ত সম্ভব নয়,—রামির মাথায় তখন চট্ করিয়া কি একটা কথা ঢুকিল, সে আপন মনেই বলিল—রামির কাছেও গোপন! রামি ত আজ ঘুমাইবে না, আজ চতুরে চতুরে বুঝাপাড়া। (ক্রমশ)

শ্রীশৈলেশচন্দ্র মজুমদার।

গ্রন্থ-সমালোচনা।

ব্রহ্মপ্রবাসীর পত্র—শ্রীকালাচাঁদ দালাল প্রণীত। মূল্য আট আনা। আজকাল বাঙ্গালীর আর 'ঘর হইতে আঙ্গিনা বিদেশ' নহে। নানা কার্য্যোপলক্ষে আজ বাঙ্গালী নানা দেশে প্রবাসী। তাহার ফলে অনেকে সেই দেশ সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় প্রকাশ করিতেছেন। যে সূক্ষ্ম দৃষ্টি, যে সহৃদয়তা থাকিলে বিদেশ ও বিদেশীকে ঠিক মত জানিতে ও বুঝিতে পারা যায়, তাহার অভাব হইলে কেবলমাত্র ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লেখা হয়। এই যে প্রতি বৎসর য়ুরোপ, আমেরিকা হইতে দলে দলে "টুরিষ্ট" আসিতেছেন—তাহাদের অনেকেই ভ্রমণ-বৃত্তান্ত প্রকাশ করিতেছেন। এরূপ পুস্তকের কি মূল্য তাহা আমরা না জানি এমন নহে। কালাচাঁদ বাবুর পুস্তকপাঠে আমরা প্রীত হইয়াছি। তিনি ধীর ভাবে সমস্ত দেখিয়াছেন, এবং সহৃদয়তার সহিত সকল বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন তাই ক্ষুদ্র হইলেও তাঁর পুস্তকখানি মনোমত হইয়াছে। কিন্তু তিনি ব্রহ্মদেশ সম্বন্ধে আমাদের মনে যে কৌতূহল উদ্রেক করিয়াছেন, তাহা সম্যক্ পরিতৃপ্ত করেন নাই। তাঁর কাছে পাঠকের আরো পাইবার দাবী আছে।

কলিকাতা, ২৭ নং হরিতকি বাগান লেনস্থ কমার্শিয়াল প্রেসে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র আইচ দ্বারা মুদ্রিত।

বঙ্গদর্শন।

বঙ্গদেশে হিন্দুজাতির হ্রাসের কারণ এবং তাহার প্রতিকার।

হিন্দুজাতিক্ষয় নিবারণের উপায়-নির্দ্ধারণ।

যে সকল কারণে হিন্দুজাতি ক্ষয় হইতেছে তাহার বিস্তারিত বিচার করা হইল। এক্ষণে ঐ সকল কারণ নিবারণের উপায় নির্দ্ধারণ আবশ্যক। কারণগুলির বিচারের সময়ই তাহাদের নিবারণের উপায়-গুলির এক প্রকার নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এজন্য বড় আয়াসের প্রয়োজন নাই।

নিম্নলিখিত কারণে হিন্দুজাতির ক্ষয় হইতেছে—(১) হিন্দুপ্রধান স্থানে দুর্ভিক্ষের অধিক প্রকোপ; (২) হিন্দুজাতির স্বধর্ম্ম ত্যাগ ও পরধর্ম্ম গ্রহণ, (ক) মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ, (খ) খ্রীষ্টধর্ম্মগ্রহণ, (গ) বিলাত ফেরত হিন্দুগণের হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজত্যাগ; (৩) হিন্দুসমাজে বিধবা-বিবাহ নিষেধ; (৪) হিন্দুসমাজে বাল্যবিবাহ প্রচলন (সেন্সাস্ রিপোর্ট অনুসারে এই কয়টী প্রধান কারণ, তদ্ভিন্ন অপর কয়েকটী কারণ উল্লিখিত হইয়াছে); (৫) বিবাহিত স্ত্রীপুরুষের বয়োবৈষম্য; (৬) খাদ্য; (৭) ভ্রূণহত্যা; (৮) বালিকা লালনপালনে যত্নের অভাব, তজ্জন্য অধিক সংখ্যক বালিকাগণের মৃত্যু।

পূর্ব্বোক্ত কারণে হিন্দুজাতিক্ষয় সম্পূর্ণ রূপে হয় নাই। হিন্দুজাতিক্ষয়ের মূল ও প্রধান কারণ পাশ্চাত্য সংসর্গে হিন্দুসমাজের বিপ্লব। উপরি উক্ত কারণগুলি নিরাকরণের উপায় একে একে নির্দ্দেশ করা যাইতেছে।

হিন্দুর ধর্ম্মান্তর গ্রহণ নিবারণের উপায়।

(১) কি উপায়ে হিন্দুর ধর্ম্মান্তর গ্রহণ নিবারণ করা যাইতে পারে? অবৈধ প্রণয়ে পড়িয়া বা নীচ স্বার্থের জন্য যে সকল হিন্দু ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিবে তাহাদিগকে নিবারণ করিবার বা বাধা দিবার উপায় নাই বলিলেই হয়। 'চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী'। সুখের বিষয় এ প্রকারের নীচপ্রবৃত্তির লোক সকল সমাজেই অতি বিরল।

তৎপরে যে সকল লোক আমাদের সমাজের নিষ্ঠুর শাসন ও দুর্ব্যবহারে হিন্দু-সমাজ ও ধর্ম্ম ত্যাগ পূর্ব্বক ইস্‌লাম বা খ্রীষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করে, তাহাদিগকে বিরত করিবার

উপায় আমরা করিতে পারি। আজ কাল জগতে ব্যক্তিবিশেষের বা সম্প্রদায়বিশেষের প্রভুত্বের কাল গিয়াছে। এক্ষণে সকলেই সমাজে সমসত্বাধিকার লাভের জন্য লালায়িত। ইহা কালের নিয়ম। আমাদের সমাজস্থিত উচ্চবর্ণের সকল ব্যক্তিরই এ কথা বিশেষ ভাবে সর্ব্বদা মনে রাখা আবশ্যক। আর যে ধর্ম্মের প্রধান শিক্ষা জগতের সর্ব্বজীবের একত্ব—মানুষ হইতে সামান্য তৃণ পর্য্যন্তও সকলেই ভগবানের অংশ—সে ধর্ম্মে উচ্চ-নীচ বর্ণের মধ্যে বর্ত্তমান অবস্থায় কোন প্রভেদ থাকিতে পারে না। নীচজাতির প্রতি আমাদের ঘৃণা দূর করিতে হইবে। তাহাদের কাহারও যদি বিদ্যা বলে অবস্থার উন্নতি হয়, তবে সমাজেও তাহার উচ্চতর স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিতে হইবে। এবং যাহাতে তাহারা বিদ্যালাভের ও অন্যব্যবসাবলম্বনের অধিকার ও সুযোগ পায়, তাহার উপায় করিতে হইবে। তাহা হইলে তাহারা সানন্দে হিন্দুসমাজভুক্ত থাকিয়া উহাকে উত্তরোত্তর বলবান ও উন্নত করিবে।

এই সঙ্গে বিলাতফেরত হিন্দুদিগের বিষয় ভাবিয়া দেখা উচিত। তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই বিদ্বান্ ও উচ্চপদস্থ। তাঁহাদের হিন্দুসমাজত্যাগে আমাদের সমাজের বিশেষ অনিষ্ট হইতেছে। যাহাতে তাঁহারা হিন্দুসমাজভুক্ত থাকেন, তাহার উপায় নির্দ্ধারণ ও ব্যবস্থা করা নিতান্ত প্রয়োজন। যে সকল কারণে বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিতে সম্মত নহে, তন্মধ্যে প্রধান কারণ তাঁহাদের হিন্দুশাস্ত্র-নিষিদ্ধ খাদ্যগ্রহণ ও তাঁহাদের মধ্যে জাতিভেদ একেবারে উঠাইয়া দেওয়া। তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যেই যে কেবল জাতিভেদ নাই তাহা নহে, তাঁহাদের অপর জাতির সকলের সহ একত্র আহার করিতেও কোন আপত্তি নাই। হিন্দুশাস্ত্রে যে সকল দ্রব্য ভক্ষণ নিষেধ তাহা গ্রহণ আমাদের দেশের জলবায়ুর জন্য সহ্য হইতে পারে না। এরূপ ক্ষেত্রে বিলাতফেরতগণের উহা বর্জ্জন করাই উচিত। জাতিভেদ সম্বন্ধে এই বলা যাইতে পারে যে বর্ত্তমান হিন্দুসমাজে উহার আর পূর্ব্বের ন্যায় "আঁট" নাই। অনেক শিথিল হইয়াছে, তবে উহা একেবারে উঠাইয়া দেওয়া যাইতে পারে না। এরূপ অবস্থায় যাঁহারা বিলাত যান, তাঁহাদের এদেশে ফিরিয়া আসিয়া আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় যতদূর সম্ভব ততদূর নিজ নিজ জাতিত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করা উচিত। এই প্রকারে যাঁহারা হিন্দুসমাজভুক্ত হইয়া থাকিতে ইচ্ছুক তাহাদিগকে গ্রহণ করা যাইতে পারে। পূর্ব্বে যাঁহারা কোন কারণে জাতিচ্যুত হইতেন, তাঁহাদিগের পুনর্গ্রহণ জন্য প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা ছিল। এখন সেরূপ ব্যবস্থা হইলে ভাল হয়।

বিধবা-বিবাহ প্রচলন আবশ্যক কি না?

(২) বিধবা-বিবাহ—এ সম্বন্ধে কিছু লেখাই বাহুল্য। পূজ্যপাদ বিদ্যাসাগর মহাশয় যে আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহাতে এ প্রথার স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যতদূর বলা সম্ভব তাহা বলা শেষ হইয়াছে। বিশেষত এ বিষয়ে কোন মত দেওয়া কঠিন। অবশ্য বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হইলে অনেক

বালিকা-বিধবা (যাঁহাদিগকে এক্ষণে নিঃসন্তান থাকিতে হয় তাঁহারা) সন্তান প্রসব করিতে পারিবেন। এবং তদ্দ্বারা হিন্দুদিগের সংখ্যা কিছু বৃদ্ধি হইবে। কিন্তু হিন্দুজাতির কিছু সংখ্যা বৃদ্ধির খাতিরে হিন্দুসমাজে আজও যে স্বর্গীয় আদর্শ বর্ত্তমান আছে, সে আদর্শ নষ্ট করা উচিত বলিয়া মনে হয় না।

বাল্যবিবাহ।

(৩) বাল্য-বিবাহ—পূর্ব্বকালে একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রথা যখন হিন্দুসমাজে পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান ছিল, তখন বাল্যবিবাহের আবশ্যকতা ও উপকারিতা সকলেই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। এখন একান্নবর্ত্তী পরিবার ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। উহার পুনঃ-সংস্থাপন অসম্ভব। সুতরাং এখন আর বাল্যবিবাহ-প্রথার পূর্ব্বের ন্যায় আবশ্যকতা বা উপকারিতা নাই। আমাদের সমাজের ও জাতির বর্ত্তমান অবস্থায় এ প্রথা রহিত করা একান্ত আবশ্যক হইয়াছে। বর্ত্তমানের বিষম জীবনসংগ্রামে বাঙ্গালী হিন্দু-যুবক অত্যল্পকাল মধ্যে বৃহৎ পরিবারের ভরণ-পোষণ ভাবনায় অস্থির। সে যে দেশের বা দশের ভাবনা ভাবিবে তাহা অসম্ভব। এইরূপে অল্প বয়সে যুবকেরা পেটের দায়গ্রস্ত হইয়া পড়ায় আমাদের জাতির ও সমাজের অশেষ বিধ অমঙ্গল হইতেছে। এ অবস্থার প্রধান কারণই বাল্যকালে বিবাহ। এ জন্য এ প্রথা রহিত করা কর্ত্তব্য। অন্তত যৌবনোদ্গমের পূর্ব্বে বালিকাগণ স্বামীর সহিত একত্র বাস করিতে না পারে তাহার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। পঞ্জাবে জাঠ ও অন্যান্য জাতি মধ্যে বিবাহের পর যত দিন না যৌবনারম্ভ হয় তত দিন পর্য্যন্ত বালিকা-গণকে পিত্রালয়ে রাখিয়া দেওয়া হয়। শ্বশুরালয়ে বা স্বামী সকাশে যাইতে দেওয়া হয় না। এ প্রথা প্রচলন হওয়াই কর্ত্তব্য। বালকগণেরও বিবাহের বয়স বৃদ্ধি করা কর্ত্তব্য। অন্তত যত দিন তাহাদের পাঠ শেষ না হয় তত দিন তাহাদের বিবাহ না দেওয়া উচিত। পূর্ব্বকালে আমাদের সমাজে এই নিয়মই প্রচলিত ছিল। তখন উপ-নয়নান্তর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক গুরুগৃহে বিদ্যাশিক্ষা করার পর স্বগৃহে ফিরিয়া আসিয়া তবে বিবাহ করিতে হইত।

বিবাহকালে বয়োবৈষম্য দূর।

(৪) বিবাহকালে পাত্রপাত্রীর উভয়ের বয়সের অত্যন্ত পার্থক্য অধুনা আর পূর্ব্বের ন্যায়* দেখিতে পাওয়া যায় না। এখন সচরাচর দশ বৎসরের বালিকার সহিত আঠার বৎসরের যুবকের বিবাহ হয়। ইহাপেক্ষা বিবাহ-বয়সের পার্থক্যে উভয়েরই শারীরিক অনিষ্ট হয় এবং যে সংখ্যক সন্তান হওয়া সম্ভব তাহা হয় না। অথবা যে সকল সন্তান জন্ম গ্রহণ করে তাহারা রুগ্ন এবং অল্পায়ুঃ হয়। বঙ্গদেশ গ্রীষ্মপ্রধান হইলেও বালিকার বিবাহ তের বৎসর বয়সে দেওয়া যাইতে পারে।

অপরজাতির হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষা।

(৫) আর এক উপায়ে হিন্দুজাতির সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে পারে। অপরজাতীয় বা ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিগণের হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষা। এ বিষয়ে সেন্‌সাস রিপোর্টে বিশেষ উল্লেখ নাই। এ কথা অনেকের নিকট অভিনব

বলিয়া বোধ হইবে। কিন্তু যাঁহারা সুদূর পর্ব্বত প্রান্তে অনার্য্যদিগের নিকট কিছু দিন বাস করিয়াছেন, তাঁহারা ইহা অসম্ভব বলিয়া মনে করিবেন না। তথায় অনেক অনার্য্য নিম্নশ্রেণীর জাতি ব্রাহ্মণদিগকে আদর্শ করিয়া ব্রাহ্মণ্য রীতিনীতি অবলম্বন করিতেছে। ধোপারাও বিধবাবিবাহ দেয় না এবং অবস্থা ভাল হইলে উহাদের বিধবা একাদশীও করে। ছোটনাগপুর ও অন্যান্য অনার্য্য-বহুল স্থানে এখনও অনেক অনার্য্য ধীরে ধীরে হিন্দু প্রতিবেশীর আচার ও ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছে এবং এইরূপে অলক্ষ্যে উহাদের হিন্দুর সহিত মিলনের উপায় হইতেছে। এতদ্ভিন্ন এদেশ হইতে অনেক পতিত ব্রাহ্মণ কোথাও বা কতিপয় বৈষ্ণব অন্নসংস্থানের চেষ্টায় এ প্রদেশে গমন পূর্ব্বক বাস করিতে থাকে। তাঁহারা প্রথমে অনার্য্য অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে কথকতাচ্ছলে হিন্দুধর্ম্মোপদেশ দিতে আরম্ভ করে। কখন বা কোন হিন্দুধর্ম্ম পুস্তক পাঠ করিয়া শুনায়। কালক্রমে তাহারা উহাদের মধ্যে পুরোহিত পদ লাভ করে। তাহাদের উপদেশে ক্রমে ক্রমে ঐ সকল অনার্য্যদিগের মধ্যে হিন্দুধর্ম্ম প্রথার প্রচার হয় এবং উহারা আপনা-দিগকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেয়। সেন্সাস রিপোর্টে প্রকাশ যাহারা পূর্ব্ব গণনার সময়ে অনার্য্যশ্রেণীভুক্ত ছিল তাহারা এক্ষণে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে গৌরবানুভব করিতেছে, এবং এইরূপে পরিচয় না হইলে বিশেষ আপত্তি করিয়াছে। এইরূপে উড়িষ্যার করদ রাজ্যে, চাটগাঁ প্রদেশে, সিংহভূম অঞ্চলে হোস জাতি, ছোটনাগপুর প্রদেশের পান নামক জাতি, করাচী জেলায় ফন্দ, শবরজাতীয়েরা, ময়ূরভঞ্জ প্রদেশে সাঁওতালগণ কেহ কেহ বৈষ্ণবধর্ম্ম অবলম্বন করিতেছে, কেহ বা হিন্দু দেবদেবীর পূজা করিতে আরম্ভ করিতেছে। উক্ত প্রকারে হিন্দুসমাজের নিম্নস্তরে এখনও সমাজ গঠন কার্য্য চলিতেছে। উহা দেখিয়া বাস্তবিকই আশার সঞ্চার হয়। কারণ উহা দ্বারা প্রমাণ হয় যে হিন্দুসমাজ এখন মৃতপ্রায় হইলেও একেবারে মৃত নহে। উক্ত প্রকারে সমাজে অপরজাতীয় লোক গ্রহণ কার্য্য সামাজিক জীবনের লক্ষণ। সমাজের নিম্নাঙ্গেই এক্ষণে সে লক্ষণ দৃষ্ট হয়। সমাজের উচ্চাঙ্গেও ঐ প্রকার জীবনীশক্তি সঞ্চালন আবশ্যক।

পাশ্চাত্যজাতির সংসর্গে আমাদের সমাজে বিপ্লব নিবারণের উপায়।

(৬) এক্ষণে পাশ্চাত্যজাতির সহিত সংসর্গে আমাদের যে শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে তাহার উপায় নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। বিদেশীর সংসর্গে আসিয়া হিন্দু-জাতির মধ্যে দুই প্রকার বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। এক ভাবের বিপ্লব এবং অপর সামাজিক আচার ব্যবহারের বিপ্লব; এই উভয় প্রকার বিপ্লবের পরিণাম ফল একই — ধ্বংস।

বিপ্লবের কারণ ও প্রকৃতি।

ভাবের (Idea) বিপ্লবের উৎপত্তি দুই বিভিন্ন জাতীয় সভ্যতার, দুই বিভিন্ন প্রকার আদর্শের সংঘর্ষ হইতে। এইরূপ বিপ্লবের

হাত হইতে মুক্তি পাওয়া অতীব সুকঠিন। কারণ, মানুষ রক্তমাংসের শরীরযুক্ত মানুষের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পারে। কিন্তু আকারহীন ছায়াময় চক্ষুর অগোচর ভাবের সহিত কি প্রকারে যুদ্ধ করিবে? এ জন্য ইংরাজ যদি মুসলমানদিগের ন্যায় এ দেশ জয় করিয়া এখানে বাস করিত, তাহা হইলে যে প্রকারে হউক আমরা তাঁহাদের সহিত কোন প্রকার বন্দোবস্ত করিয়া লইয়া তাঁহাদের প্রতিবেশী স্বরূপে তাঁহাদের নিকট নির্ব্বিঘ্নে ও নিঃসঙ্কোচে বাস করিতাম। কারণ মানুষের সহিত মানুষের আত্মীয়তা স্থাপনই হিন্দুসমাজের চিরকাল চেষ্টা ছিল। দূর আত্মীয় ও গ্রামস্থ ব্যক্তিগণের সঙ্গে জাতি ও অবস্থা নির্ব্বিচারে যথাযোগ্য আত্মীয় সম্বন্ধ স্থাপন ও রক্ষা করিত। উহা হৃদয়ের সম্বন্ধ। উহারা কেহ পিতা, কেহ পুত্র, কেহ মাতা, কেহ কন্যা, কেহ ভ্রাতা, কেহ ভগিনী, কেহ বা বয়স্য বন্ধু। আমরা যে কোন মানুষের যথার্থ সংস্রবে আসি, তাহার সঙ্গে একটা সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া বসি। সে জন্য ইংরাজগণ যদি আমাদের গ্রামে নগরে বাস করিতেন, তাহা হইলে আমরা তাঁহাদের কাহার সহিত খুড়া, কাহার সহিত জেঠা, কাহার সহিত ভাই সম্বন্ধ পাতাইয়া ফেলিয়া তাঁহাদিগকে নিজ অন্তরঙ্গ করিয়া লইতাম। তাহা হইলে আর তাঁহাদের সহিত আমাদের কোন প্রকার বিরোধ বা বিবাদের স্থান থাকিত না। তাঁহারা আমাদের নিকট বাস করিতে করিতে আমাদের রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার, ধর্ম্ম-কর্ম্ম কতকাংশ গ্রহণ করিতেন। আমরাও তাঁহাদের কতক আচার-আচরণ গ্রহণ করিতাম। এমন কি এখন যেমন আমরা মুসলমানের পীরের নিকট সিন্নী দিয়া থাকি, সেইরূপ হয় ত Vergin Maryর পূজা করিতাম, অথবা যীশুখ্রীষ্টকে ভগবানের অবতারস্বরূপ মান্য করিয়া তাঁহারও পূজার বন্দোবস্ত করিতাম। এইরূপে আমাদের উভয়ের মধ্যে সকল বিরোধের সামঞ্জস্য হইয়া যাইত। কিন্তু দুঃখের বিষয় এখন আমাদের সেরূপ সুযোগ নাই। ইংরাজ কতকগুলি অভিনব আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ভাবরাশি আমাদিগের মধ্যে ছাড়িয়া যাইতেছেন। সে ভাবগুলি আমাদের সমাজে যুগপরম্পরায় সঞ্চিত ভাব হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। আমাদের হিন্দুসভ্যতা জগৎকে যে ভাব দানে সমৃদ্ধ করিয়াছে, তাহার সহিত এ সকলের অত্যন্ত বিরোধ, ইহা পূর্ব্বেই বিশেষরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। সেই ভাবগুলিকে আমরা ঠিক ধরিতে পারিতেছি না। অথচ সে ভাবগুলির মোহিনী শক্তিতে আমরা একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছি। এতদ্ভিন্ন এইরূপে আমাদের অতীতের সহিত বর্ত্তমানের বিচ্ছেদ উপস্থিত হওয়ায় আমাদের সমাজের প্রাণ-বায়ু নিরুদ্ধপ্রায় হইয়াছে। আমাদের সমাজে দ্রুত বেগে পরিবর্ত্তন চলিতেছে, কিন্তু সমাজের অভ্যন্তরে সচেতন অন্তকরণ নাই বলিয়া সে পরিবর্ত্তন বিকার ও বিশ্লেষণের দিকে যাইতেছে। সজীব পদার্থ সচেষ্টভাবে বাহিরের অবস্থাকে নিজের অনুকূল করিয়া আনে, আর নির্জ্জীব পদার্থকে বাহিরের অবস্থাই সবলে আঘাত করিয়া নিজের আয়ত্ত করিয়া লয়। আমাদের সমাজে যাহা কিছু পরিবর্ত্তন হইতেছে, তাহাতে

চেতনার কার্য্য নাই; তাহাতে বাহিরের সঙ্গে ভিতরের সামঞ্জস্য চেষ্টা নাই, বাহির হইতে পরিবর্ত্তন ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িতেছে এবং সমাজের সমস্ত সন্ধি শিথিল করিয়া দিতেছে।

উহা নিবারণের উপায়।

আজ আমরা উত্তমরূপেই বুঝিয়াছি যে দূরে গা ঢাকা দিয়া বসিয়া থাকাতে আত্মরক্ষা চলে না। নিজের অন্তর্নিহিত শক্তিকে সর্ব্বতোভাবে জাগ্রত করা, চালনা করাই আত্মরক্ষার প্রকৃত উপায়। পাশ্চাত্য ভাব ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের চিত্তকে অভিভূত করিবেই, যতক্ষণ আমাদের চিত্ত জড়ত্ব ত্যাগ করিয়া তাহার নিজের উদ্যমকে কাযে না লাগাইবে। কোণে বসিয়া "গেল গেল" বলিয়া হাহাকার করিয়া মরিলে কোন ফল নাই। আর সকল বিষয়ে পাশ্চাত্য জাতির অনুকরণ করিয়া ছদ্মবেশ পরিয়া বাঁচিবার যে চেষ্টা তাহাও নিজেকে ভুলান মাত্র। আমরা প্রকৃত ইংরাজ হইতে পারিব না, নকল ইংরাজ হইয়াও ইংরাজকে ঠেকাইতে পারিব না।

হিন্দুসমাজের অন্তর্নিহিত শক্তি তদ্বারা বর্ত্তমান অবস্থার উপর আত্মপ্রতিষ্ঠা।

আত্মরক্ষা করিতে হইলে আমাদের সমাজের অন্তর্নিহিত কি শক্তি আছে তাহা বিশেষরূপে উপলব্ধি করা আবশ্যক। "বহুর মধ্যে একটু উপলব্ধি বিচিত্রের মধ্যে ঐক্য স্থাপন"—ইহাই ভারতবর্ষের অন্তর্নিহিত ধর্ম্ম। ভারতবর্ষ পার্থক্যকে বিরোধ বলিয়া জানে না, সে পরকে শত্রু বলিয়া কল্পনা করে না। এই জন্যই ত্যাগ না করিয়া, বিনাশ না করিয়া একটি বৃহৎ ব্যবস্থার মধ্যে সকলকেই সে স্থান দিতে চায়। ইহাই আমাদের অন্তর্নিহিত শক্তি।

এই শক্তিকে জাগ্রত করিয়া আত্মার সহিত জড়ের, সংসারের সহিত স্বর্গের, ভোগের সহিত ত্যাগের, ব্যক্তির সহিত সমাজের, যুক্তি ও বিজ্ঞানের সহিত বেদাদি শাস্ত্রের সামঞ্জস্য করিতে হইবে। আমাদের মনীষী ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসু, বস্তুতত্ত্ব, উদ্ভিদতত্ত্ব ও জন্তুতত্ত্বের ক্ষেত্রকে এক সীমানার মধ্যে আনিবার পক্ষে সহায়তা করিয়াছেন, মনস্তত্ত্বকেও যে তিনি কোন এক দিন ইহাদের এক কোটায় আনিয়া দাঁড় করাইবেন না তাহা বলা যায় না। এই ঐক্য সাধনই ভারতের প্রতিভার প্রধান কায।

হিন্দুর ইতিহাসে আত্ম-প্রতিষ্ঠার উদাহরণ।

এই শক্তিকে জাগ্রত করিয়াই আমরা আমাদের বর্ত্তমান অবস্থার উপর আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে পারিব এবং বর্ত্তমান প্রতিকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর জয়ী হইতে পারিব। এইরূপ আত্মপ্রতিষ্ঠার দৃষ্টান্ত আমাদের ইতিহাসে বিরল নহে।

"বাহিরের সহিত হিন্দুসমাজের সংঘাত এই নূতন নহে। ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াই আর্য্যদিগের সহিত এখনকার আদিম অধিবাসীদের তুমুল বিরোধ বাধিয়াছিল। এই বিরোধে আর্য্যগণ জয়ী হইলেন। কিন্তু অনার্য্যগণ (আদিম অষ্ট্রেলিয়ান বা আমেরিকানগণের মত উৎসাদিত হইল না। তাহারা আর্য্য-উপনিবেশ হইতে বহিষ্কৃত হইল না। তাহারা,

আপনাদের আচার-বিচারের সমস্ত পার্থক্য সত্ত্বেও সমাজতন্ত্রের মধ্যে স্থান পাইল। তাহাদিগকে লইয়া আর্য্যসমাজ বিচিত্র হইল।

"আর একবার এই সমাজ বিশ্লিষ্ট হইয়া গিয়াছিল। বৌদ্ধপ্রভাবের সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মের আকর্ষণে ভারতবর্ষীয়ের সহিত বহুতর পরদেশীয়ের ঘনিষ্ট সংস্রব হইয়াছিল। এই এসিয়াব্যাপী ধর্ম্মপ্লাবনের সময়ে ভারতবর্ষে নানা জাতির নানা সমাজের আচার-ব্যবহার, ক্রিয়াকর্ম্ম ভাসিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু এই অতি বৃহৎ উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যেও ব্যবস্থা স্থাপনের প্রতিভা ভারতবর্ষকে ত্যাগ করিল না। যাহা কিছু ঘরের, যাহা কিছু পরের, সমস্ত একত্র করিয়া লইয়া পুনর্ব্বার ভারতবর্ষ আপনার সমাজ সুবিহিত করিয়া গড়িয়া তুলিল। পূর্ব্বাপেক্ষা আরো বিচিত্র হইয়া উঠিল। কিন্তু বিপুল বিচিত্রের মধ্যে একটী ঐক্য সে সর্ব্বত্রই প্রথিত করিয়া দিয়াছে।

"বৌদ্ধধর্ম্মের প্লাবন অপসারিত হইয়া গেলে পর যখন খণ্ড খণ্ড দেশের খণ্ড খণ্ড ধর্ম্মসম্প্রদায় বিরোধ-বিচ্ছিন্নতায় চতুর্দ্দিক কণ্টকিত করিয়া তুলিয়াছিল তখন শঙ্করাচার্য্য সেই সমগ্র খণ্ডতা ও তুচ্ছতাকে এক মাত্র অখণ্ড বৃহত্তের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ করিবার চেষ্টায় ভারতবর্ষের প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন।

"তাহার পরে এসিয়ার পশ্চিমতম প্রদেশ প্রান্ত হইতে আর এক মহাশক্তি ঐক্য মন্ত্র বহন করিয়া দারুণ বেগে পৃথিবী প্লাবিত করিতে করিতে অবশেষে ভারতবর্ষেই চিরদিনের আশ্রয় লইল। তাহার সংঘাতে হিন্দুসমাজ আবার বিধ্বস্ত হইয়াছিল। কিন্তু কিছুকাল পরেই হিন্দুসমাজে এই নব সংঘাতের সহিত সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা ও প্রক্রিয়া সর্ব্বত্রই আরম্ভ হইয়াছিল। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সমাজের মাঝখানে এমন সংযোগ-স্থল সৃষ্ট হইতেছিল, যেখানে উভয় সমাজের সীমারেখা মিলিয়া আসিতেছিল। নানক পন্থী, কবীর পন্থী ও নিম্নশ্রেণীর বৈষ্ণব সমাজ উহার দৃষ্টান্ত স্থল। এতদ্ভিন্ন তখন সমগ্র হিন্দুসমাজ মুসলমানসমাজের রীতি-নীতি, আচার-আচরণ দৃষ্টে স্বীয় রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার মিলাইয়া উহাদিগকে যথাযোগ্য পরিবর্ত্তিত করিয়া লইয়া পুনরায় সর্ব্বপ্রকার বিরোধের মধ্যে সামঞ্জস্য করিয়া ফেলিল।

"সম্প্রতি য়ুরোপের মহাক্ষেত্রে আর এক মহাশক্তি প্রাণের প্রাবল্যে, বিজ্ঞানের কৌতূহলে, পণ্যসংগ্রহের আকাঙ্ক্ষায় বিশ্বাভিমুখী হইয়া আর এক ধর্ম্ম, আচার-ব্যবহার, শিক্ষাদীক্ষা লইয়া আসিয়া আমাদের সনাতন হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের উপর অতি প্রবলবেগে আঘাত করিয়া উহাতে এক সুদূরব্যাপী প্রচণ্ডবিপ্লবের তুফান আনয়ন করিয়াছে।

"পৃথিবীর মধ্যে আর কোন দেশেই এত জাতি, এত ধর্ম্ম, এত শক্তি একত্রিত হয় নাই। একান্ত বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে প্রকাণ্ড সমন্বয়ে বাঁধিয়া বিরোধের মধ্যে মিলনের আদর্শকে পৃথিবীর মধ্যে জয়ী করিবার এমন সুস্পষ্ট আদেশ জগতের আর কোথাও প্রচলিত হয় নাই।"—(রবি বাবুর পথ ও পাথেয়)

ভারতবর্ষীয় হিন্দুসমাজ স্বীয় আত্ম-প্রতিষ্ঠা দ্বারা বরাবর সেই আদেশ পালন সম্পূর্ণরূপে করিয়া আসিয়াছে। যে প্রতিকূল সমাজ যখন হিন্দুসমাজকে দলিত ও বিধ্বস্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছে, তখনই হিন্দুসমাজ তাহার বিরোধিতাকে সমূলে বিনাশ পূর্ব্বক তাহাকে আপন করিয়া তাহার উপর আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়াছে।

আত্মপ্রতিষ্ঠার আধুনিক চেষ্টা।

"অধুনাতন কালে দেশের মধ্যে যাঁহারা সকলের চেয়ে বড় মনীষী তাঁহারা পশ্চিমের সহিত পূর্ব্বকে মিলাইয়া লইবার কার্য্যে জীবন যাপন করিয়াছেন। তাহার দৃষ্টান্ত রাজা রামমোহন রায়। তিনি মনুষ্যত্বের ভিত্তির উপরে ভারতবর্ষকে সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে মিলিত করিবার জন্য এক দিন একাকী দাঁড়াইয়াছিলেন। আশ্চর্য্য উদার হৃদয় ও উদার বুদ্ধি দ্বারা তিনি পূর্ব্বকে পরিত্যাগ না করিয়া পশ্চিমকে গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন। এইরূপে তিনিই ভারতবর্ষের চিত্তকে সঙ্কুচিত ও প্রাচীরবদ্ধ করেন নাই, তাহাকে দেশ ও কালে প্রসারিত করিয়া য়ুরোপ ও ভারতবর্ষের মধ্যে সেতু স্থাপন করিয়াছিলেন।

"দক্ষিণ ভারতে মহাত্মা রাণাডে পূর্ব্ব ও পশ্চিমের সেতুবন্ধন কার্য্যে জীবন যাপন করিয়াছেন। যাহা মানুষকে বাধে, সমাজকে গড়ে, অসামঞ্জস্যকে দূর করে, জ্ঞান, প্রেম ও ইচ্ছাশক্তির বাধাগুলিকে নিরস্ত করে, সেই সৃজনশক্তি, সেই মিলনতত্ত্ব রাণাডের প্রকৃতির মধ্যে ছিল। সেইজন্য ভারতবাসী ও ইংরাজের মধ্যে নানা প্রকার বিরোধ ও স্বার্থসংঘাত সত্বেও ভারতের ইতিহাসের যে উপকরণ ইংরাজের মধ্যে আছে তাহা গ্রহণের পথ যাহাতে বিস্তৃত হয়, তাহার প্রশস্ত হৃদয় ও উদার বুদ্ধি সেই চেষ্টায় চির দিন প্রবৃত্ত ছিল।

"অল্প দিন পূর্ব্বে বাঙ্গলা দেশে স্বামী বিবেকানন্দও পূর্ব্ব ও পশ্চিমকে দক্ষিণে ও বামে রাখিয়া মাঝখানে দাঁড়াইতে পারিয়াছিলেন, ভারতবর্ষের ইতিহাসের মধ্যে পাশ্চাত্যকে অস্বীকার করিয়া ভারতবর্ষকে সঙ্কীর্ণ সংস্কারের মধ্যে চিরকাল সঙ্কুচিত করা তাহার জীবনের উপদেশ নহে। গ্রহণ করিবার, মিলন করিবার, সৃজন করিবার প্রতিভাই তাঁহার ছিল। তিনি ভারতবর্ষের সাধনাকে পশ্চিমে ও পশ্চিমের সাধনাকে ভারতবর্ষে দিবার ও লইবার পথ রচনার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।" (রবি বাবুর পূর্ব্ব ও পশ্চিম)

"বাঙ্গলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রই পূর্ব্ব পশ্চিমের মিলনযজ্ঞ আহ্বান করিয়াছিলেন। বাঙ্গলা সাহিত্য এমন করিয়া গঠিত হইয়া উঠিয়াছে যে পশ্চিমের জ্ঞান ও ভাব ইহা সহজে আপনার করিয়া গ্রহণ করিতে পারে। ইহা তাঁহারই প্রতিভার ফল। এতদ্ভিন্ন তিনি পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও দর্শনের সহিত আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রের উপদেশ সকলের সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও দর্শনের পরিপক্ক যুক্তি লইয়া যখন আমরা আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রাধ্যয়ন করি, তখন পদে পদেই আমাদের মনে হয় উহাদের শিক্ষা অযৌক্তিক ভ্রম কুসংস্কার পূর্ণ। বঙ্কিমচন্দ্র সেই পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও দর্শনের

সাহায্যে আমাদের প্রাচীন শাস্ত্র অধ্যয়ন পূর্ব্বক উহাদের যৌক্তিকতা ও ন্যায্যতা প্রতিপাদন করিয়া বিজ্ঞান দর্শনের সহিত আমাদের শাস্ত্রীয় উপদেশের সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছিলেন।

এই সকল মহাত্মাগণের উপদেশ গ্রহণ করিয়া এবং তাঁহাদের প্রদর্শিত পথাবলম্বন পূর্ব্বক আমরা আমাদের সমাজের বর্ত্তমান বিপ্লবে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে না পারিলে ধ্বংসের হাত হইতে মুক্ত হইতে পারিব না।

হিন্দুর সনাতন আচার-আচরণ রক্ষা।

(৭) এতদ্ভিন্ন আমাদের সনাতন রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার অনর্থক পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাহেবিয়ানা গ্রহণ করিবার ব্যর্থ চেষ্টা আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতে হইবে। যে জাতি বংশপরম্পরায় যেরূপ ভাবে গঠিত হইয়াছে, সে জাতি তাহার পরিবর্ত্তন কিছুমাত্র সহ্য করিতে পারে না। এই কারণেই বোধ হয় আমাদের দেশে বিলাতফেরত-সম্প্রদায়ের মধ্যে অকাল মৃত্যু অধিক। আমাদের সমাজে চলিত প্রথাগুলির মধ্যে অনেকগুলিই আমাদের জাতীয় জীবনের বিশেষ উপযোগী। সে গুলির রক্ষা বাঞ্ছনীয়। আর আধুনিক সুসভ্য জাতিগণের যে সকল আচার আচরণ তাহাদের জাতীয় উন্নতির সহায়, সে গুলিকে আমাদের জাতীয় জীবনের উপযোগী করিয়া লইতে হইবে। মাহাত্মা কেশবচন্দ্র একবার এই প্রকার চেষ্টা করিয়াছিলেন। (তাঁহার কৃত New Dispensation নামক গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।)

হিন্দুর জাতীয়-জীবন-ব্যাপারের যাবতীয় কর্ম্ম স্ববশে আনিতে হইবে।

(৮) আমাদের জাতীয়-জীবন-ব্যাপারের সর্ব্ব বিষয়ে এখন আমরা পরবশ। জাতীয়-জীবন-ব্যাপারের যাবতীয়কর্ম্ম সকল আমাদিগকে স্ববশে আনিতে হইবে। তাহা হইলে আমাদের মনের জড়তা বিদূরিত হইবে। আমাদের সামাজিক চেষ্টা ও উদ্যম আবার প্রতিষ্ঠিত হইবে। দেহের স্বাস্থ্য ও প্রফুল্লতা আবার ফিরিয়া আসিবে। এইরূপে আমরা আমাদের বর্ত্তমান প্রতিকূল অবস্থার উপর আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হইব। কারণ, স্বাবলম্বনই আত্ম-প্রতিষ্ঠার মূলমন্ত্র।

'ভাবে' স্বদেশী হওয়াই প্রকৃত স্বদেশী এবং উহাই আত্মরক্ষার প্রকৃত উপায়।

সম্প্রতি 'স্বদেশী আন্দোলনের' পর হইতে আমরা এইরূপ চেষ্টায় ব্রতী হইয়াছি। সে আন্দোলনের প্রারম্ভে আমরা আমাদের মৃতপ্রায় দেশীয় শিল্পের পুনরুজ্জীবনের চেষ্টায় ব্যাপৃত ছিলাম। কিন্তু সর্ব্ব বিষয়ে আমরা 'স্বদেশী' হইতে না পারিলে আমাদের প্রাণের আশা অত্যন্ত কম। বিশেষত আমরা ভাবে "বিদেশী" হওয়ায় আমাদের অবস্থা এতদূর শোচনীয় হইয়াছে এবং আমরা আমাদের নিজত্বটুকু হারাইতেছি। সুখের বিষয় আমাদের জাতির শিক্ষা ভার আমরা স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছি এবং সে শিক্ষাও আমরা আমাদের জাতীয়-জীবনের উপযোগী করিয়া দিতেছি। এইরূপ শিক্ষাবিস্তারের সহিত আমাদের ভবিষ্যৎ বংশীয়গণের মন হইতে যে ভাব প্রাচ্যজাতির প্রাচারলাভের প্রতিকূল, সেই ভাব দূরীভূত হইবে। এ বিষয়ে অধিক লেখা নিষ্প্রয়োজন।

এক্ষণে যে যে কারণে হিন্দুজাতির ক্ষয় হইতেছে এবং তাহাদের নিবারণের উপায়-গুলির সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করা যাইতেছে।

কারণ	নিবারণের উপায়
(ক) সেন্‌সাস রিপোর্ট অনুসারে	
(১) হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ—	
১ নীচ স্বার্থের জন্য ২ ধর্ম্মের জন্য	১ ও ২ নিবারণের উপায় নাই
৩ সামাজিক উৎপীড়ন	৩ হিন্দু-সমাজের নিম্নশ্রেণীর লোকের স্বজাতীয় ব্যবসা ত্যাগ পূর্ব্বক অপর অর্থকরী ব্যবসা অবলম্বনের সুযোগ দান ও উহাদের অবস্থার উন্নতির সহিত উহাদের সমাজে উচ্চতর স্থান নির্দ্দেশ।
(ক) মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ	
(খ) খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ দুর্ভিক্ষের সময়	(খ) মিশনারীদিগের ন্যায় হিন্দুদিগের ও দুর্ভিক্ষের দরুণ অনাথ পিতৃমাতৃহীন বালকবালিকাগণের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা উচিত।
(গ) বিলাত যাত্রা	(গ) বিলাত-ফেরত হিন্দুদিগের হিন্দু-শাস্ত্র নিষিদ্ধ খাদ্য বর্জ্জন ও স্বীয় জাতিত্ব বজায় রাখা উচিত।
(২) বিধবা-বিবাহ নিষেধ	(২) উহা প্রচলন হওয়া উচিত কি না বলা যায় না। উহা প্রচলনে হিন্দুজাতির সংখ্যা অত্যল্প বৃদ্ধি হইতে পারে।
(৩) বাল্য বিবাহ প্রচলন	(৩) বাল্যবিবাহ নিষেধ আবশ্যক। অত্যন্ত অল্প বয়সে বিবাহিত বালকবালিকার একত্রে বাস নিবারণ করা উচিত।
(৪) বিবাহের বয়োবৈষম্য	(৪) ইহা যতদূর সম্ভব দূর করা আবশ্যক। এখন এ কারণ আর বর্ত্তমান নাই।

খ পূর্ব্বোক্ত কারণে হিন্দুজাতির ক্ষয় আংশিক হইলেও সম্পূর্ণরূপে হয় নাই। হিন্দুজাতি ক্ষয়ের প্রকৃত মূলকারণগুলি নিম্নে লিখিত হইতেছে—

কারণ	নিবারণের উপায়
(১) পাশ্চাত্য সংসর্গ ও উহার ফলে—	
এদেশে নূতন পীড়ার আবির্ভাব।	(১) শুদ্ধ দেশের জল বায়ু সংশোধনে পীড়া দূর হইতে পারে না।
হিন্দুদিগের আহারের ও জীবন যাত্রা নির্ব্বাহের প্রণালীর পরিবর্ত্তন হেতু	(২) হিন্দুদিগের রীতিনীতি আচার-ব্যবহার তাহাদিগের মধ্যে অনেকগুলিই তাহাদের

(ক) শিশুদিগের স্বাস্থ্য ভঙ্গ ও মৃত্যুর আধিক্য

(খ) যুবক ও যুবতীগণের বন্ধ্যাত্ব তজ্জন্য জন্ম সংখ্যা হ্রাস

(৩) হিন্দুজাতির বিস্ময়াপন্ন ও আত্মবিহ্বল হওয়া

(৪) সর্ব্ব বিষয়ে আত্মনির্ভরতা হারাইয়া পরবশ হওয়া

এতদুভয়ের ফলে শরীর ও মনের জড়তা—তজ্জন্য স্বাস্থ্য ভঙ্গ ও মৃত্যুর আধিক্য এবং জন্ম-সংখ্যার হ্রাস

জাতীয় জীবনের উপযোগী। তাহাদের রক্ষা বাঞ্ছনীয়। নকল ইংরাজ হওয়া অপেক্ষা খাঁটী বাঙ্গালী হিন্দু হওয়া সহস্রগুণে ভাল।

এতদ্ভিন্ন আধুনিক সুসভ্য জাতিগণের যে সকল আচার-আচরণ তাহাদের জাতীয় জীবনের উন্নতির বিশেষ সহায়, সে গুলিকে আমাদের জাতীয় জীবনের উপযোগী করিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।

(৩) আমাদের বর্ত্তমান অবস্থার উপর আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। হিন্দু-সমাজ যে অভ্যন্তরীণ শক্তিবলে বরাবর বিরোধের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছে, তাহার উদ্বোধন আবশ্যক। তাহা হইলে আমরা বর্ত্তমান অবস্থার উপরে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে পারিব।

(৪) জাতীয়-জীবন-ব্যাপারে যাবতীয় কার্য্য আমাদিগকে আবার স্ববশে আনিতে হইবে।

(৫) ভাবে স্বদেশী, তাহাই আত্মরক্ষার প্রকৃত উপায়।

হিন্দুজাতির বৃদ্ধির আর এক উপায় অপর জাতির লোককে হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষা।*

শ্রীরাধারমণ মুখোপাধ্যায়।

* এই প্রবন্ধের মুদ্রাঙ্কণ কার্য্য প্রায় শেষ হইবার পরে জানিতে পারিলাম যে, এই প্রবন্ধটি পত্রান্তরেও প্রকাশিত হইয়াছে। এই পুরস্কার প্রবন্ধের বিজ্ঞাপনে পুরস্কারদাতা স্পষ্টই নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন যে, মনোনীত প্রবন্ধটি "বঙ্গদর্শনে" প্রকাশিত হইবে। কিন্তু দেখিতেছি পুরস্কার প্রার্থী লেখক মহাশয় সে দিকে মনোযোগ দেন নাই। এ প্রবন্ধ অন্যত্র প্রকাশের জন্য দেওয়া হইয়াছে, লেখক মহাশয় এ কথা পুরস্কারদাতাকে জানাইলে আমরা সাবধান হইতাম। বঃ সঃ।

জগতের আদি কারণ।*

এ জগৎটাকে দেখিলে বোধ হয় এটা বিভিন্ন বস্তুসমূহের একটা সমষ্টিমাত্র—মানুষ, জন্তু, গাছ ইত্যাদি। এবং প্রথমে এই সকল বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে যে কোনও সম্বন্ধ আছে তাহাও বিশেষ বোঝা যায় না। কিন্তু মানুষের মন বিভিন্নতাতে সন্তুষ্টি লাভ করিতে পারে না—ইহা প্রত্যেক বস্তুরই একটা কারণ অনুসন্ধান করে। আবার আমরা আমাদের মানসিক অবস্থা অনুসারে বস্তুর কারণ নির্দ্দেশ করি, অর্থাৎ অশিক্ষিত লোকের নিকট যাহা ঈশ্বরের ক্রোধচিহ্ন, আপনার ও আমার নিকট সেটা একটা বৈদ্যুতিক ঘটনা মাত্র। যাহাই হউক, এই কারণ অনুসন্ধানই যে বিজ্ঞানের উৎপত্তি সে বিষয়ে বোধ হয় মতদ্বৈধ হইতে পারে না। ইহা 'forbidden fruit of the tree of knowledge' হইলেও মানুষ কখনও ইহার আস্বাদ গ্রহণে অসম্মত নয়।

এখন বুঝা যাইতেছে যে বস্তুবিশেষের কারণ অনুসন্ধানই বিজ্ঞান। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি মানুষ কখনও বিভিন্নতাতে সন্তুষ্ট হইতে পারে না, আমরা কেবলমাত্র প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াও ক্ষান্ত হইতে পারি না—বস্তুত আমরা এরূপ একটী তত্ত্বের (principle) অনুসন্ধান করি যাহা জড় (material) ও আধ্যাত্মিক জগতের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা প্রদানে সক্ষম। সম্পূর্ণ দার্শনিক কাহাকে বলে? একজন ইংরাজ দার্শনিক বলিয়াছেন কোনও বস্তুর যথার্থ কারণ নির্দ্দেশই (to find the true cause) দার্শনিক ব্যাখ্যা। সুতরাং এখন দেখা যাইতেছে যে সমস্ত জগতের (the world as a whole) ব্যাখ্যা করিতে হইলে আমাদের জগতের বাহিরে যাইতে হইবে (we must transcend the world) এবং কোন অতীন্দ্রিয় তত্ত্বের (transcendental principle) আবিষ্কার করিতে হইবে। এই অতীন্দ্রিয় তত্ত্বকেই আমরা আদি কারণ বা মূল কারণ (first cause, formal cause, final cause) বলিয়া নির্দ্দেশ করি।

এখন স্বভাবতই প্রশ্ন হইবে—এই আদি কারণের প্রকৃতি কিরূপ? কিন্তু এই প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্ব্বে আমাদের আর এক বিষয়ের মীমাংসা করিতে হইবে। কোনও কোনও দার্শনিক পণ্ডিত বলেন যে এই আদি কারণের অনুসন্ধানে কোনও ফল নাই এবং এরূপ অনুসন্ধানই অসম্ভব। আমরা এরূপ দার্শনিক পণ্ডিতদিগকে নাস্তিক বা ইংরাজিতে Atheists বা Phenomenalists বা Philosophical nihilists বলি। প্রত্যেক দেশে ও প্রত্যেক জাতিতে আমরা এরূপ দার্শনিক নাস্তিক (Philosophical atheists or nihilists) দেখিতে পাই।

* লেখক কর্ত্তৃক ভবানীপুর সাহিত্য-সমিতিতে পঠিত

আমাদের দেশে লোকায়ত বা চার্ব্বাক দার্শনিকেরা নাস্তিক—ইঁহারা কোনও আদি কারণ স্বীকার করেন না—ইঁহাদের মতে জগৎ ক্ষণভঙ্গুর ঘটনার একটা বৃহৎ সমষ্টি মাত্র (The universe is an aggregation of phenomenal changes). গ্রীক Heraclitus, Epicurus ইত্যাদির মতও অনেকটা এরূপ—ইঁহারা বলেন যে দৈব বিক্ষিপ্ত পরমাণু (atoms) দ্বারা এই জগতের নির্ম্মাণ—ইহার নির্ম্মাতা কেহ নাই, আর যদিও ঈশ্বর স্বীকার করা যায় তথাচ তাঁহার সহিত পৃথিবীর কোন সম্বন্ধ স্বীকার করা যাইতে পারে না। এপিকিউরস বলেন—দেবতাদিগের ন্যায় সম্পূর্ণ সুখী জীবগণ, যাঁহারা আপনা-আপনি পূর্ণ এবং সর্ব্ববিষয়ে অনপেক্ষ, তাঁহারা জগৎসৃষ্টিরূপ কার্য্যের ভার আপনাদের স্কন্ধে চাপাইয়া লইবেন কেন? আবার সেই বিশ্বকে শাসন করা রূপ দুরূহ কার্য্যের ভারই বা তাঁহারা গ্রহণ করিবেন কেন? এই যে পাপসঙ্কুল পৃথিবী—ইহাকে আমরা দেবতাদের সৃষ্টি বলিয়া কিরূপে ধরিয়া লইতে পারি? শূন্য, অণু-পরমাণু, এবং যান্ত্রিক কারণাদি জগৎসৃষ্টিকে এক রূপে ব্যাখ্যা করিতে পারে ; metaphysicsকে, formal cause-এর theoryকে গ্রহণ করিতেই হইবে এমন কোন কথা নাই।* ইংরাজ দার্শনিকদের মধ্যে Hobbesএর মত অনেকটা এইরূপ। তিনিও কোন আদি কারণে বিশ্বাস করেন না এবং আদি কারণ অনুসন্ধান অসম্ভব বলেন। Hobbesএর মতকে চার্ব্বাকের মতের পুনরাবৃত্তি বলিলেও বোধ হয় বিশেষ অত্যুক্তি হইবে না।

এখন আমরা এই মতের একটু সংক্ষিপ্ত সমালোচনা করিব। এক কথায় বলিতে হইলে, এই মতটী সম্পূর্ণ অ-দার্শনিক (unphilosophical). আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অনেককে একে আনা (to reduce multiplicity to unity) দর্শনের কার্য্য, সুতরাং ক্ষণিকবাদ বা পরিবর্ত্তনবাদ (phenomenalism) দর্শনের শেষ কথা হইতে পারে না। এই মতানুসারে জগৎ একটা বৃহৎ ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান মাত্র (sensation). Dr. Bain বলেন, আমরা এই sensation ব্যতীত আর কিছুই জানি না বা জানিতে পারি না। ক্রমশ এই ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান কতকগুলি নিয়মানুসারে (Laws of assimilation, etc.) দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়—যেগুলি অধিক পরিমাণে আভ্যন্তরিক (subjective) সেগুলিকে আমরা 'মন' বা 'আত্মা' বলিয়া নির্দ্দেশ করি, আর যেগুলি অধিক পরিমাণে বাহ্যিক (objective) তাহাদিগকে আমরা জগৎ (Nature) বলি। Mill এই মতের

* Why should such perfect and supremely happy beings (as gods) who are self-sufficient or have no need of anything, burden themselves with creating the world? Why should they undertake the difficult task of governing the universe? How can we assume that a world full of evils the creation of the gods? Empty space, atoms, and might in short, mechanical causes, suffice to explain the world ; and it is not necessary for metaphysics to have recourse to the theory of formal causes.—Epicurus.

সুন্দর খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন 'How one series of sensations can possibly remember another series is more than I can say'—যদি সমস্ত জগৎটাই ক্ষণিক ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান হয়, তাহা হইলে জ্ঞানের অর্থ কি? জ্ঞানী বা দ্রষ্টা (knower)ই বা কে এবং জ্ঞেয় বা দৃশ্য (known)ই বা কি? আর স্থায়ীর (permanent) জ্ঞান ব্যতীত অস্থায়ী বা ক্ষণিকের জ্ঞান কিরূপে সম্ভব? Dr. Martineau অতি সুন্দরভাবে এই কথাটি বুঝাইয়াছেন—একটা স্থায়ী বা নিত্য বস্তুর সহিত সম্বন্ধ ব্যতীত পরিবর্ত্তনের কোনই অর্থ হয় না। নিত্যের অস্তিত্ব না থাকিলে পরিবর্ত্তনের অস্তিত্ব থাকে না।"* আমাদের নৈয়ায়িক দার্শনিকেরাও বৌদ্ধ 'সর্ব্বং ক্ষণিকং ক্ষণিকং' মতের খণ্ডনার্থ বলেন যে ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান মাত্রই কার্য্যস্বরূপ (effect) এবং কারণ ব্যতীত কোনও কার্য্য হয় না, সুতরাং এই পরিবর্ত্তনশীল জগতের বাহিরে কোনও স্থায়ী কারণ নিশ্চয়ই আছে।

এই সংক্ষিপ্ত সমালোচনার পর আমরা এখন বলিতে পারি যে নাস্তিকতাকে যুক্তিসঙ্গত বা দার্শনিক মত বলা যাইতে পারে না, আমার বোধ হয় যদি কেহ কখনও ভিত্তিহীন অট্টালিকা বা মস্তকহীন দেহ ধারণার মধ্যে আনিতে পারেন, তিনি হয় ত এই মতকে যুক্তিসঙ্গত বলিবেন। আমরা বলিতে পারিব না।

এখন আমরা, যাঁহারা জগতের কোনও আদি কারণ আছে বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহাদের মত বিচার করিব। এই সকল দার্শনিকদিগকে আবার দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—(১) যাঁহারা স্বীকার করেন যে আদি কারণ আছে এবং সেই আদি কারণের প্রকৃতি নির্দ্দেশ করেন, (২) যাঁহারা স্বীকার করেন যে আদি কারণ আছে, কিন্তু আমরা তাহার প্রকৃতি নির্দ্ধারণে সম্যক সমর্থ নহি। প্রথম মতাবলম্বী দার্শনিকদের মধ্যে আবার দুই প্রকার বিভিন্ন মত আছে। কেহ কেহ বলেন জগতের আদি কারণ জড়পদার্থ। আমরা ইহাদিগকে জড়বাদী বলি। আমাদের হিন্দু দার্শনিকদের মধ্যে প্রকৃত জড়বাদী কেহ আছেন বলিয়া আমার বোধ হয় না। প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকদের মধ্যে অনেক জড়বাদী দেখা যায়। Anaxamender, Heraclitus ইত্যাদি সকলেই জড়বাদী—কেহ বলেন জল, কেহ বলেন অগ্নি ও বায়ু এ জগতের আদি কারণ। এই সকল মত দেখিলেই নিতান্ত ভ্রমাত্মক ও অযৌক্তিক বলিয়া বোধ হয়, সুতরাং ইহার সমালোচনা নিষ্প্রয়োজন। আজকালকার জড়বাদীরা কোনও বিশেষ জড়পদার্থ যে জগতের কারণ ইহা স্বীকার করেন না, তাঁহাদের মতে জগতের আদি কারণ শুদ্ধমাত্র Nabulous matter—সে পদার্থ কঠিন নয়, তরল নয় বা বাষ্পীয় নয়— সে Nabulous—ইহা-

* Change has no meaning, and no possibility but in relation to the permanent, which is its prior condition; and pile up as you may your co-existent and successive mutabilities, that patient eternal abides behind and receives an everlasting witness from them, whether heeded or unguessed.—Dr. Martineau.

কেই Spencer 'cosmic dust' বা 'cosmic vapour' বলিয়াছেন। এই পদার্থ হইতেই জগতের সমস্ত বস্তুর উৎপত্তি। জীবন, মন, আত্মা, ধর্ম্ম সকলই এই পদার্থের বিকার মাত্র—মন বা আত্মা নামে কোনও বিভিন্ন বস্তু নাই—মন বা চিন্তা জড়-পদার্থের বা মস্তিষ্কের ক্রিয়া মাত্র। Vogt বলেন, "যকৃৎ ও পিত্তের মধ্যে যে সম্বন্ধ, চিন্তা ও মস্তিষ্কের মধ্যেও ঠিক সেই সম্বন্ধ।* Mobschott চিন্তাকে 'a motion in matter এবং 'phosphersence in brain' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ ইংরাজ বৈজ্ঞানিক Huxley এবং Tyndallএর মত অনেকটা এইরূপ Huxley 'Lay sermons'এ লিখিয়াছেন—আমার ও তোমার চিন্তা সমস্তই জড়পদার্থের পরমাণুর বিকৃতি মাত্র, আবার এই জড়পদার্থই জীবনীশক্তির মূল।† Huxley আরও একস্থানে বলিয়াছেন—চিন্তাও গতির ন্যায় জড়ের একটি ক্রিয়ামাত্র।‡ Tyndall তাঁহার এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন "I discern in that matter ... that the promise and potency of all terrestrial life."

এই জড়বাদের বিরুদ্ধে আমরা নিম্নলিখিত আপত্তিগুলির উল্লেখ করিতে পারি।

(১) কেবল জড়পদার্থ হইতে কখনও প্রাণের বা মনের উৎপত্তি হইতে পারে না। অনেক বৈজ্ঞানিক অনেক প্রকার পরীক্ষা ও আলোচনা করিয়াছেন কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহ প্রমাণ করিতে পারেন নাই যে কেবলমাত্র জড়পদার্থ হইতেই প্রাণ ও মনের উৎপত্তি হইয়াছে। Dr. Caird বলেন—জড় ও জীবনকে এক শ্রেণীর মধ্যে আনা যাইতে পারে না।*

(২) চিন্তাশক্তি যে মস্তিষ্কের বিকার মাত্র এ কথা কেহ প্রমাণ করিতে পারেন নাই। এমন কি Huxleyকেও স্বীকার করিতে হইয়াছে—স্নায়বিক আন্দোলনে কিরূপে চিন্তার উৎপত্তি হইতে পারে ইহা বলা অসম্ভব।†

(৩) জড়বাদীরা প্রামাণ্য বিষয় স্বীকার করিয়া লন, তাহার প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন না। দার্শনিক Green বলেন, It contains the fallacy of putting the cart before the horse." বর্ত্তমান রণসচীব Dr. Haldaneও ঠিক এই কথা

* There subsists the same relation between thought and the brain, as between bile and the liver.—Vogt.

† The thoughts to which I am now giving utterance and your thoughts regarding them are the expression of molecular changes in that matter of life which is the source of our other vital phenomena."—Huxley.

‡ Thought is as much a function of matter as motion is—Huxley.

* It still remains as impossible as ever to embrace organic under a common category with inorganic nature or to apply the principle of mechanical causation to the phenomena of life.—Dr. Caird.

† How it is that anything so remarkable as a state of consciousness comes about as the result of irritating nerve-tissue, is just as unaccountable as the appearance of the Djin when Aladdin rubbed his lamp in the story.—Huxley.

বলেন। তিনি বলেন যে মনের ভিতর আমরা জড়পদার্থের অস্তিত্ব বুঝিতে পারি, কারণ একটী জড়পদার্থ মনমধ্যস্থ ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের সমষ্টি ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারে না (a bundle of sensation); সুতরাং জড়পদার্থ দ্বারা মনের ব্যাখ্যা কিছুতেই সম্ভব হয় না এবং সে জন্যই জড়-পদার্থ জগতের আদি কারণ হইতে পারে না।

উপরি-উক্ত সমস্ত সন্দেহ ভঞ্জন জন্য অধিকাংশ দার্শনিক বলেন যে জগতের আদি কারণ 'আধ্যাত্মিক' (spiritual). এই মতাবলম্বীদের মধ্যেও অনেক প্রকারের মত আছে। Crude authroporuorphism (ঈশ্বরকে মানুষের ন্যায় ধারণা করা) হইতে আরম্ভ করিয়া শঙ্কর ও হেগেলের সর্ব্বেশ্বরবাদ (pantheism) পর্য্যন্ত এই মতের মধ্যে আসে। Prof. Fiske তাঁহার এক খানি পুস্তকে লিখিয়াছেন যে অধি-কাংশ ধর্ম্মেরই ঈশ্বর মানুষ ছাড়া আর কিছুই নহেন, তাঁহার শুভ্র কেশ আনাভি শ্মশ্রু, প্রশান্ত ও স্মিত মুখমণ্ডল,—তিনি বেশ 'High on a throne of royal state'এ বসিয়া বিচার করিতেছেন। এ সকল মতের সমালোচনা করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়, সুতরাং আমরা কেবল দার্শনিক মতেরই আলোচনা করিব।

অনেক দার্শনিকের মতে ঈশ্বর অসীম শক্তিসম্পন্ন, জ্ঞানময়, প্রাণময় জীববিশেষ। তিনি কোনও এক সময়ে এই পৃথিবী সৃজন করিয়াছেন, সুতরাং সেই ঈশ্বরই জগতের আদি কারণ। Dr. Martineau এবং খ্রীষ্টানদিগের মত সাধারণত এইরূপ Dr. Martineau ঈশ্বরের জীবত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছেন—তিনি বলেন—ঈশ্বরের অনন্ততা ও জীবত্ব এরূপ সম্বন্ধে জড়িত যে, ঈশ্বরের জীবত্ব অস্বীকার করিলে তাঁহার অনন্ততাও অস্বীকার করিতে হয়।* Dr. Martineau ঈশ্বরের চরিত্র অতি বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, এমন কি পড়িতে পড়িতে অনেক সময় বোধ হয় যেন Martineau সাহেব সবে মাত্র ভগবানের মন্ত্রণাগৃহ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন। এখন দেখা যাউক এরূপ ঈশ্বর জগতের আদি কারণ হইতে পারেন কি না। এ সম্বন্ধে আমাদের প্রধান আপত্তি এই যে জগৎ-সৃষ্টির ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। সৃষ্টির অর্থ কি? সাধারণতঃ স্রষ্টা দ্বারা কোনও এক বস্তুর রূপান্তরকরণকে আমরা সৃষ্টি বলি? কিন্তু Bibleএ লেখে 'God created this world out of nothing?' কিন্তু ইহা কিরূপে সম্ভব? অন্তত আমাদের বলিতে হইবে ইহা মনুষ্য ধারণার অতীত। Martineau এই ভ্রম খণ্ডন করিবার নিমিত্ত বলিয়াছেন যে ঈশ্বর বিনা উপা-দানে এ জগৎ সৃষ্টি করিতে পারেন না—এই উপাদানকে তিনি 'pure, unresisting space'—শূন্য, শক্তিবিহীন দিক্ নামে

* God's personality and infinity are so far inseparable concomitants that though you might deny his infinitude without prejudice to his personality you cannot deny his personality without sacrificing his infinitude.—Dr. Martineau.

অভিহিত করেন। Martineauর মত আমাদের নিকট যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না—কারণ,'creation out of nothing' যেরূপ আমাদের ধারণাতীত, 'pure unresisting space'ও ঠিক সেইরূপ। কিন্তু Martineauর কথা স্বীকার করিলেও ঈশ্বরকে আমরা আদি কারণ ও একমাত্র কারণ কিরূপে বলিতে পারি—তাঁহার বাহিরে অন্য বস্তু থাকিলে, তিনি অনন্ত হইলেন কিরূপে? তিনি ত কেবলমাত্র (effecient cause) নিমিত্ত কারণ হইলেন। আমাদের আর এক জিজ্ঞাস্য এই যে ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করিলেন কেন? ঈশ্বর কি কোনও অভাব অনুভব করিতেছিলেন? Dr. Caird জিজ্ঞাসা করেন—ঈশ্বর কি তখন এখনকার অপেক্ষা কিছু কম পূর্ণ ছিলেন? সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, ও উদ্ধারকর্তা ঈশ্বর কি সেই 'আপনাতে আপনি পূর্ণ' অনন্ত ঈশ্বরের অপেক্ষা মহত্তর?* আমাদের ন্যায়-দর্শন উত্তর দেন যে ঈশ্বর দয়া করিয়া এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন! কিন্তু আমার বোধ হয় এ বিষয়ে অনেকেই Schopenhauerএর মতাবলম্বী হইবেন—তিনি বলেন জীবনের বাস্তবিক মূল্য সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ আছে—জীবন-হীনতার অপেক্ষা ইহা শ্রেয়ঃ কি না সে বিষয়েও সন্দেহ আছে। যদি লোকের অভিজ্ঞতা দেখা যায় এবং একটু চিন্তা করা যায়, তাহা হইলে জীবনহীনতাই শ্রেয়ঃ বলিয়া বোধ হয়। মৃত লোকদের যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে তাহারা আর এ পৃথিবীতে আসিতে চায় কি না, তাহারা নিশ্চয়ই 'না' বলিবে।* আর সৃষ্টি বিষয়ে দয়ার ত কোনও সার্থকতা দেখা যায় না—দয়া প্রকাশ করিবার নিমিত্ত দয়ার পাত্র সৃজন করা ঠিক যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। মনে করুন আপনার একটী অন্ধের প্রতি দয়া করিতে ইচ্ছা হইতেছে, কিন্তু অন্ধ খুঁজিয়া পাইতেছেন না—এ স্থলে আপনি কি আপনার এক বন্ধুর চক্ষু উৎপাটন করিয়া দয়ার পাত্রের সৃষ্টি করিবেন? আমাদের দর্শন ঐ আপত্তির আর কোনও উত্তর দিতে পারে না।

এই সমালোচনার পর বোধ হয় আমরা বলিতে পারি যে সৃষ্টিতত্ত্ব ভ্রমাত্মক। এখন আমরা বেদান্ত, সাংখ্য, Hagel, Green, Haldane ও Spencer লিখিত বিবর্ত্তবাদ সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া আজিকার প্রবন্ধ শেষ করিব। বিবর্ত্তবাদ সৃষ্টিবাদের ঠিক বিপরীত মত। ইহার মতে ঈশ্বর ও জগৎ অনন্ত কালের জন্য একত্র অবস্থান করিতেছে ও করিবে (co-eternal). সময় হিসাবে দেখিলে কেহ কাহারও পূর্ব্বে নয়। অনন্তও সান্ত

* Was God less than he is now? and is the God of creation, providence and redemption greater than the Solitary, Self-sufficient God the abstract Infinitude of the eternal past?—Dr. Caird.

* "The objective value of life is a very dubious affair and it is questionable at least, whether it is preferable to non-existence; nay, if experience and reflection are called to council, non-existence can hardly fail to win. Knock at the graves, and ask the dead whether they would rise again; they will shake their heads.—Schopenhauer.

চিরদিনের জন্য একই নিয়মে একই সূত্রে গ্রথিত। একের অস্তিত্ব অপর ব্যতীত সম্ভব নয়। বৈদান্তিকদের মতে ব্রহ্মণ এই জগতের নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণ, তিনি কেবল মাত্র জগৎপরিচালক নহেন—তিনি নিজেই জগৎ-ক্রিয়া। বৈদান্তিকেরা নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকদিগের মত কোনও উপাদান (material cause, atoms) স্বীকার করিয়া ঈশ্বরকে সান্ত করেন না। এক কথায় "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রযন্ত্যভিসম্বিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্বতদ্‌ব্রহ্ম।" জগৎ ও ব্রহ্মণ একই পদার্থ কেবল মায়াহেতু উভয়ে বিভিন্ন বলিয়া মনে হয়। Hagel এর মতও অনেকটা এইরূপ বলিয়া আমাদের মনে হয়—Hagelএর মতে ঈশ্বর কোনও জীববিশেষ (personal) নহেন—তাঁহাকে আমরা absolute spirit অনন্ত আত্মা বলিতে পারি (এই স্থলে আমার বলা কর্ত্তব্য যে অনেকেই হেগেলের অনেক প্রকার ব্যাখ্যা করেন। Ffliederer আমাদের এই ব্যাখ্যার বিরোধী, তিনি বলিবেন যে Hagel Personal Godএ বিশ্বাস করিতেন এবং তাঁহার Absolute Spirit, Personal Godকেই বুঝায়) এই অনন্ত আত্মা-নিজের অন্তর্নিহিত শক্তি দ্বারা পরিচালিত হইয়া এই পরিবর্ত্তনশীল জগতে বিকাশ প্রাপ্ত হইতেছে। সুতরাং এই জগৎ সেই অনন্ত শক্তির রূপান্তর মাত্র, কেবল তাহাই নহে এ জগতের অন্তও সেই অনন্ত আত্মা—The Absolute Ideal—অনন্ত আদর্শ—"That Far off divine event towards which the whole creation moves." এই জগতের বস্তু সকল কেবল সেই অনন্ত আত্মার আত্মবিকাশের (self-realisation) বিভিন্ন সোপান মাত্র। অনন্ত আত্মা কখনও বাহিরের উপাদান অনুসন্ধান করে না—ইহা স্বয়ং পূর্ণ। Dr. Haldane অতি প্রাঞ্জলভাবে এই কথাটী বুঝাইয়াছেন—অনন্ত আত্মার পক্ষে চিন্তা করাই সৃজন করা। অনন্তের চিন্তার জন্য যদি কোনও দ্বিতীয় বস্তু আবশ্যক হয় তাহা হইলে অনন্ত নিজেই সেই বস্তু, কারণ অনন্তের বাহিরে আর কিছু থাকিতে পারে না।* এখন দেখা যাইতেছে যে এই সকল সর্ব্বেশ্বরবাদীরা (pantheist) দুইটী সত্ত্বা স্বীকার করেন না—জগৎ ও তাহার আদি কারণ একই বস্তু কার্য্যকারণের রূপান্তর মাত্র।

অনেকে শুনিলেই হয়ত আশ্চর্য্য হইবেন কিন্তু আমার বোধ হয় যে Spencer ও বেদান্তের মত প্রায় এক প্রকার। Spencer বলেন যে এই জগতের কারণ অনন্ত শক্তি—absolute power—এ শক্তির কল্পনা ভিন্ন আমরা জগতের অস্তিত্ব কল্পনা করিতে পারি না—"It is the datum of consciousness"—সমস্ত জগৎ—জড় ও আধ্যাত্মিক—সেই শক্তির রূপান্তর ব্যতীত আর কিছুই নয়। বস্তুতঃ শক্তি বৈদ্যুতিকই

* For the absolute mind and in the absolute mind to think must be to create. If the absolute mind must have, as is implied in the fact of self-consciousness, an object, it is plain that object can only be itself. For the absolute mind nothing can have any meaning, outside itself.—Dr. Haldane.

হউক, বাস্পীয় হউক, স্নায়বিক হউক, কি মানসিক হউক, সকলই সেই এক শক্তির বিকাশ মাত্র (evolution)—আবার এক দিন এই সব বিভিন্ন শক্তি সেই মহাশক্তিতে হইবে (dissolution). কিন্তু এই মহাশক্তির প্রকৃতি কিরূপ তাহা আমরা কিছুই বলিতে পারি না, কেবল মাত্র জানি যে জগতের আদি কারণ অনন্ত শক্তি। আমরা উপরি উক্ত সমস্ত মত সমালোচনা করিয়া দেখিতে পাই যে জগতের আদি কারণ শক্তি ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারে না। আমরা সেই কারণের প্রকৃতি যে আরও বিশেষ করিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারি, তাহাও আমাদের বোধ হয় না; কারণ যে পরিমাণে আমরা সে শক্তিকে বিশেষণে বিভূষিত করিব, সেই পরিমাণে আমরা তাহাকে সীমাবদ্ধ করিব। কেহ আপত্তি করিতে পারেন 'শক্তি' ও 'সত্বা' বলিলেই ত তাহাকে সীমাবদ্ধ করা হইল, কিন্তু ইহার উত্তরে আমরা বলিব 'শক্তি' বা 'সত্বা' এরূপ universal বা abstract term যে আমাদের মনুষ্যবুদ্ধি ইহার উপরে আর উঠিতে পারে না, আর 'শক্তি' বা 'সত্বা' বলিলে কোনও বিশেষ শক্তি বা বিশেষ স্বত্বা বুঝি না। বৌদ্ধদার্শনিকের এই ভ্রম সংশোধনার্থ তাঁহাদের নির্ব্বাণকে সৎ ও অসৎ (existence or non-existence) উভয়েরই অতীত বলেন। আমরা সাংখ্য-সূত্র "ঈশ্বরাসিদ্ধে প্রমাণাভাবাৎ" এই অর্থে গ্রহণ করি, জ্ঞানময় প্রাণময় লোকের পূজায় ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণাভাব হেতু অসিদ্ধ। সাংখ্যেরা কখনও জগতের আদি কারণ অনন্ত শক্তিমানে অবিশ্বাস করিতে পারেন না, কারণ তাহা হইলে তাঁহাদের প্রকৃতি ও পুরুষ চিরকালই বিভিন্ন অবস্থায় অবস্থান করিত, এ জগৎসৃষ্টি কখনও হইত না। এখন আমাদের আলোচনার শেষ করি—যে আদি কারণের অনুসন্ধানে বহির্গত হইয়াছিলাম, তাহা পাইয়াছি; সেই অনন্ত শক্তি—জগৎ যাহার ক্রমবিকাশের সোপান মাত্র—সেই আদি কারণ কবির কথায় বলিতে হইলে,—

"Something far more
deeply interposed,
Whose dwelling is the
light of the setting sun,
And the round ocean and
the living air,
And the blue sky and in
the mind of man;
A motion and a spirit that impels
All thinking things, all objects
of all thoughts
And rolls through all things... :"

শ্রীসীতারাম বন্দ্যোপাধ্যায়।

হিন্দুত্ব কি ?

যদি খ্রীষ্টিয়ানকে জিজ্ঞাসা করা যায় যে তোমার ধর্ম্ম কি, খ্রীষ্টিয়ান তাহার ধর্ম্মমূলক বিশ্বাস একে একে বর্ণনা করিতে পারিবেন। সেই বিশ্বাস যাহার আছে, সে খ্রীষ্টিয়ান, যাহার নাই, সে খ্রীষ্টিয়ান নহে। মুসলমানকে ঐরূপ প্রশ্ন করিলে মুসলমান কলমার আবৃত্তি করিবেন। বৌদ্ধ পাঁচশীলা পড়িবেন। কিন্তু হিন্দুকে জিজ্ঞাসা করিলে এমন কোন উত্তর প্রত্যাশা করা যায় না যে এক জন হিন্দু যাহা হিন্দুধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস বলিয়া উল্লেখ করিবেন তাহা অপর কোন হিন্দু বিনা আপত্তিতে তথাস্তু বলিয়া গ্রহণ করিবেন। পুনর্জন্ম, কর্ম্মফল প্রভৃতি যে সকল মতে সাধারণত হিন্দুদিগের বিশ্বাস তাহাতে সাধারণত বৌদ্ধদিগেরও বিশ্বাস। এজন্য ঐসকল মত হিন্দুর ধর্ম্মের বিশেষত্ব বলিয়া উল্লেখের অযোগ্য।

এরূপ স্থলে অন্য পন্থা অবলম্বন না করিলে হিন্দুত্ব যে কি তাহার মীমাংসা অসম্ভব। প্রথমত দেখা আবশ্যক যে, হিন্দু এক জাতির নাম ও হিন্দু এক ধর্ম্মের নাম। এই ভারতবর্ষে খ্রীষ্টিয়ান মুসলমান ভিন্ন অপর যে সকল লোক বাস করে তাহাদের সাধারণ জাতিবাচক নাম হিন্দু। এ নাম প্রাচীন নহে। মুসলমান প্রভাবের কালে এই নামের সৃষ্টি না হইলেও ইহার এদেশে সাধারণ্যে প্রচার। প্রাচীন পারশ্য ভাষায় 'স'কারের স্থানে 'হ'কার ব্যবহার হইত, যেমন এখনও পূর্ব্ববঙ্গে ব্যবহার হয়। তদনুসারে ভারতের পশ্চিমসীমাস্থ প্রাচীন সিন্ধু নদই প্রাচীন পারশিকের নিকট 'হিন্দু' বলিয়া পরিচিত ছিল। জেন্দা-বেস্তায় 'হপ্ত' হিন্দ' শব্দের উল্লেখ আছে। এই হিন্দু শব্দই 'হ'কার উচ্চারণে অক্ষম গ্রীকদিগের মুখে 'ইন্দস' 'ইন্দিয়া' এই আকার ধারণ করে। ইদানীন্তন কেহ কেহ বলেন যে, প্রচলিত পারশ্য ভাষায় কৃষ্ণবর্ণ এই অর্থে হিন্দু শব্দের প্রচলন আছে। ভারতবাসী অপেক্ষাকৃত কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া পারশ্যবাসীর নিকট হিন্দু। তন্ত্রবিশেষে উক্ত হইয়াছে যে "হীনং দূষয়তীতি হিন্দুঃ"। সে যাহা হউক খ্রীষ্টিয়ান ও মুসলমান ভিন্ন ভারতবাসীই যে হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ইহা প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধ। ভুটিয়া, লেপচা, কুকী প্রভৃতিকে বর্ত্তমান অবস্থায় হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্গত বলিয়া কোন মতেই উল্লেখ করা যায় না। ইহা স্পষ্ট যে এ দিক হইতে চাহিলে হিন্দুদিগের মধ্যে কেহ কোন সাধারণ বন্ধনী দেখিতে পাইবেন না।

অতএব হিন্দুর সাধারণ বন্ধনী অবিশ্বাসের জন্য অন্য দিক হইতে অনুসন্ধান আবশ্যক। ব্রাহ্মণ ভিন্ন হিন্দু নাই। হিন্দু নামধারী যাহাদিগকে ব্রাহ্মণগণ পরিত্যাগ করেন, তাহারাও ব্রাহ্মণকে পরিত্যাগ ও অমান্য করে না। ব্রাহ্মণত্যক্ত হিন্দু আছে, কিন্তু ব্রাহ্মণত্যাগী হিন্দু নাই। ব্রাহ্মণগণ পঞ্চ

দ্রাবীড় ও পঞ্চ গৌড় ও তাহার শাখা-প্রশাখা লইয়া অসংখ্য শ্রেণীতে বিভক্ত। যৌন সম্বন্ধের কথা দূরে থাকুক এই সকল শ্রেণীর মধ্যে সহভোজন পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ। কিন্তু যেমন ব্রাহ্মণ ভিন্ন হিন্দু নাই তেমনই গায়ত্রী ভিন্ন ব্রাহ্মণ নাই। যেমন হিন্দুর মধ্যে ব্রাহ্মণের প্রাধান্য তেমনই সমস্ত ব্রাহ্মণের মধ্যে গায়ত্রীর প্রাধান্য সর্ব্ববাদী-সম্মত। বৈদিক ও তান্ত্রিক উভয়বিধ শাস্ত্রেই গায়ত্রীর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত।

ভাগবান মনু বলিয়াছেন—

"ওঙ্কার পূর্ব্বিকাস্ত্রিস্রোমহাব্যাহৃতয়োঽব্যয়াঃ।
ত্রিপদা চৈব সাবিত্রী বিজ্ঞেয়ং ব্রহ্মণো মুখং॥
যোঽধীতেঽহন্যহন্যেতান্ ত্রীণি বর্ষান্যতন্দ্রিতঃ
স ব্রহ্ম পরমভ্যেতি বায়ুভূতঃ খমূর্ত্তিমান্॥
ত্রিভ্য এবতু বেদেভ্যঃ পাদং পাদমদূদুহৎ।
তদিত্যুচোঽস্যাঃ সাবিত্র্যাঃ পরমেষ্ঠী প্রজা-পতিঃ।

[প্রণব পূর্ব্বক তিন মহাব্যাহৃতি অর্থাৎ—ভূর্ভুবঃস্বঃ আর ত্রিপাদ গায়ত্রী এই তিন ব্রহ্মপ্রাপ্তির দ্বার হইয়াছেন। যে ব্যক্তি প্রণব ও ব্যাহৃতি এবং গায়ত্রী এই তিনকে তিন বৎসর প্রতিদিন নিরালস্য হইয়া জপ করে সে ব্যক্তি পরব্রহ্মে অভিনিবিষ্ট হয় এবং পবনতুল্য বিভূতিবিশিষ্ট হইয়া শরীর-নাশের পর ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়"।

"তৎসবিতুরিত্যাদি যে এই গায়ত্রী তাহার তিন পদকে তিন বেদ হইতে ব্রহ্মা উদ্ধার করিয়াছেন"।—রামমোহন রায় কৃত অনুবাদ।

যোগী যাজ্ঞবল্ক্য যাঁহার বাক্য স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দন প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি বলেন :-

"প্রণবব্যাহৃতিভ্যাঞ্চ গায়ত্র্যা ত্রিতয়েনচ।
উপাস্যং পরমংব্রহ্ম আত্মা যত্র প্রতিষ্ঠিতঃ॥
ভূর্ভুবঃস্বস্তথাপূর্ব্বং স্বয়মেবস্বয়ম্ভুবা।
ব্যাহৃতা জ্ঞানদেহেন তেন ব্যাহৃতয়ঃ স্মৃতাঃ॥"

["প্রণব এবং ব্যাহৃতি ও গায়ত্রী এই তিনের প্রত্যেকের অথবা সমুদয়ের দ্বারা বুদ্ধিবৃত্তির আশ্রয় যে পরব্রহ্ম তাহার উপাসনা করিবেক।

যেহেতু পূর্ব্বকালে স্বয়ং ব্রহ্মা সমুদয় বিশ্ব যে ভূর্ভুবঃস্বঃ তাহাকে ঈশ্বরের দেহ-রূপে ব্যবহৃত করিয়াছেন অর্থাৎ কহিয়া-ছেন, সেই হেতু ঐ তিনকে ব্যাহৃতি শব্দে কহা যায়, অতএব ঐ তিন শব্দ ত্রিলোক-ব্যাপক ঈশ্বরের প্রতিপাদক হন।"]

মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে :—

তথা সর্ব্বেষু মন্ত্রেষু গায়ত্রী কথিতা পরা।
জপেদিমাং মনঃপূতং মন্ত্রার্থমনুচিন্তয়ন্॥
প্রণব ব্যাহৃতিভ্যাঞ্চ গায়ত্রী পঠিতা যদি।
সর্ব্বাসু ব্রহ্মবিদ্যাসু ভবেদাশু শুভপ্রদা—॥
প্রাতঃ প্রদোষে রাত্রৌ বা জপেদ্ব্রহ্মমনা ভবন্। পূর্ব্বপাপবিমুক্তোঽসৌ নাধর্ম্মে কুরুতে মনঃ॥ প্রণবং পূর্ব্বমুচ্চার্য্য ব্যাহৃতি ত্রিতয়ন্তথা। ততস্ত্রিপাদগায়ত্রীং প্রণবেন সমাপয়েৎ। যস্মাৎ স্থিতিলয়োৎপত্তির্যেন ত্রিভুবনং ততঃ। সবিতুর্দ্দেবতস্যান্তর্যামি তদ্‌ভর্গমব্যয়ং॥—বরণীয়ং চিন্তয়ামঃ সর্ব্বান্ত-র্যামিনং বিভুং। যঃ প্রেরয়তি বুদ্ধিস্থো ধিয়োঽস্মাকং শরীরিণাং॥ এবমর্থযুতং মন্ত্র-ত্রয়ং নিত্যং জপেন্নরঃ। বিনাঽন্য নিয়মায়াসৈঃ সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ। একমেবাদ্বিতীয়ং যৎ সর্ব্বোপনিষদাং মতং। মন্ত্রত্রয়েন নিষ্পন্নং তদক্ষরমগোচরং॥ একধা দশধা বা যঃ

শতধা বা পঠেদিমাং, একাকী বহুভির্ব্বাপি সংসিদ্ধোদ্ভুত্তরোত্তরং ॥ জপান্তে সংস্মরেদ্দ্ধ একমেবাদ্বয়ং বিভুং। তেনৈব সর্ব্বকর্ম্মাণি সম্পন্নান্যকৃতান্যপি ॥ অবধূতো গৃহস্থো বা ব্রাহ্মণোহব্রাহ্মণোপি বা। তন্ত্রোক্তেষ্বেষু মন্ত্রেষু সর্ব্বে স্যুরধিকারিণঃ ॥

["সেই মতে সকল মন্ত্রের মধ্যে গায়ত্রীকে শ্রেষ্ঠরূপে কহিয়াছেন মনের পবিত্রতা যখন হইবেক তখন মন্ত্রার্থ চিন্তা পূর্ব্বক তাঁহার জপ করিবেক। প্রণব ও ব্যাহৃতির সহিত গায়ত্রী যদি পঠিত হন তবে অন্য সকল ব্রহ্মবিদ্যা অপেক্ষা করিয়া গায়ত্রী ঝটিতি শুভ প্রদান করেন। প্রাতে অথবা সন্ধ্যায় অথবা রাত্রিকালে পরমেশ্বরে আবিষ্ট চিত্ত হইয়া ইঁহার জপ করিলে সে ব্যক্তি পূর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত এবং পরে অধর্ম্ম কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় না। প্রথমে প্রণবের উচ্চারণ করিবেক পরে তিন ব্যহৃতি তাহার পর গায়ত্রী পাঠ করিয়া শেষে প্রণবে সমাপ্তি করিবেক। যাঁহা হইতে স্থিতি, লয় ও সৃষ্টি হয়, যিনি ভুবনত্রয় ব্যাপিয়া রহেন সূর্য্য-দেবের সেই অন্তর্যামী অতি প্রার্থনীয় অনির্ব্বনীয় জ্যোতিরূপ অব্যয় সর্ব্বান্তর্যামী বিভুকে আমরা চিন্তা করি যিনি আমাদের বুদ্ধিস্থ হইয়া আমাদের বুদ্ধি সকলকে প্রেরণ করিতেছেন। এই রূপ অর্থ যুক্ত তিন মন্ত্রকে নিত্য জপ করিলে অন্য নিয়ম ও অভ্যাস ব্যতিরেকে সর্ব্ব সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়। একমাত্র দ্বিতীয় রহিত যিনি সকল উপনিষদে কথিত হইয়াছেন, সেই নিত্য মনোবুদ্ধি ইন্দ্রিয়ের অগোচর পূর্ব্বোক্ত এই তিন মন্ত্রের দ্বারা প্রতিপাদিত হইলেন। একবার অথবা দশবার অথবা শতবার যে ব্যক্তি একাকী অথবা অনেকের সহিত হইয়া এ সকলের জপ করে সে উত্তরোত্তর সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়। জপ সাঙ্গে পুনরায় সেই এক অদ্বিতীয় বিভুকে স্মরণ করিবেক ইহার দ্বারা তাবৎ বর্ণাশ্রম কর্ম্ম না করিলে সে সকল সম্পন্ন হয়। অবধূত অথবা গৃহস্থ সেইরূপ ব্রাহ্মণ কিম্বা ব্রাহ্মণ ভিন্ন এই তন্ত্রোক্ত মন্ত্রে সকল অধিকারী ॥—ঐ]

এই সকল বাক্য হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায় যে গায়ত্রীর রহস্যভেদ করিতে পারিলে হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত ভিত্তি আবিস্কৃত হইবে। ইহা প্রস্তাবান্তরে অনুসন্ধেয়।

শ্রীমোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়।

স্বাস্থ্য ও শিক্ষা

অনেকের বিশ্বাস—"সার্থক জীবন" দৈব প্রসাদ ভিন্ন আর কিছু নয়। বলা বাহুল্য ইহা তাঁহাদিগের মস্ত ভুল। কাহারও জীবন সফলই হউক, আর নিস্ফলই হউক, ইহা তাঁহার শিক্ষার অবশ্যম্ভাবী ফল। শিক্ষা দ্বারা তাঁহার শরীর ও মন যেরূপ পূর্ণ ও কার্য্যকারী হইবে তাঁহার ভাবী জীবন ও সেই পরিমাণে মঙ্গলময় হইয়া উঠিবে। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশে যেরূপ শিক্ষার প্রচলন তাহাতে তাহা হইতে দেখা যায় না।

জননী ইউনিভারসিটি (University) ক্রোড়স্থ সন্তানগুলিকে যেমনি ভূমিতে

নামাইয়া দিতেছেন অমনি কোথা হইতে অকাল মৃত্যু ও অকাল বার্দ্ধক্য নামক দুইটা দৈত্য আসিয়া উহাদিগকে টপ্ করিয়া মুখে ফেলিয়া দিতেছে। এমনি তীরবেগে বাঙ্গালী জাতিটা পৃথিবীতল হইতে লোপ পাইতে বসিয়াছে!

এদেশে সাধারণত ২৩।২৪ বৎসর বয়সে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত হইতে দেখা যায়। জীবনের এই ২৩।২৪ বৎসরের প্রায় ⅔ অংশ বিদ্যা অর্জ্জনে ব্যয়িত হয়। হিসাব মত বলিতে গেলে যদিও ইহার সমস্তটাকে বাল্যকাল বলা চলে না, কেননা শৈশব ও যৌবনের কতকটা ইহার অন্তর্গত, তবুও সুবিধার জন্য আমরা না হয় জীবনের এই তরুণ বর্ষ কয়টিকে বাল্যের কোটায় নিক্ষেপ করিলাম।

এই সময়ে বালকের পিতামাতা ও শিক্ষকগণ উহার শুভাশুভ বিষয়ে যে পরিমাণে ধ্যান, চিন্তা ও চেষ্টা করিবেন, বালকের পরিণতিও সেই পরিমাণে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইবে। এ বিষয়ে তাঁহারা যতই উদাসীন হইবেন বালকের উত্তর জীবনে ততই স্বাস্থ্যের অভাব ও রোগপ্রবণতা দৃষ্ট হইবে। শিক্ষা বিষয়ে বাপ-মা ও শিক্ষকগণ তাঁহাদের নিজ নিজ কর্ত্তব্য যে পালন করিয়া আসিতেছেন আমাদের নিকট তাহা বোধ হয় না। তাঁহারা গোড়াতেই একটা মস্ত ভুল করিয়া বসেন—তাঁহারা গোটাবালকটিকে না ভাবিয়া উহার দেহ ও মনকে যেন স্বতন্ত্র ভাবে ভাবিয়া থাকেন, অথবা দেহের কথা আদৌ চিন্তা করেন না বলিলে আরও সত্য বলা হয়। শিক্ষক মহাশয় মনে করেন বালকের মনের পরিণতি ও উন্নতি সাধনই তাঁহার একমাত্র কাজ—মন ছাড়া বালকের দেহ বলিয়া যে একটা কিছু আছে, যাহার উন্নতি-অবনতির জন্য তিনি তুল্য দায়ী, এ কথাটা তাঁহার মনে ভুলিয়াও উদয় হইতে দেখা যায় না।

বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর প্রধান দোষ এই যে ইহা বালকবিশেষের শক্তি, মেধা প্রভৃতির স্বতন্ত্র বিচার না করিয়া সকলকেই যেন এক ছাঁচে ফেলিয়া মানুষ করিতে চায়, ইহাতে কতগুলি বালকের একেবারে বুদ্ধির বিকাশ হইতে পায় না, কতগুলির আবার তাহা এত অস্বাভাবিক ও অসামান্য মাত্রায় হয় যে উহা জলবুদ্বুদের ন্যায় উঠিয়াই লীন হইয়া যায়।

শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য দেহ ও মন উভয়ের তুল্য পরিণতি ও উন্নতি সাধন করা। আমাদের বর্ত্তমান বিদ্যালয়গুলিতে দেহের উন্নতির দিকটা একবারেই উপেক্ষিত হয়। এরূপ শিক্ষাকে শিক্ষাপদবাচ্যই করা উচিত নয়।

চিকিৎসক সম্প্রদায়ের কর্ত্তব্য এই ভুলটা সংশোধন করিয়া দেওয়া। আমি বেশ জানি প্রথম প্রথম তাঁহাদের সুযুক্তিপূর্ণ বাক্যে কেহই কর্ণপাত করিবে না, কিন্তু সেই ভয়ে নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিলেও তো আর চলে না। শুধু কি রোগ-বিমোচনের চেষ্টাই তাঁহাদের এক মাত্র কাজ? কি করিলে আমাদের শিশু ও বালকদিগের দেহের উন্নতি হয় শরীর সক্ষম ও পটু হয়, কি ভাবে রাখিলে উহারা ব্যাধির হাত হইতে ত্রাণ পাইতে পারে, এ সকল বিষয়ের বিধি নির্দ্দেশ করাও

কি তাঁহাদের অবশ্য কর্ত্তব্যের মধ্যে নয়? একটা জাতির দিন দিন অবনতি হইতেছে ইহা দেখিয়া তাহার নিবারণের কোন উপায় উদ্ভাবনের জন্য সমাজের নিকট তাঁহাদের কোনরূপই দায়িত্ব নাই কি?

বালকের শরীর ও মন উভয়ের যাহাতে সম্পূর্ণ পরিণতি হয় শিক্ষা প্রদান কালে ইহাই একমাত্র লক্ষ্য হওয়া কর্ত্তব্য।

বালককে কি ভাবে শিক্ষা দিতে হইবে তাহা স্থির করিবার পূর্ব্বে উহার শরীর ও মনের স্বাভাবিক অবস্থা সম্যক্ পরিজ্ঞাত হওয়া আবশ্যক।

এই তিন শ্রেণীর বালকেরা বিশেষ যত্ন ও তত্ত্বাবধানের পাত্র—

১। সুকুমার দেহ অথবা রুগ্ন, কৃশ বালকগণ।

২। যাহাদের ইতিপূর্ব্বে এমন কোন ব্যাধি হইয়া গিয়াছে, যাহা সুবিধা পাইলে পুনরায় হইতে পারে সেইরূপ বালকগণ।

৩। পিতৃপিতামহানুক্রমে সমাগত কোন বিশেষ ব্যাধিগ্রস্তের সন্তানগণ আপাতত যদিও ইহাদের দেহে পৈতৃক রোগের কোন লক্ষণই দৃষ্ট হয় না বটে, কিন্তু কে বলিতে পারে কালক্রমে তাহা হইবে কি না? এই শ্রেণীর রোগ কি কি, চিকিৎসকগণ অবশ্য তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন। শৈশব ও বাল্যে যথোচিত সতর্কতা অবলম্বন করিলে অনেক স্থলে এই সকল কুলক্রমাগত রোগসমূহ বংশ হইতে দূর করিতে পারা যায়, আর তাহা না পারিলেও ইহাদের প্রবলতা যে অনেক পরিমাণে হ্রাস করিতে পারা যায় তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

বালকের দৈর্ঘ ও ভারত্ব।—

সুস্থ বালকের দৈর্ঘ্য ও ভারত্ব প্রতিবৎসর বৃদ্ধি হওয়া উচিত। এ সম্বন্ধে গুটিকত কথা সকলেরই জানা কর্ত্তব্য। বালক যে মাসে মাসে নিয়মিত ভাবে বাড়ে তাহা নহে। বসন্ত ও গ্রীষ্ম ঋতুর প্রারম্ভে উহারা সর্ব্বাপেক্ষা মাথায় বাড়ে—দেহের ভারত্ব কিন্তু তাদৃশ বাড়ে না। শরৎকালে আবার তাহারা সর্ব্বাপেক্ষা ওজনে বাড়ে, দৈর্ঘের বৃদ্ধি তেমন দেখা যায় না। শীতকালে তাহাদের সর্ব্বপ্রকার বাড়ই একরূপ বন্ধ থাকে। আর এক কথা এই যে বালকের দৈর্ঘ্যের ও দেহের ভারত্বের মধ্যে একটা নির্দ্দিষ্ট সম্বন্ধ আছে। প্রতি বৎসর দেখা উচিত এই স্বাভাবিক সম্বন্ধের কোন রূপ ব্যতিক্রম ঘটিতেছে কি না।

কোন বালক যদি আশৈশব রোগে ভুগিতে থাকে তাহার মা ইহা দৈব দুর্ব্বিপাক মনে করিয়া নিশ্চিন্ত ও নিশ্চেষ্ট থাকেন। এই সকল বালকের জীবনের গতিবিধির পরিবর্ত্তন করিলে এবং ইহাদিগকে সুচিকিৎসাধীনে রাখিলে রোগ দূর হওয়া একেবারে অসম্ভব নয়।

মানুষের ভাগ্যে যত প্রকার সুখ আছে, তাহার মধ্যে সতেজ, কার্য্যকর পুরুষত্ব লাভই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। স্বাস্থ্যপূর্ণ শৈশব ও বাল্যই এই সুখের এক মাত্র প্রবেশদ্বার। বাপ-মা যেন মনে রাখেন তাঁহাদের সন্তানগণ তাঁহাদিগের নিকট যে সকল ধনরত্নাদিলাভ করে তাহার মধ্যে স্বাস্থ্যলাভকেই তাহারা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও আদরণীয় বলিয়া বিবেচনা করে। স্বাস্থ্যের নিম্নে অবশ্য সুশিক্ষা। ইহার জন্যও সন্তানগণ পিতামাতার নিকট ঋণী

রহিবে। চেষ্টা করিলে সকলেই নিজ নিজ সন্তানগণকে উক্ত দুই সুখে সুখী করিতে পারেন।

স্বাস্থ্য প্রধানত দুইটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে—

১ম। ব্যক্তি বিশেষের অন্তর্নিরূঢ় ধর্ম্ম বা গুণ।

২য়। বালকের স্বাভাবিক চতুষ্পার্শ্বস্থ অবস্থানিচয়।

বীজ যদি ভাল হয় আর তাহা যদি সময়ে উপযুক্ত ক্ষেত্রেই উপ্ত হয়, তবেই কালক্রমে তাহা মহা মহীরুহে পরিণত হইয়া থাকে, নচেত নহে।

বালককেও যদি তাহার বৃদ্ধির অনুকূল অবস্থার মধ্যে রাখিয়া লালন পালন করা হয়, তবেই একদিন তাহাকে সুস্থকায়, পূর্ণকলেবর দেখিবার আশা করা যাইতে পারে। ইহার অন্যথাচারণ করিলে উহাকে অপরিণত অনুন্নত দেহ, চিররুগ্ন, নিস্তেজ, দুর্ব্বলচিত্ত ও ভীরুস্বভাব ভিন্ন আর কি কল্পনা করা যাইতে পারে ?

বালকের চারিদিকের অবস্থাসমূহ—

বালকদিগকে সহরে না রাখিয়া কোন স্বাস্থ্যকর পল্লীগ্রামে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। আমাদের দেশের স্কুলগৃহগুলি বালকের স্বাস্থ্যের পক্ষে সুবিধাজনক বলিয়া মনে হয় না। একটি বৃহৎ প্রাসাদের এক একটি কক্ষে এক একটি শ্রেণী নির্দ্দিষ্ট না হইয়া প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য এক একটি সম্পূর্ণ পৃথক বাড়ী নির্দ্দিষ্ট হইলে বালকের স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই মঙ্গলকর হয়।

যে সকল বালকের পক্ষে মফস্বলে থাকা অসম্ভবপর নয়, অন্তত ছুটির দিন কয়টা তাহারা যাহাতে মফস্বলে অতিবাহিত করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা একান্ত কর্ত্তব্য। সহরে অবস্থিতি কালে যাহাদের সর্দ্দি কিছুতেই ছাড়িতে চাহে না পল্লীগ্রামে-যাইবামাত্র তাহা বিদূরিত হয়।

সহরের বায়ু পল্লীগ্রামের তুল্য বিশুদ্ধ নহে। একে তো সহরে সূর্য্যালোক পল্লীর তুল্য সুলভ নহে তাহাতে জনাকীর্ণতা ও কলকারখানার ধূমে সহরের বায়ুর স্বাভাবিক বিশুদ্ধতা একবারে নষ্ট হইয়া যায়। বহু দিন সহরে বাস করিয়া সহসা যদি কোন পল্লীগ্রামে যাওয়া যায়—বিশুদ্ধ বায়ুর মাহাত্ম্য সেই দণ্ডেই সর্ব্ব শরীরে অনুভূত হইয়া থাকে।

বালকদিগকে কোনমতেই অপর্য্যাপ্ত আলোকে ও সঙ্কীর্ণ গৃহে বাস করিতে দিতে নাই। এ দেশে বালকেরা সচরাচর যেরূপ গৃহে বাস করিয়া থাকে তাহাতে বায়ু চলাচলের সেরূপ অনুকূল ব্যবস্থা দৃষ্ট হয় না। সুতরাং তাঁহারা দিনরাত একই বায়ু পুনঃ পুনঃ গ্রহণ ও ত্যাগ করিয়া থাকে। ইহাতে তাঁহাদের দেহের অবনতি ও স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়।

বিশুদ্ধ বায়ুর অভাবে অভ্যন্তরস্থ ইন্দ্রিয় সকলের কার্য্যাদি সুসম্পাদিত হইতে পায় না। দেহদুর্গ বহিঃশত্রুর আক্রমণ সহ্য করিতে অসমর্থ হয়। এ অবস্থায় যক্ষ্মা প্রভৃতি ক্ষয়রোগের বীজ অনায়াসেই দেহে প্রবেশ করে এবং দৃঢ়ভাবে শিকড় গাড়িয়া বসে।

অনেকে মনে করেন বালকেরা যখন প্রৌঢ়দিগের অপেক্ষা ক্ষুদ্রায়তন, তখন

উঁহাদের বেলায় বসবাস ও শয়নাদির জন্য প্রৌঢ়দিগের সমান স্থান হওয়া উচিত নয়। ইহা অতি সাংঘাতিক ভুল। যথেষ্ট বিশুদ্ধ বায়ু প্রাপ্ত না হইলে বালকেরা কিছুতেই বাড়িতে পারে না।

বাস-ভূমি—

এ সম্বন্ধে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন কে না জানে স্যাঁৎস্যাতে আদ্রভূমি রোগের আকর? বালকদিগের বাসভূমিতে ও তাহার সমীপে যাহাতে জল না জমিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। যাহাদের সর্দ্দির ধাত এবং যাহারা যক্ষ্মারোগগ্রস্তের সন্তান তাহাদিগকে শুষ্ক অথচ নাতিগ্রীষ্ম দেশে রাখিয়া শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। ইহাদের অকালমৃত্যু নিবারণের ইহাই একমাত্র উপায়।

পোষাক-পরিচ্ছদাদি—

শরীরের ক্লেদ নির্গমন এবং দেহের তাপ রক্ষণ ও নিয়মিতকরণ ত্বকের অন্যতম ক্রিয়া। এই নিমিত্ত ত্বকের স্বাস্থ্য রক্ষা করা একান্ত আবশ্যক। সহসা হিম লাগিয়া অথবা তাপ লাগিয়া উহার ক্রিয়ার যাহাতে ব্যাঘাত না জন্মাইতে পারে সে বিষয়ে সর্ব্বদাই সতর্ক হইতে হইবে।

আমাদের দেশ গ্রীষ্মপ্রধান দেশ। শীতপ্রধান দেশবাসীদের অনুকরণে আমাদের বস্ত্রাদির ব্যবস্থা হওয়া উচিত নয়। শরীরের তাপ রক্ষা করিবার জন্য উহাদের অধিক গরম কাপড়ের আবশ্যক করে—আমাদের তাহা করে না! ঘর্ম্মাদ্র অথবা ভিজা কাপড় শুষ্ক হইবার কালে দেহ হইতে তাপ গ্রহণ করিয়া শরীরকে শীতল করে, সুতরাং এ অবস্থায় সর্দ্দি লাগার খুবই আশঙ্কা আছে। বয়স্ক ব্যক্তিরা যেমন অবাধে বাহিরের শৈত্য-তাপাদি সহ্য করিতে পারে বালকেরা তাহা পারে না। উহাদিগকে ধীরে ধীরে শীত-গ্রীষ্মাদি ঋতু সহ্য করাইতে হয়।

বালকদিগের গাত্র কতকগুলা বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করা অতিশয় অন্যায়—ইহা অপেক্ষা উহাদিগের গাত্র সম্পূর্ণ উন্মুক্ত রাখা বরঞ্চ ভাল। গাত্র সর্ব্বদা শুষ্ক থাকা উচিত, যে সকল পরিচ্ছদ পরিধানে তাহা হইতে পারে না তাহা কোন মতেই উপযোগী মনে করা উচিত নয়। পরিচ্ছদ সম্বন্ধে আমরা যেমন ভুল করি এমন আর কোন বিষয়েই নহে। ঠাণ্ডা লাগার ভয়ে আমরা শিশুর গাত্রে স্তরে স্তরে কতকগুলা জামা প্রভৃতি চড়াই—তাহাতে উহাদের গাত্র হইতে সর্ব্বদাই ঘর্ম্ম নিঃসরণ হইতে থাকে এবং ওই ঘর্ম্ম শুষ্ক হইবার কালে গাত্র শীতল করে, এ অবস্থায় সর্দ্দি লাগা যত সহজ এমন আর কোন অবস্থায় নয়। যে ঠাণ্ডা লাগার ভয়ে এতাধিক গরম কাপড়ের ব্যবস্থা, ইহাতে সেই ঠাণ্ডাকে যেন সাদরে নিমন্ত্রণ করিয়া আনা হয়। যে সকল শিশু সর্ব্বদাই সর্দ্দি কাশিতে কষ্ট পায় তাহাদিগের গাত্রবস্ত্রের পরিমাণ হ্রাস করিলে তাহা দূর হইতে দেখা যায়। বস্ত্রের প্রধান উদ্দেশ্য অবশ্য তাপসংরক্ষণ। কিন্তু যে বস্ত্র পরিধানে সাধারণ অবস্থায় গাত্র আর্দ্র করিয়া থাকে তাহা কিছুতেই পরিধানোপযোগী মনে করা উচিত নয়।

পরিচ্ছদাদি সম্বন্ধে আরও দুই একটি কথা মনে রাখা আবশ্যক। যে পরিচ্ছদে বালকের স্বাভাবিক অঙ্গ সঞ্চালনের বিঘ্ন জন্মায় তাহা

পরিধান করা অনুচিত। এই নিমিত্ত টাইট্ কোট, গেঞ্জি প্রভৃতি শিশুদিগের উপযোগী নয়। বালকের বস্ত্রাদি খুব ঢিলা হওয়া আবশ্যক। যে পরিচ্ছদ পরিধানে নিশ্বাস গ্রহণ কালে বক্ষপঞ্জর প্রভৃতির প্রসারণের ব্যাঘাত উৎপন্ন করে তাহা কদাচ ব্যবহার করিতে নাই। কোমরবন্ধও এই কারণে পরিত্যাজ্য। শক্ত ইস্তিরি করা জামা, শক্ত কলার প্রভৃতি বালকের অনুপযোগী। মাথায় টুপি দেওয়াও ভাল নহে। ইহাতে মস্তকে রক্ত চলাচলের বিঘ্ন উৎপাদন করে। বালকদিগের পদদ্বয় সর্ব্বদা শুষ্ক থাকা উচিত। ভিজা পা সর্দ্দি-রোগের আকর। ভিজা জুতা পায়ে দিতে নাই।

চিকিৎসক নিষেধ না করিলে বালক-দিগের দৈনিক স্নান বন্ধ করা কর্ত্তব্য নহে। স্নানে ত্বক পরিষ্কৃত ও দৃঢ় হয়। যে বালকের গাত্রে যত কম জল পড়ে সে ততই খোস্ পাঁচ্ড়া ও সর্দ্দি কাশিতে কষ্ট পায়।

খাদ্য—

বিশুদ্ধ বায়ু, সূর্য্যালোক এবং বাস-ভবনাদির পর খাদ্য। ইহাদ্বারা বালক জীবিত থাকে এবং তাহার দেহের ও মস্তিষ্কের গঠন ও পোষণ হয়। বালককে প্রচুর খাদ্য না দিলে উহার দেহ নিস্তেজ হয়, সুতরাং রোগোৎপাদক জীবাণুসমূহ অতি সহজেই উহাকে আক্রমণ করিতে পারে। অপ্রচুর ও অনুপযুক্ত খাদ্যের ভাবী ফল শরীর ও মনের অবনতি।

প্রৌঢ় ব্যক্তি ও বালকের খাদ্য একরূপ হইলে চলিবে না। প্রৌঢ়দিগের বেলায় খাদ্যের আবশ্যক শুধু দেহের ধ্বংস পূরণ করা—বালকদিগের বেলায় তাহার উপর শরীরের বর্দ্ধন ও গঠন আছে; সুতরাং উহাদের প্রচুর খাদ্যের আবশ্যক করে। বয়স্কব্যক্তির অপেক্ষা বালকেরা অধিক আহার করিয়া থাকে। উহাতে কেহ যেন বিস্মিত না হয়েন, কেননা ইহা স্বাভাবিক। ইহার অন্যথা হইলেই তাহা অস্বাভাবিক মনে করিতে হইবে এবং বালকের পূর্ণ পরিণতি সম্বন্ধে বিশেষ সন্দিহান হইতে হইবে। প্রৌঢ় ব্যক্তির শরীরের যাহা বৃদ্ধি, তাহা সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, বালকদিগের এখনও অনেক বাড়িতে আছে—সুতরাং যথেষ্ট উপাদান না যোগাইলে তাহা কিরূপে সম্পন্ন হইবার আশা করা যাইতে পারে?

সংসারে প্রবেশ করিয়া মানুষ যে সকল শারীরিক ক্লেশ ভোগ করে, অনেক স্থলেই তাহা বাল্য জীবনে আহার সম্বন্ধে ভুল করার গৌণ ফল ভিন্ন আর কিছু নয়। হয়তো বালকের খাদ্য মোটেই তাহার উপযোগী নয়, হয়তো ইহা এতই দুষ্পচ্য ও গুরুপাক যে বালক তাহা জীর্ণ করিতে সক্ষম হয় না, হয় তো রন্ধনের দোষে তাহা বালকের অনুপযোগী হইয়া পড়ে। বালকদিগকে তাহাদিগের উপযোগী প্রচুর খাদ্য দিতে হইবে—কিন্তু তাহা যেন পুষ্টিকর ও লঘু-পাক হয় এবং বিনা চর্ব্বণে অথবা সামান্য চর্ব্বণে বালক যেন তাহা গলাধঃকরণ না করিয়া বসে। এইরূপ করিলেই তবে কালক্রমে তাহারা পূর্ণকলেবর ও পূর্ণ পরিণত হইয়া জীবনের দায়িত্বসমূহ সুসম্পন্ন করিতে সমর্থ হইবে এবং তাহাদের বিদ্যা-

বুদ্ধি শারীরিক ও নৈতিক বল মৃত্যুকাল অবধি অক্ষুণ্ণ রহিবে।

ভক্ষ্য দ্রব্য একপ্রকার না হইয়া নানা প্রকার হওয়া আবশ্যক। প্রতি দিন এক রূপ খাদ্য ভোজনে পরিপাকশক্তি ক্ষীণ হইতে দেখা যায়, খাদ্যের বৈচিত্র্য থাকিলে চিত্ত প্রফুল্ল থাকে। 'এক ঘেয়ে' খাদ্যে স্বভাবও কেমন 'এক ঘেয়ে' করিয়া তুলে। প্রতি মাসে বালককে ওজন করিয়া দেখা উচিত যে তাহার দেহের পুষ্টি সুসম্পন্ন হইতেছে কি না। যে সকল বালক সহসা অসম্ভব বাড়িয়া উঠে তাহাদিগকে প্রচুর খাদ্যের ব্যবস্থা করিতে হয় এবং তাহাদের পরিশ্রমের ভাগ কমাইতে হয়। এ সকল বালকের যক্ষ্মা রোগ হইবার খুবই সম্ভাবনা থাকে যাহাদের দেহের ভার মাসে মাসে হ্রাস হইতে দেখা যায় তাহাদের বেলায় একেবারে পরিশ্রম বন্ধ করিতে হয়।

বালকদিগকে খালি পেটে কাজ করাইতে নাই, উহাদের বেলায় আগে আহার, পরে কাজ। তাহা না করিলে পরিশ্রম করিতে উহাদের যে শক্তি ব্যয়িত হয় তাহাতে উহাদের দেহ কৃশ ও দুর্ব্বল করিতে পারে। বালকদিগকে দিবসে ৪ বার ভোজন করিতে দিতে হয়। ইহার মধ্যে প্রাতঃভোজন ও মধ্যাহ্নভোজন যেন পূরা মাত্রায় হয়, অপরাহ্নের ও রাত্রের ভোজন পূরা হইবার আবশ্যক নাই। খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে মাংস মৎস্য ডিম্ব দুগ্ধ ও ডাইল সর্ব্বাপেক্ষা পুষ্টিকর। বালকদিগকে দিবসে একবার মাংস দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাহা যেন রাত্রে না দিয়া প্রাতে অথবা মধ্যাহ্নে দেওয়া হয়। মৎস্য দিবসে দুইবার দিলেও কোন ক্ষতি হয় না। মৎস্য অথবা মাংসের স্থলে একবার যেন যথেষ্ট পরিমাণে শাক সবজি ও ফল থাকে। ভাত রুটি ডাইল প্রভৃতি অতিশয় প্রয়োজনীয় খাদ্যে বালকদিগের পক্ষে শর্করার অতিশয় আবশ্যক হয়। ইহা দ্বারা উহাদের দেহের তাপ রক্ষিত হয়, শরীর বৃদ্ধি হয় এবং পেশি সমূহের কার্য্যের সহায়তা সম্পাদন করে। চা কফি প্রভৃতি বালকের পক্ষে ভাল নহে। উহাদের পরিবর্ত্তে বালকদিগকে দুগ্ধ পান করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য। দধি বড় উপকারী, ইহা সকলকেই দেওয়া যাইতে পারে। আহারের সময় জলপান করিতে নাই, তাহাতে পরিপাকক্রিয়ার বিলম্ব ও বিঘ্ন ঘটিতে দেখা যায়। ভোজনের অন্তত দুই ঘণ্টা পরে জল পান করা কর্ত্তব্য। ভোজনের অব্যবহিত পূর্ব্বে ও পরে কোনরূপ কার্য্য করিতে নাই। বালকদিগের ও প্রৌঢ়দিগের খাদ্য একরূপ ভাবে রন্ধন করা উচিত নয়।

বালকদিগের খাদ্য সুসিদ্ধ হওয়া আবশ্যক বটে, কিন্তু তাহা যেন এত কোমল ও নরম না হয় যাহাতে বিনা চর্ব্বণেই অনায়াসে উদরস্থ করিতে পারা যায়। এমন করিলে ভুক্ত দ্রব্য জীর্ণ হইতে পারে না, সুতরাং ডিস্‌পেপ্‌সিয়া নামক রোগ জন্মে। আমাদের ভক্ষ্য দ্রব্যের মধ্যে অনেকের পরিপাক ক্রিয়া মুখের মধ্য হইতে আরম্ভ হয়। মুখের লালা দ্বারা ইহা সাধিত হইয়া থাকে সুতরাং ভাল করিয়া চিবাইয়া না খাইলে সে কার্য্য কিরূপে সম্পন্ন হইতে পারে? তাড়াহুড়া করিয়া না খাইয়া ধীরে ধীরে উত্তমরূপে চিবাইয়া আহার করা কর্ত্তব্য। বর্ত্তমান সভ্যতায় আমাদের

কাজের মাত্রা বাড়িয়াছে বটে কিন্তু পরমায়ু না বাড়িয়া বরঞ্চ কমিয়াছে, সুতরাং আমাদের প্রত্যেক কাজেই যেন একটা তাড়াতাড়ি ও ব্যস্ততার ভাব আসিয়াছে। এমন কি আহার নিদ্রা প্রভৃতিও ইহার হস্ত এড়াইতে পারে নাই। ইহাতে আমাদের স্বল্প পরমায়ু স্বল্পতর হইতেছে।

দন্ত শুধু বিকাশের জন্য নহে, উহাদেরও একটা কাজ আছে, ভক্ষ্য দ্রব্যকে চর্বণ করাই উহাদের কাজ, বাল্যকালে চিবাইয়া খাইবার অভ্যাস না জন্মিলে পরে তাহা হইতে পারে না। যাহারা চর্বণ অভ্যাস করিয়াছে তাহাদের দন্তগুলি মৃত্যুকাল পর্যন্ত মুখের শোভা সম্পাদন করে আর এই সকল ব্যক্তি জীবিতকাল মধ্যে একদিনও "অজীর্ণ 'রোগ' কাহাকে বলে টের পায় না। সন্তানেরা যাহাতে চর্বণ অভ্যাস করে বাপ-মার তাহার উপর লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। অনেক পরিবারে দেখিতে পাওয়া যায় যে বালক আহারে বসিয়া বিলম্ব করে, বাপ-মা তাহাকে ভর্ৎসনা করেন। ইহা ভারি অন্যায়। বাস্তবিক পক্ষে ভর্ৎসনার পাত্র ত এ সকল বালক নয়, যাহারা তাড়াতাড়ি করিয়া ভোজন সারে, তাহারাই।

স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য প্রতিদিন নিয়মিত কালে মলত্যাগ অভ্যাস করা আবশ্যক। ড্রেন প্রভৃতির দুর্গন্ধে শরীরের ক্ষতি করে, ইহা আমরা সকলেই জানি, কিন্তু ড্রেনের অপেক্ষা অনিষ্টকর দ্রব্য পেটে থাকিতে আমরা কি করিয়া শরীর ভাল থাকিবে আশা করিতে পারি। শিশুকালে ও বাল্যে নিয়মিত কালে মলত্যাগ অভ্যাস করান আবশ্যক। মলমূত্রের বেগ ধারণ করা অন্যায়, ইহাতে অনেক প্রকার রোগ জন্মাইতে পারে।

বিদ্যাশিক্ষা বা মনোবৃত্তির অনুশীলন—

কোন ইন্দ্রিয়কে যদি না খাটান যায় কালক্রমে তাহার ধ্বংস হয়। ইন্দ্রিয়ের কার্য্যকারিতা বৃদ্ধি করিবার জন্য এবং উহার পরিণতির জন্য উহাকে কার্য্যে নিযুক্ত করা একান্ত আবশ্যক। চিন্তা, বিবেচনা প্রভৃতি মস্তিষ্কের কার্য্য। সুতরাং মস্তিষ্কের পরিণতির জন্য বিদ্যানুশীলন একান্ত বিধেয়। সেইরূপ শরীরের উন্নতির জন্য ব্যায়ামের আবশ্যক। শরীর ও মনের সঙ্গত পরিচালনায় উহাদের উভয়ের যেরূপ উন্নতি হইতে দেখা যায়, অসঙ্গত অথবা অত্যধিক পরিচালনায় তাহার আবার বিপরীত ফল ফলে।

প্রৌঢ় ব্যক্তিদিগের পক্ষে হয় ত অধিক শ্রম তত অনিষ্টকর নহে, কিন্তু বালকদিগের বেলায় ইহা অত্যন্ত ক্ষতিকর, ইহাতে বালকের দেহ ও মন উভয়ের স্বাস্থ্য ও স্বচ্ছন্দতা নষ্ট করে। বালক অল্প শ্রমেই ক্লান্ত হইয়া পড়ে, আবার যে বিষয়ে তাহাদের স্বাভাবিক অনুরক্তি বা স্পৃহা নাই সে বিষয়ে ত সে কিছুমাত্র আনন্দ পায় না, সুতরাং অতি অল্পেই ক্লান্তি বোধ করে। তাহার যাহা ভাল লাগে সে বিষয়ে বালক অনেকক্ষণ মগ্ন থাকিতে পারে।

শিক্ষাদান কালে দেখিতে হইবে বালকের কোন্ বিষয়ে স্বাভাবিক অনুরক্তি আছে। যে বালকের নিকট যে বিষয় প্রিয় বোধ হয় তাহাকে সেই বিষয় ধরিয়া শিক্ষা আরম্ভ

করিতে হইবে। এই উপায়ে তাহার বুদ্ধির কিয়ং পরিমাণে বিকাশ হইলে অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া সহজ হইয়া পড়িবে। সকলের মুখে যেমন একই খাদ্য ভাল লাগে না মস্তিষ্ক সম্বন্ধেও ঠিক তাহাই। সকলের মাথায় একই বিষয় প্রবেশ করিতে চাহে না। মুখ-প্রিয় দ্রব্য যেমন বালক বেশী খাইয়াও জীর্ণ করিতে পারে এবং তাহাতে তাহার অপকার না হইয়া বরঞ্চ উপকারই হইতে দেখা যায় সেইরূপ যে বিষয়ে বালকের স্বভাবত আসক্তি, তাহা লইয়া সে বহুক্ষণ বিনা ক্লেশে অতিবাহিত করিতে পারে, তাহাতে তাহার কোনরূপই ক্লান্তি হইতে দেখা যায় না বরঞ্চ তাহার বুদ্ধির বিশেষ উন্নতিই হইয়া থাকে। শরীরের সম্পূর্ণ গঠনের জন্য যেমন ভক্ষ্য দ্রব্যের বৈচিত্র্য আবশ্যক, মস্তিষ্কের গঠন জন্যও ত সেইরূপ বিবিধ বিষয়ের অনু-শীলন প্রয়োজন হয়।

মন ও শরীরের গঠন ও পরিণতি সম্বন্ধে আর এক বিষয়ে অদ্ভুত সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হয়। "হঠাৎ বাড়" যেমন শরীরের পক্ষে মঙ্গলকর নয়, বুদ্ধিরও "হঠাৎ বাড়" তেমনি মনের পক্ষে অকল্যাণকর। ইহাদের উন্নতি ধীরে ধীরে সম্পাদিত হওয়া আবশ্যক। অন্য অন্য কথা বারান্তরে।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ বাগছি।

মানবের জন্মকথা।

(৩

চোখের তৃতীয় পাতা এবং তৎসংলগ্ন পেশি ইত্যাদি পক্ষীদিগেরই বিশেষ পরিপুষ্ট এবং কার্য্যক্ষম, কারণ উহা শীঘ্র শীঘ্র চোখের গোলকের উপর দিয়া টানিয়া আনা যায়। এইরূপ তৃতীয় পাতা কোন কোন সরীসৃপ ও উভচরের আছে, এবং কোন কোন মৎস্যেরও আছে। স্তন্যপায়ীদিগের নিম্নতম দুইটী শ্রেণীতেও এইরূপ পাতা আছে; যথা মনোট্রিমেটা এবং কাঙ্গারু শ্রেণী। ওয়ালরাস্ প্রভৃতি অল্পসংখ্যক উচ্চ স্তন্য-পায়ীরও চক্ষুতে তৃতীয় পাতা আছে। কিন্তু চতুষ্পদ শ্রেণীতে, এবং মানুষে,—ফলত অধিকাংশ স্তন্যপায়ীদিগের মধ্যেই ইহার ধ্বংসাবশেষ একটু মাত্র বিদ্যমান আছে, যাহাকে চোখের কোণের অর্দ্ধচন্দ্রাকার মাংসখণ্ড বলা যাইতে পারে; এ কথা সকল অস্থিবিদ্যাবিদ্‌গণই স্বীকার করেন।

অধিকাংশ স্তন্যপায়ী জীবের পক্ষে ঘ্রাণশক্তি অতীব আবশ্যক। এই শক্তি রোমন্থীদিগকে সময় থাকিতেই বিপদের আশঙ্কা জানাইয়া দেয়, মাংসাশীদিগকে শিকার অন্বেষণের সাহায্য করে এবং বন্য বরাহ প্রভৃতি জীবদিগের ঐ উভয় প্রকারেই উপকার সাধন করিয়া থাকে। এই শক্তি সুসভ্য শ্বেতকায় মানবের যেরূপ লক্ষিত হয়, তদপেক্ষা কৃষ্ণকায়গণের মধ্যে ইহা

অধিকতর প্রবল; তথাপি কৃষ্ণকায়গণও ইহা হইতে অতি সামান্য উপকারই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ঘ্রাণশক্তি কৃষ্ণকায়গণকে বিপদের সংবাদ দেয় না, আহারান্বেষণের সহায়তা করে না। এ শক্তি এস্‌কুইমস্‌দিগকে দুর্গন্ধময় স্থানে নিদ্রা যাওয়া হইতে বিরত করে না; এবং অনেক অসভ্য মানবকে আধ পচা মাংস আহার করিতেও নিবৃত্ত করে না। জনৈক খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক, যাঁহার ঘ্রাণশক্তি প্রবল এবং যিনি এই বিষয় অনুশীলন করিয়াছেন, তিনি আমাকে নিশ্চয় করিয়া বলিয়াছেন যে ইউরোপীয় ব্যক্তিগণের মধ্যেও এই শক্তি সকলের সমান নহে। যাঁহারা ক্রমোন্নতিবাদ বিশ্বাস করেন * তাঁহারা ইহা সহজে স্বীকার করিবেন না যে, মানুষ এখন যে অবস্থায় আছে সেই অবস্থাতেই এখনকারমত ঘ্রাণশক্তি প্রথম হইতে অর্জ্জন করিয়াছিল। মানব কোন নিম্নতম প্রাণী হইতে এই শক্তি অত্যল্পমাত্রায় এবং প্রায়-লুপ্তাবস্থায় প্রাপ্ত হইয়াছে; কিন্তু ঐ নিম্নতম প্রাণী সর্ব্বদাই এ শক্তির ব্যবহার করিত এবং ইহা হইতে বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হইত। অশ্ব অথবা কুকুরের ন্যায় যে সকল প্রাণীর এই শক্তি অতীব প্রবল, তাহাদিগের স্থানবিষয়ক ও ব্যক্তিবিষয়ক স্মৃতি, ঐ স্থানের ও ব্যক্তির গন্ধের সহিত বিশিষ্ট ভাবে জড়িত। ইহা হইতেই বোধ হয় বুঝা যাইতে পারে, কি কারণে "মানবেরও ঘ্রাণেন্দ্রিয় বিস্মৃত ঘটনাবলীর ও স্থানের মূর্ত্তি ও ভাবসকল সুন্দররূপে স্মৃতিপথে জাগাইয়া দিতে সক্ষম হয়।" ডাঃ সভ্‌লি এই কথা যে উল্লেখ করিয়াছেন তাহা অতীব সত্য।

নর বানর শ্রেণীতে নরের একটী সুস্পষ্ট বিশেষত্ব আছে—নর প্রায় সম্পূর্ণ চুলহীন। নরের দেহের অধিকাংশ স্থানেই গুটিকত ক্ষুদ্র, খাপ্‌ছাড়া চুল দেখা যায় এবং নারীদেহে ক্ষুদ্র ও অতি সূক্ষ্ম রোঁয়া মাত্র লক্ষিত হয়। বিভিন্ন বর্গীয় মানবের লোমশতাও বিভিন্ন, এবং একবর্গীয় মানবগণ মধ্যেও লোমশতা সকলের সমান নহে; কাহারও চুল অধিক, কাহারও অল্প; কাহারও এক স্থানে কাহারও অন্য স্থানে,—এরূপ প্রভেদও দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইউরোপীয়দিগের কাহারও স্কন্ধে চুল নাই। কাহারও স্কন্ধে মোটা চুলের গুচ্ছ দেখা যায়। মানবদেহে স্থানে স্থানে যে চুলের উৎপত্তি দৃষ্ট হয়, তাহা নিম্নপ্রাণিগণের সর্ব্বাঙ্গব্যাপ্ত চুলের লুপ্তাবশেষ মাত্র, এ বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ নাই। পুরাতন প্রদাহযুক্ত স্থানে ক্ষুদ্র, সূক্ষ্ম, ঈষৎকাল বর্ণের চুল কখন কখন লম্বা, মোটা, ঘনসন্নিবিষ্ট এবং গাঢ় কাল চুলে পরিণত হইয়া থাকে; হস্তপদে এবং দেহের অন্যান্য স্থানেও এরূপ হয়। ইহা হইতেই উল্লেখিত সিদ্ধান্ত আরও সম্ভবপর বলিয়া বিবেচনা করা যায়।

---

* ডিভ্রিস্ প্রমুখ বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকগণ এখন আর ক্রমোন্নতিবাদে বিশ্বাস করেন না। তাঁহাদিগের মতে জীব-বিবর্ত্তন আকস্মিক। এক জীব অকস্মাৎ অল্প অথবা অধিক বিবর্ত্তিত হইয়া এক জাতি হইতে অন্য জাতিতে পরিণত হয়। অকস্মাৎ হয়, ক্রমে নহে। ইহাকে Mutation বলে।

সার জেম্‌স্‌ প্যাজেট আমাকে জানাইয়াছেন যে অনেক সময় একবংশীয় অনেক লোকের ভ্রূযুগলে কোন কোন চুল অন্য চুল অপেক্ষা বেশি লম্বা হইয়া থাকে। সুতরাং এই সামান্য বিশেষত্বও বোধ হয় বংশানুগত। এই লম্বা চুলগুলিও বোধ হয় ইতর জীবের অনুরূপ; কারণ সিম্পাঞ্জি এবং ম্যাকেকাস্‌ শ্রেণীস্থ কোন কোন বানর জাতির মধ্যেও চক্ষুর ঊর্দ্ধভাগে, আমাদিগের যে স্থানে ভ্রূ আছে সেই স্থানে খালি চর্ম্মের উপরে খুব লম্বা বিচ্ছিন্ন চুল দেখা যায়। কোন কোন বেবুন জাতীয় বানরেরও চক্ষুর ঊর্দ্ধে লোমাবৃত ত্বক্‌ হইতে এইরূপ লম্বা চুল উদ্গত হয়।

মানব-ভ্রূণের দেহ ছয় মাস পর্য্যন্ত সূক্ষ্ম নরম রোঁওা দ্বারা ঘনভাবে আবৃত থাকে। ইহা আরও অদ্ভুত ব্যাপার। পঞ্চ মাসের ভ্রূণ দেহে এই সকল রোঁওা প্রথমে উৎপন্ন হয়। সর্ব্বাগ্রে ভ্রূস্থানে এবং বদনমণ্ডলে, বিশেষতঃ মুখের চতুর্দ্দিকে জাত হয়। কিন্তু মুখের চতুর্দ্দিকেই মাথার রোঁওা অপেক্ষাও বেশি লম্বা হইয়া থাকে। এস্‌রিট্‌ (Eschricht) এইরূপ গুম্ফ একটী নারী-ভ্রূণেও দেখিয়াছিলেন। ইহা বিস্ময়কর নহে, কারণ প্রথম অবস্থায় স্ত্রী ও পুং জাতি মধ্যে বাহ্য লক্ষণ সাধারণত প্রায় তুল্যই। ভ্রূণদেহে ও প্রাপ্তবয়স্ক দেহে চুলের ভাঁজ এবং সংস্থান একই প্রকার, কিন্তু ভ্রূণদেহে উহা অধিকতর পরিবর্ত্তনশীল। ভ্রূণের সমস্ত দেহ, এমন কি কর্ণ এবং কপালও ঘন রোমাবৃত, কিন্তু হস্তের তালু এবং পায়ের তলা রোমহীন; অনেক ইতর প্রাণীদিগেরও ঐরূপই, তাহাদিগেরও চারিটী হস্তপদের তলদেশ রোমহীন। মানবের ও ইতরপ্রাণীর এই সমতা উল্লেখযোগ্য। কারণ এইরূপ সমতা হঠাৎ হওয়া সম্ভব নহে; বোধ হয়, যে সকল স্তন্যপায়ী জীব রোমাবৃত হইয়া জন্ম গ্রহণ করে তাহাদিগের ত্বকের অনুরূপই মানবভ্রূণের রোমাবৃত ত্বক্‌; মানবভ্রূণের রোমাবলী ইতরজীবের রোমাবলীর প্রতিনিধিস্বরূপ। তিন চারিটী মানবসন্তানের বিষয় লিপিবদ্ধ আছে,—তাহাদিগের ভূমিষ্ঠ হইবার সময়েই সমস্ত শরীর এবং বদন সূক্ষ্ম লম্বা চুল দ্বারা ঘনভাবে আবৃত ছিল। এই অদ্ভুত অবস্থা বংশানুগত। সদ্যোজাত শিশুর এই অবস্থা হইলে তাহার দন্তের অবস্থাও অস্বাভাবিক হয়। অধ্যাপক আলেক্‌জাণ্ডার ব্রাণ্ট আমাকে জানাইয়াছেন যে তিনি ঐরূপ অবস্থায় জাত একটী ৩৫ বৎসর বয়স্ক ব্যক্তির মুখের চুলের সহিত একটী ভ্রূণের রোঁওার তুলনা করিয়া দেখিয়াছেন যে উভয়েরই গঠন তুল্য; সুতরাং ঐ ব্যক্তির চুলের গঠন ভ্রূণাবস্থাতেই বদ্ধ হইয়াছিল, তথাপিও তাঁহার বৃদ্ধি স্থগিত হয় নাই, এইরূপ অনুমান করা যায়। অধ্যাপক মহাশয়ও তাহাই বলেন। শিশু-হাঁসপাতালের একজন ডাক্তার আমাকে বলিয়াছেন যে অনেক শিশু, যাহারা বিশেষ সুস্থ ও সবল নহে, তাহাদিগের পৃষ্ঠে একটু একটু লম্বা রেশমের মত চুল দেখা যায়। এ সকল স্থলেও পূর্ব্ববৎ অনুমানই করা যাইতে পারে।

মানুষের আক্কেল-দাঁত বোধ হয় ক্রমে

লোপ পাইতেছে। মাড়ির * অন্যান্য দন্ত অপেক্ষা এই দাঁতটী কিছু ছোট। সিম্পাঞ্জি এবং ওরাং-শ্রেণীর বানরেরও ঐরূপ। আক্কেল-দাঁতের কেবল দুইটী শিকড়। ২৭ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে এই দাঁত প্রায় উঠে না। আমি বিশ্বস্তরূপে অবগত হইয়াছি যে এই দাঁত শীঘ্রই নষ্ট হয়, এবং অন্যান্য দন্তের পূর্ব্বেই পড়ে। কিন্তু কোন কোন দন্ত-বিদ্যাবিৎ এ কথা স্বীকার করেন না। গঠন সম্বন্ধে এবং পরিপুষ্টির সময় সম্বন্ধে, আক্কেল-দন্ত অন্য দন্ত অপেক্ষা অধিক পরিবর্ত্তনশীল। মিলেনিয়ানগণের এই দন্তের তিনটী শিকড়, এবং ইহার পুষ্টিও ভাল। ককেশিয়ানগণের আক্কেল-দন্তের সহিত অন্যান্য মাড়ির দন্তের যেরূপ প্রভেদ, ইহাদিগের তদ্রূপ নহে। অধ্যাপক স্কফ্‌হসেন বলেন যে সভ্য মানবের চোয়াল মাড়ির দিক অসভ্যগণের অপেক্ষা খর্ব্বাকার, সেই জন্য তাহাদিগের মাড়ির দাঁতও ছোট হয়। সভ্য মানবের চোয়ালের মাড়ির অংশটা খর্ব্ব হওয়ার কারণ আমার এই বোধ হয় যে নরম পক্ক আহার্য্য বস্তু খাওয়াই তাহাদিগের অভ্যাস, সুতরাং বেশী চিবাইতে হয় না, সেই জন্যই ইহার ব্যবহার কম হওয়ায় খর্ব্ব হইয়াছে। + মিঃ ব্রেস আমাকে জানাইয়াছেন যে আমেরিকার যুক্তরাজ্যে বালক-বালিকাগণের কোন কোন মাড়ির দাঁত উঠাইয়া ফেলা, একটা সাধারণ নিয়ম হইয়া উঠিতেছে, কারণ তাহাদিগের চোয়াল কিছু ছোট হওয়ায় পূর্ণসংখ্যক মাড়ির দাঁতের স্থান হয় না।

মুখ হইতে গুহ্য পর্য্যন্ত যে খাদ্যবহ নালী আছে, তাহাতে কেবল একটী অব্যবহার্য্য অঙ্গ থাকা আমি অবগত হইয়াছি। এই অব্যবহার্য্য অথবা ক্ষয়প্রাপ্ত অঙ্গ (= অন্ধান্ত্র) অন্ত্রের শেষ ভাগে পোকার মত বাঁকাইয়া থাকে। উহা অন্ত্রেরই একটা শাখা, উহা অন্ত্র হইতে বাহির হইয়াছে, এবং উহার শেষ দিকটা থ'লের মত বন্ধ। অনেক উদ্ভিদাহারী পশুর ঐ অংশটা অত্যন্ত লম্বা। কোয়ালা * নামক প্রাণীর অন্ত্রের ঐ অংশটা দেহের তিন গুণ দীর্ঘ। কখন কখন উহার শেষ ভাগ ক্রমে সরু ও লম্বা হইয়া সূচ্যগ্রের মত হয়; এবং উহা সময় সময় একাধিক কামরায় বিভক্ত হইয়া থাকে। আমার বোধ হয় যেন আহারের পরিবর্ত্তন বশত অথবা অভ্যাসের পরিবর্ত্তন হেতু অনেক প্রাণীর অন্ত্রের এই অংশটা খুব ছোট হইয়া গিয়াছে, আর ঐরূপ ছোট হইতে হইতে এখন প্রায় লুপ্তাবস্থ হইয়া একটু চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট আছে। মানবদেহে ইহার ক্ষুদ্র অবয়ব দৃষ্টে এই অনুমান করা যাইতে পারে। অধ্যাপক কেনেষ্ট্রিনি যে সকল প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায় যে মানব-অন্ত্রের এই অংশ পরিবর্ত্তনশীল; তাহা হইতেও ঐরূপ অনুমান করা যায়। কখন কখন এই অংশটা থাকেই না, আবার কখন কখন ইহা অতি পুষ্ট। ইহার অর্দ্ধেক অথবা দশ আনা ভাগ কখন কখন ছিদ্রবিহীন দেখা যায়, আর শেষ অংশটা চেপ্টা নীরেট একটু

* কোন কোন জেলায় ইহাকে কশের দাঁত বলে।

\+ এইরূপ কারণ এখন স্বীকৃত হইবে না।

* কোয়ালাকে অষ্ট্রেলিয়ার ভালুকও বলে।

বিস্তৃতিমাত্র হইয়া থাকে। ওরাং নামক বানরের এই যন্ত্র লম্বা এবং মোড়ানো। মানবের এই যন্ত্রটী অন্ত্রের ক্ষুদ্র শেষ ভাগ হইতে উৎপন্ন হয়, এবং চারি কিম্বা পাঁচ ইঞ্চি লম্বা হয়। ইহার ব্যাস এক ইঞ্চির তিন ভাগের এক ভাগ মাত্র। ইহা মানবের কোন প্রয়োজনে ত লাগেই না, বরং সময় সময় ইহা হইতে মৃত্যু পর্য্যন্তও ঘটিয়া থাকে। আমি সম্প্রতি এইরূপ দুইটী মৃত্যুর কথা শুনিয়াছি বিচি ইত্যাদি ক্ষুদ্র কঠিন পদার্থ কোন মতে ইহার মধ্যে প্রবেশ লাভ করিতে পারিলেই প্রদাহ উৎপন্ন হয়, তাহাতেই মৃত্যু হইতে পারে।

কোন কোন নিম্ন শ্রেণীর বানরের লেমুরের * মাংসভোজী প্রাণীর, এবং মার্স্থপিয়ালদিগের † বাহুর অস্থির নীচ দিকে একটী ছিদ্র আছে, ঐ ছিদ্রের মধ্য দিয়া হস্তের শিরা ও ধমনী চলিয়া গিয়াছে। সাধারণত মানুষের বাহুর ঐ স্থানে ঐ ছিদ্রের সামান্য চিহ্ন মাত্র আছে; কদাচিৎ উহা বড় হইতেও দেখা যায়, ঐ স্থানে অস্থি বড়িশের ন্যায় বক্র, এবং বন্ধনী দ্বারা আবৃতও হইয়া থাকে। ডাক্তার ষ্ট্রুথার্স এই বিষয় অনেক অনুশীলন করিয়াছেন, তিনি দেখাইয়াছেন যে এই বিশেষত্ব বংশানুক্রমিক। একজনের এইরূপ ছিল, এবং তাহার সাত পুত্রের মধ্যে চারি জন উহা প্রাপ্ত হইয়াছিল। যাহাদিগের বাহুতে ঐ ছিদ্র বড়, তাহাদের বৃহৎ শিরা উহার মধ্য দিয়াই গিয়া থাকে।

* বানর শ্রেণীর প্রাণী, কিন্তু কিছু ছোট ইহাদিগের চক্ষু বড়, ইহারা রাত্রিচর।

† কাঙ্গারু প্রভৃতি এই শ্রেণীর জীব।

সুতরাং স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে মানববাহুর নিম্নভাগস্থ ঐ ছিদ্র ইতর জীবের ছিদ্রের অনুরূপ, অর্থাৎ তাহার সহিত তুলনীয় এবং তাহারই লুপ্তাবশেষমাত্র। অধ্যাপক টার্ণার স্থির করিয়াছেন যে আধুনিক মানবকঙ্কালে ঐ ছিদ্র শত করা এক স্থলে পাওয়া যায়। আমি তাঁহার নিকটে এই কথা জ্ঞাত হইয়াছি। মানুষের এই ছিদ্রটী যে কদাচিৎ বড় হয় তাহা ইতর-জীবধর্ম্মের পুনরাবৃত্তি বলিয়াই বোধ হয়। যদি এ অনুমান সত্য হয়, তবে ইহা বহু প্রাচীন কালীয় লক্ষণের পুনরাবৃত্তি, কারণ উচ্চশ্রেণীস্থ বানরের বাহুতে এই ছিদ্র নাই।

মানুষের বাহুর অস্থিতে কখন কখন আর একটী ছিদ্র দেখা যায়। অনেক বানরেরও বাহুতে এই ছিদ্র থাকে, কিন্তু কখন থাকেও না। অনেক নিম্নশ্রেণীস্থ প্রাণীরও ইহা আছে। বর্ত্তমান কাল অপেক্ষা প্রাচীন কালেই এই ছিদ্র অধিক সংখ্যক মানবের বাহুতে বিদ্যমান ছিল। মিঃ বাস্ক্ এ বিষয়ে নিম্নলিখিত প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন। "পারিস্ নগরে হুডের গোরস্থানে অধ্যাপক ব্রোকা, শতকরা সাড়ে চারিটী বাহুতে ঐ ছিদ্র লক্ষ্য করিয়াছেন। অরণির গুহাতে বত্রিশটী বাহুর মধ্যে আটটীর ঐরূপ ছিদ্র ছিল। মানুষ যখন প্রাচীন কালে তাম্র ও টিন মিশ্রিত ধাতুর দ্রব্যই (অধিক) ব্যবহার করিত, এই গুহা সেই সময়ের। এ ক্ষেত্রে পরিমাণ এত অধিক * হওয়ার কারণ এইরূপ অনুমান হয় যে ঐ গুলি বোধ হয় এক পরিভুক্ত

* ১/৪ = সিকি পরিমাণ।

ব্যক্তির অস্থি। এম্ দুপোঁ (M. Dupont) লেসির উপত্যকাতে শতকরা ত্রিশটী ঐরূপ সছিদ্র অস্থি পাইয়াছিলেন। মানুষসকল শীত প্রধান দেশবাসী হরিণ শিকার করিয়া বেড়াইত, এগুলি সেই সময়ের। আরজেন-টেউইলে এম্ লেগোত্র শতকরা পঁচিশটী, এবং ভরিব্রলে এম্ প্রুণারবে শতকরা ছাব্বিশটী সছিদ্র অস্থি পাইয়াছিলেন। এস্থলে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক যে এম্ প্রুণারবে বলেন যে গুয়ান্সেতে যে সকল কঙ্কাল পাওয়া যায় তাহাতে সছিদ্র বাহু-অস্থির পরিমাণ অনেক স্থলেই ঐরূপ।" বর্ত্তমান যুগের মানবদেহ অপেক্ষা প্রাচীন যুগের মানবদেহ অনেক বিষয়েই ইতর প্রাণীদিগের দেহের সহিত অধিকতর তুলনীয় ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। ইহার প্রধান কারণ বোধ হয় এই হইতে পারে যে, প্রাচীনকালীয়গণ জন্তুশ্রেণীর পূর্ব্বপুরুষ-গণের অধিকতর নিকটবর্ত্তী, আমরা তদপেক্ষা একটু দূরবর্ত্তী।

মানুষের মেরুদণ্ডের নীচের কয়েক খণ্ড অস্থি * (যাহাকে "কোকিল-চঞ্চু-অস্থি" বলা যায়, তাহা) ক্রিয়াহীন; কিন্তু অন্যান্য মেরুদণ্ডযুক্ত জন্তুর লেজের অনুরূপ। ভ্রূণের প্রথমাবস্থায় ইহাকে এদিক ওদিক ঘুরান যাইতে পারে, কারণ ইহা বদ্ধ অথবা জমাট্ নহে। তখন ইহা পায়ের সীমা অতিক্রম করিয়াও আসিয়া থাকে। ভ্রূণ ভূমিষ্ঠ হইবার পরও, কদাচিৎ কোন শিশুর, লেজের মত একটু বাহিরের দিকে দেখা গিয়াছে। এইরূপ অদ্ভুত ব্যাপার প্রায় দেখা যায় না। ইহা লেজের লুপ্তাবশেষ। এই "কোকিল-চঞ্চু অস্থি" ক্ষুদ্র, সচরাচর চারি খানি মেরুদণ্ডাস্থিতে * গঠিত; এই অস্থিগুলি পরস্পরের সহিত যুক্ত; ইহারা লুপ্তাবস্থ, কারণ গোড়ার অস্থিখণ্ড ব্যতীত অপর তিন খানি কেবল সেণ্ট্রাব মাত্র। ইহাদিগের সহিত কয়েকটী পেশি আছে, তাহার মধ্যে একটীকে থিলা† লেজের সঞ্চালক পেশির লুপ্তাবশেষ, এবং ঐ শ্রেণীর পুনরাবর্ত্তন বলিয়া মনে করেন, এ কথা আমাকে অধ্যাপক টার্ণার জানাইয়াছেন। ইতরশ্রেণীর স্তন্যপায়ী জীবের অনেকেরই এই (লেজ সঞ্চালক) পেশি বিলক্ষণ পরিপুষ্ট।

কটিদেশের প্রথম কশেরু পর্য্যন্ত, মেরুদণ্ড; অর্থাৎ (নীচের দিকে) উহা পৃষ্ঠ-দেশের শেষ কশেরু পর্য্যন্ত অবস্থিত। কিন্তু মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়া যে নালী চলিয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে ঐ দণ্ডের নিম্ন ভাগ হইতে ত্রিকাস্থি দেশ পর্য্যন্ত একটী সূত্রবৎ পদার্থ দেখা যায়, উহা লেজবৎ "কোকিল-চঞ্চু" অস্থির পিছের দিক দিয়াও দৃষ্ট হইয়া থাকে। টার্ণার বলেন, এই সূত্রের উপরের অংশ নিশ্চয় মেরুদণ্ডের অনুরূপ, কিন্তু ইহার নীচের অংশ কেবল রক্তবাহক কোষ-নির্ম্মিত আবরণ মাত্র। সুতরাং মানবের ক্ষয়প্রাপ্ত লেজবৎ অংশতেও মেরুতন্তুর ন্যায় অত্যাবশ্যকীয় পদার্থের লুপ্তাবশেষ বিদ্যমান আছে, কেবল উহা কশেরু অস্থির অন্তর্গত নালীর মধ্যে নাই, এইমাত্র। অধ্যাপক টার্ণার আমাকে নীচের বৃত্তান্তটী জানাইয়াছেন; তাহা হইতে বুঝা যাইবে যে মানুষের মেরুদণ্ডের

* ইহা গুহ্যদেশের নিকটবর্ত্তী।

* Vertebrae—কশেরু। † Theiler.

শেষভাগস্থ "কোকিল-চঞ্চু" অস্থির সহিত ইতর-প্রাণীদিগের লেজের কত সাদৃশ্য রহিয়াছে। বৃত্তান্তটী এই—মাস্কা সম্প্রতি ঐ অস্থির শেষভাগে একটী কুণ্ডলীকৃত পদার্থ আবিষ্কার করিয়াছেন, উহা ত্রিকাস্থি প্রদেশের মধ্য ধমনীর সহিত সংযুক্ত। এই আবিষ্কার বশত ক্রস্ এবং মেয়ার একটী বানরের এবং একটী বিড়ালের লেজ পরীক্ষা করিয়াছিলেন ; তাহাতেও ঐরূপ কুণ্ডলীকৃত পদার্থ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু উহা লেজের শেষ ভাগে ছিল না।

জনন-যন্ত্র সকলের মধ্যে অনেক লুপ্তাবশিষ্ট চিহ্ন পাওয়া যায়। কিন্তু উপরের বর্ণিত গুলির সহিত উহাদের একটী বিশেষ প্রভেদ আছে। উহাদিগের মধ্যে কোনোটীই এমন নহে যাহা মানবজাতিতে পরিপুষ্ট এবং কর্ম্মঠ অবস্থায় থাকেই না। উহাদিগের বিশেষত্ব এই যে যাহা নারী-দেহে বিদ্যমান, তাহা নর-দেহে লুপ্তপ্রায় অবস্থায় দৃষ্ট হয়, অথবা যাহা নর-দেহে বিদ্যমান তাহা নারী-দেহে লুপ্তপ্রায় এইমাত্র। যাহা হউক, বিভিন্ন জাতীয় জীব পৃথক পৃথক রূপে সৃষ্ট হওয়া বিশ্বাস করিলে এই সকল লুপ্তাবশিষ্ট দেহাংশের প্রকৃত মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন ; এ সকল, এবং পূর্ব্ববর্ণিত লুপ্তপ্রায় দেহাংশগুলি ঐরূপ বিশ্বাসে তুল্যরূপেই দুর্ব্বোধ্য হয়। জনন-যন্ত্র সকলের লুপ্তাংশগুলির বিষয় পরে আবার উল্লেখ করা আবশ্যক হইবে ; তখন দেখাইব যে ঐ সকল কেবল বংশানুক্রমের নিয়মের উপর নির্ভর করে, অর্থাৎ উহাদিগের মধ্যে যে গুলি নরদেহে উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা আংশিক ভাবে নারীদেহে সংক্রামিত ও বংশানুগত হইয়াছে ; অথবা যাহা নারীদেহে উৎপন্ন হইয়াছিল তাহা ঐরূপ ভাবে নরদেহে সংক্রামিত ও বংশানুগত হইয়াছে। এ স্থলে ঐরূপ লুপ্তাবশেষের কয়েকটী দৃষ্টান্ত দিব। ইহা সকলেই জানেন যে ইতর প্রাণীর এবং মানুষেরও পুংদেহে স্তনের লুপ্তাবশিষ্ট চিহ্নমাত্র আছে। অনেক পুরুষের এইরূপ লুপ্ত-স্তন বিলক্ষণ পরিপুষ্ট এবং ইহা হইতে প্রচুর দুগ্ধ নির্গত হয়। স্ত্রীলোকের স্তন এবং পুরুষের স্তন যে মূলত একই, তাহা ইহা হইতেও বেশ বুঝা যায় যে হাম্ * হইলে উভয়েরই স্তন স্ফীত হয়। অনেক স্তন্যপায়ী প্রাণীর মধ্যে পুরুষগণের মূত্রস্থলীর মুখের নীচে একটী রসগুটীর মত † বর্ত্তুল আছে, ইহা স্ত্রীজাতীয়গণের জরায়ুর অনুরূপ, এ কথা এখন সকলেই স্বীকার করেন। উহার সংযোগ-প্রণালীও বিদ্যমান। লিউকার্ট ইহার যে উৎকৃষ্ট বর্ণনা করিয়াছেন, এবং তিনি এই সিদ্ধান্তের পোষকতায় যে সকল যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা অস্বীকার করা যায় না। যে সকল স্তন্যপায়ী জীবের স্ত্রীগণের জরায়ু দ্বি-মুখ, তাহাদিগের কথা বিবেচনা করিলে এই সিদ্ধান্ত আরও স্পষ্ট রূপে বুঝা যাইতে পারে, কারণ তাহাদিগের পুংগণের মূত্রাশয় লগ্ন, বর্ত্তুল ও দ্বি-মুখ। এ স্থলে জনন-যন্ত্রসম্বন্ধীয় আরও কতিপয় লুপ্তাবশিষ্ট অঙ্গের উল্লেখ করা যাইতে পারিত।

---

* ইহাকে কোন কোন জেলায় ফ্যাঁসা, কোথাও কোদা বলে।

† ফোস্কার ন্যায়

এই তিন শ্রেণীর * বৃত্তান্ত সমূহ হইতে মানবের জন্ম-কথার যেরূপ আভাস পাওয়া যায়, তাহাতে ভ্রম হইবার সম্ভাবনা নাই। মৎপ্রণীত "Origin of Species" নামক গ্রন্থে যে সকল যুক্তিতর্কের অবতারণা করা হইয়াছে তাহার পুনরাবৃত্তি করা বাহুল্য মাত্র। এক শ্রেণীর সকল প্রাণীর সমস্ত দেহেই অনুরূপ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিদ্যমান রহিয়াছে। যদি আমরা স্বীকার করি যে ইহারা সকলেই এক আদি জীব হইতে জাত, কেবল বিভিন্ন অবস্থাধীনে তদুপযোগী ভাবে অল্লাধিক পরিবর্ত্তিত, † তাহা হইলে ঐ কথার অর্থ বোধগম্য হয়, নচেৎ মানুষের হস্ত কেমন করিয়া বানরের হস্তের ন্যায়, অশ্বের পদের ন্যায়, সিলের ডানার ন্যায়, বাদুরের পাখার ন্যায় এক-ই আদর্শের অনুরূপ হইল, তাহা বুঝিয়া উঠা নিতান্তই অসম্ভব। ঐ সকল এক আদর্শেই গঠিত হইয়াছে, এই মাত্র বলিলে বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা করা হয় না। যদি এ নিয়ম স্বীকার করি যে ভ্রূণ-দেহে যে সকল পরিবর্ত্তন অপেক্ষাকৃত পরে উৎপন্ন হইয়াছে, জীবরাজ্যে সেই সকল পরিবর্ত্তন তদ্রূপ পরেই বংশানুগত হইয়াছে, তাহা হইলে পরিষ্কার বুঝিতে পারি, কেমন করিয়া অত্যন্ত পৃথকজাতীয় জীবের ভ্রূণও অল্লাধিক পরিমাণে এক আদি জীবের অবয়ব অনুকরণ করিয়া থাকে। * মানুষের, কুকুরের, সিলের, বাদুড়ের, সরিসৃপের ভ্রূণ প্রথমাবস্থায় বিভিন্ন বলিয়া চেনাই কঠিন, এই আশ্চর্য্য ব্যাপারের অন্য কোন ব্যাখ্যাই হয় না। লুপ্তাবশিষ্ট অঙ্গপ্রত্যঙ্গের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে হইলে ইহা বিবেচনা করিলেই যথেষ্ট হয় যে উহা কোন পূর্ব্ববর্ত্তী জীবের দেহে পূর্ণাবস্থায় ছিল, পরে জীবন-ব্যাপারের পরিবর্ত্তন হেতু খর্ব্ব ও লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, হয়তো কেবল ব্যবহার না থাকার জন্যই হউক, † অথবা ঐ অব্যবহৃত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যে সকল প্রাণীর সর্ব্বাপেক্ষা কম ছিল তাহারা প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের নিয়মে রক্ষিত হইয়াছে, এই কারণেই হউক; অথবা পূর্ব্ব বর্ণিত অন্য কোন উপায়ে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের সহায়তা হওয়াতেই হউক—ঐরূপ ফল উৎপন্ন হইয়াছে; এইরূপ ব্যাখ্যা করিলেই প্রচুর হয়।

এইরূপে আমরা বুঝিতে পারি, কেমন করিয়া মানব এবং অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণী এক সাধারণ আকারে গঠিত হইয়াছে, কেন তাহাদিগের ভ্রূণাবস্থার প্রথম সময়ে এক-অবয়ব বলিয়াই বোধ হয়, ভ্রূণের পরিপুষ্টি এক প্রকারেই সিদ্ধ হয়; এবং কি কারণেই বা তাহাদের সকলের দেহেই লুপ্তাবশিষ্ট অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। আমাদিগের অকপটে স্বীকার করা উচিত যে উহারা সকলেই এক বংশীয়। ইহা স্বীকার না করিলে বলিতে হয় যে

* তিন শ্রেণী:—(১) দেহগঠন ও দৈহিক ক্রিয়া, (২) ভ্রূণের পরিপুষ্টি, (৩) লুপ্তাবশিষ্ট অঙ্গ।

† বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থায় জীবদেহ যেরূপে পরিবর্ত্তিত হয় তাহার সহিত জীব-বিবর্ত্তনের সম্বন্ধ থাকা—অর্থাৎ তাহাকে বিবর্ত্তনের অন্যতম কারণ বলিয়া স্বীকার করা, এখন আর সর্ব্ববাদী-সম্মত মত নহে। বরং বিশিষ্ট পণ্ডিতগণ উহা অস্বীকারই করিতেছেন।

* এ নিয়মও এক্ষণে সম্পূর্ণ স্বীকৃত হয় না।

† এরূপ ব্যাখ্যা এখন অনেকেই সম্যক্ স্বীকার করেন না।

আমাদিগের বুদ্ধিভ্রংশ জন্মাইবার নিমিত্তই ছলনা পূর্ব্বক আমাদিগের এবং অন্যান্য জন্তুর দেহ গঠিত হইয়াছিল। সমস্ত জন্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, তাহাদিগের সাদৃশ্য এবং শ্রেণীবিভাগের বিষয় বিবেচনা করিলে, ভূপৃষ্ঠে তাহারা দেশ দেশান্তরে যেরূপ ভাবে বিস্তৃত রহিয়াছে, এবং ভূগর্ভে তাহারা অতীত কাল হইতে এ পর্য্যন্ত যে প্রকারে স্তরে স্তরে বিন্যস্ত হইয়া রহিয়াছে, এ সকল বিষয় আলোচনা করিলে, সমস্ত জন্তুই যে এক বংশসম্ভূত, এ কথা আরও দৃঢ়রূপে প্রতীয়মান হয়। আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ সাহংকারে বলিতেন তাঁহারা দেব-বংশসম্ভূত; আমরা নিজেও স্বভাবতই কুসংস্কার-পূর্ণ। এই নিমিত্তই আমরা এ সিদ্ধান্ত স্বীকার করিতেছি না। কিন্তু একদা জীবতত্ত্ব-বিদ্‌গণ মানব এবং অন্যান্য স্তন্যপায়ী জন্তুর দেহগঠন এবং পরিপুষ্টির বিধান সকল বিলক্ষণ জ্ঞাত থাকিয়াও তাহাদিগের প্রত্যেককে পৃথক পৃথক সৃষ্ট হওয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন। ইহা অনতিবিলম্বেই একটী আশ্চর্য্য ঘটনা বলিয়া বিবেচিত হইবে, সন্দেহ নাই।

শ্রীশশধর রায়।

মহাভারত।

জ্যোতিষিক ইতিহমালা।

সূর্য্য—বক্রবাহন।

বক্রবাহনের চরিত লক্ষণ এই—

১। চিত্রবাহন রাজদুহিতা চিত্রাঙ্গদার গর্ভে অর্জ্জুনের ঔরসে বক্রবাহনের জন্ম হয় মহা ১।২১৫

২। বক্রবাহন চিত্রাঙ্গদা ও উলূপী, উভয়ের সন্তান ছিলেন। মহা ১৪।৮৮

৩। বক্রবাহনের রথে সিংহধ্বজ শোভিত ছিল এবং সেই সিংহধ্বজে সুবর্ণ তাল শোভা পাইত। মহা ১৪।৮৮

৪। বক্রবাহনের সংগ্রামে অর্জ্জুন দেহ ত্যাগ করেন। পরে বক্রবাহন তাঁহার বক্ষে সঞ্জীবন মণি স্থাপন করিলে অর্জ্জুন পুনর্জীবিত হইলেন। মহা ১৪।৭৯-৮২

৫। অন্যায় সমরে অর্জ্জুন মার্ত্তণ্ড ভীষ্মদেবকে নিপাতিত করিয়াছিলেন, সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপে মার্ত্তণ্ড বক্রবাহনের সমরে অর্জ্জুন পতিত হইলেন।

জ্যোতিষিক তত্ত্ব ও ইতিহ।

১। রাশিচক্রের তারা সিংহ সূর্য্যের গৃহ। অর্থাৎ রাশিচক্রের সিংহ রাশি সূর্য্যের নাক্ষত্রিক প্রতিমা। সিংহ পশুরাজ্যের অধিপতি, সূর্য্য জ্যোতিঃরাজ্যের অধিপতি। সিংহ সতত চক্ষু উন্মীলিত রাখে, সূর্য্য-চক্ষু কখন নিমীলিত হয় না। সূর্য্যের উদয় বা অস্ত নাই। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৩।০।৪৪ *

সূর্য্য ও সিংহ এই উভয়ের ঘনিষ্ঠ সৌসাদৃশ্য বশত তারা-সিংহ সূর্য্যের নাক্ষত্রিক প্রতিমা হইয়াছে।

২। সুবর্ণ তাল সূর্য্যের প্রতিমা মাত্র †

---

* স বা এষ ন কদাচন অস্তম্ এতি ন উদেতি।

† দ্র। সূর্য্য-ভীষ্মদেবের রথধ্বজে পঞ্চতারক-সংযুক্ত মহাতাল (মহা ৬।১৭) অথবা পঞ্চতারক-বেষ্টিত সূর্য্য শোভা পায় (মহা ৪।৫৬)।

৩। বেদমতে (১।১২২।৪) সূর্য্যের দুই মাতা।

৪। বৃহস্পতি গ্রহ যখন সূর্য্যের সন্নিহিত হইতে থাকে তখন উহার তেজ ক্রমে হ্রাস হয়। গ্রহটী বিপরীত পদে সমাগত হইলে অস্ত প্রাপ্ত হয় এবং অদৃশ্য হয়। তৎপরে গ্রহটী ক্রমে তেজস্বী হয় এবং সুদৃশ্য হয়। অস্তমনের পূর্ব্ব অবস্থাকে গ্রহের বৃদ্ধত্ব বলে। এবং অস্তমনের পরবর্ত্তী অবস্থাকে গ্রহের বাল্যত্ব বলে।

৫। সূর্য্যের রথের অশ্ব শুভ্রবর্ণ বা বভ্রুবর্ণ। *

উপপত্তি।

১। যাহার রথ ধ্বজে সিংহ এবং সুবর্ণ তাল শোভা পায় সেই রথী সূর্য্য ভিন্ন অন্য কেহ হইতে পারে না।

২। যাহার দুই মাতা সেই ব্যক্তি সূর্য্য ভিন্ন অন্য কেহ হইতে পারে না। †

৩। বভ্রুবাহনের সন্নিহিত হইলে বৃহস্পতি অর্জ্জুন অস্তমন প্রাপ্ত হইবে এবং সূর্য্য সঞ্জীবনী মণি স্পর্শে বৃহস্পতি গ্রহ আবার বাল্যত্ব প্রাপ্ত হইয়া সতেজ ও সুদৃশ্য হয়।

৪। মার্ত্তণ্ড-ভীষ্মদেবের মরণের প্রায়শ্চিত্ত জন্য অর্জ্জুনকে মার্ত্তণ্ড-বভ্রুবাহনের হস্তে নিপাতিত হইতে হইল।

৫। রাশিচক্রের মীন রাশি বৃহস্পতির গ্রহ। মীন রাশি সূর্য্যের নাক্ষত্রিক প্রতিমা। ‡ মীন রাশিস্থ অহির্বুধ্ন্য দৈবত উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্র ইতিহে কৌরব্য নাগ দুহিতা উলূপী নাম ধারণ করিয়াছে। এবং মীন রাশিস্থ পূষন্ দৈবত মৎস্যাকৃতি রেবতী নক্ষত্র ইতিহে চিত্র-অঙ্গদা নাম ধারণ করিয়াছে। এবং উলূপী ও চিত্রাঙ্গদা উভয়েই বৃহস্পতির গৃহবাসিনী বা গৃহিণী বটে।

* যাতি দেব...শুভ্রাভ্যাম্...।
(ঋঃ বেঃ ১।৩৫।৩)

† তু। পৌরাণিক ভগীরথ রাজা।

‡ জলে মৎস্যঃ মহাদ্যুতিঃ। বৃহৎসংহিতা

পূষন্‌দেব—ধৌম্য ঋষি।

পুরোহিত ধৌম্যের চরিত লক্ষণ এই ঃ—

১। অঙ্গারপর্ণ গন্ধর্ব্বের পরামর্শে পাণ্ডবগণ দেবল ভ্রাতা ধৌম্যকে পৌরহিত্যে বরণ করেন। মহা ১।১৮৩

২। ধৌম্যের সমভিব্যাহারে পাণ্ডবগণ পাঞ্চাল দেশে গমন করেন। মহা ১।১৮৩

৩। পুরোহিত ধৌম্য পাঁচ দিনে এক এক করিয়া পঞ্চ পাণ্ডবের সহিত কৃষ্ণার পরিণয় সম্পাদন করিলেন। মহা ১।১৯৮

৪। রাজসূয় যজ্ঞে ধৌম্য হোতা ছিলেন। মহা ২।৩৩

৫। বন গমন কালে ধৌম্য পাণ্ডবগণের সমভিব্যাহারে গমন করেন। মহা ২।৭৯

৬। জয়দ্রথ কৃষ্ণাকে হরণ করিলে ধৌম্য চীৎকার করিয়া পাণ্ডবগণকে কৃষ্ণার সন্ধান জ্ঞাপন করিলেন। মহা ৩।২৪৭

৭। অজ্ঞাতবাসের পূর্ব্বে ধৌম্য কৃষ্ণার পরিচারিকা সূত এবং পৌরগবগণ সহ দ্রুপদ নিবেশনে গিয়া পাণ্ডবগণের অগ্নিহোত্র সংরক্ষণ করিলেন। মহা ৪।৪

৮। ধৌম্য যুধিষ্ঠিরকে হস্তিনারাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। মহা ১২।৪০-৪১। এবং দৈবকার্য্য অনুষ্ঠানে নিযুক্ত হইলেন।

৯। ধৃতরাষ্ট্রের বনগমন কালে ধৌম্য তাহার অনুগমন করেন। মহা ১৪।১৫

১০। অগ্নি বেশ্য পুরোহিত ধৌম্য সহ পাণ্ডবগণ রাজা মরুত্তের যজ্ঞ ভূমিতে ধন আহরণ জন্য উপনীত হইলেন। মহা ১৪।৬৪

১১। তথা হইতে অশ্বমেধ যজ্ঞের ব্যয় সংগ্রহ করিয়া প্রত্যাগমন কালে ধৌম্য পুরোহিতের আর খোঁজ খবর নাই।

জ্যোতিষিক তত্ত্ব ও ইতিহ।

১। আকাশে অগ্নির প্রতিমূর্ত্তি পূষন্ দেব ব্রহ্মমণ্ডলে Auriga অধিষ্ঠিত আছে। (ঋকৃবেদের ১।৪২; ১।১৩৮; ৬৫৩-৫৬; ৬৫৮; ১০২৬) সূক্তে পূষন্ দেবের বর্ণনা আছে।

২। বেদমতে (৬.৫৫।১) পূষন্ দেব দেবগণের পুরোহিতের কাজ করেন। অর্থাৎ তিনি যজ্ঞভাগ বহন করেন এবং ১০।২৬।৫ যজ্ঞের প্রতিধি।

২। বেদ মতে (৬।৫৩.১) পূষন্ "পথঃ পতি" এবং (১।৪২।১) পথ প্রদর্শক ও (৬।৪৯।৮) "পথঃ পথঃ পরি পতিঃ" অর্থাৎ সকল পথের রক্ষক। বেদ মতে (অঃ চেঃ ১৮।২।৫৩) পূষন্ দেব সোজা পথে লইয়া যান। এবং (১০.১৭।৬) পূষন্ দেব সকল প। পরিজ্ঞাত আছেন এবং (১৪২।৭) পূষন্ দেব পথ সুগম্য করেন।

৩। বেদ মতে (১০।৮৫।২৬) পূষন্ দেব কন্যাগণের বিবাহদাতা। এবং তিনি (২০।৮৫।৩৭) কন্যাকে বরের গৃহে প্রেরণ করেন। এবং তিনি (৯।৬৭।১০) প্রার্থীকে বধূ দান করেন।

৪। এবং পূষন্ দেব (৬।৫।৫) অনুসন্ধানকারিগণের সিদ্ধিদাতা।

৫। অগ্নিদেবের নাম ধূমকেতু (১২৭।১১ ইত্যাদি)

৬ পূষন্ দেব ১।৪২।৯ উদর পূর্ণ করেন

উপপত্তি।

১। জতুগৃহ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া পাঞ্চাল-রাজকুমারী কৃষ্ণার লাভ জন্য পাণ্ডবগণ পাঞ্চাল অভিমুখে যাত্রা করিয়া পথে "পথঃ পতি" ধৌম্যকে পৌরহিত্যে বরণ করিলেন।

২। অগ্নির নাম ধূমকেতু এ জন্য অগ্নি—পূষন্ ইতিহে ধৌম্য নাম গ্রহণ করিয়াছেন।

৩। পরিণয় দেব ধৌম্য কৃষ্ণার সহিত পঞ্চ পাণ্ডবের বিবাহ ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিলেন।

৪। বনবাস গমনে পঞ্চ পাণ্ডব ধৌম্যের সমভিব্যাহারে যাত্রা করিলেন।

৫। অপহৃত কৃষ্ণার অন্বেষী পাণ্ডবগণকে চীৎকার দ্বারা ধৌম্য কৃষ্ণার অনুসন্ধান দিলেন।

৬। বনে নির্ব্বাসিত পাণ্ডবগণের অতিথি ভোজনের উপায় ধৌম্যের উপদেশে সংসাধিত হইল।

৭। নিহিত ধনরত্নের অন্বেষী পাণ্ডবগণের সিদ্ধি লাভের সহায়তায় ধৌম্য পাণ্ডবগণের সমভিব্যাহারে মরুত্ত রাজের যজ্ঞ স্থলে গমন করিলেন।

৮। প্রত্যাগমন কালে ধৌম্য নিরুদ্দেশ রহিলেন। এখন অশ্বমেধ যজ্ঞের আহুতি ধৌম্যকে দেবগণ সমীপে বহন করিতে হইবে এবং স্বর্গারোহণে ধৌম্য দেবদূত সাজিবেন, কাজেই বিনা বিদায়ে ধৌম্য অন্তর্হিত হইলেন।

জ্যোতিষিক ইতিহমালা।

গরুড়—সাত্যকি।

সাত্যকির চরিত লক্ষণ এই :—

১। যুযুধানের চলিত নাম সাত্যকি। সত্যকুমার যুযুধান শিনি রাজের বংশসম্ভূত। মহা ৭।১৪০

২। সাত্যকি ব্রহ্মলোক-প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। মহা ৭।১৪০

৩। সাত্যকি ভূরিশ্রবার (কুবের) প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন।

৪। সাত্যকি শ্রীকৃষ্ণের সহচর ও রথাধ্যক্ষ ছিলেন।

৫। ভূরিশ্রবা হস্ত দ্বারা সাত্যকির কেশ ধারণ করিলে সাত্যকি স্বীয় মস্তক পরিভ্রামিত করিতে লাগিলেন। মহা ৭।১৪০

জ্যোতিষিক তত্ত্ব ও ইতিহাস এবং উপপত্তি।

১। বেদ মতে (ঋঃ বেঃ ৭।২৪।১) "সবিতা সত্যধর্ম্মা।" ইতিহে সত্যব্রত দেবব্রত সত্যবান্ সত্যবতী এবং সাত্যকি সকলেই সূর্য্যবংশ সম্ভূত ছিলেন।

২। গরুড়মণ্ডলে (Aquila) শিনি-বংশীয় শ্যেন-সাত্যকি বীণামণ্ডলস্থ (Lyre) ব্রহ্মদৈবত অভিজিৎ নক্ষত্রের সন্নিধানে প্রতিষ্ঠিত আছেন।

৩। শ্যেন-গরুড়ের বীরত্ব অমৃত আহরণে প্রকাশিত আছে। এ জন্য ইতিহে যুদ্ধদুর্ম্মদ শ্যেন যুযুধান নাম গ্রহণ করিয়াছে। যুদ্ধলব্ধ আহারে শ্যেন-গরুড় জীবন ধারণ করে।

৪। হস্ত দ্বারা হংস আদি পক্ষীর তুণ্ড ধারণ করিলে শ্যেন-সাত্যকির মস্তক পরিভ্রামণ অনুভূত হইবে।

৫। শ্যেন-গরুড় শ্রীকৃষ্ণের বাহন। ইতিহে সাত্যকি শ্রীকৃষ্ণের রথের অধ্যক্ষতা গ্রহণ করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণের মাথায় হাত বুলান ভাল নহে। শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র চরণ স্পর্শ করাই ভাল। অতএব আমরা পরম দেবের শ্রীপাদপদ্মে প্রণতি পূর্ব্বক পর্ব্ব কথনে অতঃপর প্রবৃত্ত হইব।

তারাদর্শক।

নীলকণ্ঠ।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

রামি আবার ঠকিল—সমস্ত রাত্রি জাগিয়া কোন ফলই হইল না। কিন্তু রামি ত বোকা বনিবার পাত্র নহে, তাহার অনুমান যে একেবারে বৃথা ইহা সে স্বীকার করিতে রাজি নহে,—সে স্থির করিল, ষোড়শী 'গভীর জলের মাছ', আজ হইতে তবে ষোড়শী রাত্রিতে একাই নিজের ঘরে শয়ন করিবে এবং এখন এই প্রকারেই দুই চারি দিন কাটাইবে।

পর দিন কিন্তু ষোড়শীর নিকট শুইবার জন্য রাত্রিতে ডাক পড়িল। রামির এ অনুমানও তবে ঠিক হইল না, কিন্তু সে ত সহজে হটিতে চায় না, সে বুঝিয়া লইল এও এক চাল। এখন মাঝে মাঝে কোন দিন

তার রাত্রিতে ডাক পড়িবে, কোন দিন বা পড়িবে না!

তা, আসল কথা কি জানেন! সে দিন রাত্রিতে ষোড়শীর মন ভাল ছিল না, মন্মথদের বাটীতে সমস্ত দিন অধিকাংশ সময় মন্মথদের সহিত আহ্লাদে আমোদে কাটাইয়া তাহার সেই পূর্ব্ব স্মৃতি জাগিয়া উঠিয়াছিল, সে বহু কষ্টে বহু যত্নে তাহার ভাঙ্গা মন জোড়া দিয়াছিল, তাহার ছড়ান মন কুড়াইয়া কোন প্রকারে ঘরে মন বাঁধিয়াছিল, আজ আবার সেই বিস্মৃত বংশী ধ্বনি শুনিয়া মন তার উদাস হইয়া গিয়াছে। সেই কুঞ্জবন সেই কদম্বমূল আবার হৃদয়ে জাগিয়া উঠিয়াছে, আজ আবার যেন "যমুনার পথ পানে মন যেতে চায়।" তাই আজ সন্ধ্যার সময় দেব-দেবীদের উদ্দেশে স্বামীর কুশল প্রার্থনা করিতে তার প্রথমে ভুল হইয়াছিল, সমস্ত দিন তাঁর কথা এক প্রকার মনেই ছিল না, সেই অনুতাপে ষোড়শীর হৃদয় অশান্ত হইয়াছিল; এক দিকে মনের আবেগ, অন্য দিকে অনুতাপ, ষোড়শীর হৃদয় বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। তাই সে তখনই তাড়াতাড়ি স্বামীকে চিঠি লিখিয়াছিল, আর একা শয়ন করিয়া প্রাণ ভরিয়া সেই বিপদভঞ্জন, অনাথশরণ ভগবানকে ডাকিয়াছিল এই জন্যই ষোড়শী রামিকে সে দিন ডাকে নাই! কিন্তু রামির মন নাকি বড় কু, সে কু কথাই চিন্তা করিল—ষোড়শীর কু মতলবই সে ইহাতে দেখিল। কিন্তু কুলোকের কু কথায় আগে থাকিতে কান না দেওয়াই ভাল।

* * *

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

দেখিতে দেখিতে পাঁচ ছয় দিন কাটিয়া গেল, ইহার মধ্যে বাবুদের হইতে ষোড়শীকে লইবার জন্য দুই দিন ঝি আসিয়াছিল—কিন্তু এক দিন গৃহ কর্ম্মের ও আর এক দিন অসুস্থতার ওজরে ষোড়শী যায় নাই, সরলা ইহাতে কিছু দুঃখিত হইয়াছিল, মন্মথ কিছু বিস্মিত হইয়াছিল, ষোড়শীর এ ঔদাস্যের কারণ তাহারা কিছুই স্থির করিতে পারে নাই—শেষে সরলা মনে করিল বোধ হয় কোন প্রকারে কোন ত্রুটি হইয়া থাকিবে। সে তখন স্বামীর নিকট আর এক দিন ষোড়শীর নিকট যাইবার প্রস্তাব করিল, মন্মথের তাহাতে আপত্তি ছিল না, কিন্তু ইহার মধ্যে একটা সুযোগ ঘটিল। সম্প্রতি গৃহিণীর একটি ব্রত উদযাপনের সময় উপস্থিত। অর্থ-বলেই সব সময় সব কাজ উদ্ধার হয় না, গৃহিণীর লোক-বল বড় কম। গৃহে লোক নাই এমন কথা বলা চলে না, মধুচক্রে মক্ষিকার ন্যায় সে গৃহ সর্ব্বদাই জনসংঘে পরিপূর্ণ, কিন্তু সে চক্রে কেহ সঞ্চয় করিবার চেষ্টা করে না, সবাই তাহা হইতে মধু সংগ্রহে রত। মক্ষিকার সহিত সাদৃশ্য কেবল দংশনে! মোট কথা,বহু লোক সত্ত্বেও বাবুদের বাটীতে কাজের লোক বড়ই কম—অন্য সময় কথায় এ অভাব পূর্ণ হইয়া থাকে, কিন্তু কাজের সময় সব বিদ্যা ধরা পড়ে। তাই কোন বৃহৎ ব্যাপারে অর্থ বহুতর ব্যয় হয় বটে, কিন্তু সে পরিমাণে যশ হয় না, সময়ে সময়ে বরং অপযশই রটে। এ বাটির যিনি বর্ত্তমান গৃহিণী, মন্মথের জননী, তিনি কোন দিনই পাকা গৃহিণী নহেন! যত দিন

দেওয়ান-গৃহিণী "রাঙ্গা-গিন্নি" বাঁচিয়া ছিলেন তত দিন ক্রিয়া-কর্ম্মে তিনিই ভাণ্ডারী এবং কাণ্ডারী ছিলেন—তাঁর কর্ত্তৃত্বে সমস্ত ব্যাপারটি সুশৃঙ্খলায় সম্পন্ন হইয়া যাইত, ঢি ঢি রবে যশের গোল উঠিত, তাঁর অভাবের পর গৃহিণী-অভাবে বড় গোল বাধিয়াছে, এখন গণ্ডগোলে কাজ চলে "খোলা কেটে বামুন মরে।" ষোড়শী ত সে দিনকার বৌ, সে যে পাকা গিন্নি হইতে পারে, রায়-গৃহিণী রায় বাহাদুরপত্নী, সে কথা এক দিনের জন্যও মনে করেন নাই। সে দিন নিমন্ত্রণ খাইতে আসিয়া ষোড়শী দুই একটা কার্য্যে নিজের কর্ম্মপটুতার যে পরিচয় দিয়াছিল, গৃহিণী তাহাতেই তাহার গৃহিণীপণার পরিচয় পাইয়াছিলেন, পাকা হাতের ছাপ অল্পেই উঠে। রায়গৃহিণী নিজে পাকা গৃহিণী না হইলেও গৃহিণীপণার ধারা বুঝিতেন, তবে অক্ষমতাবশত হাতে-কলমে গৃহিণী-পণা করিতে পারিতেন না, তিনি "ছাইতে না জানিলেও গোড় চিনিতেন"—আজ তাই ব্রত-উদ্যাপনে কাজের লোকের অভাব মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, ষোড়শীর কথাই তাঁর সর্ব্বাগ্রে মনে হইল। পর দিন গঙ্গা-স্নানে যাইবার পথে ষোড়শীর গৃহে গৃহিণী অবতীর্ণ হইলেন। সঙ্গে সরলাও ছিল। গৃহিণী ও বধূকে এক সঙ্গে গৃহে আবির্ভূত দেখিয়া ষোড়শী কিছু বিচলিত হইয়া উঠিল। দুই দিন লোক ফিরাইয়া দিয়াছে, তাহাতে লেশমাত্র ক্রোধ না করিয়া ইঁহারা তাহার বাটিতে উপস্থিত। ষোড়শী সেজন্য লজ্জিত হইল, কিন্তু ভগবান জানেন কেন ষোড়শী যাইতে চাহে নাই, ইহাতে কাহারো উপর রাগ বা অভিমান নাই কিন্তু আসল কথা, সে পোড়া লজ্জার কথা ত কাহাকেও বলিবার নহে। সরলা লোক পাঠাইয়াছিল, ষোড়শী ইহাই বুঝিয়াছিল, তবে কি গৃহিণীও তাহাকে ডাকিয়াছিলেন—তা হ'লে ত বড় অন্যায় হইয়াছে—কি বলিয়া গিন্নির নিকট ক্ষমা চাহিবে, ষোড়শী তাহা ভাবিয়া পাইতেছিল না। ষোড়শী গৃহিণীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতে উদ্যত হইলে গিন্নি "রোজ রোজ ও কি কর মা তুমি যে সম্বন্ধে আমার বড়" বলিয়া প্রণাম গ্রহণ করিলেন না। যাই হোক ষোড়শীর শ্রদ্ধা-সম্মান পাইয়া গৃহিণী বিশেষ তুষ্ট হইলেন—সরলাও যথেষ্ট আদর-যত্ন পাইল। দুই চারিটা এ কথা সে কথার পর গৃহিণী আসল কথাটা পাড়িলেন। গৃহিণীর ব্রত-উপলক্ষে ষোড়শীকে ৫।৭ দিন বাবুদের বাটিতে থাকিতে হইবে। ষোড়শী তাহাতে কোন আপত্তি করিতে পারিল না, কিন্তু বাটিতে অন্য কেহ নাই বলিয়া স্থির হইল, ষোড়শী প্রত্যহ আহারান্তে রাত্রিতে নিজের বাটিতে আসিয়া থাকিবে, আবার প্রত্যূষে গাড়ী আসিলেই যাইবে, গৃহিণী যাইবার সময় বলিয়া গেলেন—"কাল তবে অবশ্যি করে যেও মা, সকালেই গাড়ী আসবে—তোমার উপরই সব ভার মা।" ষোড়শী নত মুখে মৃদু মধুর হাসিল। তাহাতেই ষোড়শীর বক্তব্য প্রকাশ পাইল, আর কিছু বলিবার প্রয়োজন হইল না। গৃহিণী ষোড়শীর সহিত কথা কহিতে কহিতেই ফস করিয়া বাটির কোথায় কি নূতন হইয়াছে দেখিয়া লইলেন—আজ তাঁর "রাঙ্গা-গিন্নি"কে বিশেষ ভাবে মনে পড়িল। তাঁর

গুণগ্রাম স্মরণ করিয়া গৃহিণীর চক্ষে জল আসিল।

সরলা ও ষোড়শী এই অবকাশে নির্জ্জনে দুই চারিটা কথা কহিতে পাইল। সরলার ভারি অভিমান—"যাও দিদি, তুমি ভাই বড় দুষ্ট, তোমার সঙ্গে কিন্তু আড়ি।

"বাড়ী বয়ে ঝগড়া কর্ত্তে এসেছ—তুমি ত বোন তবে বড় কুঁদুলে দেখচি! আমি ত জানতেম, তুমি নেহাত ভাল মানুষ! ও বাবা, এ দেখি, ধুকড়ির ভেতর খাসা চাল!" ষোড়শীর এই রহস্যে সরলা এক মুখ হাসিল—কিন্তু ইহার উত্তর আর তার মুখে জোগাইল না। সে সাদা-সিধে মানুষ, কেবল বলিয়া গেল "দুদিনই দিদি—আমরা তোমার আশায় কতক্ষণ বসেছিলাম!" "আমরা? আমরা কে কে?" সরলা এ কথায় আবার মৃদু হাসিল, হাসিয়া ষোড়শীর মুখের দিকে চাহিল, আর একটু হাসিল—ষোড়শী এ কথাটা কিন্তু তামাসা করিবে বলিয়া বলে নাই—সে পূর্ব্ব ধারণা মত মনে করিয়াছিল, "আমরা" অর্থাৎ গৃহিণী আর বৌ—কিন্তু সরলার বলিবার ভঙ্গীতে তাহার মনে সন্দেহ হইল—তবে গিন্নি লোক পাঠাইবার কথা বুঝি জানিতেন না! তবু সন্দেহ দূর করিবার জন্য ষোড়শী জিজ্ঞাসা করিল, "কে, তুমি আর গিন্নিমা!" সরলা এ বারেও আবার হাসিল, এবারও কিছু উত্তর দিল না! হাস্যে তাহার চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল,—ফুল্ল অধর প্রফুল্ল হইল—ষোড়শীও বুঝিয়া, হাসিয়া, সে অধরে অধর দিয়া মৃদু চুম্বন করিল! সরলা এতটা প্রস্তুত ছিল না, কিছু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল! ষোড়শী সহসা এতটা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল কেন? কে জানে?

গৃহিণীরা চলিয়া গেলেন—ষোড়শী একা ভাবিতে লাগিল—ইহাদের আসিবার পূর্ব্বে ষোড়শী তাহার স্বামীর কথাই ভাবিতেছিল! তাঁহার চরণে ষোড়শী কি এমন অপরাধ করিয়াছে, যে বার বার পত্র লিখিয়াও সে উত্তর পাইতেছে না! নিজ হইতে ত পত্র দিলেন না—চিঠি লিখিলেও উত্তর নাই, তবে কি সত্যই স্বামী আর তাঁহাকে ভাল বাসেন না? ষোড়শী যতই তাঁর চরণে শরণ লইতে চাহিতেছে, তিনি ততই তাহাকে উপেক্ষায় চরণ ছাড়া করিতেছেন কেন? ষোড়শীর চোখ ফাটিয়া জল আসিতেছিল! প্রথম পত্র যে ডাকে যায়ই নাই, এবং দ্বিতীয় পত্র নীলকণ্ঠ মফঃস্বলে ঘুরিতেছেন বলিয়া এ পর্য্যন্ত তাঁর হস্তগত হয় নাই, ষোড়শীর ইহা জানিবার কোন উপায় ছিল না। তাই ষোড়শী আপনার মনে কতই তোলাপাড়া করিতেছে। মনের কথা বলিবে এমন লোকটি ষোড়শীর নাই, দুঃখে বুক ফাটিতেছে, তবু মুখ ফুটিয়া সে ব্যথা জানাইবার কোনই উপায় নাই; এ অবস্থা মানুষের পক্ষে নিতান্তই কষ্টকর। রামির সহিত ষোড়শীর পূর্ব্বে দুই একটা কথা হইত কিন্তু ষোড়শীর তাহাতে আর প্রবৃত্তি হয় না। মন্মথের বাটী যাইতেও ইচ্ছা হইতেছে না,—তবে কি করা যায়? একা ত আর থাকা যায় না, ভাবাও যায় না, ষোড়শীর মনে যখন এই সকল চিন্তা-লহরী খেলিতেছিল, ঠিক সেই সময়ে গৃহিণী সরলাকে লইয়া তাহার গৃহে উপস্থিত

হইলেন। সরলার মুখে ষোড়শী শুনিল মন্মথ তাহার জন্য পথ চাহিয়া বসিয়া থাকে। সরলার কাছে থাকিয়াও কি তবে আজও ষোড়শীর জন্য মন্মথ উৎসুক হয়, তবে এখনও কি সে তেমনি ভালবাসে? এক দিকে স্বামীর ঔদাস্য, অন্য দিকে মন্মথের আগ্রহ; না, না, না. ষোড়শীর স্বামী যে প্রীতির সাগর, তাহার প্রীতির সহিত কি কাহারো স্নেহের তুলনা হয়। ছি, ছি, আবার ও কি কথা মনে আসে? ষোড়শীর ইচ্ছা, যেন দুই হাতে ঠেলিয়া এ সকল চিন্তা মন হইতে দুর করিয়া দেয়। তবে মন্মথ, আর কেন? কেন আবার—

"বাঁধিতে বসিলে মন আপন-ঘরে,
সে কেন বাজায় বাঁশী, আকুল করে!"

(ক্রমশ)

শ্রীশৈলেশচন্দ্র মজুমদার।

জীবন-বন্ধু।

না জানিয়া সেইখানে করিনু আঘাত
জীবনবন্ধু হে যেথা জাগ দিনরাত।
যেথায় নিয়ত তুমি মাগ হে বিশ্রাম
সেইখানে বাধাইনু বিপুল সংগ্রাম;
কাটিনু আপন হাতে হইয়া কঠোর
অমৃত-মঙ্গল-ধারা তব প্রেম-ডোর,
ছিন্ন করি ফেলি যাহে জীবনের মূল
অকুলসাগর-মাঝে হারাইনু কূল।
সঁপি দিনু আপনারে বিনাশের পায়
যেথা হতে বন্ধু তোমা দেখা নাহি যায়।
মরণে বরিনু আর ত্যজিনু তোমারে
ডুবিনু আঁধারে হায় ডুবিনু আঁধারে।
সেথা দেখি জাগ তুমি হয়ে মৃত্যুঞ্জয়
প্রেম-সিন্ধু হৃদ-বন্ধু নাহি তব ক্ষয়।

শ্রীহেমলতা দেবী।

মৃগ-তৃষা।

(৭)

ডাক্তার বাবুর আশঙ্কাই সত্য হইল। মোহিতকুমার কঠিন বসন্ত পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছে। সহায়-সম্পত্তি-হীনা অমিয়া প্রথমে চক্ষে অন্ধকার দেখিল! কিন্তু যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ, তাই সে আশায় বুক বাঁধিল। যত্ন-শুশ্রূষা যতদূর সম্ভব অমিয়া তাহার কিছুই ক্রটী করিল না. অকাতরে অর্থ ব্যয় করিতে লাগিল, গোপনে নিজের গহনা-পত্র বন্ধক দিল, ডাক্তার বাবু ইহার কিছুই জানিতে পারিলেন না। মোহিতকুমারের চিকিৎসার ভার তিনি আর নিজ হাতে রাখেন নাই। সহরের কোন প্রসিদ্ধ বসন্ত-রোগের চিকিৎসক নিযুক্ত হইয়াছিল, তথাপি ডাক্তার বাবু প্রত্যহ দুই তিন বার সংবাদ লইয়া যাইতেন, রোগীর গৃহে যাইতে কোন প্রকার সঙ্কোচ করিতেন না। রোগীর শয্যার, পথ্যের, ব্যবস্থা দেখিয়া তিনি কিছু

চমৎকৃত হইতেন. এরূপ ব্যয় করা সাধারণ গৃহস্থের ত সাধ্য নহে, ডাক্তার বাবু মোহিত-কুমারের অবস্থা কতক জানিতেন—তাই এ প্রকার ব্যয় কিরূপে চলিতেছে তিনি বুঝিয়া উঠিতে পারিতেন না। তিনি কয়েক-দিন ঝির দ্বারা অমিয়াকে খরচপত্রের জন্য টাকা দিতে চাহিয়াছিলেন, পাছে অমিয়া সঙ্কোচ মনে করে বলিয়া কর্জ্জ স্বরূপই টাকা দিবার প্রস্তাব করেন, কিন্তু অমিয়া তাহা লয় নাই! সবিনয়ে জানাইয়াছিল, এখন প্রয়োজন নাই, আবশ্যক হইলে জানাইবে।

অমিয়ার পিতৃব্য বসন্ত রোগে মারা যান। তাঁহার শুশ্রুষা অমিয়া স্বচক্ষে দেখিয়াছিল, ঐ সময়ে তাহার পিত্রালয়ে আর দুই তিন জনের বসন্ত হইয়াছিল, তাঁহারা রক্ষা পাইয়াছিলেন। সে খুব বেশী দিনের কথা নহে, অমিয়াও তাঁহাদের সেবা শুশ্রূষায় লিপ্ত ছিল, সুতরাং ইহাতে তাহার অনেক অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছিল, এখন সে অভিজ্ঞতা যথেষ্ট কাজে লাগিল। অমিয়া শুদ্ধাচারে থাকিয়া, দিবারাত্রি বিনিদ্র নয়নে, কখন অনশনে কখন বা অর্দ্ধাশনে, একমনে রোগীর পার্শ্বে বসিয়া সেবা করিত! এ রোগের কি অসহ্য ক্লেশ, মোহিতকুমার যন্ত্রণায় ছট-ফট করিতেন, অমিয়ার দুই চক্ষে বারি-ধারা বহিত! প্রিয়তমের এত কষ্ট আর যে চক্ষে দেখা যায় না। প্রাণে যে আর সহে না। মা যদি কষ্টই দিতে হয়, আমায় দে মা, আমার স্বামীর ক্লেশ দূর করে দে মা! অমিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া মা শীতলার কাছে এই প্রার্থনাই করিত! কখন বা সেই বিপদভয়বারিণী, ত্রিভুবনতারিণী জগজ্জননীর চরণে স্বামীর জীবন ভিক্ষা চাহিত! অমিয়া ভ্রমেও ত কাহাকে কোন মনকষ্ট দেয় নাই, কাহারো কোন অপকার করে নাই, ঠাকুর-দেবতার কোন অপ্রিয় কার্য্য করে নাই, তবে, হে মা দুর্গা, হে মা কালী, হে মা শীতলা, অমিয়ার প্রাণাধিককে, অমিয়ার প্রিয়তমকে রক্ষা করিবে না কেন? অমিয়া শিশুকাল হইতে ভক্তিভরে সেই দেবাদিদেব, মহাদেবের পূজা করিয়া আসিতেছে, সেই সতী-পতি শিব, সতীর সকল অশিব 'ক নাশ করিবেন না? অমিয়ার কপালগুণে দেব-দেবী সকলেই কি নিষ্ঠুর হইবেন? এই জন্যই কি তবে দেব-দেবীর মূর্ত্তি পাষাণে গড়িবার ব্যবস্থা! না, না, দেব-দেবীকে নির্দ্দয় ভাবিতে নাই, সে কথা ভাবিলেও অমিয়ার পাপ স্পর্শিবে! তোমরা অমিয়ার অপরাধ লইও না, সে আজ তাহার সংসারের একমাত্র অবলম্বন, তাহার সর্ব্বস্বধন হারাইতে বসিয়াছে!

(৮)

সতীর কাতর প্রার্থনায় সতী মা যেন মুখ তুলিয়া চাহিলেন! মা শীতলা মোহিত-কুমারের গাত্রে পদ্ম হস্ত বুলাইলেন, মোহিত পত্নীর পুণ্যে, পত্নীর যত্নে দিনে দিনে আরোগ্যের পথে অগ্রসর হইতে লাগিল! ক্রমে সকল প্রকার বিপদের আশঙ্কা কাটিয়া গেল, মোহিতকুমার আরোগ্য-স্নান করিলেন! আজ অমিয়ার কি আনন্দ, সে পবিত্র মুখে আজ কি পুণ্যের জ্যোতি ফুটিয়া উঠিয়াছে! আজ মোহিতকুমারের মুখের দিকে চাহিতে চাহিতে অমিয়ার মুখে সত্যই হাস্যের অমৃত ধারা ঝরিতেছিল! মুগ্ধ

মোহিতকুমার আজ যেন "নয়ন ভরিয়া" অমিয়ার যে পবিত্র রূপসুধা পান করিতেছিলেন, অমিয়াকে আর তার বলিবার কি আছে? উচ্ছ্বসিত-হৃদয় মোহিতকুমার অমিয়ার কথা মনে করিয়া সর্ব্বদাই ভাবিত,—

"কি দিব, কি দিব করি মনে করি আমি,
যে ধন তোমারে দিব, সেই ধন তুমি!"

এ সকল মনের কথা, মোহিতকুমার মুখে, কিছু বলিতে গেলে অমিয়া তাহাতে বাধা দেয়, বলে, ইহার পরে দেখচি এক গ্লাস খাবার জল দিলেই তুমি ধন্যবাদ জানাবে! এ সব পাগলামি আবার তোমার মাথায় ঢুকল কেন?

'না অমিয়া, এ পাগলামি নয়।—এ সব' —কিন্তু কি জ্বালা, আময়া যে মোহিতকে এ সম্বন্ধে কিছুই বলিতে দেয় না! এই কথা কাটাকাটির মধ্যে—নীচে কে ডাকিল "মোহিত বাবু!" সঙ্গে সঙ্গে অপেক্ষাকৃত উচ্চস্বরে আর দুইবার ডাক,—তার পর সিঁড়িতে "মস মস" জুতার শব্দ পাওয়া গেল। এ নিশ্চয়ই ডাক্তার বাবু,—অমিয়া ঘোমটা টানিয়া তাড়াতাড়ি পাশের ঘরে চলিয়া গেল। আজ সদ্যস্নাত, শুভ্রবসনপরিহিত, প্রফুল্লবদন মোহিতকুমারকে দেখিয়া ডাক্তার বাবু একমুখ হাসিয়া ফেলিলেন—বলিলেন, মোহিত বাবু, এবার কিন্তু আপনার পুনর্জ্জন্ম! স্মিতমুখে মোহিতকুমার উত্তর দিলেন—সে কেবল আপনাদের আশীর্ব্বাদে!

ডাক্তার বাবু তখন ব্রাহ্মণোচিত ভাব সহ বলিতে লাগিলেন, আমাদের আশীর্ব্বাদ ছিল বটে, কিন্তু আমাদের মত কলির ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদে তেমন জোর নাই যে, আপনাকে মৃত্যুমুখ হইতে ফিরাইয়া আনে! এবার যে আপনি রক্ষা পেয়েচেন সে কেবল আপনার সাধ্বী সহধর্ম্মিণীর পুণ্যের জোরে। যমের মুখ হ'তে কেড়ে নেওয়া যাকে বলে, তিনি আপনাকে ঠিক তাই করেচেন! আগে সাবিত্রী-সত্যবানের গল্পটা কেবল কবির কল্পনা মনে কর্‌তাম, কিন্তু আপনাকে আপনার পত্নী যে করে বাঁচিয়েছেন, তা দেখে এত দিনে আমি সেই উপাখ্যানের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছি! উ! পত্নী আপনার কি অসাধ্য সাধনই করেছেন! সত্যই আপনার সেবা-রতা ভার্য্যার পাতিব্রত্য, তাঁর একাগ্রতা দেখে, যমরাজ তুষ্ট হয়ে, আপনার জীবন তাঁকে দান করেছেন! আপনার অর্দ্ধাঙ্গিনী সত্যই সাবিত্রীর অংশ! তাঁর প্রসঙ্গ শুনিলে জীবন ধন্য হয়!—মোহিতকুমার পত্নীর প্রশংসায় সুখী হইতেছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু ডাক্তার বাবুর কথার উত্তরে, দুই একটা রহস্যের প্রলোভন তাঁহাকে অনেক কষ্টে সম্বরণ করিতে হইয়াছিল! কারণ ডাক্তার বাবু অতিশয় ভক্তির সহিত উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে কথাগুলি বলিতেছিলেন, স্থান কাল না বুঝিয়া ইহার উপর তামাসা করা, নিতান্তই 'শীতলার বাহনে'র কার্য্য হইত, সুতরাং মোহিত সামলাইয়া গেলেন—কিন্তু হইলই বা পত্নীর—এতটা প্রশংসা বিনা বাক্য ব্যয়ে হজম করা নিতান্তই ভদ্রতা-বিরুদ্ধ হয় মনে করিয়া, মোহিতকে বলিতে হইল "আপনারা স্নেহ করেন, তাই তাঁর সমস্ত কার্য্য স্নেহের চক্ষে দেখে থাকেন!" "না না, মোহিত বাবু ইহার

মধ্যে অতিরঞ্জন কিছু মাত্র নাই!" এ প্রকার কথা-বার্ত্তা বোধ হয় কিছুক্ষণ চলিত, কিন্তু ডাক্তার বাবুর একটা বড় "জরুরি ডাক" আছে, তাঁর ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল! কাজেই ডাক্তার বাবুকে তখনই উঠিতে হইল।

"ডাক্তার বাবু কি বল্‌ছিলেন, শুনেছ ত? আমি কিছু বল্লেই বুঝি দোষের হয়," মোহিতকুমারের কথায় তেমন কান না দিয়া "পুরুষ মানুষের ওসব বাজে কথা শুন্‌তে নেই" বলিতে বলিতে অমিয়া কার্য্যান্তরে চলিয়া গেল! আজ যে এ পর্য্যন্ত রন্ধনের কোন ব্যবস্থাই হয় নাই। মোহিতকুমারকে স্নান করাইতে, বিছানা বদলাইতে, অনেক বিলম্ব হইয়া গিয়াছে।

দুই তিন দিন পরে মোহিতকুমার এক দিন প্রাতে অমিয়াকে রহস্যের ছলে বলিতেছিল, ডাক্তার বাবু বলেন, তুমি কলির সাবিত্রী, যমরাজের নিকট হইতে আমার জীবন ভিক্ষা লইয়াছ!—তা ভাই জীবনের সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যটা, অন্তত যে সম্পত্তিটুকু ছিল, সেটুকুও যদি বর চাহিতে তবে খাইয়া বাঁচিতাম। অমিয়া কি উত্তর দিতে যাইতেছিল, সহসা কাহার কণ্ঠস্বরে স্ত্রী, পুরুষ উভয়েই চমকিয়া উঠিল। বাহির হইতে কে বলিল "রহস্য নয়, মোহিতকুমার, সত্যই অমিয়া সাবিত্রীর মতই তোমায় রক্ষা করিয়াছে, রাজ্যও তাহার কল্যাণে তোমার হইবে। সঙ্গে সঙ্গে এক মনুষ্যমূর্ত্তি গৃহ মধ্যে দৃষ্ট হইল। কে, ইনি? (ক্রমশ)

শ্রীঃ—

গ্রন্থ সমালোচনা।

চিকিৎসক (আদর্শ হোমিয়োপ্যাথিক গ্রন্থ)—ডাক্তার এ, সি, মজুমদার এল, এম, এস, প্রণীত। মূল্য ২৲। আমরা চিকিৎসক নহি—চিকিৎসাগ্রন্থের সমালোচনা করিবার অধিকার এক মাত্র বিশেষজ্ঞের আছে। তবে কিছু দিন সৌখিন ভাবে হোমিওপ্যাথিক আলোচনা করিয়াছিলাম সেই সাহসে এবং সমালোচক-সুলভ সর্ব্বজ্ঞতার অভিমানেই এ পুস্তক সমালোচনায় হাত দিয়াছি। পুস্তকখানির বিষয়-সংস্থান আমাদের বেশ ভাল লাগিয়াছে। ভূমিকায় হোমিওপ্যাথি সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়, তার পর সাধারণভাবে পথ্যাদি-বিচার, তার পর মেটিরিয়া মেডিকা, ও পরে প্রাকটিস্ বা চিকিৎসাপ্রণালী লিখিত হইয়াছে! পরিশিষ্টে অনেক প্রয়োজনীয় বিষয় আছে! পুস্তকখানি গৃহস্থের কাজে লাগিবে। কিন্তু আকার হিসাবে মূল্য অতিরিক্ত মনে হয়, সুলভ করিবার উপায় নাই কি?

২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিসন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত।

বঙ্গদর্শন

দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর।

(সাগর-মাহাত্ম্য)

পঙ্কজ বলিলে পদ্মকেই বুঝায়; বিদ্যাসাগর বলিলেও সকলে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়কেই বুঝিয়া থাকেন। তিনি সত্যই বিদ্যার সাগর, কিন্তু তাঁহার প্রকৃত পরিচয় কি বিদ্যায়? না। তিনি বুদ্ধির আধার, তেজের আকর, উৎসাহের প্রতিমূর্ত্তি; কিন্তু কেবল এ সকল গুণের জন্য ত তিনি আমাদের হৃদয়ের এই গভীর ভক্তি আকর্ষণ করেন নাই। স্বর্গীয় রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ও এই সকল গুণের অধিকারী ছিলেন, তাঁহার ও ৺ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্বর্গারোহণ প্রায় এক সময়েই ঘটিয়াছিল। কিন্তু মনস্বী রাজেন্দ্রলালের মৃত্যুতে কি দেশব্যাপী হাহাকার উঠিয়াছিল? "বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে" কথা সত্য বটে, কিন্তু সে শিক্ষিত সমাজে; সাধারণের সহিত তাহার সম্পর্ক বড় অল্প, তবে বিদ্যাসাগরের বিয়োগে দেশে শোকের সে প্রবল উচ্ছ্বাস উঠিয়াছিল কেন এবং আজিও তাঁহার কথা উঠিলেই সাধারণের চক্ষু সজল হইয়া আসে কেন? সে কি তিনি বিদ্যাসাগর বলিয়া? না। তিনি যে দয়ার সাগর, দয়াই তাঁহার বিশেষত্ব। দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা তাঁহার দয়ার কথা স্মরণ করিয়াই আজিও আকুল হয়। দয়ার সাগর উপাধিই তাঁহার প্রকৃত পরিচয়; দানের মাহাত্ম্য আমরা ভুলিয়াছিলাম। স্বদেশ-প্রেম, স্বজাতি-প্রেম, স্বধর্ম্ম-প্রেম আমাদিগের নিকট পুঁথিগত বিদ্যার তুল্য ছিল। দয়ার সাগর বিদ্যাসাগরই আমাদিগের দয়া ও প্রেমের মহিমা স্বীয় জীবনের কার্য্যের ভিতর দিয়া আবার নূতন করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন।

স্বর্গীয় মনস্বী ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বলিয়াছিলেন "ভারতের ইতিহাস উহার অধিবাসী জনগণের সহধর্ম্মী প্রেম ও স্বদেশী প্রেম-বিহীনতা দোষের প্রায়শ্চিত্তের ইতিহাস মাত্র। তিনি বলিয়াছিলেন যে, উচ্চশ্রেণীর হিন্দু তাঁহার 'শাস্ত্রবাক্যে' শিক্ষিত, যে সর্ব্ব ঘটেই ভগবান বিদ্যমান আছেন, সমস্তই একের বিভূতি। কিন্তু ব্যবহারে সধর্ম্মীকে পশুর অপেক্ষাও অপবিত্র

ভাবে দেখিতেন, এবং অনেকটা এখনও দেখেন। ঘরের দাওয়াতে ছাগল-নাদিতে দোষ কম, এক জন মেথর বা ডোম বসায় দোষ বেশী। এই সধর্ম্মী প্রেমের অভাবে এই সধর্ম্মী বিদ্বেষের জন্য ভগবান করুণা-পূর্ব্বক পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সধর্ম্মী প্রেমিক মুসলমানকে শাস্তা ও শিক্ষকরূপে এ দেশে প্রেরণ করেন। মুসলমানের আমলের শেষে হিন্দুর মধ্যে কতকটা সধর্ম্মী প্রেমের উদ্রেক হইয়াছিল। মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ মহারাষ্ট্রীয় শূদ্রের সহিত একপ্রাণ হইয়া দেশের কার্য্য করিয়াছিল। সর্ব্ব বর্ণের পঞ্জাবী শিখও একপ্রাণ হইয়া কার্য্য করিয়াছিল। কিন্তু মহারাষ্ট্রীয়ের এবং শিখেদের স্বদেশী প্রেম পরিস্ফুট হয় নাই, উহা প্রাদেশিকভাবে বদ্ধ ছিল। উহারা নিজেদের সকলকেই ভারত-সন্তান বলিয়া মনে করে নাই। মহারাষ্ট্রীয়, রাজপুতানা-বাসীকে এবং বাঙ্গালীকে নির্ম্মম ভাবে লুঠ করিয়াছিল। শিখ কয়টা বড় সহর—সহিন্দ একেবারে বিধ্বস্ত করিয়াছিল। ভারতবাসী যে হিন্দু-মুসলমান পরস্পরের স্বদেশী সুতরাং প্রেমের পাত্র এবং অপর দেশবাসী সকলের অপেক্ষাই নিকটের, এই সহজ কথা উভয়েই কিছুমাত্র বুঝেন নাই। ভগবান এই স্বদেশী বিদ্বেষ-পাপের দমন জন্য পৃথিবী মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্বদেশী ভক্ত ইংরাজকে ভারতে অখণ্ড সাম্রাজ্য স্থাপন জন্য পাঠাইয়া দিয়াছেন। সধর্ম্মী প্রেম সম্বন্ধে মুসলমান আদর্শস্থানীয়; দরিদ্র, ভিক্ষুক এবং নবাব বাদসাহ ভাই ভাই ভাবে একত্র নমাজ পরিতে আদিষ্ট এবং সে বিধি উহারা প্রীতির সহিত পালন করিয়া থাকেন। ইদের দিনে কাতারে কাতারে মুসলমানদের একত্র উপাসনা কি সুন্দর ও পবিত্র দৃশ্য। এ দিকে আবার স্বদেশী প্রেম সম্বন্ধে ব্রিটিশ বা ইংরেজ জাতি আদর্শস্থানীয়! ইংরাজের মধ্যে স্কচ্, ওয়েলস্, আইরিশ, রোমান্-ক্যাথোলিক, ভেসেটার, প্রেসপিটিরিয়ান্ প্রভৃতিই প্রাদেশিক ভেদ আছে, কিন্তু উহারা সকলে স্বদেশ-প্রেমে মত্ত। স্বধর্ম্মের জন্য মুসলমান অপকর্ম্মও করিতে প্রস্তুত, স্বদেশীর জন্য ইংরাজও অপকর্ম্ম পর্য্যন্ত করিতে প্রস্তুত। ভারতবাসী হিন্দু-মুসল-মানগণের কাহার জন্যই অপকর্ম্ম হইয়া কাজ নাই; কিছুতেই ঈশ্বর সমীপে অপরাধী হইয়া কাজ নাই, উহাতে স্বধর্ম্মীর বা স্বদেশীর প্রকৃত উপকার করা হয় না, কিন্তু প্রত্যেক ভারতবাসীর মনেই গাঢ় স্বধর্ম্মী প্রেম গাঢ়তর স্বদেশী প্রেমে আবৃত থাকা প্রার্থনীয়, সেইরূপ কখন হইলে তবে এই পুণ্য-ভূমিতে ও কর্ম্ম-ভূমিতে ভগবানের প্রেরিত স্বধর্ম্মী প্রেমিক ও স্বদেশী প্রেমিক—আদর্শদিগের আগমন সার্থক হইবে।”

আমার মনে হয়, তাঁহাদের আগমনের সার্থকতার সূত্রপাত হইয়াছে। বিদ্যাসাগরই এই সার্থক পথের প্রথম ও প্রধান যাত্রী, কিন্তু তাঁর প্রেম কেবল স্বধর্ম্মী প্রেমে ও স্বদেশী প্রেমে আবদ্ধ ছিল না, সে প্রেম বিশ্বপ্রেমে পরিণত হইয়াছিল। তিনি ব্রাহ্মণ, কি চণ্ডাল, হিন্দু কি মুসলমান, ব্রাহ্ম বা খ্রীষ্টান, ছোট কি বড়, আবশ্যক স্থলে সমান ভাবে সকলের প্রতি সদয় ব্যবহার করিতেন। তিনি তাঁহার অধ্যা-

পক্ষের কলেরা রোগে যেমন সেবা করিয়াছিলেন, একজন মেথরের সুশ্রূষাতেও সেইরূপ একান্ত মনে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার কোন অধ্যাপক স্বীয় ভাগিনেয়ের কলেরা পীড়ায় ভীত হইয়া তাহার সংস্রব ত্যাগ করিয়াছিলেন। অধ্যাপকের সেই পরিত্যক্ত ভাগিনেয়কেও বিদ্যাসাগর যেরূপ যত্ন করিয়াছিলেন, অন্য এক ব্যক্তির ঐ পীড়াক্রান্ত ভৃত্য, প্রভু কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া বিদ্যাসাগরের নিকট সেইরূপ ব্যবহারই পাইয়াছিল। সেই মুমূর্ষু, পরিত্যক্ত, অনাথ ভৃত্যকে বিদ্যাসাগর পথ হইতে তুলিয়া বুকে করিয়া লইয়া নিজের শয্যায় আশ্রয় দিয়াছিলেন। সংক্রামক রোগ বলিয়া তিনি কখন রোগীর সেবায় পশ্চাৎপদ হন নাই। একজনার সেবায় প্রাণ হারাইলে দেশের ও দশের উপকার করা সম্ভব হইবে না, সুতরাং Public goodএর জন্য সেরূপ সেবায় নিজের মূল্যবান জীবনকে বিপন্ন করা অনুচিত এরূপ যুক্তি-তর্কের উদয় কখনও তাঁহার মনে হয় নাই।

একবার সহোদর শম্ভুচন্দ্রের নিষেধ-ঈঙ্গিত সত্ত্বেও কোনও কুষ্ঠরোগীর স্বহস্ত আনীত জলখাবারও বিদ্যাসাগর অম্লান বদনে খাইয়াছিলেন এবং এ জন্য পরে শম্ভুচন্দ্র অনুযোগ করিলে বলিয়াছিলেন "তোমার ঐ পীড়া থাকিলে আমি কি করিতাম।"

সে বৎসর দুর্ভিক্ষের সময় হাজার হাজার লোককে অন্ন দিয়া, যাহারা সকলে একত্রে খাইতে অনিচ্ছুক তাহাদের সিধা দিয়া, যাহারা প্রাণান্তেও সাধারণে পরের সাহায্যে জীবন ধারণের কথা প্রচারে স্বীকৃত ছিল না, তাহাদিগকে গোপনে অর্থ সাহায্য করিয়াও বিদ্যাসাগরের মনে তৃপ্তি হইত না। সমাগত দুর্ভিক্ষ পীড়িত জনসঙ্ঘের রুক্ষ মস্তকে তৈল দিবার ব্যবস্থাও তিনি করিয়াছিলেন। নীচজাতীয়, যথা ডোম, চণ্ডাল আদি শ্রেণীর লোককে অপরে ঘৃণাবশত তৈল না দিলে বিদ্যাসাগর স্বহস্তে তাহাদের মস্তকে গাত্রে তৈল দিয়া দিতেন। দুর্ভিক্ষের পরেও যাহাদের অবস্থা শোচনীয় তাহাদিগকে যথেষ্ট সাহায্য করিতেন। শারদীয় পূজায় পঞ্চ সহস্র মুদ্রার বস্ত্র দান করিয়াও এ দুর্ভিক্ষের সময় সহস্র টাকার বস্ত্র দান করিয়াছিলেন। যখন বাল্যকালে উপার্জ্জনের ক্ষমতা ছিল না, তখনও তিনি গামছা পরিধান করিয়া বস্ত্রহীনকে নিজের বস্ত্র দিতেন। উত্তরকালে তিনি যখন বিশেষ পদস্থ হইয়াছিলেন তখনও পূর্ব্ব পরিচিত দীন দুঃখী বা সামান্য অবস্থাপন্ন লোকের সহিত একাসনে বসিয়া তাহাদের সহিত কত ঘরের কথা কহিতেন, সম্ভ্রান্ত ও বড় লোক কেহ কেহ তাঁহাকে এই অবস্থায় দেখিয়া লজ্জিত হইলে তিনি বলিতেন "আমার ছোট বড় সবই সমান, আমার এ ব্যবহারে যদি তোমরা লজ্জানুভব কর, তবে আমার সহিত আলাপ না রাখিলেই চলিবে।"

বর্দ্ধমান যখন ম্যালেরিয়ায় উৎসন্নপ্রায় হইয়া গিয়াছিল, তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় গভর্ণমেণ্ট দ্বারায় চিকিৎসা সাহায্য করাইয়াও নিজ ব্যয়ে Dispensary স্থাপন

করিয়া ঔষধ, পথ্য ও বস্ত্র দিয়া শত শত রোগীর জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন।

ঔষধে অধিক ব্যয় হইতেছে বলিয়া ডাক্তার দরিদ্র ব্যক্তি ও রোগীর জন্য কুইনানের পরিবর্ত্তে সিঙ্কোনা (cincona) ব্যবহারের প্রস্তাব করিলে "রোগ ত সবারই সমান, তবে ঔষধের তারতম্য কেন হইবে" বলিয়া সে প্রস্তাব বিদ্যাসাগর মহাশয় অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় এক দিন দেশবাসী দীন দুঃখীর কথায়, অন্ন ক্লিষ্টের ব্যথায় ব্যথিত হইয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে বলিয়াছিলেন, দেশে সকলেই Congress করিতেছেন, আন্দোলন করিতেছেন কিন্তু দেশের শত সহস্র লোক যে অনাহারে প্রতিদিন মরিতেছে তাহাদিগকে ত কেহ দেখিতেছেন না। যে দেশের লোক দলে দলে না খাইয়া প্রত্যহ যমদ্বারে উপস্থিত হইতেছে তাহাদের আবার রাজনীতি কি? আজকাল আমরা দেশের দীন দুঃখীর অভাব ও কষ্ট যেন এক আধটু বুঝিতেছি, কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন এই কথা বলিয়াছেন তখন তিনি ছাড়া দুঃখীর ব্যথা কয় জনা বুঝিত! এখনই বা কয়জনে কতটুকু বুঝি! বুঝিলেই বা তাহা মোচনে কতটুকু চেষ্টা করি। বিদ্যাসাগর দীনদুঃখীর দুঃখ বুঝিতেন এবং বুঝাই যথেষ্ট মনে করিতেন না, মোচন করিতেও চেষ্টা করিতেন। লক্ষপতির সাহসে যাহা কুলায় না সেই ভাবে অর্থ ব্যয় করিয়া নিজের বহুমূল্য সময়ের দিকে লক্ষ্যমাত্র না রাখিয়া সে অভাব, সে দুঃখ ঘুচাইতেন। এরূপ আদর্শ কখন বৃথায় যায় না, এ আত্মত্যাগ কখন নিষ্ফল হয় না।

গত অর্দ্ধোদয় যোগে যখনই যুবক, কিশোর এমন কি বালকবৃন্দকেও দিবা রাত্রি পরিশ্রম করিয়া অনাহারে, অনিদ্রায় প্রফুল্ল চিত্তে স্বদেশবাসীর সেবা করিতে দেখিয়াছি, তখনই আনন্দে শিহরিয়া উঠিয়া ভাবিয়াছি, এতদিনে বিদ্যাসাগরের আদর্শের ফল ফলিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে এতদিন দেশের মৃত দেহে সঞ্জীবনী শক্তির সঞ্চার হইয়াছে, আর ভূদেব বাবুর সেই সধর্ম্মী ও স্বদেশী প্রেম সম্বন্ধে অনুমানও বুঝি যাথার্থ্যে পরিণত হইতে চলিয়াছে!

বিদ্যাসাগর পরের সেবার জন্য অর্থ বা সময় কিছুরই মায়া করিতেন না। তিনি পীড়িত বন্ধুর সেবার বা মনোরঞ্জনের জন্য ছয় মাস কাল পর্য্যন্ত অনন্যমনা ও অনন্যকর্ম্মা হইয়া পীড়িতের সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন। কোন উন্মাদরোগ-গ্রস্তা বন্ধুপত্নীকে অন্য কেহ আহার করাইতে সক্ষম হইত না বলিয়া বিদ্যাসাগর দীর্ঘকাল তাহাকে স্বহস্তে আহার করাইয়া আসিতেন।

পরের দুঃখে তাঁহার হৃদয় সদাই কাঁদিয়া উঠিত, তাই বালবিধবার যে দুঃখ তিনি হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, তাহা মোচনের জন্য তিনি আপনার সমস্ত সুখ, শান্তি, স্বাস্থ্য ও অর্থ বিসর্জ্জন করিতে কুণ্ঠামাত্রও করেন নাই। কুলীন-কুমারীর ব্যথায় ব্যথিত হইয়াও বহুবিবাহ নিবারণের জন্য সেরূপ গুরুতর পরিশ্রম করিয়াছিলেন।

আকাশের তারকা, সমুদ্রের তরঙ্গ, মরুভূমির বালুকা বরং গণনা করা সম্ভব,

কিন্তু বিদ্যাসাগরের দানের সংখ্যা সাধ্যাতীত। তাঁর অধিকাংশ দানই গোপন ছিল, তবু ধর্ম্মের ঢাক আপনি বাজে! কোন দরিদ্র ব্রাহ্মণ কন্যাদায়-উদ্ধারের জন্য ঋণদায়ে বিব্রত হইয়াছিলেন, তাঁহার মহাজন কলিকাতা ছোট আদালতে নালিশ করিয়াছেন—সে দায় হইতে উদ্ধারের আর কোন উপায় নাই, কত কত বড় লোকের নিকট দুঃখের কাহিনী বলিয়া ব্রাহ্মণ সাহায্য চাহিয়াছেন কোন ফল হয় নাই, শেষ বিদ্যাসাগরের সহিত তার পথে দেখা, বিদ্যাসাগরকে তিনি চিনিতেন না, কথায় কথায় বিদ্যাসাগর ব্রাহ্মণের বিপদ শুনিলেন, তার পর তাঁকে কিছু না বলিয়া ছোট আদালতে সে টাকা জমা করিয়া দিয়া ব্রাহ্মণকে ঋণমুক্ত করিলেন, ব্রাহ্মণ পর্য্যন্ত জানিল না, তাঁহার উদ্ধার কর্ত্তা কে! এইরূপ দান এক আধটি নয় অসংখ্য। মাসে যে তিনি কত লোকের মাসহারা যোগাইতেন, তাহা তাঁহার উইল দেখিলে কতকটা অনুভূত হয়! ভিক্ষুকেরা ভিক্ষা করিতে আসিয়া যদি দাঁড়াইয়া থাকিত, তবে বিদ্যাসাগর মহাশয় ভৃত্যদের ধমকাইতেন, বলিতেন, দিবি ত এক মুঠা চাউল, তা আবার দেরী কেন, ওরা এই সময়ে আর দুই বাড়ীতে ভিক্ষা করিতে পারিবে।

এক ভিখারিণীকে বর্দ্ধমানে বিদ্যাসাগরের পুরাতন পাচক ভর্ৎসনা করায় তাহাকে কর্ম্ম হইতে অবসর দেন, পুরাতন ভৃত্য বলিয়া তাহার পেনসেনের ব্যবস্থা করিয়াও দিয়াছিলেন, তথাপি যে ভিখারীকে কটু কথা বলে, তাহাকে নিজের গৃহে রাখিতে বিদ্যাসাগর আর স্বীকৃত হইলেন না।

এক দিন কোন ধনীর বৈঠকখানায় গৃহস্বামীর সহিত বিদ্যাসাগর বসিয়া আছেন, এমন সময় এক ভিখারীর কাতর চীৎকার তাহার কর্ণে বার বার পশিতে লাগিল, তিনি স্থির থাকিতে না পারিয়া ধনীকে বলিলেন ও লোকটা চীৎকার করে কেন! ধনী মনে করিলেন বিদ্যাসাগর বুঝি ঐ চীৎকারে বিরক্ত হইতেছেন, সে জন্য দ্বারবানকে ডাকিয়া লোকটার ব্যবস্থা করিতে আদেশ দিলেন। ভিক্ষুক সে ধনবানের গৃহে ভিক্ষার জন্য গিয়াছে, ইহা নিশ্চয়ই বামনের চন্দ্রলাভের ন্যায় দুরাশা। কিন্তু তার এ দুরাশার অর্দ্ধেক ফল ফলিল অর্থাৎ চন্দ্রের পরিবর্ত্তে দ্বারবানের সুকোমল হস্তের অর্দ্ধচন্দ্র প্রাপ্ত হইয়া ভিক্ষুক কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিল। বিদ্যাসাগর ইহা বুঝিলেন, তাড়াতাড়ি সে বৈঠকখানা হইতে নামিয়া একটি টাকা এবং পাছে সে টাকাটি ভাঙ্গাইতে মায়া করিয়া না খাইয়া উপবাসী থাকে, তাই আর দুইটি পয়সা দিয়া বলিলেন বাপু, এ দুয়ারে আর কখনও আসিও না, শুনিয়াছি বিদ্যাসাগরও আর সে বাড়ীতে প্রবেশ করেন নাই।

বিদ্যাসাগর ধর্ম্মপ্রচার কেন করেন না বলিয়া কেহ কেহ তাঁহার নিকট আক্ষেপ করিতেন! বিদ্যাসাগর তাহাদিগকে বলিতেন বাপু ঐ কাজটি আমার দ্বারা হইবে না, পরের জন্য বেত খাওয়া আমার কর্ম্ম নয়। সে কিরূপ? না, যখন পরকালে ধর্ম্মের বিচার হইবে তখন হয় ত ঠিক ধর্ম্ম গ্রহণ

করি নাই বলিয়া এক প্রস্থ বেত খাইব, আবার যাহারা আমার প্রদর্শিত ধর্ম্ম পথে আসিবে, তাহাদিগকে কেন অধর্ম্ম পথে চালাইয়াছি বলিয়া তরফে তরফে প্রত্যহ বেত খাইতে হইবে ; তা বাপু অত বেত খাওয়ায় আমার কাজ নাই, এ পর্য্যন্ত ধর্ম্মের সূক্ষ্ম তত্ত্ব কেহ ঠিক আবিষ্কার করিতে পারেন নাই,—সে মীমাংসা আর সৃষ্টির প্রথম হইতে এ পর্য্যন্ত হইল না। সুতরাং না বুঝিয়া কি ধর্ম্ম প্রচার করিব—

বেদাঃ বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্নাঃ
নাসৌ মুনির্য্যস্য মতং ন ভিন্নং।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্থা ॥

কিন্তু বিদ্যাসাগর কি সত্যই কোন ধর্ম্ম প্রচার করেন নাই? কলির যাহা প্রধান ধর্ম্ম তিনি তাহাই প্রচার করিয়াছেন, শুনিয়াছি মনুসংহিতায় আছে—

তপঃ পরং কৃতযুগে ত্রেতায়াং জ্ঞানমুচ্যতে।
দ্বাপরে যজ্ঞমেবাহুর্দ্দানমেকং কলৌ যুগে।

সত্য যুগের প্রধান ধর্ম্ম তপস্যা, ত্রেতা যুগের প্রধান ধর্ম্ম জ্ঞান, দ্বাপর যুগের প্রধান ধর্ম্ম যজ্ঞ, কলি যুগের প্রধান ধর্ম্ম দান।

পরাশর সংহিতাতেও না কি ঐ কথা—

তপঃ পরং কৃতযুগে ত্রেতায়াং জ্ঞানমুচ্যতে।
দ্বাপরে যজ্ঞমেবাহুর্দ্দানমেব কলৌ যুগে!

এ যুগে বিদ্যাসাগরের মত দান কে করিয়াছে তাঁহার মত দাতা কে? সুতরাং বলিতে হইবে, কলিযুগে তিনিই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম-প্রচারক! কিন্তু তাঁহার দানের সীমা শাস্ত্রের ভবিষ্যৎবাণীও ছাড়াইয়া গিয়াছে।

অভিগম্য কৃতে দানং ত্রেতাস্বাহূয় দীয়তে।
দ্বাপরে যাচমানায় সেবয়া দীয়তে কলৌ।

সত্য যুগে পাত্রের নিকট গিয়া দান করিয়া আইসে, ত্রেতাযুগে পাত্রকে আহ্বান করিয়া আনিয়া দান করে, দ্বাপর যুগে নিকটে আসিয়া যাচ্ঞা করিলে দান করে, কলিযুগে আনুগত্য করিলে দান করে।

কিন্তু বিদ্যাসাগরের দান কলিকালেও সত্যযুগের ন্যায় ছিল!

বিদ্যাসাগর দানই করিয়াছেন, কিন্তু সংসারে প্রতিদান বড় পান নাই, অবশ্য প্রতিদানের আশায় তিনি দান করেন নাই, বিশেষত দানগ্রহণ তিনি ত করিতেনই না, এই মন্ত্র যেন তাঁর জীবনের জপ-মালা ছিল—

"যাচিতারশ্চনঃ সন্তু মাচ যাচিস্ম কঞ্চন।" "সহস্র সহস্র যাচক আমার নিকটে উপস্থিত হউক, আমি যেন কোন ব্যক্তিরও নিকট যাচ্ঞা না করি।" তিনি অর্থ কি উপকার ইহা পাইবার জন্য লালায়িত ছিলেন না, কিন্তু তিনি প্রীতির প্রার্থী ছিলেন! তিনি এক সময় তাঁহার পিতৃদেবকে লিখিয়াছিলেন, আমি এ সংসারে আসিয়া কাহাকেও সুখী করিতে পারিলাম না, আমার অবস্থা যেন, কথামালার অশ্ব ও বৃদ্ধ কৃষকের বৃদ্ধের মত। এই কয়টি সামান্য কথাতেই তাঁহার মনের বেদনা কতক অনুভব করা যায়। তাঁহার কনিষ্ঠ দৌহিত্র নিতান্ত শৈশব অবস্থায় কথা-প্রসঙ্গে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "দাদা মহাশয় আমি তোমায় বড় ভাল বাসি, কিন্তু তার চেয়ে বেশী ভাল বাসি, তোমার ঐ চক-চকে সিকি দুয়ানিকে।" বিদ্যাসাগর মহাশয় এ কথায় বড় সুখী হইয়া বলিয়াছিলেন "ঠিক

কথাই রে গুজি, আমা অপেক্ষা আমার চকচকে সিকি দুয়ানিকেই সবাই বেশী ভাল বাসে, তুই ছেলে মানুষ তাই সত্য কথা বল্লি! অন্যে চাপিয়া যায়।" এ কথাতেও তাঁহার হৃদয়ের ক্ষত ধরা পড়ে। স্বর্গগতা বালিকা প্রভাবতী সম্ভাষণেও তাঁহার হৃদয়ের ব্যথা বুঝিতে পারি। সংসারের স্বার্থপরতা, অকৃতজ্ঞতা, নীচতা দেখিয়া তিনি মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন! কেহ তাহার নিন্দা করিতেছে শুনিলে তিনি একটু বিষাদের হাসি হাসিয়া বলিতেন, দাঁড়াও, আগে দেখি, আমি তাহার (ঐ নিন্দুকের) কো'ন উপকার করিয়াছি কি না! হায়, তিনি যাহাদের প্রাণ দিয়া উপকার করিয়াছেন তাহারাই তাঁহার নিন্দুক, কি নিদারুণ অভিজ্ঞতা! বিদ্যাসাগরের দারুণ ক্রোধ ছিল সত্য, সে ক্রোধে সময় সময় প্রলয় বহিয়া যাইত, ক্রোধের বশে অনেক সময় তিনি ক্ষতিগ্রস্তও হইয়াছেন অনেক সৎকার্য্যও পণ্ড হইয়াছে, কিন্তু সে ক্রোধ সে জিদ না থাকিলে আবার অনেক শুভ কর্ম্মও হইত না। আমরা তাই বিদ্যাসাগরকে যেমন ভাল বাসি, তাঁর জিদ, তাঁর ক্রোধকেও তেমনই আদর করি। বিদ্যাসাগর একদিন তাঁর জ্যেষ্ঠ দৌহিত্র সুরেশচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করেন—তোরা সত্যই কি আমায় ভাল বাসিস? সুরেশ বাবু তখন ঠিক বালক নহেন, রঘুবংশ প্রভৃতি পাঠ করেন—সুরেশ বাবু উত্তর দিলেন সত্যই আপনাকে ভাল বাসি। বিদ্যাসাগর বলিলেন, আমি তোদের প্রতি এত তর্জ্জন গর্জ্জন করি, সময়ে সময়ে প্রহারও করি, তবু তোরা আমায় ভাল বাসিস্ এ কথা সত্য কেমন করিয়া বুঝিব। তখন সুরেশ বাবু রঘুবংশের সেই প্রসিদ্ধ শ্লোকটি উচ্চারণ করিলেন—

"অধৃষ্যশ্চাভিগম্যশ্চ
যাদোরত্নৈরিবার্ণবঃ।"

যে সাগরে মকর কুম্ভীর, সেই সাগরেই রত্ন নিহিত! রত্নাকরকে কে না ভালবাসে? আমরাও সুরেশ বাবুর মত বলি, রত্নাকরকে কে না ভালবাসে?

বিদ্যাসাগরের দয়া কেবল মনুষ্য মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না, তিনি কুকুর বিড়ালের জন্যও শোক করিতেন। একদিন গাভী দোহনের সময় তিনি গাভীর ও বৎসের ব্যাকুলতা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন! গাভীর সজল করুণ চক্ষে যে কথা প্রকাশ পাইতেছিল, তাহা তিনি যেন হৃদয় দিয়া পাঠ করিলেন; গাভী যেন বলিতেছিল—

"দারুণ পালক সেই, আমারি কুটীরে,
বাঁধিয়া রেখেছে, মোর শিশু বৎসটীরে।
আমি আছি তিন হাত মাত্র দূরে বাঁধা
দিবস যামিনী মোর সার শুধু কাঁদা।
ক্ষুধায় আকুল বাছা জিজ্ঞাসে না কেহ,
বাঁট ভরা দুধ মোর বুক ভরা স্নেহ।
সারা রাত্রি বাছা মোর মা মা বলে ডাকে
ক্ষুধায় দুর্ব্বল হ'য়ে ভূমে পড়ে থাকে!
দুজনায় দুজনের মুখ পানে চাই
বিফল রোদনে মোরা যামিনী পোহাই!
প্রত্যহ প্রভাতে পাই প্রভুর দর্শন,
সে দৃষ্টি এ প্রাণে করে অনল বর্ষণ!
দেখিলে দোহন পাত্র বাম হাতে কেঁড়ে
আসিয়া বাছারে দেয় একবার ছেড়ে।

ক্ষুধায় তৃষ্ণায় বৎস পাগল হইয়া
দুধ খেতে আসে মোর বাঁটে মুখ দিয়া।
দুটি মাত্র টান দিতে, সে পাষাণ প্রাণে
নাহি সহে, বাছায় বদন ধরে টানে।
তখনি, সরায়ে নিয়া ধ'রে রাখে কাছে,
তা' দেখে কি অভাগিনী মার প্রাণ বাঁচে।
সব দুধ টুকু মোর টানিয়া দোহায়
ভাবি হায়, কেন কাল যামিনী পোহায়!
কাছে দাঁড়াইয়া বাছা হায় হায় করে,
'মা মা' ব'লে ডাকে আর আঁখি দুটী ঝরে,
নিঠুর যখন দেখে দুধ নাই বাটে,
ছেড়ে দেয়, তারে, বাছা শুষ্ক বাট চাটে।
সব চলে যায় মোরা দুইজনে কাঁদি,
নীরবে সকলি সহি, বিধি প্রতিবাদী!
পূর্ব্ব জন্মে কার মাকে দিয়েছিনু ক্লেশ
তারই এ কঠোর শাস্তি, জেনেছি বিশেষ। *

এই দৃশ্য দেখিয়া, এই ভাব মনে অনুভব করিয়া তিনি দুগ্ধ ত্যাগ করিয়াছিলেন! বর্ত্তমানের গাভী-দোহনের ব্যাপার ত সকলেই জানি, সে দৃশ্যও অনেক সময় দেখি, কিন্তু কয় জনে, সে করুণ ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া দুগ্ধ ত্যাগ করিয়াছি? কেহ কেহ বলেন ঈশ্বরচন্দ্র ভগবৎভক্ত ছিলেন না, আমরা সে কথা মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহি, বরং আমরা বলি, তাহার ন্যায় ভগবৎ-প্রেমে প্রেমিক কয়জন? নিম্ন-উদ্ধৃত কবিতা আমাদের এ উক্তির পোষকতা করিবে।

"Abou Ben Adhem—may his
tribe increase!
Awoke one night from dream
of peace,
And saw, within the moonlight
in the room,
Making it rich, and like a lily
in bloom.
An angel writing in a book of
gold,
Exceeding peace had made Ben
Adhem bold,
And to the presence in the room
he said,
"What writest thou?" The
vision raised its head.
And, with a look made of all
sweet accord,
Answered, 'The names of those
who love the Lord,'
'And is mine one?' Said Abou.
'Nay, not so'
Replied the angel. Adhem spoke
more low.
But cheerly still, and said, 'I
pray thee,
Write me as one that loves his
fellow-men.'
The angel wrote, and vanished.
The next night
He came again, with a great
wakening light.
And showed their names whom
love of Godhas blessed,

* কবি শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত সেন মহাশয়ের অপ্রকাশিত কবিতা।

And, lo! Ben Adhem's name
led all the rest.

মানুষকে ভালবাসিলেই ভগবানকে ভাল বাসা হয়। সেই ভালবাসার স্বর্গীয় প্রবাহ বিদ্যাসাগর এ দেশে প্রবাহিত করিয়া গিয়াছেন।

ভগীরথ স্বর্গ হইতে জাহ্নবীকে মর্ত্ত্যে আনিয়া সগরকুল উদ্ধার করিয়াছিলেন, আর বিদ্যাসাগর করুণার জাহ্নবী বহাইয়া আমাদের দেশকে ধন্য করিয়াছেন! সেই জাহ্নবীর নির্ম্মল সুশীতল বারি ব্যবহারে সহস্র সহস্র লোক পরিতৃপ্ত হইয়াছিল, দেশ ধন্য হইয়াছিল, কিন্তু সে পুণ্যতোয়া জাহ্নবীও যেন ধরা পৃষ্ঠ হইতে আবার অন্তর্হিত হইতেছেন, ভাগীরথীর সে প্রবাহ, সে গভীরতা, সে তেজ আর নাই; নিদাঘের দারুণ তাপ সে স্নিগ্ধ সলিল শুষিয়া লইতেছে। দেশবাসী তৃষ্ণায় কাতর, কে আর স্বর্গ হইতে করুণার সে মন্দাকিনী মর্ত্ত্যে আনিয়া সুশীতল বারি বিতরণে তৃষিতের তৃষ্ণা নিবারণ করিবে?

শ্রীশৈলেশচন্দ্র মজুমদার।

গায়ত্রী-রহস্য।

পূর্ব্ব প্রস্তাবে দেখা গিয়াছে যে অসীম বৈচিত্র্যময় হিন্দুত্বের মূলসূত্র গায়ত্রী। প্রাচীন সুধীগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া গায়ত্রীর অর্থ চিন্তা করা কর্ত্তব্য। যোগী যাজ্ঞবল্ক্য তিনটী শ্লোকের দ্বারা গায়ত্রীর যে অর্থ করিয়াছেন, তাহা স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য ধৃত—যথা

"দেবস্য সবিতুর্ব্বর্চ্চো ভর্গমন্তর্গতং বিভুং।
ব্রহ্মবাদিন এবাহুর্ব্বরেণ্যং চাস্য ধীমহি॥
চিন্তয়ামোবয়ং ভর্গং ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু বুদ্ধিবৃত্তীঃ পুনঃ পুনঃ॥
বুদ্ধেশ্চোদয়িতা যস্তু চিদাত্মা পুরুষোবিরাট্।
বরেণ্যং বরণীয়ঞ্চ জন্মসংসারভীরুভিঃ॥

অর্থাৎ "সূর্য্যদেবের অন্তর্যামী সেই তেজস্বরূপ যাঁহাকে ব্রহ্মবাদীরা সর্ব্বব্যাপী, সকলের প্রার্থনীয় পরমাত্মা কহেন সেই প্রার্থনীয়কে আমরা আমাদের অন্তর্যামিরূপে চিন্তা করি; যিনি আমাদের বুদ্ধিকে ধর্ম্ম অর্থ কাম-মোক্ষের প্রতি পুনঃপুনঃ প্রেরণ করিতেছেন, যিনি চিৎস্বরূপে বুদ্ধির প্রেরক হইয়া সম্পূর্ণ জগতে ব্যাপক হন, আর যিনি জন্ম-মরণাদি সংসার হইতে যাঁহারা ভয়যুক্ত তাঁহাদের প্রার্থনীয় হন।" (রামমোহন রায়ের অনুবাদ)

প্রাচীন ভট্ট গুণবিষ্ণু গায়ত্রীর অর্থের উপসংহারে এইরূপ নিষ্পন্নার্থ করিয়াছেন, যথা—

"যস্তথাভূতো ভর্গোঽস্মান্ প্রেরয়তি স জলজ্যোতীরসামৃত ভূরাদিলোকত্রয়াত্মক সকলচরাচরস্বরূপ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর সূর্য্যাদি নানা দেবতাময় পরব্রহ্ম স্বরূপো ভূরাদি সপ্তলোকান্ প্রদীপবৎ প্রকাশয়ন্ মদীয় জীবাত্মানং জ্যোতিরূপং সত্যাখ্যং সপ্তমং ব্রহ্মলোকং ব্রহ্মস্থানং নীত্বা আত্মন্যেব ব্রহ্মণি ব্রহ্মজ্যোতিষা সহৈকভাবং করোতীতি

চিন্তয়ন্ জপং কুর্য্যাৎ।" অর্থাৎ, "যে এপ্রকার সর্ব্বব্যাপী ভর্গ আমাদের অন্তর্যামী হইয়া প্রেরণ করিতেছেন, তেঁহ জল জ্যোতিঃ রস অমৃত এবং ভূরাদি লোকত্রয় এবং সকল চরাচরময় আর ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর সূর্য্যাদি নানা দেবতাময় হন সেই বিশ্বব্যাপী পর-ব্রহ্ম তেঁহ ভূঃ প্রভৃতি সপ্তলোককে প্রদীপের ন্যায় প্রকাশ করেন তেঁহ আমাদের জীবাত্মাকে জ্যোতির্ম্ময় সত্যাখ্য সর্ব্বোপরি ব্রহ্মলোককে প্রাপ্ত করিয়া পরব্রহ্মস্বরূপ আপনাতে আপন চিদ্রূপের সহিত এক ভাবে প্রাপ্ত করেন এইরূপ চিন্তা করিয়া গায়ত্রী জপ করিবেক।" (রামমোহন রায়ের অনুবাদ)

রাজা রামমোহন রায় মহাশয় ইহার অর্থ করিয়াছেন। যথা—

"তত্রাদৌ "ওঁ" ইতি জগতাং স্থিতি-লয়োৎপত্ত্যেককারণং ব্রহ্ম নির্দ্দিশতি। "যতোবা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্ম" ইতি শ্রুতিঃ।

তদোঙ্কার প্রতিপাদ্য কারণং কিমেভ্যঃ কার্য্যেভ্যো বিভিন্নং তিষ্ঠতীত্যাশঙ্কায়ামনন্তরং পঠতি। "ভূর্ভুবঃ স্বঃ" ইতি দ্বিতীয় মন্ত্রং। ইদং লোকত্রয়ব্যাপ্যৈব তৎ কারণ-রূপং ব্রহ্ম নিত্যমবতিষ্ঠতে "দিব্যোহ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ সবাহ্যাভ্যন্তরোহ্যজঃ" ইতি শ্রুতিঃ। কিং তর্হি তস্মাৎ কারণাৎ জগদন্তঃস্থিতানি স্থূলসূক্ষ্মাত্মকানি ভূতানি স্বাতন্ত্র্যেন নির্বহন্তি নবেতি সংশয়ে পুনঃ পঠতি "তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধীয়ো য়োনঃ প্রচোদয়াৎ" ইতি তৃতীয় মন্ত্রং। দীপ্তিমতঃ সূর্য্যস্য তদনির্ব্বচনীয়মন্তর্য্যামি জ্যোতিরূপং বিশেষণ প্রার্থনীয়ং ন কেবলং সূর্য্যান্তর্যামী কিন্তু যোঽসৌ ভর্গঃ অস্মাকং সর্ব্বেষাং শরীরিণামন্তঃস্থোঽন্তর্যামী সন্ বুদ্ধি-বৃত্তীর্বিষয়েষু প্রেরয়তি "য আদিত্যমন্তরো যময়তি এষ ত আত্মা অন্তর্য্যাম্যমৃতঃ" ইতি শ্রুতিঃ। ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি" ইতি গীতাস্মৃতিশ্চ।

ত্রয়াণাং মন্ত্রাণামভিধেয়স্যৈকত্বাদেকত্র জপো বিধীয়তে।

ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ।

তেষাময়ং সংক্ষেপার্থঃ।

সর্ব্বেষাং কারণং সর্ব্বত্রব্যাপিনং অসূর্য্য-দস্মদাদি সর্ব্বশরীরিণামন্তর্য্যামিনং চিন্তয়ামঃ ইতি।

অর্থাৎ তাহাতে আদৌ "ওঁ" এই শব্দ জগতের স্থিতি লয় উৎপত্তির কারণ পর-ব্রহ্মকে নির্দ্দেশ করিতেছেন। "যাহা হইতে এই সকল ভূত জন্মিতেছে আর জন্মিয়া যাহার দ্বারা স্থিতি করিতেছে, ম্রিয়মাণ হইয়া যাহাতে পুনর্গমন করে তাহাকে জানিতে ইচ্ছা করে তেঁহ ব্রহ্ম হন" এই শ্রুতি।

সেই ওঁঙ্কারের প্রতিপাদ্য যে কারণ তিনি কি এই সকল কার্য্য হইতে বিভিন্নরূপে স্থিতি করেন এই আশঙ্কায় পুনরায় পাঠ করিতেছেন "ভূর্ভুবঃ স্বঃ" এই তিন ব্যাহৃতি যাহা দ্বিতীয় মন্ত্র হয়। অর্থাৎ সেই কারণরূপ পরব্রহ্ম এই ত্রিলোক বিশ্বকে ব্যাপিয়া রহিয়াছেন। "জ্যোতিরূপ মূর্ত্তি-রহিত অর্থাৎ স্বপ্রকাশ এবং সম্পূর্ণ ও

অন্তরবাহ্যে ব্যাপিয়া বর্ত্তমান এবং জন্মরহিত পরমাত্মা হন'' এই শ্রুতি।

জগতের অন্তঃপাতী স্থূলসূক্ষ্মভূত সকল সেই কারণ হইতে স্বতন্ত্ররূপে আপন আপন কার্য্য নির্ব্বাহ করেন কি না' এই সংশয়ে পুনরায় পাঠ করিতেছেন ''তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ" এই তৃতীয় মন্ত্র অর্থাৎ দীপ্তিমন্ত সূর্য্যের সেই অনির্ব্বচনীয় অন্তর্য্যামী জ্যোতিস্বরূপ বিশেষমতে প্রার্থনীয় তাঁহাকে আমরা চিন্তা করি, তিনি কেবল সূর্য্যের অন্তর্য্যামী হন এমত নহে, কিন্তু যে সেই স্বপ্রকাশ আমাদের সর্ব্বদেহীর অন্তস্থিত অন্তর্য্যামী বুদ্ধির বৃত্তিকে বিষয়ে প্রেরণ করিতেছেন; যিনি সূর্য্যের অন্তর্ব্বর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে নিয়মে রাখিতেছেন সেই অবিনাশী তোমার অন্তর্য্যামী আত্মা হন অর্থাৎ অন্তঃস্থিত হইয়া তোমাকে নিয়মে রাখিতেছেন" এই শ্রুতি। ভগবদ্গীতা। "সকল ভূতের হৃদয়ে হে অর্জ্জুন ঈশ্বর অবস্থিতি করেন।"

এই তিন মন্ত্রের প্রতিপাদ্য এক পরব্রহ্ম হন এ কারণ তিনের একত্র জপের বিধি দিয়াছেন।

সেই তিনের সংক্ষেপার্থ এই—সকলের কারণ সর্ব্বত্রব্যাপী সূর্য্য অবধি করিয়া আমাদের সকল দেহবন্তের অন্তর্য্যামী তাঁহাকে চিন্তা করি ইতি। (রামমোহন রায়ের বাঙ্গালা গ্রন্থাবলী ৩৯৯ পৃঃ)

পূজ্যপাদ পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামী গায়ত্রীর আদ্যন্তে উচ্চারিত প্রণবের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন

''বেদশাস্ত্রে ওঁকারের রূপ "ওঁ" এই প্রকার দেখাইবার অর্থ কি? নিরাকার ব্রহ্মের রূপ নাই, বেদে নিরাকার ওঁকারের রূপ বর্ণনা করিবার প্রয়োজন নাই। যখন নিরাকার ব্রহ্ম সাকার জগৎরূপে অর্থাৎ বিরাট নানা নামরূপে বিস্তার হন, তখন শাস্ত্রে তাঁহার নাম ওঁকার বলিয়া ঋষি, মুনিগণ কল্পনা করেন। অ, উ, ম অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, এই তিন অক্ষর যোগে ওঁকার অক্ষর হইয়াছে অর্থাৎ সমস্ত চরাচর স্ত্রীপুরুষকে লইয়া বিরাট ব্রহ্মের নাম ওঁকার। সেই ওঁকার ব্রহ্মের উপরে যে বিন্দু লিখিত আছে ইহার অর্থ এই যে, জীবসমূহের মস্তকের ভিতরে ও বহিরাকাশে জ্ঞানরূপ জ্যোতি আছেন অর্থাৎ তেজোরূপ সূর্য্যনারায়ণ ঐ বিন্দু। অর্দ্ধমাত্রা চন্দ্রমা জ্যোতিঃ, যিনি জীবমাত্রের কণ্ঠভাগে বিরাজ করিতেছেন। চন্দ্রবিন্দু অর্থে প্রকৃতি-পুরুষ যুগলরূপ। সমস্ত লইয়া বিরাটরূপ জানিবে। (সার নিত্যক্রিয়া, ৮ম সং ১২৭ পৃঃ)

পূজ্যপাদ সমগ্র ব্রহ্ম গায়ত্রীর যে অর্থ করিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

ওঁ "ভূর্ভুবস্বঃ" কি না, ভূর্লোক, অন্তরীক্ষলোক, স্বর্লোক। ভূর্লোক পৃথিবীকে বলে, অন্তরীক্ষ লোক মধ্যস্থানকে বলে, স্বর্লোক আকাশ বা স্বর্গকে বলে, কিন্তু ইহার সার অর্থ ভূর্লোক নাভীতে জঠরাগ্নিরূপ জ্যোতিঃ, অন্তরীক্ষলোক হৃদয়ে প্রাণস্বরূপ চন্দ্রমা জ্যোতিঃ; স্বর্লোক মস্তকে জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য্যনারায়ণ। এই তিন লোকের তিন রূপ। ইহার নাম ব্যাহৃতি।

এই তিন লোকের জ্যোতিকে প্রেম ও ভক্তি সহকারে এক অখণ্ডাকার পূর্ণ রূপে ধ্যান করিলে পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ জীবাত্মার সহিত অভিন্নরূপে ভাসিবেন, আর কোন বিষয়ে ভ্রম থাকিবে না। "তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য",তৎ অর্থে ঈশ্বর 'সবিতুর্বরেণ্যং' কি না জগত প্রসবিতার অর্থাৎ সৃষ্টিকর্ত্তা সূর্য্যনারায়ণের পূজনীয়। 'ভর্গো দেবস্য' অর্থাৎ সূর্য্যনারায়ণের তেজঃ—তিনিই দেবতা। "ধীমহি ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ," ঈশ্বর অর্থাৎ সূর্য্যনারায়ণ অন্তর হইতে বুদ্ধি প্রেরণ করেন। প্রত্যেক নরনারী ভক্তিপূর্ব্বক চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতির সম্মুখে করপুটে প্রার্থনা করিবেন যে, হে ভর্গ-দেবস্য, হে দেবজ্যোতিঃ স্বরূপ জগন্মাতা জগৎপিতা জগৎগুরু জগদাত্মা, আমার বুদ্ধিকে অন্তর হইতে প্রেরণ করিয়া সত্য তত্ত্বে সংযুক্ত করুন—যাহাতে ব্যবহারিক ও পরমার্থিক কার্য্য আমি উত্তমরূপে বুঝিয়া নিষ্পন্ন করিতে পারি, যাহাতে জ্ঞান পাইয়া সপরিবারে মুক্তিস্বরূপ পরমানন্দে আনন্দ-রূপে থাকিতে পারি। 'ওঁ আপঃ জ্যোতিঃ রসোঽমৃতং ব্রহ্ম" ওঁকার ব্রহ্ম, আপঃ অর্থে জল, রস ও জ্যোতি অর্থে জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ অমৃতরূপ অখণ্ডাকার পূর্ণরূপে বিরাজমান আছেন। নিরাকার সাকার পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপকে শ্রদ্ধা ভক্তি পূর্ব্বক মনুষ্যগণের উপাসনা করা উচিত। তাহা হইলে সকল মঙ্গল হইবে। নিরাকার পরমাত্মা অন্তর্য্যামী দৃষ্ট হন না, মনোবাণীর অতীত ও ইন্দ্রিয়ের অগোচর এবং তিনি নিরাকার সাকার বিরাট প্রত্যক্ষ জ্যোতিঃ স্বরূপে বিরাজমান আছেন। এই জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ পরমাত্মাকে প্রাতে, সায়ংকালে, শ্রদ্ধা ভক্তি পূর্ব্বক প্রত্যেক নরনারী প্রণাম করিবে ও আপনার পরমাত্মার এবং ওঁকার মন্ত্রের একই রূপ জানিয়া এই চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ তেজোময়কে নেত্রে ও মস্তকে ধারণ করিবে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে এক অক্ষর ওঁকার প্রণবের মূল পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ। অধিক মন্ত্রের আড়ম্বরে সময় নষ্ট করিবার প্রয়োজন নাই। ইহাতেই সহজে কার্য্য উদ্ধার হইবে।" (ঐ)

এখন বিচারের বিষয় একটী রহিল। ভট্ট গুণবিষ্ণু যে দেবতাময় বলিয়া গায়ত্রীকে উল্লেখ করিয়াছেন সে দেবতা কি, বা কে? ও ব্রহ্মগায়ত্রীর সপ্ত ব্যাহৃতিকে যে সপ্তলোক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন সে সপ্ত লোক কি? সন্ধ্যাহ্নিকে ত্রিসন্ধ্যায় যে ধ্যান কথিত হইয়াছে তাহাতে উল্লিখিত দেবতার রহস্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে। নিজ দেহের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যথাক্রমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের এবং ত্রিসন্ধ্যায় তদনুযায়ী আকাশস্থ সূর্য্যমণ্ডলে তত্তৎ দেবতার শক্তির বা প্রকৃতির ধ্যানের বিধি দৃষ্ট হয়।

প্রাতে নিজ নাভিদেশে ব্রহ্মার ধ্যান।

"ওঁ রক্তবর্ণং চতুর্মুখং দ্বিভুজং অক্ষসূত্র-কমণ্ডলুকরং হংসাসনসমারূঢ়ং ব্রহ্মাণং নাভিদেশে ধ্যায়েৎ॥" এবং রবিমণ্ডলে ব্রহ্মাণী মহাশক্তির ধ্যান।

'ওঁ প্রাতর্গায়ত্রী রবিমণ্ডলমধ্যস্থা রক্ত-বর্ণা দ্বিভুজা, অক্ষসূত্রকমণ্ডলুকরা হংসাসনা-রূঢ়া ব্রাহ্মী ব্রহ্মদৈবত্যা কুমারী ঋগ্বেদোদাহৃতা ধ্যেয়া।"

মধ্যাহ্নে হৃদয়ে বিষ্ণুর ধ্যান।

"ওঁ নালোৎপলদলপ্রভং চতুর্ভুজং শঙ্খ-চক্রগদাপদ্মহস্তং গরুড়াসনারূঢ়ং হৃদি কেশবং ধ্যায়েৎ।"

রবিমণ্ডলে বৈষ্ণবী শক্তির ধ্যান।

"ওঁ মধ্যাহ্নে সাবিত্রী রবিমণ্ডলমধ্যস্থা কৃষ্ণবর্ণা চতুর্ভুজা ত্রিনেত্রা শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মহস্তা যুবতী গরুড়ারূঢ়া বৈষ্ণবী বিষ্ণু দৈবত্যা যজুর্ব্বেদোদাহৃতা ধ্যেয়া।"

সায়ংকালে ললাটে মহেশ্বরের ধ্যান।

"ওঁ শ্বেতং দ্বিভুজং ত্রিশূলডমরুকরমর্দ্ধ-চন্দ্রবিভূষিতং ত্রিনেত্রং বৃষভস্থং ললাটে শম্ভুং ধ্যায়েৎ।" এবং সূর্য্যমণ্ডলে রুদ্রানার বা রুদ্রশক্তির ধ্যান।

"ওঁ সায়াহ্নে সরস্বতী রবিমণ্ডলমধ্যস্থা শুক্লবর্ণা দ্বিভুজা ত্রিশূলডমরুকরা বৃষভাসনা-রূঢ়া রুদ্রানী রুদ্রদৈবত্যা সামবেদোদাহৃতা ধ্যেয়া।"

এই ধ্যানবিধির আলোচনায় ইহাই প্রাপ্ত হওয়া যায় যে, ক্ষুদ্র জীবদেহের সহিত বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের ও ক্ষুদ্র জীব-চৈতন্যের সহিত অসীম ব্রহ্ম চৈতন্যের মিলন সাধনই ইহার উদ্দেশ্য। দেহে সন্তানোৎপাদন, শ্বাসচালন ও সমুদায় বাহ্য ক্রিয়ার শান্তি এই তিন ভাবের বিভেদ অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে দেহগত জীব-চেতনার ভিন্ন ভিন্ন নামকরণ হইয়াছে। এবং ঐ সমস্ত ক্রিয়ার পরম্পরা ক্রমে যাহা মূলশক্তি, যাহার দ্বারা নিখিল ব্যবহার ও পরমার্থ সিদ্ধ হইতেছে, সেই শক্তিকে পূজ্যপাদ পরমহংস মহাশয় আকাশস্থ সৌরজ্যোতিরূপে নির্দ্ধারিত করিয়াছেন।

"জীবশরীরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন দেবতার কল্পনায় ধারণ করিবার যে কথা আছে, ইহার সার মর্ম্ম এক সত্য ওঁকার বিরাট পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য নারায়ণ জীবসমূহের মস্তকে প্রকাশ বা বিরাজমান, এই জন্য ইহাকে ব্রহ্মা বলে। ইনি ললাটে আছেন এই কারণ ইহাঁর নাম শিব বা জীব, ইনি জীবসমূহের হৃদয়ে আছেন এ কারণ ইহাঁকে বিষ্ণু বলে।" (ঐ ১১১ পৃঃ)

"আদিত্যান্তর্গতং যচ্চ জ্যোতিষাং জ্যোতি-রুত্তমং।
হৃদয়ে সর্ব্বজন্তুনাং জীবভূতঃ স তিষ্ঠতি॥
হৃদ্যাকাশে চ যো জীবঃ সাধকৈরুপবর্ণ্যতে।
স এবাদিত্যরূপেণ বহির্নভসিরাজতে॥
পাষাণমণি ধাতুনাং তেজোরূপেণ সংস্থিতঃ।
বৃক্ষৌষধিতৃণানাঞ্চ রসরূপেণ তিষ্ঠতি।"

যোগী যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

"সূর্য্যমণ্ডলের অন্তর্গত যে জ্যোতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ জ্যোতিঃ তিনিই প্রাণী সকলের অন্তরে জীবরূপে অবস্থিতি করেন। যিনি সাধকগণ কর্ত্তৃক শাস্ত্রানুসারে অন্তরাকাশে জীব বলিয়া বর্ণিত হয়েন, তিনিই বহিরাকাশে সূর্য্য-নারায়ণ রূপে বিরাজমান; প্রস্তর, মণি ও ধাতুর মধ্যে তিনিই তেজোরূপে এবং বৃক্ষ, ওষধি ও তৃণের মধ্যে রসরূপে রহিয়াছেন।" (ঐ ১১০)

সপ্ত লোক সম্বন্ধে প্রথমত স্মরণ রাখিতে হইবে যে ইহাই ব্রহ্ম-গায়ত্রীর মহা-ব্যাহৃতি। ইহার অর্থ পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ বা তারাগণ, চন্দ্রমা ও সূর্য্য-নারায়ণ। (ঐ ১২৯ পৃঃ)

এই সপ্তকেই দেহস্থ ষটচক্র ও তাহার সমাপ্তি সহস্রার। দেহের সর্ব্ব নিম্নস্থানে

স্থূলতম পৃথিবীতত্ত্ব ও সর্ব্বোর্দ্ধে বিশুদ্ধ চৈতন্য-তত্ত্ব, ইহার মধ্যে সূক্ষ্মতার তারতম্য অনুসারে চক্রনামা অন্যান্য তত্ত্ব সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। (ঐ ১৩৩ পৃঃ)

মহীং মূলাধারে কমপি মণিপুরে হুতবহং
স্থিতং স্বাধিষ্ঠানে হৃদিমরুতামাকাশমুপরি।
মনোপি ভ্রূমধ্যে সকলমপি ভিত্বা কুলপথং
সহস্রসারে পদ্মে সহ রহসি পত্যা বিহরসি॥

ধ্যানের জন্য যে পরমাত্মার রূপকল্পনা তাহার পূজ্যপাদ কৃত রূপক-ভেদ স্থানাভাবে সংগৃহীত হইল না। পূর্ব্ব সংগৃহীত বাক্যে লেখকের মনের ছায়াপাত যত্নে নিবারিত হইয়াছে। আজ্ঞাচক্র যে মনের স্থান ও সহস্রসারে যে বিশুদ্ধ একীভূত শক্তি ও চৈতন্যের স্থান, ইহা প্রাচ্য বিজ্ঞানে আবিষ্কৃত হইয়াছে কি না, তাহা এ ক্ষেত্রে বিচার্য্য নহে।

শ্রীমোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়।

পাষাণী

কবিবর শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তাঁহার রচিত 'পাষাণী' নাটিকার উপাখ্যান-ভাগ মহাকবি বাল্মীকি রচিত অহল্যার উপাখ্যান হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। রামায়ণ ও মহাভারত আমাদের জাতীয় সাহিত্যে চির গৌরবের সামগ্রী। শুধু গৌরবের নহে, পূজার্হ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। রামায়ণ-রচয়িতা মহাকবি বাল্মীকি শুধু কবি নহেন, তিনি মহর্ষি। সাধনা বলে যাঁহারা সত্যকে প্রত্যক্ষরূপে উপলব্ধি করিয়াছেন, হিন্দু শাস্ত্রানুসারে তাঁহারাই মহর্ষি পদবাচ্য হন। মহর্ষি বাল্মীকি সাধনা বলে রত্নাকর দস্যু হইতে মহর্ষি বাল্মীকি হইয়াছিলেন, মহাকাব্য রামায়ণ তাঁহারই সাধনালব্ধ সিদ্ধির অমৃত-মধুর ফল।

অহল্যার উপাখ্যানের সহিত রামায়ণের আখ্যায়িকা-ভাগের বিশেষ কোন সম্বন্ধ না থাকিলেও প্রসঙ্গত এই উপাখ্যানটী কথিত হইয়াছে। সংক্ষেপে উপাখ্যানটী এইরূপ; রাম যখন মহর্ষি বিশ্বামিত্রের সঙ্গে মিথিলায় যাইতেছিলেন, তখন মিথিলার উপবনে একটী জনশূন্য আশ্রম দেখিতে পাইয়া সেটি কোন্ মুনির পরিত্যক্ত আশ্রম তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। বিশ্বামিত্র রামের প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন "বৎস, এই দিব্য আশ্রমটী মহাত্মা গৌতমের পুরাশ্রম। মহর্ষি গৌতম নিজ পত্নী অহল্যার সঙ্গে এই স্থানে তপানুষ্ঠান করিতেন। এইরূপ বহু বৎসর গত হইলে একদিন রূপমুগ্ধ সুরপতি ইন্দ্র গৌতমের অনুপস্থিতির সময়ে গৌতমের বেশ ধারণ করিয়া অহল্যার নিকট গমন করিলেন। গৌতম আশ্রমে প্রত্যাগত হইয়াই এই ঘটনা জানিতে পারিয়া ইন্দ্রকে অভিশপ্ত করিলেন, এবং অহল্যাকেও এই অভিশাপ দিলেন, 'তুমি এই আশ্রমে ভস্মশায়িনী ও সমস্ত প্রাণীর অদৃশ্যা হইয়া বায়ুমাত্র ভক্ষণ করিয়া বহু বৎসর আপনার কৃত দুষ্কার্য্যের জন্য অনুতপ্তচিত্তে তপস্যা করিবে। পরে

যখন মহারাজ দশরথের পুত্র রাম এই বনে আগমন করিবেন, তখন তুমি তাঁহার দর্শনে পবিত্রা হইয়া পূর্ব্বশরীর প্রাপ্ত হইবে।' এই অভিশাপ প্রদান করিয়া গৌতম তপস্যা করিবার জন্য হিমালয়ে প্রস্থান করিলেন, তদবধি এই মনোরম আশ্রম জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া পরিত্যক্ত অবস্থায় পতিত আছে।" বিশ্বামিত্র রামের নিকট অহল্যার কাহিনী এইরূপ বিবৃত করিয়া তাঁহাকে গৌতমাশ্রমে প্রবেশ করিতে বলিলেন। রাম গৌতমের আশ্রমে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন ভাগ্যবতী অহল্যা তপঃপ্রভাবে এরূপ প্রভাসম্পন্না হইয়াছেন যে দেবতারাও তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হ'ন না। তিনি স্বামীর বাক্যানুসারে রামের আগমন কাল পর্য্যন্ত ধূম পরিব্যাপ্ত অগ্নিশিখার ন্যায়, তুষারাবৃত মেঘাচ্ছন্ন পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় ও নিবিড় জলদ-জালাবৃত প্রদীপ্ত সূর্য্যকিরণের ন্যায় ত্রি-জগতের দুর্নিরীক্ষ্যা হইয়াছিলেন। এখন রাম সন্দর্শনে বিগতপাপা হইয়া সকলেরই দৃষ্টিপথে আবির্ভূতা হইলেন।

গৌতমও তপোবলে সমস্ত বিষয় জানিয়া আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়া ধৌত-কলুষা স্বীয় পত্নীকে গ্রহণ করিয়া সস্ত্রীক হইয়া রামলক্ষ্মণের পূজা করিলেন।

উচ্চশ্রেণীর কবি মাত্রেই মহান্ উদ্দেশ্য লইয়া গ্রন্থ রচনা করেন। রামায়ণে বর্ণিত এই অহল্যার উপাখ্যানের উদ্দেশ্য কি তাহা লইয়া বিচার করিবার পূর্ব্বে আমরা সাহিত্য সম্বন্ধে গুটীকতক কথা বুঝিতে চেষ্টা করিব। সাহিত্যকে আমরা দুই ভাবে দেখিতে পারি, প্রথমত সমস্ত পৃথিবীর সাহিত্যের ভাবে, দ্বিতীয়ত জাতীয় সাহিত্যের ভাবে। পৃথিবীতে নানা দেশে, নানা যুগে অনেক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া পৃথিবীর কল্যাণদায়িনী মহাবাণী সকল প্রচার করেন। মহাপুরুষের মুখনির্গত সেই সকল বাক্যই পৃথিবীতে ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে, আর সেই ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোকে পথ দেখিয়া মানব আপনার গন্তব্য পথে চলে। জগতে যত প্রকার ধর্ম্মশাস্ত্র আছে মূলত সকলের একই শিক্ষা হইলেও দেশভেদে, যুগভেদে, এবং যে সকল মহাপুরুষ ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন তাঁহাদেরও প্রকৃতিভেদে নানা ধর্ম্মকে সময় সময় পরস্পরের বিরোধী বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু ঈশ্বর আর এক প্রকারে অবিরোধী ধর্ম্ম শিক্ষা দিতেছেন, সে শিক্ষা প্রকৃতির শিক্ষা। 'প্রকৃতি' নামক তাঁহার স্বরচিত বিশাল গ্রন্থের প্রতি পত্রে বাহ্যপ্রকৃতি, জীবপ্রকৃতি ও মানব-প্রকৃতির বিচিত্রভাবে নানা বাধা প্রতিরোধ ও উত্থান-পতনের ভিতর দিয়া ক্রমবিকাশের ইতিহাসে তিনি প্রকৃত সত্য ও কল্যাণের পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছেন। বিশাল বিশ্বপ্রকৃতির বিচিত্রতার মধ্য দিয়া যে মহান্ সত্য আপনাকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত করিতেছেন, সে সত্য সকল দেশে, সকল কালে, সকলের পক্ষেই সমান সত্য। সে সত্য সমগ্র মানবজাতির সনাতন সত্য। কিন্তু অধিকারভেদে এই সত্য হৃদয়ঙ্গম করা সকলের পক্ষে সমান সহজ নহে। অক্ষরজ্ঞানহীন মূর্খ যেমন সজ্জিত অক্ষর-মালা কেবল 'হিজি-

বিজ্ঞি' বলিয়া মনে করে. সেইরূপ আমাদের ধারণা-শক্তির অল্পতাবশত প্রকৃতির এই বিচিত্র ভাবগুলি অনেক সময় আমাদের নিকট নিতান্ত দুর্ব্বোধ বলিয়া মনে হয়। কিন্তু একদিকে যেমন দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকগণ বিশ্বপ্রকৃতিকে নানাভাবে বিশ্লেষণ করিয়া তাহার অভ্যন্তরে যে গূঢ় ও বিশ্বজনীন সত্য আছে, তাহাই আবিষ্কার করিয়া তাহার উপরে বিজ্ঞান ও দর্শনশাস্ত্রের ভিত্তি স্থাপন করিতেছেন, আবার অপর দিকে সেইরূপ তত্ত্বদর্শী মনীষীগণ তাঁহাদের সূক্ষ্মদৃষ্টি দ্বারা প্রকৃতি-গ্রন্থে ভগবানের অভিপ্রায় পাঠ করিয়া তাহাকে সাধারণ মানবের সহজবোধ্য করিবার জন্য নানা বর্ণে রঞ্জিত তুলিকার দ্বারা চিত্রাঙ্কনী প্রতিভায় আমাদের মনের সম্মুখে সে গুলি পরিস্ফুট করিয়া তুলিতেছেন। কবি প্রকৃতি-কাব্যের যে বিচিত্র ঝঙ্কার অন্তরের ভিতর শুনিতে পাইতেছেন, তাহারই সহিত আপনার হৃদয়-বীণা মিলাইয়া জগৎবাসীর শ্রবণে অপূর্ব্ব সঙ্গীত-লহরী ঢালিয়া দিতেছেন। ইহাই বিশ্বসাহিত্য। বিশ্বপ্রকৃতির বিচিত্রতার ভিতর দিয়া যে সত্য আত্মপ্রকাশ করিতেছেন, সেই সত্যই বিশ্বসাহিত্যের প্রাণ। যে সাহিত্যের প্রাণ আছে, সেই সাহিত্যই চিরদিন অমর হইয়া রহিয়াছে, প্রাণহীন সাহিত্য বুদ্বুদের মত আজ জন্ম গ্রহণ করিয়া কাল কালসমুদ্রের ভিতর কোথায় মিলাইয়া যায়, তাহার কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না।

জাতীয়সাহিত্য বিশ্বসাহিত্যের ক্রোড়েই জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, বিশ্বকাব্যের বীণার সহিতই তাহার জীবন-বীণার তার বাঁধা। তবে, তাহার সুরে আরও একটু বিশেষত্ব আছে, সেটী জাতীয় বিশেষত্ব। সেই বিশেষত্বের ভিত্তির উপরেই জাতীয়ত্বের প্রতিষ্ঠা, সেই বিশেষত্বের গণ্ডি দিয়াই সকল জাতি তাহাদের জাতীয় সাহিত্যকে তাহাদের নিজস্ব করিয়া লয়। সেই জন্যই জাতীয় সাহিত্য আমাদের অধিক প্রিয়তর। জাতীয়-সাহিত্য জাতীয়জীবনের ইতিহাস, আশ্রয় ও জনক। তখন যে জাতি প্রধানত যে ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছে তাহাদের সাহিত্যেও সেই ভাবের চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে। সেই সমস্ত গত কালের জাতীয় জীবনের ইতিহাস সাহিত্যের পৃষ্ঠায় পাঠ করিয়া আমরা যুগবিভাগ নির্ণয় করি। ভারতবর্ষের সাহিত্যে বৈদিক যুগ হইতে একাল পর্য্যন্ত স্তরে স্তরে বহুতর যুগপরিবর্ত্তনের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। কত জ্ঞাত ও অজ্ঞাত সাহিত্য শ্রেণীবদ্ধ এবং বিক্ষিপ্ত ভাবে আদিকাল হইতে জাতীয় জীবনের ইতিহাস রক্ষা করিয়া আসিতেছে, সেই ইতিহাস জাতির পূর্ব্বপিতৃগণের সহিত পরবর্ত্তীগণের চরিত্রগত যে নিগূঢ় সম্বন্ধ তাহাই সচেতন করিয়া রাখিয়াছে। জাতীয়-সাহিত্য কেবল জাতীয় জীবনের ইতিহাস মাত্র নহে, সে জাতীয়-জীবনের আশ্রয় ও জনক। যখনই কোন জাতি, যে কোন ভাবে, ধর্ম্মে অথবা কর্ম্মে, উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে, সাহিত্যই তখন তাহাদিগের মন্ত্রদাতা গুরু ও আশ্রয় হইয়াছে, এবং যখন কোন জাতি জড়তার নিদ্রালস্য পরিত্যাগ করিয়া নবজীবনের পথে অগ্রসর

হইয়াছে তখন সাহিত্যকেই সেই নব-জীবনের জনক বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়।

মহাকাব্য রামায়ণ অমর বিশ্বসাহিত্য এবং আমাদের জাতীয় সাহিত্য। "জগতে কাহাকেও ঘৃণা করিবে না" এইটী বিশ্ব-সাহিত্যে প্রচারিত একটী মহাবাণী। যে যতই কেন দুষ্ক্রিয়ারত মহাপাপী হোক্ না, তথাপি সে ঘৃণার পাত্র নহে। ঈশ্বর তাঁহার নিজের সৃষ্ট বিশ্বপ্রকৃতিতে এই নীতি প্রচার করিয়াছেন। তিনি কাহাকেও ঘৃণা করেন না। যতদূর নীচত্ব আমরা কল্পনা করিতে পারি তাহার অপেক্ষাও অধিক নীচ ক্রিয়াসক্তকে ভগবান তাঁহার রাজ্যে স্থান দান করিয়াছেন, ঘৃণা করিয়া বর্জ্জন করেন নাই। বিশ্বসাহিত্য বিশ্ব-প্রকৃতির নিকট ভগবানের প্রদত্ত এই শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছে। বিশ্বসাহিত্যের এই মহান্ নীতি আর্য্যসাহিত্যের কাব্য, নাটক, ইতিহাস ও আখ্যায়িকা সকল গ্রন্থেই সার্থকতা লাভ করিয়াছে। জীবমাত্রেই নিষ্কলুষ সচ্চিদানন্দ নারায়ণের অংশ, যে জাতির ইহাই মজ্জাগত ধারণা, তাহাদের জাতীয়-সাহিত্য যে এই ভাবে গঠিত হইবে ইহাই স্বাভাবিক। ভগবানে দৃঢ় বিশ্বাস ও একান্ত নির্ভরই ভারতবর্ষের জাতীয়ত্ব, ভারতবাসীর শিক্ষাদীক্ষায়, কার্য্যে ও মনে সকল বিষয়েই এই নির্ভরের ভাব প্রকাশ পায়। এই জন্য রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি আমাদের জাতীয়-সাহিত্যও এইভাবে অনুপ্রাণিত। আমাদের জাতীয়-সাহিত্য বলেন, ভগবান পতিতপাবন, তিনি কখনও পতিতকে উপেক্ষা করেন না। তিনি করুণার মহাসমুদ্র, প্রেমময় ও সর্ব্বভূতে সমদর্শী। তিনি জগৎপিতা, জগতে কেহই তাঁহার ঘৃণার পাত্র নহে। তাঁহার রাজ্যে কোন জীবেরই অন্য জীবকে ঘৃণা করিবার অধিকার নাই। তুমি অপরাধীকে শাস্তি দিতে পার, লাঞ্ছিত করিতে পার, নির্ব্বাসিত করিতে পার, ইহলোক হইতে বিদায় দিতে পার, কিন্তু ঘৃণা করিতে পার না।

তুমি পাপীকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতে পার না, কিন্তু দুষ্ক্রিয়া ও পাপ যেন তোমার একান্ত ঘৃণার বস্তু হয়, ইহাই বিশ্বসাহিত্যের দ্বিতীয় শিক্ষা। বিন্দুমাত্র অন্যায়াচরণও যেন তোমার মনের দুর্ব্বলতা অথবা অনব-ধানতায় ক্ষমা প্রাপ্ত না হয়। অতি যৎসামান্য অগ্নিও যেমন কাষ্ঠস্তূপের ভিতরে গোপন ভাবে থাকিলে ক্রমশ তাহা বৃদ্ধি পাইয়া দেশ ধ্বংস করিতে পারে, তেমনি মনের গূঢ়তম সামান্য পাপও প্রশ্রয় পাইলে, শুধু কেবল পাপাচারীর নিজের নহে, তাহার আত্মীয়-স্বজনের এমন কি দেশের পর্য্যন্ত ধ্বংসের কারণ হয়। এই জন্যই পাপীর উপযুক্ত শাস্তি প্রয়োজন, সে শাস্তির কঠোরতা তাহাকে ধ্বংস করিবার জন্য নহে, পাপ ধ্বংস করিয়া তাহার হাত হইতে পাপ-গ্রস্তকে বাঁচাইবার জন্য। বিশ্বসাহিত্যের এই শিক্ষাও আমাদের জাতীয়-সাহিত্যে পূর্ণরূপে বর্ত্তমান, তথায় দুরাচারী ও দুরাচার-সহিষ্ণু সম-অপরাধী বলিয়া গণ্য হইয়াছে। আর্য্যজাতি ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা করিয়াছেন,—

"অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে,
তব দণ্ড বজ্রসম তারে যেন দহে।"

হিন্দুশাস্ত্রের কর্ম্মফলবাদে এই নীতিরই সার সংগৃহীত হইয়াছে।

বিশ্বসাহিত্যের আর একটী মহাবাণী এই যে পবিত্রতা ও আত্মত্যাগই প্রকৃত প্রেমের বীজস্বরূপ। এই দুটীর অভাব হইলে কখনও প্রকৃত প্রেমের বিকাশ হইতে পারে না।

অহল্যার উপাখ্যানে বিশ্বসাহিত্যের এই তিনটী সর্ব্বপ্রধান নীতিই উপলব্ধি হয়। অহল্যার চিত্তে কিছু মলিনতা ছিল বলিয়া তিনি ঋষিপত্নী হইয়াও অধঃপতনের সোপানে পদক্ষেপ করিয়াছিলেন। ঋষি-শ্রেষ্ঠ গৌতম পত্নীর এইরূপ গর্হিত আচরণ দেখিয়াও তাঁহাকে ঘৃণা করেন নাই। ঘৃণা করিলে তিনি অপথগামিনী পত্নীকে তখনই ত্যাগ করিয়া যাইতেন, কিন্তু গৌতম তাহা না করিয়া পত্নীর চিত্তের মলিনতা দূর করিবার উপায় চিন্তা করিয়াছিলেন। তিনি অহল্যাকে যে অভিশাপ দিয়াছিলেন তাহাতে স্ত্রীর প্রতি ঘৃণা অথবা নিষ্ঠুরতা প্রকাশ পায় নাই, বরং স্নেহই প্রকাশ পাইয়াছে। সে স্নেহ পুরুষোচিত সবল স্নেহ, আসক্তি-দুর্ব্বল স্নেহ নহে। প্রিয়তমা পত্নীকে অনির্দ্দিষ্ট দীর্ঘকালের জন্য বন মধ্যে একাকিনী দুশ্চর কঠোর তপস্যায় নিয়োজিত রাখিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে মনে যে আঘাত লাগিয়াছিল, সে আঘাত সহ্য করিবার মত চিত্তের সবলতা তাঁহার ছিল। কেননা, তিনি আত্মত্যাগী, তাঁহার চিত্ত তপস্যাপূত, তাঁহার হৃদয়-মন্দিরে প্রেমের কণকপ্রদীপ জ্বলিয়াছে, শোক ও সংশয়ের অন্ধকার তাই সেখানে ছায়া ফেলিতে পারে নাই।

গৌতম জানিতেন, হৃদয়ের মালিন্য দূর করিতে হইলে তপস্যা প্রয়োজন, গৌতম জানিতেন অপরাধের দণ্ড ভগবানের স্নেহের বিধান। ভগবান তাঁহার নিজের বিধি নিজেই ভঙ্গ করিতে পারেন না, এই জন্য অহল্যা কঠোর তপস্যায় বিশুদ্ধা হইলে শ্রীরামচন্দ্রের দর্শন পাইয়াছিলেন, তাহার পূর্ব্বে নহে।

ঈশ্বরে একান্ত মনে আত্মসমর্পণ, সকল বিষয়ে তাহাতে নির্ভর, আমাদের জাতীয়-সাহিত্যের এই যে বিশেষত্ব, তাহাও এই উপাখ্যানে পরিস্ফুট হইয়াছে। গৌতম অসহায়া স্ত্রীকে বনমধ্যে একাকিনী রাখিয়া যাইতে ইতস্ততঃ করেন নাই; বনে, গৃহে, অথবা যেখানেই হউক ভগবানই একমাত্র রক্ষক এ বিষয়ে তাঁহার সংশয় ছিল না। অহল্যা তপস্যায় চিত্তশুদ্ধির ফলে ভগবানের দর্শন পাইলেন, নররূপী নারায়ণের চরণরেণু-স্পর্শে তাঁহার পাষাণ-স্তূপের মত পাতকরাশি অন্তর্হিত হইয়া গেল, তিনি নিষ্কাম প্রেমের রাজ্যে নবজন্ম গ্রহণ করিয়া প্রাতঃস্মরণীয়া হইয়া রহিলেন।

রামায়ণের এই অহল্যার উপাখ্যান অপথগামীকে কি আশ্বাসই প্রদান করিতেছে! ভগবানের অপার করুণার প্রতি মানবমনে কি নির্ভরের ভাবই জাগাইয়া তুলিতেছে। এখনও প্রতিদিন প্রাতঃকালে অহল্যার প্রাতঃস্মরণীয় নাম স্মরণ করিতে গিয়া পাপপঙ্কে নিমজ্জিতপ্রায় কত মানবের মনে আবার নব বল জাগিয়া উঠে, কত লুব্ধ পাপাচারীরও আপাতমধুর পাপে ঘৃণা জন্মিয়া পবিত্রতার সৌরভে চিত্ত আকৃষ্ট হয়

রামায়ণের এই উপাখ্যানটী শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় সংশোধিত ও পরিমার্জ্জিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার নাটিকায় প্রথমে যখন ঋষিপত্নী অহল্যার সাক্ষাৎ পাই, তখন তিনি ফুল তুলিতে তুলিতে গাহিতেছেন,—

"আজি কি ব্যাথা উঠিছে জাগি'রে
মম হৃদয় কিসের লাগি' রে
যেন উঠিছে কাঁপিয়া কাঁপিয়া।"

তাহার পর অহল্যা তাঁহার সখী মাধুরীর নিকট আপনার "নিরুদ্ধ প্রাণের ব্যথা" বলিতেছেন,—

"মনে আছে, বিবাহ আমার হইয়াছে কতদিন?

* * * *

তখন ছিলাম দশবর্ষীয়া বালিকা,
আজ আমি পঞ্চদশবর্ষীয়া যুবতী।"

পঞ্চদশবর্ষীয়া অহল্যা ইতিমধ্যেই "শতানন্দ" নামে একটী পুত্রের জননী হইয়াছেন। পুত্রটীর বয়সও ৪।৫ বৎসরের কম নহে, কেননা ঋষিপুত্র মিথ্যা কথা ও দুষ্টামি বিদ্যাতে বেশ পরিপক্ক হইয়াছে।

শতানন্দ। দাদা আমাকে মেরেছে!
অহল্যা। তুই বুঝি দুষ্টামি করেছিলি?
শতানন্দ। না। আমি বল্লাম দাদা সন্দেশ খাবি? অম্‌নি দাদা আমাকে ঠাস্ করে চড় মাল্লে।

অহল্যা সঙ্গিনীর নিকট নিরুদ্ধ প্রাণের ব্যথা বলিতেছেন। সে প্রাণের ব্যথা কি? প্রথমটা তাহা ভাল করিয়া বুঝা যায় না। কেবল অহল্যার উক্তি হইতে এইটুকু বুঝা যায় যে, তিনি জানেন যে তিনি অপূর্ব্ব রূপবতী, আরও বুঝিয়াছেন যে তাঁহার জীবন বিফল হইয়া গেল।

'দেখ্ চেয়ে—
শুদ্ধ চেয়ে দেখ্ সখি, এরূপ মাধুরি,
শুদ্ধ চেয়ে দেখ্ গলে এই পুষ্পমালা।
হয়নি কি অধোমুখী এ বক্ষপরশে
লজ্জায়? নিশ্চয়, শুদ্ধ মন্দারব্রততী
যোগ্য হইবার ভূষা এ মৃণাল ভুজে!
দেখ্, বেড়িয়াছে মোরে এ কৌষেয় বেশ
কত না আগ্রহে!

ব্যর্থ নহে—
এ রূপ, এ যৌবন এ জীবন? জগৎ
বিষাদ নহে?—"

ষষ্ঠ দৃশ্যে, তপস্যার্থে বিদায়প্রার্থী গৌতমের বিদায়-প্রার্থনায় অহল্যা বলিতেছেন:—

"যদি না থাকিবে
বিবাহ করিলে কেন? বাঁধিলে আমার
কৈশোর, তোমার শীর্ণ বার্দ্ধক্যের সনে?
দেখ চাহি এই মুখপানে—এই নব
উদ্ভিন্ন যৌবন, এই উচ্ছ্বসিত রূপ,
অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা, এই উদ্বেল হৃদয়—
দেখিছ? বাঁধিলে কেন নবসুকোমল
কুসুমিত পল্লবিত শ্যামল বল্লরী
নীরস বিশুষ্ক বৃক্ষকাণ্ডে?"

ঋষিপত্নী অহল্যার ইহাই মনোবেদনা। এত রূপ-যৌবন, বৃদ্ধ গৌতমের পত্নীত্বে কি না সকলই ব্যর্থ হইয়া গেল? স্বামীকে অহল্যা স্পষ্টাক্ষরেই বলিলেন,—

"তুমি যাও, তুমি থাক—একই কথা প্রভু—
অহল্যার। তোমার হৃদয়ে নাই স্নেহ;
তোমার অধরে নাই সুধা!"

আবার স্বামী চলিয়া গেলে বলিতেছেন—

"এত রূপ ! এ পূর্ণ যৌবন ! সব বৃথা ?
ধরিয়া রাখিতে তবু পারিলি না হায়
এ স্ত্রৈণ মূঢ় স্থবির গৌতমে ?"

এই স্থানেই অহল্যার সম্পূর্ণ পরিচয় নহে। ইন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ ও কথোপকথন আরও বিচিত্র। দ্বিজেন্দ্র বাবুর লিখিত সমালোচনায় দেখিতে পাই কুরুচিপূর্ণ কাব্য তিনি বড়ই ঘৃণা করেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তাঁহার অঙ্কিত রুচির চিত্র তুলিয়া দিতে আমাদের সঙ্কোচ বোধ হইতেছে।

পথিকের বেশে ইন্দ্র পথে চলিয়াছেন, প্রোষিতভর্তৃকা অহল্যা সাগ্রহে তাঁহাকে ডাকিলেন।

ইন্দ্র। ডাকিলে মোরে কে তুমি তাপসী ?

* * * *

কত দূর মিথিলানগরী, দয়া করে' দেবি
পথ বোলে দাও যদি।

অহল্যা। পান্থ, বহুদূর,
সে স্থান দুর্গম। সন্ধ্যা আগত। তাপস
মদীয় আশ্রমে যাপ নিশীথ।

* * * *

ইন্দ্র। না, না, যাইব না।

অহল্যা। হাঁ যাইবে তুমি। মুখে স্পষ্ট ব্যক্ত তাহা,
কপট ! আশ্রমে চল। (অস্ফুট স্বরে) সত্য বলিতেছি,
আমি তব দাসী, তুমি মোর প্রাণেশ্বর।

দ্বিজেন্দ্র বাবু অহল্যার চিত্রে আরও যাহা অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা বিস্তারিত লিখিবার প্রয়োজন নাই। সংক্ষেপে,—প্রবাসগত গৌতমের আশ্রমে ইন্দ্র প্রতিরাত্রে ময়ূরপঙ্খী নৌকা চড়িয়া আসিতে লাগিলেন, অহল্যা আশ্রমেই কিছু দিন এইরূপ ভাবে থাকিয়া অবশেষে গৌতমের আগমন ভয়ে ইন্দ্রের সহিত পলায়ন করিলেন। পলায়ন কালে পুত্র শতানন্দ জাগ্রত হইয়া পড়িলে তাহার গলা টিপিয়া হত্যা করিয়া পলায়ন করিলেন। তাহার পর দশ বৎসর ইন্দ্রের সহিত বিহার সুরাপান ইত্যাদিতে কাটাইয়া দিলেন। অবশেষে ইন্দ্র যখন স্পষ্ট করিয়াই বলিলেন,—

"এতদিন ভুঞ্জেছি তোমারে—
মিটেছে লালসা মম ! আর নাহি চাহি।"

তাহার পরেও অহল্যা ইন্দ্রের পদতলে পড়িয়া—

"কোথা যাও ?
যাইও না প্রিয় ! এখনো যুবতী আমি,
দশবর্ষ ধরি পান করিয়াছ বটে
এ রূপের তীব্রসুরা ; পাত্রে চেয়ে দেখ
আরো আছে, আরো দিতে পারি।"

বলিয়া মিনতি করিতে লাগিলেন।

কিন্তু ইন্দ্র কিছুতেই থাকিলেন না, অহল্যার সকল মিনতি অগ্রাহ্য করিয়া প্রস্থানোদ্যত হইলেন।

অহল্যা। নির্ম্মম লম্পট ! যাবে ?
যাবে ? এই যাও।

(কটিদেশ হইতে ছুরিকা লইয়া ইন্দ্রের বক্ষে আমূল রোপণ)

ইহার পর অহল্যার স্বকৃত দুষ্কার্য্যের জন্য অনুতাপ আরম্ভ হইয়াছে। সে অনুতাপ এই রূপ,—

"আমি কলঙ্কিনী সত্য। কিন্তু কার দোষে ?
কে রোপিয়াছিল এই স্বর্ণলতিকায়

নীরস পাষাণস্তূপে ? কে বা প্রলোভনে
ভুলাইল অসহায়া দুর্ব্বলা রমণী,
কে তাহারে নিক্ষেপিল করিয়া সম্ভোগ
শূন্য পাত্র সম, পান করি তীব্র সুরা ?
নহে সে নির্ম্মম ক্রুর পুরুষ ? তথাপি—
শুদ্ধ আমি, দোষী একা সমাজ-বিচারে ?"

দ্বিজেন্দ্র বাবুর এই চিত্র ক্ষণিকের মতিভ্রংশে পদস্খলিতা ভারতবর্ষের পুণ্যাশ্রমনিবাসিনী ঋষিপত্নীর চিত্র নহে। ইহা নরকের চিত্র, ইহা নরকনিবাসিনী পিশাচিনীর চিত্র। উচ্চশ্রেণীর কবিদিগের কাব্য মাত্রেই একটী মহৎ উদ্দেশ্য থাকে ইহা পূর্ব্বে একবার বলিয়াছি। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় যে উদ্দেশ্যে পাষাণী-নাটিকার অবতারণা করিয়াছেন, প্রথম দৃশ্যে বিশ্বামিত্র ও জনকের কথোপকথনে তাহার আভাস পাওয়া যায়। গৌতমের চরিত্র ক্ষমাগুণের আদর্শ করিয়া সৃষ্টি করাই তাঁহার এই কাব্যের প্রধান উদ্দেশ্য। তাঁহার গৌতম অতি শান্তস্বভাব, অতিশয় বিনয়ী এবং ক্ষমাশীল। গৌতম যখন সহধর্ম্মিণীর মুখে শুনিতেছেন,—

"তপস্যার—
শুষ্ক কর্ত্তব্যের জন্য তোমার জীবন,
আমার জীবন চাহে সম্ভোগ।
ভিন্ন গতি দু'জনার ভিন্ন দিকে।"

তখনও গৌতম শান্তভাবে মনে মনে সহধর্ম্মিণীর উদ্দেশে বলিতেছেন "সত্য কথা, ঘুচিল না এ বিচ্ছেদ প্রিয়ে !" গৌতমপত্নী স্বামীকে মুখের উপরেই "বৃদ্ধ, নীরস বৃক্ষকাণ্ড" ইত্যাদি সুমধুর সম্বোধন করিতে বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করেন না, সঙ্কোচ করিবার কোন কারণও নাই, কেননা মহাত্মা গৌতম ক্ষমাশীল। যখন রামচন্দ্রের উপদেশে অহল্যার চৈতন্য হইল, তিনি স্বামীর কাছে আসিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন, তখন পুত্র শতানন্দ পিতাকে কুলটা জননীর প্রতি শাস্তি বিধান করিতে অনুরোধ করিলে গৌতম বলিলেন—

"শাস্তি দিব ? হায় !
আকণ্ঠ নিমগ্ন পাপে আমি মূঢ়মতি,
দুর্ব্বল মনুষ্য নিজে। সাধ্য কি আমার,
কর্ত্তব্যস্খলিত, মূঢ় মনুষ্য উপরি
বসিব বিচারাসনে ?"

কিন্তু বাল্মিকীর গৌতমের এতটা ক্ষমাগুণ ছিল না। তিনি এত কথা না বুঝিয়া, তখনই অহল্যাকে

"এস প্রপীড়িতা পরিত্যক্তা প্রাণেশ্বরি !
এস বাণবিদ্ধ মম পিঞ্জরের পাখী
হৃদয় পিঞ্জরে ফিরে এস !"

বলিয়া বক্ষে ধারণ না করিয়া বরং অভিশাপ দিলেন যে, "তুমি বায়ুমাত্র ভক্ষণ করিয়া, ভস্মশায়িনী ও অন্যের দুর্নিরীক্ষ্যা হইয়া অনুতাপদগ্ধ চিত্তে তপস্যা কর। তপস্যাফলে দশরথতনয়ের দর্শন পাইয়া সম্পূর্ণ পবিত্র হইলে আমি তোমাকে গ্রহণ করিব।"

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তাঁহার কালিদাস ও ভবভূতি নামক প্রবন্ধে কালিদাস ও ভবভূতির কাব্য লইয়া বিচার করিতেছেন। সংস্কৃত-সাহিত্যে নাটকের নায়কের সর্ব্বগুণসম্পন্ন হওয়া প্রয়োজন, দ্বিজেন্দ্র বাবুর মতে এইজন্য ভবভূতি পত্নীত্যাগী রামচন্দ্রকে নিজের নাটকের

নায়ক করিবার জন্য অনেক ঘসিয়া মাজিয়া দোষবর্জ্জিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। দ্বিজেন্দ্র বাবুও বোধ হয় সেই কারণেই ক্ষমাহীন ব্রাহ্মণ গৌতমকে কল্পনার তুলিকায় মার্জ্জিত করিয়া ক্ষমাগুণ-সম্পন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার চেষ্টা সফল হয় নাই। সে চরিত্র-চিত্র শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ন্যায় অসামান্য প্রতিভাবান লেখকের হাতে পড়িয়াও নিতান্ত নিষ্প্রভ হইয়াছে। যদিও গৌতমের চরিত্রে একটা শান্ত ভাব আছে, কিন্তু সে শান্তভাব চরিত্রের অটলতায় দৃঢ় ও চরিত্র-গৌরবে উজ্জ্বল নহে, সে শান্ত ভাব যেন জড়তার সহিত জড়িত। অহল্যা-চরিত্রে স্বামীর প্রভাব বিন্দুমাত্রও লক্ষিত হয় না, অহল্যার এতদূর অধঃপতন অনেকটা গৌতমেরই দোষে হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। যে তাপসপত্নী তপস্বী গৌতমের সম্মুখে "তোমার অধরে নাই সুধা" অতএব, "তোমাতে আমাতে মিলন অসম্ভব," নির্ব্বিবাদে এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়া 'প্রিয়ে, প্রেয়সি প্রভৃতি প্রণয়মধুর সম্ভাষণ শুনিতে পায় তাহার পক্ষে স্বেচ্ছাচারিণী হওয়া খুব বেশী আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। মহর্ষি গৌতম যখন পুত্র শতানন্দকে জনকের নিকট রাখিয়া তপস্যা করিতে যাইতেছেন, তখন শতবার জনককে বলিতে-ছেন "আমার শতানন্দকে দেখিও।" শতবার ফিরিয়া আসিয়া শতানন্দের মুখে চুম্বন করিতেছেন, শতবার বলিতেছেন, "চলিলাম!" কিন্তু চলিতে আর পারিতেছেন না। তাঁহার এই ভাব দেখিয়া শিষ্য চিরঞ্জীব আর থাকিতে না পারিয়া বলিয়া ফেলিল—

"চলিলাম, চলিলাম' একশত বার
করার সদর্থ বুঝি, প্রভু যাইবার
ইচ্ছা নাই? কে মাথার দিব্য দিয়া তবে
কহিয়াছে 'যাও, যাও,' থাকো না এখানে?"

তবুও গৌতমের "যাই, যাই" আর শেষ হইল না। অবশেষে তিনি শতানন্দকে বলিলেন,—

"বৎস, প্রাণাধিক,
একটী চুম্বন তুই দিবি না পিতারে?"

শতানন্দ চুম্বন দিলে বলিলেন,

"একবাব 'বাবা' বোলে ডাক্
শুনে যাই।"

শতানন্দ যখন "বাবা" বলিয়া ডাকিল তখন গৌতম

"না যাইতে পারিব না আমি,
রহিব সংসারী।"

বলিয়া একেবারে হাল ছাড়িয়া দিলেন।

এই স্থানে গৌতমের চরিত্র একেবারে ম্লান হইয়া গিয়াছে! কোলের শিশুর জন্য পুত্রবৎসলা জননীর এরূপ "আকুলী, বিকুলী" শোভা পাইত, কিন্তু মহর্ষি গৌতম—তাঁহার পক্ষে এরূপ আচরণ নিতান্ত বিসদৃশ। তাঁহার আশক্তি চাঞ্চল্যহীন স্নেহ নির্ব্বাত অগ্নিশিখার ন্যায় থাকিবে। আর তাহাই দেখিতে সুন্দর।

উদারস্বভাব মহাত্মারা যে পাপীকে ঘৃণা করেন না, বরং তাহাদের প্রতি করুণা পরবশ হন, প্রেম দিয়া তাহাদের পাপের দাহ দূর করিবার চেষ্টা করেন, পতিতা পত্নীর প্রতি গৌতমের প্রেম ও করুণার

দৃশ্যে কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল তাহাই দেখাইতে চাহিয়াছেন। পাপী ঘৃণার পাত্র নহে যথার্থ, কিন্তু পাপও কি ঘৃণার যোগ্য নহে? যখন শরীরের রক্ত বিষাক্ত হইয়া স্ফোটকের আকার ধারণ করে, তখন শত শীতল প্রলেপেও তাহার দাহ নিবারিত হয় না, তাহার জন্য অস্ত্র-চিকিৎসার প্রয়োজন হয়।

"শাস্তি দিব? হায়!
আকণ্ঠ নিমগ্ন পাপে আমি মূঢ়মতি,
দুর্ব্বল মনুষ্য নিজে, সাধ্য কি আমার
কর্ত্তব্যস্খলিত, মূঢ়, মনুষ্য উপরি
বসিব বিচারাসনে?"

গৌতমের এই উক্তিতে কি ইহাই বুঝায় না, যে, যখন সকলেই অপরাধী তখন পরস্পর পরস্পরকে ক্ষমা করিয়া সংসার পাতাইয়া ঘরকন্না করিতে থাকাই ভাল। আমি নিজেই যখন দোষী তখন অন্যের দোষের দিকে ঘৃণার দৃষ্টিতে চাহিব কোন্ সাহসে? দ্বিজেন্দ্র বাবুর প্রচারিত এই সত্য বিশ্বসাহিত্যের অথবা আমাদের জাতীয়-সাহিত্যের অনুমোদিত নহে। আর্য্য-সাহিত্য পাপীকে করুণার ক্রোড়ে আশ্রয় দিতে বিমুখ নহে, কিন্তু পাপকে বিন্দুমাত্র উপেক্ষা করিতে পারে না, সে পাপ নিজেরই হউক অথবা অন্যেরই হউক। আমি যদি পাপী হই, আমার মনের কলুষ আমি উপেক্ষা করিতে পারিব না, এবং আমি নিজে কলুষিত বলিয়া অন্যের চিত্তের কলুষ-রাশিও উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখিতে পারি না। পাপী বলিয়া কেহ পরিত্যাগের যোগ্য নহে বটে, কিন্তু যত দিন সে পাপমুক্ত না হয় তত দিন তাহাকে পরিত্যক্ত থাকিতেই হইবে। এই জন্য যত দিন অহল্যা বিগত-পাপা না হইয়াছিলেন ততদিন মুনি-পত্নী-সমাজে তাঁহার স্থান ছিল না।

অহল্যার নাম দিয়া দ্বিজেন্দ্র বাবু এমন একটী রমণী-চরিত্রের অবতারণা করিয়াছেন যে, যাহার অপেক্ষা দুশ্চারিণী রমণী কল্পনা করাও কঠিন। যে রমণী মুনিপত্নী হইয়া নিজেই পথ হইতে সুন্দর যুবক পথিককে নিশীথে কু-অভিপ্রায়ে স্বগৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যায়, যে প্রণয়াস্পদের সহিত গৃহত্যাগ করিবার জন্য স্বীয় গর্ভজাত সন্তানকে শ্বাস-রোধ করিয়া হত্যা করে, দ্বিজেন্দ্র বাবু তাঁহার সেই মানস-কন্যাটীর প্রতি বারবার "প্রলুব্ধা, প্রতারিতা" বলিয়া মমতা প্রকাশ করিলেও তাহার দোষের গুরুত্ব কিছু কমিবে না। দ্বিজেন্দ্র বাবুর কি ইহাই মত যে রমণীরা যতদূর ইচ্ছা অধঃপতনের পথে চলিলেও তাহারা কেবল "প্রলুব্ধা, প্রতারিতা," তাহারা প্রণয়াস্পদের সঙ্গে গৃহ ত্যাগ করিয়া গিয়া আবার যখনই ফিরিয়া আসুক, স্বামীগণের, "প্রতারিতা, প্রলুব্ধা, পতিতা, প্রেয়সী আমার!" বলিয়া বক্ষে ধারণ করিয়া ক্ষমাধর্ম্মের মাহাত্ম্য দেখানো উচিত? দ্বিজেন্দ্র বাবু যদি এই মত প্রচারের উদ্দেশ্যেই পাষাণী নাটিকা রচনা করিয়া থাকেন, তবে নায়ক ও নায়িকার অহল্যা ও গৌতম নাম না দিয়া অন্য কোন নাম দিলে আমাদের বিশেষ কিছুই আপত্তি থাকিত না।

কাব্যে ও সাহিত্যে পাপ ও পুণ্য উভয়েরই চিত্র আঁকিতে হয়। প্রধানতঃ

পুণ্যের নিকট পাপকে হীন করাই এই চিত্রাঙ্কণের উদ্দেশ্য থাকে। রেনাল্ড ও জোলা প্রভৃতিও তাঁহাদের প্রণীত অনেক পুস্তকে পরিণামে পুণ্যের জয় দেখাইয়াছেন, তথাপি তাঁহাদের অঙ্কিত পাপচিত্রগুলি এমন বিচিত্র বর্ণে ও নৈপুণ্যসহকারে অঙ্কিত যে তাহাতেই লোকের মন মুগ্ধ হইয়া যায়। এইরূপ সজীব পাপচিত্রে পরিপূর্ণ বলিয়াই এই শ্রেণীর গ্রন্থগুলি অপাঠ্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। পাপচিত্র উপভোগ করিবার যোগ্য নহে, পুণ্যচিত্রই সাহিত্যের অলঙ্কার। কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তাঁহার সুনিপুণ চিত্রাঙ্কণী প্রতিভায় ইন্দ্র ও অহল্যার প্রণয়কাহিনী উজ্জ্বল বর্ণে অঙ্কিত করিয়াছেন, গৌতম তাহার নিকট নিষ্প্রভ, আর পাষাণীর উদ্ধারকর্ত্তা রামচন্দ্রের কথা তো দুইচারিটী সামান্য কথাতেই শেষ হইয়াছে।

আমরা পাষাণী সমালোচনা উপলক্ষ্যে অনেক অপ্রিয় কথা লিখিয়াছি। কিন্তু যাহা লিখিয়াছি তাহা সত্যেরই খাতিরে। দ্বিজেন্দ্র বাবুর অনেক রচনা বঙ্গসাহিত্যের স্থায়ী সম্পত্তি হইবে, ইহাই আমাদের বিশ্বাস; তিনি জাতীয়-সাহিত্যভাণ্ডারে 'দুর্গাদাস,' 'মেবার পতন' ও 'সাজাহান' প্রভৃতি অমূল্য রত্ন দান করিয়াছেন—তাঁহার 'হাসির গান', কয়টি জাতীয়-সঙ্গীত বঙ্গসাহিত্যে একটা অভিনবত্ব আনিয়া দিয়াছে, তাঁহার কতকগুলি চিত্র বঙ্গ-সাহিত্যের একটা দিক উজ্জ্বল রাখিয়াছে, কিন্তু তাঁর অনেকগুলি রচনা একেবারেই তাঁর উপযুক্ত নহে, সে গুলি তাঁহার ও বঙ্গ-সাহিত্যের কলঙ্কস্বরূপ। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা তাঁহার পাষাণী 'পাষাণে,' তাহার নমুনা 'কষিয়া' দেখিলাম। আশা করি দ্বিজেন্দ্র বাবু নিবিষ্ট চিত্তে, সমালোচকের চক্ষে, পাষাণী পাঠ করিয়া, তাঁহারই সমালোচনার "পরশুরামি" কুঠারাঘাতে ভবিষ্যতে তাঁহার পাষাণী প্রভৃতিকে সংস্কৃত করিতে চেষ্টিত হইবেন এবং আমাদের উদ্দেশ্য বুঝিয়া এই "অপ্রিয়" কথা আলোচনার জন্য আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন। তাঁহার নিকট আরও প্রার্থনা করি, তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা যেন পাষাণীর ন্যায় নাটকে বা কোন ব্যক্তিগত আলোচনায় আকৃষ্ট না হইয়া দুর্গাদাস, মেবার পতন, সাজাহানের ন্যায় নাটক রচনায় নিযুক্ত থাকে।

শ্রীসরসীলাল সরকার।

ধর্ম্মের কথা।

১

এক সময় ধর্ম্মের কথা অনেক কহিয়াছি। এখনো অবসর পাইলে বলি না এমন নয়। কিন্তু বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মকথা কহিবার সাহসটা কমিয়া যাইতেছে, ইহা দেখিতেছি।

ধর্ম্ম-বস্তু যে কত নিগূঢ়, কত জটিল, আগে তাহা বুঝিতাম না। এখনো যে ভাল করিয়া বুঝি, এ স্পর্দ্ধা নাই। তবে যতটুকু বুঝিতেছি, তাহাতেই মনে হয়, সচরাচর লোকে যে ভাবে ধর্ম্মের কথা

বলে, ধর্ম্ম লইয়া বাক্‌বিতণ্ডা করে, তার মত এমন নিষ্ফল কাজ আর দুনিয়ায় নাই।

ফুল যেমন আপনা হইতেই ফুটে, বায়ু যেমন আপনা হইতেই বহে, চূতগন্ধে মাতোয়ারা হইয়া কোকিল যেমন আপনা হইতেই পঞ্চমে তান ধরে, তরুণ কিরণ রেখার আভাসে আপনা হইতে যেমন জীবজগৎ জাগিয়া উঠে, তেমনি আপনা হইতে যখন ধর্ম্ম-কথা বেরিয়ে পড়ে, তাহা নিষ্ফল নহে। সে কথার সার্থকতাও বাহিরে নয়, ভিতরে; শ্রোতার কাণে বা মনে নয়, বক্তার আপনার মনে ও প্রাণে। ফোটা-ই যেমন ফুলের সার্থকতা, বহিয়া যাওয়াই যেমন মলয়ের সার্থকতা, সেইরূপ আপনা হইতে, আপনারই জন্য যে ধর্ম্ম-কথা বাহির হয়, আত্মপ্রকাশেই তার পূর্ণ সার্থকতা। কে শুনিল বা না শুনিল, কে বুঝিল বা না বুঝিল, কার প্রাণে তাহা লাগিল বা না লাগিল, এ সকল বাহিরের ঘটনা বা ফলাফলের উপরে, এরূপ ধর্ম্মকথার সার্থকতা আদৌ নির্ভর করে না। এরূপ ধর্ম্মকথার কথা এখানে বলিতেছি না। লোককে বুঝাইবার জন্য যে ধর্ম্মকথা বলা হয়, অপরের ভ্রান্তিবিনোদনের জন্য যার অভিব্যক্তি হয়, পরমতাবলম্বী লোককে স্বমতাবলম্বী করিবার জন্য, আপনার দলের বা সম্প্রদায়ের পরিসরবৃদ্ধির চেষ্টায় যে ধর্ম্ম-কথা উক্ত হয়, তারই কথা এখানে বলিতেছি। তার মত নিষ্ফল কাজ, সত্যই, দুনিয়ায় আর কিছু আছে কি না, জানি না।

এ জন্য আমাদের দেশে লোককে ডাকিয়া ধর্ম্মকথা কহিবার প্রথা কখনো ছিল না। পণ্ডিতেরা সভা করিয়া শাস্ত্রার্থের আলোচনা করিতেন। বক্তাগণ পৌরাণিকী কথা কহিয়া লোকের চিত্তরঞ্জন ও চরিত্র-গঠন করিতেন। সদ্‌গুরুগণ শিষ্যমণ্ডলীকে ধর্ম্মোপদেশ দিতেন। এ সকল প্রথা প্রচলিত ছিল। কিন্তু যে যা বোঝে না কেবল নহে, বুঝিতে চাহে না, তাহাকে জোর করিয়া সে কথা শুনাইবার ও বুঝাই-বার প্রয়াস কখনো দেখা যায় নাই।

আর, এর মূল কারণ এই মনে হয় যে আমাদের দেশের প্রাচীন সাধুমহন্তরা ধর্ম্ম-বস্তু যে কত গূঢ়, কত জটিল ইহা অতিশয় দৃঢ়ভাবে বুঝিয়াছিলেন ও ধরিয়াছিলেন। তাঁরা জানিতেন যে যার ভিতরে যে বস্তু বা যে অবস্থা জন্মে নাই, বাহির হইতে তাহাকে কখনো সে বস্তু দেওয়া যায় না, ও তার ভিতরে সে অবস্থা আনা সম্ভব নহে। এক কথায় বলিতে গেলে, তাঁরা অধিকারী-ভেদ মানিতেন, সকলে সকল বিষয়ের অধিকারী নহে, এ সত্যটা অতি দৃঢ় ভাবে ধরিয়া-ছিলেন।

এক সময়, এই অধিকারীভেদের কথা শুনিলেই, আমরা নাসিকা কুঞ্চিত করিতাম। ধর্ম্মবস্তু সার্ব্বজনীন, ভগবানের সত্য সার্ব্বভৌমিক, এখানে আবার অধিকারী অনধিকারীর কথা কি? ধর্ম্মে অধিকারী-ভেদ মানাটা তখন নিতান্ত অসত্য ও অধর্ম্ম বলিয়া মনে হইত। কিন্তু সত্যই কি ধর্ম্মে কোনো অধিকারী অনধিকারী ভেদ নাই? সকল সত্যই কি সকলে বুঝে, না বুঝিতে পারে? যুক্তিতে যা ধরা যায়, তাকেই কি

চরিত্রে ও চিত্তে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হয়? ক্ষেত্রতত্ত্বের প্রতিজ্ঞার ন্যায়, কেবল যুক্তি-পরম্পরার উপরেই কি ধর্ম্মকে গড়িয়া তোলা যায়? আর তা যদি সম্ভব না হয়, তবে অধিকারী-ভেদ না মানিয়া এ সমস্যার অপর মীমাংসাই বা কি আছে?

ফলত যত জীব, তত ধর্ম্ম। প্রত্যেক জীবের ধর্ম্ম তার নিজস্ব বস্তু। ধর্ম্ম যে কেবল মরণে সঙ্গে যায়, তাহা নহে; জন্মকালেও সঙ্গে থাকে। আমরা প্রত্যেকে আমাদের ধর্ম্মকে সঙ্গে লইয়া জন্মগ্রহণ করি, আবার আয়ু ফুরাইলে এই ধর্ম্মকে সঙ্গে লইয়াই লোকান্তরে গমন করি যাহা হইতে ভূত সকলের উৎপত্তি, যাহাতে ভূত সকলের স্থিতি, যাহা ভূত সকলের নিয়তি ও গতি, তাহাই ধর্ম্ম। সমষ্টিভাবে এই ধর্ম্মই ব্রহ্ম; ব্যষ্টিভাবে ঐ ব্রহ্মই ধর্ম্ম।

ব্রহ্মেতে এই বিশ্ব স্থিতি করিতেছে, যখন বলি, তখন বিশ্বকে সমষ্টিরূপেই দেখি। ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ বস্তু, ব্রহ্মেতে যাহাকে দেখিবে তাহাকেই নির্ব্বিশেষভাবে দেখিতে হইবে। ব্রহ্ম সকলেতে, সকলেই ব্রহ্মেতে। ব্রহ্ম সকলেরই প্রাণস্য প্রাণং উত চক্ষুষশ্চক্ষুঃ ব্রহ্ম যেমন তোমার প্রাণ, তেমনি আমার প্রাণ, তেমনি বিশ্বেরো প্রাণ। ব্রহ্মদৃষ্টিতে তুমি আমি, সাধু অসাধু, জীব ও জড়, সকলই একাকার হইয়া যায়, নির্ব্বিশেষে সকল বিশেষত্ব বিলোপ প্রাপ্ত হয়।

কিন্তু ধর্ম্মেতে এই বিশ্ব স্থিতি করিতেছে, যখন বলি, তখন ইহাকে একান্ত ব্যষ্টিভাবে দেখিয়া থাকি। ধর্ম্ম বলিলেই নিয়মের বাঁধন, বিধি-নিষেধের কড়াকড়ি বুঝিয়া থাকি। ব্রহ্মে বিধিও নাই নিষেধও নাই। বিধি-নিষেধ বলিলেই একের সঙ্গে অপরের সম্বন্ধ বোঝায়। এক যে অপর হইতে পৃথক্, এ ধারণা ব্যতিরেকে বিধি-নিষেধের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় না। এটা কর, ওটা করিও না,—ইহা যখনই বলি, তখনই এটা যে ওটা হইতে ভিন্ন, স্বতন্ত্র, ওটার বিরোধী, ইহা ধরিয়া লই। এই ভেদবুদ্ধির উপরে ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত, ব্রহ্মদৃষ্টিতে এ ভেদের স্থান নাই। ব্রহ্মে অভেদ, ধর্ম্মে ভেদ, ব্রহ্ম ও ধর্ম্ম এ দুয়ের পার্থক্য এই। মূলে, পরমার্থত দুই এক; যা ব্রহ্ম তাই ধর্ম্ম। কিন্তু এই এক বস্তুই সমষ্টিভাবে দেখিলে, ব্রহ্মরূপে প্রতিভাত হয়, ব্যষ্টিভাবে দেখিলে ধর্ম্মরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে।

ব্রহ্ম সকলেতেই আছেন বলিয়া, ধর্ম্মও তাই সকলেই আছেন। আমরা এই জন্য কেবল মানুষেরই ধর্ম্ম আছে, আর কারো নাই, এমন কথা কখনো বলি না। আমরা যাকে ধর্ম্ম বলি, তা জড়ে জীবে, পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ, বৃক্ষলতা, মানুষ-দেবতা, সকলেই আছেন। কিন্তু এই ধর্ম্ম প্রত্যেকেই বিশিষ্ট আকার ধারণ করিয়া আছেন। এই জন্য প্রত্যেকের ধর্ম্ম স্বতন্ত্র। জলের যা ধর্ম্ম, আগুণের তাহা ধর্ম্ম নহে। পৃথিবীর বা মৃত্তিকার যা ধর্ম্ম, আকাশের তাহা ধর্ম্ম নহে। বৃক্ষলতার যা ধর্ম্ম কীটপতঙ্গাদির ধর্ম্ম তাহা নহে। পশুপক্ষীর যা ধর্ম্ম, মানুষের তাহা নহে। এমন কি একের ধর্ম্ম যাহা, অপরের ধর্ম্ম তার বিরোধীও হইতে পারে। এই বিরোধে ধর্ম্মের ধর্ম্মত্ব কখনো নষ্ট হয় না। সৃষ্টিতে তো এরূপ বিরোধ সর্ব্বদাই প্রত্যক্ষ

করিতেছি। শক্তিতে শক্তিতে বিরোধ, বস্তুতে বস্তুতে বিরোধ, জীবে জীবে বিরোধ. এই নিত্য বিরোধের সমষ্টিই বিশ্ব। আর ধর্ম্মবস্তু এই বিরোধের মধ্যে, এই বিরোধকে অবলম্বন করিয়াই প্রকাশিত হইতেছে। এই বিরোধ বিশ্বের অস্থিমজ্জাগত। এই বিরোধই ভাগ্যবিবর্ত্তনের প্রণালী।

অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এই জগৎব্যাপী বিরোধ, যাহাকে লইয়াই জগতের স্থিতি ও পরিণতি, যে বিরোধের একান্ত নিরশনের নামই মহাপ্রলয়,—এই বিরোধও ঐকান্তিকী বস্তু নহে। বিরোধ জগতের প্রণালী, কিন্তু লক্ষ্য নহে। বিশ্বের মূল এক এবং গতিও এক। এই অনন্ত ভেদ-বিরোধের মধ্য দিয়া জগৎ একই লক্ষ্যের দিকে ছুটিয়াছে। এই ভেদ-বিরোধ একত্বকে বিনাশ করে না, বরং একত্বকে প্রতিনিয়তই প্রতিষ্ঠিত করিতেছে। আর বিরোধ যখন মিলনেরই সূত্র হইয়া, একই কেন্দ্রে সকলকে আকর্ষণ করে, ভেদ যখন অভেদেরই দিকে ছুটিতে থাকে, তখনই অধিকারীভেদ প্রতিষ্ঠিত হয়।

অধিকারী-ভেদে লক্ষ্যের একত্বকে কখনো নষ্ট করে না, কেবল পন্থার বিশালতা ও বিভিন্নতাই নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। ঋজু কুটিল বহুবিধ পথ ধরিয়া জীব একই গন্তব্যের দিকে যাইতেছে, হিন্দু এ কথা কখনো অস্বীকার করে নাই। কেবল সকল মানুষই যে এক লক্ষ্যের অনুসরণ করিতেছে, এমনো নহে। এই লক্ষ্য কেবল মানুষের লক্ষ্য নহে। ইহা সকল জীবেরই লক্ষ্য। ইহা সমগ্র বিশ্বেরই চিরন্তন লক্ষ্য। জড় ও জীব, চেতন, অচেতন, উদ্ভিদ, সকলে আপন আপন ভাবে, আপন আপন অধিকারে এই সনাতন এই বিশ্বজনীন লক্ষ্যের দিকে যাইতেছে। ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি যেমন এক শক্তি, এক ইচ্ছা, এক প্রাণ, এক সত্তা হইতে, সেইরূপ ব্রহ্মাণ্ডের গতিও সেই একেরই দিকে। যাহা হইতে ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি, তাহাতেই ব্রহ্মাণ্ডের স্থিতি, তাহাতেই আবার ব্রহ্মাণ্ডের লয়। "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি"—যাহা হইতে ভূত সকল উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া যাহাতে ভূতগ্রাম স্থিতি করে, প্রলয়-কালে যাহাতে ভূতগ্রাম পুনঃপ্রবেশ করে ও লীন হয়,—শ্রুতি ইহাকেই ব্রহ্ম কহিয়াছেন। ইহাই হিন্দুর তথাকথিত অদ্বৈতবাদের মূল। এই অদ্বৈততত্ত্বের উপরেই এক দিকে ধর্ম্মের একত্ব ও অপর দিকে ধর্ম্মের অধিকারী-ভেদ, এই উভয় সত্যই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ফলত এই অধিকারীভেদ মানিয়াই হিন্দুর ধর্ম্ম এমন বড়, এমন উদার, এমন সার্ব্বজনীন বস্তু হইয়াছে। যে ধর্ম্মে অধি-কারীভেদ মানে না, তাহা যতই কেন উদারতার ভাণ বা সার্ব্বজনীনতার দাবি করুক না, তাহা প্রকৃত পক্ষে উদারও হইতে পারে না, সার্ব্বজনীনও হইতে পারে না। খৃষ্টধর্ম্মে অধিকারী-ভেদ নাই, সুতরাং একদিকে যেমন সকল খৃষ্টীয়ানই একই রূপ সাধনার, একই আকারের উপাসনার কেবল অধিকারী নহে, কিন্তু তাহাই অবলম্বন করিতে বাধ্য, সেইরূপ যারা ইহা করিল না, বা করিতে পারিল না, তারা এই ধর্ম্মের

বাহিরে পড়িয়া রহিল, আর যতক্ষণ এক জনও কোনও ধর্ম্মের বাহিরে পড়িয়া আছে, ততক্ষণ সেই ধর্ম্ম যতই কেন উচ্চ হউক না, সার্ব্বজনীন কখনো হইতে পারে না। সর্ব্বজনের যাহা নহে, তাহা সার্ব্বজনীন, ইহাতে অর্থ-বিরোধ ঘটে। ইচ্ছা করিলেই তুমি খৃষ্টীয়ান হইতে পার, তাহাতে কোনো বাধা নাই; এ কথা বলিলেও এই আপত্তির খণ্ডন হয় না। এখানে আমার ইচ্ছাই তবে এই সার্ব্বজনীনতার বিরোধী হইয়া আছে। এরূপ বস্তুকে কখনো সার্ব্বজনীন বস্তু বলা যায় না, বলা যাইতে পারে না। মনুষ্যত্ব সার্ব্বজনীন বস্তু; সমগ্র মনুষ্যমণ্ডলীকে অধিকার করিয়া এই বস্তু আছে। আমি ইচ্ছা করি আর না করি, এই মনুষ্যত্ব আমার, আমি এই মনুষ্যত্বের। সভ্য ও অসভ্য বড় ও ছোট, জ্ঞানী ও মূর্খ, সাধু ও অসাধু, সুস্থ ও অসুস্থ, সবল ও দুর্ব্বল, প্রৌঢ় ও শিশু, সকলেই এই সাধারণ মনুষ্যত্বের আশ্রিত, অঙ্গীভূত, অধীন। যে পঙ্গু সেও মানুষ, যে খঞ্জ সেও মানুষ। যে বোবা সেও মানুষ। এই জন্যই মনুষ্যত্ব সার্ব্বজনীন বস্তু। ইচ্ছা করিয়া তুমি মানুষ হইয়া জন্মগ্রহণ কর নাই; আর ইচ্ছা করিয়া এখন মনুষ্যত্বের বাহিরে যাইতেও পার না, থাকিতেও পার না। তুমি পশুর মত জীবন যাপন করিতে পার, মনুষ্যত্বকে অবমাননা করিতে পার, তোমার এই শ্রেষ্ঠ অধিকারকে অগ্রাহ্য করিতে পার, কিন্তু মনুষ্যত্ব তথাপি তোমাকে ছাড়িবে না। প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে মনুষ্যত্বের এই যে ঐকান্তিক অপরিহার্য্য সম্বন্ধ আছে, তারই জন্য মনুষ্যত্ব সার্ব্বজনীন বস্তু। যে ধর্ম্ম সমগ্র বিশ্বের মধ্যে এই ঐকান্তিক, এই অপরিহার্য্য সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে না, সে ধর্ম্ম কখনো বিশ্বজনীন বা সার্ব্বজনীন হইতে পারে না। হিন্দু যে ধর্ম্মে বিশ্বাস করে, তাহা সার্ব্বজনীন, এই জন্য সেই ধর্ম্মের বিশাল সম্বন্ধজালে জড় ও জীব সকলে সমান ভাবে বাঁধা রহিয়াছে। জলে সে ধর্ম্ম শৈত্য, অগ্নিতে উত্তাপ, সূর্য্যচন্দ্রনক্ষত্রাদিতে জ্যোতি, পৃথিবীতে পুণ্য গন্ধ। পক্ষীতে সে ধর্ম্ম পক্ষীত্ব, কীটে কীটত্ব, পতঙ্গে পতঙ্গত্ব, মানুষে মনুষ্যত্ব। এই জন্যই হিন্দুর ধর্ম্ম

সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধুঃ।

জড়, জীব, সকলেরই মধু। ইহা সহজ বস্তু, ইহা সার্ব্বজনীন বস্তু। ইহা বিশ্বজনীন তত্ত্ব।

ধর্ম্ম সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধুঃ—এখানেই ধর্ম্মের বিশালত্ব ও সার্ব্বজনীনত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রথমত ধর্ম্ম কেবল মনুষ্যের নহে, সর্ব্বেষাং ভূতানাং—সকল ভূতের সাধারণ সম্পত্তি। আর ইহা সকল ভূতের মধু। এই মধু শব্দের অর্থ অত্যন্ত গূঢ়।

মিষ্টত্বই মধুর ধর্ম্ম। যাহা মিষ্ট যাহা তৃপ্তিকর, তাহাই মধু। ধর্ম্ম সকল ভূতের মধু, অর্থ এই যে ধর্ম্মে সকল ভূতের পরম তৃপ্তিলাভ হইয়া থাকে। যাহাতে যে বস্তুর পরম তৃপ্তিলাভ হয়, তাহাই সে বস্তুর ধর্ম্ম।

আর প্রত্যেক বস্তুর নিজস্ব প্রকৃতি হইতেই তার তৃপ্তির কারণ উৎপন্ন হয়। বস্তু যখন আপনার প্রকৃতিকে প্রাপ্ত হয়, আপনার অন্তঃপ্রকৃতির চরিতার্থতা লাভ করে, তখনই তাহার পরম তৃপ্তিলাভ হইয়া থাকে। ধর্ম্ম সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধুঃ এই বলিয়া ধর্ম্মের মূল

তত্ত্ব নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া মহাভারত ধর্ম্মকে জীবের প্রকৃতির উপরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। আমি যা, তাতেই আমার তৃপ্তি হয়, আমি যা নই তাতে কখনো আমার তৃপ্তি হইতে পারে না। আমি ইন্দ্রিয়সম্পন্ন জীব, চক্ষুকর্ণরসনাদি আমার প্রকৃতির অঙ্গ, আমার প্রকৃতির তৃপ্তি সাধনের যন্ত্র। এই জন্য বিষয়রসে আমার তৃপ্তি হয়। যখন আমার প্রকৃতি এই সকল ইন্দ্রিয়কে ছাড়াইয়া যায়, তখন ইন্দ্রিয় সাহায্যে বিষয়ভোগ করাতে আমার যে তৃপ্তি হইত, এখন অতীন্দ্রিয়ের ধ্যান-ধারণাতে তদপেক্ষা অধিকতর, গভীরতর তৃপ্তিলাভ হইয়া থাকে। আমার প্রকৃতির স্ফূর্ত্তি ও সার্থকতাই এই তৃপ্তির কারণ ও অর্থ। ধর্ম্ম সকল ভূতের পরম তৃপ্তির কারণ, সকল ভূতের মধু, এই জন্য সে ধর্ম্মে সকল ভূতের আত্মপ্রকৃতির সার্থকতা লাভ হইয়া থাকে। ধর্ম্মের ভিতর দিয়া ভূতগ্রাম ভাগ্যবিবর্ত্তনে, আপনার প্রকৃতিকে ফুটাইয়া তোলে, আপনার প্রকৃতিকে প্রাপ্ত হয়। আর প্রত্যেক জীবের প্রকৃতির উপরে যখনই ধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়, তখনই এক দিকে ইহা সার্ব্বজনীন বস্তু হয়, ও অপর দিকে ইহার মধ্যে অধিকারীভেদে স্থান হইয়া থাকে। ফলত অধিকারীভেদ আছে বলিয়াই ধর্ম্ম সার্ব্বজনীন, আর সার্ব্বজনীন বলিয়াই তাহাতে অধিকারীভেদের প্রতিষ্ঠা সম্ভব ও আবশ্যক হয়।

শ্রীঃ

মাতৃহীনা

(গল্প)

কাঞ্চনপুরের রামদয়াল বসু সম্পন্ন গৃহস্থ। তাঁহার যথেষ্ট জোত জমা ছিল, সম্বৎসর প্রায় দুই 'খাদা' (৩২ বিঘা) জমিতে আবাদ হইত; দুটি আমকাঁঠালের বাগান, একটি কদলী ও শাক-শবজীর বাগান, ছোট-বড় তিনটি পুষ্করিণী, তন্মধ্যে একটি পুষ্করিণীতে প্রায় আধ মণ ওজনের পাকা 'রুই' পাওয়া যাইত। তাঁহার গোয়ালে যে কয়েকটি পয়স্বিনী গাভী ছিল, তাহারা বৎসরের অধিকাংশ সময়েই দৈনিক দশ বার সের দুধ দিত। রামদয়ালের স্ত্রী ক্ষান্তমণি সুদক্ষা গৃহিণী ছিলেন, তাঁহার গৃহিণীপণায় চঞ্চলা কমলা অচঞ্চল ভাবে তাঁহার গৃহে বাস করিতে ছিলেন। রামদয়ালের সোণার সংসার।

সংসারে পরিবার সংখ্যা নিতান্ত অল্প। রামদয়ালের তিন চারিটি পুত্র তিন চারি বৎসরের হইয়া পিতা মাতার মায়া কাটাইয়া চলিয়া গিয়াছিল, বড়টি বাঁচিয়া থাকিলে এত দিন বিশ বৎসরের হইত। ছেলে কটিকে যমের হাতে সঁপিয়া দিয়া তাঁহারা চারি বৎসরের একটি কন্যা পুঁটুকে লইয়া কোন রকমে পুত্রশোক ভুলিয়াছিলেন;

পুটু তাঁহাদের নয়ন পুত্তলি। সংসারে পুঁটুর আদরের সীমা ছিল না। পুঁটু 'মলে'র সঙ্গে জুতা পায়ে দিত, কাছা দিয়া কাপড় পরিত, এবং নাকে মুক্তার একটি নলক থাকিলেও পুরুষের মত সে কামিজ গায়ে দিত। স্ত্রী ও কন্যা ভিন্ন রামদয়ালের সংসারে এক বিধবা বৃদ্ধা পিসিমা ছিলেন, অন্য পরিবার ছিল না। তথাপি তাঁহার গৃহে দু'বেলা পঞ্চাশখানি পাতা পড়িত। ক্ষান্তমণি এত লোকের ভাত-ব্যঞ্জন একাকী রাঁধিতেন, পিসিমা নামে মাত্র তাঁহার সাহায্য করিতেন। প্রতিপাল্য পোষ্যগণকে ক্ষান্তমণি যখন অন্ন-ব্যঞ্জন পরিবেশন করিতেন, তখন তাঁহাকে দেখিলে মনে হইত মা অন্নপূর্ণা ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন বিতরণ করিতেছেন। তাঁহার নাসিকায় প্রকাণ্ড নথ, ললাটে একটি ক্ষুদ্র নীলবর্ণ উল্কী, মস্তকের নিবিড় কুন্তলদাম চূড়াকারে সম্মুখ দিকে বাঁধা, পরিধানে কস্তাপেড়ে সাড়ী; তাঁহার প্রকোষ্ঠে সুলোহিত শাঁখা ও করতলে স্তূপীকৃত অন্ন পূর্ণ থালা। পল্লী-বাসিনীরা বলিত, ক্ষান্তমণি তাঁহার ঘরের লক্ষ্মী।

রামদয়ালের বিধবা পিসি রামমণি বার্দ্ধক্যে নিতান্ত স্থবিরা হইয়া উঠিয়াছিলেন, তের বৎসর বয়সে বিধবা হইয়া তিনি ভ্রাতার সংসারেই প্রতিপালিত হইতেছিলেন। তিনি ভ্রাতার সংসারেই কর্ত্রী ছিলেন। ভ্রাতার মৃত্যুর পর তাঁহার প্রতিপালন-ভার ভ্রাতুষ্পুত্র রামদয়ালের স্কন্ধে পড়িল; দীর্ঘকাল সংসারের কর্ত্তৃত্ব করিয়া যখন তিনি 'পেন্সন' লইলেন তখন ক্ষান্তমণিকে অগত্যা সেই গুরুভার গ্রহণ করিতে হইল। পিসিমা তাঁহার বার্দ্ধক্যের প্রধান অবলম্বন হরিনামের ঝুলিতে মনপ্রাণ সমর্পণ করিলেন। কিন্তু পুঁটুর আক্রমণে তাঁহাকে হরিনামের ঝুলি লইয়া বড় ব্যতিব্যস্ত হইতে হইত! ঝুলি হইতে কোন দিন তাঁহার গঙ্গামৃত্তিকা খানি, কোন দিন তিলক কাটিবার চটাটি, কোন দিন বা তাঁহার টিনমোড়া চতুষ্কোণ ক্ষুদ্র আরসী খানি চুরি যাইত, এবং বিস্তর সাধ্যসাধনার পর পুঁটু গুপ্ত স্থান হইতে তাহা বাহির করিয়া দিত। যে দিন তিনি সন্ধ্যাকালে পুঁটুকে কোলের কাছে লইয়া রূপকথা না বলিতেন, তাহার পর দিনই এইরূপ অনর্থপাত হইত। তাঁহার উপর পুঁটুর দৌরাত্ম্যের সীমা ছিল না।

ক্ষান্তমণি পিতৃগৃহে অল্প লেখা-পড়া শিখিয়াছিলেন, কিন্তু বিলাসিতার সহিত কোন দিন তাঁহার পরিচয় হয় নাই। তিনি রামায়ণ মহাভারত কোন রকমে পড়িতে পারিতেন, নাটক নভেল বুঝিবার বিদ্যা তাঁহার ছিল না, সে প্রবৃত্তিও ছিল না। সমস্ত দিন গৃহকার্য্য করিয়া তিনি প্রায়ই অবসর পাইতেন না; কোন দিন একটু অবসর পাইলে সে সময়টুকু তিনি কাঁথা শেলাই বালিশের ওয়ার শিলাই প্রভৃতি সূচ কার্য্যে ক্ষেপণ করিতেন; কোন দিন রামায়ণ খানা খুলিয়া বসিতেন; পিসিমা হরিনামের ঝুলিটি হাতে লইয়া মালা ঘুরা-ইতে ঘুরাইতে পরম পবিত্র রামচরিতকথা একাগ্র মনে শ্রবণ করিতেন, পল্লীবিধবা-গণও সেখানে আসিয়া জুটিতেন। অবশেষে দিবসের সকল কার্য্য শেষ করিয়া রামদয়াল যখন শ্রান্ত দেহে গৃহে উপস্থিত হইতেন,

তখন ক্ষান্তমণি পুস্তক বন্ধ করিয়া তাঁহার হাত মুখ ধুইবার জল দিতেন, স্বামীর জন্য জলযোগের আয়োজনে ব্যস্ত হইতেন।

পুঁটু এতক্ষণ কোথায় থাকিত তাহার কেহ সন্ধান রাখিত না। কিন্তু রামদয়াল জল খাইতে বসিয়া "পুঁটু পুঁটু, আয়রে!"—বলিয়া যেমন ডাকিতেন, অমনই পুঁটু কোথা হইতে কালো কোঁকড়া চুলগুলি দুলাইতে দুলাইতে, মাটিতে আঁচল লুটাইতে লুটাইতে তাহার পিতার সম্মুখে আসিয়া বসিত!—ঘরে প্রচুর দুধ হইত; ক্ষান্তমণি স্বামীর জন্য ক্ষীর, সর, চাঁচির সন্দেশ প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া রাখিতেন। পিতার পাতে প্রসাদ না পাইলে পুঁটুর তৃপ্তি হইত না। পুঁটু কাছে বসিয়া না খাইলে রামদয়ালের মুখে কোনও জিনিস রুচিত না।

জলযোগ শেষ হইলে ঝি তামাক সাজিয়া আনিত। রামদয়াল হুঁকা লইয়া, বারান্দায় মাদুরের উপর তামাক খাইতে বসিতেন, পুঁটু তাঁহার জানুর কাছে বসিয়া অত্যন্ত ব্যস্ত ভাবে 'আগাডুম্ বাগাডুম্' খেলিত, পিতার সহিত কত অসম্বদ্ধ গল্প করিত। ক্ষান্তমণি গৃহে সন্ধ্যাদীপ দেখাইয়া পাকশালায় প্রবেশ করিতেন। এই ভাবে সাংসারিক কর্ত্তব্য পালন করিতে করিতে সুখশান্তি ও আনন্দে তাঁহাদের জীবনের দিনগুলি কাটিয়া যাইতেছিল, রামদয়ালের সংকল্প ছিল, পুঁটু আর একটু বড় হইলে তাহাকে সুপাত্রে সম্প্রদান করিয়া গৌরীদানের পুণ্য সঞ্চয় করিবেন; কিন্তু মানুষের সংকল্প সকল সময় কার্য্যে পরিণত হয় না, ভগবান রামদয়ালকে নিশ্চিন্ত হইতে দিলেন না। আষাঢ়ের একদিন মেঘান্ধকারপূর্ণ সন্ধ্যাকালে সহসা কোথা হইতে একটা উদ্দাম ঝটিকা আসিয়া রামদয়ালের গৃহের সোণার প্রদীপ এক ফুংকারে নির্ব্বাপিত করিয়া ফেলিল; ক্ষান্তমণি জীবনের মধ্যাহ্নে ভীষণ বিসূচিকা রোগে, সংসার রঙ্গমঞ্চের অভিনয় শেষ করিয়া দিব্যধামে প্রস্থান করিলেন। গৃহিণীর অভাবে রামদয়ালের গৃহ শ্মশানে পরিণত হইল। সংসারে পূর্ব্বে যাহা যেমন ছিল, তাহা তেমনই রহিল, কেবল এক জনের অভাব রামদয়ালের মনে হইতে লাগিল, তাঁহার সুখের কুঞ্জ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তাঁহার জীবন মরুময় হইয়াছে।

২

পুঁটু মায়ের বড় আদরিণী কন্যা ছিল। মায়ের শোক সে সহজে ভুলিতে পারিল না। তাহার বয়স তখন পাঁচ বৎসর, পাঁচ বৎসরের মেয়ে সংসারে মা ছাড়া আর কাহাকেও বড় চিনিত না। মাতৃবিয়োগের পর তাহার চরিত্রের বড় পরিবর্ত্তন হইল। পূর্ব্বে সে সমস্ত দিন পল্লীবাসিনী প্রতিবাসিনী বালিকাদের সঙ্গে খেলা করিয়া বেড়াইত, আহারের সময় ভিন্ন অন্য সময় তাহাকে দেখিতে পাওয়া যাইত না; পাড়ায় তাহাদের অগম্য স্থান ছিল না। একমাত্র কন্যা বলিয়া সে পিতামাতার অত্যধিক আদর লাভ করিয়াছিল, তাহাকে পিতামাতার তাড়না সহ্য করিতে হইত না। এক এক দিন পুঁটু রান্নাঘরের দাওয়ায় বসিয়া মহা উৎসাহে খেলা ঘরের রন্ধন কার্য্যে মনোনিবেশ করিত। সুর্কী, বালি, কাদা, তেলাকুচার ফল, পৈ'মুচড়ি', 'ঘোলমৌনির'

লাল লাল ফল, তাহার ভাত মাছ ডাল, তরকারী দধি দুগ্ধের স্থান অধিকার করিত। কোন কোন দিন সে হাসি মুখে তাহার পিতামাতাকে তাহার 'বেটা'র বিবাহের বৌভাতে নিমন্ত্রণ করিত। মা তাহার আয়োজন দেখিয়া বলিতেন, "পুঁটু আমার বেঁচে থাক্‌লে খুব ভাল গিন্নি হবে।" রামদয়াল বলিতেন, "হাঁ, ওর শ্বশুর শাশুড়ী ওর হাতের রান্না খেয়ে কখন ভুল্‌তে পারবে না। মাটীর সন্দেশ, সুরকীর চচ্চড়ি, তেলাকুচার ঘণ্ট, বালির পায়স, পুঁটু খুব ভাল রেঁধেছে; তোর রান্না চমৎকার হয়েছে পুঁটু!"—পিতার প্রশংসায় আনন্দে ও লজ্জায় পুঁটুর ফুলের মত গাল দু'খানি লাল হইয়া উঠিত; কিন্তু সে হঠাৎ গম্ভীর হইয়া বলিত, "এখনও মার মত ভাল রাঁধ্‌তে শিখিনি, পান তৈয়েরীও খুব ভাল হয় না; এই দেখ বাবা, আমার পান!"—পুঁটু সেটে আলুর পাতা সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল, তাহাই পিতাকে দেখাইত।

মা বলিতেন, "পুঁটু, এখন তোর রান্না-বান্না রেখে দে, অনেক বেলা হয়েছে, ভাত খাবি আয়।"

পুঁটু বলিত, "তুমি বলো কি মা? আজ যে আমার বেটার বিয়ের বৌভাত, পাঁচ জনকে 'নেমন্তন্ন' করেছি, তাদের খাওয়া দাওয়া না হতেই আমি খেয়ে বসে থাক্‌বো! এখনো যে আমার 'আন্নিক' (আহ্নিক) হয় নি!"

পুঁটু তাহার বুড়ো দিদি রাসমণিকে আহ্নিক পূজা করিতে দেখিত, তাঁহার দেখাদেখি সে মধ্যে মধ্যে একখানি কুশাসন পাতিয়া তাহার উপর পূজাসনে বসিত, খেলিবার গেলাসে সে এক গেলাস জল লইয়া সেই জলে মাটি গুলিয়া তিলক কাটিত, বিড়বিড় করিয়া মন্ত্র পড়িত, দশবার মাটিতে মাথা ঠুকিয়া প্রণাম করিত; একটু নেকড়া হরিনামের ঝুলির মত করিয়া বাঁধিয়া, তাহার মধ্যে ক্ষুদ্র হাত খানি রাখিয়া এক গাছি কাঠের মালা ঘুরাইত, মধ্যে মধ্যে তাহা ললাটে স্পর্শ করিত। মা যদি বলিতেন, "পুঁটু, আমার গামছা খানা নিয়ে আয় ত মা!" অমনি পুঁটু রাগ করিয়া ঠোঁট ফুলাইয়া বলিত, "আমি এখন জপে বসেছি, আমাকে কিছু ব'লো না।"

রামদয়াল বাবু মধ্যাহ্নে আহারাদির পর কিছু কাল বিশ্রাম করিতেন, এক এক দিন পুঁটু হঠাৎ তাহার সঙ্গিনীদের ছাড়িয়া তাহার পিতার মাথার কাছে আসিয়া বসিত, এবং তাঁহার কেশবিরল মস্তকে ধীরে ধীরে হাত বুলাইত। সেই স্নেহ-স্পর্শে রামদয়াল চক্ষু খুলিয়া দেখিতেন, পুঁটু তাঁহার মাথার কাছে বসিয়া খিলখিল করিয়া হাসিতেছে!

রামদয়াল সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিতেন, "খবর কি পুঁটু? আমার মাথার উপর তোর নজর পড়লো কেন?"

পুঁটু বলিত, "বাবা, সৈ আমার বৌ কেড়ে নিয়েছে, গয়নাগুলোও সব ফেরত নিয়েছে। আমাকে একটা মেয়ে কিনে দেবে বাবা? আর আমাকে এক গাছা ফুতির মালা কিনে দিয়ো; আমার বেটার জন্যে পূজোয় একটা ভাল পোষাক চাই।"

রামদয়াল বলিতেন, "ওরে বুড়ী, তাই বুঝি আমার মাথায় হাত বুলোতে এসেছিস্? তোর হাড়ে হাড়ে নষ্টামি!"

রাসমণি বলিতেন, "কলির মেয়ে কি না কেমন করে কাজ আদায় করতে হয় তা এরই মধ্যে শিখেচে!"

পুঁটু বলিত, "না বাবা, তোমার মাথাটা উস্‌কো খুস্‌কো হয়ে আছে, আমি চিরুণ এনে তোমার মাথায় সিঁতি কেটে দিই।"

রামদয়াল হাসিয়া বলিতেন, "আমার টাকে সিঁতি কাটবি? তোর সাহস ত খুব!"

* * * * * *

কিন্তু সে দিন আর নাই। মায়ের মৃত্যুর পর পুঁটুর সেই সদাপ্রফুল্লভাব অন্তর্হিত হইয়াছিল। শৈশবেই তাহার শৈশব-চাঞ্চল্য দূর হইয়াছিল। প্রথম প্রথম সে মায়ের জন্ত বড় কাঁদিত; কিছু দিন পরে সে আর তেমন কাঁদিত না বটে, কিন্তু এক স্থানে বসিয়া কি যেন ভাবিত; এক এক সময় সে চুপে চুপে নির্জ্জন ঘরের মধ্যে গিয়া দাঁড়াইত, যেন তাহার ব্যাকুল দৃষ্টি চারিদিকে কাহাকে খুঁজিত! তাহার পিতার শয়ন কক্ষে খাটের পাশে দেওয়ালে তাহার মায়ের একখানি বড় 'ফটো' টাঙ্গানো ছিল। ক্ষান্তমণি দুই বৎসর পূর্ব্বে পুঁটুকে কোলে লইয়া ছবিখানি তুলাইয়া ছিলেন। মায়ের সেই ছবির দিকে চাহিয়া চাহিয়া তাহার চক্ষু দুটি জলে ভরিয়া উঠিত, তাহার প্রাণ হাহাকার করিয়া উঠিত, তাহার ইচ্ছা হইত, একবার সে তেমনই করিয়া মায়ের কোলে গিয়া বসে! সেই সময় দৈবাৎ তাহার পিতা সেই কক্ষে উপস্থিত হইলে সে তাড়াতাড়ি খাটের পাশে মুখ গুঁজিয়া দাঁড়াইত। পিতা যদি সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিতেন, "কি হয়েছে পুঁটু?"—অমনই পুঁটু ফুঁপাইয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিত; রামদয়ালের চক্ষুও সিক্ত হইয়া উঠিত।

ক্ষান্তমণির মৃত্যুর পর রাসমণি বড়ই বিপদে পড়িলেন। রামদয়ালকে দু বেলা দুটি রাঁধিয়া দিতে তাঁহার প্রাণান্ত হইবার উপক্রম হইল, তাঁহার পূজার্চ্চনারও বড় ব্যাঘাত ঘটিতে লাগিল। তিনি বুঝিলেন, এ ভাবে বেশী দিন কাটিতে পারে না, সংসারের একটি অভিভাবিকা না হইলে আর চলিতেছে না। তিনি আর কয় দিন? তাঁহার অভাবে কে রামদয়ালের সেবা-শুশ্রূষা করিবে? পরিচারিকারা পর মাত্র, তাহারা স্বার্থ চিন্তাতেই ব্যস্ত থাকে, তাহাদের দ্বারা কতটুকু কাজ পাওয়া যায়? বিপদে আপদে তাহাদের উপর কি নির্ভর করিতে পারা যায়?—সুতরাং পিসিমা স্থির করিলেন, রামদয়ালের আর একটি বিবাহ দিতে হইবে, একটি নূতন বৌ ঘরে না আনিলে সংসার চির দিন 'হোটেলখানা' হইয়া থাকিবে; আর রামদয়ালের বয়সই বা এত বেশী কি, দুই কুড়ি তিন বৎসর বৈ ত নয়! এ বয়সে বিবাহ না করিলে চলিবে কেন?

৩

ক্ষান্তমণির মৃত্যুর পর দুই মাস চলিয়া গেল। রাসমণি মধ্যে মধ্যে রামদয়ালকে বিবাহের কথা বলেন, কিন্তু রামদয়াল অত্যন্ত অন্যমনস্ক, সে কথা কানে তোলেন না। অবশেষে পিসিমা রামদয়ালের বন্ধু গ্রাম্য স্কুলের প্রধান পণ্ডিত ত্রিলোচন কাব্য-তীর্থের শরণাগত হইলেন।

ত্রিলোচন রামদয়ালের বাল্য বন্ধু;

তাঁহার সহিত রামদয়ালের অনেক কথা হইত। ত্রিলোচনের ইচ্ছা রামদয়াল বিবাহ করিয়া পুনর্ব্বার সংসারী হন; তিনি রামদয়ালের নিকট ইঙ্গিতে তাঁহার মনের ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন; পিসিমার অনুরোধের পর তিনি রামদয়ালকে বিবাহের জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। রামদয়াল বলিলেন, আর কেন ভাই? আমাদের বাঙ্গালীর 'বল বুদ্ধি ভরসা, চল্লিশ হলেই ফরসা।'—চল্লিশ পারিয়েছি, এখন কোন রকমে আর দশ-বারোটা বছর চোক কান বুঁজে কাটাতে পারলেই পাড়ি জমাতে পারি। এই দশবারো বৎসরের জন্য কেন আর একটা দুগ্ধপোষ্য বালিকাকে গলায় বেঁধে সংসার সমুদ্রে ডুবিয়ে মারবো?—আরও এক কথা, বিবাহ করলেই মেয়েটা পর হয়ে যাবে। মাপ্ কর ভাই, এ কাজটি আমাকে দিয়ে হবে না।"

এই ভাবে একটি বৎসর কাটিয়া গেল। দুশ্চিন্তায় পিসিমার মাথার সমস্ত চুল সাদা হইয়া গেল, তাঁহার শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল।

পর বৎসর জ্যৈষ্ঠমাসে ক্ষান্তমণির এক মাতুল কয়েক দিনের জন্য রামদয়ালের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। তাঁহার বাড়ী কাঞ্চনপুর হইতে কয়েক ক্রোশ দূরে, কাঞ্চনপুরে তাঁহার কিছু পৈতৃক লাখরাজ জমি ছিল, তিনি তাহারই বন্দোবস্ত করিতে আসিয়াছিলেন; তাঁহার হঠাৎ কাঞ্চনপুরে আসিবার অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল কি না প্রকাশ নাই। এত বড় সংসারটা একটি স্ত্রীলোকের অভাবে নষ্ট হইয়া যাইতেছে দেখিয়া তাঁহার আক্ষেপের সীমা রহিল না। তিনি রামদয়ালকে বিবাহের জন্য পীড়াপীড়ি করিলেন। পিসিমার সঙ্গেও তাঁহার যুক্তি-পরামর্শ চলিতে লাগিল; কিন্তু রামদয়ালের সেই এক কথা,—একটি গরীবের ছেলের সঙ্গে পুঁটুর বিবাহ দিয়া জামাইটিকে পৈতৃক ভিটায় বসাইয়া তিনি কাশীবাসী হইবেন। বিবাহে রুচি নাই, তাহা কর্ত্তব্যও নহে।

কিন্তু মিত্র মহাশয় কাব্যতীর্থ নহেন, তাঁহাকে নিরস্ত করা কঠিন হইল। মামা-শ্বশুর মিত্তিরজা আহারান্তে বাঁধা হুঁকায় অম্বরী তামাক টানিতে টানিতে বলিলেন, "বাবাজী, তোমাদের বয়সই বা এমন কি হয়েছে, ছেলে মানুষ বল্লেই হয়, এ বয়সে এ রকম বৈরাগ্য নিতান্ত পাগলামি। এই দেখ না কেন আমাদের নারায়ণপুরের জমীদার পদ্মলোচন বাবু তেষট্টি বৎসর বয়সে চতুর্থ পক্ষে আবার কেঁচে গণ্ডুষ কল্লেন, হাইকোর্টের উকীল জনার্দ্দন বাবুর ধী শক্ত নাম, জাজ্জ্বল্যমান সংসার, সংসারে ছেলে মেয়ে নাতি পুতি সকলই বর্ত্তমান, তবু গিন্নি রোগা বলে ৬০র বৎসরের একটি বৌ ঘরে এনেছেন! তাঁরা কি অবিবেচক, ভাল মন্দ বুঝতে পারেন না? ভেবে দেখ দেখি বাপু, কঠিন ব্যারাম হ'লে, বুড়ো বয়সে শরীর অক্ষম হয়ে পড়লে কে তোমাকে দেখ্‌বে, কে 'তাগত' করবে, কে তোমার মুখে দুটি ভাত তুলে দেবে? কথায় বলে "শরীরং ব্যাধিমন্দিরং"—আজ তুমি ভাল আছ, রক্তের জোর আছে, কাল পড়ে যেতে পার; তখন ত একজন সেবা-শুশ্রূষার লোক চাই। চাকর-চাকরাণীদের দিয়ে

যদি অসময়ে সেবা চলতো তা'হলে আর ভাবনা ছিল কি?

বাবাজী বলিলেন, "মামা, সকলের রুচি এক রকম নয়, মুনসেফ পরেশ বাবু সাত ছেলের বাপ, পরিবার মারা যেঁতে না যেতে অশৌচ হতে না হতে পনের বছরের একটা ধাড়ী মেয়ে কোথা থেকে লুকিয়ে বিয়ে করে এলেন, ছেলে-মেয়েগুলিকে পর করলেন! আবার রাজপুত্র প্রমোদকিশোরের বাইশ বৎসর বয়সে পত্নী বিয়োগ হলো, তিনি ব্রহ্মচর্য্য আরম্ভ করলেন; মাছ খান না, হবিষ্য করেন! রুচির কথা নিয়ে তর্ক তুলে কোন লাভ নেই। তবে সত্তর বৎসর বয়সেও যাঁরা দশ বছরের নলক-পরা বধূ ঘরে এনে খুব বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেন, নূতন করে সংসার পাতেন, তাঁদের মতের সঙ্গে আমার মত মেলে না। আমার যা গিয়েছে—তা আর ফিরে আস্‌বে না, যদি আস্‌তো তবে তা যেতো না। সে অভাব যখন কখনই পূরণ হবে না, হবার আশা নেই, তখন খেয়ার কড়ি দিয়ে কেন ডুবে পার হই? আপনি আমাকে আর এ অনুরোধ করবেন না।"

মিত্তির জা ভাগিনেয়ীটির শোকে আকুল হইয়া উঠিলেন, কলাপাতার নলটা হুকার মুখ হইতে খসিয়া পড়িল, বস্ত্রপ্রান্তে তিনি চক্ষু মার্জ্জনা করিলেন, তাহার পর কিঞ্চিৎ সাব্যস্থ হইয়া বলিলেন, "বাবাজী ঠিক কথাই বলেছ; যেমনটি যায় তেমনটি আর আসে না। বিশেতঃ মা ক্ষান্ত আমাদের সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণার মত ছিল, মামা-মামীর প্রতি তার ভক্তি কত ছিল! সে অভাব কখন পূরণ হবে না তা জানি, আর পরের মেয়ে ঘরে আন্‌লে পুঁটুরাণী যে পর হয়ে যাবে এ কথাও ঠিক। কিন্তু পুঁটু বড় হয়ে 'সময় অসময়ে' তোমার যে করবে, এ আশাও করো না; সংসারে আর পাঁচটা দেখ্‌চি কি না! ওর ঈশ্বর ইচ্ছায় দুটো ছেলে মেয়ে হবে, তাদের নিয়েই ব্যস্ত থাক্‌বে না বুড়ো বাপকে দেখ্‌বে? আমি বাপু, তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী,অনেক বিবেচনার পর একটা সংযুক্তি স্থির করেছি। আমার ইচ্ছা আমার ছোট মেয়ে কিরণশশীকে তোমার হাত দিয়ে যাই, খাসা গোছালো মেয়ে, তোমার যেমন সংসার শূন্য, সে তার ঠিক উপযুক্ত। তার রূপ গুণের কথা আর কি বলবো, বয়সও এই চৌদ্দ পার হয়েছে। কুলীনের ঘরের মেয়ে, ন দশ বছর বয়সে বিয়ে দিয়ে উঠ্‌তে পারিনি। বিশেষ মেয়েটির উপর বড়ই মায়া, ছোট মেয়ে কি না! আর সে পুঁটুকেও খুব যত্ন টত্ন করবে, পুঁটুর মার মামাতো বোন, তার পর ত নয়। পুঁটুকে ঠিক মায়ের মতই দেখ্‌বে। দেখ বাবা আমার এই অনুরোধটা তোমাকে রাখ্‌তেই হবে, তোমার মঙ্গলের জন্যই এ কথা বলছি; আমার ভগিনীপতি—তোমার শ্বশুর ঘোষজা বেঁচে থাকলে তিনিও আজ এ জন্য তোমাকে অনুরোধ করতেন! তুমি আমার কথায় রাজী না হলে তোমাকে ছাড়চিনে।"—মিত্তিরজা খপ্‌ করিয়া রামদয়ালের হাত জড়াইয়া ধরিলেন —পিসিমা আড়ালে দাঁড়াইয়া সকল কথাই শুনিতেছিলেন, তিনি সময় বুঝিয়া রামদয়ালের সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, "বাপের তুল্য 'বেক্তি', হাত ধরে অনুরোধ করচে, কথাটা ঠেলো না বাবা।

কথায় বলে, 'কাচা কাপড়, যাচা মেয়ে, যে ছাড়ে সে অলপ্পেয়ে' !''

রামদয়ালের হঠাৎ সন্দেহ হইল, লাখরাজি জমীর বন্দোবস্ত করিতে আসা একটা উপলক্ষ্য মাত্র, তিনি মেয়ের বিবাহের ঘটকালী করিতেই কাঞ্চনপুরে আসিয়াছেন !—রামদয়াল ইতস্ততঃ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন অন্য কোথাও কি আপনার কিরণশশীর উপযুক্ত পাত্র যুটচে না ? আমার মত আধ্‌-বুড়োর হাতে তাকে সমর্পণের জন্য এত ব্যস্ত হয়েছেন কেন ?"

মিত্তিরজা বলিলেন, "আমার মেয়ের পাত্রের অভাব ! বলই বা কি আর কও-ই বা কি ? হরিশ্চন্দ্রপুরের চৌধুরী জমীদার-দের সঙ্গে তার বিয়ের 'কথা-কথন' চল্‌চে। মস্ত ধনী লোক তারা, দরজায় তিনটে হাতী বাঁধা ! মেয়েকে বাঁউড়ী সুট গহনা দেবে। আর ছেলেটি যেন কার্ত্তিক, বাঙ্গালা স্কুলে বোধোদয় শেষ করে আখ্যানমঞ্জরী পড়চে ! তা কিরণশশী কোলের মেয়ে, গিন্নি অত দূরে বিয়ে দিতে রাজী নন। আর সত্যি কথা বল্‌তে কি, অত বড় লোকের ঘরে কাজ করতে আমারও মন সরচে না। মেয়ের সঙ্গে একবার দেখা করতে হলে বেয়াইএর কাছে চারদণ্ড উমেদারী করতে হবে।"

প্রকৃত কথা এই যে, কিরণশশীর রূপ থাকিলেও মিত্তিরজার অর্থ ছিল না। একালে ভদ্রসমাজে কেবল মেয়ের রূপে 'চিঁড়া ভেজে না'। রূপ ত চাই-ই, সঙ্গে সঙ্গে রূপচাঁদও চাই। মিত্তিরজা যেখানেই বিবাহের সম্বন্ধ করিয়াছেন, সেখান হইতেই তিন চারি হাজার টাকার ফর্দ্দ আসিয়াছে। রামদয়ালের সাংসারিক অবস্থা ভাল, কোন রকমে সাত পাকটা দিতে পারিলে বিষয় সম্পত্তি সমস্তই তাঁহার মেয়ের হইবে। এত বড়, প্রলোভন, বৈষয়িক লোক হইয়া তিনি কিরূপে ত্যাগ করেন ? রামদয়ালের বয়স আর দশ বৎসর অধিক হইলেও তাঁহার এ বিবাহে আপত্তি ছিল না।

রামদয়াল বড় গোলে পড়িলেন, মিত্তির-জার প্রস্তাবে হঠাৎ রাজী হওয়া কঠিন, কিন্তু তাঁহার হাত ছাড়ানো আরও কঠিন। তাঁহার প্রধান ভয় নূতন গৃহিণী আসিয়া তাঁহার পুঁটুকে পর করিয়া দিবে। কিন্তু মিত্তিরজার কন্যা পুঁটুর মাসী, মাসী যদি জননীর স্থান অধিকার করে, তবে সে কি তাহার ভগিনীর কন্যাকে ফেলিতে পারিবে ? রামদয়াল ভাবিতে লাগিলেন, তাঁহার মন অনেকটা নরম হইল, কিন্তু হঠাৎ শেষ উত্তর দিতে পারিলেন না; বলিলেন, "বিবাহে আমার আদৌ ইচ্ছা নাই, তবে দিন কত ভাবিয়া দেখি, আপনাকে আজই কথা দিতে পারিব না।"

বাবাজীর মন অনেকটা নরম হইয়াছে বুঝিয়া মিত্তিরজা কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন। তিনি রাত্রে বেয়ানকে বলিলেন, "বুঝেছ বেয়ান, বাবাজীত নিমরাজী হয়েছেন, কিন্তু এখনও পুরো রাজী করতে পারিনি। এ কালের ছেলে পিলের ঐ যেন কি এক রকম স্বভাব, কোন মতে গোঁ ছাড়তে চায় না। এ দিকে সংসারটা যে ব'য়ে যায় তার কি ? তোমার বাপ বড় বাপের ভিটের

আলো দিবার ত মানুষ চাই ! মেয়ের বিয়ে দিয়ে জামাই এনে বাড়ীতে বসালে কি বাপদাদার নাম রক্ষে হয়, না দুধের 'তেষ্টা' ঘোলে মেটে ? বাপপিতামহ জলগণ্ডুষের প্রত্যাশা করেন। রামদয়াল ছেলে মানুষ, বুদ্ধি শুদ্ধি ত পরিপক্ক হয় নি, চুল না পাকলে বুদ্ধি পাকে না। রামদয়ালের ভয়, বিয়ে করলে পাছে মেয়েটি পর হয়ে যায় ! তা, তুমি ওকে বুঝিয়ে সুজিয়ে রাজী কর, আমার কিরণশশী দুষ্টু মেয়ে নয়, পুঁটুকে সে ঠিক মেয়ের মতই দেখ্‌বে। আমার ইচ্ছা, শ্রাবণ মাস পড়তে পড়তেই শুভকর্ম্মটা শেষ হয়ে যাক্।"

পিসিমা বলিলেন, "যেমন করেই হোক, বিয়েটা শীগ্‌গির শীগ্‌গির দিয়ে ফেলতে হচ্চে, রামের বিয়ে না দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে মরতে পারবো না। যেমন করেই হোক আমি তার মত করবো বেয়াই, তুমি ভেবো না। তোমার মেয়ে আন্‌বো সে ত ঘরেরই কথা।"

সেই রাত্রেই পিসিমা কাঁদিয়া কাটিয়া রামদয়ালকে রাজী করিলেন। পরলোক-গতা পত্নীর উজ্জ্বল স্মৃতি পুনঃপুনঃ তাঁহার মর্ম্ম পীড়িত করিতে লাগিল; কিন্তু নিদারুণ দুর্ভাবনার মধ্যেও রামদয়াল একটু সান্ত্বনা লাভ করিলেন, মামাশ্বশুরের কন্যাকে বিবাহ করিলে সে তাঁহার পুঁটুকে পর করিতে পারিবে না। সে যে পুঁটুর মাসি !

মিত্তিরজা পর দিন বেয়ানের মুখে শুনিলেন, রামদয়াল বিবাহে সম্মত হইয়াছেন।—তিনি অকূল সাগরে কূল পাইলেন।

৪

শ্রাবণ মাস পড়িতে না পড়িতে রামদয়াল কন্যাদায়গ্রস্ত বৃদ্ধ মিত্তিরজার স্কন্ধ হইতে দুশ্চিন্তার বোঝা নামাইয়া নিজ স্কন্ধে গ্রহণ করিলেন, কিরণশশীকে বিবাহ করিয়া ঘরে আনিলেন।

কিরণশশী সুন্দরী না হইলেও তাহাকে কুরূপা বলা যায় না, কান্তমণি তাহার অপেক্ষা অনেক অধিক রূপবতী ছিলেন; কিন্তু রামদয়াল যে বয়সে কিরণশশীকে বিবাহ করিয়া আনিলেন সে বয়সে রূপের মোহ প্রায়ই কাটিয়া যায়, তখন মানুষের হৃদয় গুণেরই পক্ষপাতী হইয়া উঠে। পিসিমা দেখিলেন বৌটি পরম গুণবতী। সে সকালে উঠিয়া গোময় দিয়া পিসিমার তুলসীমঞ্চ নিকাইত, তাঁহার 'আকাচা' কাপড় কাচিয়া দিত, তাঁহার রন্ধনের যোগাড় করিয়া দিত, আবার বৈকালে তাঁহার পাকা চুল তুলিয়া দিত; এত গুণের বৌ কি কারও হয় ? রামদয়ালও দেখিয়া শুনিয়া ক্রমে কিরণশশীর পক্ষপাতী হইয়া উঠিলেন, বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে বধূর প্রতি তাঁহার হৃদয়ে সহানুভূতির সঞ্চার হইয়াছিল; যে হরিশ্চন্দ্রপুরের চৌধুরী জমীদারের পুত্রবধূ হইয়া 'বাঁউড়ী সুট' গহনা পড়িয়া জীবন সার্থক করিতে পারিত, সে তাঁহার ন্যায় প্রৌঢ়ের গলে বরমাল্য অর্পণ করিয়া তাঁহার দুঃখকষ্ট অসুবিধার সঙ্গিনী হইল, দয়ার্দ্র হৃদয় রামদয়ালের দয়া ও সহানুভূতি ক্রমে দাম্পত্য প্রেমের শূন্য আসনের দিকে অগ্রসর হইল, তিনি পর-লোকগতা পতিব্রতা পত্নী কান্তমণির কথা ধীরে ধীরে ভুলিতে লাগিলেন।

কিন্তু পুঁটু তাহার নূতন মায়ের সহিত তেমন অসঙ্কোচে মিশিত না; কোন দিন তাহাকে মন খুলিয়া কোন কথা বলিত না। পূজার সময় সে দেখিল, নূতন মা তাহার মায়ের তোরঙ্গ খুলিয়া বারাণসী সাড়ীখানি বাহির করিয়া লইয়া পরিল, তাঁহার গহনাগুলি সমস্তই গায়ে দিল—তাহার পর পল্লীবাসীদের সঙ্গে দত্তবাড়ী আরতি দেখিতে গেল। সে তাহাকে ডাকিল না, পুঁটুও সঙ্গে যাইতে চাহিল না। সে বারান্দার পৈঠায় মলিন মুখে বসিয়া রহিল।

দুই বৎসর পূর্ব্বের কথা পুঁটুর মনে পড়িল। সেও এই রকম পূজার দিন। তাহার মা এই বারাণসী সাড়ীখানি পরিয়া নানা অলঙ্কারে সাজিয়া ও পুঁটুকে সাজাইয়া তাহাকে কোলে লইয়া আরতি দেখিতে গিয়াছিলেন। আজ মা কোথায়? আজ কেহ তাহাকে সাজায় না, কেহ তাহাকে গহনা পরাইয়া দেয় না। পুঁটু খাইতে না চাহিলে কেহ তাহাকে আদর করিয়া ডাকিয়া খাইতে দেয় না; কেহ তাহার রুক্ষ চুলগুলিতে হাত দেয় না। মা বলিতেন 'আহা, আমার পুঁটুর কেমন চুল! এমন চুল আর কাহারও নয়।'—অনেক দিনের কথাটা পুঁটুর মনে পড়িল, সে আর কোন মতে আত্মসংবরণ করিতে পারিল না। সে সেই সোপান প্রান্তে পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।—তাহাকে কাঁদিতে দেখিয়া বুড়ো দিদি রাগ করিয়া বলিলেন, "আজ তোর হলো কি?—নাঃ দিনরাত এমন ঘ্যান ঘ্যান প্যানপ্যান ভাল লাগে না। আজ 'বছরকার' দিন এমন দিনে ভরা সন্ধ্যা-বেলা কাঁদ্‌লে অলক্ষণ হবে যে!"—হায়! ঠাকুর মাও আজ তার দুঃখ অভিমান বুঝিলেন না! মা হারাইয়া সে সংসারে বুঝি সকলই হারাইয়াছে। পুঁটু কাঁদিয়া কাঁদিয়া সানের উপর ঘুমাইয়া পড়িল।

সে দিন মহাষ্টমী। মধ্যাকাশ হইতে শরতের অর্দ্ধচন্দ্র সুবিমল রজতকিরণ বর্ষণে চরাচর প্লাবিত করিতেছিলেন। পূজাবাড়ীতে মহা উৎসাহে সন্ধিপূজার ঢাক বাজিতেছিল, পাড়ার ছেলেমেয়েরা মনের মত পোষাক পড়িয়া মনের আনন্দে পূজা দেখিতে যাইতেছিল। রুক্ষকেশা, মলিনবস্ত্রপরিহিতা অনাদৃতা অভিমানিনী পুঁটু একাকী সানের উপড় পড়িয়া স্বপ্ন দেখিল, মা যেন আকাশে চাঁদের পাশে লুকাইয়া হাসিতেছেন, হাসিয়া হাসিয়া ডাকিতেছেন, 'আয় মা, আয়! যদি জ্বালা জুড়াতে চাস্ তবে আমার কোলে আয়!"—কিন্তু পুঁটু অত উঁচুতে উঠিবে কিরূপে? মায়ের কোলে যাইবার জন্য সে স্বপ্নে অস্থির হইয়া উঠিল, কিন্তু তাহার আশা পূরিল না; তাহার মুদিত চক্ষু হইতে দুই বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। সুশীতল নৈশ সমীরণ অদূরবর্ত্তী রজনীগন্ধার ঝাড় হইতে মধুর সৌরভ বহন করিয়া পুষ্পগন্ধে পুঁটুকে মায়ের আদরের ন্যায় আচ্ছন্ন করিল, তাহার অযত্নবর্দ্ধিত রুক্ষ কেশদাম লইয়া খেলা করিতে লাগিল।

মাতার মৃত্যুর পর হইতে পুঁটু তাহার পিতার কাছে খাটের উপর রাত্রে

শয়ন করিত। বাপের কাছে না শুইলে ভয়ে তাহার ঘুম হইত না। সন্ধ্যার পর পুঁটু জাগিয়া দেখিল নূতন মা আরতি দেখিয়া ঘরে ফিরিয়াছে, বস্ত্রালঙ্কারগুলি খুলিয়া বাক্সে তুলিয়া রাখিতেছে, পুঁটু দীন নেত্রে একবার সেই দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে খাটের নিকটে গিয়া দাঁড়াইল।

কিরণশশী জিজ্ঞাসা করিল,—কি লা পুঁটি, ওখানে এসে দাঁড়ালি কেন?

পুঁটু বলিল, "বাবার বিছানায় শোব।"

কিরণশশী মুখ ভঙ্গী করিয়া বলিল, 'আর খাটে শুতে হবে না। সমস্ত দিন ধূলো-কাদা ঘেঁটে, যেখানে সেখানে মাটিতে গড়িয়ে বেড়াবেন, আর সন্ধ্যাবেলায় খাটে শুতে আসবেন। হাবাতে মেয়েটাকে নিয়ে কি জ্বালাতেই পড়েছি! যা এখান থেকে, তোর বুড়ো দিদির কাছে শুয়ে থাক্‌গে। আমি তোর জন্যে তিন দিন অন্তর বিছানার চাদর বদলাতে পারিনে, আদর দিয়ে দিয়ে মেয়েটাকে একেবারে মাথায় চড়িয়েছে, স্বর্গে বাতি দেবেন!"

পুঁটু নড়িল না, খাটের বাজু ধরিয়া ছবির মত দাঁড়াইয়া রহিল। চোখের জলে সে কিছু দেখিতে পাইল না।

কিরণশশী গর্জ্জন করিয়া বলিল, "তবু ঐখানে খুঁটির মত দাঁড়িয়ে রৈলি! কথা বল্লে শুনিস্‌নে কেন? বেরো ঘর থেকে।"

কিরণশশী তাহার ডানা ধরিয়া শয়ন কক্ষের দ্বারের দিকে সরাইয়া দিল।

পুঁটু কাঁদিতে কাঁদিতে চণ্ডীমণ্ডপে তাহার পিতার নিকট গেল। রামদয়াল তখন চণ্ডীমণ্ডপে ফরাসের উপর বসিয়া কয়েক জন প্রজার সঙ্গে জমীসংক্রান্ত কি কথা বলিতেছিলেন, তাহাদিগকে বিদায় দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "পুঁটু কি হয়েছে রে, কাঁদচিস্ কেন?"

পুঁটু প্রথমে কোন উত্তর দিল না, অনেক পীড়াপীড়িতে বলিল, "নূতন মা বকেচে, আমাকে খাটে শুতে দেবে না।"

রামদয়াল দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন, অনেক দিন হইতেই তাঁহার মনে হইতেছিল বিমাতা কখন মাতার অভাব পূর্ণ করিতে পারে না। দুই একটি ঘটনা দেখিয়া তিনি বুঝিয়াছিলেন পুঁটুর প্রতি কিরণশশীর কিছুমাত্র স্নেহ নাই। অদ্য পত্নীর ব্যবহারে তিনি বড় বিরক্ত হইয়া উঠিলেন; কিন্তু কোন কথা না বলিয়া পুঁটুকে কোলে লইয়া শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন। ধূলোমাখা ধেড়ে মেয়েকে বাপের কোলে দেখিয়া কিরণশশীর সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল, সে নথ নাড়িয়া বলিল, "রাজ্যের ধূলো ওর গায়ে, তুমি ওকে খাটে শোয়াতে পাবে না।"

রামদয়াল রক্তনেত্রে 'দ্বিতীয় পক্ষের' দিকে চাহিলেন, কোন কথা না বলিয়া পুঁটুকে খাটে শয়ন করাইলেন এবং তাহার পাশে বসিয়া তাহার রুক্ষ কেশরাশিতে অঙ্গুলি চালনা করিতে লাগিলেন।

কিরণশশী দেখিল, তাহার স্বামী তাহার হুকুম তামিল করিল না। রাগে ও অভিমানে সে পচা ইলিশের মত ফুলিয়া ঢাক হইল; স্বামীর কর্ণমূলে সুশাণিত বিষাক্ত বাক্যবাণ বর্ষণ করিতে লাগিল। 'দোজবরে'র এত সাহস!

কিরণশশী একটা হরিকেন লণ্ঠনের

নিকট বসিয়া সুপারী কাটিতে কাটিতে বলিল, মানুষ যত বুড়ো হচ্চে, ততই যেন বুদ্ধি-বিবেচনা সব লোপ পেয়ে যাচ্ছে! সংসারে আর কারও ত মেয়ে নাই! মেয়ের আদর দেখ্‌লে সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে যায়, যদি মেয়ের রূপ থাক্‌তো ত আরও কত হতো। সারাদিন ধুলো-কাদা ঘেঁটে বেড়াবে, চিমটি দিলে ময়লা ওঠে, খাটে না শুলে ওর ঘুম হয় না!"

রামদয়াল গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "ছেলে মানুষ, ধুলো কাদা ঘেঁটে বেড়ানো ওদের স্বভাব। তুমি ত গাল দিতে খুব মজবুত, কোন দিন ত তোমাকে ওর গা-টা পরিষ্কার করে দিতে দেখ্‌লাম না। পিসিমা আছেন তাই কোন কোন দিন ওর মাথায় একটু জল পড়ে।"

রাগে কিরণশশীর সুপারী কাটা বন্ধ হইয়া গেল। সে বলিল, "আমার ত অন্য কাজকর্ম্ম কিছু নেই, তাই মেয়েকে তিন বেলা সাবান মাখাতে বসবো!—এত দরদ হয়ে থাকে তুমি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করলেই পার।"

রামদয়াল বলিলেন, "ওর মা বেঁচে থাকৃতে সে কখন এ কথা বলতো না। পুঁটুর আদর যত্ন করবার মানুষ নেই বলেই আমি বুড়ো বয়সে এই দুষ্কর্ম্ম করিছি, আবার একটা বিয়ে করে বসেছি!"

দ্বিতীয় পক্ষের নব যুবতী পত্নী প্রৌঢ় স্বামীর নিকট এরূপ গঞ্জনা কোন কালেই সহ্য করিতে পারে না। কিরণশশী রাগে গজরাইতে লাগিল, তাহার নাসিকার প্রকাণ্ড নথচক্র অজগরের 'কুলোপানা' চক্রের মত আন্দোলিত হইতে লাগিল, সে ঝঙ্কার দিয়া বলিল, "যদি কথায় কথায় অপমান করবে, তবে বুড়ো বয়সে বিয়ে করেছিলে কেন? কে তোমার পায়ে ধরে সাধ্‌তে গিয়েছিল?'

রামদয়াল ধৈর্য্যচ্যুত হইয়াছিলেন, কিরণশশীর ব্যবহারে তাঁহার হৃদয়ে আজ বড় আঘাত লাগিয়াছিল; তিনি তাহাকে মার্জ্জনা করিলেন না, বলিলেন, "কেহ পায়ে ধরে সাধেনি বটে, তবে এ জন্যে কেহ কেহ হাতে ধরে সাধাসাধি করেছিল কি না তোমার বাপকে সে কথা জিজ্ঞাসা করলে জান্‌তে পারবে। ভেবেছিলাম মেয়েটা তোমার কাছে আদর যত্ন পাবে, কিন্তু দেখচি তুমি ওকে দু'চক্ষে দেখতে পার না!"

কিরণশশী বলিল, "তুমি কথায় কথায় আমাকে খোঁটা দেও, আমি তোমার এত 'নাথি-ঝাঁটার" ভাত খেতে চাইনে, দাও আমাকে কালই বাপের বাড়ী পাঠিয়ে; যদি 'অদেষ্টে' দুঃখই না থাকৃবে, তবে এত যায়গা থাকৃতে বাবা আমাকে 'দোজবরের' হাতে সঁপে দেবেন কেন? এর চেয়ে হাত পা ধ'রে জলে ফেলে দিতে পারতেন, তাও ভাল ছিল, চিরকালটা এমন জ্বালাতন হ'য়ে মরতে হতো না।"

কথায় কথা বাড়ে বুঝিয়া রামদয়াল আর কোন কথা বলিলেন না, তিনি শয্যায় শয়ন করিয়া অদৃষ্ট-বিড়ম্বনার কথা ভাবিতে লাগিলেন, জীবনটা তাঁহার নিকট জটিল সমস্যা বলিয়া মনে হইতে লাগিল! তখনও আকাশে চাঁদ হাসিতেছিল, পূজা বাড়ীতে মহাশব্দে ঢাক বাজিয়া ক্ষুদ্র গ্রামখানি তোল-

পাড় করিয়া তুলিতেছিল, এবং নৈশ সমীরণে কেতকী, রজনীগন্ধা ও কামিনীর গন্ধ দিকে দিকে ভাসিয়া যাইতেছিল,—উৎসবমুখর পল্লী-প্রকৃতি ক্ষুদ্র মানবের সুখদুঃখে সম্পূর্ণ উদাসীন।

পুঁটু অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত চক্ষু মুদিতে পারিল না, কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহার চক্ষু ফুলিয়া উঠিল। বালিকা হইলেও সে তাহার পিতামাতার দাম্পত্য কলহের অর্থ বুঝিয়াছিল; সে বুঝিল, তাহার দোষেই তাহার পিতা মনে এত বেদনা পাইয়াছেন, দুঃখিনী মাতৃহারা বালিকা ভাবিল, "মা মরিবার সময় আমাকে সঙ্গে লইয়া গেল না কেন? আর কোন দিন বাবার কাছে শুইতে আসিব না।"

কিরণশশী সে রাত্রে তাহার অঞ্চল-শয্যা ত্যাগ করিল না, রাত্রে কাহারও আহার হইল না। পুঁটু পর দিন হইতে তাহার বুড়ো দিদির জীর্ণ মলিন শয্যায় আশ্রয় লইল। পূজার আনন্দোৎসব কোথা দিয়া গেল তাহা সে বুঝিতেও পারিল না। দশমীর দিন বিসর্জ্জনের বাজনার সঙ্গে শানাই যখন কাঁদিয়া কাঁদিয়া বিরহ-সঙ্গীত গাহিতে লাগিল, তখন সে মাটীতে লুটাইয়া কাঁদিয়া বলিল, "মাগো, তুমি কোথায় গিয়াছ, আমাকেও নিয়ে যাও।"

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

নাট্য-রঙ্গ

(১)

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণঃ—

অনুগত শ্যেন (মিঃ সেন?)—নবীন 'মাসিক' সম্পাদক।

অসমান খান—পুরাতন ঐ

অয়সকান্তি—নামজাদা লেখক।

স্থান—নবীন সম্পাদকের কার্য্যালয়।

অয়সকান্তি স্বীয় প্রবন্ধের প্রুফ-সংশোধনে ও মধ্যে মধ্যে নবীন সম্পাদককে উপদেশ প্রদানে রত। পার্শ্বে সসঙ্কোচে উপবিষ্ট—লেখকের মুখের প্রতি সাগ্রহ-নিবদ্ধ-দৃষ্টি নবীন সম্পাদক।

সহসা প্রকোষ্ঠে তৃতীয় ব্যক্তির ছায়া পড়িল। ক্রোধকম্পিত স্বরে আগন্তুক কহিল—

"অয়সকান্তি, এ উত্তম!"

উভয়ে মুখ তুলিল—দেখিল স্বয়ং অসমান খান।

অসমান খান তাঁহার মাসিকের জনৈক লেখকের নিকট সবিশেষ অবগত হইয়া অয়সকান্তির সন্ধানে আসিয়াছিল। অনুগত শ্যেন অসমানের সে ব্যঙ্গোক্তিতে অয়সের অপমানাশঙ্কায় ত্রস্তে চেয়ার ছাড়িয়া উভয়ের মধ্যে আসিবার চেষ্টা করিল। অয়সকান্তি আরক্ত মুখে অথচ স্থির স্বরে উত্তর করিল—

"কি উত্তম, অসমান?"

"আমার মাসিকের জন্য প্রদত্ত সমালোচনার পুস্তক লইয়া অপর মাসিকে সমা-

লোচনা লেখা—এ উত্তম। আমার কার্য্যালয় ছাড়িয়া এ অফিস গৃহে তোমার অধিষ্ঠান—এ উত্তম।"

অয়স কহিল—"এই পত্রিকার সহিত সম্বন্ধ রাখা, ইহার জন্য কার্য্য করা এখন আমার ইচ্ছা। আমার কর্ম্ম উত্তম কি অধম, সে কথায় তোমার প্রয়োজন নাই।"

অসমান বিস্মিত হইল; বিস্মিতের অধিক ক্রুদ্ধ হইল, কহিল—

"প্রয়োজন আছে কি না আছে, কাল প্রাতে দৈনিক পত্রের স্তম্ভে দেখিবে।"

অয়স পূর্ব্ববৎ কহিল—"যখন literary tribunal আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, আমি তখন তাহার উত্তর দিব। তোমার চিন্তা নাই।"

অসমান পূর্ব্ববৎ ব্যঙ্গ করিয়া বলিল—

"আর যদি আমিই জিজ্ঞাসা করি?"

অয়সকান্তি প্রুফ দর্শন হইতে বিরত হইল, গেলি প্রুফের কাগজগুলি বামহস্তে ধরিয়া স্থির দৃষ্টিতে অসমানের প্রতি নিরীক্ষণ করিল; সুবর্ণমণ্ডিত ফ্রেমযুক্ত চশমার মধ্য হইতে তাঁহার মার্জ্জার-বিনিন্দিত নয়ন কিঞ্চিৎ বর্দ্ধিতায়ন হইয়া দীপ্ত হইয়া উঠিল, পমেটম-মর্দ্দিত সযত্ন-কেয়ারী-কৃত অলকাবলীর সহিত শিরোদেশ হঠাৎ এক দিকে হেলিল, অতি পরিষ্কার স্বরে অয়স কহিল—

"অসমান, যদি জিজ্ঞাসা কর, তবে আমার উত্তর এই—এখন এই সম্পাদকই আমার আদরের পাত্র।"

যদি তন্মুহূর্ত্তে কক্ষ মধ্যে বজ্রপতন হইত, তবে অসমান অধিকতর চমকিত হইতে পারিত না। সে স্তম্ভিত হইয়া রহিল।

অয়স পুনরপি কহিল—

"শুন, অসমান, আবার বলি, এই সম্পাদক আমার প্রিয়তম—আমার সর্ব্বস্ব। যাবজ্জীবন আমি ইহারই মাসিকের সেবায় নিযুক্ত থাকিব। আমার হৃদয়ে আর অন্য মাসিকের স্থান নাই। কালই যদি নববিধানের চক্রে ইহার অস্তিত্ব চূর্ণ হইয়া যায়, তথাপি দেখিবে, অনন্তকাল পর্য্যন্ত ইহারই স্মৃতি আমার হৃদয়-মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। এমন কি, এই মুহূর্ত্তের পর যদি ঘটনাবশে ইহার সহিত আমার প্রকাশ্য সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিতে হয়, তথাপি আমি প্রচ্ছন্ন নামে ইহারই সহায়তা করিব। আরও শুন—মনে করিতে পার, এতক্ষণ কি বলিতেছিলাম? আমি তোমার লেখক ভাঙাইয়া পারি, গ্রাহক ভাঙাইয়া পারি, বিজ্ঞাপনদাতা ভাঙাইয়া পারি, তোমার গ্রাহকের লিষ্ট supply করিয়া পারি, যদি সম্ভব হয়, প্রেস ভাঙাইয়া পারি, এবং প্রয়োজন হইলে সাধারণের মন ভাঙাইয়া পারি, ইহাকে তোমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আসনে তুলিব। কতকটা লোকনিন্দা-ভয়, কতকটা অভিজ্ঞতার অভাব, এই নবীন ব্রতীকে এখনও পশ্চাৎপদ রাখিয়াছে। নতুবা দেখিতে, সত্বরেই তোমার কাগজের অস্তিত্ব বিলুপ্তপ্রায় হইত।"

তার পর গম্ভীরস্বরে অয়সকান্তি পুনরপি কহিল "অসমান, এ সকল কথা বলিয়া ক্লেশ দিলাম, অপরাধ ক্ষমা কর। তুমি আমার অনেক লেখা প্রকাশ করিয়াছ; তুমি আমার যশের প্রথম উত্তরসাধক। তোমায় রূঢ় কথা বলা আমার অনুচিত।

কিন্তু ইদানিং নানা রূপে তুমি আমায় বড়ই জ্বালাইয়াছ। চিরদিন তোমার মুরুব্বিয়ানা আর ভাল লাগে না। তুমি আমায় অস্থির-চিত্ত ভাবিয়া আমায় কটুবাক্য প্রয়োগ করিতেছিলে। কিন্তু আমি যাই হই, অস্থিরচিত্ত নহি; আমি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়াই 'এই পত্রে ভিড়িয়াছি।' অয়স-কান্তি যাহা করে, তাহা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারে। আজ তোমাকে এ কথা বলিলাম, কাল সাহিত্য-সমাজে এ কথা মুক্তকণ্ঠে বলিব।"

পরে অনুগতের প্রতি ফিরিয়া বলিল—"অনুগত তুমিও আমায় ক্ষমা কর। আজিকার আমার এ আচরণে তোমার অনিষ্ট হইতে পারে. কিন্তু অসমান আজ আমায় এরূপ উত্তেজিত না করিলে, এ গূঢ়তম কথা কখনও কাহারও নিকট প্রকাশ পাইত না।"

ক্ষণেক থামিয়া অয়সকান্তি পুনরায় কহিতে লাগিল—

"অসমান, আবার বলি, যদি দোষ করিয়া থাকি, দোষ মার্জ্জনা করিও। আমি তোমার পূর্ব্বের সেই স্নেহের লেখক। পূর্ব্বস্মৃতি স্মরণ করিয়া সে স্নেহের লাঘব করিও না। এখন আমি ইঁহার স্তবে স্তুতিতে নির্ব্বিচার প্রশংসা প্রচারে একেবারে মন্ত্রমুগ্ধ হইয়াছি। আমি উচ্চ আশার তাড়নায় যশের স্বর্ণলঙ্কায় উপনীত হইবার কামনায় সমুদ্র অতিক্রমে প্রবৃত্ত হইয়াছি। তুমি আমার পূর্ব্ব প্রীতিতে নিরাশ হইয়াও বিশেষ বুদ্ধির প্রণোদনে প্রতিকূল সমালোচনায়ুধ নিক্ষেপে আমায় অপমান-সলিলে ডুবাইও না।

এই বলিয়া অসমানের উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া অয়সকান্তি পুনবার প্রুফ দেখিতে বসিয়া গেলেন। ইদানিং অয়সকান্তির ব্যবহারে অসমানের মনে সন্দেহের উদয় হইয়াছিল বটে, কিন্তু এতটা যে গড়াইয়াছে অসমান তাহা স্বপ্নেও ভাবে নাই। নিরাশা-দগ্ধ অসমান কিয়ৎক্ষণ বিহ্বলের ন্যায় বিনা বাক্যে থাকিয়া নবীন সম্পাদকের প্রতি তীক্ষ্ণ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল। নবীন সম্পা-দক বুঝিলেন সে কটাক্ষ যেন বলিতেছে "এ পৃথিবীর মধ্যে অয়সের প্রীতি-আকাঙ্ক্ষী দুই সম্পাদকের স্থান হয় না!"

অনুগতের স্নেহদৃষ্টি যেন প্রকাশ করিল আমি অয়সকান্তিকে একচেটে করিবার অভিলাষী নহি। কিন্তু তাহাতেও অসমানের রুদ্রমূর্ত্তি শান্তভাব ধারণ করিল না। বক্রদৃষ্টিতে দেখিতে দেখিতে অসমান সে স্থান ত্যাগ করিল। নবীন সম্পাদক বুঝিল ভাবী মসীযুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। ইতি উদ্যোগ পর্ব্ব।

সাহিত্য-প্রসঙ্গ।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ।

গত দুই মাসে পরিষদের চিত্রশালায় আবার কতকগুলি কৌতূহলবর্দ্ধক দ্রব্য সংগৃহীত হইয়াছে (১) মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বৌদ্ধাচার্য্য-

গণের ব্যবহৃত একটি তাম্রমুকুট ও একটি ঘণ্টা উপহার দিয়াছেন। মুকুটের সম্মুখ ভাগে কতকগুলি বুদ্ধমূর্ত্তি বিশিষ্ট ধাতুময় চূড়া আছে এবং পশ্চাদ্দিকে একটি খোদিত লিপি আছে। ঘণ্টাটির গাত্রে বৌদ্ধগণের ব্যবহৃত বজ্রচিহ্ন যুক্ত। (২) শ্রীযুক্ত নৃপতি নাথ ত্রিবেদী মহাশয় একটি বৃহৎ বিষ্ণুমূর্ত্তি উপহার দিয়াছেন, এটিও পূর্ব্বসংগৃহীত বিষ্ণুমূর্ত্তিগুলিরই সমাকৃতি। (৩) শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় ভূষণার রাজা সীতারাম রায়ের কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ হইতে কয়েকখানি কারুকার্য্য-বিশিষ্ট ইষ্টক (৪) শ্রীযুক্ত জানকীনাথ গুপ্ত মহাশয় নশীপুরের এক প্রাচীন মন্দিরের কারুকার্য্যবিশিষ্ট ইষ্টক এবং শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কামাখ্যা-মন্দিরের কারুকার্য্যবিশিষ্ট ইষ্টক উপহার দিয়াছেন। (৫) শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র সিংহ মহাশয় বিষ্ণুপুরের রাজ-কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ হইতে কারুকার্য্যবিশিষ্ট ইষ্টক, কামানের গোলা এবং সাঁজোয়া (বর্ম্ম) উপহার দিয়াছেন। (৬) শ্রীযুক্ত রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর একটি শেরশাহের স্বর্ণমুদ্রা ও একটি আকবরশাহের স্বর্ণমুদ্রা ক্রয় করিয়া দিয়াছেন। আকবরী মোহরটি টাঁড়া নগরের টাঁকশাল হইতে মুদ্রিত। রাজা টোডরমল যখন বাঙ্গলার শাসনকর্ত্তা হন, তখন টাঁড়ার (রাজমহলের নিকট) টাঁকশাল হয়। এই টাঁকশালের মুদ্রা প্রায় পাওয়া যায় না। পরিষদের পুস্তকালয়ে শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের চেষ্টায় বাঙ্গলার আদিনাটক "ভদ্রার্জ্জুন"ও আদিনাটক বলিয়া ভ্রান্ত প্রসিদ্ধিবিশিষ্ট পুস্তিকা "প্রেম-নাটক" সংগৃহীত হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত যত গুলি মুদ্রিত নাটকের নাম জানিতে পারা গিয়াছে তন্মধ্যে তারাচরণ শিকদার প্রণীত এই 'ভদ্রার্জ্জুন' নাটক সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। উহা ১৭৭৪ শকাব্দে (১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে, ১২৫৯ সালে) কলিকাতার চৈতন্যচন্দ্রোদয় যন্ত্রে মুদ্রিত। ৺রামনারায়ণ তর্করত্নের-"কুলীন কুলসর্ব্বস্ব" ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ভাস্কর যন্ত্রে সর্ব্বপ্রথম মুদ্রিত হয়। 'প্রেম-নাটক' পুস্তিকা ১২৬৯ সালে মুদ্রিত-গ্রন্থপ্রকাশ বিভাগে স্থির হইয়াছে—কাঁটাহার স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত নীলরতন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সংগৃহীত চণ্ডীদাসের পদাবলী (পাঁচশতাধিক) প্রকাশিত হইবে।

গয়াড় তুঙ্গদেবের তাম্রশাসন।

এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় সম্প্রতি শ্রীযুক্ত নীলমণি চক্রবর্ত্তী, এম্‌-এ মহাশয় এক খানি নূতন তাম্রশাসনের বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন নীলমণি বাবু বলেন,—এই শাসনখানি সোসাইটির হাতে অনেক দিন উপেক্ষিত ভাবে পড়িয়া ছিল। উহা কোথা হইতে, কবে, কে, কিরূপে সংগ্রহ করিয়া-ছিলেন কার্য্য বিবরণের কোথাও তাহা দেখা যায় না।

শাসনখানির আকার আয়তন ৬ইঃ × ৫ইঃ। ইহার মাথার উপর ডিম্বাকৃতি একটি পিতলের রাজমুদ্রা লাগান আছে। এই মুদ্রায় একটি বৃক্ষতলে একটি বৃষ-মূর্ত্তি আছে, ইহাই ইহার লাঞ্ছন। ইহার উর্দ্ধে রাজনাম "শ্রীগয়াড়তুঙ্গদেবস্য" এইরূপে খোদিত আছে। রাজনামের উর্দ্ধে অর্দ্ধচন্দ্র ও বৃত্তাকার চিহ্ন খোদিত আছে। অর্দ্ধচন্দ্রটি

চন্দ্রের ও বৃত্তাকার চিহ্নটি সূর্য্যের উদ্দেশ্যে খোদিত। শাসনখানির উভয় পৃষ্ঠাতেই লিপি খোদিত আছে। অক্ষরগুলি গভীর করিয়া খোদিত। অবস্থা ভালই আছে।

অক্ষরের আকার দেখিয়া ইহাকে খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ বলিতে পারা যায়। শাসনখানি ভূমিদানের দলিল। তুঙ্গবংশীয় রাজা গয়াড় তুঙ্গদেব এই দানের কর্ত্তা। তিনি রোহিত গিরিবাসী ও শাণ্ডিল্য-গোত্রীয় রোহিতগিরি বর্ত্তমান শাহাবাদ জেলার রোটাসগড়। এপিগ্রাফিকা ইণ্ডিকার ৪র্থ ভাগের ৩১১ পৃষ্ঠার এই রোটাসগড়ে ১২৭৯ সম্বন্ধে "প্রতাপ" নামে কোন রাজা ছিলেন জানা যায়। তাঁহার সঙ্গে এই তুঙ্গ বংশীয়দিগের কোন সংস্রব ছিল কি না তাহা এখনও জানা নাই। গয়াড়তুঙ্গ এই শাসনে আপনাকে "পরম মাহেশ্বর" অর্থাৎ বিশিষ্ট শৈব বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন, রাজ-মুদ্রার বৃষলাঞ্ছন হইতেও বুঝা যায়। শাসনের একস্থানে তাঁহাকে কেবল মাত্র মণ্ডলেশ্বর বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। তাঁহার আবিষ্কৃত মণ্ডলের নাম যমগর্ত্তমণ্ডল। বংশাবলী হিসাবে ইহাতে যে কয়টি নাম পাওয়া যায় তাঁহাদের মধ্যে সম্পর্কসূত্র বিশেষ স্পষ্ট করিয়া লেখা নাই। বাণার্য্য-শক্র, জগতুঙ্গ ও সলানতুঙ্গ এই তিনটি মাত্র নাম পাওয়া গিয়াছে। নীলমণি বাবুর অনুমান গয়াড়তুঙ্গ এই শেষোক্তের পুত্র। যমগর্ত্তমণ্ডলে বেন্দুঙ্গ বিষয়ে তোরো গ্রামখানি তিনি বিভিন্নগোত্রীয় একাদশ জন ব্রাহ্মণকে নানামত অংশে ভাগ করিয়া দিয়াছেন। এই ব্রাহ্মণেরা অহিচ্ছত্র হইতে আসিয়া ওড্র বিষয়ে "কুরুবাভত" গ্রামে বাস করিয়া-ছিলেন। এই শাসনে 'মাল' শব্দের অর্থ লইয়া নীলমণি বাবু একটু তর্ক করিয়া স্থির করিয়াছেন যে দর্শনযোগ্য উচ্চভূমির নাম মাল ভূমি। চলিত কথায় মালের জমী অর্থে যে জমীর খাজনা দিতে হয়। শাসন-খানিতে তারিখ নাই।

নীলকণ্ঠ।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

ষোড়শীর কাজ বাড়িয়াছে। আজ কাল তাহাকে প্রত্যহই বাবুদের বাটী যাতায়াত করিতে হয়, প্রাতে মন্মথের জননী গঙ্গা-স্নানের পথে ষোড়শীকে লইয়া আসেন, রাত্রিতে আবার ঝি এবং দ্বারবান তাহাকে গৃহে রাখিয়া যায়। ষোড়শী অতি প্রত্যুষে উঠিয়া গৃহদেবতার পূজার ব্যবস্থা করিয়া রাখে, সন্ধ্যার পূর্ব্বে বাবুদের বাটীর 'বামুন ঠাকুরুণ' আসিয়া 'শীতলের' আয়োজন করিয়া দেন। পুরোহিতকে সুতরাং কোন প্রকার অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না। যা কিছু অসুবিধা রামির, তাহাকে রাঁধিয়া খাইতে হয়, সে ইচ্ছা করিলে বাবুদের বাটীতে খাইতে পারে, সে প্রস্তাব হইয়াও ছিল, কিন্তু ষোড়শীর ব্যবস্থায় এইরূপই চলিতেছে! রামির কষ্টের উপর কষ্ট তাহাকে এখন প্রায় বাবুদের বাটীতে ছুটা-

ছুটি করিতে হয়—ষোড়শী ঠাকুরুণ ত দিব্বি গাড়ী চাপিয়া যাতায়াত করেন, তিনি ত আর হাঁটাহাঁটির কষ্ট বুঝেন না, তাই কথায় কথায়—ডাক্ রামিকে! এ কষ্টেও একটু সুখ ছিল—রামি দেখিত বাবুদের বাড়ীর গিন্নিই ত এখন তাহার মুনিব ঠাকুরুণ! ষোড়শী যাহাকে হাতে তুলিয়া দেয় সে পায়, যাহাকে না দেয়, সে পায় না। বৌ সরলা ত ষোড়শীর পিছু পিছু ফেরে—যার ধন তার ধন নয়,—কিন্তু ইহাতে রামির বড় সুখ, কে জানে কেন, সরলার প্রতি সে বিদ্বেষ-বতা। মন্মথ যে দিন বলিয়াছিল—'ঝির সাক্ষাতে এত লজ্জা কেন', সেই দিন সরলার ব্যবহারে, জানি না রামি কি দেখিয়াছিল, সেই দিন হইতে রামি সরলার উপর হাড়ে চটা। সরলার কোনরূপ অনিষ্ট হইলে রামি যেন তাহাতে আনন্দ অনুভব করে। আজ সরলার গৃহে ষোড়শীর এতটা আদর দেখিয়া রামি মনে মনে একটা ভবিষ্যৎ কল্পনা করিয়া লইল; সে যেন স্পষ্ট দেখিল—সরলার সুখের দিন ফুরাইয়া আসিতেছে।—'তোমারে মারিবে যে, গোকুলে বাড়িছে সে।' থাক, থাক, আর বেশী দিন নয়! সুখের বৃন্দাবন হবে দুখময়।

গৃহিণীও এখন ষোড়শীর মুঠার মধ্যে। সত্যই ষোড়শীর গৃহিণীপণা অনন্যসাধারণ। গৃহিণী হইতে বাড়ীর ঝি-চাকর সকলেই তাহার ব্যবহারে সন্তুষ্ট—অসন্তুষ্ট কেবল ভাঁড়ারি এবং পাচক। এতদিন—'সেই ধান সেই চাল, কিন্তু গিন্নি বিনে আলথাল' ছিল। ভাঁড়ারে দ্রব্যের অভাব নাই, খরচেরও ক্রটী নাই, কিন্তু হয় ত দাস-দাসীর আহারের সময় ব্যঞ্জনের অভাব; হয় ত অনেকের খাওয়াই হয় না। এমন এক দিন নয়, দুই দিন নয়, মাঝে মাঝে প্রায়ই ঘটিত। গৃহিণী ইহার কোনই কূলকিনারা করিতে পারিতেন না। তিনি যাহাদের আহার হইত না, শেষে তাহাদের পয়সা ধরিয়া দিতেন। তাহাতে খরচও হইত, অথচ নিন্দা ঘুচিত না। ষোড়শী দু'এক দিন এরূপ অব্যবস্থা লক্ষ্য করিয়া কিছু বলিল না। তাহার পর একদিন ধীরে ধীরে 'গিন্নিমা'র নিকট জানাইল—'খরচ সেই সবই হয়, কেবল দেখার অভাবে এতটা বিশৃঙ্খল হইতেছে।' গৃহিণী দুরের গঙ্গা নিকটে পাইলেন, বলিলেন—'মা, আমি তা বুঝি, কিন্তু কে দেখে?' বাস্তবিকই দেখিবার লোকের বড় অভাব। গৃহিণী পূজা-অর্চ্চনা যোগধ্যান লইয়াই দিনের অধিকাংশ সময় ব্যস্ত। মধ্যাহ্নে আহারান্তে যে একটু সময় পান তাহা মহাভারত শুনিতেই কাটিয়া যায়—সে সময় চালডালের কথা ভাল লাগে না। সরলা 'বৌ মানুষ', বিশেষতঃ ছেলে মানুষ; এ গৃহিণীপণা তার কাজ নয়, বিশেষত সে শিক্ষা তার নাই। ষোড়শী বাল্যকালে তাহার মাতুলাশ্রয়ে থাকিত। কুলীনকুমারীদের আশ্রয়ই সেই। মাতুল বেশ অবস্থাপন্ন, দুই বেলা অনেকগুলি পাত সে বাড়ীতে পড়ে। মাতামহী পাকা গৃহিণী। ষোড়শী বিবাহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অর্থাৎ ষোড়শ বর্ষ পর্য্যন্ত মাতুলাশ্রয়ে লালিতাপালিতা। সেই গৃহে সুনিপুণা গৃহিণী মাতামহীর আদর্শে শিক্ষিতা, কাজেই

ষোড়শী গৃহকার্য্যে সুদক্ষা। যে খেলোয়াড়, সে খেলায় কাঁচা চাল দেখিলে চুপ করিয়া থাকিতে পারে না ; হোক্ না কেন গুরুজন, চালে তাঁহার ভুল হইলে, তখনি তাহা ধরিয়া দিবার জন্য হৃদয়ে একটা চাঞ্চল্য অনুভব করে। যদি বা অন্য চালে চুপ করিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু যখন 'মাৎ' হইবার সম্ভাবনা তখন সে চুপ করিয়া থাকিতেই পারে না। ষোড়শী যখন দেখিল, সে সোনার সংসার গৃহিণীপণার অভাবে মাটি হইতে বসিয়াছে, গৃহে বাহিরে সর্ব্বত্র নিন্দা রটিতেছে, তখন আর সে চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না ; গৃহিণী কি মনে করিবেন না ভাবিয়া, সাংসারিক বিশৃঙ্খলার কথা তাঁহাকে বলিয়াছিল গৃহিণী লোক বড় ভাল, বড় সাদাসিদে, সাধারণ লোকের ন্যায় একবার রাগ করা দুরে থাক্ ষোড়শী যে তাঁহার ব্যথার ব্যথী ইহা বুঝিয়া মনে মনে বড়ই আহ্লাদিত হইলেন, বলিলেন,—'মা এ সব ভার তোমার, তুমি বৌমাকে শিখাইয়া লও।'

ষোড়শী তখন সরলাকে সহকারিণী লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল। দেখিতে দেখিতে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে অন্নপূর্ণার আবির্ভাব হইল।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

সরলা প্রাণপণে ষোড়শীর সাহায্য করিতে লাগিল। প্রথম প্রথম কিন্তু তাহার প্রাণ পড়িয়া ছিল অন্যত্র। সে কাজ করিতে করিতে অন্যমনস্ক হইত। ষোড়শী ইহা বুঝিল। হাসিয়া বলিল "এখন আমি গুরুমহাশয়, আমার পাঠই পড়িতে হইবে, অন্য পাঠ ভুলিয়া যাও।" মুখে ইহা বলিল কিন্তু সরলার মনের কথা সে বুঝিল। ভালবাসার কি যন্ত্রণা ষোড়শী তাহা জানিত, ভালবাসিয়া কি সুখ তাহা সে বুঝিত, তাই সে সরলার যাহাতে দুই দিক রক্ষা হয় সেই ব্যবস্থা করিল। সরলাকে বলিল কাল হইতে তোমার টিফিনের ছুটি বাড়াইয়া দিব। মন্মথ যখন অন্দর মহলে আসিত ষোড়শী সময় বুঝিয়া ঠিক সেই সময় সরলাকে ছাড়িয়া দিত। সরলা আপনার দৌর্ব্বল্য ধরা পড়িয়াছে দেখিয়া মনে মনে কিছু লজ্জিত হইল। কিন্তু এ ব্যবস্থায় অসুখী হইল না। ষোড়শীর প্রতি তাহার শ্রদ্ধা বাড়িয়াই গেল।

ষোড়শী কেবল গৃহিণীপণাতেই নিপুণা নহে, রন্ধনেতে সে সিদ্ধহস্তা। সে একদিন সাধ করিয়া রাঁধিবার ভার লইল। সে দিন ষোড়শী মনের মতন করিয়া নানাবিধ ব্যঞ্জন পায়স পিষ্টক প্রস্তুত করিল।

মন্মথের আহারের সময় সে সরলাকে সঙ্গে করিয়া সেখানে দাঁড়াইল। অনেকে বলেন আহারের সময় কেহ কাছে থাকিলে আহারে কেমন বাধ বাধ ঠেকে, কিন্তু সকল ক্ষেত্রে ইহা খাটে না ; আর, কাহার কিরূপ হয় বলিতে পারি না, কিন্তু আজ সম্মুখে সরলা ও ষোড়শীকে দেখিয়া মন্মথ আহার্য্যের ওজন ঠিক রাখিতে পারিল না। আমরা সত্য কথা বলিব মন্মথ ভোজন করিয়া এমন তৃপ্তি আর কখনও পায় নাই।

বহুদিন পূর্ব্বে একদিন নীলকণ্ঠের সহিত একত্রে ষোড়শীর স্বহস্ত প্রস্তুত অন্নব্যঞ্জন মন্মথ আহার করিয়াছিল বটে, কিন্তু সে দিন

ত এত সুস্বাদু মনে হয় নাই। সে সঙ্গগুণে কি অন্য কারণে ঠিক বলা যায় না। কিন্তু আজ ব্যঞ্জনে ব্যঞ্জনে যেন সুধা ক্ষরিতেছিল। মন্মথ আহার-অন্তে পরিহাসচ্ছলে বলিল 'রাঙ্গাদিদি আজ বুঝিলাম কি গুণে দ্রৌপদী পঞ্চপাণ্ডবকে এত মুগ্ধ রাখিয়াছিলেন। কি গুণে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সখা হইয়াছিলেন। আমার বোধ হয় দ্রৌপদী যদি তোমার মতন রাঁধিতে পারিত, তবে কুরুপাণ্ডব উভয় পক্ষই দ্রৌপদীর গোলাম হইত। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ আর হইত না।' ষোড়শী যেন পরিহাস না বুঝিয়াই চাপা রহস্যে বলিল 'রান্নায় নুন বেশী হইয়াছে কি?' মন্মথ বলিল 'না, সে কথা বলিলে যে আমার নিমকহারামী হয়। সত্যই আজ খাওয়াটা বড় বেশী রকম হইয়াছে, ভয় হইয়াছে পাছে আপনার এত সাধের পায়েস মিষ্টান্নে পেট ফাটিয়া বাহির হইয়া যায়। ষোড়শী গম্ভীর ভাবে বলিল 'মাথা ফাটিয়া না বাহির হইলেই বাঁচি'। এতক্ষণ সরলা নীরবে এ রহস্যালাপ শুনিতেছিল এবার সে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। মন্মথ কিছু অপ্রতিভ হইল, সে ষোড়শীকে মহাভারতের ফাঁদে ফেলিতে গিয়া নিজে কৃত্তিবাসের ফাঁদে পড়িল।

সরলা একটু অন্যমনস্ক ছিল। ষোড়শী পুণ্যবতী, সে তার রন্ধন গুণে এমনি করিয়া তাহার স্বামীকে পরিতৃপ্ত করিতে পারে, আজ সে আমার স্বামীকেও কত তৃপ্তি দিয়াছে, আর আমি ছি ছি! আমি আমার স্বামীকে এ ভোজন-সুখ হইতে এতদিন বঞ্চিত রাখিয়াছি একদিনও তাহাকে এ সুখে সুখী করিতে পারিলাম না।

ষোড়শীও ভাবিতে লাগিল, সত্যই কি আমার রান্না মন্মথের এত ভাল লাগিয়াছে?

সহসা ষোড়শীর ভাবান্তর ঘটিল। প্রবাসে কে তাঁহার স্বামীকে যত্ন করিতেছে, রাঁধিয়া দিতেছে? আবার কতদিনে ষোড়শী তাঁহাকে রন্ধন করাইয়া আহার করাইতে পারিবে। তাহার রন্ধন কি কাহাকে তৃপ্তি দিতে পারে? মন্মথের এ মিছা কথা। ছাই রান্না

শ্রীশৈলেশচন্দ্র মজুমদার

সমালোচনা।

নবদ্বীপ-পরিক্রমা (প্রথমাংশ) —বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত। পরিষদ এই পুরাতন পুস্তকের প্রকাশ করিয়া নবদ্বীপের ইতিহাস রচনার একটা উপকরণ রক্ষা করিলেন। পরিষদের গ্রন্থ-প্রকাশ-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় ঠিক বলিয়াছেন—"নবদ্বীপ অতীত বঙ্গের প্রধান গৌরবকেন্দ্র।"—ইহার পুরাতত্ত্ব উদ্ধার একান্ত প্রয়োজনীয়। সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন, দ্বিতীয় খণ্ডের বিস্তৃত ভূমিকায় নবদ্বীপের পুরাতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব ও ধারাবাহিক ইতিহাস প্রকাশ করিবেন। আমরা আগ্রহের সহিত দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের অপেক্ষায় রহিলাম।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিসন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত।

বঙ্গদর্শন।

ধর্ম্মের কথা।

অধিকারী-ভেদ।

এ জগতে সকল বিষয়েই ভালমন্দ এবং সত্যাসত্য মিশিয়া আছে। নিখুঁত ভাল বা নিভাজ সত্য প্রায়ই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। অধিকারী-ভেদেরও একটা ভালোর দিক্ আর একটা মন্দের দিক্, একটা সত্যের দিক্ আর একটা মিথ্যার দিক্ আছে। আমরা এক সময়ে ইহার মন্দের দিক্ ও মিথ্যার দিক্টাই দেখিয়াছিলাম। অজ্ঞ লোকে, গতানুগতিক ভাবে, ইহার যে কদর্থ করিত, তৎপ্রতিই লক্ষ্য করিয়াছিলাম। এই আপাতমিথ্যার পশ্চাতে যে একটা বিরাট ও গভীর সত্য পড়িয়া আছে, সে দিকে তাকাইয়া দেখি নাই। তাই ইহাকে এমন সরাসরি রকমে একান্ত অসত্য ভাবিয়া বর্জ্জন করিতে গিয়াছিলাম।

বহুকাল হইতে আমাদের দেশে ধর্ম্মের এই অধিকারীভেদের কথাটা জন্মগত জাতিভেদের সঙ্গে জড়াইয়াছিল। জন্মের দ্বারা, জাতির দ্বারা, বর্ণের দ্বারা ধর্ম্মের অধিকারী-অনধিকারীর বিচার হইত। ব্রাহ্মণেরই উচ্চতম আধ্যাত্মিক ধর্ম্মে অধিকার, অন্যের সে অধিকার নাই। এই উচ্চ ধর্ম্ম বেদবেদান্তেরই অন্তর্গত, আর বেদে স্ত্রী-শূদ্রের অধিকার নাই। গৃহীর জ্ঞানকাণ্ডে অধিকার নাই। এই রূপে ভাবেই বর্ণাশ্রমের দ্বারা ধর্ম্মের অধিকার নির্ণীত হইত। প্রচলিত বর্ণাশ্রমকে ধর্ম্মের অধিকার-অনধিকারের মাপকাটি করা হইয়াছিল। ইহাই অধিকারী-ভেদের মিথ্যার দিক্। এখন অতি অল্প লোকেই এরূপ ভাবে অধিকারী-ভেদকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চান। এখন আমরা অধিকারীভেদ বলিতে জন্মগত বা বর্ণগত অধিকার বুঝি না, মানুষের ভিতরকার প্রকৃতিগত যে অধিকার তাহাই বুঝিয়া থাকি। ইহাই অধিকারীভেদে সত্য দিক্ ও সদর্থ।

ফলত বর্ণাশ্রমের উপরে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অধিকার বা অনধিকার প্রতিষ্ঠিত করিতে যাইয়া, প্রাচীনেরাই বর্ণাশ্রমেরও একটা সদর্থ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন,

এ কথাও মনে রাখা কর্ত্তব্য। গীতাতে এই চেষ্টা অতি পরিষ্কাররূপে প্রত্যক্ষ হয়।

চাতুর্ব্বর্ণং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।

গুণ ও কর্ম্মের বিভাগ করিয়া যে চতুর্ব্বর্ণের সৃষ্টি হইয়াছে, গুণকর্ম্মের উপরেই যে বর্ণাশ্রম প্রতিষ্ঠিত, এমন কথা হয় ত সাহস করিয়া আমরা বলিতে পারিব না। গুণকর্ম্ম না বলিয়া যদি জন্মকর্ম্ম বলা হয়, তবেই হয় ত, আমরা যাহাকে ইতিহাস বলিয়া জানি, তার চক্ষে কথাটা সত্য হইতে পারে। এবং এই অর্থে বর্ণভেদকে মানব-সমাজের একটা আদিম বিভাগ বলিয়াই সচ্ছন্দে গ্রহণ করাও যাইতে পারে। এক সময়ে বর্ণ জাতিরই চিহ্ন ছিল। এখনো ভিন্ন ভিন্ন জাতির বর্ণ অনেকটা বিভিন্ন। জাপান, চীন প্রভৃতি মঙ্গোলিও জাতির মুখশ্রী যেমন অপর জাতি হইতে ভিন্ন, তাহাদের বর্ণও সেইরূপ অপর জাতি হইতে অনেকটা পৃথক। সেইরূপ কাফ্রিজাতির মুখশ্রী ও বর্ণ উভয়ই আর্য্যজাতি হইতে ভিন্ন। কালক্রমে এক জাতি অপর জাতির সঙ্গে অনেকটা মিলিয়া মিশিয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষে বর্ণাশ্রমের প্রভাব সত্ত্বেও এই মিশামিশিটা অনেক বেশী হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এক দিন এরূপ হয় নাই। তখন বর্ণভেদে সমাজ-ভেদই বুঝাইত, আর তাই বলিয়া বর্ণবৈষম্য বহুল পরিমাণে ভিতরকার প্রকৃতিগত বৈষম্যেরও নিদর্শন ছিল। মানুষ সর্ব্বদাই সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করে। অত্যন্ত আদিম অবস্থাতেও তাহাকে সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করিতে দেখা যায়। কোনো কোনো ইতর জন্তু স্বভাবতই যেমন সর্ব্বদা যুথবদ্ধ হইয়া থাকে, ইহা যেমন এ সকল জন্তুর প্রকৃতিগত হইয়া গিয়াছে, সেইরূপে সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করা মানবেরও মূল প্রকৃতির সঙ্গেই জড়াইয়া আছে। আর এক ব্যক্তি যেমন অপর ব্যক্তি হইতে আকারে, আচারে, রুচিতে, প্রবৃত্তিতে, ভিন্ন; সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন মানবসমাজও পরস্পর হইতে ভিন্ন। এ বিভিন্নতা মৌলিক। ইহা প্রকৃতিগত ব্যাপার। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যেমন এক একটা বিশেষত্ব দেখা যায়, ভিন্ন ভিন্ন মানবসমাজেও সেইরূপ এক একটা বিশেষত্ব রহিয়াছে। এই বিশেষত্ব কবে, কি কারণে, ফুটিয়া উঠিয়াছে, আমরা ইহা জানি না, জানিবার উপায় নাই। মানুষকে ও মানবসমাজকে যে দিন হইতে দেখিতেছি, ইতিহাস যে কালের খবর রাখে, তত দিনই এই সমাজ-গত বা বর্ণগত পার্থক্য লক্ষিত হইয়া আসিয়াছে। আর এই যে জাতিগত বা সমাজগত পার্থক্য, ইহাই বর্ণভেদের মূল। ভারতবর্ষের আদি আর্য্যোপনিবেশে কেবল দুই জাতি বা দুই বর্ণ ছিল। এক আর্য্য অপর অনার্য্য। এক শুক্ল অপর কৃষ্ণ। ক্রমে অনেক অনার্য্য আর্য্যসমাজভুক্ত হইয়া যান; অনেক আর্য্যও আপন আপন কর্ম্ম বা ব্যবসার দ্বারা বিভক্ত হইয়া পড়েন। এইরূপেই বর্ণভেদের উৎপত্তি হয়। সে সময়ে জন্ম-কর্ম্মেরই উপরে এই বর্ণভেদ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। সমাজ-বিবর্ত্তনে যখন এই জন্মগত বর্ণভেদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উঠিতে আরম্ভ হয়, তখনই

গুণকর্ম্মের উপরে ইহা প্রতিষ্ঠিত, এই বলিয়া এই প্রতিবাদ খণ্ডনের চেষ্টা হইয়াছিল। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ সময়ে ভারতবর্ষে যে একটা তুমুল সমাজবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল, মহাভারতই তাহার সাক্ষী, সেই বিপ্লবের সময়ে প্রাচীনকে রক্ষা করিবার চেষ্টা ও প্রাচীনের সঙ্গে নবীনের সমন্বয়-সাধনের প্রয়াস হইতেই, গুণকর্ম্মের উপরে চতুর্ব্বর্ণের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, এই যুক্তি উত্থাপিত হয়। বর্ণধর্ম্মের উপরে লোকের শ্রদ্ধা যদি নষ্ট না হইয়া যাইত, তাহা হইলে এই যুক্তি প্রয়োগের প্রয়োজনই উপস্থিত হইত না। কিন্তু সে যাহাই হউক না কেন, যে কারণেই বর্ণ বিভাগকে গুণকর্ম্মের উপরে স্থাপন করিবার চেষ্টা হউক না কেন, এই যুক্তির উপরেই প্রাচীন কালে ধর্ম্মের অধিকারীভেদকে প্রচলিত বর্ণাশ্রমের সঙ্গে মিশাইয়া দেওয়া হয়, এ কথা অস্বীকার করা কঠিন। যে গুণকর্ম্মের ভিত্তিতে বর্ণাশ্রমকে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা হয়, সেই গুণকর্ম্মের উপরেই ধর্ম্মের অধিকারীভেদও প্রতিষ্ঠিত। এই বলিয়া বর্ণাশ্রমকে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অধিকারী-ভেদের মাপকাটি করা হইয়াছিল। এইরূপেই জন্মগত বর্ণভেদের উপরে প্রকৃতিগত অধিকারীভেদও কার্য্যত স্থাপিত হয়।

আর জন্মের উপরে আমাদের গুণকর্ম্ম যে আদৌ নির্ভর করে না, এমন কথাও বলিতে পারা যায় না। আমাদের জন্মটা নিতান্তই আকস্মিক ব্যাপার নহে। বস্তু মাত্রেরই উৎপত্তি দ্বারা জীবনগতি নিয়মিত হইয়া থাকে। মানুষও যাঁর ঔরসে, যে গর্ভে জন্ম গ্রহণ করে, তাহার দ্বারা তার পরবর্ত্তী সমস্ত জীবনটা বহুল পরিমাণে পরিচালিত হইয়া থাকে। মায়ের গর্ভে পিতামাতার প্রকৃতির ছাচেই, আমাদের প্রত্যেকের প্রকৃতির ছাঁচটা গড়িয়া উঠে। পিতামাতা যদি সত্বগুণসম্পন্ন হন, তাঁহাদের প্রকৃতির সাত্বিকতাতে যদি আমাদের সঞ্চার হয়, তবে আমরাও যে সত্বপ্রধান হই, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। তাঁরা যদি রাজসিক প্রকৃতি সম্পন্ন হন, আমাদের জন্মকালে যদি তাঁহাদের প্রকৃতিগত রজঃ সত্ব ও তমঃকে অভিভূত করিয়া থাকে, তবে আমরাও রাজসিক স্বভাব প্রাপ্ত হই, ও তাঁহাদের তমগুণের প্রভাব-কালে আমাদের উৎপত্তি হইলে যে আমরা তামসিক প্রকৃতি লাভ করি, ইহা প্রত্যক্ষ কথা। সন্তান যে পিতামাতার শারীরিক দোষগুণের উত্তরাধিকারী হয়, ইহা সকলেই জানেন। আমাদের মানসিক প্রকৃতিও যে আমরা অনেক সময় আমাদের পিতামাতার নিকট হইতে লাভ করি, এ কথাও অস্বীকার করা সম্ভব নহে। সময় সময় ইহার ব্যতিক্রম যে ঘটে না, এমন নহে। কিন্তু এ সকল সাময়িক ব্যতিক্রমে সাধারণ নিয়মকে নষ্ট করে না, বরং প্রতিষ্ঠিত ও প্রমাণিতই করিয়া থাকে। আর যখন মানুষের পিতামাতার স্বভাবচরিত্রের উপরে, তাহার নিজের সুখ-দুঃখ, মঙ্গলামঙ্গল, ধর্ম্মাধর্ম্ম এতটা পরিমাণেই নির্ভর করে, তখন তার জন্মব্যাপারটা যে একান্ত আকস্মিক বিষয়, ইহার মধ্যে কোনোই কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ নাই, এ কথা বলিলে, সমুদায় সৃষ্টি-

কার্য্যই উচ্ছৃঙ্খল, অর্থহীন ও ধর্ম্মশূন্য হইয়া পড়ে। জীবজগতের বিবর্ত্তন ও ক্রমবিকাশে প্রত্যেক জীবাণুই আপনার বিকাশ সাধনার্থ উপযোগী বিষয় ও উপকরণাদি চারিদিক হইতে, আপনা হইতেই বাছিয়া লয়। যাহা তাহার ইষ্ট-সাধনের উপযোগী নহে বা অন্তরায় হইবার কথা, তাহাকে প্রত্যেক জীবাণুই, আপনার প্রকৃতির প্রেরণায়, যথাসাধ্য বর্জ্জন করিয়া চলে। এই বর্জ্জন ও গ্রহণের বিধানটাকেই জীবতত্ত্বে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন কহে। সামান্য জীবাণু পর্য্যন্ত যে বিশ্বজনীন নিয়মের অধীন হইয়া চলে, ও যাহার ভিতর দিয়া আপনার সার্থকতা অন্বেষণ করে, কেবল মানুষই কি সে নিয়মের বশবর্ত্তী নহে? তাহা যদি না হয়, তবে মানবের জন্ম কদাপি একটা আকস্মিক ব্যাপার হইতেই পারে না। আর মানব-জন্মের যদি একটা কার্য্যকারণ-শৃঙ্খলা, একটা পৌর্ব্বাপর্য্য সম্বন্ধ ও ব্যবস্থা থাকে, তাহা হইলে জীবাণু যেমন আপনার বিকাশোপযোগী বস্তু ও ব্যবস্থা চারিদিক হইতে সংগ্রহ করিয়া লয়, মানব জন্মকালে সেইরূপ আপনার ভিতরকার প্রকৃতির যাহাতে স্ফূরণ ও চরিতার্থতা হইবে এমন সকল অবস্থাকে কেন যে বাছিয়া লইবে না, ইহা বুঝি না। জীবাণু তর্ক করিয়া, বিচার করিয়া, সজ্ঞানে আপনার প্রয়োজন সাধনের উপযোগী বস্তু ও অবস্থাকে বাছিয়া লয় না সত্য, প্রকৃতির প্রেরণায়, অবশেই এ কার্য্য করিয়া থাকে। মানুষও জন্মকালে সেইরূপই প্রকৃতির প্রেরণায় অবশে আপনার পিতা-মাতাকে বাছিয়া লয়, এ কথা বলা যাইতে পারে। বিশেষ যাঁরা জন্মান্তরবাদী, মানবাত্মাকে যাঁরা অনাদি অনন্ত বলিয়া বিশ্বাস করেন, যাঁরা বলেন—

> ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচি-
> ন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ
> অজো নিত্যঃ শাশ্বতোয়ং পুরাণো—

তাঁদের পক্ষে জীবের জন্মক্রিয়ার ভিতরে কোনো নিয়ম, কোনো পৌর্ব্বাপর্য্য, কোনো কার্য্যকারণসম্বন্ধ, কোনো উপায় ও উদ্দেশ্যের সংযোগ নাই, এরূপ কল্পনা করাও অসম্ভব। আর আমাদের জন্মটা যদি একান্ত অহেতুকী ব্যাপার না হয়, তবে জন্মের দ্বারা, পিতামাতার প্রকৃতি, চরিত্র, সাধনা, অবস্থা, ইত্যাদির দ্বারা বহুল পরিমাণে যে আমাদের নিজেদের প্রকৃতির পরিচয় পাইতে পারা যায়, ইহাই বা অস্বীকার করিব কেমন করিয়া? কর্ম্মফল যদি মানিতে হয়, তাহা হইলে, জীব যে যে যোনি প্রাপ্ত হয়, তাহা একান্ত একটা স্ফূর্ত্তিখেলা মাত্র, ইহাতে কার্য্যকারণ-শৃঙ্খলা নাই, একথা মানা যায় না। অন্তত কর্ম্মফলবাদী হিন্দু ইহা কখনো স্বীকার করেন না। সুতরাং বর্ণভেদটা সর্ব্বথা গুণকর্ম্মের উপরে প্রতিষ্ঠিত না হইলেও, জন্মব্যাপারটা যে তাহার উপরেই প্রতিষ্ঠিত, ইহা অস্বীকার করা হিন্দুর পক্ষে অসম্ভব। আর মানুষের ভিতরকার প্রকৃতির উপরেই যদি তার জন্মস্থান নির্ভর করে, সেই প্রকৃতিই যদি আপনার প্রয়োজনানুরোধে বিশেষ বিশেষ পিতামাতাকে বাছুনি করিয়া লয়, তাহা হইলে, জন্মের দ্বারা, কুলের

দ্বারা তার ধর্ম্মের অধিকার বা অনধিকার নির্দ্ধারণ করিবার চেষ্টা সর্ব্বথা সফলতা প্রাপ্ত না হইলেও, একান্তই যে অযৌক্তিক এমনো বলা যায় না।*

বর্ণাশ্রম যদি সর্ব্বথাই গুণকর্ম্মের পরিচায়ক হইত, মানুষের ভিতরকার প্রকৃতির দ্বারা যদি তার বর্ণ নির্ণীত হইত, তাহা হইলে, এই বর্ণাশ্রমের দ্বারা ধর্ম্মের অধিকার নির্ণয় করাও সঙ্গত হইতে পারিত। কিন্তু যদিও গীতাতে ব্রাহ্মণের প্রকৃতিকে সাত্ত্বিক, ক্ষত্রিয়ের রাজসিক, শূদ্রের তামসিক এই ভাবেই বর্ণনা করিয়াছেন, তথাপি কার্য্যত সকল ব্রাহ্মণই যে সাত্ত্বিক, বা অধিকাংশ ব্রাহ্মণই যে সত্ত্বপ্রধান, কিম্বা সকল শূদ্র অথবা অধিকাংশ শূদ্রই যে প্রকৃতিগত তামসিক-ভাবসম্পন্ন, এমন কথা বলা যায় না। আর কার্য্যত গুণ-কর্ম্মই প্রচলিত বর্ণাশ্রমের নির্ণায়ক নহে বলিয়া, ইহাকে ধর্ম্মের অধিকারী-ভেদের সূত্ররূপে গ্রহণ করা সঙ্গত নহে। ব্রাহ্মণের যে আদর্শ প্রকৃতি, সেই প্রকৃতি অনুসারে ধর্ম্মসাধনের উন্নত অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, ইহা স্বীকার করি। সেইরূপ প্রকৃতি যাঁহাদের নহে, শ্রেষ্ঠতম ধর্ম্মসাধনে তাঁহাদের অধিকার এখনো জন্মায় নাই। এ কথা নিঃশঙ্কোচে বলিতে পারা যায়। সেইরূপ ক্ষত্রিয়ের যে আদর্শ প্রকৃতি, সেই প্রকৃতি অনুসারেই তাঁরও ধর্ম্মের অধিকার নির্ণীত হইবে, ইহাও স্বীকার করা যায়। শূদ্র-প্রকৃতি সম্বন্ধেও তাহা বলা যাইতে পারে। কিন্তু ব্রাহ্মণ-সন্তান হইলেই ব্রাহ্মণ্য প্রকৃতি লাভ হয় না। ক্ষত্রযোনিতে জন্মিলেই রাজসিক হওয়া যায় না। আর শূদ্রগৃহে জন্ম গ্রহণ করিলেই যে তামসিক প্রকৃতি সম্পন্ন হইতে হইবে, এমনো কথা নয়। এ সকলই প্রত্যক্ষের বিরোধী। সুতরাং প্রচলিত বর্ণাশ্রমকে ধর্ম্মের অধিকারী-ভেদের মাপকাটি করা যাইতে পারে না। গুণকর্ম্মের উপরে যদি সত্যভাবে কখনো এই বর্ণাশ্রমকে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হয়, তবে তখন এ কথা উঠিতে পারে। বর্ত্তমানে ইহার কোনো অবসর ও সঙ্গতি নাই।

ধর্ম্মের অধিকারীভেদ বর্ণাশ্রমের দ্বারা নির্ণীত হইত বলিয়াই, আমরা এক সময় ইহাকে অসত্য ও অযৌক্তিক বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছিলাম। এখনো বর্ণাশ্রমের এ দাবি মানিতে রাজি নহি। কিন্তু তাই বলিয়া, অধিকারীভেদ কথাটা যে মিথ্যা এমনো বলিতে পারি না। ফলত যে পরিমাণে অধিকারীভেদের সত্যকে ধরিতে পারিয়াছি, সেই পরিমাণেই প্রচলিত বর্ণাশ্রমের উপরে ইহাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাওয়া কতটা অসত্য ও অসঙ্গত, ইহা বুঝিয়াছি।

বর্ণভেদে বা জাতিভেদে অধিকারীভেদের প্রতিষ্ঠা নহে। অধিকারীভেদ জীবের প্রকৃতিভেদের উপরে প্রতিষ্ঠিত। ইহার অর্থ এই যে যার যেমন প্রকৃতি, তার ধর্ম্ম ঠিক তদনুরূপ হইবেই হইবে। ইহার ব্যতিক্রম করিতে গেলে, সে ধর্ম্ম তার জীবনে জীবন্তভাবে কখনো ফুটিয়া উঠিবে না, বরং অনধিকার-চর্চ্চা করিতে যাইয়া, যে ধর্ম্মে তার সত্য অধিকার ছিল, সে অধিকারও নষ্ট হইয়া যাইবে।

ধর্ম্ম বস্তু অতিশয় অন্তরঙ্গ বস্তু। মানুষের ভিতর হইতে তার ধর্ম্ম ফুটিয়া উঠিবে। বাহির হইতে, এ বস্তু কেহ কাহাকেও দান করিতে পারে না। আর ধর্ম্ম যদি ভিতর হইতেই ফুটিয়া উঠে, ইহাই যদি ধর্ম্মের প্রকৃতি হয়, তাহা হইলে, প্রত্যেক মানুষের ধর্ম্ম তার নিজস্ব বস্তু হওয়াই চাই। ভিতর হইতে আমাদের ভাল মন্দ যাই ফুটিয়া উঠুক না কেন, তাই কেবল আমাদের নিজস্ব বস্তু, অন্য বস্তু সেরূপভাবে আমাদের নিজের বস্তু নহে, কখনই হইতে পারে না। সুতরাং প্রত্যেকের ধর্ম্মকে তার ভিতর হইতেই ফুটাইয়া তোলা চাই। আর ইহা করিতে গেলেই, তার ভিতরকার প্রকৃতিকে ভাল করিয়া জানা, ভাল করিয়া বোঝা একান্তই আবশ্যক। যাঁরা মানুষের ভিতরকার প্রকৃতিকে প্রত্যক্ষ করিতে পারেন না, যাঁদের অন্তর্দৃষ্টি খোলে নাই, তাঁহারা এ জন্য কখনো প্রকৃত ধর্ম্মোপদেষ্টা হইতে পারেন না। এই অন্তর্দৃষ্টিই প্রকৃত সদ্‌গুরুর লক্ষণ। সাধনবলে যাঁহাদের অধ্যাত্ম-চক্ষু ফুটিয়াছে, মানুষের মুখ দেখিয়াই যাঁহারা তাহার ভিতরকার মতিগতি সব বুঝিতে ও জানিতে পারেন, ও কাহার মধ্যে কোন্ গুণ প্রবল, কাহার ঝোঁক কোন্ দিকে, এ সকল প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন, কেবল তাঁহারাই লোককে সত্যভাবে ধর্ম্ম-পথে লইয়া যাইতে পারেন। অপরের সে অধিকার নাই।

বর্ণাশ্রমের দ্বারা ধর্ম্মের অধিকার বা অনধিকার নির্ণীত হইতে পারে না। ফলত সাধন-বিষয়ে, অন্তরঙ্গ ব্যাপারে, বর্ণাশ্রম কখনোই আমাদের দেশে ধর্ম্মের নিয়ন্তা ছিল বলিয়াও বোধ হয় না। বর্ণাশ্রমের প্রভাব যখন অতিশয় প্রবল ছিল, তখনো প্রকৃত ধর্ম্মের অধিকার-অনধিকার-বিচার সমাজ করিত না, কিন্তু কেবল সদ্‌গুরুই করিতেন। কে কোন্ সাধনের অধিকারী, কে কোন্ পন্থা অবলম্বন করিবে, কোন্ শিক্ষার ও কোন্ অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া কে আপনার জীবনের ও প্রকৃতির পরিণতি লাভ করিতে পারিবে, এ প্রশ্নের মীমাংসা কেবল অধ্যাত্ম-সম্পদসম্পন্ন সদ্‌গুরুই করিতে পারেন। সুতরাং অধিকারীভেদ মানিলেই যে বর্ণাশ্রম মানিতে হইবে, এমন কোনো কথা নাই; কিন্তু সদ্‌গুরু মানিতেই হইবে, ইহা ঠিক। আইন আছে অথচ বিচারক নাই, এ যেমন অলীক কথা, ব্যর্থ কল্পনা; তেমনি ধর্ম্মে অধিকারী-অনধিকারীভেদ আছে, অথচ এমন কোনো ব্যক্তি নাই, যিনি এ বিষয়ের যথাযথ বিচার করিতে পারেন, ইহাও তেমনি অলীক কল্পনা, ব্যর্থ বিতণ্ডা মাত্র। ধর্ম্মে অধিকারীভেদ মানিলেই ধর্ম্মসাধনে গুরু-আনুগত্যের আবশ্যকতাও স্বীকার করিতেই হইবে।

ধর্ম্মে অধিকারীভেদ মানিলেই, ধর্ম্ম-সাধনে গুরু স্বীকার করিতেই হইবে। কার কি অধিকার, অথবা সাধকের কোন্ সাধনে অধিকার, ইহা কেবল সদ্‌গুরুই বুঝিতে পারেন। আর তিনিই কেবল প্রত্যেক শিষ্যের অন্তঃপ্রকৃতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া, তাহাকে উপযোগী সাধন-পথে পরিচালিত করিতে পারেন। আর সদ্‌গুরু এরূপভাবে শিষ্যকে ধর্ম্মপথে এগিয়ে দেন বলিয়া,

তাঁর উপদেশ বা আদেশ সর্ব্বথা এক হয় না। কাহাকেও তিনি জ্ঞানমার্গে, স্বাধ্যায়-তপস্যায়, ধ্যানধারণাদির পথে, কাহাকেও কর্ম্মমার্গে, যাগযজ্ঞাদির পথে, কাহাকেও ভক্তিমার্গে, নামজপকীর্ত্তনাদির পথে, পরিচালিত করিয়া থাকেন। এইরূপে প্রত্যেক শিষ্যকে তিনি তার ঠিক উপযোগী সাধন দান করিয়া থাকেন।

ধর্ম্মে অধিকারীভেদ মানিলে যেমন সদ্‌গুরু অবলম্বন করা আবশ্যক হইয়া উঠে, সেইরূপ মতামতের প্রতি একটা ঐকান্তিক উপেক্ষাও জন্মিয়া থাকে। মত মনের কথা। এই মন আমাদের একাদশ ইন্দ্রিয়। অতীন্দ্রিয় ব্যাপারে মনের দন্তস্ফুট করিবার অধিকার নাই। মন যে অতীন্দ্রিয় জগৎ রচনা করে, তাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়াদির উপরে, ইহাদেরই সংযোগে রচিত হয়। আমাদের মতামতের দ্বারা, আমরা কিরূপ ভাবনা ভাবি, কিরূপ কল্পনা জল্পনা করি। কোন্ দিকে আমাদের প্রকৃতির ঝোঁক ইহা কতকটা বোঝা যায় সত্য, কিন্তু তাহার উপরে আমাদের সত্যিকার, আমাদের ভিতরকার ধর্ম্ম কখনো প্রকৃত পক্ষে গড়িয়া উঠে না। আজ যাহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতেছি, কাল তাহাকে অসত্য বলিয়া বর্জ্জন করিতেছি। মতামতের ইতিহাস সর্ব্বথাই এইরূপ। মত ও সত্যে প্রভেদ এই। মত মানসিক বস্তু, মনগড়া জিনিষ। সত্য মন গ্রহণ করে মাত্র, কিন্তু আপনি সৃজন করে না। সত্য বস্তুতন্ত্র। বস্তুসাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়। সত্য প্রত্যক্ষগোচর, প্রত্যক্ষগ্রাহ্য। মত উপমান অনুমানাদির উপরে প্রতিষ্ঠিত। যাহা অনুমান উপমানাদির উপরে রচিত হয়, তার পরিবর্ত্তন, সংশোধন, বর্জ্জনাদি সম্ভব। কিন্তু প্রত্যক্ষ বিষয়ে জ্ঞানের পরিবর্ত্তন সম্ভব নহে। সুতরাং সত্য বস্তু নিত্য, তার ক্ষয়বৃদ্ধি নাই। মত অনিত্য ভাঙ্গে ও গড়ে। আমরা এক দিন যাহা সত্য বলিয়া ভাবি, আর এক দিন তাহাকেই অসত্য বলিয়া বর্জ্জন করিতে পারি। আর এইরূপ ভাঙ্গা-গড়ার ভিতর দিয়াই, আমাদের ভিতরকার প্রকৃতি ক্রমে ফুটিয়া উঠে। এই ভাঙ্গা-গড়াকে যে ভয় করে, সে জীবনের নাড়া-চাড়া দেখিয়া ভীত হইয়া, মৃত্যুকে আশ্রয় করিতে যায়। যেখানে জীবন সেখানেই পরিবর্ত্তন। সেখানেই ভাঙ্গাগড়া। ধর্ম্ম যেখানে জীবন্ত, সেখানেই তাহা নিত্য নূতনভাবে ফুটিয়া উঠে, নিত্য নূতন অভিজ্ঞতা লাভ করে, নিত্য নূতন তত্ত্ব সংগ্রহ করে। আর সেই জন্য, এই নিত্য বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তার মতামতেরও সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তন সম্ভব কেবল নহে, পরি-বর্ত্তন একরূপ অনিবার্য্য। এই পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়াই, ধর্ম্মে অধিকারীভেদ যাঁরা মানেন, ভিতরকার প্রকৃতির উপরে যাঁরা ধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করেন, কেবল মাত্র আত্মসাক্ষাৎকারকে যাঁরা ধর্ম্মের প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করেন, তাঁরা মানসিক কল্পনা-জল্পনার প্রতি তেমন দৃক্‌পাত করেন না। গাছের যেমন পাতা-পল্লব, ধার্ম্মিকের অন্তরস্থ ধর্ম্মের সেইরূপ এ সকল মতামত। গাছ যখন সজীব থাকে তখন গাছ বাড়িতে থাকে, তখন তার এক পাতা ঝড়ে, আর

এক পাতা গজায়। ইহাই তার জীবনের ও বিকাশের চিহ্ন। এই ঝড়তি-পড়তি দেখিয়া কেহ গাছ নষ্ট হইতেছে এমন ভাবেন না। সেইরূপ ধর্ম্ম যখন সত্যি-সত্যি অন্তরে ফুটিতে আরম্ভ করে, তখন বাহিরের মতামতের বাড়তি-পড়তি দেখিয়া ভীত হইবার কোনো কারণ থাকে না। এই ঝড়তি-পড়তিই, তার বিকাশের চিহ্ন, তার জীবনের প্রমাণ।

গুরু শিষ্যের অন্তরে তার ভিতরকার প্রকৃতির উপরে ধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন, সেই প্রকৃতি হইতে, সেই প্রকৃতিরই উপযোগী করিয়া, সদ্‌গুরু শিষ্যের ধর্ম্মকে গড়িয়া তুলিতে চাহেন। তাই বলিয়া তিনি কখনো তাঁর মতামতের প্রতি অত্যধিক দৃষ্টিপাত করেন না। শিষ্যের জীবন্ত, সতেজ মতগুলিকে, অপূর্ণ বা ভ্রান্ত বলিয়া টানিয়া ছিঁড়িতেও চান না। আর শুষ্ক পড়ন্ত মতগুলিকে বাহিরের যুক্তি দ্বারা ধরিয়া রাখিতেও চেষ্টা করেন না। আপনা হইতে শিষ্যের মানসক্ষেত্রে যে মতামত গজাইয়া উঠে, তাহা গজা'ক; আপনা হইতে যাহা ঝড়িয়া পড়ে, তাহা পড়ুক। উভয়েরই প্রতি উদাসীন থাকিয়া, তিনি তাঁর ভিতর-কার প্রকৃতিটাকেই জাগাইয়া, বাঁচাইয়া, ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করেন। মতের বন্ধনেই সম্প্রদায় গড়ে। সদ্‌গুরুর আশ্রয়ে এজন্ত প্রকৃত পক্ষে কোনো সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিতে পারে না। আমাদের দেশে শাক্ত-বৈষ্ণব, ব্রাহ্মণ-শূদ্র, এমন কি হিন্দু-মুসলমানও, কখনো কখনো এক সদ্‌গুরুর চরণাশ্রিত হইয়া ধর্ম্মসাধন করিয়াছেন, এমনো দেখা গিয়াছে। এইরূপ সদ্‌গুরুই ধর্ম্মে অধিকারীভেদ নির্ণয় করিতে পারেন। এইরূপ সদ্‌গুরুই প্রকৃত ধর্ম্মের অবলম্বন ও আশ্রয়। বিচারক যেমন আইনের আশ্রয় ও অবলম্বন, বৈদ্য যেমন চিকিৎসার আশ্রয় ও অবলম্বন, ধনী যেমন ব্যবসা-বাণিজ্যের আশ্রয় ও অবলম্বন, বিদ্বান্ যেমন বিদ্যার আশ্রয় ও অবলম্বন, সদ্‌গুরু সেইরূপ ধর্ম্মের আশ্রয় ও অবলম্বন।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

এ জগত কার!

কার এ জগত কার!
কার এ আলো রূপের রাশি
কার এ অন্ধকার!
কার হে আমি কার হে তুমি,
কার এ বিপুল বিশাল ভূমি,
কার এ সিন্ধু আকাশ চুমি
দিগন্ত প্রসার!

কার হে এমন আসা যাওয়া,
পলে পলে নূতন হওয়া,
এমন চাওয়া এমন পাওয়া
কার হে চমৎকার!
কার দরশন মাগি ভুবন,
কাটায় হে তার দীর্ঘ জীবন,
ফিরে ফিরে কাহার মিলন
চাহি বারম্বার!

শ্রীহেমলতা দেবী।

প্রকৃত নির্ব্বাণ কি?

(পূর্ব্বপ্রবন্ধের অনুবৃত্তি)

এখন শুধু মুক্তিতত্ত্বের চতুর্থ সত্যটির কথা বলা বাকী আছে,—সেই অষ্ট আর্য্য-মার্গ; অর্থাৎ সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সঙ্কল্প, সম্যক্ কার্য্য, সম্যক্ কর্ম্মান্ত, সম্যক্ আজীব, সম্যক্ ব্যায়াম্, সম্যক্ স্মৃতি ও সম্যক্ সমাধি। এই অষ্টমার্গ-সত্যের উপর বৌদ্ধধর্ম্মনীতি প্রতিষ্ঠিত; ইহা হইতেই সমস্ত বিধি ও নিষেধ নিঃসৃত হইয়াছে। এ কথা যেন আমরা ভুলিয়া না যাই যে, বৌদ্ধধর্ম্ম মুখ্যতঃ একটি নৈতিক ধর্ম্ম; যে সকল দার্শনিক সিদ্ধান্তের দ্বারা সৃষ্টি, জগতের নিত্যতা, মূলসত্তা, এমন কি, পরব্রহ্ম—এই সকল মহারহস্য ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে—বৌদ্ধধর্ম্মের নিকট এই সকল দার্শনিক সিদ্ধান্ত গৌণ বিষয়। শাক্যমুনির কথায় ইহার অসংখ্য প্রমাণ পাওয়া যায়; এই সকল বিষয়-সম্বন্ধে তাঁহাকে প্রশ্ন করিলে, তিনি প্রায়ই উত্তর দিতেন না; যে কারণে তিনি উত্তর দিতেন না তাহা এই—উহার দ্বারা মানুষের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উন্নতি সাধিত হইতে পারে না; মানুষের মুক্তির জন্য উহা অনাবশ্যক; যে আপনার মুক্তি ইচ্ছা করিবে তাহাকে উহা ছাড়া অন্য উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, এই সকল রহস্যের সমাধান মুক্তির উপায় নহে। বুদ্ধের কোন শিষ্য বুদ্ধকে যখন এই কথা জিজ্ঞাসা করেন,—দার্শনশাস্ত্রের যে গুলি সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর প্রশ্ন তাহার উত্তর দিতে তিনি কেন বিরত হন, তখন গুরুশিষ্যের মধ্যে যে কথোপকথন হয়, সেই কথোপকথনের মধ্যে এই কথাটি বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। শাক্যমুনি বলিলেন, আমি কি তোমার প্রশ্নের উত্তরে তোমাকে বলিয়াছি, জগৎ নিত্য কি অনিত্য এই সম্বন্ধে তোমাকে উপদেশ দিব,—পরলোকের রহস্য সকল তোমার নিকট প্রকাশ করিব? শিষ্য উত্তর করিলেন—না! যদি কাহাকে কেহ সাঙ্ঘাতিক আঘাত করে, যতক্ষণ না চিকিৎসক তাহাকে বুঝাইয়া বলিবে, কে তাহাকে আঘাত করিল, তাহার আঘাতকারী ক্ষুদ্র কি বৃহৎ, উদারচেতা কি দীনচেতা, ততক্ষণ কি সেই চিকিৎসক তাহার চিকিৎসা করিতে বিরত থাকিবে?—কখনই না। তাই বলিয়াছি, নিত্য ও অসীম সম্বন্ধে বুদ্ধ যদি কিছু উপদেশ দিয়া না থাকেন, কিছু প্রকাশ করিয়া না থাকেন, তবে সে এই কারণে যে, তাহাতে মুক্তির পথে কোন সাহায্য হয় না। একটী মাত্র বিষয় যাহা জানা আবশ্যক তাহা এই—কোন্ পথ অবলম্বন করিলে, পরম শান্তি ও নির্ব্বাণে উপনীত হওয়া যায়।

কিন্তু আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই শান্তি-রাজ্যে প্রবেশ করিতে হইলে, নীতি চাই, বিজ্ঞান চাই, ধর্ম্মের সাধনা চাই; শান্তি লাভের পক্ষে এগুলি অপরিহার্য্য। যে কেহ ছয়টি মুখ্য সদ্‌গুণের এবং তদুৎপন্ন গৌণ সদ্‌গুণের সাধনা না করে, তাহার মুক্তিলাভের কোন সম্ভাবনা নাই। এক কথায়, নৈতিক

সিদ্ধি,—নির্ব্বাণের সহিত, মুক্তির সহিত দুশ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। এই সিদ্ধি লাভ করিতে হইলে, সম্পূর্ণরূপে আত্মবিসর্জ্জন করা চাই, সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ স্বীকার করা চাই, নিঃস্বার্থ হওয়া চাই, স্বকীয় সৎকর্ম্মের জন্য—কি বর্ত্তমান কি ভবিষ্যৎ—কোন প্রকার পুরস্কারের অভিলাষ করিবে না। বৌদ্ধ ভিক্ষুর ভিক্ষা দেওয়া নিষিদ্ধ, কেননা ভিক্ষা দিলে, দানজনিত সুখ হয়, আনন্দ হয়।

এই কারণেই বৌদ্ধধর্ম্ম একটী শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। ফলত, রিপুদিগকে দমন করা, সমস্ত আনন্দ সমস্ত সুখকে বিসর্জ্জন করা, জীবনের সমস্ত দৈন্য জীবন হইতে অপনীত করা এবং এই সমস্ত আপনাকে ছাড়া আর কাহাকে পীড়া না দিয়া সাধন করা—ইহা সামান্ত বীরত্ব নহে।

এই ছয়টী মুখ্য সদ্‌গুণ;—প্রজ্ঞা, চিত্তশুদ্ধি, ভিক্ষাদান, বীর্য্য, ক্ষান্তি ও মৈত্রী। ইহা সহজেই বুঝা যায়,—যে সকল প্রকৃত সম্পদ মোক্ষের সাধন, সেই সকল সম্পদের সহিত মিথ্যা সম্পদের পার্থক্য জ্ঞান—ইহাই বৌদ্ধদিগের প্রজ্ঞা। এই প্রজ্ঞার দ্বারা মুক্তির প্রকৃত মার্গ জানা যায়। ইহা জানিবার জন্য ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের যাহা মূল ভিত্তি সেই শ্রুতির আবশ্যকতা নাই। বৌদ্ধেরা বেদকে অস্বীকার করে। চিত্তশুদ্ধির দ্বারা বৌদ্ধেরা, সমস্ত ইন্দ্রিয়-সুখকে ভীষণ রিপুজ্ঞানে পরিত্যাগ করে। এই রিপুদিগের সহিত সংগ্রাম করিবার জন্যই বীর্য্যের আবশ্যকতা। ক্ষান্তি ও ধৈর্য্যের দ্বারা বৌদ্ধেরা অম্লানবদনে সংসারের সমস্ত দুঃখ-কষ্ট, সমস্ত দশাবিপর্য্যয় সহ্য করিয়া থাকে। অন্যকে ভালবাসা, কাহারও কোন অনিষ্ট না করা, ভিক্ষা দান করা, অন্যের দোষ মার্জ্জনা করা—ইহাই মৈত্রীর উপদেশ।

দেখিবে,—আর্য্য-অষ্টমার্গের সংখ্যা নির্দ্দেশ-কালে প্রত্যেকের গোড়ায় "সম্যক্‌" অর্থাৎ বিশুদ্ধ এই বিশেষণটী প্রযুক্ত হইয়াছে। ফলত বৌদ্ধের পক্ষে চিত্তশুদ্ধিই ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা। ধম্মপদে আছে;—"যাহার কার্য্য বিশুদ্ধ, যাহার সংকল্প বিশুদ্ধ, আনন্দ তাহাকে ছায়ার ন্যায় অনুসরণ করে।"

আমরা একটু পরে দেখিতে পাইব, বৌদ্ধদের মধ্যে, ভিক্ষু ও সংসারী এই দুই শ্রেণীই আছে। নিষেধমূলক উপদেশ ভিক্ষুর পক্ষে একপ্রকার, সংসারীর পক্ষে অন্য প্রকার। কতকগুলি সাধারণ উপদেশ আছে—যাহা কি ভিক্ষু কি সংসারী—সকলেরই পালনীয়। আর কতকগুলি বিশেষ উপদেশ আছে যাহা একমাত্র ভিক্ষুদের প্রতি প্রযুজ্য।

সাধারণত বৌদ্ধেরা বীজমন্ত্র আবৃত্তি করিয়া এইরূপ প্রতিজ্ঞা করে—আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি;—(১) কোন প্রকার জীব হিংসা করিব না; (২) চুরী করিব না; (৩) ব্যভিচার করিব না; (৪) মিথ্যা-কথন, প্রবঞ্চনা, পরনিন্দা করিব না; (৫) সুরাপান করিব না। অতএব বৌদ্ধধর্ম্মের মতে, জীবহিংসা একেবারেই নিষিদ্ধ, জীবহিংসা করিলে পরজন্মে সদ্‌গতি হয় না। তাই বৌদ্ধেরা এই উপদেশটি একটু অতিরিক্ত সীমায় লইয়া যায়। পাছে কোন ক্ষুদ্র কীট কিম্বা কৃমি হত্যা হয়, এই জন্য উহারা জল

ছাঁকিয়া পান করে। ভিক্ষুদিগের কৌষিক বস্ত্র পরিধান করা নিষিদ্ধ; কেননা, তাহা হইলে তন্তুবায়রা বহুসংখ্যক কীট হত্যা করিয়া তাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে বাধ্য হইবে। বৌদ্ধদিগের কোন প্রকার অস্ত্র—এমন কি ছড়িটি পর্য্যন্ত ধারণ করা নিষিদ্ধ।

পরনিন্দা করাও বৌদ্ধধর্ম্মে বিশেষরূপে নিষিদ্ধ। এমন কোন কথা বলিবে না যাহাতে পরস্পরের মধ্যে মনান্তর বা বিচ্ছেদ ঘটিতে পারে। সকলের মধ্যে মিলন ও সদ্ভাব স্থাপন করাই বৌদ্ধদিগের মুখ্য কার্য্য। কিন্তু বৌদ্ধদিগের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা কোন্ কাজ শ্লাঘ্য? না, অনিষ্টাচরণের জন্য অনিষ্টকারীকে ক্ষমা করা। ধম্মপদের এই অংশটি তাহার প্রমাণ।—"সে আমাকে ঠকাইয়াছে, মারিয়াছে, আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছে; শত্রুতাকে প্রেমের দ্বারা জয় করিবে। ইহাই নিত্যকালের ধর্ম্ম।" এই প্রসঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্মের একটী সুন্দর গল্প "দিব্য-অবদান" হইতে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। এই অংশের নাম "অশোক-অবদান"।

ইহা শত্রুর প্রতি প্রীতি ও ক্ষমার একটী সুন্দর দৃষ্টান্ত। রাজকুমার কুণাল মহারাজা অশোকের পুত্র। কুণালের মাতার নাম পদ্মাবতী। কুণাল যখন ভূমিষ্ঠ হয়, তখন সেই শিশুর অনুপম সৌন্দর্য্যে সকলে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। বিশেষত তাহার নেত্রযুগল দীর্ঘায়ত ও যার পর নাই প্রভাবিশিষ্ট ছিল। যখন সে বড় হইয়া উঠিল, পিতা তাহার বিবাহ দিলেন। কিন্তু একজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর সহিত আলাপ-পরিচয় হওয়ায়, রাজকুমার আশ্রমে প্রবেশ করিয়া ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। একদিন তাহার পিতার রক্ষিতা তিষ্যা কুণালের রূপে মুগ্ধ হইয়া, কুণালের নিকট স্বকীয় অনুরাগ জানাইল। কিন্তু কুণাল এইরূপ উত্তর করিলেন:—"একজন পুত্রের নিকট এরূপ পাপ-কথা উচ্চারণ করিও না, কেননা, তুমি আমার মাতৃতুল্য; এরূপ অসংযত পাপ-বাসনা পরিত্যাগ কর।" প্রত্যাখ্যাত হইয়া তিষ্যা রোষভরে তাহাকে মৃত্যুভয় প্রদর্শন করিল। কুণাল উত্তর করিলেন, "জননি, শুদ্ধচরিত্র থাকিয়া বরং আমি মৃত্যুকে বরণ করিব তথাপি আমার কর্ত্তব্য পথ হইতে ভ্রষ্ট হইব না। এমন কাজ আমি করিতে চাহি না যাহাতে সাধুলোকদিগের আমি নিন্দার পাত্র হইব।" রাণী প্রতিশোধ লইবার জন্য কৃতসংকল্প হইলেন। সেই সময়ে একটা উপলক্ষ্যও উপস্থিত হইল। মহারাজা কুণালকে একটা বিদ্রোহী নগরকে দমন করিবার জন্য পাঠাইয়া দেন। কুণাল স্বকীয় কার্য্যে সংসিদ্ধ হইলে পর তিষ্যা, মহারাজা অশোকের গজদন্তের সিলমোহর অপহরণ করিয়া, সেই সিলমোহরের ছাপ দিয়া কুণালের চক্ষু উৎপাটন করিবার আদেশ পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু কোন ঘাতকই এই নিষ্ঠুর কার্য্য করিতে সম্মত হইল না, কেবল একজন বিরূপ বিকৃতাঙ্গ ব্যক্তি এই কার্য্য করিতে স্বীকৃত হইল। যুবরাজের একটী চক্ষু উৎপাটিত হইল। রাজ্যের সমস্ত লোক হাহাকার করিতে লাগিল। উৎপাটিত

চক্ষু হস্তে লইয়া কুণাল এইরূপ বলিলেন—রে স্থূল-মাংস গোলক! পূর্ব্বের ন্যায় এখন তুই পদার্থের রূপ দর্শন করিতে পারিতেছিস্ না কি? মূঢ়েরা তোর প্রতি আসক্ত হইয়া মোহবশতই এইরূপ বলে—"এই চক্ষুই আমি!" দ্বিতীয় চক্ষু উৎপাটিত হইলে কুণাল বলিয়া উঠিলেন—চর্ম্ম-চক্ষু আমা হইতে অপনীত হইয়াছে, আমি এখন দিব্যচক্ষু লাভ করিয়াছি।" তাহার পর যখন শুনিলেন, তিষ্যাই তাঁহার এই সকল দুর্গতির মূলীভূত কারণ, তখন তিনি শুধু এই কথা বলিলেন:—তিনি চিরজীবী হউন, তিনি চিরসুখী হউন; তাঁহার প্রভাব চিরস্থায়ী হউক।" কিন্তু কুণালের পত্নী কুণালের এই দুর্দ্দশার কথা শুনিয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে কুণালের পায়ে আসিয়া পড়িল। কুণাল তাহাকে এই বলিয়া সান্ত্বনা করিলেন—"আর কাঁদিও না, এই জগৎ কর্ম্মেরই পরিণাম, কর্ম্মফলেই মানুষ দুঃখ পায়; প্রিয়জনের সহিত বিচ্ছেদ ভোগ করিবার জন্যই মানুষের জন্ম;—এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া তুমি ক্রন্দনে বিরত হও।" ভিক্ষু-ব্রত অবলম্বন করিবার পর, কুণাল একদিন পিতৃ-প্রাসাদে আসিলেন। মহারাজা অশোক পুত্রের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। পরে সংজ্ঞালাভ করিয়া পুত্রের প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন; ক্রমে দয়া আসিয়া ক্রোধের স্থান অধিকার করিল। অশোক জিজ্ঞাসা করিলেন, কে এই নিষ্ঠুর জঘন্য কাজ করিয়াছে? শুনিলেন, রাণী তিষ্যা এই কাজ করিয়াছে। রাজা আদেশ করিলেন, যাহা সর্ব্বাপেক্ষা নৃশংস দণ্ড, তৃষ্যার প্রতি সেই দণ্ড বিধান করা হউক। কিন্তু কুণাল মর্ম্মাহত হইয়া বলিলেন—যদি রাণী হীন কার্য্য করিয়া থাকেন, আপনি মহত্ত্ব প্রদর্শন করুন, আপনি স্ত্রীহত্যা করিবেন না। কেননা, মৈত্রী অপেক্ষা পুণ্য আর কিছুই নাই। ভগবান ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রচার করিয়া গিয়াছেন।" তাহার পর কুণাল, অশোকের পদতলে পতিত হইয়া এইরূপ বলিতে লাগিলেন; "মহারাজ! আপনি আমার জন্য কিছুমাত্র দুঃখ করিবেন না; এই নিষ্ঠুরাচরণে, আমার রোষানল উদ্দীপিত হয় নাই। যিনি আমার চক্ষু উৎপাটন করিতে আদেশ করিয়াছিলেন সেই জননীর প্রতি মৈত্রী ভাব ভিন্ন আমার হৃদয়ে আর কোন ভাব নাই। এই সকল সত্য বাক্যের নামে, আমার নেত্র যেন আবার পূর্ব্ব অবস্থা লাভ করে।"

যে সকল সদ্‌গুণকে বুদ্ধ সর্ব্বাপেক্ষা শ্লাঘ্য বলিয়া মনে করিতেন, মৈত্রী তাহার মধ্যে একটি। তিনি বলিতেন—"আমার হৃদয় মৈত্রীর দ্বারা পূর্ণ—আমার হৃদয়ে বিদ্বেষ মাত্র নাই—আমি মৈত্রীর দ্বারা সমাচ্ছন্ন। সর্ব্বতোভাবে, ও পূর্ণ প্রভাব সহকারে, এই মৈত্রী-বল আমি সমস্ত জগতের উপর ছাড়িয়া দিলাম। মৈত্রী-বলই আমার মুখ্য অবলম্বন।" সম্পূর্ণ আত্মবিসর্জ্জনই এই মৈত্রীভাবের পূর্ণ পরিণতি। মৈত্রীর কোন নির্দ্দিষ্ট সীমা নাই। যে বৌদ্ধ সিদ্ধি লাভ করিতে চাহেন তিনি সর্ব্বপ্রযত্নে মৈত্রীভাব অর্জ্জন করিবেন।

কিন্তু ভিক্ষুদিগকে ভিক্ষা দান করা সংসারী বৌদ্ধদিগের অবশ্যকর্ত্তব্য নহে। সেটা তাহার স্বেচ্ছাধীন; ভিক্ষা দিতেও পারে, না দিতেও পারে। তা ছাড়া বৌদ্ধধর্ম্মে ভিক্ষাদান একটা পুণ্যের কাজ; যে ভিক্ষা দান করে তাহারই পুণ্য হয়। অতএব ভিক্ষা দিয়া ভিক্ষাদাতাই গৃহীতার নিকট বাধিত হয়। ভিক্ষা-গৃহীতা ভিক্ষাদাতার নিকট বাধিত হয় না। তাই যখন কোন বৌদ্ধ কোন গুরুতর অপরাধ করে, তখন দণ্ডস্বরূপ তাহার ভিক্ষা কেহ গ্রহণ করিবে না, এইরূপ আদেশ প্রচার করা হয়।

আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, সংসারী বৌদ্ধ-দিগের শুধু পাঁচটী প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু বৌদ্ধ ভিক্ষুদের জন্য আরও তিনটী প্রতিজ্ঞা সংযোজিত হইয়াছে। (১) অসময়ে অর্থাৎ মধ্যাহ্নের পর আহার করিবে না; (২) লৌকিক ধরণের নৃত্য-গীত করিবে না—সমস্ত পার্থিব সুখ বিসর্জ্জন করিবে; (৩) সাজসজ্জা ও সুগন্ধী দ্রব্য ব্যবহার করিবে না।　　(ক্রমশ)

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আমার জীবন।

নবীনচন্দ্র সেন।

প্রথমেই নিবেদনে লেখা আছে, "বহু বৎসর ব্যাপিয়া লেখকের অবসর ক্রমে এই জীবনী লিখিত"—ইহাতে "স্থানে স্থানে পুনরুক্তি হইয়াছে।" উপক্রমণিকায় লেখা আছে "এই মধ্য জীবনে দাঁড়াইয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলে, যে সকল ঝটিকা-বিলোড়িত অরণ্যানী ও ভূধরমালা অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি তাহা দেখিয়া ভবিষ্যতের জন্য সাহস ও শান্তি লাভ করিতে পারিব; সমাজের ও সংসারের যে সকল বিশ্বাস-ঘাতক বালুকাচর ও গহ্বর পার হইয়া আসিয়াছি, তাহা দেখিয়া অনেক শিক্ষা, অনেক সতর্কতা, লাভ করিতে পারিব; এবং মেঘান্তরিত প্রাবৃট্-চন্দ্রমার ন্যায় কদাচিৎ যে সুখের, শান্তির ও স্নেহের মুখ দেখিয়াছি, তাহা দেখিয়া ভবিষ্যৎ কথঞ্চিৎ আশায় পূর্ণ করিতে পারিব; এই সাহস, এই শিক্ষা, এই সান্ত্বনার আশায় আজ আত্মজীবনের আলোচনা করিতে বসিলাম।"

দ্বিতীয় খণ্ডের নিবেদনে লেখা আছে "এই 'আমার জীবন' পাঁচ ভাগে বিভক্ত।" কবি নবীনচন্দ্রের বড় ইচ্ছা ছিল যাহাতে এই পাচ ভাগই তাঁহার জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয়। কবির মৃত্যুতে তাহা হইল না। প্রথমভাগ বোধ হয় তিনি প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। দ্বিতীয় ভাগ তাঁহার উপযুক্ত পুত্র শ্রীমান নির্ম্মলচন্দ্র সেন

প্রকাশ করিয়াছেন। আর বাকী তিন ভাগও যাহাতে শীঘ্র প্রকাশিত হয় তাহার বিশেষ চেষ্টা করিবেন বলিয়াছেন। সেও আজ এক বৎসরের কথা। তৃতীয় ভাগ যে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা আমরা জানি না। প্রথম দুই ভাগই আমরা "বঙ্গদর্শনে" সমালোচনার্থ পাইয়াছি। গ্রন্থখণ্ডের সমালোচনা সম্ভবে না, তথাপি দুই চারি কথা লিখিতেছি।

সমালোচনার মোটামুটি দুইটা উদ্দেশ্য। (১) গ্রন্থের পরিচয় প্রদান। (২) গ্রন্থের উন্নতিকল্পে গ্রন্থকারকে উপদেশ দান। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের সমালোচনার এই দ্বিতীয় উদ্দেশ্য থাকিতেই পারে না। গ্রন্থের পরিচয় আমরা অতীব আহ্লাদ-সহকারে পাঠকবর্গ সমক্ষে উপস্থাপিত করিতেছি।

বাঙ্গালায় দুই চারি খানি আত্মচরিত আছে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মচরিত, শ্রীযুক্ত কিশোরীলাল সরকার মহাশয়ের মাতৃদেবীর স্ব-লিখিত আংশিক জীবনচরিত, বঙ্গবাসী হইতে প্রকাশিত "বঙ্গ-ভাষার লেখক"গণের কাহার কাহার অল্প-বিস্তর জীবনবৃত্তান্ত প্রভৃতি দুই চারি খানি গ্রন্থ আছে, নবীনচন্দ্রের 'আমার জীবনে'র মত এত বড় সুবৃহৎ গ্রন্থ বাঙ্গালায় নাই। কবি ইহাতে আপনার শিক্ষা, দীক্ষা, পরীক্ষার বিস্তারিত পরিচয় দিয়াছেন। আপনার জীবনকাল ভোর, বঙ্গের অনেক স্থলের সামাজিক, নৈতিক, রাজনৈতিক অবস্থার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। "পিতৃহীন যুবকের" দুর্দ্দশার কথা এমন করুণচ্ছন্দ, এমন হৃদয় খুলিয়া বিবৃত করিয়াছেন যে, পড়িতে পড়িতে পাষণ্ডের হৃদয়ও বিগলিত হয়, কবির ব্যথায় ব্যথিত হইয়া তাঁহার সঙ্গে কাঁদিতে ইচ্ছা করে, আর জীবন্ত দুঃখ সম্মুখে মূর্ত্তিমন্ত দেখিয়া, কবিকে আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা করণার্থ, ভগবানের সমীপে কাতর কণ্ঠে নিবেদন-ধ্বনি আপনা আপনি পাঠকের মুখ হইতে বিনির্গত হয়।

প্রথমভাগে নবীনচন্দ্রের পুত্র-জীবন বিবৃত হইয়াছে। পুরাণ-প্রসিদ্ধ ভাষায় বলিতে গেলে নবীন বড় দুরন্ত বালক ছিলেন। কিন্তু বড় মেধাবী। ছেলে ভাল, কিন্তু বড় দুষ্ট। নবীন আপনার দুষ্টামির অনেক পরিচয় দিয়াছেন, অবশ্য অনেক দেন নাই। সকল কথা কিছু "আমার জীবনে" লেখা যায় না। যে সকল দুষ্টামিতে কিঞ্চিৎ রঙ্গরস ছিল, তাহার কতক কতক আমরা পাইয়াছি। তাহাতেই আমাদের যথেষ্ট হইয়াছে। একজন মাষ্টার, একজন পণ্ডিত এবং একজন মুনসী সাহেবের যে ফটো আমরা পাইয়াছি তাহা জীবন্ত প্রতিকৃতি।

প্রথম খণ্ডে অনেকগুলি ফটো আছে। এই খণ্ড একখানি আলবম্ বা ফটো-সংগ্রহ বলিলেই চলে।

নবীনচন্দ্রের পিতৃদেবের—গোপী-মোহনের—চিত্র অতি উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত হইয়াছে। তাহার পুত্র-স্নেহপূর্ণ হৃদয়, বিপন্নের প্রতি করুণাসিক্ত মন, উজ্জ্বল গৌরাঙ্গ দেহ, একান্ত মনে দীর্ঘকাল-ব্যাপিনী পূজা-অর্চনা, অবারিত দ্বার,

আত্মীয়-পোষণ ও রক্ষণ, অকাতর-মুক্ত-হস্ততা, এবং সেই মুক্তহস্ততার জন্য ক্রমেই অধিকতর ঋণগ্রস্ত হওয়া, এবং শেষে সেই ঋণভারে তনুত্যাগ, এই সকল অতি উজ্জ্বল বর্ণে, মনের ঐকান্তিক প্রীতি, চক্ষুর ধারাবাহিক অশ্রু দিয়া নবীনচন্দ্র চিত্রিত করিয়াছেন। মাতার স্নেহ, অমায়িকতা, সরলতা, পতিনিষ্ঠা, অপরিস্ফুট বর্ণে হইলেও স্পষ্ট রেখায় চিত্রিত হইয়াছে। জ্ঞাতিগণের ঈর্ষা এবং উপদ্রবের উপরি নবীনচন্দ্রের নিয়ত কটাক্ষ আছে। তাহার ফল বড় বিষময়।

নবীনচন্দ্র ষোল বৎসর বয়স পর্য্যন্ত চট্টগ্রামেই বিদ্যাশিক্ষা করেন। ঐখান হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া কলিকাতায় পড়িতে আসেন। চারি বৎসর কলিকাতায় থাকিয়া এল-এ ও বি-এ দিয়া ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটি চাকরি পান। এইখানেই প্রথম ভাগের শেষ।

প্রথম ভাগে দুইটি বাল্যানুরাগের গল্প আছে; আর বিবাহের বৃত্তান্ত আছে। লেখার ভঙ্গিতে সেগুলি সুপাঠ্য হইয়াছে।

কলিকাতায় মেছের বাসায় উপনিবেশ কালে নবীনচন্দ্র আপনার সুখ-দুঃখের পরিচয় দিয়াছেন। ছাত্রদিগের মধ্যে তিন চারি জন তাহার আত্মীয় ছিলেন, নবীনের সঙ্গে তাঁহাদের অবশ্য সহানুভূতি ছিল, আর দুই জনকে তিনি দ্বেষী মনে করিয়াছিলেন, নড়িতে চড়িতে তাহাদের উপর কটাক্ষ করিয়াছেন। জ্ঞাতিদ্রোহের এই একটি বিষময় ফল। নবীন-চরিত্রে এই জ্ঞাতি-দ্রোহের আরও বিষময় ফল ফলিয়াছে। ১৪০ পৃষ্ঠায় নবীন প্রথমে লিখিলেন "আমার সমস্ত কবিতা সে পথে প্রেরণ করিলে, (অর্থাৎ না ছাপাইয়া ধ্বংস করিলে) এ জীবনে এত ঈর্ষা, এত শত্রুতা, এত দুর্গতি ভোগ করিতে হইত না।" তাহার পরে বলিতেছেন, "পরের প্রশংসা শুনিয়া ও দেখিয়া এ জগতে কয় জন মর্ম্মাহত না হইয়া থাকিতে পারেন?" তাহাতেই বলিতেছি, বাল্যাবধি জ্ঞাতিদ্রোহের মধ্যে লালিতপালিত হওয়াতে নবীনের হৃদয় নিতান্ত কুসংস্কারাচ্ছন্ন হইয়াছিল। পরের ভাল দেখিয়া অনেকেই যদি মর্ম্মাহত হয়, তাহা হইলে এই সংসার সয়তানের রাজ্য! তুমি যে মঙ্গলময়ের মাঙ্গল্য বলিয়াছ; তাহা কেবল মুখের কথা! চন্দ্রকুমার তোমার Friend, philosopher and guide—তোমার সুহৃৎ 'জ্ঞানগুরু' এবং পথপ্রদর্শক—সেই চন্দ্রকুমারের চরিত্রে যখন তুমি ঈর্ষা আরোপিত করিয়াছ, তখন তুমি নিতান্ত কুসংস্কারান্ধ, তোমার জন্য দুঃখ হয়। প্রথমভাগের এই ঈর্ষা-আরোপ—এই ভাগের কলঙ্ক। ইহার আদ্যোপান্তে কিন্তু লোকছবি বড় উজ্জ্বল।

নবীনচন্দ্র তান্ত্রিক পিতার পরম স্নেহের পাত্র ছিলেন। তিনিও পিতাকে পরম ভক্তি করিতেন। দশ বৎসর বয়ক্রম কালে, নবীনচন্দ্র শঙ্কর পুরী স্বামী নামক একজন "সন্ন্যাসীর কাছে, সন্ন্যাস-নিয়মে কর্পূরালোকে" দীক্ষিত হন। সুতরাং সুরাপানে পাপ, এ কথা জীবনে কখন নবীনচন্দ্র মনে করিতে পারেন নাই। তাহার পর, নবীন যখন চট্টগ্রাম স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়েন, তখন সেই শ্রেণীর

মাষ্টার আনন্দ বাবু তাহাকে মুসলমান-পদ-পেশনে প্রস্তুত পাওরুটির লোভ দেখাইয়া 'ব্রাহ্ম' করেন। তৎপূর্ব্বে তিনি পৌত্তলিক ছিলেন। কলিকাতার বাসায় তাঁহারা তিন জন ব্রাহ্ম ছিলেন। "মাঘ মাসে দারুণ শীতে পাতকুয়ার বরফের মত জলে প্রত্যুষে স্নান করিয়া, আমরা পাতলা ফিন্‌ফিনে উড়ানী মাত্র গায়ে দিয়া—না হয়, ত্যাগ-স্বীকার *—প্রত্যেক রবিবার কেশব বাবুর বাটীতে ছুটিতাম।" কেশব বাবু তখন উপাসনা করিতেন। একদিন এই উপাসনায় বিরক্ত হইয়া নবীনের মনে খটকা উঠিল। নবীন লিখিতেছেন "আমি সেদিন হইতে ব্রাহ্মসমাজ ছাড়িলাম এবং কর্ণহীন ক্ষুদ্র তরীর মত সংসার-সমুদ্রে ভাসিতে লাগিলাম।" ব্রাহ্মধর্ম্ম ছাড়িলেন বটে, কিন্তু পাওরুটি নবীনকে ছাড়িল না, আর সুরা ত আছেই। সুতরাং যাহারা আচারকে ধর্ম্মের অঙ্গ বলে, তাহাদের উপর নবীনের তীব্র কটাক্ষ সমানে এই দুই খণ্ডে আছে। হিন্দু-বিবাহ-রীতির উপর নবীনের ভ্রূকুটি কটাক্ষ খেলা করিতে ছাড়ে নাই। এক স্থানে বলিতেছেন "ইহাদের (হিন্দুদের) দুরদৃষ্ট কি শুভাদৃষ্ট বশতই হউক—ঘোরতর মতভেদ আছে; ঘোড়ার আগে গাড়ী, লেখার আগে রেজিষ্টরি, আগে বিবাহ পরে প্রেম।" ইহাতে এমন কেহ মনে করিবেন না যে, 'আগে বিবাহ পরে প্রেম' এই ব্যাপার নবীনচন্দ্র ভালরূপে বুঝিতে পারেন নাই বলিয়া, তিনি হিন্দু নরনারীর আদর্শ জীবনের গৌরব বুঝিতেন না। সে সকল তিনি অতি সুন্দর বুঝিতেন, এখনকার উপন্যাসী স্ত্রীশিক্ষায় তিনি বিষম কটাক্ষ ক্ষেপ করিয়াছেন।

গ্রন্থে তাহার যথেষ্ট পরিচয় আছে—

"যদি কথায় কথায় সূর্য্যমুখীর মত গৃহত্যাগ, কুন্দনন্দিনীর মত বিষপান, ভ্রমরের মত দারুণ অভিমান, স্ত্রী-শিক্ষা হয়, তবে আজ স্ত্রী-শিক্ষায় দেশ টলটলায়-মান। যদি বিমলার চতুরতা, গিরিজায়ার চটুলতা এবং আসমানীর বণিকতার অনু-করণ স্ত্রী-শিক্ষা বল, তবে আজ স্ত্রী-শিক্ষায় দেশ টলটলায়মান। যদি অহোরাত্রি স্বামীর দোষ অনুসন্ধান ও তস্য শাসন, উপন্যাসোদ্ধৃত তীব্র বাক্যানলে তস্য অস্থিমজ্জা দাহন ও পরিবারবর্গের মর্ম্ম-পীড়ন স্ত্রী-শিক্ষা হয়, তবে আজ স্ত্রী-শিক্ষায় সত্য সত্যই দেশ টলটলায়মান। যদি সংসারে অসচ্ছলতা, হৃদয়ে অশান্তি, কর্ত্তব্যে ভ্রান্তি, স্ত্রী-শিক্ষার ফল হয়, তবে আর ভাবনা নাই, আজ স্ত্রী-শিক্ষায় দেশ টলটলায়মান।"

অন্যত্র দেখুন—

"অপরাহ্ণে ও সন্ধ্যার সময়ে সমস্ত বৎসর বাড়ী বাড়ী রামায়ণ, মহাভারত, কবি-কঙ্কণ পাঠ হইত। এক একজন কি মধুর কণ্ঠে, কি ভাবতরঙ্গ তুলিয়া সে সকল পবিত্র কাব্য পাঠ করিতেন। নবীনা, প্রবীণা, বালবৃদ্ধ দিবসের কার্য্য সারিয়া মন্ত্রমুগ্ধবৎ ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে সে সকল উপাখ্যান শুনিতে শুনিতে শোকে ও ভক্তিতে অশ্রু বর্ষণ করিতেন এবং প্রেমে পবিত্রিত, বীরত্বে উদ্দীপিত, পুণ্যে মোহিত, পাপে রোমাঞ্চিত

* 'নহিলে ত্যাগ-স্বীকার হয় না' এইরূপ ভাষা হইবে, বোধ হয়।

হইতেন। এই মহাগ্রন্থ সকল তাঁহাদের অস্থি-মজ্জায় প্রবেশ করিয়া, তাঁহাদের শোণিতে শোণিতে, সঞ্চারিত হইয়া, তাঁহাদের শরীর ও চরিত্র গঠন করিত এবং কর্ম্মে নিষ্কামতা, ধর্ম্মে ভক্তি, অবিচলতা, অধর্ম্মে ঘৃণার পরাকাষ্ঠা, পুণ্যে প্রবৃত্তি, পাপে নিবৃত্তি, জীবে দয়া, সত্যনিষ্ঠা, সতীত্বে সুখ, শিক্ষা দিত। এমন উচ্চ শিক্ষা, তাহার এমন সহজ উপায়, তাহার এমন দেশব্যাপী সুফল, আর কোন দেশ কি কখনও দেখাইতে পারিয়াছে? * * * * * এ সকল পুথির স্থান উপন্যাস গ্রহণ করিয়াছে। সীতার স্থান সূর্য্যমুখী, রামচন্দ্রের স্থান সীতারাম, সাবিত্রীর স্থান কুন্দনন্দিনী, বেহুলার স্থান বিমলা, শ্রীকৃষ্ণের স্থান সত্যানন্দ, অর্জ্জুনের স্থান জীবানন্দ, গ্রহণ করিয়াছেন। ভরত-লক্ষণের স্থান শূন্য। কাজে কাজেই কেবল স্ত্রী-শিক্ষায় নহে পুরুষ-শিক্ষায়ও দেশ টলটলায়মান।"

এই প্রথমভাগে নবীনচন্দ্র তাঁহারই কবিত্ব-শক্তি সঞ্চারের ইতিহাস দিয়াছেন। এই পরিচয় প্রদান অবসরে তিনি বাঙ্গালা দেশের বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর উপর বিষম বিদ্রূপ বিক্ষেপ করিয়াছেন, আর শিক্ষা-বিভাগের উপর তীব্র কশাঘাত সেই সঙ্গে সঙ্গে আছে। কবি দেখাইয়াছেন, একে কবিতানুরাগ তাহার বংশগত, তাহার উপর তাঁহার পিতা কবিতা পড়িতে বড় ভাল বাসিতেন। তিনি "সুরসিক, সুগায়ক, সুকবি," তাহার পর "চট্টগ্রাম-বাসী মাত্রই কবিতা-প্রিয়," আর নবীনের মাতৃভূমি প্রাকৃতিক কবিত্বময়।

"মাতার অধিত্যকায়, উপত্যকায়, বনে বনে কবিতা, বৃক্ষে বৃক্ষে, লতায় লতায়, ফুলে ফলে কবিতা; পর্ব্বত বিভক্ত পীত শ্যামল শস্যক্ষেত্রে কবিতা। মাতার সমুদ্র-গর্জ্জনে কবিতা, নির্ঝরিণীর তরতর কণ্ঠে কবিতা, সংখ্যাতীত বন-বিহঙ্গের কলকণ্ঠে কবিতা। যাহার এরূপ পিতা, এরূপ বংশ, এরূপ মাতৃভূমি, তাহার হৃদয়ে যে শৈশব হইতেই কবিতানুরাগ সঞ্চারিত হইবে কল্পনার অস্ফুট হিল্লোলমালা খেলিবে, তাহা আর আশ্চর্য্য কি? অতএব পাখীর যেমন গীত, সলিলের যেমন তরলতা, পুষ্পের যেমন সৌরভ, কবিতানুরাগ আমার প্রকৃতি-গত ছিল।"

প্রথমভাগে, কবির দরিদ্রতার যেমন শোকপূর্ণ বর্ণন আছে, তেমনই করুণাপূর্ণ হৃদয়বান ব্যক্তিবৃন্দের দয়াশীলতার উচ্ছ্বসিত পরিচয় আছে। সদয় সাহেব বাঙ্গালীর সমানে সুখ্যাতি আছে। লোকের দুঃখ-দারিদ্রের পরিচয় পাইলে দুঃখ হয়, সেই সঙ্গে সঙ্গে যদি দেখা যায় দশ জনে সেই দুঃখ দূর করিতে অগ্রসর, তাহা হইলে করুণায় হৃদয় পরিপূরিত হয়, ক্রন্দন সম্বরণ করা যায় না। নবীনের বর্ণনায় আমরা চোখের জল রাখিতে পারি নাই। বিদ্যা-সাগর দয়ার সাগর, নবীন উহা সুন্দর দেখাইয়াছেন। দিগম্বর মিত্র, কৃষ্ণদাস পাল, প্যারীচরণ সরকার, কেশব বাবু, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ মিত্র, গিরিশচন্দ্র দেব প্রভৃতি বাঙ্গালীর এবং প্রিন্সিপাল সট্‌ক্লিফ ও অগিল্‌বি, সেক্রেটারি ষ্টানস্‌ফীল্ড, তাম্পিয়ার ব্যাপমান্ প্রভৃতি

সাহেবের দয়ার জীবন্ত পরিচয় এবং আনন্দাশ্রু-বিজড়িত সুখ্যাতি আছে। পিতৃবিয়োগে হঠাৎ নিঃস্ব হইয়া নবীনচন্দ্র দুঃখের সহিত ঘনিষ্ঠতা করেন, পাঁচজনের কাছে সাহায্য ভিক্ষা করেন, সহৃদয় সাহায্য পাইয়া তিনি দুঃখের মহত্ব বুঝিতে পারেন তাহার কথা তিনিই বলুন।

"তাঁহার সৃষ্টিতে এত দুঃখ, এত দরিদ্রতা, এত বিপদ কেন, ইহা ভাবিয়া বড় বড় দার্শনিকগণও তাঁহার অস্তিত্বে বিশ্বাসহীন হইয়াছেন। * * * হায়! হায়! মানুষ বুঝে না সোনা পোড়াইলে আরও নির্ম্মল হয়। পোড়ানই কেবল নির্ম্মল করিবার উপায়। মানুষ বুঝে না যে তদ্রূপ দুঃখও মানুষকে নির্ম্মল ও পবিত্র করে, মানুষকে মানুষ করে। আমি দুঃখে না পড়িলে এই দেবতুল্য আদর্শ সকল দেখিতাম না; মানবের মহত্ব কি, প্রকৃত মনুষ্যত্ব কি, বুঝিতে পারিতাম না। যৎকিঞ্চিৎ যাহা বুঝিতে পারিয়াছি এবং আত্মজীবনে কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করিয়াছি, তাহা এই ঘোরতর বিপদের ফল। আজ বুঝিতে পারিতেছি আমার সেই বিপদের গর্ভে আমার কি মঙ্গল নিহিত ছিল, সে অগ্নি-পরীক্ষার দ্বারা ভগবান আমার কি উন্নতি, কি মঙ্গল বিধান করিয়াছেন। আমি আজ যাহা, সেই বিপদ তাহার সৃষ্টিকর্ত্তা। আমি আজ যাহা, সেই বিপদে না পড়িলে তাহা হইতাম না। আজ সেই বিপদের আলোচনা করিতে, পশ্চাৎ ফিরিয়া তাহার ঘন-ঘোর ঘটামণ্ডিত মুখছবি দেখিতে, মনে কি আনন্দ, কি গৌরব, কি পবিত্রতা সঞ্চারিত হইতেছে! তদ্ভিন্ন যে কখনও দুঃখের মুখ দেখে নাই, সুখ কি তাহা সে বুঝিতে পারে না। সুখ-দুঃখ কিছু নিত্য সনাতন পদার্থ নহে। * * * * সুখ-দুঃখ মনের অবস্থা মাত্র। মানুষের অবস্থা-ভেদে, প্রকৃতি-ভেদে ইহার অনন্ত তারতম্য। স্তরের পর অনন্ত স্তর, সোপানের পর অনন্ত সোপান আছে। যে দুঃখ ভোগ করে নাই, সে সুখের পাশব ভাব ভিন্ন, তাহার উচ্চ মহান্ ভাব বুঝিতে পারে না। ভগবান সচ্চিদানন্দ। তিনি সর্ব্ব আনন্দের আধার। মানুষ যত তাঁহার দিকে অগ্রসর হইবে, ততই মানুষ হইবে, সুখী হইবে। সুখের দ্বিতীয় পথ নাই। মানুষ দুঃখে না পড়িলে তাঁহার দিকে চাহে না। তাঁহার বিপদভঞ্জন সুখ কি মধুর!

"বিপদ সন্তুভাঃ সর্ব্বা যত্রতত্র জগদ্গুরো।
ভবতো দর্শনং যত্র ন পুনর্ভব দর্শনং ॥

মহাভারত।"

এই সকল কথা পড়িতে পড়িতে আমরা নবীনের জ্ঞাতি-দ্রোহ-জড়িত পূর্ব্ব কথা ভুলিয়া যাই, আর নবীনের জন্য দুঃখ করিতে আনন্দ হয়।

শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার।

মানবের জন্মকথা।

কোন নিম্ন প্রাণী হইতে মানবের উৎপত্তি-প্রণালী।

মানব অনেক পরিবর্ত্তিত হইতেছে, ইহা স্পষ্টই বুঝা যায়। এক বর্গীয় দুইটী ব্যক্তি সম্পূর্ণ একরূপ নহে। লক্ষ লক্ষ মুখ তুলনা কর, প্রত্যেকটী পৃথক আকারের। দেহের ভিন্ন ভিন্ন অংশও সকলের সমান পরিমিত নহে, তাহাদিগের পরিমাণও বিভিন্ন। পদযষ্টির দৈর্ঘ্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিবর্ত্তনশীল। যদিও পৃথিবীর কোন দেশে মানুষের মাথা দীর্ঘাকার, কোন দেশে থর্ব্বাকার, তথাপি এক বর্গীয়গণ মধ্যেও মাথার পরিমাপে অনেক প্রভেদ দেখা যায়। ইহার দৃষ্টান্ত স্থলে আমেরিকার, দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়ার ও স্যাণ্ডুইচ্ দ্বীপের আদিম নিবাসীদিগকে উল্লেখ করা যায়। ইহাদিগের মধ্যে দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়ার আদিম নিবাসিগণ অন্য কোন মানবের সহিত রক্ত-সংস্রবে সঙ্কর ভাবাপন্ন হয় নাই, উহারা খাঁটি অমিশ্র, উহাদিগের আচার-ব্যবহার এবং ভাষাও অমিশ্র। যদি কোন মানব অমিশ্র বর্গীয় থাকে, তবে সে উহারাই। একজন প্রসিদ্ধ দন্তবিদ্যাবিৎ আমাকে জানাইয়াছেন যে, মানবগণের আকৃতিতে যেরূপ প্রভেদ দৃষ্ট হয়, দন্তেও তদ্রূপই। প্রধান ধমনীগুলি সাধারণতঃ যে পথ অনুসরণ করে তাহা ছাড়িয়া অনেক স্থলে বিপথগামী হয়; তন্নিবন্ধন, কি পরিমাণ স্থলে উহারা কোন্ পথ অবলম্বন করে, তাহা অস্ত্রচিকিৎসার নিমিত্ত জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক হওয়ায় ১০৪০টী শব পরীক্ষা করিতে হইয়াছিল। পেশীগুলি অত্যন্ত পরিবর্ত্তনশীল। অধ্যাপক টার্ণার দেখিয়াছিলেন যে ৫০টী শবের মধ্যে দুইটীরও পদের পেশী ঠিক একরূপ ছিল না; ইহার মধ্যে কোন কোনটীর ব্যতিক্রম অত্যন্ত অধিক। তিনি বলিয়াছেন যে ঐরূপ ব্যতিক্রম হেতু অবশ্যই যথারীতি পদ সঞ্চালনের ব্যাঘাত অথবা ইতরবিশেষ হইয়াছিল। মিঃ জে, উড্ ৩৬টী দেহ পরীক্ষা করিয়া পেশীর পরিবর্ত্তন ২৯৫টী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; আর একবার তিনি ঐ সংখ্যক দেহ পরীক্ষায় ৫৫৮টী পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়াছিলেন; কিন্তু এবারে দুই পার্শ্বের পেশীর পরিবর্ত্তনকে এক সংখ্যা গণনা করিয়াছিলেন। অস্থি-বিদ্যার গ্রন্থাদিতে পেশীগুলির যেরূপ সাধারণ বর্ণনা করা হইয়া থাকে, তদ্রূপ তিনি এই শেষোক্ত ৩৬টির মধ্যে একটি দেহেও প্রাপ্ত হন নাই। একটা দেহে তিনি ২৫ টা পেশী ব্যতিক্রম গণনা করিয়াছিলেন। একই পেশী কখন কখন নানারূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। অধ্যাপক ম্যাকালিষ্টার হস্তের পামেরিস্ অ্যাক্সেসরিয়ান্ নামক পেশীর বিংশতি প্রকার পরিবর্ত্তন বর্ণনা করিয়াছেন।

বিখ্যাত প্রাচীন অস্থি-বিদ্যাবিৎ উলফ দৃঢ়তার সহিত বলেন যে শরীরের আভ্যন্তরিক যন্ত্র সকল বাহিরের অংশ অপেক্ষা অধিক পরিবর্ত্তনশীল। তিনি আভ্যন্তরিক যন্ত্র সকলের এক একটী আদর্শ মূর্ত্তি

মনোনীত করিয়া তাহা প্রদর্শনের নিমিত্ত একখানি গ্রন্থও লিখিয়াছেন। যকৃত, ফুস্‌ফুস্‌, মুত্রাশয় প্রভৃতির অথবা মানবের স্বর্গীয় বদনমণ্ডলের সুন্দর আদর্শরূপের আলোচনা শুনিলে আমাদিগের কাণে কেমন অদ্ভুত রকম শুনায়।

বিভিন্ন বর্গীয় মানবের কথা দূরে থাকুক, একবর্গ মধ্যেই ভিন্ন ভিন্ন মানবের মনোবৃত্তি এতই বিভিন্ন ও পরিবর্ত্তনশীল এবং তাহা এতই সুপরিজ্ঞাত, যে সে বিষয়ে এ স্থলে একটী কথাও বলিবার আবশ্যক নাই। ইতর জন্তুগণের মনোবৃত্তি সম্বন্ধেও ঐ কথাই সত্য। যাঁহারা পশুশালার ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহারা সকলেই ইহা স্বীকার করেন। আমরাও ইহা আমাদিগের কুকুর এবং অন্যান্য গৃহপালিত পশুর মধ্যে লক্ষ্য করিয়া থাকি। ব্রেম্‌ আফ্রিকায় কতকগুলি বানর পোষিয়াছিলেন। তিনি বলেন, উহাদিগের প্রত্যেকের স্বভাব ও মেজাজ বিভিন্ন। তিনি একটী বানরকে বিশেষ বুদ্ধিমান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। পশুশালার রক্ষকগণ আমাকে আমেরিকা প্রদেশের একটী বানর দেখাইয়াছিলেন, সেটীও উহার তুল্যই বুদ্ধিমান। রেঞ্জার প্যারাগোয়া দেশে একবর্গীয় কয়েকটী বানর রাখিয়াছিলেন, তাহাদিগের মনোবৃত্তিও বিভিন্ন বলিয়া তিনি বিশেষরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন, এই বিভিন্নতা কিয়ৎপরিমাণে জন্মগত, কিয়দংশ শিক্ষা-গত, এবং তাহাদিগের সহিত যেরূপ ব্যবহার করা যায় তাহার উপরও ইহা কিয়ৎপরিমাণে নির্ভর করে।

আমি অন্যত্র * বংশানুক্রম সম্বন্ধে এত বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি যে এ স্থলে আর বেশী কিছু বলিবার আবশ্যক নাই। অতি সামান্য সামান্য লক্ষণ হইতে গুরুতর লক্ষণ পর্য্যন্ত সকলই বংশানুগত, ইহা ইতর প্রাণীদিগের সম্বন্ধেও জানা গিয়াছে; মানবের সম্বন্ধে যে সকল বৃত্তান্ত সংগৃহীত হইয়াছে তাহা আরও অধিক, গৃহপালিত পশুদিগের মানসিক দোষ-গুণ বংশানুগত হওয়া স্পষ্টই দেখা যায়। অভ্যাস এবং বিশেষ প্রবৃত্তি ত বংশানুগত হয়-ই, তাহা ব্যতীতও বুদ্ধিমত্তা, সাহস, ভাল মন্দ মেজাজ ইত্যাদিও বংশানুগত। মানবের প্রত্যেক পরিবারে এইরূপ বৃত্তান্ত আমরা দেখিতে পাই। আর মিষ্টার গ্যাল্টনের গবেষণার ফলে আমরা এমন জানিতে পারিয়াছি যে যদিও প্রতিভা একাধিক উচ্চবৃত্তি সকলের সংমিশ্রণে জাত, তথাপি তাহাও বংশানুগত। পক্ষান্তরে উন্মত্ততা এবং অন্যান্য মানসিক বিকৃতি কোন কোন বংশে পূর্ব্বপুরুষাগত হইয়া থাকে, ইহা অতি নিশ্চিত।

জীব সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তিত হইতেছে কিন্তু তাহার কারণ আমরা বুঝিতে পারি না। তথাপি এটুকু বুঝিতে পারি যে মানব এবং ইতর প্রাণী, সকলেই পুরুষানুক্রমে দীর্ঘ কাল যে সকল বিভিন্ন অবস্থায় পতিত হইয়াছে, তাহার সহিত এই পরিবর্ত্তনের † কোন প্রকার

---

* Variation in Plants and Animals under domestication নামক গ্রন্থে।

† কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থা জীব-বিবর্ত্তনের কারণ বলিয়া এক্ষণে আর স্বীকৃত হয় না। ইহা পরিবর্ত্তনেরও প্রবর্ত্তক কারণ নহে, এ কথা ডারুইন

সংশ্রব আছেই। এ বিষয়ে মানবজাতীয় বিভিন্ন বর্গকে গৃহপালিত প্রাণীর সহিত তুলনীয়। আর আমেরিকার ন্যায় বিস্তীর্ণ প্রদেশে এক বর্গীয় বিভিন্ন ব্যক্তিকেও ঐ সকল প্রাণীর সহিত তুলনা করা যায়। সভ্য সমাজে বিভিন্ন অবস্থার ফল বিশেষ লক্ষিত হইয়া থাকে; কারণ ঐরূপ সমাজে বিভিন্ন জনগণের পদগৌরব বিভিন্ন প্রকার হওয়ায় এবং তাহারা ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায় অবলম্বন করায়, তাহাদিগের মধ্যে চরিত্রগত তারতম্য অনেক হইয়া উঠে; অসভ্য সমাজে তদ্রূপ হয় না। অসভ্য সমাজকে অনেকাংশে সমভাবাপন্ন বিবেচনা করা হয়, কিন্তু এ কথাও অতিরঞ্জিত এবং কোন কোন স্থলে অপ্রকৃত। মানব দীর্ঘকাল যে সকল অবস্থায় পতিত হইয়াছে কেবল তাহার দিকে লক্ষ্য করিলেও ইতর প্রাণী অপেক্ষা তাহাকে অতিরিক্ত মাত্রায় গৃহপালিতবৎ বিবেচনা করা যায় না। অষ্ট্রেলিয়াবাসী কোন কোন অসভ্যগণ অপেক্ষা বহু বিস্তৃত অনেক ইতরজাতীয় জীব অধিকতর পরিবর্ত্তনের অধীন হইয়াছে। আর এক গুরুতর বিষয়ে মানবের সহিত গৃহপালিত জন্তুর পার্থক্য অত্যন্ত অধিক, তাহা এই জ্ঞানকৃতই হউক কিম্বা অজ্ঞাতসারেই হউক, মানবের বংশবৃদ্ধি দীর্ঘকাল নিয়মের অধীন হয় নাই। মানবের কোন বর্গ অথবা কোন সম্প্রদায় এমন পূর্ণ মাত্রায় পরাধীন হয় নাই যে তাহাদিগের মধ্যে যাহারা প্রভুগণের অধিকতর উপকারী হইয়াছে, তাহারাই রক্ষিত হইয়াছে অপরে রক্ষিত হয় নাই। জ্ঞানপূর্ব্বক নির্দ্দিষ্ট নরনারীকে বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ করা হয় নাই। কেবল মাত্র প্রুশিয়া দেশের গ্রেনেডিয়ার সৈন্য সম্বন্ধে ঐরূপ করা হইয়াছিল; কারণ এ ক্ষেত্রে মানব জ্ঞানকৃত নির্ব্বাচন করিয়াছিল। পল্লীগ্রামে অনেক দীর্ঘকায় স্ত্রী-পুরুষকে পালন করা হইত। স্পার্টা দেশে এক প্রকার শিশু-নির্ব্বাচন বিধিবদ্ধ হইয়াছিল, কারণ ঐ বিধি অনুসারে শিশুদিগকে জন্মিবার কিয়ৎকাল পরেই পরীক্ষা করা হইত; তাহাতে যে সকল শিশু বালষ্ঠ ও সুগঠিত তাহাদিগকে রক্ষা করিয়া অপরগুলিকে মৃত্যুর হস্তে সমর্পণ করা হইত।

(ক্রমশ)

শ্রীশশধর রায়।

স্বয়ংই স্বীকার করিয়াছেন। এক জাতীয় জীবের মধ্যে যে প্রভেদ দেখা যায়, যেমন নানাবিধ অশ্ব, নানাবিধ গো ইত্যাদি, তাহাকে পরিবর্ত্তন বলি। আর বিভিন্নজাতীয় জীবের যে প্রভেদ, যেমন গো এবং অশ্বের পার্থক্য, তাহাকে বিবর্ত্তন বলি।

গ্রহের বাষ্পমণ্ডল।

রাক্ষসপুরীর যে মহলে প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল, আমাদের শৈশব উপন্যাসের বন্দী রাজপুত্রকে বার বার তাহারই সিংহদ্বারে আঘাত দিতে দেখিয়াছি। প্রকৃতিদেবী তাঁহার সৃষ্টির সকল মহলে বৈজ্ঞানিকদিগকে প্রবেশ করিতে দেন নাই। আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের নজর এখন তাহাদেরই উপর বিশেষভাবে পড়িয়াছে। ইহারা উপন্যাসের রাজপুত্রের ন্যায়ই ঐ সকল

রহস্যপুরীর সিংহদ্বারে এখন বৃথা আঘাত দিতেছেন। যে তপস্যা, যে সাধনার ফলে প্রকৃতি স্বহস্তে দ্বার উন্মোচন করিয়া দেন, বোধ হয় আজও তাহা পূর্ণ হয় নাই। এখনো অনেক মহলের দ্বারই রুদ্ধ। যাহা হউক বহু দূরে থাকিয়া বৈজ্ঞানিকগণ সৃষ্টির যে এক অজ্ঞাতপুরীর বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহারই আলোচনা করিব।

পৃথিবী নানা পরিবর্ত্তনের মধ্যে থাকিয়া এখন যেমন বিচিত্র প্রাণী ও উদ্ভিদের আবাস-স্থান হইয়া পড়িয়াছে, সৌরজগতের অপর গ্রহ-উপগ্রহের মধ্যে কোনটি সেই প্রকার অবস্থায় উপনীত হইয়াছে কি না, এই প্রশ্নটি লইয়া বৈজ্ঞানিকগণ বহু দিন ধরিয়া আলোচনা করিতেছেন। উপন্যাসকারের লেখনীও বিষয়টিকে অবলম্বন করিয়া অবিরাম চলিয়াছে। জ্যোতির্বিদ্‌গণের ত কথাই নাই। ইঁহাদের উৎকট কল্পনা কতদূর পৌঁছিতে পারে, তাহা বৃদ্ধ সিয়াপেরেলি হইতে আরম্ভ করিয়া নবীন লয়েল প্রমুখ অনেকেই প্রত্যক্ষ দেখাইয়াছেন। ইঁহাদের আলোচনার কোন্ অংশ কল্পনাসৃষ্ট, এবং কোন্‌টাই বা বিজ্ঞানসুগত তাহা সত্যই বাছিয়া লওয়া কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মঙ্গলগ্রহকে জীববাসের উপযোগী বলিয়া প্রমাণ করিবার জন্য লয়েল সাহেব যে সকল যুক্তি প্রয়োগ করিতেছেন, সেগুলিকে কখন কখন ফরাসী লেখক জুলস্‌ভার্ণের বৈজ্ঞানিক উপন্যাসেরই উপযুক্ত বলিয়া মনে হয়।

সুইডেনের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আরেনিয়স্ সাহেব, অপর গ্রহের আকাশের অবস্থা জীববাসোপযোগী কি না, এই প্রশ্নটি লইয়া সম্প্রতি আলোচনা করিয়াছেন। আমরা বহু দিন ধরিয়া নানা তর্কবিতর্কের আবর্জ্জনা হইতে বিষয়টির যে সারটুকুর সন্ধানে বৃথা চেষ্টা করিয়া আসিতেছিলাম, আরেনিয়স্ সাহেবের কয়েকটি অল্প কথার মধ্যে তাহারই সন্ধান পাইয়াছি। বক্তব্যগুলি ইনি এক পুস্তিকার আকারে মাতৃভাষায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক সার্ হেন্‌রি রস্কো তাহারই এক ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন।

আমরা যে প্রকার জীবের সহিত পরিচিত, তাহাদের জীবনধারণের জন্য চারি দিকে এক বাষ্পমণ্ডল থাকা একান্ত আবশ্যক। পৃথিবীকে ঘেরিয়া অক্সিজেন্, নাইট্রোজেন্ এবং অঙ্গারক বাষ্পের যে গভীর আবরণ রহিয়াছে, তাহাই ইহাকে জীববাসের উপযোগী করিয়াছে। অপর গ্রহে বাষ্পমণ্ডলের অবস্থা কি প্রকার অধ্যাপক আরেনিয়স্ কেবল তাহা লইয়াই আলোচনা করিয়াছেন। ইউরেনস্, নেপচুন্, শনি, এবং বৃহস্পতি এই চারিটি গ্রহ আকারে অত্যন্ত বৃহৎ। সূর্য্য হইতে দূরে থাকিয়াও তাহাদের বিশাল দেহ অদ্যাপি শীতল হয় নাই। হয় ত কোন কোনটি বাষ্পাবস্থাতেই আছে। সুতরাং এগুলি যে জীববাসের উপযোগী নয়, তাহা সহজেই বুঝা যায়। সুতরাং আলোচনা করিতে গেলে বুধ শুক্র এবং মঙ্গল ব্যতীত অপর কোন গ্রহেরই সংবাদ লওয়া আবশ্যক হয় না।

মঙ্গল ও বৃহস্পতির কক্ষার ভিতরে

এক জাতীয় অসংখ্য ক্ষুদ্র গ্রহ (Asteroids) বিচরণ করে। ইহারা সংখ্যায় যেমন অধিক আকারে সেই প্রকার ছোট। এ পর্য্যন্ত প্রায় হাজারটি ক্ষুদ্র গ্রহের আবিষ্কার হইয়াছে, কিন্তু কোনটিকেই আমাদের চন্দ্র অপেক্ষা বৃহত্তর দেখা যায় নাই। অধিকাংশেরই ব্যাসের পরিমাণ কুড়ি মাইলের অধিক নয়। কাজেই তাপ বিকীরণ করিয়া এই সকল জ্যোতিষ্ক যে বহু দিন পৃথিবীর ন্যায় কঠিন ও শীতল হইয়া পড়িয়াছে, তাহা মানিয়া লওয়া যাইতে পারে। কিন্তু শীতল ও কঠিন হইলেই গ্রহে বাষ্পমণ্ডল থাকিবে, ইহা স্বীকার করা যায় না। লঘু বায়বীয় জিনিসের অণুগুলি সর্ব্বদাই বিচ্ছিন্ন হইয়া দূরে যাইবার চেষ্টা করে। কোন এক প্রবল আকর্ষণ যদি ইহাদের সকলকে টানিয়া না রাখে, তবে কোন বাষ্পকে সীমাবদ্ধ স্থানে রাখা যায় না। পৃথিবীর দেহের গুরুত্ব বড় অল্প নয়। তাই মাধ্যাকর্ষণ দ্বারা বাধা পাইয়া আমাদের আকাশের বাষ্পগুলি আজও পৃথিবী ত্যাগ করে নাই। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ক্ষুদ্র গ্রহগুলি আকারে ও গুরুত্বে পৃথিবীর তুলনায় খুবই তুচ্ছ। কাজেই সেগুলি বাষ্পরাশিকে টানিয়া রাখিয়া যে জীবের বাসোপযোগী হইবে, তাহা কখনই বিশ্বাস করা যায় না।

সুতরাং বুধ, শুক্র এবং মঙ্গলগ্রহ ব্যতীত আমাদের পরিচিত কোন সৌরজ্যোতিষ্কে জীবের অস্তিত্ব কখনই সম্ভবপর নয়।

প্রথমে বুধগ্রহের কথা আলোচনা করা যাউক। পাঠক যদি গ্রহদিগকে চিনিয়া লইয়া একবার ভাল করিয়া তাহাদিগকে দেখেন, তবে সকলকে সমান উজ্জ্বল দেখিবেন না। শুক্র যখন শুকতারার বা সান্ধ্যতারার আকারে আকাশে দেখা দেয়, তখন সেটিকে যত উজ্জ্বল দেখায়, বুধ, বৃহস্পতি, মঙ্গল বা শনি কাহাকেও সে প্রকার দেখা যায় না। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে শুক্রের আলোক-প্রতিফলন-ক্ষমতা চন্দ্রের প্রায় ছয় গুণ। বুধ আলোক-প্রতিফলনে আমাদের চন্দ্রেরই অনুরূপ। জ্যোতিষিগণ আজকাল এই আলোক পরিমাপ করিয়া গ্রহগণের প্রাকৃতিক অবস্থা কতকটা অনুমান করিয়া লইতেছেন। যে সকল গ্রহ বাষ্পমণ্ডলে আবৃত থাকে সে গুলিকে বাষ্পহীন গ্রহ অপেক্ষা অনেক অধিক আলোক প্রতিফলন করিতে দেখা যায়। বুধের স্বাভাবিক ম্লানতা লক্ষ্য করিয়া আরেনিয়াস্ সাহেব ইহাকে বায়বীয় পদার্থ বর্জ্জিত বলিতে চাহিতেছেন।

বুধের বাষ্পহীনতার ইহাই একমাত্র প্রমাণ নয়। গুরুত্ব অবলম্বনে হিসাব করিতে বসিলেও ঐ সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে হয়। আমাদের চন্দ্রটি যে বাষ্পবর্জ্জিত তাহাতে আর এখন অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ইহার ক্ষুদ্র এবং লঘু দেহ কোন বাষ্পকে টানিয়া রাখিতে পারে নাই। বুধের গুরুত্ব চন্দ্রের দেড় গুণ মাত্র। সুতরাং এই গুরুত্ব লইয়া এটি যে কোন বাষ্পকে নিজের চারিদিকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিয়াছে তাহা মনে হয় না।

আমাদের পৃথিবী প্রায় চব্বিশ ঘণ্টাকালে এক পূর্ণাবর্ত্তন (Rotation) শেষ করে। সুতরাং মোটামুটি হিসাব করিলে দেখা যায়,

যে এক বৎসর কালে ইহা একবার সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া আসে, সেই সময়ে সে নিজে নিজে তিনশত পইষট্টিবার ঘুরপাক্ খায়। চন্দ্র পৃথিবীরই উপগ্রহ। পৃথিবীর চারিদিকে ঘুড়িয়া বেড়ান ইহার কাজ। প্রায় আটাশ দিনে যখন সে একবার মাত্র ধরা প্রদক্ষিণ করে তখন নিজে একবারের অধিক আবর্ত্তন করিতে পারে না। ইহারই ফলে, চন্দ্রের সেই শশলাঞ্ছিত একটা দিকই সর্ব্বদা পৃথিবীর দিকে উন্মুক্ত থাকে। আধুনিক জ্যোতিষিগণ বড় বড় দূরবীণের সাহায্যে বুধ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ইহার গতিবিধিকে ঠিক চাঁদেরই মত দেখিতে পাইয়াছেন। কাজেই বলিতে হয়, এখন বুধের একটা দিকেই সূর্য্যের তাপালোকের রশ্মি অজস্র আসিয়া পড়িতেছে। অপর দিক্‌টা ঘোর তমসাচ্ছন্ন এবং অসম্ভব শীতল।

পূর্ব্বোক্ত ব্যাপারগুলির আলোচনা করিয়া আরেনিয়স্ সাহেব বলিতেছেন, বুধ গ্রহটি তাহার ক্ষীণ আকর্ষণের সাহায্যে যদি কোন গুরুবাষ্পকে আট্‌কাইয়া রাখিয়া থাকে, তবে তাহা অন্ধকারাচ্ছন্ন দিকের শীতে কখনই বাষ্পাকারে নাই। হেলিয়ম্ ও হাইড্রোজেন ব্যতীত অপর কোন বাষ্পই বুধের শীতে জমাট না বাঁধিয়া থাকিতে পারে না। আমাদের পৃথিবী তাহার বিশাল দেহের সমস্ত বল প্রয়োগ করিয়াও ঐ দুই লঘু বাষ্পকে বায়ুমণ্ডলে রাখিতে পারে নাই। সুতরাং ক্ষুদ্রদেহ বুধে যে ঐ দুই বাষ্প নাই, তাহা সুনিশ্চিত।

শুক্রগ্রহটি আমাদের অতি নিকটে অবস্থিত। ইহার সূর্য্যপ্রদক্ষিণকাল স্থির আছে, কিন্তু আবর্ত্তনকালটি আজও ঠিক জানা যায় নাই। আজকাল অনেক জ্যোতিষী বলিতেছেন, বুধ ও চন্দ্র যেমন এক পূর্ণপ্রদক্ষিণ-কালে নিজে একবারমাত্র আবর্ত্তিত হয়; শুক্রও ঠিক সেই প্রকারে নিজের চারিদিকে ঘুরিতেছে। এ কথা সত্য হইলে বলিতে হয়, বুধের ন্যায় ইহারও কেবল একটা দিকে সূর্য্যের তাপালোক পড়ে, এবং অপর দিক্‌টা তাপাভাবে ভয়ানক শীতল অবস্থায় থাকিয়া যায়। এ প্রকার ঘোর শীতে কোন তরল বা বায়বীয় পদার্থ জমাট না বাঁধিয়া থাকিতে পারে না। কাজেই এই হিসাবে শুক্রের বাষ্পমণ্ডল নাই ইহাই সিদ্ধান্ত হয়।

অধ্যাপক আরেনিয়স্ এই সিদ্ধান্তে সাধারণ জ্যোতিষীদিগের সহিত একমত হইতে পারেন নাই। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে সকল গ্রহের উপরে বাষ্পমণ্ডল থাকে, সূর্য্যের আলোক অধিক প্রতিফলন করিয়া সেগুলি খুব উজ্জ্বল হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু উজ্জ্বলতায় কোন গ্রহই শুক্রের সমকক্ষ নয়। কাজেই আরেনিয়স্ সাহেব উহাকে একেবারে বাষ্পবর্জ্জিত বলিয়া স্বীকার করিতে পারিতেছেন না। ইঁহার মতে শুক্র সম্ভবতঃ আমাদের পৃথিবীরই মত গভীর বাষ্পাবরণে মণ্ডিত আছে এবং চব্বিশ ঘণ্টায় পূর্ণাবর্ত্তন শেষ করিয়া সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে। আজকাল জ্যোতিষিগণ শুক্রের যে দীর্ঘ আবর্ত্তন-কালের কথা প্রচার করিতেছেন, তাহাতে ইনি সম্মতি দিতে পারেন নাই।

মঙ্গলের আকাশের অবস্থা সম্বন্ধে

আরেনিয়স্ সাহেব বিশেষ আলোচনা করেন নাই। আজ পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া মঙ্গল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, ইহাতে যে সকল লক্ষণ দেখা গিয়াছে, তাহাতেও ইহার লঘু বাষ্পাবরণের অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। শীত ঋতুতে মঙ্গলের দুই মেরুতে দুইটি শ্বেত-চিহ্ন প্রকাশ হইয়া পড়ে। তার পর যখন মঙ্গলে গ্রীষ্মকাল উপস্থিত হয়, সে দু'টিকে আর দেখা যায় না। জ্যোতিষিগণ ঐ শ্বেতবিন্দুকে মেরুদেশে সঞ্চিত তুষার বলিতে চাহিতেছেন। এই অনুমান সত্য হইলে মঙ্গলে বাষ্পের অস্তিত্বও স্বীকার করিয়া লইতে হয়। জলীয় বাষ্প না থাকিলে কোন এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে নিয়মিত কালে বরফ জমিতে পারে না।

গ্রহে বাষ্প থাকিলেই হয় না। কোন্ বাষ্প কি পরিমাণে স্থির করিয়া, পরে সেগুলি প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবন রক্ষার অনুকূল কি না বিচার করা কর্ত্তব্য। আমাদের আকাশে অক্সিজেন, নাইট্রোজেন এবং অঙ্গারক বাষ্প যে পরিমাণে মিশ্রিত আছে, তাহা কখনই একটি নির্দ্দিষ্ট অনুপাতকে অতিক্রম করে না। অনুপাতে কোনটির পরিমাণ একটু কমিয়া বা বাড়িয়া গেলে, এই বায়ুই জীবনরক্ষার অনুপযোগী হইয়া পড়ে। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে আমরা যে সকল সামগ্রী খুঁজিয়া পাই, চিরদিনই যে তাহাতে এগুলি ছিল না তাহার প্রচুর প্রমাণ আছে। যুগে যুগে নানা পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া আমাদের আকাশ এখন এত নির্ম্মল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জীবতত্ত্ববিদ্গণকে জিজ্ঞাসা কর, তাঁহারাও বলিবেন, সৃষ্টির প্রথমে প্রাণী বা উদ্ভিদ কেহই বর্ত্তমান আকার লইয়া ভূতলে জন্ম গ্রহণ করে নাই। যেমন আকাশ ও মাটির পরিবর্ত্তন চলিয়াছে, জীবগণও সেই সকল পরিবর্ত্তনের সহিত সুর মিলাইয়া ক্রমোন্নতির দিকে ধাবমান হইয়াছে। উদ্ভিদ ও প্রাণীর বর্ত্তমান আকার-প্রকার যুগ যুগান্তের অনেক পরিবর্ত্তনের ফল। সুতরাং গ্রহে জীব আছে কি না স্থির করিতে হইলে, তাহার বাষ্পমণ্ডলের অবস্থার বিষয়টা সর্ব্বাগ্রে অনুসন্ধান করা আবশ্যক হইয়া পড়ে।

নীহারিকা-বাদকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিলে বলিতে হয়, সৌরজগতের সকল জ্যোতিষ্কেরই গঠনোপাদান এক। প্রত্যেক উপাদানের পরিমাণ সকল জ্যোতিষ্কে সমান না থাকিতে পারে, কিন্তু আমাদের পৃথিবী যে যে পদার্থ দিয়া প্রস্তুত, সেই গুলিই যে অল্পাধিক পরিমাণে একত্রিত হইয়া সৌরজগতের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা নিশ্চিত। সুতরাং পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ক্রমিক পরিবর্ত্তনের একটা পর্য্যায় স্থির করিয়া, অপর গ্রহগুলি সেই সকল পর্য্যায়ের কোন্ কোন্‌টিতে পড়ে, তাহা স্থির করা ব্যতীত গ্রহের অবস্থা নির্ণয়ের আর অন্য উপায় দেখি না। বলা বাহুল্য, সৃষ্টির আদিতে এক জ্বলন্ত নীহারিকারাশি হইতে আমাদের পৃথিবী যে দিন পৃথক হইয়া পড়িয়াছিল, তখন তাহার বায়ুমণ্ডল ছিল না। কাল ক্রমে ধরা শীতল হইয়া পড়িলে চারিদিকে যখন একটা কঠিন আবরণ জমাট বাঁধিয়াছিল বোধ হয় তখনি ভূগর্ভ হইতে হাইড্রোজেন ও অঙ্গারক বাষ্প উপরে উঠিয়া এক বাষ্পমণ্ডলের রচনা করিয়াছিল। ইহাই আমাদের

প্রাথমিক আকাশ। বায়ুমণ্ডলের এই অবস্থা কত বৎসর ছিল, হিসাব করা যায় না। কিন্তু বহু লক্ষ বৎসর পরে ভূপৃষ্ঠে উদ্ভিদ্ জন্ম গ্রহণ করিলে, তাহারই দেহের হরিদ্-কণার (Chlorophyl) স্পর্শে নীচেকার অঙ্গারক বাষ্প বিশ্লিষ্ট হইয়া যে, অঙ্গার ও অক্সিজেনের উৎপত্তি করিয়াছিল তাহা আমরা অনুমান করিতে পারি। আকাশের উচ্চ প্রদেশে যে আদিম অঙ্গারক বাষ্প ও হাইড্রোজেন সঞ্চিত, এ পর্য্যন্ত সেগুলিকে কেহই স্পর্শ করিতে পারে নাই। অঙ্গারঘটিত বাষ্প ও হাইড্রোজেন সহজেই অপর জিনিসের সহিত মিশিয়া যায়। নীচের অক্সিজেন উপরে উঠিয়া, উচ্চস্তরে সঞ্চিত ঐ দুই বাষ্পকে সম্ভবতঃ নানা প্রকারে রূপান্তরিত করিয়াছিল। কাজেই আকাশে অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন ছাড়া আর কোন বাষ্পই অবিকৃত অবস্থায় থাকিতে পার নাই। নাইট্রোজেন অপর জিনিসের সহিত সহজে মিশ্রিত হয় না, নচেৎ এই বায়ুকেও আমরা আকাশে দেখিতে পাইতাম না।

বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, আমাদের বায়ুমণ্ডলের পূর্ব্বোক্ত অবস্থাতেই ভূপৃষ্ঠে প্রাণীর জন্ম হইয়াছিল। এখন আকাশে যে অঙ্গারক বাষ্প ও জলীয় বাষ্প দেখা যায়, তাহা পৃথিবীর আদিম বায়ুমণ্ডলের সামগ্রী নয়। সময় সময় আভ্যন্তরীণ তাপের উপদ্রবে এই দুই বাষ্প ভূগর্ভ হইতেই প্রচুর পরিমাণে উত্থিত হইত। তাহারই অবশেষ এখন বায়ুমণ্ডলে বর্ত্তমান। নদী, সমুদ্র সকলই সেই জলীয় বাষ্প দ্বারাই উৎপন্ন হইয়াছে।

অধ্যাপক আরেনিয়স্ বলিতেছেন, সম্ভবতঃ শুক্রগ্রহের বায়ুমণ্ডলের অবস্থা পৃথিবীরই অনুরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বর্ত্তমান অবস্থা কখনই চিরস্থায়ী নয়। এমন দিন নিশ্চয়ই আসিবে যখন ভূপৃষ্ঠের সমস্ত জল এবং অঙ্গারক বাষ্প একত্রে মিলিয়া নীরস মর্ম্মর-শিলায় (Calcium carbonate) পরিণত হইবে, এবং গভীর সমুদ্রগুলি মৃত্তিকাপূর্ণ হইয়া এক একটা মরুভূমির আকার ধারণ করিবে। আজও, যে দুই চারিটি আগ্নেয় গিরির উৎপাতে বায়ুমণ্ডলে নূতন জলীয় বাষ্প ও অঙ্গারক বাষ্প আসিয়া মিশিতেছে, তখন তাহারা আর অগ্নি উদ্গীরণ করিবে না। কাজেই বায়ুমণ্ডল ক্রমে শূন্য হইয়া যাইবে। অধ্যাপক আরেনিয়স্ বলিতেছেন, মঙ্গলগ্রহটির বায়ুমণ্ডল সম্ভবতঃ এই প্রকারে শূন্য হইয়া পড়িয়াছে। অঙ্গারক বাষ্পের অভাবে এখন উহাতে আর উদ্ভিদ জন্মিতেছে না। কাজেই অক্সিজেনেরও অভাব হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্বে মঙ্গলের আকাশে যে অক্সিজেন ছিল, এখন তাহার চিহ্নমাত্র থাকার সম্ভাবনা নাই। উহা নাইট্রোজেন ও লৌহাদি ধাতুর সহিত মিশিয়া নানাপ্রকার নাইট্রাইট্ ও অক্সাইড্ প্রস্তুত করিয়া নিঃশেষিত হইয়া গেছে। আমাদের চন্দ্র এবং বৃহস্পতি ও শনির বড় বড় উপগ্রহগুলি, বহুকাল হইল, এই অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। মঙ্গল ইহাতে পদার্পাণ করিয়াছে মাত্র।

শ্রীজগদানন্দ রায়।

পুরাণ সম্বন্ধে দুই একটি কথা।

বিজ্ঞান মানবের জন্মকথায় ব্যাখ্যা করিতেছেন যে, বানরদেহ হইতে মানব-দেহ। আপনি জিজ্ঞাসা করিতে পারেন 'তাহা জানিয়া আমাদিগের লাভ কি'? বিজ্ঞান বলেন 'জ্ঞানলাভ একটা প্রকাণ্ড লাভ'। জ্ঞানে অহঙ্কার বিদূরিত হয়। অহঙ্কার শূন্য হইলে মানব সম্পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়। তবে বৈজ্ঞানিক মানব, বানরকে পিতৃতুল্য ভক্তি করিতে প্রস্তুত কি না তাহা সন্দেহ। যদি তাহা হইত, তাহা হইলে সার্কাসে আমাদিগের পিতৃপুরুষগণকে নাচাইয়া রঙ্গ দেখিতাম না।

কিন্তু শাস্ত্র, বিজ্ঞান হইতেও অনেকটা উদারপ্রকৃতি। শাস্ত্রের মতেও বহু নিম্নযোনি হইতে মানবদেহ উদ্ভূত। কিন্তু ভক্তি-স্থলে শাস্ত্র অন্যবিধ পিতৃপুরুষকে লক্ষ্য করিয়া থাকেন। শাস্ত্রের মতে যদিও মানবদেহ বানরের, কিন্তু পিতৃপুরুষগণ সেই দেহটার মধ্যে ক্রমে বাস করিয়া, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া, ভূমিকর্ষণ করিয়া, ধীরে ধীরে, যুগে যুগে, কল্পে কল্পে একটা অদ্ভুত দেহ বাহির করিয়াছেন। সেটা মানবের উৎকৃষ্ট দেহ! দিব্য গোঁফ দাড়ি, টানা ভ্রূ, লম্বিত বেণী, মধুর কণ্ঠস্বর, সঙ্গীতপরায়ণ গলা, ভক্তি-পরায়ণ হৃদয়, জ্ঞানপূর্ণ মস্তিষ্ক। এমন দেহ যে আপনা-আপনি হইয়া গেল, বানর আপনিই কথা কহিতে লাগিল, কবিতা লিখিতে শিখিল, এবং বিজ্ঞানশাস্ত্রে পণ্ডিত হইয়া গেল, অর্থাৎ বিনা পরিশ্রমে, বিনা অবচেষ্টায়, তাহা বোধ হয় কেহ বলিতে চাহেন না। যদি বলেন ত সেটা রাগের কথা। যাঁহারা পুরাকালে সঙ্গীতধ্বনি করিয়াছেন, বেদপাঠ করিয়াছেন, ঈশ্বরের জ্যোতির্ম্ময় প্রতিবিম্ব হৃদয়ে ধারণ করিয়া-ছেন, কবিতা বাঁধিয়াছেন, চিত্র গড়িয়াছেন, নিশ্চয়ই তাঁহারাই বানরের দেহ মধ্যে অন্ধের ন্যায় অন্ধকারে হস্ত প্রসারণ করিয়া, কোন দুজ্ঞেয় উপায়ে, আজি আমাদিগের সম্মুখে খাড়া। তাঁহারা বলিতে চাহেন যে 'আমরা মানব হইতে সুন্দর', এবং 'আমা-দিগের সৌন্দর্য্য কোন অতিসুন্দর উৎস হইতে উদ্ভূত'।

ইঁহারাই আমাদিগের পিতৃপুরুষ। বিশ্বের মানসপুত্র, প্রকৃতির আদরের সন্তান। মাতার এবং পিতার কল্পনা। ঈশ্বরের প্রতিকৃতি। তাঁহার সিংহাসনতলস্থ প্রজা।

আপনি জিজ্ঞাসা করিতে পারেন এই পিতৃপুরুষের চেহারাটা কিরূপ? উত্তর 'ফলেন পরিচীয়তে'। যদি চেহারাটা, আপাততঃ আমাদের যেমন আছে তেমনি থাকিয়া যায়, তবে উত্তর দিতে পারিতাম। কিন্তু আদিম সমুদ্রকীটের ডিম্ব হইতে, লাঙ্গুলসম্পন্ন ব্যাঙাচি ও বানরের কত প্রভেদ, তাহা মনে করিয়া উত্তর দিতে ভয় হয়। লাঙ্গুল খসিয়াছে, লোম উঠিয়াছে, দাড়ি, গোঁফ কিংবা টিকিও অন্তর্হিত হইবে, এবং মোটের মাথায় অবশেষ কি থাকিবে তাহা কেহ জানে না। কেহ কেহ বলেন অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ আত্মার মত আমরা দাঁড়াইয়া যাইব। কি দুঃখের বিষয়, অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ

আত্মার পক্ষে মাসিকপত্রে সমালোচনা করা কি কষ্টকর ব্যাপার! অতএব হস্ত, লেখনী, এবং কাগজ ও ছাপাখানা থাকিতে থাকিতে দুই একটা কথা বলিয়া রাখা ভাল।

কেহ কেহ এই বিশ্বের নাড়ী-নক্ষত্র জানিতে চাহেন। অনেক বাকবিতণ্ডার পর একরকম স্থির হইয়াছে যে, দেহ ও আত্মা স্বতন্ত্র পদার্থ। দেহ কি তাহা জানি না। আত্মা কি তাহা জানি না। অথচ দুইটা স্বতন্ত্র তাহা বোধ হয়। স্বতন্ত্র না হইলে আমরা ব্যস্ত কেন? যদি মনে করেন উভয়েই এক, তাহা হইলেও ক্ষতি নাই। তবে একটা অংশ দ্রষ্টা ও অন্যাংশ দৃশ্য তাহাতে সন্দেহ নাই। 'আমি দৃশ্য' ইহা প্রকৃতি-পরম্পরা। 'আমি দ্রষ্টা' ইহা পুরুষ-পরম্পরা।

পিতৃপুরুষগণ দ্রষ্টা। তাঁহাদিগের মধ্যে আমরাও ভবিষ্যতের কতিপয় পিতৃপুরুষ। দ্রষ্টার চেহারাই দৃশ্য। দৃশ্য গোসাপ। চেহারাটা বড় সুবিধার নয়। দ্রষ্টার পছন্দ হইল না। দৃশ্য বানর। দ্রষ্টা লাঙ্গুল নাড়িয়া চাড়িয়া বিরক্ত হইলেন। দৃশ্য মনুষ্য। আপাততঃ মন্দ নহে। কিন্তু কিছুদিন পরে ভাল লাগে না। তোমাকে দেখিয়া চটিয়া যাই। আমাকে দেখিয়া আমিই চটিতে থাকি। ক্রমে চটা-চটিতে, যুদ্ধ-বিগ্রহ ঘটে। নাক, কান, দাঁত খসিতে থাকে। ক্রমে দৃশ্য বদলাইয়া যায়। পুরাকালে এবম্বিধ অনেক দৃশ্য ঘটিয়া গিয়াছে, এবং দ্রষ্টাগণ চটিয়া গিয়াছেন। একবিংশতি হস্ত মনুষ্য, তালগাছ-প্রমাণ অমর-আখ্যাত বানররাজ, ভল্লুক ও মর্কট, জটায়ু এবং দশস্কন্ধ দশানন, নানাবিধ বিশাল এবং ক্ষুদ্র দৃশ্য, বিরাট এবং খর্ব্ব ইতিহাস লইয়া বিশ্বের পটে উদীয়মান হইয়াছিল। তাহাতেও আত্মানামক নির্ব্বিকার পদার্থের মন উঠে নাই।

এইরূপ দৃশ্যের মধ্যে অবতারগণ আসিয়া কলিকাতা মিউনিসিপালিটির 'হেল্‌থ অফিসারের' ন্যায় স্বাস্থ্যরক্ষার নিমিত্ত বিশেষ যত্নবান হইয়াছিলেন এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। অদ্ভুত দৃশ্য, বিষাক্ত কীট, তালবৃক্ষপ্রমাণ বানর এবং হস্তী সকল ক্রমে অন্তর্হিত হইয়া, এখন পিতৃপুরুষগণের অঙ্গুষ্ঠ-প্রমাণ দেহের পথ অনেকটা পরিষ্কার হইয়াছে। অথচ যদি কেহ তাহা জানিতে চাহেন তাহা কিরূপ, তবে পুরাণ পাঠ করিতে পারেন।

কিন্তু আপনি বলিতে পারেন 'ধাঁ করিয়া পুরাণ বিশ্বাস করিব কেন? ইহার একটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তি দেখাইয়া দাও'। আপনি দর্শনকার, বিজ্ঞান দৃশ্যকার। দুঃখের বিষয় আপনি পৌরাণিকী দৃশ্য, নূতন যুগে দেখিতে চাহেন। তাহা দেখান', আমাদিগের ন্যায় ক্ষুদ্র মানবের পক্ষে অসম্ভব। যদি উপায় থাকিত তবে ভল্লুক, বানর ও দশানন আনিয়া খাড়া করিতাম। কিন্তু আর একটা উপায় আছে, তাহা অনুমান। দৃশ্যকার বিজ্ঞান ডিম্ব (cell) দ্বারা তাহা দেখাইতেছেন। আমরাও সেই ডিম্বের সাহায্যে দেখিতে চেষ্টা করিব।

প্রথমতঃ দেখা যাউক, পুরাণ সম্বন্ধে কত প্রকার মত আছে। একশ্রেণীর লোক ইহাকে 'ঠাকুরদাদার' গল্প স্বরূপ মনে

করেন। অর্থাৎ উহা ছেলেপুলে ও স্ত্রী-লোকের মনোরঞ্জনার্থ। যদি তাহাই হয় তবে পুরাণেরও সার্থকতা আছে তাহা বলিতে হইবে। ছেলেপুলে ও স্ত্রীলোক খুসী থাকিলেও ব্রহ্মাণ্ড অনেকটা শান্তিময় হয়।

কিন্তু ইহারও উপর কথা উঠে কেন? কারণ, অন্য একশ্রেণীর লোকের নিকট পুরাণ রূপক, এবং সেই রূপক তিন প্রকার—

১। আধ্যাত্মিক রূপক। অর্থাৎ দশানন দশ ইন্দ্রিয়, পাণ্ডব-গণ পঞ্চ অঙ্গুলি, বিভীষণ সত্ত্বগুণ, রাবণ রজোগুণ, কুম্ভকর্ণ তমোগুণ। ইত্যাদি।

২। যৌগিক রূপক। যেমন পাণ্ডব পঞ্চতত্ত্ব, অভিমন্যুর ব্যূহ ষট্‌চক্র, হনুমান বায়ু, তাহার সাহায্যে মহাযোগী শ্রীরামচন্দ্র লঙ্কা হইতে (কুম্ভকের সাহায্যে) সীতাদেবীর (কুণ্ডলিনী শক্তির) উদ্ধার করিয়াছিলেন। সূর্য্যবংশ পিঙ্গলা, চন্দ্রবংশ ইড়া। ইত্যাদি।

৩। জ্যোতিষিক রূপক। ক্ষীর সমুদ্র বা ছায়াপথ 'Milky way'। শ্রীকৃষ্ণ অর্থাৎ আদিত্যের গোলকচক্রে কদম্বের তলে নক্ষত্রগণের (গোপীনীর) সহিত বিহার। বশিষ্টের পত্নী অরুন্ধতী একটা নক্ষত্র। বুধগ্রহ নকুল, শুক্রগ্রহ সহদেব। ইত্যাদি।

এখন যদি জিজ্ঞাসা করেন এই সকল আধ্যাত্মিক দৃশ্য, কিংবা যৌগিক দৃশ্য এবং জ্যোতিষিক দৃশ্য ঠিক আমাদিগের ন্যায় মতিগতিসম্পন্ন হইয়া, দিব্য দাড়ি এবং গোঁফ লইয়া, নানাবিধ লোকে, ভূলোকেই হউক কিংবা দেব লোকেই হউক, অবলীলাক্রমে বিচরণ করিতেন কি না, তাহার উত্তর সকলেই দিতে নারাজ। তাঁহাদিগের মতে এখনকার লোক পাছে অধ্যাত্ম কিংবা যোগশাস্ত্র না বুঝিতে পারে, অতএব হেঁয়ালি স্বরূপ এই সকল কথা লিপিবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। অর্থাৎ পুরাণ না থাকিলে ভাস্করাচার্য্য গোলাধ্যায় লিখিতে পারিতেন না, শঙ্কর বেদান্ত বুঝিতেন না, এবং আমি এবং আপনি পিতৃপুরুষগণ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতাম না।

কিন্তু পুরাণ আমাদের সন্দেহ নিবৃত্তি করা দূরে থাকুক, নিজের উপরই ঘোর সন্দেহ আকর্ষণ করিতে যত্নবান। পুরাণের এবম্বিধ নিষ্ঠুরতার উৎপত্তি কোথায় তাহা আমরা জানি না।

একটা কথা অনেকে সন্দেহ করেন। পুরাণ যদি অনেক কালের কথা হয়, অর্থাৎ যদি কোন পূর্ব্বকল্পের ইতিহাস হয়, তবে তৎকালীন ঐতিহাসিক-প্রবর কোন উপায়ে তাহা লোকপরম্পরা জগতে রাখিয়া গিয়াছেন? যদি ইহাই মনে করা যায় যে এককল্পের পিতৃপুরুষগণ, অন্য কল্পের উদ্ভিদ, কীট, এবং বানরাদির দেহ বাহিয়া অবশেষে পুরাণ প্রভৃতি তালপত্রের পুঁথিতে লিপিবদ্ধ করিতে পারগ হইয়াছিলেন, তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য যে পূর্ব্বস্মৃতি তাঁহাদিগের জ্ঞান-গোচর হইল কিরূপে?

কথাটা ভয়ানক শক্ত। প্রমাণ করা দুঃসাধ্য। একরকম মোটামুটি বলা যাইতে পারে যে মনুষ্যের জ্ঞান যদি বানর-দেহ বাহিয়া আসে, তবে স্মৃতি আসিতে কি পারে

না? যখন কীটদেহ হইতেই আমাদিগের এই অসামান্য বুদ্ধি স্বীয় পথ পরিষ্কার করিয়া আসিয়াছে, তখন সেই অসামান্য বুদ্ধির সহিত অসামান্য স্মৃতিশক্তি আসার আশ্চর্য্য কি? যদি কোন পৌরাণিক পূর্ব্বকল্পের ব্যাসদেব কিংবা বশিষ্ঠের ন্যায় ইতিহাসবেত্তা আমাদিগের মধ্যে আসিয়া উদীয়মান হন, তবে শ্রীরামচন্দ্রের ন্যায় রাজাকে, কিংবা কোন বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক প্রবরকে অধুনাতন বৈজ্ঞানিক ভাষায় পুরাতন বিশ্বদৃশ্যের ইতিহাস সটীক বুঝাইয়া দিতে পারেন না কি?

পুরাণ পাঠ করিলেই ঐতিহাসিকের আভাষ পাওয়া যায়। বশিষ্ঠদেব রামচন্দ্রকে পুরাণ শুনাইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণও ঋষিগণের নিকট পুরাণ বুঝিয়াছিলেন। ঋষিগণই পুরাণের মর্ম্ম জানিতেন। ঋষিগণের মধ্যেই পুরাণের স্মৃতি ছিল। ঋষিগণই ঐতিহাসিক। শ্রোতা শুদ্ধচেতা জ্ঞানী পুরুষ।

কিন্তু আপাততঃ ঋষিগণের অভাব। এবং সহজে বিশ্বাস করে এমন শ্রোতা বিরল। এখন আমাদিগের হাহাহুহু গন্ধর্ব্ব, দধীচি এবং বীর হনুমানের কথা শুনিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয় না, কারণ পিতৃপুরুষগণের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমরা কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ পাই নাই। এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে একটা অন্তর্নিহিত (Subliminal) আত্মগৌরব ও চৈতন্য, কিংবা জ্ঞান-প্রবাহ নিম্নস্তরের জীবদেহ বাহিয়া মানবদেহে বর্ত্তিয়াছে। আপাততঃ আমরা যতদূর জানিতে পারিয়াছি তাহাতে পুরাণ রূপক ছাড়া আর কি হইতে পারে, তাহা নির্ণয় করিবার কোন কূল-কিনারা পাওয়া যায় না।

কিন্তু আমরা 'ডিম্ব-তত্ত্ব' নামক প্রসিদ্ধ তত্ত্ব (Cellular theory) বিজ্ঞান হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি। চক্ষু এক প্রকারের ডিম্ব, মাংসপেশী অন্যপ্রকার, হৃৎপিণ্ড অন্যপ্রকার এবং আমাদিগের 'জ্ঞান' যদিও ঠিক ডিম্বের মত নয়, কিন্তু কোন অদৃশ্য ডিম্বের অন্তর্গত তাহাও অনুমান-সাপেক্ষ। আমরা আভাষ পাইয়াছি যে স্মৃতিরও ডিম্বই ভিত্তি।

অবশ্য আমরা থিয়সফিষ্টগণের ন্যায় হঠাৎ সূক্ষ্মদেহ, সপ্তলোক ও নানাবিধ চৈতন্যের অবতারণা করিতে চাহি না। সাধারণ বুদ্ধিতে যতটা অনুমান করা যাইতে পারে, তাহারই আভাষ দিতে চাহি। আমাদিগের বুদ্ধি ক্ষুদ্র এবং কল্পনাও যৎসামান্য। কথাটা বিস্তার করিলে অনেকটা 'গাঁজাখুরি' গল্পের মত হয়, কিন্তু যাহারা পুরাণকে গাঁজাখুরি মনে করেন তাঁহাদের বুঝা উচিত যে পুরাণের টীকাও অন্যবিধ হইতে পারে না।

ডিম্বতত্ত্ব একটা মানবদেহ লইয়া বিচার করা যাউক। মাতৃগর্ভে ভ্রূণ প্রথমতঃ একই ডিম্ব বিশেষ (Germinal cell) এবং তাহারই মধ্যে বহুপ্রকার সংস্কার অন্তর্নিহিত। অর্থাৎ অস্থি-বিকাশের সংস্কার ও শক্তি, মাংসপেশি বিকাশের শক্তি, স্নায়ুবিকাশের শক্তি, বুদ্ধি, ভক্তি, জ্ঞান প্রভৃতি বিকাশের শক্তি, ইত্যাদি। ইহার সৃষ্টিপ্রকরণ জটিল এবং অনেক আইন-কানুনের বাধ্য। কিন্তু মোটামুটী এই।

একই ডিম্ব হইতে প্রত্যেক রকমের সংস্কার লইয়া অনেক রকম ডিম্ব ফুটিয়া বাহির হয়, এবং একটি হইতে দুইটি, দুইটি হইতে চারিটি এইরূপ লক্ষ লক্ষ ডিম্ব এক এক পথ ধরিয়া বাহির হইতে থাকে। ইহাদিগের পরিচালক তাহারা নিজেই, কিন্তু সকলেই মূল অণ্ডের অধীন। জীবদেহে যখন মস্তিষ্কেরই প্রথম বিকাশ, তখন মূল অণ্ডের বাসস্থান মস্তিষ্কেই নির্দ্দিষ্ট করা যাইতে পারে; কিন্তু উর্ণনাভের ন্যায় তাহার বাসস্থান এক স্থানে নির্দ্দিষ্ট হইলেও, তাহাকে অন্যান্য সংস্কার-সম্পন্ন সন্তানগণের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতে হয়। উর্ণনাভের জালের মত স্নায়ুমণ্ডলী অর্থাৎ কর্ম্মের পথ চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ে এবং তাহারই মধ্যে স্থানে স্থানে চক্রস্বরূপ (Plexus) এক একটা বিশ্রাম স্থান কিংবা বিকাশের স্থান আছে। অর্থাৎ মাংসপেশির, অস্থির, হৃদ্‌পিণ্ডের, ফুসফুসের, ভাস্কর, কামনার, জ্ঞানের, প্রত্যেকেরই বিকাশের স্থান আছে। যে পথ ধরিয়া তাহারা ডিম পাড়িয়া তুমুল আন্দোলন করে, সেই স্নায়ুপথ, কিংবা তাহাদিগের বিকাশের কেন্দ্র, কোন উপায়ে নষ্ট কিংবা ধ্বংস করিতে পারিলে, অন্ততঃ আপাততঃ তাহাদিগের আর বিকাশ হইতে পারে না। এইরূপে ভ্রূণসৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে, দৃশ্য মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ডিম্বের জন্ম, মরণ, বর্দ্ধন, এবং লয় ইত্যাদি হইতে থাকে।

এখন যদি মানুষটাকে মৃত্যুর পরে দগ্ধ না করিয়া মৃত্তিকায় প্রোথিত করিয়া রাখেন কিংবা কোন কাচপাত্রে বদ্ধ করিয়া রাখেন, তবে দেখিবেন যে, ক্রমে মাংসপেশি প্রভৃতি অন্তর্দ্ধান হইয়া অন্যপদার্থের সহিত মিশিয়া যায়, ক্রমে স্নায়ুচক্র বিলীন হইয়া যায়। পর্ব্বতের মত অস্থি-মাত্র বহুদিন থাকে। তাহাও বহুকালে নষ্ট হইয়া যায়।

এত মেহনৎ সত্বেও দেহটা থাকিল না। তাহার জ্ঞান-বুদ্ধি, দয়া-ধর্ম্ম স্মরণ করিয়া পুত্র-কন্যা কাঁদিল, তাহার বেয়াকুব্বী ও বদমায়সী স্মরণ করিয়া শত্রুপক্ষ এক হাত লইল, এবং সে আবার জন্মিবে ইহা বুঝাইয়া পণ্ডিতগণ সান্ত্বনা করিল।

এখন ডিম্বগণের পৌরাণিক এবং শেষ অবস্থা পর্য্যন্ত দেখা যাউক। পদনখরের ডিম্ব তাহার পূর্ব্ব পুরুষ অন্য একটি সেই প্রকার ডিম্ব হইতে উদ্ভূত, অস্থির ডিম্বের সেই প্রকার একটা বিরাট বংশ, মাংসপেশির ও সেই রকম আর একটা বংশ। উভয় বংশের নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান ছিল। কিন্তু তাহাই শেষ বাসস্থান নহে। অন্ততঃ তাহারা এই বলিতে পারে যে অমুক চক্র (Plexus) কিংবা বাস-কেন্দ্র হইতে আমাদিগের বংশের (Tissue) উৎপত্তি। মাংসপেশি বলিতে পারে আমাদিগের বংশ অতি পুরাতন, কারণ ইহা সংগঠিত হইতে চল্লিশ বৎসর লাগিয়াছে। কিন্তু অস্থিও ফেলা যায় না। আবার মাংসপেশী এবং অস্থি উভয়েই কোন কালে কেবল একই ডিম্বের গর্ভ হইতে বাহির হইয়াছিল, অতএব সেটা আরও পুরাতন। এবং সেই ডিম্বও অন্যান্য নানাবিধ সংস্কারাপন্ন ডিম্বের সহিত যে আদিম ডিম্বের গর্ভোৎপন্ন তাহার ইতিহাস কেহই জানে না। যদিও প্রত্যেকের পিতৃপুরুষ বিভিন্ন, কিন্তু সেই সকল পিতৃপুরুষ যে অন্য পিতৃপুরুষ

হইতে, এবং সকল পিতৃরুষই যে আদিম পিতৃপুরুষ অর্থাৎ মস্তিষ্কাস্থিত উর্ণনাভ কিংবা ব্রহ্মার মত চতুর্ম্মুখ-সম্পন্ন ডিম্ব হইতে বহির্গত, তাহা অনেকটা অনুমান করা যাইতে পারে।

প্রত্যেক পিতৃপুরুষই বুদ্ধিমান এবং বিচক্ষণ। যদি অস্থি এবং মাংসপেশির ডিম্বগণকে শূদ্র কিংবা সেবক বলা যায়, রক্তাদির ব্যবসাজীবি ডিম্বকে বৈশ্য বলা যায়, বলবুদ্ধির ডিম্বকে ক্ষত্রিয় বলা যায়, ও সম্পূর্ণ জ্ঞানের ডিম্বকে ব্রাহ্মণ বলা যায় তবে আমাদের কল্পিত ব্রহ্মাস্বরূপ প্রপিতামহ-ডিম্বের সম্পূর্ণ গৌরব বজায় রাখা যাইতে পারে।

কিন্তু আমরা একটি মানবদেহ লইয়াছি, এবং তাহারই অন্তর্গত পিতৃপুরুষের কথা কহিয়াছি। বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা করিবেন 'তুমি বানরের কথা কহিলে কই'? অতএব তাহা কহি।

যদি একটা মানুষকে এই প্রকার একটা ডিম্ব ধরা যায় তবে অনেক মানুষ লইয়া একটা দেহ ধরা উচিত। মনে করুন একটা বিরাট গর্ভ আছে, এবং তাহার মধ্যে পৃথিবী নামক গ্রহ একটা ডিম্ব (cell), এবং সেই ডিম্ব হইতে নানা প্রকার বংশের (Tissue) উৎপত্তি হইতেছে।

এই পৃথিবী নামক গ্রহের মধ্যে যে আদিম ডিম্বের একটা মস্তিষ্ক (Brain centre) নিহিত আছে তাহা খুব সম্ভব। কারণ ইহা হইতে উৎপন্ন প্রথম কীটাণু, এবং পরে বহু কীটাণু, এবং পরে গজ কচ্ছপ, এবং বিশাল জীবজন্তুগণের (তাহারও প্রমাণ এখনও ভূতত্ব দিতেছেন) বিকাশ হইয়াছিল এবং এখনও হইতেছে। প্রকাণ্ড অস্থি ও মাংসপেশি লইয়া হস্তী এবং পৌরাণিক মাষ্টোডোন্, ক্ষুদ্র দেহ লইয়া চড়ুই পক্ষী, এবং বিলক্ষণ বুদ্ধিসম্পন্ন Anthropoid বানরাদি, জীবশূন্য (Azoic) যুগ হইতে Miocene, pliocene ইত্যাদি বাহিয়া অবশেষে খৃষ্টাব্দ বিংশ শতাব্দীতে উপস্থিত হইয়াছে। অস্থির প্রতিকৃতি পর্ব্বতাদি, রক্তের প্রতিকৃতি জলাশয় এবং গুল্মাদি, মাংসের প্রতিকৃতি কর্দ্দমাদি, ঘর্ম্মের মত বাষ্পাদি, সকলই পৃথিবী হইতে উদ্ভুত। সকলেরই এক একটি করিয়া পিতৃপুরুষ কিংবা দেবতা, এবং সকলেরই আবার একটি সাধারণ পিতৃপুরুষ, এই পৃথিবীরই অন্তর্নিহিত মস্তিষ্কের মধ্যে অবস্থিত তাহাও অনুমান করা যাইতে পারে। তবে মনুষ্য-বংশ হইতে বানরবংশের তফাৎ এই যে মনুষ্যমস্তিষ্ক ডিম্বের ভাগটা বেশী সংগ্রহ করিয়াছে, বানর এখনও তাহা করিতে পারে নাই, আবার লাভ করিয়া মানুষ হইবে। মনুষ্যদেহের মাস্তষ্কের ভাগে যে সকল ডিম্ব (cell) আছে তাহারা যে কেবল মস্তিষ্ক লইয়াই থাকিয়া গিয়াছে তাহা নয়। তাহা-দেরও লাঙ্গুল ছিল, অস্থি ছিল, পাহাড় পর্ব্বত জলাশয়ের মত স্থান সকল ছিল, কিন্তু ক্রমে সেগুলি ত্যাগ করিয়া এখন বালখিল্য ঋষিগণের মত কেবল জ্ঞান সঞ্চালন করি-তেছে। আমাদিগের দেহেও রাক্ষস, বানর, ভল্লুক, সর্প, প্রভৃতির ন্যায় হিংস্রক ডিম্ব আছে, নচেৎ আমাদের স্বভাব অমন হয় কেন, কথার ঢং সে রকম কেন, মারা-

মারি কাটা-কাটি, রিপু-পরায়ণতা কেন? অথচ আমাদিগের স্নেহ আছে, দানধর্ম্ম বৈরাগ্য আছে, টন্‌টনে জ্ঞানও আছে। ইহা কেবল ডিম্বের সংখ্যার মারপেঁচ।

ইহা অনেকটা হেকেল ও বাইস্‌মানের মত। শাস্ত্রের ও মত। মস্তিষ্কের ডিম্ব অনেকটা নিরামিষ আহার লইয়া ব্যস্ত। শোণিতের ডিম্ব মাংসাদি লইয়া ব্যস্ত। এমন কি ইহাও প্রমাণিত হইয়াছে যে, স্থির ডিম্বগুলি আদিমকালে পরিব্রাজক ছিল এবং পিতৃপুরুষগণের বাসস্থানে গিয়া বুদ্ধিবৃত্তি সম্মার্জ্জিত করিয়া আসিত। (Journal of Royal Microscopical Society—all fixed and stationary cells have once been "wandering cells, that is nomadic embryonic entities moving over the free surfaces of membranes, in search of some medium or tissue for which they have a physiological affinity. Its nomadic faculties being restored it may travel into quite other localities and by contiguity become again a fixed entity in another kind of tissue by evolution) কি আশ্চর্য্য ব্রহ্মচর্য্য! কি অদ্ভুত পরিশ্রম ও শিক্ষা!

মনুষ্য-ডিম্ব কিংবা তাহার বংশ (tissue) যে এই রকম পূর্ব্বপুরুষ বানর ভল্লুকাদির নিকৃষ্ট অংশ ছাড়িয়া এবং ভূমণ্ডলে পর্য্যটন করিয়া আমাদিগের কল্পিত মস্তিষ্কের স্থানে গিয়া আদিম পিতৃপুরুষের জ্ঞান প্রাপ্ত হইবে, ইহা কি একটা আশ্চর্য্য কথা?

কিন্তু আপনি জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে যদি তাহাই হয়, অর্থাৎ মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি ইত্যাদি, পৃথিবীর অন্তর্নিহিত সূক্ষ্ম সারাংশে (Nucleus) প্রচ্ছন্ন থাকে, এবং তাহাই ক্রমে ক্রমে বহুবিধ ডিম্বে সঞ্চারিত হইয়া বানরাদির মস্তক হইতে মনুষ্য মস্তকে বিকাশ পাইয়া থাকে, তবে ইহাও জিজ্ঞাস্য যে পৃথিবীই কি মানবের পিতৃপুরুষের আদিম বিশ্রাম স্থান?

দুর্ভাগ্যবশতঃ না। পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে তাকাইয়া দেখিলে এবং পৃথিবীর ইতিহাস পাঠ করিলে তিনটি কথা অনুমিত হয়:—

১। পৃথিবী ডিম্ব অন্যান্য গ্রহাদির ন্যায় কোন সাধারণ ডিম্ব হইতে উদ্ভূত।

২। ক্রমে গ্রহগণ ভিন্ন ভিন্ন সংস্কারাদির বশে আদিম ডিম্ব, এবং পরবর্ত্তী যুগের সাধারণ বাসস্থান হইতে, ক্রমে ক্রমে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। মানবদেহের ডিম্ব-পিতৃপুরুষের মধ্যযুগের বাসস্থানের ন্যায় ইহারা এক একটি কেন্দ্র মাত্র (Plexuses in the solar system).

৩। ইহাদিগেরও একটি সাধারণ পিতৃপুরুষ আছেন এবং তাঁহারই ইচ্ছা কিংবা কল্পনা কিংবা দৃশ্যক্রমে (তিনি দ্রষ্টা) এই সৌরজগত বিকাশিত এবং লীন হইতেছে।

ইহাও সম্ভব যে এই সৌরজগৎই শেষ জগৎ নহে। তারকামণ্ডলী দেখিলে ও মাধ্যাকর্ষণাদির বিচার করিলে অন্যান্য বহু জগতের কথা আসিয়া পড়ে। কিন্তু পুরাণের জন্য ততটা কথা পাড়িবার দরকার নাই।

এখন আমরা সৌরজগতের দিকে

চাহিয়া দেখিব। সূর্য্য মধ্যস্থানে এবং গ্রহগণ নিজকক্ষায় ব্যতিব্যস্ত। আপাততঃ যতদূর জানা গিয়াছে বুধগ্রহ সূর্য্য হইতে সর্ব্বাপেক্ষা নিকট, শুক্র তৎপরে, পৃথিবী একটি চন্দ্র লইয়া তাহার পর, তৎপর মঙ্গল দুইটি চন্দ্র লইয়া, বৃহস্পতি চারিটি চন্দ্র লইয়া, শনি আটটি চন্দ্র লইয়া, এবং তাহা হইতেও দূরে ইউরেনস এবং নেপচুন্ (বরুণ) গোলকমণ্ডলে নির্ব্বিবাদে পরিভ্রমণ করিতেছেন (চন্দ্রের ইংরাজী Satellite)।

ইহা হইতেও দূরে তারকামণ্ডলী সৌরজগৎ বেষ্টন করিয়া আছে। মধ্যে মধ্যে বহু গ্রহ আছেন, তাঁহারা ক্ষুদ্র বলিয়া নামকরণ হয় নাই। কিন্তু তারকামণ্ডলী মধ্যে কতকগুলি স্থির অর্থাৎ গতিশূন্য (fixed) তারকার বাহ্য অবয়ব দৃষ্টে দ্বাদশ রাশির নামকরণ হইয়াছে। সেই গুলির প্রতি লক্ষ্য করিয়া গ্রহগণের গতি নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে, এবং ধ্রুবতারা নামক তারা দেখিয়া আমরা এ পর্য্যন্ত ঠিক করিতে পারি যে কত সহস্র বৎসরে এক একটি গ্রহ অয়ন হইতে ক্রমে ক্রমে অপসৃত হইয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্ব স্থানে উপনীত হয় (Precession of Equinoxes)।

এখন, যদি ডিম্ব-তত্ত্বের আইন সৌরজগতেও খাটে এরূপ মানিয়া লওয়া যায় (কারণ সৃষ্টিতত্ত্বে দুই প্রকার আইন থাকা অসম্ভব) তাহা হইলে কোন কালে যে নক্ষত্রগণও ঘুরিয়া বেড়াইত ইহা সম্ভব। যুগল তারকা (Binary stars) ইহার একটি দৃষ্টান্ত। যখন মানবদেহে ডিম্বগণ (cells) বহুপরিভ্রমণ করিয়া আবার স্থির হইয়া পড়ে, এরূপ দেখা গিয়াছে, তখন তারকাগণ ও যে এককালে বিলক্ষণ পরিভ্রমণ এবং পরিশ্রম করিয়া এখন বার্দ্ধক্যকালে নিশ্চিন্ত হইয়া পড়িয়াছে ইহার কিছুই আশ্চর্য্য নহে। তখনও আমাদিগের সূর্য্য ও গ্রহগণ জন্মগ্রহণ করেন নাই। অর্থাৎ দ্বাদশ রাশি (এখনকার তারকামণ্ডলী) তখন একটা মহাসমুদ্রের মত কিংবা মাতৃগর্ভের মত ছিল। সৌরজগতের ভ্রূণ অর্থাৎ সূর্য্য তখন নীহারিকমণ্ডলীর মধ্যে প্রচ্ছন্ন (Nebula). তাহার পর সমুদ্র-মন্থনের মত একটা কিছু হইয়া চন্দ্র সূর্য্য আদি গ্রহগণের উৎপত্তি।

এই সমুদ্র-মন্থন যে কিরূপে হইতে পারে তাহা আমরা কল্পনা করিতে পারি না। কারণ একদিকে সুরগণ এবং অন্যদিকে অসুরগণ কিরূপে রজ্জু টানিয়া তৎকালীন মহাসমুদ্রকে আলোড়িত করিয়াছিল, তাহার ঠিক প্রতিকৃতি এখন ও মানবগর্ভে দেখিতে পাওয়া যায় নাই। কিন্তু এটা যে একটা রূপক তাহা বলিতে পারি না। তবে এটা ঠিক যে, সুরগণ দিব্য গুম্ফ এবং শ্মশ্রুসম্পন্ন মানুষের মত, এবং অসুরগণ যে দিল্লীরাজ আগরা জুতা পায় হাব্সীগণের মত সমুদ্র বক্ষে নবপ্রকাশিত আর্টস্কুলের চিত্রের ন্যায় একটা কেলেঙ্কারি করিয়াছিলেন, তাহা কখনই নয়। সুরগণের এবং অসুরগণের চেহারা কল্পনায় না আসিলেও, তাহারা যে জীববিশেষ, অন্ততঃ কোন দিব্য জ্যোতির্ম্ময় ডিম্ববিশেষ, এবং সেই ডিম্ব-গুলি যে লক্ষযোজন পরিব্যাপ্ত হইয়া তৎকালীন সৌরজগতের মেরুদণ্ডের দুই পার্শ্বে সারি

বাঁধিয়া একটা বিরাট ব্যাপার সাধন করিয়াছিল তাহার ফল মানব-মাতৃগর্ভে অতি ক্ষুদ্রাকারে দেখা যায়।

কেবল ফল মাত্র দৃষ্ট হয়। অর্থাৎ প্রথম ভ্রূণ (germinal cell) আসিয়া প্রকাশ হয় সেটা আমরা অনুবীক্ষণ সাহায্যে দেখিয়াছি। কিন্তু ভ্রূণ শুক্র-শোণিত হইতে কিরূপে মেরুদণ্ডের সংযোগে (chordadorsalis) মন্থন দ্বারা উৎপত্তি হয় তাহা আমরা জানি না। আঁচা যাইতে পারে, কিন্তু যাহা প্রত্যক্ষ নহে তাহার অবতারণা করা ধৃষ্টতা মাত্র। কিন্তু ইহা ঠিক যে একটা অণ্ড, বহু অণ্ডের প্রবৃত্তি লইয়া উদিত হইলেও, বংশ বিস্তারের মাল-মসলা চাহি, এবং সে মাল-মসলা আমাদিগের সমুদ্র, এবং সমুদ্র কখন জীবশূন্য হইতে পারে না।

এখন আমাদিগের এই মাত্র দ্রষ্টব্য যে এই ডিম্ব বংশ বিস্তারের সহিত সুরাসুরের কোন সম্বন্ধ থাকিতে পারে কি না। আমরা গর্ভে দেখিয়াছি একপ্রকার ডিম্ব অন্যকে খাইয়া ফেলে, এবং পরস্পরের মধ্যে মহা বিরোধ ঘটে। এই বিরোধ না ঘটিলে সুর-ডিম্বের বাসস্থান ও অসুর-ডিম্বের বাসস্থান স্বতন্ত্র হইত না। ভ্রূণরূপী পিতৃপুরুষ যখন সুরাসুর পরিপূর্ণ মহাসমুদ্রে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন, এবং স্বীয় কল্পনা ক্রমে একটা বংশ বিস্তারের জন্য তেজঃপুঞ্জ কলেবরে সমুদ্রকে দ্বিধা করিয়া গোলকের উত্তর এবং দক্ষিণভাগ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তখন সৌর-জগতের চেহারা যে ঠিক, আমরা এখন যাহা দেখি, তাহা ছিল না তাহা অনুমিত হয়।

মধ্যে সূর্য্য। উত্তর দিকে বিস্তীর্ণ জল-ভাগ। শূন্যে যে জল ঝুলিয়া থাকিতে পারে তাহা বোধ হয় বুঝাইতে হইবে না। তখন আদিত্য ছাড়া গ্রহগণের উৎপত্তি হয় নাই এবং আদিত্য তখন স্বয়ং গতিবিশিষ্ট। উর্ণনাভের ন্যায় তাঁহার রথ বিলক্ষণ পরিভ্রমণ করিত এবং তিনি নূতন কেন্দ্রে বিশ্রাম লাভ করিবার পূর্ব্বে সৌরজগতের আধুনিক গতির সৃষ্টি হয় নাই। ইহা বেদের সূর্য্য। বাইবেলের বিশ্রামের পূর্ব্বে। আপনি মনে করিতে পারেন চতুর্দ্দিকেই বুঝি কেবল অগ্নিময়। তাহার কোন কারণ নাই। পৃথিবী-ডিম্ব লইয়া ভাবিয়া দেখুন, অভ্যন্তরে অগ্নি, তাহার পর জৈবিক সার এবং তাহার পর পরিব্যাপ্ত সমুদ্র, একত্রে একটি আর একটিকে আবরণ করিয়া বিন্দুর ন্যায় শূন্যে ঝুলিতেছে। সেই রূপ প্রথম সৃষ্টিতে সূর্য্য অগ্নিস্বরূপ (nucleolus,) বুধ তাহার স্ফুলিঙ্গ, শুক্র তাহার জৈবিক সারাংশ, একটি আর একটি আবরণ করিয়া মহাসমুদ্র মধ্যে। যেমন মাতৃগর্ভে অর্থাৎ সমুদ্র মধ্যে পিতার শুক্র পিতৃপুরুষের ধারাবাহী বুদ্ধি বুধ ও জ্ঞান (আদিত্য) প্রভৃতি লইয়া একটি অভিনব বংশ বিকাশ করিতে রজস্থলে উদীয়মান। আমাদিগের ক্ষুদ্র চক্ষুতে গর্ভ ও ভ্রূণ ছোট বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু যদি আমাদিগের চক্ষু সৌরজগৎ হইতেও বড় হইত, তাহা হইলে সূর্য্যের জন্ম ও সূর্য্য-বংশ বিস্তারকে রূপক বলিতাম না।

অবশ্য সৌরজগতের এই অবস্থা বহুকাল থাকিতে পারে না। বুধ ও শুক্র বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল, এবং বুধ এবং শুক্র প্রভৃতি কেন্দ্র হইতে ডিম্বসকল সমুদ্র বাহিয়া পৃথিবী-

নামক গ্রহের আভ্যন্তরীণ মস্তিষ্কের কাঠাম (cerebral hemisphere) সৃজন করিয়াছিল, এবং এইরূপে আদিম পিতৃপুরুষ চন্দ্রনামক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন (cerebellum) এবং সেই স্থান হইতে সাধারণতঃ দুইটি পথ বাহিয়া সমুদ্র মধ্যে বহুডিম্বের উৎপত্তি করিয়াছিলেন। পৃথিবী এবম্বিধ প্রকরণে চন্দ্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল। অন্যান্য গ্রহগণও এইরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া এক একটি বংশের কেন্দ্রস্থান হইয়াছিল এবং তাহারাও চন্দ্রবিশিষ্ট। অতএব চন্দ্রবংশ ও সূর্য্যবংশ যে এই পৃথিবীর এবং অন্য গ্রহের নাই তাহা বলা চলে না। প্রত্যেক কেন্দ্র ক্রমে জলরাশি আকর্ষণ করিয়া এক একটা বৃহৎ ডিম্বে পরিণত। তাহাদের একই পিতৃপুরুষ, একই বুদ্ধি, একই জ্ঞান। কিন্তু পূর্ব্বে বলা গিয়াছে দ্রষ্টা এবং দৃশ্য একই নহে। বহুত্ব যেমন দৃশ্যাবলীর একটা অঙ্গ, রকমারীও তাহাই।

যদি তৎকালীন এবম্বিধ বিরাট দৃশ্য অতি ক্ষুদ্র করিয়া কল্পনা করা যায় এবং মাতৃগর্ভের সহিত তুলনা করা যায় তাহা হইলে কোন পার্থক্য থাকে না। কিন্তু ক্ষুদ্র কল্পনা করিলে বড় কল্পনা রূপক হইয়া দাঁড়ায়। যদি ছোট একটা সপ্তদ্বীপ কল্পনা করা যায় তবে বিরাট সপ্তদ্বীপ রূপক হইয়া যায়। কিন্তু পুরাণ বুঝিতে গেলে কিঞ্চিৎ বড় এবং আপাততঃ গাঁজাখুরি কল্পনা করা চাহি।

তাহা এই। কত লক্ষ লক্ষ বৎসরে এই সকল সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। এককালে এমন অবস্থা ছিল যে ক্ষুদ্র এবং বিরাট ডিম্বগণ এক গ্রহ হইতে অন্য গ্রহে স্বচ্ছন্দে গমনাগমন করিতে পারিত। মধ্যে দ্বীপ সকল ছিল। জল ছিল। পর্ব্বতাদি ছিল। এখনও সেই প্রকার আমাদিগের দেহ মধ্যে। এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে সূক্ষ্মশরীর দরকার হইত না।

এখন আমরা অন্য গ্রহগণকে ছাড়িয়া দিয়া সূর্য্য, চন্দ্র, এবং পৃথিবীকেই দেখিব। চন্দ্রের মতিগতি দেখিয়া, আকর্ষণাদি দেখিয়া, এবং তাহার ভূপৃষ্ঠের পর্ব্বতাদি দেখিয়া, বেশ বোধ হয় যে এককালে ইহা পৃথিবীর খুব সন্নিকট ছিল, এমন কি পৃথিবী নামক গোলকের উত্তর মেরু চন্দ্রের যে ভাগ আমরা দেখিতে পাই সেই ভাগ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। তবে আপনি জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে বিচ্ছিন্ন হইবার পূর্ব্বে যে তাহাতে জীবজন্তু ছিল তাহার প্রমাণ কি? এবং যদি থাকে তাহারা কি প্রকার? আমরা যে সকল চন্দ্র এবং সূর্য্যবংশীয় নরপতিগণের কথা পুরাণে পাঠ করি তাহাদিগের তৎকালীন অস্তিত্বের প্রমাণ কি?

কথাটা অবশ্যই শক্ত। যদি সেই সকল নরপতিবৃন্দকে ক্ষুদ্রাকার মানুষের মত অবয়ববিশিষ্ট বলিয়া ধরা যায় তবে নিশ্চয় কুম্ভকর্ণ এবং হনুমান রূপক হইয়া পড়িবে। কিন্তু তাহারা পুরাণের মতে 'দিব্যদেহধারী'। পদার্থপুঞ্জের প্রাকৃতিক বিকাশের সহিত দেহেরও বিকাশ। দিব্যদেহধারী ও দিব্যচক্ষু-ওয়ালা পুরুষ এবং এবং স্ত্রীলোকের দেহ ঠিক আমাদের মত

নয়। তাহাদের বাহ্যদেহ আমাদের এখনকার চক্ষুগোলকের দৃশ্য না হইতে পারে, কিন্তু তাহাদের দেহও জড়পদার্থ এবং একটা বিশেষ আকৃতিময় ছিল তাহাই আমাদিগের বক্তব্য। অবশ্য আমরা কল্পনা করিতে না পারিয়া তাহাকে Astral body বলিতে পারি, কিন্তু তাহাতে অন্য অর্থ আসিয়া পড়ে। হনুমানের চড়ে যেমন রাবণ কম্পমান হইয়াছিলেন, এখনও একটা গোদা বানরের চড়ে আমরা সেইরূপ হইয়া থাকি। কিন্তু তৎকালীন হনুমান এখন আসিয়া আমাদিগকে চড় মারিতে পারিবে না। যদি মারে তবে আমাদিগের স্নায়ুমণ্ডলী অস্থির হইতে পারে কিন্তু সেটা ভূতে পাওয়ার ন্যায়। এখন আমরা যেমন প্রস্তরাদি লইয়া সেতু বাঁধি, তখনকার বানর ইহা হইতে লক্ষগুণ বড় সেতু বাঁধিতে পারিত। পর্ব্বত উৎপাটন করিতে পারিত। অর্থাৎ তৎকালীন Anthropoid ape এখনকার এবং তখনকার পর্ব্বত হইতেও বড় ছিল। সুতরাং পুরাণোক্ত বীরত্বে বেশী বাহাদুরী নাই।

অতএব, যখন সূর্য্য ও গ্রহগণ পরস্পরের সন্নিকট ছিল, তখনকার ডিম্ববংশ, নানাবিধ জীবজন্তু ও বিরাট মানবাকারে এক গ্রহ হইতে অন্য গ্রহে ক্রমে ক্রমে প্রসারিত হইয়াছিল, এরূপ অনুমান করা আশ্চর্য্য নয়। অতিক্ষুদ্র বুদ্ধিতেও ইহা বিবেচ্য হইতে পারে যে পৃথিবীর এই জাতি সকল কোথা হইতে আসিল? একটা বড় গাছ দেখিয়া যখন আমাদিগের বেশ বোধ হয় যে বীজের মধ্যে গাছ ছিল, তখন পৃথিবী-বৃক্ষ দেখিয়া তাহা মনে করি না কেন? বৃক্ষবীজ যেমন মৃত্তিকা ও জলের সাহায্যে বর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ পৃথিবীবীজ যে আদিম কালে মহাসমুদ্র ও সপ্তদ্বীপাদির সাহায্যে এখনকার আকার ধারণ করিয়াছে তাহা কি অসম্ভব? অপিচ এইরূপ একটা গাছ যে তাহারও পূর্ব্বে কোন কল্পে হইয়াছিল তাহতেই বা বিস্ময় কি? এবং সৌর-জগতকে যদি একটা বীজ ধরিয়া লওয়া যায় তবে পৃথিবী তাহারই একটি ডাল, এবং এখন এক ডাল হইতে অন্য ডালে যেমন পিপীলিকাগণ পরিভ্রমণ করে, তখনও যে বিরাট চন্দ্র ও সূর্য্যবংশ এক গ্রহ হইতে অন্য গ্রহে যাতায়াত করিতেন না, যুদ্ধাদি করিতেন না, ও বংশ বিস্তার করণার্থ বিবাহাদি করিতেন না তাহা কে বলিতে পারে?

তবে এই কথা মাত্র বলিতে পারি যে সেই বিরাট পৃথিবী এখন ছোট হইয়া গিয়াছে। চন্দ্রে জলভাগ নাই, শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। বিজ্ঞানের মতে গ্রহগণের এখনও যেমত অবস্থা আছে তাহা হইতে, কোন কালে যে জীবজন্তু এবং মনুষ্যাদি ছিল, তাহা প্রমাণ হয়। ইহাতে কি প্রমাণের দরকার আছে? বীজ এবং অণ্ডাদি প্রসারণের আইন এখন সর্ব্বতোভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। সুরাসুর, ঋষিগণ, আদিত্যের রথচক্রের উপর ভ্রমণ, মান্ধাতার উরুভাগ হইতে জন্ম, ভগীরথের গঙ্গা আনয়ন, অগস্ত্যের সমুদ্র শোষণ, বালির সহস্রযোজন ব্যাপ্ত লাঙ্গুল, সীতাদেবীর পাতালে প্রবেশ, সুরাসুরের সমুদ্রমন্থন, ঠিক আইনানুসারে, জ্যোতিষ, গণিত এবং

দেহতত্ত্বের সাহায্যে বেশ বুঝান যাইতে পারে। ইহাতে রূপক ও যোগ আনিবার কোন আবশ্যক নাই।

তবে ইহা মাত্র বলিতে পারেন যে তাহার প্রতিকৃতি তারকামণ্ডলীতে পাওয়া যায় এবং মানবদেহের নাড়ী-নক্ষত্রাদি দেখিয়া তন্ত্রের মধ্যে পাওয়া যায়। একটা আর একটার পরিপোষক। একটা আর একটার প্রমাণ। কিন্তু তাহা হইলেও পুরাণ যে একটা ভাবিয়া দেখিবার জিনিষ, এবং রূপকে জড়াইবার জিনিষ নহে, তাহারই ইঙ্গিত দিতে আমরা সাহসী হইয়াছি। পুরাণ বুঝিতে গেলে সমগ্র বিজ্ঞান আয়ত্ত করা দরকার, এবং আমাদিগের বিশ্বাস যে বিজ্ঞানই শাস্ত্রের গৌরব রাখিবে।

এবং আমাদিগের ইহাও বিশ্বাস যে বিজ্ঞানই আমাদিগের পিতৃপুরুষগণের অস্তিত্ব এবং সেই পিতৃপুরুষগণের উপাস্য পরমেশ্বরের মহিমাও একদিন বুঝাইবে। যখন Nebular theory বিজ্ঞান-জগতকে বিস্মিত করিয়াছিল তখন Sir Isaac Newton বেণ্ট্‌লি সাহেবকে বলিয়াছিলেন যে ও তত্ত্বটা আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি না, কারণ উহা নিরীশ্বর! কি গভীর কথা! নিউটন তখন বুঝিয়াছিলেন যে সৌরজগতের প্রথম বিকাশ মানববুদ্ধির অতীত। আমাদিগের শাস্ত্রের সহিত নীহারিকা-তত্ত্বের (Nebular theory) পার্থক্য এই যে, শাস্ত্র বীজ-প্রসারণের তত্ত্ব বজায় রাখিয়াছে কিন্তু Nebular theory নিজ কল্পনার মূলে উপনীত হয় নাই। গ্রহগণ বাহুদূপ্তে শূন্যে বিকাশ প্রাপ্ত হইলেও তাহাদের পূর্ব্ববীজ যে একটি বীজের মধ্যে ছিল ইহাই যুক্তিসঙ্গত। এবং বীজগুলি ক্রমে ক্রমে প্রসারিত না হইলে, একটা আর একটার সঙ্গে সহবাস না করিয়া, না ভাঙ্গিয়া গড়িয়া, যে কোন কালে জীবজন্তু উৎপাদন করিতে সমর্থ হইয়াছিল তাহা যুক্তিসঙ্গত নহে। Fission (খণ্ড খণ্ড হইয়া প্রসারণ) এবং amphimixis (জৈবিক সংমিশ্রণ) সৃষ্টির প্রকাণ্ড দুইটি প্রকরণ। তাহা উড়াইয়া দিলে চলিবে না।

সমগ্র বিশ্বের মহাপ্রলয় যে কি তাহা আমরা জানি না এবং তাহা পরব্রহ্মের ন্যায় দুর্জ্ঞেয়। দর্শন তাহা লইয়া থাকুক। কিন্তু জড়বিজ্ঞানেও, আমরা যে বুদ্ধি ও জ্ঞানের প্রসারণ দেখি, দয়াধর্ম্মের প্রসারণ দেখি, তাহা পিতৃপুরুষের প্রমাণ ও মায়াধিষ্ঠিত পরমজ্ঞানময় পুরুষের প্রমাণ।

বীজ-প্রসারণ-তত্ত্বে একটি আশ্চর্য্য প্রণালী দেখিতে পাওয়া যায়: পুনর্জ্জন্ম, প্রসারণ মাত্র। 'আমিত্ব' অর্থাৎ বিশ্বের একত্ব সর্ব্বব্যাপী। মানববংশ কীট-পতঙ্গাদির দেহ হইতে উদ্ভূত হইলেও কোন্ বংশ যে কতকালের, তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। কোন্ মানববংশ দৈত্যবংশ হইতে, কাহারা ত্রেতাযুগের 'প্রাকৃতিক' বানর হইতে, এবং কাহারা ঋষিগণ হইতে, বংশ-পরম্পরাক্রমে মর্ত্ত্যে অবস্থান করিতেছে, তাহার তত্ত্ব আমরা নিরূপণ করিতে অক্ষম। প্রত্নতত্ত্ব Azoic যুগ পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারেন মাত্র। হয় ত দশ সহস্র বৎসর পূর্ব্বের একটি বৃহৎ নরকঙ্কাল পাইতে পারেন, কিন্তু তাহাও শেষ নহে। এখন পৃথিবীর যে অবস্থা লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে তাহা ছিল না। এখন যে স্থান

সমুদ্রগর্ভে নিহিত, পুরাকালে তাহা রমণীয় দ্বীপাদি ছিল। এখনকার ভূগর্ভস্থ পর্ব্বতাদির পূর্ব্বেও যে অন্য এক প্রস্থ সেইরূপ পর্ব্বত ও জীবজন্তু আদি জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহার কিছুই আশ্চর্য্য নাই। আমাদিগের জ্ঞান ক্ষুদ্র, ও বিজ্ঞানের শৈশব অবস্থা, তাই বলিয়াই কি আদিম কালের ইতিহাস কি 'গাঁজাখুরি' হইয়া পড়িবে?

একটু ভাবিয়া দেখিলে বেশ বুঝা যায় যে জাতিস্মরতা লাভের পূর্ব্বে জ্ঞানের সম্পূর্ণ বিকাশ হওয়া চাহি। কোন্ অলক্ষ্য মহা কেন্দ্র হইতে যুগে যুগে এই জ্ঞানতরঙ্গ, লক্ষ লক্ষ যোনি বাহিয়া মানবের মস্তিষ্কে প্রতিঘাত করিতেছে তাহা কে জানে? সেই যোনিগত দেহ সকল যে কেবল এই পৃথিবীর, নহে, পরন্তু অন্যান্য পুরাতন পৃথিবী অন্যান্য গ্রহগণের সংস্রবে প্রাকৃতিক নিয়মে, অগণন যুগ ধরিয়া, এখনও স্বীয় তেজঃপুঞ্জ সম্পূর্ণ বিকাশিত করিতে পারে নাই তাহা আমরা ক্ষুদ্র মানব কি বুঝিব?

তবে আমাদের এইটুকু মনে রাখা উচিত যে আমরা এ কালের নহি। এ পৃথিবীর নহি। আমাদিগের পিতৃপুরুষ একই। কনাদ যাঁহাকে পরমাণু দিয়া দেখিয়াছেন, বিজ্ঞান যাঁহাকে প্রকৃতি দিয়া দেখিতেছেন, সাংখ্য যাঁহাকে প্রকৃতি এবং পুরুষ দিয়া দেখিয়াছেন এবং বেদান্ত যাঁহাকে মায়া দিয়া দেখিয়াছেন, তিনিই সেই, যাঁহাকে আদিম সৌরজগতের বেদজ্ঞ আদিত্যের মধ্য দিয়া, এবং পুরাণ সপ্তর্ষিমণ্ডল ও সূর্য্য ও চন্দ্রবংশ দিয়া দেখিয়াছিলেন। হৃদয়ের মধ্যে সেই জ্ঞানময়কে ক্ষুদ্র বলিয়া ধরিতে পারেন, কিংবা বিরাট সৌরজগতে আদিত্য বলিয়া ধরিতে পারেন, তাহাতে কিছু আসে যায় না। তাঁহাকে সপ্তলোকে ভাগ করিলেও তিনি জড় নহেন, কিংবা প্রস্তরের মধ্য দিয়া দেখিলেও জড় নহেন। তাঁহার চক্ষু 'আমি' এবং 'তুমি' সকলেই। তোমার চক্ষু নিমীলিত হইলে আমি জাগাইয়া দিব। আমার চক্ষু নিমীলিত হইলে তুমি জাগাইবে। কোন দৃশ্যই অসম্ভব নহে। পুরাণের দৃশ্যও সুন্দর, এবং চিন্তা করিলে ক্ষুদ্র খণ্ডজ্ঞান বর্দ্ধিত হইয়া আমাদিগের জাতিস্মরতা ব্যক্ত করে। অর্থাৎ আমরা একই জাতি এবং একই আদিম বংশোদ্ভূত। বহুরূপ আমরা দেখিয়াছি এবং আরও দেখিব। আমরা চিরকাল থাকিব। বংশবৃদ্ধিও করিব। যুদ্ধ বিগ্রহ চলিবে। প্রেমও চলিবে। তবে মধ্যে মধ্যে যেন মূলের দিকে দৃষ্টিপাত থাকে, তাহা হইলেই যথেষ্ট।

সুরদাস।

বেদান্ত।

আমি এই প্রবন্ধে সংক্ষেপে বেদান্ত-প্রতিপাদ্য বিষয়ের বর্ণনা করিব। যুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক উপনিষদের অর্থ নির্ণয় করাই বেদান্ত-সূত্রের উদ্দেশ্য, কিন্তু ভাষ্যকারগণ উক্ত সূত্র দ্বারাই উপনিষদে, দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ প্রভৃতি নানাবিধ মত সংস্থাপন করিয়াছেন। আচার্য্য শঙ্কর স্বকৃত ভাষ্যে অদ্বৈতবাদেরই সমর্থনার্থ নানাবিধ যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। তাহার মতে অদ্বৈতাত্মবাদই উপনিষৎ প্রতিপাদ্য, অন্যান্যবাদ তৎ-প্রতিপাদ্য নহে।

মহর্ষি বাদরায়ণ প্রণীত বেদান্তসূত্র বা বেদান্তদর্শন চারি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রত্যেক অধ্যায়ে চারিটী পাদ (অংশ) আছে। বেদান্তদর্শনের সূত্রসংখ্যা ৫৫৫। প্রথমাধ্যায়ের চারিপাদে যথাক্রমে ৩১, ৩২, ৪৩, ২৮ মোট ১৩৪; দ্বিতীয়াধ্যায়ের চারিপাদে যথক্রমে ৩৭, ৪৫, ৫৩, ২২ মোট ১৫৭; তৃতীয়াধ্যায়ে চারিপাদে যথাক্রমে ২৭, ৪১, ৬৬, ৫২ মোট ১৬৮; এবং চতুর্থাধ্যায়ের চারিপদে যথাক্রমে ১৯, ২১, ১৬, ২২ মোট ৭২টী সূত্র আছে। এক একটী বিষয়ের বিচার করিবার জন্য যে ক'টী সূত্র আবশ্যকীয়, সে সূত্রসমষ্টিকে অধিকরণ বলা হইয়া থাকে। প্রত্যেক অধিকরণের পাঁচটী অংশ আছে। (১) বিচার্য্য বিষয়, (২) সন্দেহ, (৩) সঙ্গতি, (৪) পূর্ব্বপক্ষ ও (৫) সিদ্ধান্ত। এই অধিকরণ "ন্যায়" নামে কখন কখনও অভিহিত হইয়া থাকে। বেদান্ত-দর্শনের অধিকরণ-সংখ্যা ১৯২। প্রথম অধ্যায়ের প্রথমপাদে ১১ দ্বিতীয়ে ৭ তৃতীয়ে ১৪ এবং চতুর্থে ৮ মোট ৪০। এবং দ্বিতীয়াধ্যায়ে যথাক্রমে ১৩, ৮, ১৭, ৯ মোট ৪৭. তৃতীয়াধ্যায়ে যথাক্রমে ৬, ৮, ৩৬, ১৭ মোট ৬৭ এবং চতুর্থাধ্যায়ে ১৪, ১১, ৬, ৭ মোট ৩৮টী অধিকরণ আছে। বেদান্ত-দর্শনের চারিটী অধ্যায়, যথাক্রমে সমন্বয়, অবিরোধ, সাধন ও ফলাধ্যায় নামে প্রসিদ্ধ। প্রথম অধ্যায়ে, ব্রহ্মই একমাত্র বেদান্ত (উপনিষৎ) প্রতিপাদ্য। অর্থাৎ উপনিষদীয় শব্দ সকলের তাৎপর্য্য বিষয় একমাত্র ব্রহ্ম, ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদে ব্রহ্ম-বোধক স্পষ্ট বাক্য; দ্বিতীয় পাদে উপাসনা-প্রকরণস্থ ব্রহ্মবোধক অস্পষ্ট বাক্য; তৃতীয় পাদে জ্ঞান-প্রকরণস্থ অস্পষ্ট ব্রহ্মবোধক বাক্য এবং চতুর্থ পাদে ব্রহ্মবোধক সন্দিগ্ধ বাক্যসমূহ বিচারিত হইয়াছে।

দ্বিতীয়াধ্যায় অবিরোধাধ্যায় নামে প্রসিদ্ধ। এই অধ্যায়ের প্রথম পাদে সাংখ্য, পাতঞ্জল ও বৈশেষিকাদি স্মৃতি এবং যুক্তির সহিত বেদান্তাদ্বৈতবাদের অবিরোধ; দ্বিতীয় পাদে সাংখ্য, পাতঞ্জল, বৈশেষিক, নৈয়ায়িক, বৌদ্ধ, (সৌত্রান্তিক, বৈভাষিক, যোগাচার ও মাধ্যমিক) জৈন, মাহেশ্বর ও বৈষ্ণব দার্শনিক মতের সদোষতা; তৃতীয় পাদে পৃথিব্যাদি পঞ্চ মহাভূতবোধক উপনিষদ্ বাক্যসমূহের পরস্পর অবিরোধ ও জীবাত্মা-

বোধক শ্রুতিসমূহের পরস্পর অবিরোধ এবং চতুর্থ পাদে সূক্ষ্ম শরীর বোধক উপনিষদ্‌সমূহের অবিরোধ প্রতিপাদিত হইয়াছে।

তৃতীয়াধ্যায় সাধনাধ্যায় নামে অভিহিত। তাহার প্রথম পাদে বৈরাগ্য নিরূপণ, দ্বিতীয় পাদে জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপ-নিরূপণ, তৃতীয় পাদে সগুণ ও নির্গুণ উপাসনার বিষয় নিরূপণ এবং চতুর্থ পাদে নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞানের বাহ্যকারণ যজ্ঞাদি এবং আভ্যন্তরিক কারণ শম-দমাদি নিরূপণ করা হইয়াছে।

চতুর্থাধ্যায় ফলাধ্যায় নামে কথিত হইয়া থাকে। ইহার প্রথম পাদে জীবমুক্তি, দ্বিতীয় পাদে মৃত জীবের উর্দ্ধগতির ক্রম, তৃতীয় পাদে সগুণ ব্রহ্মজ্ঞানীর মৃত্যুর পর ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি এবং চতুর্থ পাদে নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞানীর বিদেহমুক্তি অর্থাৎ দেহত্যাগের পর ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থিতি নিরূপিত হইয়াছে। ভাষ্যকার শঙ্কর, প্রথম চারি অধিকরণে, অদ্বৈতবাদ-সংসৃষ্ট বিষয়সমূহের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত আধকরণ চতুষ্টয়ের প্রথমটী জিজ্ঞাসা বা প্রয়োজনাধিকরণ, দ্বিতীয় জন্ম বা লক্ষণাধিকরণ, তৃতীয় প্রমাণাধিকরণ এবং চতুর্থ সমন্বয় বা বেদান্ত তাৎপর্য্যনির্ণয়াধিকরণ নামে প্রসিদ্ধ।

আমি প্রথমতঃ উক্ত অধিকরণ চতুষ্টয়ের প্রতিপাদ্য বিষয় বর্ণনা করিব। এই জগতে দ্বিবিধ-স্বভাব মনুষ্য দেখিতে পাওয়া যায়, রাগ-স্বভাব ও বিরাগ-স্বভাব। রাগ-স্বভাব মনুষ্যগণ ক্রমিক বৈষয়িক উন্নতি ও সুখের আকাঙ্ক্ষা করিতে থাকেন। কিন্তু কিছুতেই তাহাদের আকাঙ্ক্ষা, শেষ সীমায় উপনীত হইতে পারে না। অধিকন্তু তাহারা সেই অদম্য আকাঙ্ক্ষার চরিতার্থতা সম্পাদনার্থ, নানাবিধ দুঃখ সহ্য করিতে বাধ্য হন। বৈষয়িক অভিলাষের কৃতার্থতা সম্পাদন উদ্দেশে, যে সমুদয় কার্য্য করা হয়, তাহাতে আংশিক দুঃখ অপরিহার্য্য, বিশেষতঃ যদি সেই সকল অভিলাষ, কোনও প্রতিবন্ধকবশতঃ ফলপ্রদ না হয়, তাহা হইলে তখন আর দুঃখের সীমা থাকে না। আবার একটী কামনা ফলপ্রদ হইলে কামনান্তর উপস্থিত হয়, তখনও সেইরূপ অংশতঃ বা সম্পূর্ণতঃ দুঃখভোগের মাত্রা বৃদ্ধি হইতে থাকে। এই সম্বন্ধে মহর্ষি কপিল বলিয়াছেন যে

"নিরাশঃ সুখী পিঙ্গলাবৎ"

পিঙ্গলা নাম্নী কোন গণিকা, নায়কের আগমন প্রতীক্ষায় অসহনীয় কষ্ট অনুভব করিতেছিল, যখন তাহার আসবার নির্দ্ধারিত সময় অতীত হইয়া গেল, তখন সেই গণিকা নায়ক-সমাগমের আশা পরিত্যাগ করিয়া, সুখে নিদ্রিত হইয়া পড়িল।

যাহারা বিরাগ-স্বভাব তাহারা সংসারের কোন বস্তুতেই আসক্ত নহেন। তাঁহারা সাংসারিক সকল বস্তুকেই, বিষসংযুক্ত অমৃতের মত মনে করেন। বিষসংযুক্ত অমৃত খাইতে সুস্বাদু, কিন্তু তাহার পরিণামে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, সেই রূপ সাংসারিক বিষয় সুখ উপভোগ-সময়ে সুস্বাদু হইলেও তাহার পরিণাম দুঃখদায়ক, বিশেষতঃ উক্ত সুখ অস্থায়ী, কারণ সাংসারিক বিষয় সকলই অস্থায়ী, অস্থায়ী বিষয় দ্বারা কখনও স্থায়ী সুখ হইতে পারে না। বিশেষতঃ সেই

সুখের কারণভূত অস্থায়ী বিষয়ের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী; সুতরাং, তাহার বিনাশ জনিত দুঃখ হইতে অব্যাহতি পাইবার আশা, মরুভূমিতে জল প্রত্যাশার মত, কোন রূপেই ফলপ্রদ হইতে পারে না। ইহাই বিরাগ-স্বভাব মহাত্মাগণের সিদ্ধান্ত।

যাঁহারা বিরাগ-স্বভাব, তাঁহারাই মুমুক্ষু এবং তাহারাই বেদান্তশাস্ত্র বুঝিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। ইহা ভাষ্যকার শঙ্কর "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" এই সূত্রস্থ "অথ" শব্দের অর্থ দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন। উক্ত সূত্রের অর্থ এই যে, যেহেতু নিত্যানিত্য বস্তুবিবেকাদিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ বুঝিতে পারিয়াছেন যে "কর্ম্ম সকল অনিত্য ফলপ্রদ এবং ব্রহ্মজ্ঞানই নিত্য ফল প্রদানে সমর্থ" অতএব তাহাদিগের পক্ষে মোক্ষকারণ ব্রহ্মজ্ঞান লাভার্থ তদ্বিষয়ের (ব্রহ্মবিষয়ের) জিজ্ঞাসা অর্থাৎ বিচার অবশ্য কর্ত্তব্য। যাহারা ব্রহ্মজিজ্ঞাসু তাহারাই ব্রহ্ম বিচারার্থী। এইরূপ ব্যক্তিগণের নিম্ন লিখিত চতুর্ব্বিধ গুণ থাকা আবশ্যক।

১। নিত্যানিত্য বস্তুবিবেক।

২। ইহামুত্রার্থ ফলভোগবিরাগ।

৩। শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান ও শ্রদ্ধারূপ চিত্তবৃত্তি।

৪। মুমুক্ষা বা মুক্তির ইচ্ছা।

এইক্ষণ নিত্যানিত্য বস্তুবিবেক প্রভৃতি কি? তাহা বলা যাইতেছে। কোন্ বস্তু নিত্য, এবং কোন্ বস্তু অনিত্য, তাহার অবধারণের নাম নিত্যানিত্য বস্তুবিবেক। ঐহিক ও পারলৌকিক সুখের প্রতি বিদ্বেষের নাম ইহামুত্রার্থ ফলভোগ-বিরাগ। যে বৃত্তিদ্বারা আত্মসম্বন্ধীয় কথার অতিরিক্ত বিষয় হইতে মনের নিবৃত্তি হয়, সেই মনোবৃত্তির নাম শম। মনের যেরূপ বৃত্তি বা অবস্থা হইলে, আত্মজ্ঞানের অনুপযোগী বিষয়ে বহিরিন্দ্রিয়গণ (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ প্রভৃতি) কোন কার্য্য করিতে পারে না, মনের সেইরূপ বৃত্তি বা অবস্থার নাম দম। মনের যেরূপ বৃত্তি হইলে উক্ত শম ও দম স্থায়ী হইতে পারে, তাহার অথবা বিধিপূর্ব্বক শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম পরিত্যাগের নাম উপরতি। শীত-উষ্ণ, সুখ-দুঃখ, মান-অপমান, লাভ-অলাভ ইত্যাদি পরস্পর-বিরুদ্ধ অবস্থায় সমভাবে সহিষ্ণুতার নাম তিতিক্ষা। আত্মবিষয়ে মনের একাগ্রতার নাম সমাধান। গুরূপদেশ ও বেদান্তবাক্যে বিশ্বাসের নাম শ্রদ্ধা। মুক্তির ইচ্ছার নাম মুমুক্ষা।

অদ্বৈতবাদিগণ বলিয়া থাকেন যে এই জগতে সৎ চিৎ ও আনন্দরূপ আত্মাই একমাত্র নিত্য পদার্থ, তদ্ভিন্ন সকল পদার্থই অনিত্য ও দুঃখময়, যখন এই সিদ্ধান্ত যুক্তি প্রভৃতি দ্বারা দৃঢ়ীভূত হয়, তখন ইহাকে নিত্যানিত্য বস্তুবিবেক নামে অভিহিত করা যায়। যিনি উক্ত সিদ্ধান্তকে দৃঢ়ীভূত করিতে পারেন, তাহার নিকটে স্ত্রী-পুত্র ও অর্থাদি জনিত ঐহিক সুখ এবং শ্রুতি ও ইতিহাসাদি প্রসিদ্ধ পারলৌকিক সুখ, ঐন্দ্রজালিক বা স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থের মত অতিতুচ্ছ ক্ষণিক রূপে বিবেচিত হইয়া থাকে। এইরূপ বিবেচনা হইলে পূর্ব্বোক্ত ইন্দ্রজাল বা স্বপ্নতুল্য ঐহিক ও পারলৌকিক সুখের প্রতি, কোন রূপ আসক্তি থাকে না, বরং তাহার প্রতি বিদ্বেষই

উৎপন্ন হইয়া থাকে, এই বিদ্বেষই ইহামুত্রার্থ ফলভোগবিরাগ নামে অভিহিত। এইরূপ বিরাগ হইলে অনিত্য বিষয় (আত্মাতিরিক্ত বিষয়) সম্বন্ধীয় কথা হইতে মনের নিবৃত্তি হইয়া থাকে, এই নিবৃত্তিকে শম বলা যায়। আমাদের চক্ষু প্রভৃতি বহিরিন্দ্রিয়বর্গ মনের অধীন; মন যখন যে বিষয়ে আসক্ত হয়, তখন তাহারা সেই বিষয়ে, মনের অনুকূলে কার্য্য করিয়া থাকে, এবং মন অনাসক্ত হইলে তাহারাও প্রতিকূল অর্থাৎ অনাসক্ত হয়, সুতরাং অনিত্য বিষয়ে শম (অনিত্য বিষয় হইতে মনের নিবৃত্তি) সাধিত হইলে, সেই সকল বিষয় হইতে বহিরিন্দ্রিয়ের নিবৃত্তি অবশ্যম্ভাবী, ইহাই দম নামে অভিহিত। উক্ত শম ও দম সাধিত হইলে শাস্ত্রবিহিত যাগযজ্ঞাদি কর্ম্মে প্রবৃত্তি থাকে না এবং এই শম ও দম যাহাতে বিলুপ্ত না হয় তাহার জন্য বিশেষ আকাঙ্ক্ষা বলবতী হয়। এই অবস্থাই উপরতি নামে বেদান্তশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ। যিনি শম দম ক্রমে উপরতি লাভ করিতে পারেন, তাহার নিকট বৈষয়িক সুখ-দুঃখ এবং শীত-উষ্ণ প্রভৃতি দ্বন্দবর্গ সমস্তই অসংকল্পিত বলিয়া প্রতিভাত হয়। কারণ তিনি আত্মা সুখস্বরূপ, নিত্য, তদ্ভিন্ন সকল বস্তুই দুঃখময় এবং অনিত্য, এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া শম-দমাদি লাভ ক্রমে উপরত হইয়াছেন। যখন বৈষয়িক সুখ-দুঃখ ও শীত উষ্ণ প্রভতি দ্বন্দবর্গ নিত্যসুখ-রূপ আত্মা হইতে ভিন্ন, তখন এই সকলই দুঃখময় এবং ক্ষণিক এই জ্ঞান হইলে এই সকল বিষয়ে প্রলোভন উদ্বেলিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। তখন ঐ সকল দ্বন্দবর্গের প্রতি সহিষ্ণুতার ভাব উপস্থিত হয়, এই ভাবই তিতিক্ষা। উক্ত তিতিক্ষা সাধিত হইলে সচ্চিদানন্দ রূপ আত্মার প্রতি মনের একগ্রতা জন্মিয়া থাকে, এই মানসিক একাগ্রতা-ভাবই সমাধান নামে কথিত হইয়াছে। সমাধান দ্বারা "সচ্চিৎ সুখ রূপ আত্মাই সত্য, অন্য সকলই মিথ্যা" এই উপদেশে আস্থা জাত হয়, এইরূপ আস্থা সাধিত হইলে মনে এই ভাবের উদয় হয় যে "পরিদৃশ্যমান দুঃখময় জগতের সংস্রবে আমার নির্ম্মল আত্মা যেন আর কখনও পতিত না হয়" এই ভাব বা ইচ্ছাই মুমুক্ষা নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

যিনি নিত্যানিত্য বস্তুবিবেক প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত গুণ লাভ করিয়াছেন, তিনিই এক মাত্র বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবিচার দ্বারা তদ্বিষয়ে সম্যক জ্ঞান লাভ করিতে পারেন। যাঁহারা কুতুহলী বা পাণ্ডিত্যাভিমান কামনা বশতঃ ব্রহ্মবিচারে প্রবৃত্ত হন, তাঁহারা কখনই সম্যক জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হন না। কারণ এইরূপ ব্যক্তিগণের তৎসম্বন্ধে চিত্তের একাগ্রতা হইতে পারে না। যাঁহার যে বিষয়ে একাগ্রতা নাই, তিনি কখনও সে বিষয়ের প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিতে সমর্থ হন না।

এইক্ষণে ইহা স্থির হইল যে নিত্যানিত্য বস্তুবিবেক প্রভৃতি হইলে ব্রহ্মবিচারে অধিকার হইয়া থাকে।

বিচার দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে ব্রহ্মকে জানা যায়, তাহা হইলে তৎসম্বন্ধে অজ্ঞতা বা অজ্ঞান বিদূরিত হয়। অজ্ঞান বিদূরিত হইলে কোন প্রকার দুঃখ হইতে পারে না,

বিশেষতঃ তখন স্বাভাবিক সুখের উপলব্ধি হইতে থাকে। এই স্বাভাবিক সুখোপলব্ধিই অদ্বৈতবাদ সিদ্ধান্তিত মুক্তি বা মোক্ষ।

দুঃখের অপরিবর্ত্তনীয় নিবৃত্তি, এবং অবিনশ্বর সুখ সকলেরই অভিলষিত। কিন্তু সংসারের কোন কার্য্য দ্বারাই, আমরা তাহা পাইতে পারি না। সকল কার্য্যই কখনও সুখ, কখনও বা দুঃখ প্রদান করে। সাংসারিক লোকেরা মনে করেন যে স্ত্রী-পুত্র, ধন প্রভৃতিই সুখের কারণ; বাস্তবিক একটু একাগ্রতার সহিত বিবেচনা করিলে তাহাতে দুঃখই পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। কারণ, যখন উক্ত সুখকারণ সকল বর্ত্তমান থাকিয়া, আমাদের সুখ সম্পাদন করে, তখনও আমরা তাহাদের ভাবী অদর্শনের আশঙ্কায় ভীত হইয়া, দুঃখ ভোগ করিয়া থাকি। সাংসারিক সুখকারণ স্ত্রী-পুত্র-ধনাদির বৃদ্ধি দ্বারা, আমাদের দুঃখকারণেরই বাহুল্য সাধিত হয়। সুতরাং বিনশ্বর বিষয় দ্বারা, অবিনশ্বর সুখ ও অপরিবর্ত্তনশীল দুঃখ নিবৃত্তি লাভের আশা করা যাইতে পারে না। তবে কি উপায়ে আমরা ইহা লাভ করিতে পারি এবং তাহা যুক্তিসিদ্ধ কি না, ভাষ্যকার শঙ্কর ইহাই প্রথম সূত্রে যথাসম্ভব সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছেন।

তিনি প্রথমেই অধ্যাস বা মিথ্যাজ্ঞান বর্ণনা করিয়াছেন। তদ্দ্বারা তিনি বুঝাইয়াছেন যে মিথ্যাজ্ঞানই দুঃখের কারণ এবং সত্য জ্ঞান দ্বারা তাহার নিবৃত্তি হইলে দুঃখ বিলুপ্ত হয় এবং নিত্য সুখ উপলব্ধ হইয়া থাকে। এই সত্যজ্ঞান, বিচারব্যতীত হইতে পারে না। অতএব এ স্থলে দুঃখ কারণ মিথ্যাজ্ঞান সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিব। প্রথমতঃ এই পরিদৃশ্যমান সংসারের সহিত আমাদের বাস্তবিক সম্বন্ধ আছে কি না? তাহার নির্ণয় করা যাইতেছে; কারণ, সংসারের সংসর্গবশতঃ আমরা নানাবিধ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকি। যদি আমাদের এই সংসার-সম্বন্ধ সত্য হয়, তবে কখনও জ্ঞান দ্বারা তাহার নিবৃত্তি হইবে না। মিথ্যা হইলেই জ্ঞান তাহার নিবৃত্তি সাধনে সমর্থ হইতে পারিবে। এই জগতে আমরা সাধারণ দৃষ্টিতে দুই প্রকার পদার্থ দেখিতে পাই। কতক চেতন ও কতক অচেতন। স্ত্রী-পুত্রাদি চেতন ও স্বর্ণ-রজতাদি অচেতন, এই উভয়বিধ পদার্থই আমাদের সুখের কারণ এবং "ইহা আমাদের," এইরূপ আমরা মনে করি। কিন্তু "ইহা আমাদের" কি "আমরা ইহাদের" তৎসম্বন্ধে আমরা কোন বিচার করিয়া দেখি না। স্ত্রী মনে করেন "তিনি আমার স্বামী," স্বামী মনে করেন তিনি "আমার পত্নী"; পিতা-পুত্রাদি চেতনের মধ্যেও এইরূপ সম্বন্ধের বিনিময়। অচেতন পদার্থের মধ্যে এইরূপ পরস্পর সম্বন্ধ জ্ঞান আছে কি না? তাহা আমরা সাধারণ জ্ঞান দ্বারা বুঝিতে পারি না। কিন্তু আমার বোধ হয়, অচেতন পদার্থেরও এই প্রকার সম্বন্ধ জ্ঞান আছে। আমরা যে অচেতন স্বর্ণ-রজতাদিকে "আমার স্বর্ণ-রজত" বলিয়া মনে করি, সেই স্বর্ণ-রজত ও বোধ হয় মনে করে যে "তিনি আমার রক্ষক।" কারণ বৈদান্তিকগণ বলিয়া থাকেন যে, এই জগতের সর্ব্বত্রই চৈতন্য বা আত্মা বর্ত্তমান আছে। সর্ব্বত্র চৈতন্য বা

আত্মা থাকিলেও, আমরা তাহা অনুভব করিতে পারি না। কারণ আমরা বাহ্য কার্য্য দেখিয়াই অপরের চৈতন্য বা আত্ম-সত্তা অনুমান করিয়া থাকি। যে সকল পদার্থকে আমরা 'অচেতন' বলিয়া মনে করি, তাহারা হস্তপদাদি বাহ্যেন্দ্রিয় বিহীন। সুতরাং তাহারা আমাদের দর্শন-যোগ্য কোন রূপ বাহ্য কার্য করিতে পারে না, সে জন্য আমরাও তাহাদের চৈতন্যসত্তা বা আত্মসত্তা সহজেই অনুমান করিতে সমর্থ হই না। এইক্ষণে ঐ সকল পদার্থের চৈতন্য বা আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে যুক্তি প্রদর্শন করা যাইতেছে।

যাহারা ইচ্ছানুসারে গমনাগমন করিতে পারে, তাহাদের চৈতন্য বা আত্মা আছে; ইহা সর্ব্ববাদী সিদ্ধ। বৃক্ষ প্রভৃতি প্রাণিগণের চৈতন্য বা আত্মা সম্বন্ধেও বিশেষ সংশয়ের কারণ নাই। কারণ, বৃক্ষাদির মৃত্যু আমাদের প্রত্যক্ষ সিদ্ধ, মৃত্যুর পর তাহারা শুষ্ক হইয়া যায়। তবে তাহারা ইচ্ছানুসারে গমনাগমন করিতে পারে না, সে জন্য আমরা তাহাদিগকে অচেতন নামে অভিহিত করিয়া থাকি। নিদ্রিত ও রোগ দ্বারা মোহপ্রাপ্ত মনুষ্যগণকে আত্মা থাকিতেও বাহ্যেন্দ্রিয় শক্তি না থাকায় অচেতন বলা হইয়া থাকে। বৃক্ষাদি প্রাণিগণ কতিপয় বাহ্যেন্দ্রিয়বিহীন, সে জন্য তাহাদের বিশেষ বাহ্যকার্য্য দৃষ্ট না হইলেও, আভ্যন্তরিক কার্য্য অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। তাহা না হইলে তাহাদের শরীরে পুষ্টি হইতে পারে না। আমার বোধ হয়, যাহাদের শরীরের উপচয় (বৃদ্ধি) দৃষ্ট হয়, তাহাদের সকলেরই আত্মা বা চৈতন্য আছে। আত্মার একটী শক্তি আছে, তাহাকে বৈশেষিক দর্শনে জীবন-যোনি যত্ন নামে অভিহিত করা হইয়াছে। এই শক্তি প্রভাবে মনুষ্য প্রভৃতি প্রাণিগণ বায়ুর আদানপ্রদান ও শরীর বৃদ্ধির উপ-যোগী পরমাণু-সংগ্রহ প্রভৃতি করিয়া থাকেন। নিয়মিত ভাবে বায়ুর আদান-প্রদান ও সজাতীয় পরমাণু সংগ্রহই আমাদের শরীর-পুষ্টির উপযোগী। সাধারণতঃ বৃক্ষাদির শরীরে, এইরূপ বায়ুর আদান-প্রদান দৃষ্ট হয় না বটে, কিন্তু বিশেষ অনুসন্ধিৎসাপূর্ব্বক বিচার করিলে, অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, বৃক্ষাদি শরীরে নিজ নিজ শরীর বৃদ্ধির উপযোগী পরমাণু-সংগ্রহের অনুকূল কোনরূপ ক্রিয়া আছে। সেই ক্রিয়া দ্বারা সজাতীয় পরমাণু-সংগ্রহ ক্রমে তাহারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। উক্ত ক্রিয়া চেতনা-প্রবৃত্তি-সমুদ্ভূত। বৃক্ষাদির মত পাষাণ প্রভৃতিও ক্রমশঃ বৃদ্ধি লাভ করে, সুতরাং তাহাদেরও ঐরূপ সজাতীয় পরমাণু-সংগ্রাহক ক্রিয়া ও তদনুকূল প্রবৃত্তিজনক চৈতন্যময় আত্মা আছে, ইহাও যুক্তিসঙ্গত এইরূপই মনে হয়। এইক্ষণে ইহা জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, মৃত্তিকা ও তদীয় সূক্ষ্মাংশের (পরমাণুর) আত্মা আছে কি না? আমার বোধ হয়, প্রত্যেক পরমাণুরই এক একটী আত্মা আছে। এবং আত্মা আছে বলিয়াই তাহারা সজাতীয় অন্য পরমাণুর সহিত মিলিত (সংযুক্ত) হইতে পারে। এই জগতে যত প্রকার পদার্থ আমাদের অনুভূত হইতেছে, সে সমস্তই সজাতীয় মিলন সংযোগ প্রিয়, মিলন-প্রবৃত্তি প্রযুক্তই তাহারা অপর

সজাতীয় পদার্থের সহিত মিলিত হইয়া থাকে। যখন আমাদের কোন লোকের সঙ্গে মিলিত হওয়ার প্রবৃত্তি হয়, তখন আমরা তাহাদের নিকটে উপস্থিত হই, অথবা তাহাদিগকে আমাদের নিকটে আনয়ন করিয়া থাকি। সেইরূপ, আমরা যাহাদিগকে অচেতন পদার্থ মধ্যে গণনা করিয়া থাকি তাহারাও স্বস্ব প্রবৃত্তি অনুসারে অন্য সজাতীয়ের নিকটে উপস্থিত হয়, অথবা অন্যকে নিজের নিকটে আনয়ন করে। প্রত্যেক পার্থিবাদি পরমাণুই অন্য পরমাণুর সহিত মিলিত হইতেছে, অথবা অন্য পরমাণুকে তাহার নিকটে আনয়ন করিতেছে, ইহা আমরা সর্ব্বদা অনুভব করিতে পারি। মনুষ্য প্রভৃতি প্রাণিগণ, স্বভাবতঃই সজাতীয় মিলন-প্রিয় এবং তাহাদের আত্মা আছে, সুতরাং যাহারা মিলনপ্রিয় তাহারা সাত্মক, অর্থাৎ তাহাদের আত্মা আছে, এইরূপ অনুমান যুক্তিসিদ্ধ বলিয়াই মনে হয়। এই বিষয়ে জৈন দার্শনিক গণেরও সম্মতি আছে। মল্লিষেন কৃত স্যাদ্বাদমঞ্জরী গ্রন্থে লিখিত আছে যে "শিলাদিরূপা পৃথিবী সাত্মিকা ছেদে সমানধাতূত্থানাৎ দর্ভাঙ্কুরবৎ" ইত্যাদি যেমন কুশ প্রভৃতি তৃণ ছিন্ন হইলেও পুনর্ব্বার বর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ শিলাদিরূপ পৃথিবী, ছিন্ন হইলেও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সুতরাং কুশাদি তৃণগণের মত, তাহারাও আত্মাযুক্ত। পৃথিবীর ন্যায় অগ্নিরও আত্মা আছে, যেমন আমাদের শরীর আহার দ্বারা বর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ আহার (ইন্ধন কার্য্য) দ্বারা অগ্নিও বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। জৈন মতে জীবাত্মা দ্বিবিধ, সমনস্ক ও অমনস্ক। যাহারা শিক্ষা, আলাপ প্রভৃতি করিতে পারে তাহারা সমনস্ক। যাহারা শিক্ষা আলাপাদি-বিহীন তাহারা অমনস্ক। অমনস্ক দুই প্রকার, ত্রস ও স্থাবর। শঙ্খ, কৃমি প্রভৃতি ত্রস; পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু আকাশ ও বৃক্ষাদি স্থাবর। স্থাবর জীবের ত্বগিন্দ্রিয় আছে, অন্য কোন বাহ্যেন্দ্রিয় নাই। ত্রস গণের মধ্যে যথাসম্ভব দুই হইতে পাঁচটী পর্য্যন্ত বাহ্যেন্দ্রিয় আছে। মন পূর্ব্বোক্ত সকল জীবে সমভাবে অবস্থিত। কিন্তু মন যে শরীরে অধিক বহিরিন্দ্রিয়ের সাহায্য প্রাপ্ত হয়, সে শরীরেই তাহার অধিকতর স্ফূর্ত্তি পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। আমরা ইন্দ্রিয়ের আধিক্য ও অল্পতা অনুসারে, জীবের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ নির্ণয় করিয়া থাকি। এই পরিদৃশ্যমান জগতের সকল পদার্থই বিভিন্ন স্বভাবসম্পন্ন। সেই স্বভাব, জ্ঞানজ সংস্কার ভিন্ন আর কিছুই নহে। বহিরিন্দ্রিয় সহকৃত মনের সাহায্যে, যখন তাহা অভিব্যক্ত হয়, তখনই আমরা জ্ঞানের উপলব্ধি করিতে পারি। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জ্ঞান পর পরবর্ত্তী স্বভাবের কারণ। যখন সকল পদার্থেই জ্ঞানজ সংস্কাররূপ বিভিন্ন স্বভাব পরিলক্ষিত হইতেছে, তখন সকল পদার্থকে সজীব স্বীকার করাই যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া মনে হয়। বেদান্তের অদ্বৈতবাদানুসারে, জীবাত্মা ব্রহ্মস্বরূপ ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী, তিনি সৎচিৎ ও আনন্দময়। আমরা জগতের সর্ব্বত্রই সত্তাংশ অনুভব করিয়া থাকি। এই সত্তাই ব্রহ্ম, ইহাই জীবাত্মা পর শরীরস্থ চিৎ আনন্দ, আমরা প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করিতে পারি না।

পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু প্রভৃতির সত্তা, সর্ব্ববাদিসিদ্ধ। সুতরাং তাহাতে ব্রহ্মরূপ জীবাত্মা স্বীকার করাই যুক্তিসঙ্গত। এই বিষয়ে ভারতিতীর্থকৃত পঞ্চদশী নামক বেদান্ত প্রকরণে লিখিত আছে—

"সত্তা চিতিঃ সুখঞ্চেতি স্বভাবা ব্রহ্মণস্ত্রয়ঃ।
মৃচ্ছিলাদিষু সত্ত্বৈব ব্যজ্যতে নেতর দ্বয়ং।
সত্তাচিতির্দ্বয়ং ব্যক্তং ধীবৃত্ত্যোর্ঘোরমূঢ়য়োঃ।
শান্ত বৃত্তৌ ত্রয়ং ব্যক্তং মিশ্রং ব্রহ্মেত্থমীরিতং ॥

অসত্তা জাড্য দুঃখে দ্বে মায়ারূপং ত্রয়স্ত্বিদং।
অসত্তা নরশৃঙ্গাদৌ জাড্যং কাষ্ঠশিলাদিষু।
ঘোরমূঢ়ধিয়োঃ দুঃখমেবং মায়া বিজৃম্ভিতা॥
শান্তাসু জড়বুদ্ধ্যৈক্যাৎ মিশ্রং ব্রহ্মেতি কীর্ত্তিতং।

ব্রহ্মের স্বভাব ত্রিবিধ। সত্তা, চিৎ ও সুখ। মৃত্তিকা ও শিলা প্রভৃতিতে মাত্র সত্তার অভিব্যক্তি হয়। রজঃ ও তমঃ প্রধান যথাক্রমে ঘোর ও মূঢ় বুদ্ধিবৃত্তিতে সত্তা ও চিৎ উভয়েরই অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। সত্ত প্রধান শান্ত বৃত্তিতে, সৎ, চিৎ ও আনন্দ এই ত্রিবিধ ভাব জ্ঞাত হওয়া যায়। ইহা ব্রহ্মের মিশ্রভাব। অসত্তা, জড়তা ও দুঃখ এই তিনটি মায়ার স্বভাব। নরশৃঙ্গ প্রভৃতি অসৎ পদার্থে অসত্তা, কাষ্ঠ ও শিলা প্রভৃতিতে জড়তা এবং ঘোর ও মূঢ় বুদ্ধিবৃত্তিতে দুঃখের অভিব্যক্তি হয়। শান্ত, ঘোর ও মূঢ় বৃত্তিতে জড়ভাবাপন্ন বুদ্ধির সহিত ব্রহ্মের একীভাব অনুভূত হয়, সে জন্য তাহা মিশ্রব্রহ্ম বলিয়া কথিত হইয়াছে।

যেমন আমাদের শরীরের অধিষ্ঠাতা জীবাত্মা, সেইরূপ পৃথিবী প্রভৃতিরও অধিষ্ঠাতা আত্মা আছে। এই বিষয়ে শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে "মৃদব্রবীৎ" "আপোঽব্রবন্" অর্থাৎ মৃত্তিকা ও জল কথা বলিয়াছিলেন; এ স্থলে মৃত্তিকা ও জল শব্দের অর্থ তদভিমানী আত্মা, মৃত্তিকা ও জল যে আত্মার শরীর, তিনি সেই মৃত্তিকা ও জলে অহঙ্কারাভিমান করিয়া থাকেন। যেমন আমাদের শরীরসংসৃষ্ট অন্তঃকরণ পরিচ্ছিন্ন—চৈতন্য, আমাদের জীবাত্মা নামে অভিহিত হইয়া থাকে, সেইরূপ মৃত্তিকা প্রভৃতিস্থিত অন্তঃকরণ—পরিচ্ছিন্ন চৈতন্য, মৃত্তিকা প্রভৃতির জীবাত্মা নামে অভিহিত হইতে, বিশেষ কোন প্রতিবন্ধক পরিদৃষ্ট হয় না। প্রসঙ্গক্রমে প্রস্তাবিত বিষয় হইতে, অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। এইক্ষণ প্রকৃত বিষয়ের বর্ণনা করা যাইবে। আগামীবারে সর্ব্বত্র জীবাত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিতে ইচ্ছা রহিল।

(ক্রমশ)

শ্রীগুরুচরণ তর্কদর্শনতীর্থ।

সিমাচলম্ বা সিংহাচল দর্শন।

(নৃসিংহ-ক্ষেত্র)

পথে।

উড়িষ্যায় প্রবেশ করিয়া চারি দিকের প্রাকৃতিক শোভা দেখিয়া আমি যে বড় তৃপ্ত হইয়াছিলাম, তাহা নহে। সুজলা সুফলা বঙ্গভূমির শস্যশ্যামলা প্রান্তর দেখিয়া উড়িষ্যার অনুর্ব্বর ক্ষেত্রগুলি আমার নিকটে বড় দীন-দরিদ্র বোধ হইতেছিল। উড়িষ্যাবাসীদের দারিদ্র্য-কাহিনী যেন সেই সকল প্রস্তরকঠিন লোহিত মৃত্তিকারাশিতে অঙ্কিত। প্রান্তরের পর প্রান্তর পতিত আছে, কিন্তু তাহাতে চাষ নাই, শস্যের বংশ মাত্র নাই। মধ্যে মধ্যে বিশালোরসী বেগবতী নদী তাহাদের বক্ষ ভেদ করিয়া সাগর অভিমুখে ছুটিয়া চলিয়াছে। কিন্তু তাহাতেও মৃত্তিকার কঠিন বক্ষ কোমল হইতেছে না। মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে ঢুকিয়া আমি ঠিক তাহার বিপরীত এক চিত্র দেখিলাম। প্রাকৃতিক শোভাসম্পদ এই দেশকে এক অপূর্ব্ব সাজসজ্জায় সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছে। কিছুদূর যাইতেই পূর্ব্বঘাট-পর্ব্বতের শৃঙ্খলমালা একটু একটু করিয়া দেখা দিতে লাগিল। রেলের লাইনের দুই পার্শ্বে তাহাদের নবনীরদ-লাঞ্ছিত ধুম্রশোভা ও তন্নিম্নে সমতল ক্ষেত্রের শ্যামল বক্ষে পর্য্যাপ্ত শস্যরাশির এক মহা-সমুদ্র—দেখিয়া কেমন মোহিত হইয়া যাইতে হয়। পাহাড়গুলির শৃঙ্গ কোথাও বা প্রস্তর-মণ্ডিত, কোথাও বা বৃক্ষলতাদি সুশোভিত, কোথাও বা উহারা নব সূর্য্যালোকে অপূর্ব্ব স্বর্ণকান্তি ধারণ করিয়া আছে। যত যাইতে লাগিলাম, ততই যেন এই দেশের নব নব শোভা আমাকে আরও বেশী মুগ্ধ করিয়া তুলিতে লাগিল। অতৃপ্ত প্রাণে অনিমেষ নয়নে আমরা এই সব শোভা দেখিতে দেখিতে ক্রমে চিল্কাতীরে উপনীত হইলাম।

হ্রদশূন্য ভারতবর্ষে চিল্কার শোভা অনির্ব্বচনীয়। ভূগোলে এই হ্রদের কথা পড়িয়াছিলাম, কিন্তু কখনও প্রত্যক্ষ করি নাই। এইবার দেখিয়া বড় আনন্দ পাই-লাম। ইতিহাসেও এই হ্রদের কথা পড়িয়া-ছিলাম। সে এক অতীব দুঃখের কাহিনী। প্রবাদ, এইখানেই একদিন ভগবান জগন্নাথ দেবকে কালাপাহাড়ের তাড়নায় সলিল তলে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল।

চিল্কাহ্রদ তিন দিকে স্থল বেষ্টিত। এক দিক সমুদ্রের সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। সে দিক রেলপথ হইতে দেখা যায় না। আমাদের লাইন তাহার বিপরীত তীর ঘেঁসিয়া গিয়াছে। গাড়ীতে বসিয়াই হ্রদের শোভা সম্যক দৃষ্ট হইয়া থাকে। লাইনটি কখনও হ্রদের ঠিক পাড় দিয়া গিয়াছে, কখনও বা একটু সরিয়া গিয়াছে। তাহাতে হ্রদের সঙ্গে যাত্রিকদিগের বেশ লুকোচুরি খেলা হয়। আমরা কখনও বা ঠিক হ্রদের পাড় দিয়াই যাইতে লাগিলাম, কখনও বা একটু আধটু সরিয়া নিকটবর্ত্তী কোনও পর্ব্বতান্তরালে লুকাইতে লাগিলাম। এত

বড় একটা বিস্তীর্ণ জলাশয়ের সঙ্গে মানুষের মত ক্ষুদ্রপ্রাণীর এই লুকোচুরী খেলা এক অপূর্ব্ব ব্যাপার বটে। সে কি আনন্দপ্রদ তাহা আমি বুঝাইতে পারিব না।

হ্রদটি দেখিতে একটি ছোটখাটো সমুদ্রের মত। অন্যান্য দেশের অন্যান্য হ্রদের তুলনায় আকারে এইটি তেমন বৃহৎ নয় বটে, কিন্তু ইহার আপেক্ষিক ক্ষুদ্রত্বের ভাব পথিকের হৃদয়ে জাগরিত হয় না। যতদূর দেখা যায় সীমা নাই, অন্ত নাই, সমুদ্রেরই মত অনন্তবিস্তৃত; সুতরাং ইহার বিশালত্বের ভাবই পথিকের চক্ষে ফুটিয়া উঠে। সেই বিশালত্বের সঙ্গে একটা গাম্ভীর্য্যের স্থির শান্তভাব কেমন একসুরে বাঁধা! সমুদ্রের মত বিশালত্ব আছে, কিন্তু তাহাতে তাহার উত্তাল তরঙ্গমালা নাই। সেই স্থির শান্ত অনন্তবিস্তৃত অম্বুরাশির মধ্যে কোথাও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ, কোথাও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বতশৃঙ্গ কেমন মস্তক উন্নত করিয়া আছে! হ্রদটি উত্তর-পূর্ব্ব কোণ হইতে দক্ষিণ পশ্চিম দিকে বিস্তৃত; উত্তর ও দক্ষিণেই কিছু বেশী আড় হইয়া আছে। রেলওয়ে লাইনটি দৈর্ঘ্যেই ইহার সঙ্গে সঙ্গে গিয়াছে। এই ভাবে রেলের লাইনের সঙ্গে সঙ্গে ইহা লম্বে ৪৪ মাইল বিস্তৃত। পরিসরে উত্তরপূর্ব্বে ইহা ন্যূনাধিক ২০ মাইল। দক্ষিণপশ্চিমে বাম ক্রমে ছোট হইতে হইতে শেষ সীমায় ৪।৫ মাইল পরিসরে ঠেকিয়াছে। বর্ষাকালে ইহার বিস্তৃতি ৪৫০ বর্গ মাইলে পৌঁছে। কিন্তু সুদিনে প্রায় একশত মাইল আকারে কমিয়া যায়। যে দিকে হ্রদের বিস্তৃতি বেশী সে দিকে ইহার তীরে পাহাড়-পর্ব্বত তেমন দৃষ্ট হয় না। কিন্তু দক্ষিণপশ্চিমে ইহা ঘন পর্ব্বতমালা বেষ্টিত। ভূষন্দপুর ষ্টেশন হইতে রম্ভা ষ্টেশন পর্য্যন্ত এই চল্লিশ, একচল্লিশ মাইল পথে গাড়ীতে বসিয়া হ্রদের মধ্যে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ দেখিতে পাওয়া যায়। দ্বীপগুলি প্রায়ই জনমানবশূন্য, কিন্তু মধ্যে মধ্যে কোথাও বসতিও দৃষ্ট হয়। ছোট ছোট নৌকা করিয়া লোকেরা ইহার বক্ষে যাতায়াত করে। হ্রদের শান্ত বক্ষে তাহাদের শান্ত বিচরণ কেমন স্বপ্নময় বোধ হয়। কিন্তু চিল্কার বাহ্যিক শোভা যেমনই হউক, ইহার আভ্যন্তরিক শোভা বড় ভয়ানক। হ্রদটির কোন স্থলেই গভীরতা চারি হস্তের অধিক নহে। অধিকাংশ স্থলেই ২।৩ হস্ত মাত্র। এতবড় একটা বিশাল জলাশয়ের বক্ষ এত অগভীর ইহা এক আশ্চর্য্য ব্যাপার! কিন্তু ইহা হইতেও আরো আশ্চর্য্য ব্যাপার এই যে এইটুকু জলেও কাহারো নামিবার সাধ্য নাই। ইহার এই টুকু জলেই নিত্য অনেক জলজন্তু বাস করে। সমুদ্রের সহিত সম্মিলিত থাকায় এবং সমুদ্রের তরঙ্গাঘাত এইখানে সহ্য করিতে হয় না বলিয়া, ইহারা সমুদ্র ছাড়িয়া দলে দলে এইখানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে। চিল্কার জল সমুদ্রের মতই লোনা।

বেলা সাড়ে ছয়টা হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় আটটা পর্য্যন্ত দ্রুতগামী মাদ্রাজ মেলে বসিয়া আমরা চিল্কার এই সমস্ত শোভা দেখিলাম। তার পরে গাড়ী যখন রম্ভা ছাড়িয়া একেবারে চিত্রপুর ষ্টেসনে যাইয়া থামিল, তখন যেন হঠাৎ একটা সুখস্বপ্ন আমাদের চক্ষুর সম্মুখ হইতে কোথায়

মিলাইয়া গেল। আমরা যেন পুনঃ জাগরিত হইয়া আবার আমাদের বাস্তবরাজ্যে ফিরিয়া আসিলাম। তখন আবার আমরা মাদ্রাজের সেই শৃঙ্খলাবদ্ধ পর্ব্বতমালার প্রান্ত বহিয়া চলিলাম।

বারহামপুর ষ্টেসন হইতে মাদ্রাজের ও উৎকলের মিশ্রভাব দূর হইয়াছে। এই খান হইতেই খাঁটি মাদ্রাজের চিহ্ন দৃষ্ট হইয়া থাকে। আমরা এইখানে আসিয়াই খাঁটি তেলেগু চিত্র দেখিতে পাইলাম। মাদ্রাজীদের অর্দ্ধমণ্ডিত মস্তক (উৎকলেও তাই), সুদীর্ঘ বেণী ও ডবল কোচার দৃশ্য আমাদের চক্ষে বড় নূতন। ডবল কোচা কথাটা কি, তাহা হয় ত সকলে বুঝিতে পারিলেন না। মাদ্রাজীদের কাপড় পরা কিছু অদ্ভুত। তাহাদের কাচা ও কোচা প্রায় তুল্য। কাচার দিকেও তাহাদের কোচার মত খানিকটা ঝুলিয়া থাকে। ইহার সার্থকতা কি বুঝিলাম না। তাহাদের গায়ে আটা-সাটা লম্বা জামা, মাথায় (সম্ভ্রান্তলোকদের) গোলাকৃতি টুপি, গলায় লম্বা চাদর। কথা বুঝিবার সাধ্য নাই। ইংরেজী না জানিলে পথিকের বিপদ। পানওয়ালাদের সঙ্গেও আমাদের একরূপ আকার ইঙ্গিতেই বাক্যালাপ হইতে লাগিল। গাড়ী বারহামপুর ছাড়িয়া আরও যতই অগ্রসর হইতে লাগিল, ততই এই সব বিষয়গুলি আরও স্পষ্ট স্পষ্ট লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। অবশেষে বেলা তিনটার সময় গাড়ী ওয়ালটেয়ারে পৌছিল।

ওয়ালটেয়ার সমগ্র ভারতের মধ্যে একটা প্রধান স্বাস্থ্য-নিবাস। সমুদ্রের তীরে পাহাড়। সেই পাহাড়ের উপর ওয়ালটেয়ার নগর। পাহাড় ও সমুদ্রের হাওয়া একত্র হইয়া ওয়ালটেয়ারকে চির-মলয়-সেবিত করিয়াছে। রাত্রিদিনে সকল সময়ই ইহার হাওয়ার উত্তাপ একই রকম। এই জন্ম ক্ষয়রোগগ্রস্ত রোগীর জন্য এ স্থান বড়ই উপকারী। সমুদ্র ও পাহাড়ের মধ্যে নিম্ন ভূমিতে ঠিক সমুদ্রের তীরে ভিজগাপটন্ (বিশাখাপত্তন) সহর। ওয়ালটেয়ার ষ্টেশন হইতে সমুদ্র দেখা যায় না। কিন্তু ষ্টেশনে নামিতেই সমুদ্রের একটা ঠাণ্ডা বাতাস দেহ ও প্রাণটিকে শীতল করিয়া দেয়। আমরা নামিতেই এই অপূর্ব্ব সমীরণ সেবন করিয়া অনন্ত তৃপ্তি লাভ করিলাম। নামিয়াই বুঝিলাম, কলিকাতার ধূলিধূমমণ্ডিত কষ্ট-সেব্য বায়ুমণ্ডল হইতে কোনও এক সম্পূর্ণ নূতন রাজ্যে উপস্থিত হইয়াছি। (ক্রমশ)

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়।

নীলকণ্ঠ।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

অনেক দিন নীলকণ্ঠের খবরাখবর লওয়া হয় নাই। বেচারা প্রবাসে কাজের সাগরে হাবুডুবু খাইতেছে। গতবারে তিনি ষোড়শীর অনুরোধে জমাবন্দীর কাজ শেষ হইতে না হইতে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, তাহাতে মুনিবের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে,

পাকা-গুটি কাঁচিয়াছে। প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করিবার জন্য সময়ে সময়ে পাকা গুটি কাঁচাইবার প্রয়োজন হয়, সত্য; কিন্তু এ ক্ষেত্রে সেরূপ নহে। এ যে ঘরে উঠিবার উপক্রমে গুটি মারা পড়িয়াছে। পাড়ি জমাইবার মুখে নৌকাডুবি হইয়াছে। যন্ত্র-বাঁধা শেষ হইয়া সঙ্গীত আরম্ভেই তার কাটিয়াছে। তাই নীলকণ্ঠের সে বেদনা বড় বাজিয়াছে। তিনি ষোড়শীর অনুরোধে সেবারে তাড়াতাড়ি গৃহে না ফিরিলে ত এমনটি ঘটিত না। গৃহিণীর অনুরোধ না শুনিলে সে সব পরিশ্রম ত পণ্ড হইত না; মুনিবের এ ক্ষতির সম্ভাবনা ত ছিল না। বৃদ্ধ বয়সে তরুণী ভার্য্যা গ্রহণ না করিলে তাহার ত এ পিছু-টান জুটিত না! হায় তিনি আজ কর্ত্তব্য-ভ্রষ্ট! অনুতপ্ত নীলকণ্ঠ তাই প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, এবার একজন প্রজারও জমা-বন্দী বাকী রাখিয়া, নূতন জমাবন্দীমূলে দুই তিন কিস্তির খাজনা আদায় না দেখিয়া তিনি আর গৃহে ফিরিবেন না। আর যাহার জন্য তাহাকে কর্ত্তব্যচ্যুত, প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে হইয়াছে এ সুদীর্ঘ কাল যতদূর সম্ভব তাহাকে মন হইতে দূরে রাখিবেন। সে জন্য তিনি এবার হৃদয়কে কঠিন করিয়াছেন। আসিয়া অবধি ষোড়শীকে কোন পত্র পর্য্যন্ত লেখেন নাই, যাহাকে ভাল বাসিয়া কর্ত্তব্যে অবহেলা করিয়াছেন, এখন দীর্ঘকাল তাহার স্মৃতিকে অবহেলা করিয়া মুনিবের কার্য্যে আপনার সমস্ত অভিনিবেশ নিয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু সে স্মৃতি কি সহজে ভোলা যায়? সাধনায় বসিয়া সিদ্ধ হইবার পূর্ব্বে সাধক নানারূপ বিভীষিকা দেখেন, তাঁহার সে সাধনা ভাঙ্গাইবার নিমিত্ত কত প্রলোভন কত বাধা উপস্থিত হয়, নীলকণ্ঠের এ সাধনার সময় ষোড়শীর স্মৃতি কতবার কতরূপে তাঁহার হৃদয়ে উঁকি-ঝুঁকি মারিতেছে। কিন্তু নীলকণ্ঠ সাধনায় অটল। কর্ত্তব্যচ্যুত যক্ষ সুদীর্ঘ একটি বৎসর প্রিয়ার বিরহ সহিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, নীলকণ্ঠও আজ নিজের প্রতি সে শাস্তি বিধান করিয়াছেন। কিন্তু যক্ষ স্মৃতিসুখে বঞ্চিত ছিলেন না, মেঘকে দৌত্যে বরণ করিয়া, মনের অনেক জ্বালা দূর করিয়াছেন। তিনি বিরহী বটেন, কিন্তু তাঁর বিরহ,—

"সঙ্গমবিরহবিকল্পে বরমপি সঙ্গমাৎ বিরহম্
সঙ্গে সৈকা ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং বিরহে।"

সে বিরহে আনন্দ আছে। কিন্তু নীলকণ্ঠ এ বিরহে কাল্পনিক সুখ হইতেও আপনাকে বঞ্চিত করিয়াছেন। তিনি হৃদয় কঠিন করিয়া মুনিবের কার্য্যে আপনাকে ঢালিয়া দিয়াছেন। ইহাই তাঁহার প্রায়শ্চিত্ত।

নীলকণ্ঠ নিজ হইতে ষোড়শীকে পত্র দিবেন না, ইহা মনস্থ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ষোড়শীর পত্র পাইলে তিনি যে উত্তর না দিয়া থাকিতে পারিবেন এতটা আশা বৃদ্ধ স্বামীর নিকট করা সমীচিন বলিয়া মনে হয় না। ষোড়শীর প্রথম পত্র যে 'মাঠে মারা' না 'জলে মারা' পড়িয়াছে তাহা পাঠক মহাশয় জানেন। ষোড়শী তাহা জানিতে পারে নাই বলিয়া উত্তর না পাওয়ায় ততটা ব্যথিত হইয়াছিল। তার পর ষোড়শীর দ্বিতীয় পত্র,

তাহাও সময়ে নীলকণ্ঠের হস্তগত হয় নাই। সরকারী পত্র ছাড়া অন্য কোন পত্র মফস্বলে পাঠাইবার ব্যবস্থা নীলকণ্ঠ করিয়া যান নাই। সে জন্য সে পত্র নীলকণ্ঠের চক্ষু-গোচর হইতে অনেক বিলম্ব হইয়াছিল। এদিকে ষোড়শী দ্বিতীয় পত্রের উত্তর না পাইয়া প্রথমে আশঙ্কায় চিন্তিত, পরে অভিমানে ক্ষুব্ধ, শেষ ইহা অবহেলা জ্ঞান করিয়া, বড় ব্যথিত হইল। বেশ, তিনি ভাল আছেন সুখে আছেন, সেই ভাল। সরকারী পত্রে এত কথা লিখিতে পারেন, ষোড়শীকে কি দুই ছত্র লিখিতেও তাঁর সময়ে কুলায় না। না, আর সে চিঠি-পত্র লিখিবে না, কিন্তু ষোড়শীর সে প্রতিজ্ঞা স্থির রহিল না, সরকারী পত্রের সমস্ত টুকু ত তাঁর হস্তাক্ষর নহে, দস্তখত মাত্র তাঁর, তবে তাঁর কোন অসুখ করে নাই ত! স্বামীর স্বহস্তের পত্র দেখিবার জন্য ষোড়শীর মন বড় ব্যাকুল হইল; সে, সকল মান, সকল অভিমান দূরে ফেলিয়া নীলকণ্ঠকে তৃতীয় পত্র লিখিল, কিন্তু সে পত্রেরও উত্তর আসার সময় অতীত হইয়া গেল, ষোড়শীর উদ্বেগের সীমা রহিল না। ইতিমধ্যে কোন গোপনীয় বিষয় জানাইবার জন্য নীলকণ্ঠ স্বহস্তে মন্মথকে পত্র লিখিলেন, ষোড়শী মন্মথের হাতে স্বামীর লিখিত সেই দীর্ঘ পত্র দেখিল, ভাবিল তবে, তবে,

"কি দোষে দাসী দোষী তব চরণে!"

প্রথমে দারুণ অভিমানে ষোড়শীর হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িল, তার পর, সে এ জ্বালা জুড়াইবার জন্য পড়াশুনায় অধিকতর মনোযোগ দিল, সেই সময়ে মন্মথের জননী ব্রত-উপলক্ষে ষোড়শীকে কিছু দিনের জন্য অধিকাংশ সময় নিজগৃহে রাখিবার ব্যবস্থা করিলেন। হাতে কাজ পাইয়া ষোড়শী যেন কতকটা শান্তি লাভ করিল। নীলকণ্ঠ মফস্বল হইতে ফিরিয় বহুবিলম্বে ষোড়শীর দুই পত্রই এক সঙ্গে পাইলেন। ও, কি, বৃদ্ধের এ ভাবান্তর ঘটিল কেন?

দ্বাত্রিংশ-পরিচ্ছেদ।

সরলা প্রথম প্রথম ষোড়শীর সমক্ষে স্বামীর নিকট একগলা ঘোমটা দিত, কিন্তু ষোড়শীর "কলা বৌ" প্রভৃতি শ্লেষাত্মক সম্বোধনে এবং মন্মথের আন্তরিক সমর্থনে ঘোমটা ক্রমে চক্ষুলজ্জা পরিত্যাগ করিয়া চক্ষের উপরিভাগে উঠিয়াছিল, কিন্তু ষোড়শী তাহাতেও যে ছাড়ে না! মন্মথেরও ষোড়শীর সম্মুখে, সরলার ঘোমটা ঘুচাইতে বড় আগ্রহ! তুলনায় সমালোচনার জন্য বুঝি! ক্রমিক অনুরোধে যা থাকে কপালে ভাবিয়া সরলার ঘোমটা ধীরে ধীরে কপালে উঠিল! রাহুমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় মন্মথের সমক্ষে সেই চাঁদপনা মুখখানি দেখিয়া ষোড়শীর রসের সিন্ধু উথলিয়া উঠিয়াছিল, তাই আজ তার রঙ্গরসের কিছু বাড়াবাড়ি। সরলাও যে ইহাতে যোগ না দিয়াছিল, তাহা নহে, কিন্তু সে সময় সময় বড় অন্যমনস্ক হইতে-ছিল। সে ভাবিতেছিল ষোড়শীর কি পুণ্যের জোর! সে তাহার রন্ধনের গুণে, আপনার স্বামীকে আহারে পরিতৃপ্ত করাইয়া ধন্য হইয়াছে। আজ সে সরলার স্বামীকেও কত তৃপ্তি দিয়াছে, তার চেয়ে কত দিকে, কত গুণে ষোড়শী শ্রেষ্ঠ! হায়,

স্বামীকে স্বহস্তে রাঁধিয়া আহার করাইয়া, তেমন তৃপ্ত কি সরলা কোন দিন দিতে পারিবে! তাহার এমন সৌভাগ্য কি কখন হইবে? যে স্ত্রী স্বামীকে সেবায় তুষ্ট আহারে তৃপ্ত, ব্যবহারে মুগ্ধ করিতে না পারিল, সে স্ত্রীর জীবনই বৃথা!

ইহার পর হইতে সরলা ষোড়শীর নিকট রন্ধন ও গৃহ-কার্য্য শিখিবার জন্য আপনাকে সম্পূর্ণভাবে নিযুক্ত করিল। সে ঐকান্তিক চেষ্টার ফল বড় দ্রুত ফলিল, সরলার শ্বশ্রূ-ঠাকুরাণী বধূর সুমতি দেখিয়া বড়ই আহ্লাদিত হইলেন, তাহার শিক্ষার জন্য লক্ষ্মীর ভাণ্ডার উন্মুক্ত রাখিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন, প্রথম প্রথম অনেক দ্রব্য অপচয় হইবে, তা হোক্‌, যাহাতে বধূ আশঙ্কা না করে, বা নিরুৎসাহিত না হয়, সে কথাও ষোড়শী এবং সরলাকে [illegible] দিলেন। সরলার আগ্রহ [illegible] দেখিতে দেখিতে সরলা নানাবিধ ব্যঞ্জন, মিষ্টান্ন পিষ্টক, পলান্ন, ও আরও নানারূপ আহার্য্য, পানীয় প্রস্তুত করিতে শিখিল। ষোড়শী তাহার সমস্ত বিদ্যা মন খুলিয়া সরলাকে শিখাইল. কোন রূপ কার্পণ্য বা গোপন করিল না, ক্রমে ষোড়শীর শিক্ষা-ভাণ্ডারের সমস্তই সরলার আয়ত্ত হইল। ষোড়শীর ন্যায় সরলাও রন্ধনে নিপুণ হইয়া উঠিতে লাগিল, গৃহ কার্য্যের শৃঙ্খলাতেও সে পটুত্ব লাভ করিল।

সরলা যখন এই সকল কার্য্যে মন দিয়াছিল, তখন মন্মথের যে কিছু অসুবিধা না ঘটিয়াছিল, তাহা নহে, কিন্তু সে সকল কথা পরে। (ক্রমশ)

শ্রীশৈলেশচন্দ্র মজুমদার।

ভালবাসা। *

Love is Eternal—Love is God.

ভাল বেস না আমায়!
যদি রূপ মোহে মজি' ভাল বেসে থাক,—
তবে সখা—ভাল বেস না আমায়॥
ভাল বাস ওই সহস্র কিরণে,
জ্যোতির্ম্ময় বপু—সুনীল গগনে;
রূপ যার কভু অনন্ত জীবনে;—
হবে না মলিন—রবে আপন প্রভায়।
ভাল বেস না আমায়!

ভাল বেস না আমায়!
যদি যৌবন হেরিয়া ভাল বেসে থাক,—
মিনতি তোমারে—ভাল বেস না আমায়॥
ভাল বাস তবে সরস বসন্ত,
চির মধুময়—যৌবন প্রশান্ত;
মধুভরা চিত—অসীম অনন্ত;—
বরষে বরষে নিজ সুষমা ছড়ায়।
ভাল বেস না আমায়!

ভাল বেস না আমায়!
যদি ধন রত্ন আশে ভাল বেসে থাক,—
তবে সখা—ভাল বেস না আমায়॥
ভাল বাস ওই নীল পারাবার,
তরঙ্গ ভঙ্গিম—অনন্ত বিস্তার,
তার সম কার সম্পদ ভাণ্ডার,—
প্রয়াসী জনে সে কত রতন বিলায়।
ভাল বেস না আমায়!

ভাল বেস হে আমায়!
যদি পবিত্র প্রণয়ে—আকুল অন্তরে,
ভাল বেসে থাক—তবে বেস হে আমায়॥
দিব প্রতিদান পরাণ ভরিয়া,
রবি শশী তারা সকলে জিনিয়া;
সরস বসন্ত জলধি বেড়িয়া;—
বিকাব চরণে তব—প্রাণ যদি চায়,—
ভাল বেস হে আমায়॥

শ্রীআনন্দগোপাল ঘোষ।

* This is a Norwegian Love Song, retranslation from English to Bengalee.

সাহিত্য-প্রসঙ্গ।

ভারতীয় নাট্যের মূল।

এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এম্‌-এ মহাশয় 'ভারতীয় নাট্যের মূল' নামে এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। এই প্রবন্ধে তিনি দেখাইয়াছেন যে সকল প্রকার কিম্বদন্তীই ভরতঋষিকে ভারতীয় নাট্যকলার আবিষ্কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করে। বিক্রমোর্ব্বশীতে কালিদাস ভরতকে দেবতাদিগের নাটক-লেখক ও নাট্যপীঠ শিল্পী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন; উত্তররামচরিতে ভবভূতি তাঁহাকে তৌর্য্যত্রিক সূত্রকার বলিয়াছেন। অভিনেতাদিগকে ভরতপুত্র এবং ভারতীয় নাট্যকলার সর্ব্বপ্রধান গ্রন্থকে 'ভারত-নাট্য-শাস্ত্র' বলা হইয়া থাকে। এই গ্রন্থে ভরত নিজেই বক্তা। ব্রহ্মার কৃপায় তাঁহার নিকট এই শাস্ত্র পঞ্চম বেদরূপে স্বয়ংপ্রকাশিত হয়।

পাণিনি শিলালি (৪।৩।১১০) ও কৃশাশ্ব (৪।৩।১১১) নামে দুই নাট্য সূত্রকার ঋষির নাম করিয়াছেন। ইহা দ্বারা অভিনেতৃবৃত্তি যে পাণিনিরও পূর্ব্ববর্ত্তী তাহা প্রমাণিত হইতেছে। সামাশ্রমীর ন্যায় পণ্ডিতগণ পাণিনিকে খৃষ্টের ২৩০০ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী আর কথাসরিৎসাগরের একটি গল্পের উপর নির্ভর করিয়া বুহ্লার তাঁহাকে খৃষ্টের ৪০০ শত বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী বলেন। পাণিনির দিন ঠিক না হইলেও নাট্যসূত্র যে তাঁহার পূর্ব্বেও ছিল তাহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না।

যাইট বৎসরের কিছু পূর্ব্বে কর্ণেল উজলি সারগুজা রাজ্যে রামগড় পর্ব্বতে দুইটি পর্ব্বত-গুহা আবিষ্কার করেন। উহার মধ্যে অশোকাক্ষরে লিপিও খোদিত আছে। সম্প্রতি ডাঃ ব্লুক এই গুহা পরিদর্শন করিয়া নাট্যসম্বন্ধীয় লিপি বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। উহার মধ্যে 'লুপদখে' শব্দের অর্থ 'অভিনয়-কুশলী স্থির করিয়াছেন। তিনি একটি গুহায় রঙ্গমঞ্চ, দর্শকাসন, তিরস্করণীর দণ্ডবিল প্রভৃতি আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহার মতে এই নাট্যশালা খৃষ্টীয় দুই বা তিন শত বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে শক ও যবনদিগের সঙ্গে পহ্লব (পহ্লব) গণের উল্লেখ দেখা যায়। (নাট্যশাস্ত্র ২৫।৮৯) পহ্লবগণই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ পার্থীয় জাতি। পার্থীয়গণ খৃষ্টের তিনশত বৎসর পূর্ব্বে প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। ইহাদিগের নাম পহ্লব শব্দে পরিবর্ত্তন হইলে এই নাট্যশাস্ত্র রচিত হয়। সামান্যতঃ খৃষ্টের দুইশত বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ রামগড়ের গুহাগর্ভ নাট্যশালা নির্ম্মাণের প্রায় সমকালে এই ভারত-নাট্যসূত্র সঙ্কলিত হইয়া থাকিবে। ইহার পর শাস্ত্রী মহাশয় ভরত-কথিত নাট্যশাস্ত্রের নানা অধ্যায়ে সংক্ষিপ্ত বিবরণ বিবৃত করিয়াছেন। উপসংহারে তিনি নাট্যামোদের অনুষ্ঠানে ইন্দ্রধ্বজ স্থাপনের প্রথা (জর্জ্জর প্রতিষ্ঠা) হইতে প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছেন ভারতের নাট্যামোদ ধ্বজারোপণরূপ এক অতি প্রাচীন উৎসবের সঙ্গে যখন সংশ্লিষ্ট তখন ইহাকে একেবারে ভারতীয় বা ভারতীয় আর্য্যাচার বলা যাইতে পারে। উত্তর কালবর্ত্তী গ্রীকগণের সহিত ইহার কোন সংশ্রব নাই।

ষোড়শ শতাব্দীর কামান।

ঢাকার স্কুল ইন্‌স্পেক্টার ষ্টেপ্‌লটন সাহেব এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় কতক প্রাচীন কামানের বিবরণ ও ছবি বাহির করিয়াছেন।

১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ১২ ফেব্রুয়ারি তারিখে কতকগুলি লোক নারায়ণগঞ্জের উত্তর পূর্ব্বে সাত মাইল দূরে দেওয়ান বাগ নামক গ্রামে মাটী খুঁড়িতে খুঁড়িতে সাতটি পিতলের কামান পাইয়াছে। যে স্থানে কামান কয়টি পাওয়া গিয়াছে, উহা সার্ভে ম্যাপে 'মমুহর খানের বাগ' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এই গ্রাম আকাটিয়া খাল শীতল লাক্ষ্যা নদীর সঙ্গম স্থলে অবস্থিত। একটি কামানের গাত্রে ইশার্খা নামক এক ব্যক্তির নাম খোদা আছে। যাঁহার নামে

ঐ বাগের নাম সেই মনুহর খাঁ। এই ইশাখাঁর প্রপৌত্র মুনাব্বর খাঁ ব্যতীত আর কেহ নহে। এ জমীর বর্ত্তমান অধিকারীর নাম মৌলভী মুজফর হোসেন।

ঐ সাতটি কামান ঢাকায় আনা হইয়াছে। উহার চারিটির নলের মুখ সিংহ বা বাঘ্র মুখাকৃতি। একটির উপরে হুমায়ুন জেতা বাদশাহ শের শাহের নাম খোদিত আছে। ষ্টেপ্‌ল্‌টন অনুমান করেন, এই শের শাহের কীর্ত্তির অনুস্মরণে তাঁহার রাজত্ব কালে প্রস্তুত কামানের মুখই ঐরূপ সিংহ বা ব্যাঘ্র মুখ করা হইয়াছে। যে কামানটিতে শের শাহের নাম খোদিত আছে,—তাহাতে ৯৪৯ হিজিরি (১৫৪২ খৃষ্টাব্দ) খোদিত আছে। অবশিষ্ট তিনটির মধ্যে একটি ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে পূর্ব্ব বাঙ্গালার যে শাসনকর্ত্তা ছিলেন, সেই ইশাখাঁর নাম এবং হিজিরা ১০০২ (১৫৯৩ খৃষ্টাব্দ) খোদিত আছে। কামানগুলি ৩ ফুট ১০ ইঞ্চ হইতে ৫ ফুট ১ ইঞ্চ পর্য্যন্ত লম্বা এবং ওজনে ১মণ হইতে ২মণ। সম্ভবতঃ এই কামানগুলি যুদ্ধের জাহাজে (নাওয়ারায়) ব্যবহৃত হইত। যেটিতে ইশাখাঁর নাম খোদা আছে তাহা হস্তীপৃষ্ঠে চলিতে পারে।

প্রথম কামানটির খোদিত লিপি হইতে পারসী অক্ষরে বাদশাহ শের শাহের নাম, ৯৪৯ হিজিরা এবং এই কামাননির্ম্মাতার নাম 'সৈয়দ আহমদ রুমী' জানা যায়। ইহার ওজন বাঙ্গালা অক্ষরে ৩/৪ তিন মণ চার সের খোদিত আছে। ইহার নীচের দিকে 'রিফাত গাজী'র নাম খোদিত আছে, উহা হয় গোলন্দাজের নাম না হয় পরবর্ত্তী অধিকারীর নাম। আর একটি নাম 'তরফ রাজা' কামানটির কমরের কাছে বাঙ্গালায় খোদিত আছে। উহা কামানটিরই নাম বলিয়া অনুমান করা যায়। ষোড়শ শতাব্দীতে দক্ষিণ শ্রীহট্ট জয়ের সঙ্গে এই নামের কোন সম্পর্ক থাকা অসম্ভব নহে, কারণ শ্রীহট্টের তরফ পরগণা দক্ষিণ শ্রীহট্টের প্রধান স্থান। ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জ উপবিভাগে জঙ্গল বাড়ীতে যে কেল্লা আছে উহা ইশাখাঁ ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দের সমকালে কোচদিগের নিকট হইতে জয় করেন। এইখানে এখনও ইশাখাঁর বংশধরেরা বাস করিতেছেন। উহা তরফ পরগণার বেশী পশ্চিমে নহে। তরফ রাজা নামের নীচে ২/৬ দুই মণ ছয় সের বাঙ্গালায় খোদিত আছে, কিন্তু এই দুইটি ওজনের কোনটিই মিলে না, আসলে কামানটির ওজন ১৷৭ এক মণ সাতাইস সের মাত্র।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় কামানেরও ব্যাঘ্রমুখ এবং নির্ম্মাণ-কৌশল প্রথমটিরই মত। দ্বিতীয়টির ওজন ১৸৴ এক মণ সওয়া ত্রিশ সের। ইহাতে কোন লিপি খোদিত নাই।

তৃতীয়টির ওজন বর্ত্তমান ১৸৬৷৷ এক মণ সাড়ে ছত্রিশ সের। ইহাতে পারসীতে যে লিপি খোদিত আছে, তাহাতে এক জন নূতন শাসনকর্ত্তার নাম পাওয়া গিয়াছে। নামটি—মাবুদখাঁ। ইহাতে এক স্থানে পারসী অক্ষরে ১০ সংখ্যা ও বাঙ্গালা অক্ষরে ওজন ২।৬ দুই মণ ষোল সের লিখিত আছে।

চতুর্থটিও ব্যাঘ্রমুখ। উহাতে বাঙ্গালা অক্ষরে নি ৩৯১ ২॥৮॥ খোদিত আছে। 'নি' অর্থ কি বুঝা গেল না। সম্ভবতঃ নিশানা—চিহ্ন হইতে পারে। ৩৯১ কামানটির সংখ্যা এবং বাকী ওজন দুইমণ সাড়ে আঠাইস সের, বর্ত্তমান ওজন কিন্তু ১॥৴৮ দেড়মণ তিন পোয়া মাত্র।

পঞ্চমটিতে ৩০০ শত বৎসরের প্রাচীন কালের বাঙ্গালা অক্ষরের একটি খোদিত লিপি আছে। যে বৎসরে আকবর বাদশাহের সেনাপতি রূপে মহারাজ মানসিংহ ইশাখাঁকে দমন করিয়াছিলেন, সেই বৎসরে এই কামানটি ঢালাই হয়। স্বাধীন পাঠানরাজ দাউদ শাহের পর (১৫৭৬ খৃষ্টাব্দ) এবং মানসিংহ কর্ত্তৃক বাঙ্গালা জয়ের (১৫৯৩ খৃষ্টাব্দ) মধ্যে এদেশে যে দ্বাদশ ভৌমিক প্রবল হইয়াছিলেন তন্মধ্যে এই ইশাখাঁ একজন। এই কামানটিতে বাঙ্গালায় নিম্নলিখিত লিপি খোদিত আছে ঃ—

সরকার শ্রীযুক্ত ইছা খাঁ।
?(বমসনদা ফি) সন হীজার
১০০২

ইহার বর্ত্তমান ওজন এক মণ আড়াই সের। ষষ্ঠ কামানটিতে সংখ্যা ১২৬ এবং পুরাতন ওজন ২॥৬ দুই মণ ছাব্বিস সের খোদিত আছে।

সপ্তমটিতে কোন খোদিত লিপি নাই। বর্ত্তমান ওজন ১ মণ ৩০ সের।

ইশাখাঁর বংশধর এখনও বর্ত্তমান। তাঁহার দুই পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠের ধারায় লতিফের বংশধরগণ ময়মনসিংহ জঙ্গলবাড়ীতে (এগার সিন্ধু দুর্গের নিকট বাস করেন এবং কনিষ্ঠের ধারায় আবদুল্লার বংশধরেরা এক্ষণে হৈবতনগরে (কিশোরগঞ্জে) বাস করিতেছেন।

গ্রন্থ-সমালোচনা।

সাবিত্রী-সত্যবান—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায় প্রণীত; বর্ণরঞ্জিত কয়েকখানি হাফ্‌-টোন চিত্র সমন্বিত; সুদৃশ্য বাঁধাই; মূল্য ১॥০

আমরা সাবিত্রীর এই উপাখ্যান খানি পাঠ করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছি। ভাষার প্রাঞ্জলতা, ভাবের বিশুদ্ধতা এবং আদর্শের পবিত্রতা গ্রন্থখানিকে রমণীয় করিয়া তুলিয়াছে। একাধারে সম্পদে সংযম, বিপদে স্থৈর্য্য, কর্ত্তব্যকার্য্যে নিষ্ঠা, সাধনায় একাগ্রতা এবং সতীত্বের গরিমা—সাবিত্রী-চরিত্রের যাহা মূল—গ্রন্থে তাহা বেশ ফুটিয়াছে। পূজা অর্চ্চনায়, তপোবনের শান্তিময় জীবনের প্রতি অনুরাগে, এক-নিষ্ঠায়, সহজ অনাড়ম্বরত্বে, পতি-সেবায়, শ্বশ্রূ প্রভৃতির পরিচর্য্যায় এবং ঐকান্তিক নীরব সাধনার মধ্য দিয়া, গ্রন্থকার সাবিত্রী-চরিত্রটিকে, অতি সুন্দর, সহজ এবং স্বাভাবিকভাবে স্তরে স্তরে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত আমরা নিরবচ্ছিন্ন সাধনা দেখিতে পাই। সে সাধনা সাধকের সরলতায় রমণীয়, গুরুজনের মঙ্গলাশীষে পূত, এবং একাগ্রতায় ত্রিকালজয়ী। সাবিত্রী-উপাখ্যানে রোম্যাণ্টিকত্বের উপাদানের অভাব নাই, কিন্তু গ্রন্থকার যে সেই উপাদানকেই সংযম এবং সাত্ত্বিকতার আবরণে মণ্ডিত করিয়া উপাখ্যানের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন, তাহাতে আমরা সুখী। তাঁহার তপোবনের চিত্রটি শান্তিরসে মগ্ন। গ্রন্থকার হিন্দু, হিন্দুর চিরন্তন আদর্শে অনুপ্রাণিত, তাই এমন ভাবে সাবিত্রী-জীবনের প্রতি ঘটনাকে সাত্ত্বিকতার ছায়া মণ্ডিত এবং এক মহা লক্ষ্যাভিমুখী করিয়া দেখিতে পারিয়াছেন। গ্রন্থে সাবিত্রীর মূল উপাখ্যানই অনুসৃত হইয়াছে।

কিন্তু একটা কথা, সাবিত্রী তত্ত্বে' যে বিস্তারিত চরিত্র বিশ্লেষণ বা নীতি-সমালোচনা চলে, এরূপ উপাখ্যান-পুস্তকে তাহা চলে না। কতক স্থলে বরং তাহা অসঙ্গত এবং অপ্রাসঙ্গিকও হইয়া দাঁড়ায়। আলোচ্য পুস্তকে দু'এক স্থলে হইয়াছেও তাহাই। পারিহাস-রসও সব সময়ে ঠিক 'মিশ' খায় নাই। বিষয়ের গাম্ভীর্য্যও তাহা দ্বারা কথঞ্চিৎ খর্ব্ব হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে মুদ্রাকর প্রমাদ ঘটিয়াছে। "যার যার কর্ম্মফলে সে সে সুখ দুঃখ ভোগ করে" "একদিন সে 'বাসনা সিদ্ধের' উপক্রম হইল" "বৈধব্যকে 'ঘাড়ে' লইয়াও সাধ্বী সাবিত্রী সত্যবানকে বরণ করিতে 'দৃঢ়প্রতিজ্ঞ'" "রাজর্ষি দ্যুমৎসেন শুনিলেন, অশ্বপতি তাঁহার 'ছেলের নিকটে সাবিত্রীকে' বিবাহ দিতে আনিয়াছেন" "সাবিত্রী একদৃষ্টে অনিমেষ নয়নে (সত্যবানের মুখের প্রতি) চাহিয়া থাকে, আর কি এক 'উৎকটানন্দে' তাহার চোখ মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠে" প্রভৃতি ব্যাকরণ-দুষ্ট এবং ভাষাগত দোষের পরিচায়ক। পরিশিষ্টটি সাবিত্রী-চরিত্রের ব্যাখ্যা মাত্র। গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি ব্যতীত, আলোচ্য গ্রন্থে তাহার আবশ্যকতা কি বুঝিলাম না।

ভরসা করি, ভবিষ্য সংস্করণে এ সকল ত্রুটীর সংশোধনে গ্রন্থকার মনোযোগ হইবেন। এই সকল ত্রুটি সত্ত্বেও গ্রন্থখানি যে মনোরম হইয়াছে, সে পরিচয় আমরা পূর্ব্বেই দিয়াছি। ইহা যে পাঠক, বিশেষতঃ পাঠিকাবর্গের সমাদর লাভ করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বিলাতে জাপান

চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে আমরা জাপানকে অসভ্য ভাবিতাম। আর আজ, আমাদের সভ্যতার দাবি যারা সহজে স্বীকার করে না, তারাও জাপানকে আপনাদের সমকক্ষরূপে গ্রহণ করিতেছে। আজ ইংরেজের মুখে জাপানের প্রশংসা ধরে না। এক দিন জাপানের এই অভ্যুদয়ে আমরাও নিজেদেরে কতকটা শ্লাঘান্বিত ভাবিয়াছি। জাপান তো আমাদেরই। জাপান আশিয়ার সভ্যতা ও সাধনার উত্তরাধিকারী। জাপান আপনার সভ্যতা ও সাধনা চীন হইতে, ও চীন আপনার ধর্ম্ম ও দর্শন বহুল পরিমাণে ভারতবর্ষ হইতে পাইয়াছে। শিষ্যের গৌরবে যেমন গুরুর গৌরব, চীন ও জাপানের অভ্যুদয়ে তেমনি ভারতেরও গৌরব। দশ বারো বৎসর পূর্ব্বে আমরা অনেকে এরূপ ভাবিতাম। আমরা আশা করিয়াছিলাম যে জাপান, বিধাতার আশীর্ব্বাদে, আশিয়ার হৃতগৌরবের পুনরুদ্ধার করিবে, আশিয়ার সনাতন সাধনাকে জগতে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার পথটা অন্তত পরিষ্কার করিয়া দিবে।

ইংলণ্ড যে দিন জাপানের সঙ্গে সখ্যতা-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া, জাপানকে য়ুরোপীয় রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে সমান আসন প্রদান করিল, সে দিন আমরা ভাবিয়াছিলাম যে বিধাতা যে উদ্দেশ্যে ইংরেজকে ভারতে আনিয়াছিলেন ভারতের শাসন-শাসিত সম্পর্কে তাহা পণ্ড হইয়া গিয়াছিল, জাপানের সখ্যতায়, বুঝি বা সে নষ্ট লক্ষ্য পুনরায় সিদ্ধ হইবে। আশিয়ার সনাতন সাধনার সঙ্গে য়ুরোপের নূতন সভ্যতার একটা সমন্বয় সাধনের পথ এত দিনে খুলিয়া গেল। জগৎকে দিতে পারে, আশিয়ার এমন অনেক অমূল্য সম্পদ-ঐশ্বর্য্য আছে। য়ুরোপ হইতে লইবার বস্তুও অনেক আছে। বিধাতা কেবল পার্থিবপণ্যের আদান-প্রদানের জন্যই য়ুরোপের সঙ্গে আশিয়ার এ নূতন সম্বন্ধ সংঘটন করান নাই। অপার্থিব, পারমার্থিক জ্ঞান ও সাধনার আদান-প্রদানের জন্যই তাঁর এ অভিনব ব্যবস্থা। কিন্তু ইংরেজ ভারতে আসিয়া রাজত্বই করিতে লাগিল, ভারতের সনাতন সাধনার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া সেই সাধনাকে আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিল না। আভিজাত্য ভক্তির অন্তরায়। ভাগবত বলেন, ধনী, বিদ্বান্, ব্রাহ্মণ, এঁদের কেহই ভক্তির অধিকারী নহেন। যেখানে ভক্তির সম্বন্ধ

হয় না, সেখানে পারমার্থিক সম্পদের আদান-প্রদানও সম্ভবে না। ভারতবর্ষের সঙ্গে ইংরেজের এ ভক্তির সম্বন্ধ, রাজৈশ্বর্য্য-সম্ভোগ নিবন্ধন, একান্ত অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে! "শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানম্"—এই শ্রদ্ধাই জ্ঞানলাভের সার্ব্বজনীন পন্থা। কিন্তু যে যার অধীন হইয়া পড়ে, আপনার শক্তি-সম্পদের জন্য যে যার উপরে সর্ব্বতোভাবে নির্ভর করিতে বাধ্য হয়, তাহার প্রতি সে ব্যক্তির শ্রদ্ধার উদ্রেক হওয়া একান্ত অসাধ্য না হইলেও, নিতান্ত সহজ নয়। ফলত ইংরেজ ভারতের প্রতি আজিও সমুচিত শ্রদ্ধাবান হইতে পারে নাই। বর্ত্তমান অবস্থাধীনে কখনো যে হইতে পারিবে, তাহারও সম্ভাবনা নাই। এ জন্য ইংরেজ ভারতের সাচ্চা বস্তুকে আজিও ভাল করিয়া ধরিতে পারে নাই। অথচ তারই জন্য, বিধাতা তাহাকে ভারতবর্ষে আনিয়াছিলেন। কিন্তু ভারতের সাহায্যে যাহা সম্ভব হয় নাই, সম্ভব হইবার নহে, জাপানের সখ্যতায় তাহা সাধিত হইবে। জাপানকে শ্রদ্ধা করিতে, ভক্তি করিতে, সত্যভাবে প্রীতি করিতে শিখিয়া, ইংলণ্ড ও সমগ্র য়ুরোপ ক্রমে জাপান যে সভ্যতা ও সাধনার উত্তরাধিকারী, সেই সভ্যতা ও সাধনাকে ভক্তি করিতে শিখিবে, ও তৎপ্রতি শ্রদ্ধাবান হইয়া, ক্রমে তাহাকে আয়ত্ত করিতে পারিবে, জাপানের অভিনব অভ্যুদয়ে, আমাদের অনেকের মনে এ আশার সঞ্চার হইয়াছিল। তাই আমরা জাপানের অভ্যুত্থানে এমন ভাবে আস্ফালন করিয়া উঠিয়াছিলাম।

কিন্তু ক্রমেই যেন সে আশা ও সে উৎসাহ ম্রিয়মান হইয়া পড়িতেছে। জাপান আশিয়ার সর্ব্বকনিষ্ঠ সন্তান। আশিয়ার সনাতন সাধনা ভারতে বা চীনে যেরূপ পরিপক্কতা লাভ করিয়াছে, কাজেই জাপানে সেরূপ লাভ করিতে পারে নাই। আর এই কারণেই, বোধ হয়, য়ুরোপীয় শক্তি ও সাধনার সঙ্গে সংঘর্ষে আসিয়া জাপান এক দিকে আপনার শরীরটাকে কেবল বাঁচাইয়া রাখিয়াছে নয়, বরং য়ুরোপের পথ ধরিয়া তাহাকে আরও দৃঢ়িষ্ঠ ও বলিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছে, কিন্তু অন্য দিকে য়ুরোপেরই মত প্রাণটাকে যেন কৃষ্ট ও ক্ষীণ করিয়া ফেলিতেছে। য়ুরোপের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রবৃত্ত হইয়া, জাপানকে য়ুরোপের যন্ত্রতন্ত্র আয়ত্ত করিতে হইয়াছিল, ইহা বুঝি। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জাপানের আত্মরক্ষার আর অন্য উপায়ান্তরও ছিল না। এরূপ না করিলে, জাপানকে অপর জাতির ন্যায় য়ুরোপের দ্বারা কালে নিষ্পিষ্ট হইতে হইত। এ সকলই সত্য। আমরা একদিন ভাবিয়াছিলাম যে জাপান এ সকল যন্ত্রতন্ত্রের সাহায্যে আত্মরক্ষা করিতে যাইয়া, চিরদিনই এ সকলের উপরে প্রভুত্ব করিবে। কিন্তু মানুষ যেমন প্রভুরূপে যন্ত্রবিশেষকে পরিচালিত করিয়া আপনার কার্য্যোদ্ধার করে, সেইরূপ আবার কখনো, তার নিজের যন্ত্রতন্ত্রই তাহার উপরে আপনাদের প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া, মানুষকে স্বকীয় লক্ষ্যভ্রষ্ট করিয়াও ফেলে। যাহা উপায় মাত্র ছিল, তাহা ক্রমে উদ্দেশ্য হইয়া পড়ে। জাপানেরও যেন তাহাই হইতেছে। য়ুরোপের সঙ্গে

সমকক্ষতা করিবার জন্য, আপনাকে য়ুরোপের হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য, জাপান য়ুরোপের যন্ত্রতন্ত্র শিখিয়াছিল। এখন আপনাকে বাঁচাইবার জন্য নহে, কারণ সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু য়ুরোপেরই মত আপনাকে গড়িয়া তুলিবার জন্য জাপান প্রাণপণ করিয়া সেই সকল যন্ত্রতন্ত্রের ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। আশিয়ার প্রাচীন আদর্শ সকল যে আশা বুকে লইয়া, জাপানের দিকে চাহিয়াছিল, সে আশার সফলতার সম্ভাবনা কৈ?

জাপান যে আপনাকে একেবারেই ইংরেজের বা ফরাসীদের মত করিয়া তুলিবে, বা তুলিতে পারিবে, এমন কথা বলি না। ব্যক্তিই হউক, আর জাতিই হউক, কেহই আপনাকে একেবারে আর এক ব্যক্তির বা আর এক জাতির মত, করিয়া তুলিতে পারে না। শত অনুকরণের ভিতরেও, তার ব্যক্তিত্ব বা জাতিত্ব, কতকটা থাকিবেই থাকিবে। জাপান ঠিক ইংরেজের বা ফরাসীদের চরিত্র লাভ করিবে, এমন নহে। কিন্তু জাপান, নিজের মতে, নিজের ছাঁচে য়ুরোপীয়দেরই মত হইতেছে, আসিয়ার মত আর থাকিতেছে না। আশিয়ারও য়ুরোপের মধ্যে একটা বিশেষ প্রভেদ এই যে,আশিয়ার সাধনা, ভালমন্দ, পরিণত-অপরিণত, সকলই স্বল্পবিস্তর অন্তর্মুখীন; য়ুরোপের সাধনা সেইরূপ বহির্মুখীন। এর অর্থ এই নহে যে আশিয়ার বহির্মুখীনতা নাই, বা য়ুরোপের অন্তর্মুখীনতা নাই। মানুষ সর্ব্বত্রই একটা সমগ্রবস্তু। এক মানুষে বা এক জাতিতে. যাহা আছে, মূলে সকলেই এই সমগ্রের অভিব্যক্তি বলিয়া—অপর মানুষে ও অপর জাতিতেও তাহা আছে। কিন্তু প্রকাশের তারতম্যও আছে। কারো মধ্যে এই সমগ্রের এক দিক্ ফুটিয়াছে, কারো মধ্যে অপর দিক্ বা ফুটিয়াছে। কারো ঝোঁক্ এক দিকে, কারো বা অপর দিকে। য়ুরোপের ঝোঁক বাহিরে, বিষয়ে, ইদং-এর দিকে। আশিয়ার ঝোঁক অন্তরে, পরমার্থে, অহং-এর দিকে। জাপান য়ুরোপীয়ের মত হইয়া যাইতেছে বলার অর্থ এই যে জাপানের প্রাণের ঝোঁকটা ক্রমশই এই ইদং-এর উপরে পড়িতেছে। য়ুরোপীয় সাধনা ইদংকে যে ভাবে দেখে, যে ভাবে ইদংকে ব্যবহার করিতেছে, জাপানও সেই ভাবেই দেখিতে আরম্ভ করিয়াছে। আর এখানেই জাপান আশিয়ার সনাতন লক্ষ্য চ্যুত হইয়া, য়ুরোপের ছাঁচে আপনাকে গড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। জাপান ইংরেজ, বা ফরাসীস্ বা জর্ম্মাণের মত হইবে, এমন কথা বলি না, এরূপ হওয়া অসম্ভব। কিন্তু ইংরেজ, ফরাসীস্, জর্ম্মাণ, রুশ, এরা সকলে যেমন আপন আপন বিশেষত্ব রক্ষা করিয়াও, সাধারণভাবে য়ুরোপীয় সাধনা ও সভ্যতার অঙ্গীভূত হইয়া আছে, জাপানও সেইরূপ আপনার নিজস্ব চরিত্র রক্ষা করিয়াও, ক্রমে এই য়ুরোপীয় সাধনা ও সভ্যতারই অঙ্গীভূত হইয়া পড়িতেছে। কোনো কোনো বিভাগে য়ুরোপ জাপানের নিকট হইতে সভ্যতার কতকগুলি উপকরণ স্বচ্ছন্দচিত্তে গ্রহণ করিবে, সত্য। কিন্তু জাপান কেবল যে য়ুরোপের নিকট হইতে সভ্যতার দু'চারিটা উপকরণ লইয়াই ক্ষান্ত থাকিবে, এমন বোধ

হয় না। জাপান য়ুরোপীয় সভ্যতার সমগ্র প্রাণটাকে টানিয়া লইবার জন্য আপনার হাত বাড়াইয়া আছে। যেমন ইংরেজ, ফরাসীস, জর্ম্মাণ, প্রভৃতি আপনাদের বিশেষ বিশেষ জাতীয় চরিত্র রাখিয়াও, এ সকল বিভিন্নতা সত্ত্বেও, য়ুরোপেরই এক একটা জাতি হইয়া আছে, সেইরূপ জাপান, দেশ সম্বন্ধে আশিয়ার অন্তর্ভূত থাকিয়াও, ক্রমে ইংরেজ, ফরাসীস্ প্রভৃতির ন্যায়, সাধনা ও সভ্যতার আদর্শে, য়ুরোপীয়ই হইয়া উঠিতেছে। এই পরধর্ম্ম জাপানের পক্ষে ভয়াবহ হইবে কি না, ভগবান জানেন।

একটা অবস্থা আছে যখন ব্যক্তিই হউক আর জাতিই হউক, আপনার অপেক্ষা প্রবলতর ব্যক্তি বা জাতির সঙ্গে সখ্যতাসূত্রে আবদ্ধ হইলে, তার নিজস্বটুকু হারাইয়া ফেলিতে পারে। যতদিন কোনো ব্যক্তির বা জাতির চরিত্র ভাল করিয়া গড়িয়া উঠে নাই, ততদিনই তার এ বিপদের আশঙ্কা থাকে। গঠিত, চরিত্র, পরিণত-বয়ঃ, ব্যক্তির বা জাতির পক্ষে এরূপ ভাবে আপনাকে হারাণ একরূপ অসম্ভব। জাপান এখনো এ পরিপক্কতা প্রাপ্ত হয় নাই। জাপানের পশ্চাতে একটা বিস্তৃত, বিপুল, ইতিহাস ও সাধনা বিদ্যমান নাই। যদি থাকিত, তাহা হইলে, জাপানের আধুনিক নেতৃবৃন্দ যেমন করিয়া জাপানকে সহসা নূতন ভাবে গড়িয়া তুলিয়াছেন, তেমন ভাবে কখনই গড়িতে পারিতেন না। ভারতবর্ষে এ চেষ্টা একান্তই বিফল হইয়া যাইত। ভারতের একটা প্রকাণ্ড প্রাচীন ইতিহাস, একটা পরিণত ও জটিল সাধনা আছে। একটা বিশাল সাহিত্য সেই ইতিহাস ও সাধনাকে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। একটা প্রাচীন ধর্ম্ম এখানে বহুসহস্রাব্দ ধরিয়া লোকচরিত্রকে গড়িয়া পিটিয়া, একটা বিশেষ আকার দিয়াছে। এখানে ছলা-পরামর্শ করিয়া, দশ জনে মিলিয়া একটা নূতন ধরণের ইতিহাস বা ধর্ম্ম গড়িয়া, জাতীয় জীবনকে একটা নূতন ছাঁচে ঢালা একেবারেই অসাধ্য। এখানে প্রাচীনকে ফুটাইয়া, নূতনের সঙ্গে প্রাচীনের সামঞ্জস্য করিয়া, তবে বর্ত্তমানের উপযোগী জাতীয় জীবন রচনা করিতে হইবে। আর এ জন্য এ ক্ষেত্রে, ভারতের উপরে বাহিরের প্রভাব যতই কেন আসিয়া পড়ুক না, তার নিজত্বটুকু কখনই একেবারে ধুইয়া মুছিয়া যাইবে না, যাইতে পারে না। জাপানে ইহা ঘটিতেছে, কারণ এ পর্য্যন্ত জাপানের একটা নিজস্ব সাধনা ও সভ্যতা একেবারে গড়িয়া উঠে নাই। জাপান চীন হইতেই আপনার সভ্যতা ও সাধনা লাভ করিয়াছে। এ সাধনাও কতকটা ধার করা। ইহাও একেবারে জাপানের অস্থিমজ্জাগত হইয়া যায় নাই। এ জন্য জাপানের পক্ষে আপনাকে বদলান কতকটা সহজ। এই জন্যই জাপান এত অল্প দিনের মধ্যে, এতটা সহসা ও সহজে, য়ুরোপীয় শক্তিসঙ্ঘের মাঝখানে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছে। আর এই জন্যই জাপান আশিয়ার অধিবাসী হইয়াও, আশিয়ার নিজস্ব, সনাতন সাধনা হইতে দ্রুতবেগে সরিয়া পড়িতেছে বলিয়া মনে হয়।

বিলাতে জাপানের শিল্প-সভ্যতার যে

প্রদর্শনী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা দেখিয়া এই আশঙ্কাই প্রাণে জাগিয়া উঠে। এ প্রদর্শনীতে দেখিবার বিষয় অনেক, শিখিবার বিষয় অনেক, * সুরসিক জনের সম্ভোগের বিষয়ও অনেক। জাপানের চারুশিল্প বিলাতের শিল্পকলাকে কতটা পেছুনে ফেলিয়া রাখিয়াছে, এখানে ইহা প্রত্যক্ষ করা যায়। জাপানের প্রাণটা কবিত্বে পূর্ণ। জাপানের চালচলন, ঘর-দরজা, পথঘাট, বন-উপবন, সকলে মিলিয়া যেন একটা বিশাল দৃশ্যকাব্য রচনা করিয়াছে। জাপানের এ কবিত্ব অতি প্রাচীন বস্তু। চিরদিনই বোধ হয় জাপান সুন্দরের উপাসক ছিল। তাই জাপানের সকলই যেন সুন্দর, সুচারু, সুপরিপাটী। জাপান আপনার এই সৌন্দর্য্যকে লণ্ডন সহরের এক কোণে অদ্ভুতরূপে ফুটাইয়া তুলিয়াছে। প্রদর্শনীতে প্রবেশ করিয়া, খানিকটা যাইতে না যাইতেই মনে হয় যেন আর বিলাতে নাই, একেবারে, কোনো ইন্দ্রজালপ্রভাবে, জাপানে গিয়া পড়িয়াছি। ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে জাপানের প্রকৃতি দেবী যে সকল বসন পরিধান করেন, যেরূপ কীরণবরণগন্ধে আপনার বরবপুকে সাজাইয়া থাকেন, এখানে তার অবিকল ছবিটী যেন ফুটিয়া উঠিয়াছে। লণ্ডন সহরে, লোহার চালার নীচে, জাপান যেন সশরীরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, এমনি মনে হয়। প্রথমেই শীতঋতুর ছবি। আকাশ কুয়াসাচ্ছন্ন। বনস্থলী কোথাও বা পত্রপল্লবহীন, আর কোথাও বা শুভ্রতুষারাবৃত; আবার কোথাও বা শীতঋতুসুলভ বিরল পুষ্পলতাদি দ্বারা সুসজ্জিত। এই গ্রীষ্মকালেও, এখানে মনে হয় যেন খুব ঠাণ্ডা হাওয়া বহিতেছে। তার পর বসন্তের চিত্র। এ সকল ছবি নহে; আঁকা নয়, কিন্তু সত্যিকার ও কৃত্রিম গাছপালা দিয়া সাজান। কাণ্ডপ্রকাণ্ড সকলই সত্যিকার বটে, জাপানের বৃক্ষের নমুনা, জাহাজে করিয়া জাপান হইতে আসিয়াছে। তবে পাতা ও ফুল অবশ্য কৃত্রিম। কিন্তু জাপানের কারুকার্য্যের এমনি বাহাদুরী যে এ সকলও চক্ষে কিছুতেই কৃত্রিম বলিয়া বোধ হয় না। এতদিন ধরিয়া এখানে রহিয়াছে, কিন্তু ঝড়িয়া পড়ে না, তাই বলিয়া, যুক্তি বিচার করিয়া, এ গুলি যে সত্য নহে, কৃত্রিম এ সিদ্ধান্ত করিতে হয়। এই বসন্তের চিত্র অতি সুন্দর, এ সৌন্দর্য্যের বর্ণনা হয় না। কত রং-এর কত ফুল, কত রকমের কত পাতা, কত ছোট-বড় গাছ, বরণকীরণের ডালি মাথায় লইয়া যেন হেলিতেছে ‍দুলিতেছে। শীতে প্রকৃতি যেমনই জড়শড় হইয়াছিল, এখানে, নববসন্ত-সমাগমে, বিহগমুখরিত, বরণখচিত, গন্ধপূরিত হইয়া তেমনি যেন নবজীবনের ভরা পসরা লইয়া দাঁড়াইয়াছে। চারিদিকে যেন এক নূতন জীবন জাগিয়া উঠিয়াছে। এই নবজীবনের সঙ্গে সঙ্গে যেন আকাশ-পাতাল জুড়িয়া এক পরমানন্দের শ্রোত ছুটিয়াছে, জীবন্ত বসন্তের রস, চারিদিকে যেন উছলিয়া পড়িতেছে। তার পরেই শরৎ। শরদের বনস্থলীতে, শরদের আকাশে ও পৃথিবীতে, প্রকৃতি যেন জীবনের পরিপক্কতা প্রাপ্ত হইয়াছে। বসন্তের উচ্ছ্বাস থামিয়া গিয়াছে, কিন্তু জীবনের গতি গভীরতর

হইয়া উঠিয়াছে। যৌবনের চাঞ্চল্য কমিয়া গিয়া, এখানে প্রৌঢ়ের স্থৈর্য্য ক্রমে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সেই গাছ, সেই পাতা, সেই ফুল, সেই আকাশ, সকলই বসন্তে যেমন এখানে, শরদেও তেমনিই আছে; অথচ তেমনি যেন নাই। একটা গভীর পরিবর্ত্তনে যেন সকলই আচ্ছন্ন হইয়া আছে। এই ভাবে, জাপান লণ্ডন সহরের মাঝখানে, অতি অদ্ভুতরূপে আপনার ঋতুর বাহার বিস্তার করিয়া বসিয়াছে। চারুশিল্পে জাপান সিদ্ধহস্ত। দুনিয়ার আর কোনো জাতি, এমন ভাবে, প্রকৃতির ছবিকে, জীবন্ত করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিত না। চিত্রশিল্পে অনেকেই পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন। প্রকৃতির ছবি অনেকেই আঁকিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতির তাবেলা (tableau) বা জীবন্ত ছবি, এমনভাবে আর কেহই গড়িয়া তুলিতে পারে না।

তার পর, ইতিহাসের তাবেলা (tableau) প্রথমে জাপান আপনার অন্নময় কোষকে প্রকট করিয়াছে। প্রদর্শনীতে প্রবেশ করিয়াই, ঋতুত্রয়ে জাপানের চেহারা কেমন হয় তাহা দেখিলে, তার পরে জাপানের প্রাণময় কোষ। দেশের মাটি, জলস্থল, আকাশ, তার বহিঃপ্রকৃতি যেমন অন্নময় দেহ, সে দেশে যে জাতি বাস করে, তাহা তেমনি তার প্রাণময় দেহ। ইতিহাসে এই প্রাণ প্রকট হইয়া থাকে। ঐতিহাসিক তাবেলা দ্বারা জাপান এখানে আপনার জাতীয় জীবনের ছবিটা ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছে। বুদ্ধদেবের জন্মের পূর্ব্ব হইতে, ভিন্ন ভিন্ন যুগে জাপান কি কি মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, এ সকল তাবেলাতে তারই পরিচয় দিবার চেষ্টা করিয়াছে। আর এই খানেই আধুনিক জাপান কেমন অলক্ষিতে আপনাকে য়ুরোপীয় সাধনা ও সভ্যতার মধ্যে হারাইয়া ফেলিতেছে, তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই সকল ছবির স্বতন্ত্র আলোচনা আবশ্যক। বারান্তরে সে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

বাঙ্গালার মাতৃমূর্ত্তি।

সন্তানের উপর জননীর প্রভাব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক এ কথা সর্ব্ববাদী-সম্মত। সুতরাং জননী-জাতির অবস্থা ও চরিত্র যে সে জাতির উন্নতি ও অবনতিকে বহুপরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করে এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সেই কারণে সাধারণত প্রত্যেক জাতির জাতীয় বিশেষত্ব বিশেষ পরিস্ফুট আকারে সে জাতির রমণী-চরিত্রে প্রকাশ পায় এবং যতদিন রমণী-চরিত্রে সেই বিশেষত্বের অভাব না হয় ততদিন সে জাতির জাতীয় চরিত্রে সে বিশেষত্বের সম্পূর্ণ অভাব হয় না।

জাতীয় বিশেষত্ব জাতির স্থিতি ও উন্নতির পক্ষে অপরিহার্য্য। বহু সহস্র বৎসর ও

শতাব্দী ধরিয়া যে শিক্ষা, যে অভ্যাস, যে আচার, যে অনুষ্ঠান কোন জাতির অস্থিমজ্জার সঙ্গে মিলিয়া গিয়াছে তাহাকে অতিক্রম করিয়া কোন জাতি স্থিতি বা উন্নতি লাভ করিতে পারে না। প্রকৃত পক্ষে এই বিশেষত্বই জাতির জাতীয়ত্ব—ইহার অভাবে জাতীয়ত্ব বিলুপ্ত হয়।

হিন্দুজাতির এই বিশেষত্ব তাহার সংযম, ত্যাগ ও ধর্ম্মপ্রাণতা। প্রত্যেক কর্ম্মের ভিতর দিয়া, আচারের ভিতর দিয়া, জীবন যাত্রাপ্রণালীর ভিতর দিয়া, এই বিশেষত্ব হিন্দুসমাজে বিকাশ লাভ করিয়াছে। সুতরাং হিন্দুর জাতীয়ত্ব কখনও বিকাশের জন্য এই সকল বিশেষত্ব অক্ষুণ্ণ থাকা প্রয়োজন।

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এই বিশেষত্ব হিন্দু-সমাজ হইতে দিন দিন বিলুপ্ত হইতেছে এবং বাঙ্গালার জননী-সমাজও এ প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি পান নাই। জাতীয়-উন্নতি-প্রয়াসী ব্যক্তি মাত্রেরই এ কথা আলোচ্য।

ইংরাজী-শিক্ষার প্রথম যুগ হইতে এই ধ্বংস আরম্ভ হইয়াছিল এবং আজিও সে ধ্বংস ক্রিয়া সম্পূর্ণ ক্ষান্ত হয় নাই।

সে অধিক দিনের কথা নহে, যে দিন বাঙ্গালী ইংরাজী-শিক্ষার প্রথম যুগে পাশ্চাত্য সভ্যতার জ্বালাময়ী জ্যোতি দর্শনে উদ্ভ্রান্ত চিত্তে "পতঙ্গবৎ বহ্নিমুখং বিবিক্ষু"—দলে দলে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়াছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালার রমণী-সমাজকেও আপনাদের ধ্বংসপথের সাথী করিবার চেষ্টায় ত্রুটি করে নাই। সে দিনের সে অন্ধ-গতি-বেগ যদি অব্যাহত থাকিত তাহা হইলে হয় ত এত দিন বাঙ্গালার জাতীয় আদর্শ ও বিশেষত্ব সম্পূর্ণ চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইত। কিন্তু বাঙ্গলার সৌভাগ্য ক্রমে অধিক দিন সে গতিবেগ অব্যাহত থাকিতে পায় নাই—এমন দুর্দ্দিনেও বাঙ্গালার পথপ্রদর্শক মহাপুরুষের অভাব ঘটে নাই।

রাজা রামমোহন রায় এই দুর্দ্দিনে অভ্র-ভেদী হিমালয়ের ন্যায় অটল রহিয়া বজ্রকণ্ঠে স্বদেশবাসীকে ঘরে ফিরিবার জন্য প্রথম আহ্বান করিলেন তাঁহার সে প্রীতিপূর্ণ কণ্ঠধ্বনি দিকে দিকে ধ্বনিত হইল, কিন্তু অধিক লোক সে আহ্বান-বাণী শ্রবণ করিল না। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও মনস্বী কেশব-চন্দ্রও রাজার কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইলেন, কিন্তু ফল অধিক হইল না। ধর্ম্মের আহ্বানে ধর্ম্মপ্রাণ বাঙ্গালীর চিত্ত আকৃষ্ট হইল না। বাঙ্গালী আপনার অবলম্বিত স্রোতপথে যন্ত্রচালিতের ন্যায় ভাসিয়া চলিল। তখন ঐন্দ্রজালিক তুলিকা হস্তে প্রতিভা-শালী বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালার সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। যে গৃহ, যে সমাজ, যে দৃশ্য, যে উৎসব তুচ্ছ ঘৃণ্য বোধে বাঙ্গালী উপেক্ষা করিয়া ঘরের বাহির হইয়াছিল, বঙ্কিমচন্দ্র আপনার মায়া-তুলিকাপাতে তাহাদের স্বর্গীয় শোভায় উদ্ভাসিত করিয়া সহাস্য মুখে প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ে আপনার স্বদেশ-বাসীকে আহ্বান করিয়া মধুর কণ্ঠে বলিলেন —"এই শোভায় অতুলনীয়, ঐশ্বর্য্যে অপূর্ব্ব, মহিমায় পরিপূর্ণ—এই সুখময়, শান্তিময়, প্রীতিময় গৃহ ছাড়িয়া কোন্ অনির্দ্দেশ্য সুখের

আশায় বিদেশীর চরণতলে ছুটিয়া চলিয়াছে?" বাঙ্গালী স্তব্ধ নেত্রে চাহিয়া চাহিয়া বাঙ্গালী ঐন্দ্রজালিকের অপূর্ব ইন্দ্রজাল দেখিল, দেখিয়া দেখিয়া শেষে আর চক্ষু ফিরাইতে পারিল না—স্কটলণ্ডের "লেকে'র মায়া ভুলিয়া "বারুণীর" ঘাটে আসিয়া দাঁড়াইল—"জুলিয়েট","মিরাণ্ডা","ডেসডিমোনা" ভুলিয়া "সূর্য্যমুখী", "ভ্রমর," "কপালকুণ্ডলা"র সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইল।

প্রতিভাশালী বঙ্কিমচন্দ্র অসামান্য কৌশলে স্বদেশবাসীকে বিদেশের কুহক হইতে মুক্ত করিলেন, তাহাদিগকে একেবারে ঘরে পৌঁছাইয়া দিতে পারিলেন না বটে, কিন্তু গৃহাভিমুখ করিয়া দিলেন; তিনি যে চিত্র দেখাইয়া উন্মার্গ বাঙ্গালীকে আকৃষ্ট করিয়াছিলেন তাহা ঠিক বাঙ্গালীর জাতীয় চিত্র নহে। তিনি বাঙ্গালীর স্বাভাবিক চিত্রে পাশ্চাত্য বিলাস ও ভোগের মাদকতা মিলাইয়াছিলেন—বর্ণকে উজ্জ্বলতর করিবার আশায় স্বদেশের খাটি সোণায় বিদেশী ভাবের 'খাদ' মিলাইয়াছিলেন। সে সময়ে সমাজের যে অবস্থা, বাঙ্গালীর মনের যে গতি, তাহাতে বঙ্কিমচন্দ্রের অবলম্বিত পন্থা ভিন্ন সহজে সে স্রোত ফিরিবার কোন উপায় ছিল না। আমাদের সে উদ্ভ্রান্ত যৌবনে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রসাদে আমরা পাশ্চাত্য ভাবে অনুপ্রাণিত পত্নীত্বের উজ্জ্বল চিত্র পাইলাম। সে অনুকরণে বঙ্গরমণী বিদেশের মোহ-মুগ্ধ স্বামীকে গৃহে আকৃষ্ট করিতে শিখিল। কিন্তু তখনও সংযমে প্রতিষ্ঠিত, ত্যাগে বিশদীকৃত, প্রীতিতে বিকশিত, ধর্ম্মে অনুপ্রাণিত—মহিমাময়ী ঐশ্বর্য্যময়ী, পবিত্রতাময়ী জগতে অতুলনীয় বাঙ্গালার মাতৃমূর্ত্তি আমরা দেখিতে পাই নাই। তখনও যেন বঙ্গরমণী পূর্ব্বের মত স্বার্থকে বিসর্জ্জন করিতে, ভোগকে ধর্ম্মের মন্দিরে বলি দিতে মাতৃস্নেহে সকলকে হৃদয়ে স্থান দিতে—শিখে নাই—তখন সে প্রেমকে পূজা করিতে গিয়া ভগবানকে ভুলিয়াছিল—নিজের ও স্বামীর মুখ দেখিতে গিয়া বৃহত্তর সংসারকে উপেক্ষা করিতেছিল। বঙ্গরমণী হিন্দুর চিরন্তন আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইতেছেন। "যেনাহং নামৃতং স্যাম তেনাহং কিমকুর্য্যাম্"—এ কথা আর তাহার মুখ দিয়া বাহির হইত না। এই ভ্রষ্ট আদর্শ আজও দেশ হইতে অপসারিত হয় নাই—তাই আজ বাঙ্গালার রমণীসমাজ ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের জন্য আকুল হইয়া উঠিতেছে—ব্রহ্মচর্য্য অপেক্ষা পুনর্বিবাহ বাঙ্গালীর চক্ষে শ্রেয়তর বিবেচিত হইতেছে—আর্ত্ত, পীড়িত, দরিদ্র বাঙ্গালীর অতিথিশালায় স্থান পাইতেছে না! কিন্তু জাতীয় উন্নতির জন্য জাতীয় বিশেষত্ব অক্ষুণ্ণ রাখা যদি অপরিহার্য্য হয় তাহা হইলে এ আদর্শ অনুসরণ করিলে সুফল ফলিবে না। বাঙ্গালার অন্যতম সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক স্বর্গীয় শ্রীশচন্দ্র একথা সুস্পষ্ট ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। তাই তিনি তাঁহার প্রথম উপন্যাস "শক্তি-কাননের উৎসর্গ পত্রে লিখিয়াছিলেন" বাঙ্গালার আসল যে মহত্ব তাহা খাঁটি বাঙ্গালিত্ব হইতেই সম্ভবে। যাহা কিছু সেই বাঙ্গালিত্বের বিঘ্নকর তাহাতে সুফল ফলিবে না। তাই শ্রীশচন্দ্র তাঁহার প্রত্যেক উপন্যাসে বাঙ্গালীর জাতীয় আদর্শ যথাযথ চিত্রিত করিতে

চাহিয়াছিলেন। তাঁহার সম্ভ্রান্ত গৃহস্থচিত্র হইতে দস্যুচরিত্র পর্য্যন্ত প্রত্যেক চিত্র হিন্দুর বিশেষত্বে বিশেষিত তাঁহার "হৈমবতী", "নিস্তারিণী" "ফুলকুমারী", "সরলা", "মীরা" প্রত্যেকেই হিন্দু-চরিত্রের বিশেষত্বে বিশদীকৃত।

ধর্ম্ম ইহাঁদের চরিত্রের ভিত্তি—সংযম ও স্বার্থবিসর্জ্জন তাহার মেরুদণ্ড! ধর্ম্মপ্রাণা 'হৈমবতী' পরম ভাগবত 'জগন্নাথ আচার্য্যে'র উপযুক্ত সহধর্ম্মিণী।—গৃহদেবতা গোপীনাথের সেবার বিপুল আয়োজন তাঁহারই ভক্ত-হস্তস্পর্শে সমুজ্জ্বল—তাঁহার আনন্দময় বসন্তোৎসব তাঁহারই নিষ্ঠা ও ভক্তিতে সার্থক ও সুন্দর! ননদিনী মৃণ্ময়ী ঠাকুরাণীর হস্তে সংসারের সমস্ত কর্ত্তৃত্বভার সমর্পণ করিয়া এই আত্মবিসর্জ্জন-পরায়ণা বঙ্গকুললক্ষ্মী শুধু সংসারের কাজ লইয়াই সন্তুষ্ট—উৎসবের আনন্দময় মুহূর্ত্তে যখন সকলে অপনার সুখ লইয়া বিব্রত তখনও এই বঙ্গ-জননীর মাতৃহৃদয় আর্ত্ত, পীড়িত, ও শোকার্ত্তের জন্য ব্যথিত। স্বামীর প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি ও প্রীতি,—কিন্তু বাহিরে তাহার লক্ষণ মাত্র নাই। "আপনাতে আপনি অটল" এই সংযত কল্যাণময় প্রেম—ইহাই হিন্দু-প্রেমের বিশেষত্ব।

"সূর্য্যমুখী"র যেখানে স্বামীর সঙ্গে গাড়ী হাকাইয়াও তৃপ্তি নাই—"হৈমবতীর" আধ হাত ঘোমটা সেখানে কিছুতেই কপালের উপর উঠে না—অথচ হৈমবতীর প্রেম সূর্য্যমুখীর প্রেম অপেক্ষা গভীরতা বা আন্তরিকতায় কোন অংশে হীন নহে। "সরলা," 'মীরা,' 'ফুলকুমারী,' 'নিস্তারিণী' সকলের পক্ষেই এ কথা খাটে। শ্রীশচন্দ্রের দস্যু পর্য্যন্ত হিন্দু। "বিশ্বনাথ" দস্যুতার মধ্যেও সংযমী। দস্যুতা করিতে বসিয়াও "বিশ্বনাথ" দুঃখী ও দুর্ব্বলের প্রতি করুণাপর—স্ত্রীলোকের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং বিলাসিতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বীতস্পৃহ। শ্বশুর কর্তৃক লাঞ্ছিতা, স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্তা "প্রফুল্ল" সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে বসিয়াও "রাণীগিরি"র অভিনয় করিতেছিল—"বিশ্বনাথ" প্রকৃত দস্যু হইয়াও নিজে মাথায় করিয়া "সরলা"র "মোট" তাহার স্বামী-গৃহে পৌঁছিয়া দিতে গিয়াছিল।

তাই বলিতেছিলাম বাঙ্গালীকে জাতীয় আদর্শে ফিরিতে হইলে শ্রীশচন্দ্রের আদর্শ ধরিয়াই তাহাকে ফিরিতে হইবে—আধুনিক আদর্শ ধরিয়া নহে। আমি এমন বলিতেছি না যে বাঙ্গালী উন্নতি লাভ কামনা করিলে তাহাকে সেই দেড়শত বৎসরের পূর্ব্বের কালেই স্থির হইয়া থাকিতে হইবে।

আমি বলিতে চাই যে জাতীয় বিশেষত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, জাতীয় উন্নতি সাধন করিতে হইলে জাতীয় বিশেষত্বকে আবার প্রাণপণ চেষ্টায় ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। যত দিন বঙ্গরমণী আবার তাঁহার মাতৃভাব না ফিরিয়া পাইবেন—যতদিন না হিন্দুসন্তান আবার সংযম, ব্রহ্মচর্য্য ও নিষ্ঠার মর্য্যাদা বুঝিতে শিখিবে, ততদিন সহস্র রাজনৈতিক আন্দোলন, লক্ষ শিক্ষা-প্রণালীর বিধিনিয়ম—তাহাকে মানুষ করিয়া তুলিতে পারিবে না।

প্রবৃত্তির পথ স্বভাবতই চিত্তাকর্ষক—ভোগের পথ—বিলাসের পথ সহজেই মনোরম সেই পথ আবার অসাধারণ প্রতিভা-

শালী শক্তিশালী লেখনী বলে উজ্জ্বলী-কৃত—তাই শ্রীশচন্দ্রের স্নিগ্ধ, শুভ্র, পবিত্র চিত্র বাঙ্গালীর মুগ্ধ হৃদয়কে আকর্ষণ করে নাই। আজ জাতীয় উন্নতির আগ্রহের দিনে তাই আর একবার আমরা বাঙ্গালীকে তাহার চিরন্তন মাতৃমূর্ত্তিকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে সাগ্রহে আহ্বান করিতেছি। বঙ্গের মাতৃমূর্ত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে তাহার সন্তানের জন্য আর পৃথক করিয়া আয়োজন করার আবশ্যক হইবে না।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন গুপ্ত।

অব্যক্ত-জীবন।

শ্বাসযন্ত্র ও হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়ালোপ, দেহের শীতলতা, এবং সংজ্ঞাহীনতা প্রভৃতি কয়েকটি লক্ষণ প্রকাশ হইলে আমরা সাধারণ বুদ্ধিতে প্রাণীদিগকে মৃত বলিয়া সিদ্ধান্ত করি। শরীরবিদ্‌গণকে জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহারা এই সকল স্থূল লক্ষণের উল্লেখ না করিয়া বলিবেন, সজীব প্রাণী বাহিরের বিবিধ পদার্থ নানা উপায়ে অবিরাম দেহস্থ করিয়া এবং দেহের নানা আবর্জ্জনা বাহিরে ছাড়িয়া,— যে আদান-প্রদান চালায় তাহাই জীবনের প্রধান লক্ষণ এবং ইহারই অভাব মৃত্যু। আরো সূক্ষ্ম লক্ষণ জিজ্ঞাসা করিলে, তখন ইঁহারা শক্তির কথা আনিয়া ফেলেন। প্রাণিগণ খাদ্য হইতেই তাহাদের শক্তি আহরণ করে। যে শক্তি খাদ্যে অব্যক্ত ছিল, দেহযন্ত্রের মধ্যে পড়িয়া তাহাই তাপ, গতি, বিদ্যুৎ প্রভৃতি নানা শক্তিতে মূর্ত্তিমান হইয়া পড়ে। অব্যক্ত-শক্তিকে এই প্রকারে ব্যক্ত করাকেই শরীর-বিদ্‌গণ জীবনের লক্ষণ বলিবেন। এবং তাহারই অভাবকে মৃত্যু বলিয়া প্রচার করিবেন।

জীবন-মৃত্যুর পূর্ব্বোক্ত লক্ষণগুলির সাহায্যে প্রাণিদেহ পরীক্ষা করিলে মোটামুটি কাজ চলিয়া যায় বটে, কিন্তু সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা করিতে গেলে, ঐ গুলিই সময়ে সময়ে নানা ভ্রমের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। অল্পদিন হইল স্পেনের কোন সহরে একটি বালিকার মৃত্যু হয়। দেহে মৃত্যুর স্থূল-লক্ষণ গুলিকে দেখিতে পাইয়া ডাক্তার মৃত দেহটিকে শবাধারে পূরিবার আদেশ দিয়াছিলেন। শবাধার সমাধিস্থলে লইয়াও যাওয়া হইল। কিন্তু মৃৎপ্রোথিত করার আবশ্যক হইল না। বালিকাটি সজীব হইয়া স্বহস্তে শবাধারের ডালা ভাঙ্গিয়া সকলকে চমকিত করিয়াছিল। এই ঘটনার সত্যতায় সন্দিহান হইবার কারণ নাই। যাঁহারা স্বচক্ষে ব্যাপারটি দেখিয়াছিলেন, তাঁহারাই নানা বৈজ্ঞানিক পত্রে ইহার বিশেষ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কাজেই বলিতে হয়, জীবন-মৃত্যুর যে সকল সাধারণ লক্ষণ আমাদের জানা আছে, তাহা অভ্রান্ত নয়। জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে যে এক অব্যক্ত জীবন আছে, তাহা জীবনের সাধারণ লক্ষণ-গুলির দ্বারা ধরা পড়ে না।

প্রাণীর কথা ছাড়িয়া উদ্ভিদের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, জীবন-মৃত্যুর লক্ষণে আরো গোলযোগ দেখা যায়। বাজার হইতে যে সকল বীজ লইয়া বপন করা যায়, তাহার সকলগুলি অঙ্কুরিত হয় না। কাজেই বাহিরের আকার প্রকার পরীক্ষা করিয়া যে বীজকে আমরা সজীব মনে করি, তাহা সত্যই জীবিত নয়। পাঠক হয় ত বলিবেন, অঙ্কুরিত হওয়াই বীজের সজীবতার লক্ষণ। কথাটা খুবই সত্য। কিন্তু এই লক্ষণ দ্বারা সজীবতা বুঝিতে গেলে, বীজকে নষ্ট করা হয়। প্রাণীর সজীবতা পরীক্ষা করিতে গিয়া যদি তাহার মুণ্ডচ্ছেদের ব্যবস্থা করা যায়, তবে পরীক্ষা সার্থক হয় সত্য, কিন্তু তাহাতে বিশেষ কিছুই লাভ করা যায় না। যে পরীক্ষায় জিনিসটি অবিকৃত থাকিয়া নিজের সজীবতার লক্ষণ প্রকাশ করে, তাহাই প্রকৃত পরীক্ষা।

আধুনিক জীবতত্ত্ব সম্বন্ধীয় গ্রন্থে ঐ প্রকার তিনটি পরীক্ষার উল্লেখ দেখা যায়। কোন প্রাণী বা উদ্ভিদের সজীবতা পরীক্ষা করিতে গেলে, তাহা অক্সিজেন এবং অঙ্গারক বাষ্প আদান-প্রদান করে কি না, তাহাই সর্ব্ব প্রথমে দেখা হয়। তার পর দেহের তাপ পরীক্ষা করা হইয়া থাকে, এবং সর্ব্বশেষে শরীরের কোন অংশে আঘাত দিয়া আহত ও অনাহত অংশের মধ্যে কোন বিদ্যুৎ-প্রবাহ চলিতেছে কি না, তাহা সূক্ষ্ম যন্ত্র সাহায্যে নির্ণয় করা হইয়া থাকে। প্রাণী বা উদ্ভিদের দেহ পচিতে আরম্ভ করিলে তাহা জীবনহীন বলিয়া সিদ্ধান্ত করার প্রথা আছে। কিন্তু ইহাকে কখনই মৃত্যুলক্ষণ বলা যায় না। ডিম্ব জিনিসটাকে প্রাণী বা উদ্ভিদ কোন জীবেরই কোটায় ফেলা যায় না। কাজেই উহাকে নির্জীব বলিয়াই মানিয়া লইতে হয়। অথচ মৃত পদার্থের ন্যায়ই ডিম্ব পচিতে আরম্ভ করে। কেবল ইহা দেখিয়াই যদি কেহ ডিম্বকে মৃত পদার্থ বলেন, তবে অন্যায় করা হয়। যাহা কোন কালে সজীব ছিল না, তাহা কখনই মৃত হইতে পারে না। সুতরাং প্রাণী বা উদ্ভিদের জীবন-মৃত্যু সাধারণ নিয়মে পরীক্ষা করিতে গেলে, পূর্ব্বোক্ত তিনটি পরীক্ষা অবলম্বন করা ছাড়া আর উপায় দেখা যায় না।

আজ কাল জীবন-মৃত্যুর লক্ষণ পূর্ব্বোক্ত উপায়েই স্থির করা হইতেছে বটে, কিন্তু পরীক্ষাকালে এ গুলিরও ব্যভিচার দেখা যায়। জীবমাত্রেই কখন কখন এমন অবস্থায় আসিয়া দাঁড়ায়, যখন ঐ সকল পরীক্ষার কোনটিতেই তাহারা সাড়া দেয় না। রটিফার (Rotifer) নামক ক্ষুদ্র প্রাণিগুলিকে শুষ্ক স্থানে রাখিলে তাহারা বহু বৎসর ধরিয়া ধূলিকণার ন্যায় পড়িয়া থাকে। এই অবস্থায় পরীক্ষা করিলে জীবনের কোন লক্ষণই দেখা যায় না। কিন্তু কয়েক মিনিট মাত্র জলে ভিজাইয়া রাখিলে তাহারাই নড়াচড়া করিয়া জীবনের লক্ষণ প্রকাশ করিতে থাকে। কেবল রটিফার নয়, ইহা ছাড়া আরও অনেক ক্ষুদ্র প্রাণীর এইপ্রকার অব্যক্ত জীবন দেখা যায়। এইগুলি আমোবা প্রভৃতির ন্যায় এককোষ জীব নয়। সাধারণ প্রাণীদিগের ন্যায় ইহাদেরও দেহে পাক-যন্ত্রাদির সুব্যবস্থা আছে। সুতরাং বলিতে হয়, জীবন ও মৃত্যুর মাঝে অব্যক্ত-জীবন

বলিয়া একটা অবস্থা ছোট বড় প্রাণী বা উদ্ভিদের মধ্যে নিশ্চয়ই আছে।

যে সকল প্রাণীর রক্ত শীতল তাহাদিগের মধ্যে অব্যক্ত জীবন বেশ ভাল করিয়া লক্ষ্য করা যায়। মেরুপ্রদেশের তুষাররাশির মধ্যে যখন ভেক জমাট বাঁধিয়া থাকে, তখন তাহার দেহে জীবনের একটুও লক্ষণ দেখা যায় না। তার পর বরফ গলিয়া জল হইলেই, তাহারা সজীব হইয়া বিচরণ আরম্ভ করে। মেরুপ্রদেশের বরফের মধ্যে মৎস্য এমন জমিয়া যায় যে, একটু চাপ দিলেই তাহাদের দেহ ধূলির ন্যায় চূর্ণ হইয়া পড়ে। কিন্তু গ্রীষ্মের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে সেই সকল মৎস্যই আবার সজীব হইয়া বরফ-গলা জলে আনন্দে বিচরণ আরম্ভ করে। সুপ্রসিদ্ধ মেরু-পর্য্যটক স্যাকলটন্ সাহেব দক্ষিণ মেরু-প্রদেশে বৎসরের মধ্যে প্রায় দশ মাস কাল কতকগুলি প্রাণীকে একেবারে নির্জ্জীব অবস্থায় থাকিতে দেখিয়াছিলেন।

উষ্ণ-শোণিতযুক্ত উন্নত প্রাণীর কথা আলোচনা করিলে, ইহাদেরও অব্যক্ত জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়। কর্ণেল টাউন্‌সেণ্ড নামক এক ব্যক্তির অদ্ভুত কার্য্যের কথা হয় ত পাঠক শুনিয়া থাকিবেন। ডব্‌লিনের ডাক্তার চনিস্ (Cheynes) স্বচক্ষে দেখিয়া বলিয়াছেন, লোকটি ইচ্ছা করিলেই মরিতে পারিত, এবং একটু চেষ্টা করিলেই আবার সজীব হইয়া পড়িত। যখন মরিবার জন্য প্রস্তুত হইত, সত্যসত্যই তখন নাড়ী ক্ষীণতর হইয়া শেষে নিস্পন্দ হইয়া যাইত। এই অবস্থায় চিকিৎসকগণ হৃদ্‌যন্ত্র পরীক্ষা করিয়া জীবনের একটুও লক্ষণ ধরিতে পারিতেন না। আমাদের দেশের যোগীদিগের সমাধির অবস্থা সম্বন্ধে যে সকল কথা শুনা যায়, তাহার বিশেষ পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। অধিক দিনের কথা নয়, রণজিৎ সিংহের রাজত্বকালে সাধারণের সম্মুখে সাধু হরিদাসের যে পরীক্ষা হইয়াছিল, তাহার বিবরণ শুনিলে, মরা ও বাঁচার মধ্যে জীবনের যে একটা নিশ্চেষ্ট অবস্থা আছে তাহা সুস্পষ্ট বুঝা যায়। আয়র্ল্যাণ্ডের টাউন্‌সেণ্ড সাহেবের ইচ্ছামৃত্যুর কথা সত্য হইলে, ভীষ্মের ইচ্ছামৃত্যুতে, এবং রঘুবংশের রাজাদিগের "যোগেনান্তে তনুত্যজাম্" বিশেষণটিকে কেন অমূলক বলিব বুঝিতে পারি না। সুতরাং দেখা যাইতেছে অব্যক্ত-জীবন মানুষ প্রভৃতি উন্নত প্রাণীদিগের মধ্যে খুব সুলভ না হইলেও, ব্যাপারটির অস্তিত্বকে অস্বীকার করা যায় না।

উদ্ভিদ ও জীবাণু প্রভৃতি অনুন্নত জীবের মধ্যে অব্যক্ত-জীবনের উদাহরণ সর্ব্বদাই দেখা যায়। যে বীজ শত বৎসর মৃতবৎ থাকিয়া মৃত্তিকায় পড়িলেই অঙ্কুরিত হয়, তাহার জীবন যে এই দীর্ঘকাল ধরিয়া অব্যক্ত অবস্থায় সেই বীজেই ছিল তাহা আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারি। অধ্যাপক ম্যাক্‌ফ্যাডেন্ (Macfadyen) কতকগুলি ব্যাধি-জীবাণুকে তরল-বায়ুর শীতলতার মধ্যে রাখিয়াও একবারে নির্জ্জীব করিতে পারেন নাই। তরল-বায়ুর উষ্ণতা বরফের উষ্ণতা অপেক্ষা প্রায় দুই শত ডিগ্রি কম। এই ভয়ানক শীতে এমন জমাট হইয়া গিয়াছিল যে, অঙ্গুলিস্পর্শে তাহারা ধূলির ন্যায় চূর্ণ হইয়া পড়িত, কিন্তু নির্জ্জীব হয় নাই।

এখন অব্যক্ত-জীবন সম্বন্ধে আধুনিক শরীরতত্ত্ববিদ্‌গণ কি বলেন, আলোচনা করা যাউক। ইঁহারা বলেন, প্রাণ নামক কোন জিনিস দেহের কোন বিশেষ অংশে নাই। যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষ দ্বারা জীবদেহ নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার প্রত্যেক-টিতেই জীবন বর্ত্তমান। কিন্তু সকলগুলি সমান ভাবে জীবিত নয়। কাহারো জীবনের মাত্রা অধিক এবং কাহারো কম। প্রাণীদিগের নখদন্ত এবং কেশাদির বহিরাবরণ যে সকল কোষ দ্বারা গঠিত, তাহা আবার সম্পূর্ণ নির্জ্জীব। দেহের সজীব কোষগুলির সমবেত জীবনীশক্তি যে প্রাণী বা উদ্ভিদে অধিক, সেই জীবকেই আমরা খুব সপ্রাণ দেখি। সার্ উইলিয়ম্ রস্কের ন্যায় কর্ম্মী পুরুষ এবং বায়ুরোগগ্রস্ত জড়বৎ ব্যক্তি উভয়েই সজীব বটে, কিন্তু সজীবতার মাত্রা দুইয়ে এক নয়। বায়ুরোগ-গ্রস্ত ব্যক্তি সত্যই অল্প অক্সিজেন গ্রহণ করে, এবং অতি অল্প অঙ্গারক বাষ্প ত্যাগ করে। ইহার কেবল মস্তিষ্কই দুর্ব্বল নয়, পেশী, ত্বক্, হৃদ্‌যন্ত্র এবং পাক-যন্ত্র প্রভৃতি শরীরের সকল অংশটিকেই নির্জ্জীব দেখা যায়।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, জীবন এবং মৃত্যু এই দুই সীমার মধ্যে জীবনের নানা পর্য্যায় বর্ত্তমান। প্রাণী বা উদ্ভিদ যখন পূর্ণজীবন হইতে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হয়, তখন তাহাকে ঐ সকল পর্য্যায়ের মধ্য দিয়াই যাইতে হয়। কিন্তু এগুলির সংখ্যা যে কত তাহা স্থির করিবার উপায় নাই। আমরা সূর্য্যালোকের সেই মৌলিক সাতটি রঙকে চিনি। কিন্তু কত পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া বর্ণসূত্রের (spectrum) লাল রঙ পীত হইয়া দাঁড়ায় এবং পীত রঙ বেগুণে হইয়া পড়ে, তাহার হিসাব চলে না। আমরা জীবনকে জানি এবং মৃত্যুকেও জানি, কিন্তু কত পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া জীবনই মৃত্যু হইয়া দাঁড়ায় তাহার হিসাব করিতে পারি না। শরীরবিদ্‌গণ জীবন ও মৃত্যুর মাঝেকার কোন এক অবস্থাকেই অব্যক্ত-জীবন বলিতে চাহিতেছেন।

জীবন ব্যাপারটা যে কি, তাহা আজও ঘোর কুহেলিকায় আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। এই কুহেলিকার আবরণ কোন দিন অপনীত হইবে কি না জানি না। যতদূর সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে মনে হয় যে সকল অণু দ্বারা দেহ গঠিত, তাহাদেরই সংযোগ-বিয়োগের বিশেষ বিশেষ শক্তি-গুলি জীবনের কার্য্য প্রকাশ করে। এই সংযোগ-বিয়োগ আমাদের পরিচিত রাসা-য়ণিক সংযোগ-বিয়োগেরই অনুরূপ, কিন্তু অপেক্ষাকৃত অনেক জটিল। জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ জীবনীশক্তির এই রাসায়ণিক ভিত্তিকে স্বীকার করিয়া বলিতেছেন, 'প্রাণী ও উদ্ভি-দের অব্যক্ত-জীবন এবং দেহের অণুর নিশ্চেষ্ট অবস্থা একই ব্যাপার। অণুর সংযোগ-বিয়োগের ধর্ম্ম এই অবস্থায় লোপ পায় না, সুপ্তাবস্থায় থাকে মাত্র। তার পর তাহাই কালক্রমে ব্যক্ত হইয়া পড়িলে জীবনের ক্রিয়াও ব্যক্ত হইয়া পড়ে। জীবের যখন মৃত্যু হয়, কেবল তখনি সেই সকল ধর্ম্ম একেবারে লোপ পাইয়া যায়। বাহিরের সঙ্গের যোগ রাখিয়া অণুগুলি যে সকল কার্য্য দেখাইত, তখন মৃত অণুতে তাহা আর দেখা যায় না।

সাধারণ জড়পদার্থের স্থূল রাসায়ণিক গুলিই সেই অবস্থায় উহাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে থাকে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে দেহের অণু-গুলির চঞ্চলভাব অর্থাৎ জঙ্গমত্বই জীবন। ঘড়ির কাঁটা জোর করিয়া চাপিয়া ধরিলে ঘড়িটিকে যেমন অল্পক্ষণের জন্য বন্ধ রাখা যায়, সেই প্রকারে দেহের জলীয় অংশকে টানিয়া লইলে বা তাপের মাত্রাকে কমাইয়া ফেলিলে অণুর জঙ্গমত্বের ক্ষণিক রোধ সম্ভব হয়। তার পর সেই বাধাগুলিকে নষ্ট করিলেই, ঘড়ির কলের ন্যায় দেহের কলটি আপনিই চলিতে আরম্ভ করে।

প্রাণিদেহে নানা প্রকার ঔষধের যে সকল ক্রিয়া আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতেও আণবিক জঙ্গমত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাণীকে অজ্ঞান করিতে হইলে ক্লোরোফরম্ প্রয়োগের রীতি আছে। জিনিসটা নিশ্চয়ই দেহের অণুর সংস্পর্শে আসিয়া রাসায়ণিক কার্য্য সুরু করিয়া দেয়, এবং তাহারই ফলে সমগ্র অণু নিশ্চল হইয়া পড়ে। মস্তিষ্কের অণুর নিশ্চলতায় রোগী সংজ্ঞাহীন হয় এবং হৃদ্‌পিণ্ড ও শ্বাসযন্ত্রের নিশ্চেষ্টতায় মৃত্যু পর্য্যন্ত দেখা দেয়। প্রুসিক্ এসিড (Prussic acid) জিনিসটা ভয়ানক বিষ। প্রাণীর শ্বাসযন্ত্রে অণুগুলিকে নিষ্ক্রিয় করাই ইহার কাজ।

জীবনীশক্তিকে রাসায়ণিক কার্য্য বলিয়া মানিয়া লইয়াও জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ অব্যক্ত জীবনের ইহা ছাড়া আর কোন কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই। ইতর প্রাণী বা উদ্ভিদ যখন শীতে জমাট বাঁধিয়া মৃতবৎ পড়িয়া থাকে, আমরা তখন উহাদের দেহের আণবিক নিশ্চলতার কারণ দেখিতে পাই। কিন্তু টাউন্‌সেণ্ড বা সাধু হরিদাসের মত কোন এক ব্যক্তি যখন স্বেচ্ছায় জীবনকে অব্যক্ত করে, তখন কোন্ মহাশক্তি দেহে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া অণুপুঞ্জের রাসায়ণিক শক্তিকে অপহরণ করে, তাহা এখনো জানা যায় নাই।

শ্রীজগদানন্দ রায়।

গোবিন্দদাস।

বৈষ্ণব কবিগণের মধ্যে কবি গোবিন্দদাস প্রখ্যাতনামা। কিন্তু আমরা নিঃসংশয় চিত্তে বলিতে পারি না যে, গোবিন্দদাসের পদাবলী বলিয়া যতগুলি পদ প্রচলিত আছে, সকল গুলিই একই কবির রচিত; কারণ ইদানীং আমরা অনেকগুলি গোবিন্দদাসের কথা শুনিতে পাইতেছি। অথচ ইহাও নিঃসঙ্কোচে বলা যায় না যে, গোবিন্দদাসের বিরচিত পদাবলী বলিয়া যাহা প্রচলিত আছে তাহা একই ব্যক্তির হওয়া অসম্ভব, কিম্বা ইহাদের মধ্যে পরে বিজ্ঞাত কোনও গোবিন্দদাসের পদ নিশ্চয়ই মিশ্রিত হইয়াছে। আভ্যন্তরীণ প্রমাণ এতৎ সম্বন্ধে এত প্রবল নহে যে আমাদিগকে এ প্রশ্নের মীমাংসা করিবার কালে দ্বিধাশূন্য করিতে পারে। যাবৎ

তাহা না হয় তাবৎ গোবিন্দদাসের পদাবলী নামধেয় পদগুলিকে এক ব্যক্তির রচিত বলিয়া ধরিয়া লইলে বিশেষ কোনও ক্ষতি বা আপত্তির হেতু দেখিতে পাই না। আমরা সেইরূপ ধরিয়া লইয়াই এই পদাবলী গুলির বিচারে প্রবৃত্ত হইতেছি। আমাদিগের বিবেচনায় এই পদগুলির ভিতর একটী এমন সূত্র আছে, যাহা দ্বারা তাহাদিগকে পরস্পর সংশ্লিষ্ট বলিয়া বোধ করিতে পারা যায়; অন্তত অধিকাংশ স্থলেই এই এক জাতীয়ত্ব অনুভব করিবার জন্য কোনও ক্লেশ করিতে হয় না। এই সূত্রটী তাঁহার রচিত পদগুলির মধুরতা। এই বিষয়ে গোবিন্দদাসের স্থান বৈষ্ণব কবিদিগের ভিতর একটু স্বতন্ত্র। বৈষ্ণব গীতির বাহ্য প্রকৃতি ও বাহ্য পরিচ্ছদ উপাদেয় হইলেও তাহা যে সর্ব্বদাই লক্ষ্য করিবার উপযুক্ত এ কথা কেহ স্বীকার করিবেন না। তাহার কারণ, বৈষ্ণব কবিগণ কবিতার বাহ্যোপকরণের প্রতি তত মন দেন নাই, মনের আবেগে যখন যে কথা যে ছন্দে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন, সুকবির হস্তে পড়িয়া সেই সকল কথাই অনেক স্থলে এমন সুন্দর ভাবে কথিত হইয়াছে ও এমন সুন্দর বেশ ধারণ করিয়াছে যে তাহা দৃষ্টি আকর্ষণ না করিয়া থাকিতে পারে না। কিন্তু ইহাও বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, কবিতার ছন্দোবন্ধ বা বাক্য-বিন্যাস তাঁহাদের প্রধান লক্ষ্য নহে, প্রাণের কথা বলাই তাঁহাদের প্রথম উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। ভাবের গাম্ভীর্য্য এবং মর্ম্মের উচ্ছ্বাসই তাঁহারা বিশেষ যত্ন সহকারে প্রকাশ করিয়াছেন, এই জন্য তাঁহাদের পদে সর্ব্বদা চাক্‌চিক্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তাঁহাদের পদে যে মাধুর্য্য নাই এমন কথা আমি বলি না। তবে অনেক স্থলেই যে তাহাতে বচন-চাতুর্য্য ও ছন্দো-পারিপাট্যের অভাব পরিলক্ষিত হয়, তাহা সকলেই জানেন। এ বিষয়ে বৈষ্ণব কবিগণের যে কোনও আন্তরিক আস্থা ছিল তাহা বোধ হয় না।

অন্যান্য বৈষ্ণব কবি হইতে কবি গোবিন্দদাসের এই খানেই স্বাতন্ত্র্য। বৈষ্ণব কবির আদি গুরু জয়দেবের আদর্শে গোবিন্দদাস তাঁহার পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। গোবিন্দদাস তাঁহার পদাবলীর ভিতর একটু মধুরতা, একটু গঠন-পারিপাট্য, একটু কোমলকান্তি আনিবার জন্য যেন সর্ব্বদাই চেষ্টা করিয়াছেন। মসৃণ পেলবতায় তাঁহার পদাবলী সদাই যেন সমৃদ্ধ। জয়দেবের অনুকরণে তিনি প্রথমেই কোমলকান্ত পদের দ্বারা শ্রীশ্যামসুন্দরের বন্দনা করিয়াছেন, তাহা জয়দেবের গীতির ন্যায় মধুর—

ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ পঙ্কজকলিতম্
ব্রজবনিতাকুচ কুঙ্কুমললিতম্॥
বন্দে গিরিবর ধরপদকমলম্।
কমলাকর কমলাঞ্চিতমমলম্।

ইত্যাদি পদে যে ললিত সুর উঠিয়াছে সেই সুর প্রায় তাঁহার সকল কবিতাতেই শুনিতে পাওয়া যায়। এই মধুর ঝঙ্কার এই সুরের বৈচিত্র্যময়ী ভঙ্গী কবি গোবিন্দদাসের নিজস্ব। বাঙ্গালা গীতি-কবিতায় ছন্দো-বৈচিত্র্য ও রচনাবিন্যাস-কৌশল তিনিই

প্রথম আবিষ্কার করিয়াছেন। শ্রীজয়দেব সংস্কৃত রচনায় যে অপূর্ব্ব ভঙ্গীর আবিষ্কার করিয়াছিলেন সেই অপূর্ব্ব ভঙ্গী বঙ্গভাষায় কবি গোবিন্দদাস প্রথম আমদানি করিয়াছেন। গোবিন্দদাসের পদাবলীতে কোকিলের পঞ্চম তান, বীণার কোমল নিক্বণ নিয়ত বিরাজিত। গোবিন্দদাসের পদাবলীতে "চৌদিকে ভ্রমরা ভ্রমরী গুঞ্জ'। গোবিন্দদাস ভারতচন্দ্রের পূর্ব্ব পিতামহ। যে ছন্দ ও ভাষা ভারতচন্দ্র গোবিন্দদাসে পাইয়াছিলেন তাহাই তিনি মার্জ্জিত ও সুসজ্জিত করিয়া নিজ প্রয়োজনে নিযুক্ত করিয়াছেন। গোবিন্দদাস একজন প্রসিদ্ধ শিল্পী; তাঁহার নির্ম্মিত "ইমারত" কোথাও দেখিতে কুৎসিৎ নহে, সকল স্থলেই সুদৃশ্য। ভারতচন্দ্রের সহিত এই স্থলেই তাঁহার সাম্য; কিন্তু গোবিন্দদাস শুধু শিল্পী নহেন, তিনি কবি। ভারতচন্দ্রের সহিত এইখানে তাঁহার বৈষম্য। যে সরস কবিত্বে গোবিন্দদাস অনুপ্রাণিত, ভারতচন্দ্রে তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না। গোবিন্দদাসের কবিত্ব ও ভারতচন্দ্রের কবিত্ব বিভিন্ন জাতীয়। ভারতচন্দ্রের কৃতিত্ব কোথায় তাহা অনেকে বলিয়াছেন—সে কথার অবতারণার এখানে প্রয়োজন নাই। আমরা শুধু গোবিন্দদাসের কথাই বলিব।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে গোবিন্দদাস এক জন সুশিল্পী। এই শিল্পকলা বৈষ্ণব কবিদিগের ভিতর গোবিন্দদাসে যেমন পরিস্ফুট তেমন আর কাহাতেও নহে, এ কথা বলিলে অত্যুক্তি বা অন্যায় উক্তি হইবে না।

আজু বিপিনে আওল কান,
মূরতি মূরত কুসুম বাণ,
জনু জলধর রুচির অঙ্গ,
ভঙ্গী নটবর মোহিনী।
ঈষৎ হসিত বদন চন্দ,
তরুণী নয়ন নয়ন কন্দ,
বিম্ব অধরে মুরলি খুরলি,
ত্রিভুবন মনোমোহিনী॥
কুসুম মিলিত চিকুরপুঞ্জ,
চৌদিকে ভ্রমরা ভ্রমরীগুঞ্জ,
পুচ্ছনিচয় রচিত মুকুট,
মকর-কুণ্ডল দোলনী।
চঞ্চল নয়ন খঞ্জন জোর,
সঘনে ধাওত শ্রবণ ওর,
গীম শোহন রতন রাজ,
মোতিমহার লোলনী॥
কটি পীত পট কিঙ্কিনী বাজ,
মদগতি অতি কুঞ্জররাজ,
জানু লম্বিত কদম্ব মাল,
মত্ত-মধুকর-ভোরণী।
অরুণ বরণ চরণ কুঞ্জ,
তরুণ অরুণ কিরণ গঞ্জ,
দাস গোবিন্দ হৃদয় রঞ্জ,
মত্ত মঞ্জীর বোলনী॥

এই নূতন ছন্দে গোবিন্দদাস যখন বৈষ্ণব কবিতার আসরে গান ধরিলেন, তখন তাঁহার গানের রিশ শ্রোতৃবর্গের কর্ণে মধু বর্ষণ করিয়া তাহাদের হৃদয়ে এক অভিনব হিল্লোলের সৃষ্টি করিয়াছিল সন্দেহ নাই।

গোবিন্দদাসের চিত্ত এই নূতন সুরের ঝঙ্কারে মুগ্ধ হইয়া নিত্য নূতন কলগীতির সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। তাঁহার ভক্তিপ্রবণ চিত্ত নিজ পরম রমণীয় ইষ্ট মূর্ত্তিদ্বয়ের পরম সৌন্দর্য্যের আবেশে আবিষ্ট হইয়া,

উল্লাসে উৎফুল্ল হইয়া বিবিধ ছন্দে, নিজ মুখরতা প্রকাশ করিয়াছে। কখনও তিনি

নন্দ-নন্দন, চন্দ-চন্দন-
গন্ধ নিন্দিত অঙ্গ।
জলদ সুন্দর, কম্বু কন্দর,
নিন্দিত সুন্দর ভঙ্গ॥

দেখিয়া বিমুগ্ধ; কখনও তিনি ধ্যানস্তিমিত নয়নে দেখিয়াছেন

সুন্দরী রাধা আওয়ে বনি।
ব্রজ রমণীগণ মুকুট মণি॥
কুঞ্জর গামিনী, মোতিম দামিনী,
শ্যাম নিহারিণী চমকানি রে।
আভরণ ভারিণী, নব অনুরাগিণী,
রস আবেশিনী তরঙ্গিণী রে॥
অঙ্গ তরঙ্গিণী, অধর সুরঙ্গিণী,
সঙ্গিনী নব নব রঙ্গিণী রে।
কুঞ্চিত কেশিনী, নিরুপম বেশিনী,
রস আবেশিনী ভঙ্গিনী রে॥
নব অনুরাগিণী, নিখিল সোহাগিনী,
পঞ্চম রাগিণী রূপিণী রে।
রাসবিহারিণী, হাস বিকাশিনী,
গোবিন্দদাস চিত মোহিনী রে॥

অমনি তিনি এই অপূর্ব্ব মূর্ত্তির কল্পনায় ভক্তিদ্রব চিত্তে নূতন ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া নূতন ছন্দে গাহিয়া উঠেন—

জয়তি জয়, বৃষভানু নন্দিনী,
শ্যাম মোহিনি রাধিকে।
কনয়া শতবাণ, কান্তি কলেবর,
কিরণে জিত কমলাধিকে॥

এমনি মধুরতায়, এমনি কোমলতায় গোবিন্দদাসের সমগ্র পদাবলী পূর্ণ। গোবিন্দদাস প্রথমতঃ আমাদের কর্ণকুহরে মধু বর্ষণ করেন, একটী ভরা সুর আমাদের কাণে ঝঙ্কৃত করিয়া দেন। সেই সুরের মোহে আমাদের হৃদয় স্বতঃই তাঁহার পদাবলীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। গোবিন্দদাসের ছন্দ এত বিচিত্রতার আকর, এত অভিনব তানের সমাবেশে সমৃদ্ধ, এবং এত কালোপযোগী যে তাহার আকর্ষণ এড়াইবার উপায় নাই। ছন্দ সর্ব্বকালেই কবিতার প্রাণ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। যে কবিতার ছন্দ ভাল নহে, তাহা খুব উচ্চাঙ্গের হইলেও তাহার আকর্ষণী শক্তির কিছু অভাব হইবেই। পূর্ব্বে বলিয়াছি কবি গোবিন্দদাস একজন প্রসিদ্ধ শিল্পী। তিনি ছন্দের উপযুক্ত ভাষাও ব্যবহার করিয়াছেন। গোবিন্দদাসের ভাষার সম্বন্ধে লক্ষ্য করিবার বিষয় প্রধানতঃ দুইটী;— অনুপ্রাসের সুব্যবহার ও যুক্তাক্ষরের সমীচীন প্রয়োগ। অনুপ্রাস সুব্যবহৃত হইলে ভাষার অলঙ্কার, নচেৎ তাহা ভাষার প্রপীড়ক হইয়া উঠে। দাশরথি রায়ের অনুপ্রাস ও যমক চর্চ্চা করিলেই তাহা বেশ হৃদয়ঙ্গম হইবে। গোবিন্দদাস এই দোষ সর্ব্বদা পরিহার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ভাষা অলঙ্কৃত হইলেও নিতান্ত কৃত্রিম বলিয়া বিবেচিত হইবে না। যে অনুপ্রাসাদি অলঙ্কার তিনি ব্যবহার করিয়াছেন তাহা যেন আপনি তাঁহার লেখনীর মুখে আসিয়া পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয়; হৃদয়ের উল্লাসের সহিত তাঁহার ভাষার চাঞ্চল্যের এত নিকট সম্পর্ক যে সে ভাষা দেখিয়া কবিকে কেহই কৃত্রিমতা দোষে দূষিত করিতে ইচ্ছা করিবেন না। বর্ষায় নদীবক্ষে উচ্ছ্বাস যেমন স্বাভাবিক, কবি গোবিন্দদাসের ভাষার

হিল্লোলও তেমনি স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। ভাবের প্রবাহে তাঁহার ভাষা হেলিয়া দুলিয়া, নাচিয়া নাচিয়া চলিয়াছে, বীচি-বিক্ষুব্ধ-হৃদয়া শুভ্র ফেন-হাস্যে শোভিতা তরঙ্গিণীর মত তাঁহার ভাষা সুস্মিতশালিনী ও মনোহারিণী, অথচ তাহার ভিতর দিয়াই যেন তাগতে একটা অব্যক্ত সৌভাগ্য-গর্ব্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে—

গাবই সব মধুমাস।
জনি দহ বিরহ হুতাশ॥
হুতাশ সদৃশ, চাঁদ চন্দন,
মন্দ পবন সন্তাপই।
মাধবী মধু, মত্ত মধুকর,
মধুর মঙ্গল গাবই॥
নব মঞ্জু রঞ্জন, পুঞ্জ রঞ্জিত,
চূত কানন শোভই।
রসলোল কোকিলা কোকিলকুল,
কাকলী মন মোহই॥
মোহই মাধবী মাস।
চৌদিশে কুসুম বিকাশ॥
বিকাশ হাস বিলাস, সুললিত কমলিনী,
রস জিম্ভিতা।
মধুপান চঞ্চল, চঞ্চরীকুল পদ্মিনী,
মুখ স্বিতা॥
মুকুল পুলকিত, বল্লী তরু অরু,
চারু চৌদিশে সঞ্চিতা।
হামসে পাপিনী, বিরহে তাপিনী,
সকল সুখ পরিবঞ্চিতা॥

বসন্ত-শোভা-বিমুগ্ধা বিরহিণীর এই উচ্ছ্বাস আমাদের কাণের কাছে সাগর-গামিনী কলনাদিনীর কুলুকুলুধ্বনির ন্যায় একটা অজ্ঞাত ব্যথার সৃষ্টির সহিত একটী মধুর-কোমল-করুণ রাগিণী গাহিয়া যায়; অথচ বসন্ত-সৌন্দর্য্যান্দোলিত কবি-হৃদয়ের উদ্বেল তরঙ্গ স্পর্শে আমাদের হৃদয়ও যেন সঙ্গে সঙ্গে আনন্দোচ্ছ্বাস-পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। ইহার ভিতর অবসাদ নাই, প্রকৃতির সৌন্দর্য্য যেমন পরিস্ফুট, হৃদয়ের যন্ত্রণাও তেমনি সুস্পষ্ট। ভাষা সজ্জিত, কিন্তু সজ্জার জন্য একটা কৃত্রিম চেষ্টা-জাগরণ নহে। যুক্তাক্ষরের সদ্ব্যবহারের কত শক্তি তাহা ইহাতে পরিষ্কার রূপে বুঝা যাইবে।

অনুপ্রাসের সুব্যবহারও গোবিন্দদাসে অনেক মিলিবে। জয়দেবের অনুপ্রাস যেমন চেষ্টা-বিরহিত বলিয়া মনে হয়, গোবিন্দদাসের অনুপ্রাসও তেমনি সহজ ও সরল, তাই সুন্দর।

মদন মোহন মুরতি মাধব,
মধুর মধুপুর তোই।
মুগধ মাধবী, মানি মানদ,
বিছই মারগ জোই॥
বিমল মধু ঋতু, মল্লী মুকুলিত,
মেলি মধুকরী, মধুর মধুকর,
মাতি মধু পিবি গুঞ্জ॥
মিহিরজা মৃদু মন্দ, মারুহ মনই,
মনসিজ সাতি।
মসৃণ মলয়জে মুরছি মানিনী
মহী মাহা গড়ি যাতি॥
মহা মণিময়, মহগ মণ্ডল,
মলিন মুখ অরবিন্দ।
মরমে মৃগয়তি মুদির ম নাহর,
মোহিত দাস গোবিন্দ॥

গোবিন্দদাস অনুপ্রাস যাহা মাঝে মাঝে

ব্যবহার করিয়াছেন তাহা এমনই মধুর। কিন্তু সত্যের অনুরোধে ইহাও বলা উচিত যে কখনও কখনও গোবিন্দদাসের পদাবলীতে এই কৌশলের অপব্যবহারও দৃষ্ট হয়। অনুপ্রাস লিখিয়া বাহাদুরি দেখাইবার ইচ্ছা কখনও কখনও তাঁহার হয় নাই, এ কথা বলা যায় না। মাঘ, ভারবির মত বড় বড় কবিরাও এ প্রলোভন এড়াইতে পারেন নাই। গোবিন্দদাসও যে একেবারে সে প্রলোভনের হস্ত হইতে নিস্তার পাইয়াছিলেন তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু ইহাও বলিতে হইবে যে সে সকল স্থলেও তাঁহার কবিতা কর্কশতা-দোষ-দুষ্ট নহে। তাঁহার ভক্তিবিধৌত সরস হৃদয়ে কোমলতার অভাব কোথাও দৃষ্ট হয় না। এই কোমলতাই গোবিন্দদাসের নিজস্ব। তাই তাঁহার অনুপ্রাসাদিতে পদের কোমলতা সাধিত হইয়াছে, কথা লইয়া বহুকষ্টসাধ্য ব্যায়াম করিবার বিকট প্রয়াস কোথাও প্রকাশ পায় নাই।

কিন্তু এই কারণেই আবার গোবিন্দদাসের পদাবলীতে একটী দোষ প্রবেশ করিয়াছে। অনেকে বলেন গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির পদানুসরণে তাঁহার পদাবলী গঠিত করিয়াছিলেন। কথাটা যদি সত্য হয় তাহা হইলে আমাদের স্বীকার করিতে হইবে যে শিষ্য গুরুর গাম্ভীর্য্য ভাল রকম ধরিতে পারেন নাই। গোবিন্দদাসের পদাবলীতে বিদ্যাপতির ডমরু-ধ্বনি আদৌ শুনিতে পাওয়া যায় না। অনেক স্থলে যে গোবিন্দদাস বিদ্যাপতিকে অনুকরণ করিয়াছেন তাহা নিশ্চয়, অনুকরণ কেন অনেক স্থলে তিনি বিদ্যাপতির কথাগুলিই লইয়া পদ রচনা করিয়াছেন। এতৎ সত্বেও বলিতে হইবে যে বিদ্যাপতির গাম্ভীর্য্য তাহাতে নাই। উভয় কবির বর্ষার চিত্র পাশাপাশি রাখিয়া দেখিলেই এ কথার যাথার্থ্য অনুভূত হইবে। উভয় বর্ণনার ছন্দ ও প্রকরণ একই, উপকরণ ও ভাব একই, কিন্তু দুটীতে যে প্রভেদ তাহা স্পষ্ট লক্ষিত হইবে। বিদ্যাপতির বর্ণনায় গাম্ভীর্য্য ; গোবিন্দদাসের বর্ণনায় গাম্ভীর্য্যের ছায়া মাত্র। একের বর্ণনা হৃদয়ের অন্তস্তল উদ্বেলিত করিয়া একটা অব্যক্ত আশঙ্কার সৃষ্টি করে, অপরের বর্ণনায় হৃদয়ে একটা গম্ভীর ভাবের আবেশ মাত্র সৃষ্টি করে, ইহার অধিক আর কিছুই করিতে পারে না। একটী জলদের গভীর নির্ঘোষ, অপরটী মুরজমন্দ্র।

আমরা এতক্ষণ গোবিন্দদাসের পদাবলীর বাহ্যোপকরণ সম্বন্ধে বলিয়াছি, এইবার তাঁহার কবিত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিব। তাঁহার ভাষা ও ছন্দ সম্বন্ধে এতগুলি কথা বলিলাম তাহার কারণ যে তিনি বঙ্গ-কবিতায় এ বিষয়ে পথপ্রদর্শক—বঙ্গকাব্যে তিনিই প্রথম শিল্পী।

কিন্তু আগেই বলিয়াছি যে গোবিন্দদাস কেবল শিল্পী নহেন, তিনি কবি। তাঁহার পদাবলী কেবল সুশ্রাব্য বাক্যের সমষ্টি মাত্র নহে, সরস কবিত্বের উপাদানে গঠিত। তিনি বিদ্যাপতিকে অনুসরণ করিয়াছেন কি চণ্ডীদাসকে অনুসরণ করিয়াছেন, সে বিচার করা নিষ্প্রয়োজন। তাঁহার পূর্ব্বে এই অমর কবিদ্বয় বৈষ্ণব কবিতার আসর

জাঁকাইয়া বসিয়াছিলেন ; তাঁহাদের পদানুসরণ করা তৎপরবর্ত্তী সকল বৈষ্ণব কবিই গৌরবের বিষয় মনে করিতেন। গোবিন্দদাস যে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসকে নমস্কার করিয়া নিজ পদাবলী আরম্ভ করিয়াছেন, ইহা স্বীকার করিলে গোবিন্দদাসের কিছুই মানের লাঘব হইবে না যে তিনি বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের কাছে অনেক বিষয়ে ঋণী। বৈষ্ণব কবি মাত্রেই এই দুই মহাকবির কাছে চির ঋণে আবদ্ধ। তাঁহারা যে ভাব-ভাগীরথী বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে প্রবাহিত করিয়াছেন, তাহার পুণ্যময় সলিলে অবগাহন করিয়া সকল বৈষ্ণব কবিই ধন্য হইয়াছেন ; গোবিন্দদাস ও হইয়াছেন। যাহা বৈষ্ণব কবি মাত্রেরই সাধারণ সম্পত্তি, তাহা লইয়া নিজের কাব্যাঙ্গের পুষ্টি করিয়াছেন বলিয়া গোবিন্দদাস দোষ-ভাজন হইতে পারেন না। ইহা করিয়াও গোবিন্দদাস একজন সুকবি, সে কথা কেহই স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। আমরা সেই কবিত্বের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় লইতে চেষ্টা করিব।

গোবিন্দদাসের কবিত্বের বাহ্য উপকরণগুলি তাঁহার ভাষা ও ছন্দের মত সুন্দর। তিনি যে ভাবালঙ্কারগুলি ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা অধিকাংশস্থলে তাঁহার কবিগুরু বিদ্যাপতির সমকক্ষ, কোথাও যেন বিদ্যাপতির উপমাকেও পরাস্ত করিয়াছে। শ্রীরাধার বর্ণনায় তিনি যে "পঞ্চম-রাগিণী রূপিণী রে" উপমাটী ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা এত ভাবসমন্বিত ও মধুর যে, বলিতে কি বিদ্যাপতিতেও এমন মনোহর উপমা দেখি নাই। গোবিন্দদাসের বিশেষণগুলিও মাঝে মাঝে এমনই মর্ম্মস্পর্শী ও "ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণী ;" "যাঁহা যাঁহা তরল বিলোকন পড়ই," প্রভৃতি রাশি রাশি বিশেষণ তাঁহার পদগুলিকে উজ্জ্বল লাবণ্যে বিশেষিত করিয়াছে ইহারা যেন আমাদের হৃদয়ে সংলগ্ন হইয়া যায় ; একটী অভিনব ভাবের তরঙ্গে যেন হৃদয় নিমগ্ন হইয়া যায়। তাঁহার উপমাগুলিও এমনি সৌন্দর্য্যময়, এমনি নূতনত্ব-সম্পন্ন।

(১) গুরুজন গৌরব, চৌর সদৃশ ভেল,
দূরেহুঁ দূরে রহুঁ ভাগি।

(২) কানু অনুরাগ— ভুজগে গরাসল,
কুল দাদুরি মতি মন্দ।

(৩) সজনি কানু সে বরজ ভুজঙ্গ
সো মঝু হৃদয়, চন্দন রুহে লাগল,
ভাগল ধরম বিহঙ্গ॥

(৪) সজনি কানু সে শৈল সোণার।
মঝু মন কাঞ্চন, আপন প্রেমধন,
জোরি পিঁধায়ল হার॥

(৫) হেরইতে হামারি, সজল দিঠি পঙ্কজে,
দুহুঁ পাদুক করি নেল॥

(৬) ভাল আধ ইন্দু, অমিঞা আগোরাল
ভাঙ তিমির ঘন ঘোর।
কিরণ বিকাশিত, শ্রুতি কুবলয় পরি
ধাবই নয়ন চকোর॥
নাশা শিখর, সমুখে উদিত পুন,
সিন্দুর ভানু উজোর।
অহনিশি বদন, কমল তেঞি বিকশিত,
শ্যাম ভ্রমর নাহি ছোর॥
অরুণ কিরণ পুন, অধরে হেরি হেরি,
হার তরঙ্গিনী তীরে।

কুচ যুগ কোক　শোক নাহি জানত
গোবিন্দদাস কহ ফুরে ॥

(৭) শুন মাধব তোহে সোঁপনু ব্রজবালা।
মরকত মদন,　কোই জন পূজই,
দেই নবকাঞ্চন মালা ॥
তুহুঁ অতি চপল,　চরিত জনু ষট্‌পদ,
কমলিনী বিপিন গোঙারি।
মৃদুল শিরিষ,　কুসুম জনু তোড়ই,
লহু লহু কবরী সঞ্চারি ॥

(৮) রাই কানু আলিঙ্গন, নীলমণি কাঞ্চন,
হেরইতে লোচন ভোর।
আবেশে অবশ তনু ভেল অতি আকুল
জলধরে বিজুরী উজোর ॥

এমনি সুন্দর উপমায় গোবিন্দদাসের পদাবলী সমধিক সমৃদ্ধ। এই সকল উপমায় একটু নূতনত্ব আছে; কতকগুলি এত সুন্দর যে রাধাশ্যামের বর্ণনায় তাহারা এক রকম অপরিহার্যরূপে গৃহীত হইয়াছে। গোবিন্দদাসের কাব্যশিল্পে এই উপমাগুলি উজ্জ্বল মণির মত শোভাশালিনী।

কবি গোবিন্দদাস সকল বৈষ্ণব কবির মত রূপবর্ণনায় সুপটু; অধিকাংশ বৈষ্ণব কবির মত তিনি প্রিয়তমের মুখে—প্রিয়তমার ও প্রিয়তমার মুখে প্রিয়তমের রূপ বর্ণনা করিয়াছেন। এমন স্থলে একটু আধটু অত্যুক্তি সহজেই আসিয়া পড়ে, তাহা নিতান্ত অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয় না। ভালবাসার নিয়মই এই যে প্রিয়জনকে সর্ব্বগুণবিভূষিত ও সকল সৌন্দর্য্যের আধার বলিয়া প্রতিপন্ন করে। ইহাই ভালবাসার সাধারণ ধর্ম্ম। তাহার উপর শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা গোবিন্দদাসের ইষ্টদেবতা; সেই ইষ্টদেবতাদ্বয়ের রূপ বর্ণনা করিবার কালে তিনি সকল সময়ে আত্মসংযম রাখিতে পারেন নাই, মধুময়ী কল্পনা সাহায্যে তাঁহার ভক্তিপ্রবণ চিত্ত রাধাকৃষ্ণের অপূর্ব্ব মূর্ত্তি ধারণা করিয়া আমাদের চক্ষের সমক্ষে সজীব ভাবে বিচিত্রিত করিয়াছে। ভক্তের ভগবৎমূর্ত্তি-কল্পনা ও তাহার বর্ণনা বৈষ্ণব কবিতায় অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইত। গোবিন্দদাস শুধু রাধাকৃষ্ণের রূপ বর্ণনা করেন নাই, শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর রূপও বর্ণনা করিয়াছেন। গোবিন্দদাস শ্রীচৈতন্যের পরবর্ত্তী এবং তাঁহাতে মহাপ্রভুর শিক্ষার প্রভাব বিলক্ষণ প্রকাশিত। শ্রীচৈতন্যের শিক্ষা—"ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ নায়কশিরোমণি। নায়িকার শিরোমণি রাধাঠাকুরাণী।" গোবিন্দদাস শ্রীকৃষ্ণরাধাকে এই ভাবেই দেখিয়াছেন, এবং ভক্তিবিগলিত প্রাণে ভগবান্ ও তাঁহার হ্লাদিনীশক্তিকে এই হৃদয়োন্মাদক ভাবে ভাবিয়া নিজ ভক্তিসাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অতএব নায়ক ও নায়িকা-শিরোমণির রূপ কাজেকাজেই প্রথমে তাঁহাকে চিত্রিত করিতে হইয়াছে।*

চণ্ডীদাস যে উপাদানে শ্রীরাধার প্রণয়োৎপত্তি কল্পনা করিয়াছেন, গোবিন্দদাসও সেই সেই উপাদান তাঁহার শ্রীরাধার প্রেমোৎপত্তির হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

"পহিলে শুনলু হাম, শ্যাম দুই আখর
তৈখনে মন চুরি কেল।

* লেখক প্রণীত 'মধুর রস ও বৈষ্ণব কবি' দেখুন—উদ্বোধন ফাল্গুণ, ১৩১৬, ১২৫-২৭।

ইত্যাদি পদ চণ্ডীদাসের "সই কো শুনাইল শ্যাম নাম। কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো, আকুল করিল মোর প্রাণ" এই অমৃতময় পদের রূপান্তর মাত্র। কিন্তু গোবিন্দদাসের শ্রীরাধা চণ্ডীদাসের শ্রীরাধার মত পাগলিনী নহেন, বিদ্যাপতির শ্রীরাধিকার মত লালসাময়ী। গোবিন্দদাসের রাধা "যোগিনীর পারা" নহেন। তিনি লালসাময়ী সুন্দরী।

কিন্তু সে লালসার ভিতর দিয়াও তাঁহার প্রণয় কবি গোবিন্দদাসের চতুর লেখনীর মুখে বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে।

নিশসি নহারসি ফুটল কদম্ব।
করতলে বদন সঘন অবলম্ব॥
ক্ষণে তনু মোড়সি করি কত ভঙ্গ।
অবিরল পুলক মুকুল ভরু অঙ্গ॥

* * * * *

ভাব কি গোপসি গোপত না রহই।
মরমক বেদন বদনে সব কহই॥
যতনে নিবারসি নয়নক লোর।
গদগদ শবদে কহসি আধ বোল॥
আন ছলে অঙ্গ নয়নে ছলে পন্থ।
সঘনে গতাগতি করসি একান্ত॥
দূরে রহু গুরু জন গৌরব লাজ!
গোবিন্দদাস কহে পড়ল অকাজ॥

শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ কবি নিপুণ তুলিকার স্পর্শে বর্ণনা করিয়াছেন, ইহার ভিতর এক একটী কথা কবিত্বের পরাকাষ্ঠা—

রূপ নিরখিতে আঁখির লাজ
ভাসল নয়ন জলে।

শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগও কবি বেশ আঁকিয়াছেন

বঙ্কিম হাসি, বিলোকন অঞ্চলে
মঝু পর যো দিঠি দেল।
কিয়ে অনুরাগিণী, কিয়ে বিরাগিণী
বুঝইতে সংশয় ভেল॥

আবার

পেখণু ব্রজ নবনারী।
তরুণিম শৈশব লখই না পারি॥
হৃদয় নয়ন গতি রীতে
সো কিয়ে আন নহত পরতীতে।।
ঐছন হেরইতে গোরী।
হঠ সঞে পৈঠল মনমাহা মোরি॥

গোবিন্দদাসের পূর্ব্বরাগের চিত্রগুলি বড় উজ্জ্বল, বড় স্নিগ্ধ। এই সকল চিত্রে তাঁহার সহৃদয়তা বিশেষরূপে ব্যক্ত হইয়াছে। গোবিন্দদাসের শ্রীরাধা এক দিকে যেমন বিদ্যাপতির রাধিকার মত লালসাময়ী অপরদিকে তেমনি চণ্ডীদাসের রাধিকার মত প্রথম দর্শনাবধি প্রেমপরিপ্লুত-হৃদয়া। বিদ্যাপতির মত গোবিন্দদাস শ্রীরাধার বয়ঃসন্ধি বর্ণনা করেন নাই। আমরা যখন গোবিন্দদাসের কবিতায় প্রথম শ্রীরাধার দর্শন পাই, তখনই তিনি প্রেমমুগ্ধা যুবতী নায়িকা। তখন তিনি সখীর কথায়—

চৌদিকে চকিত, নয়ানে ঘন হেরসি
ঝাঁপসি ঝাঁপল অঙ্গ।
বচনক ভাঁতি বুঝই নাহি পারিয়ে
কাঁহা শিখলি ইহ রঙ্গ॥
সুন্দরি কি কেল পরিজনে বাঁচি।
শ্যাম সুনাগর গুপত প্রেমধন
জানয়ু হিয়া মাহা সাচি॥

তখনই তাঁহার "না জানি কি ব্যাধি

মরমে বাধল।” তখনই তিনি শ্যাম-মোহিতা ও শ্যাম-মোহিনী।

গোবিন্দদাসের শ্রীরাধার হৃদয়ে কৃষ্ণ-সম্ভোগ-লালসা যেমন প্রবল, কৃষ্ণের প্রতি প্রেমও তেমনি প্রবল। গোবিন্দ-দাসের রাধাকৃষ্ণ শুধু উভয়ের রূপ-বন্ধনে পরস্পর আবদ্ধ আছেন; দুই জনেই দুই জনের “প্রাণ লইয়া খেলা” করিয়াছেন দুই জনে দুইজনের রূপের উল্লাসে উন্মাদ-প্রীতি হৃদয়ে পোষণ করিয়াছেন—

রাধা মাধব ভাতি।
কো বিহি নিরমিল, কোন ঘটাওল
শ্যামর গোরী সাঙ্গাতি॥
যব দুহুঁ দুহুঁ হেরি, নয়ন অঞ্জলি ভরি
আন আন পীবইতে চাহ।
তনু তনু পৈঠত, সঘনে আলিঙ্গিত,
কৈছে হোয়ত নিরবাহ॥
আরতি অধর, সুধারস পীবি,
পীবি দুহুঁক পিরীতি উনমাদ।
গোবিন্দ দাস কহে, অধিক রস আবেশে,
কিয়ে নায়ক পরমাদ॥

“নয়ন অঞ্জলি ভরি” কি সুন্দর ভাব ব্যক্ত করিতেছে—আকাঙ্ক্ষার কি উন্মাদ মূর্ত্তি এই ক’টা কথায় অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে গোবিন্দদাসের নায়ক ও নায়িকার হৃদয়ে পরস্পরের জন্য এই আকাঙ্ক্ষা শুধু তাঁহার কাল্পনিক স্বপ্নমাত্র ছিল না; তাঁহারা যে মহাপুরুষের কাছে মধু-ররসাশ্রিত বৈষ্ণবধর্ম্ম শিক্ষা করিয়া-ছিলেন, সেই জগৎপূজ্য মহাপ্রভুর জীবনে এই সকল ভাব অহরহঃ স্ফুরিত হইতে দেখা গিয়াছিল।

“রা কহি ধা পঁহু কহই না পারিয়ে
ধারা ধরি বহে লোর।
সোই পুরুন মণি লোটায় ধরণী
পুণি কোহে আরতি ওর॥”

গোবিন্দদাস-বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের এই চিত্র একটী জীবন্ত চিত্রের প্রতিচ্ছবি, কল্পনা মাত্র নহে।

গোবিন্দদাস বৈষ্ণব কবিকুলের প্রথা মত মিলন-সম্ভোগ বর্ণনা করিয়াছেন। এই বর্ণনায় অনেকে অশ্লীলতা ভিন্ন আর কিছু দেখিতে প্রস্তুত নহেন, তাহা আমাদের অবিদিত নহে। এতৎ সম্বন্ধে আমার যাহা বক্তব্য তাহা আমি উদ্বোধন মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত করিয়াছি। * এখানে এইটুকু বলিলেই চলিবে যে বৈষ্ণব কবির গান যদি কেবল পার্থিব প্রণয়ের গান বলিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলেও এই সম্ভোগচিত্রগুলি স্বাভাবিক বৈ অস্বাভাবিক নহে, তাহা মনুষ্য-হৃদয়জ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন। ভালবাসার যাহা স্বাভাবিক পরিণতি তাহাই বৈষ্ণব কবি বর্ণিত করিয়াছেন; শুধু বৈষ্ণব কবি কেন সকল মহাকবিরাই ইহাই বুঝাইয়াছেন। শুধু এই কথা বলিয়া রাখিতে ইচ্ছা করি যে গোবিন্দদাসের সম্ভোগচিত্র কেবল শারীরিক সম্ভোগ নহে, ইহাতে মনের অংশও অনেক পরিমাণে আছে। এ গুলি ভারতচন্দ্রের ও তাঁহার শিষ্যগণের সম্ভোগচিত্রের মত নির্লজ্জ শারীরিক মিলনের একটা ক্ষণিক উত্তেজনা-সঞ্জাত নিরবচ্ছিন্ন দৈহিক আলিঙ্গনের চিত্র নহে।

* উদ্বোধন—১৩১৬ চৈত্র, ১৬১।

ইহাও লক্ষ্য করিতে পারা যায় যে এই সকল চিত্র অঙ্কিত করিবার কালে কবির হৃদয়ে কোনও কুভাব উদিত হয় নাই। বরঞ্চ ইহাদের ভিতর হইতে প্রেমের নিত্য নূতনত্ব ও বর্দ্ধনশীলতা বেশ প্রকটিত হইয়াছে, এবং কবির হৃদয়ে একটী অপার্থিব ভাব বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়।

দুই জন নিতি নিতি নব অনুরাগ।
দুহুঁ রূপ নিতি নিতি দুহুঁ হিয়ে জাগে॥
দুহুঁ মুখ চুম্বই দুহুঁ করু কোর।
দুহুঁ পরিরম্ভণে দুহুঁ ভেল ভোর॥
দুহুঁ দোহা যৈছন দারিদ হেম।
নিতি নিতি আরতি নিতি নব প্রেম॥
নিতি নিতি ঐছন করত বিলাস।
নিতি নিতি হেরই গোবিন্দ দাস॥

কবি গোবিন্দদাসের মন এ সকল বর্ণনার কালে কোথায়? তাঁহার দৃষ্টি কি নিতান্ত নীচ প্রবৃত্তি চালিত হইয়া এই অপূর্ব্ব যুগলমিলন দেখিয়াছে? যাঁহারা অত্যন্ত অন্ধভাবে বৈষ্ণব কবির চর্চ্চা করেন, তাঁহারাই এমন কথা বলিবেন। আমরা দেখিতে পাই যে মিলন-সম্ভোগ-বর্ণনা কালেই যেন কবির চিত্ত আরও ভক্তি-বিধৌত হইয়াছে, যেন তাঁহার আরও ইষ্ট-চরণে মতি বৃদ্ধি হইয়াছে, সেই বর্ণনার কালেই কবির লেখনী আরও সংযত হইয়াছে, আর সেই সময়েই

চরণে বেড়িয়া চারু অরুণ সরোরুহ
মধুকর গোবিন্দ দাস।

গোবিন্দদাসের সম্ভোগ-বর্ণনা কি জাতীয়, তাহা তাঁহার "রসোদ্‌গার" শীর্ষক কবিতা-গুলিতে প্রকাশিত।

হৃদয় মন্দিরে, মোর কানু ঘুমাওল,
প্রেম প্রহরী রহু জাগি।
গুরুজন গৌরব, চৌর সদৃশ ভেল,
দূরহিঁ দূরে রহু ভাগি॥
সজনি এতদিনে ভাঙ্গল ধন্দ।
কানু অনুরাগ— ভুজগে গরাসল,
কুল দাদুরি মতি মন্দ॥
আপনক চরিত আপনি নাহি সমুঝিয়ে
আন করত হোয় আন।
ভাবে ভরল তনু পরিজন বাঁচিতে
গ্রহপতি সপতিক ঠাম॥
নিদঁহু নিদঁ, নয়ানে না হেরিয়ে,
না জানিয়ে কি ভেল আঁখি।
অতএ পরমাদ, কহই না পারিয়ে,
গোবিন্দদাস এক সাখী॥

আমরা আরও দেখিতে পাই যে গোবিন্দ-দাসের কবিত্ব এ সকল বর্ণনায় উছলিয়া উঠিয়াছে, তিনি আর এখানে শুধু শিল্পী নহেন, তিনি এখানে যথার্থ কবি। কত সুন্দর ভাবে তিনি শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেম প্রকটিত করিয়াছেন। বাঙ্গালাসাহিত্যে তাহা একটী নূতন ভাবের প্রবাহ ছুটাইয়াছে। তাঁহার ভাব-প্রকাশ-শক্তি অসীম, সরস ও জটিলতা-দোষ-শূন্য।

মোর অঙ্গ সঙ্গ আশে, লালসা পাইয়া রসে
প্রাণনাথ বলে জিনু জিনু।
নিজ অনুগত জনে গণিয়া রাখিবে মনে
এ তনু তোমারে দিনু দিনু।
বন্ধুয়া বোলয়ে ধনি কালিয়া কস্তুরী খানি
ও রাঙ্গা চরণ তলে মাখি।
সখীর সমাজে তোর ঘোষণা রহুক মোর
নিগূঢ় মরম তার সাখী॥

বিদগধ শ্যাম রায় বীজন করয়ে গায়
আপনে ভুঞ্জায় গুয়া পান।
গোবিন্দ বলয়ে ধনি শুন ওগো ঠাকুরাণী
তুমি সে কানুর একপ্রাণ ॥

গোবিন্দদাসের হৃদয়ের প্রেম এই সকল চিত্র অবলম্বন করিয়া এক অতিশয় নিবিড় রসের প্রস্রবণ সৃষ্টি করিয়াছে—কবিত্বের শীতল বারিতে বাঙ্গালীর হৃদয় সিক্ত ও স্নিগ্ধ করিয়াছে।

ও নব নাগর, রসের সাগর,
আগোর সকল গুণে।
সে সব চরিত, আদর পিরীত
ঝুরিয়া মরি যে মনে ॥
পিরীতি বল, কত না ছল,
সে কি নাশে আকুতি সাধে।
মান নাশিয়া, মধুর ভাখিয়া
হাসিয়া মরম বাঁধে ॥
সে মোরে কোলেতে, করিয়া ভাবিয়া,
বদনে বদন দিয়া।
মধুর চুম্বিয়া বিধু বিড়ম্বিয়া
পরাণ লইল পিয়া ॥

ও দিঠি চাতুরী মুখের মাধুরী
লহরী কত বা আর।
এ সুখ শুনিতে, ঝুরিয়া মরয়ে
দাস গোবিন্দ ছার ॥

যদি যুগলমিলনের রসাস্বাদ করিবার ক্ষমতা আমাদের থাকে, তবে এই সকল কবিতা হইতে তাহা সাধিত হইবে ; মিলনে শুধু চপলতাই অভিব্যক্ত হয় না, প্রেমও ব্যক্ত হয়, তাহা বেশ বুঝা যাইবে।

গোবিন্দদাস ভক্ত কবি, প্রেমিক কবি। প্রেমের দীনত্ব তিনি এমন সুন্দর ভাবে বুঝাইয়াছেন যে তেমন আমরা চণ্ডীদাসের কাছেও বুঝি নাই।

একলি যাইতে যমুনার ঘাটে।
পদচিহ্ন মোর দেখিয়া বাটে ॥
প্রতি পদ চিহ্ন চুম্বয়ে কান।
তা দেখি আকুল বিকল প্রাণ ॥

এমন লালসা কি কেহ কখনও দেখিয়াছেন ? বাঙ্গালা-সাহিত্যে গোবিন্দদাস এ সকল অদ্ভুত ভাবের প্রথম পরিচায়ক –

আমার অঙ্গের সৌরভ পাইলে।
ঘুরি ঘুরি জনু ভ্রমরা বুলে ॥

এ লালসা ভক্তের প্রতি ভগবানের লালসা, শ্রীরাধার লালসা, ভগবানের প্রতি ভক্তের লালসা, এ কথা আবার যখন আমাদের মনে উদিত হয়, তখন আমাদের হৃদয় আনন্দে ও উল্লাসে উৎফুল্ল হইয়া উঠে। বৈষ্ণব কবির গানের যথার্থ মর্ম্ম অবগত হইলে যদি আমাদের এতদুর পরমলাভ, তবে অন্ধের ন্যায় কেন আমরা তাহা উপলব্ধি করিতে চেষ্টা না করিয়া নিজের ক্ষতি ও কবির অযথা নিন্দবাদ করিব ?

যথার্থ প্রেমের দৈন্য গোবিন্দদাস "মানের" চিত্রে উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন। মানের চিত্র প্রায় সকল বৈষ্ণব কবিই আঁকিয়াছেন, কিন্তু গোবিন্দদাসে এ বিষয় একটু সরসত্ব আছে, একটু নূতন সুর আছে। বোধ হয় এ কথা বলিলে নিতান্ত অন্যায় হইবে না যে, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসেও মানের চিত্র এত সরস নহে। গোবিন্দদাসের মানের চিত্রে; কতকগুলি চরিত্র বড় সুন্দর ফুটিয়াছে—শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র

ও সখী চরিত্র। শ্রীরাধার চরিত্রও বেশ কোমলত্ব লাভ করিয়াছে। মান বড় মিষ্ট যেখানে যথার্থ প্রণয় থাকে। সেই ভালবাসা গোবিন্দদাসের চিত্রে বড় মধুর রূপ ধারণ করিয়াছে।

সখী-চরিত্র বৈষ্ণব কবিতায় বড় উপাদেয়। নিঃস্বার্থতার মূর্ত্তি-স্বরূপিণী সখীগণ বৈষ্ণব কাব্যের অলঙ্কার-স্বরূপ। রাধাকৃষ্ণের মিলন সাধনই ইহাদের চরম সাধনা, ইহাতেই তাহাদের সুখ, ইহাতেই তাহাদের তৃপ্তি। মানে সখীদের চিত্র অত্যন্ত মনোহর। শ্রীরাধার হৃদয়ের সকল তত্ত্ব সখীদের কাছে বিদিত, যখন শ্রীরাধা কৃষ্ণকে প্রত্যাখ্যান, করিলেন, তখনই সখী বুঝিল যে রাধার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। সখীর কার্য্য আরম্ভ হইল। যখন রাধা কৃষ্ণকে বিদায় দিলেন, তখন সখী তাঁহাকে তীব্র তিরস্কার করিতেছে, কিন্তু যখন আবার রাধার অন্তঃকরণ ব্যথা-বিগলিত বলিয়া জানিতে পারিল, তখন যুগলমিলন সাধিত করিবার জন্য সখীর চেষ্টার অবশেষ রহিল না। সকলের অপেক্ষা ফুটিয়াছে শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র। স্বার্থহীন প্রেম গোবিন্দদাসের কৃষ্ণচরিত্রে সম্যক্ বিকশিত।

রাই অনাদর, হেরি রসিক বর,
অভিমানে করল পয়ান।
নয়নক লোরে পথ লখই না পারই
পীতবাসে মুছই বয়ান॥
হরি হরি নিজ অপরাধ না জান।
সো হেন রসবতী কতি লাগি নিরশল
কাহে করল মোহে মান॥
মোহে উপেখি রাই কৈছে জীয়ব
সো দুখ করি মান
রসবতী হৃদয় বিরহ জ্বরে জারব
ইথে লাগি বিদরে পরাণ॥
রাই সম্বাদ সুধারস সিঞ্চনে
তনু তিরপিত করু মোর।
গোবিন্দ দাস যব যতনে মিলাওব
তব যশ গাওব তোর।

গোবিন্দদাস শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রে যে সুন্দর নিঃস্বার্থতার আরোপ করিয়াছেন তাহা আমরা বিদ্যাপতির অথবা চণ্ডীদাসের মানের চিত্রেও দেখিতে পাই না, ইহা তাঁহার কম ক্ষমতার পরিচয় দেয় না। ইহাই তাঁহার কবিত্বের প্রধান কীর্ত্তিস্তম্ভ। কবি এই স্থলে তাঁহার মনুষ্য-চরিত্র-চিত্রণক্ষমতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন।

গোবিন্দদাসের প্রেম—সাধারণতঃ বৈষ্ণব কবির প্রেম—যে কি অলৌকিক পদার্থ তাহা যাঁহারা তাঁহার "প্রেম-বৈচিত্র্য" মনঃসংযোগ সহকারে চর্চ্চা করিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন। তাঁহারা বুঝিবেন যে বৈষ্ণব কবির "সম্ভোগ" ইন্দ্রিয়-চপলতা ও জঘন্য লালসার বিলাস-ক্ষেত্র-মাত্র নহে। মহাকবি চণ্ডীদাস তাঁহার অমর ভাষায় এই প্রেম-বৈচিত্র্যের সূত্রপাত করিয়াছেন—"দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া"। গোবিন্দদাসে "প্রেম-বৈচিত্র্য" আরও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে; তাঁহার চিত্রে "বিচ্ছেদ ভাবিয়া" নাই; পূর্ণ আলিঙ্গনের মধ্যেই পূর্ণ বিরহ। যাঁহারা পার্থিব প্রণয়ের কবি তাঁহারা মিলনে বিরহের আশঙ্কাটুকু পর্য্যন্তই ভাবিতে পারেন —

"I am afraid
Being in right, all this is but a dream,
Too fratterning, sweet to be substantial."
—Romeo Juliet.

চণ্ডীদাসের চিত্র ইহার অনেক উপরে। যে মিলনে বিরহের আশঙ্কা আছে সে মিলন ক্ষণিক ইন্দ্রিয়-সুখান্বেষণের মিলন নহে, চণ্ডীদাসের "দুহুঁ কোরে দুঁহু কাঁদে বিরহ ভাবিয়া" এই আমাদিগকে এই তথ্য শিক্ষা দেয়। কিন্তু গোবিন্দদাসের

রোদিতি রাধা শ্যাম করি কোর।
হরি হরি কাঁহা গেও প্রাণনাথ মোর॥
জানসু রে সখি প্রেম আগয়ান।
নাগর কোরে নাগরী নাহি জ্ঞান॥
মূরছলি নাগর মূরছলি রাই।
বিরহে বিয়াকুল কুল না পাই॥

আরও গভীরতর তত্ত্ব প্রচার করিতেছে। গোবিন্দদাস আমাদিগকে শিখাইয়াছেন যে প্রেম অপার্থিব সামগ্রী, ইহা অঙ্গের সঙ্গ দ্বারা ধরা যায় না; রাধাকৃষ্ণের যে অপার্থিব ভালবাসা তাহাতে অঙ্গসঙ্গের উপলব্ধি পর্য্যন্ত নাই। বৈষ্ণব কবির ভালবাসার আধ্যাত্মিকতা এইখানে উজ্জ্বল বর্ণে নির্দ্দেশিত হইয়াছে। প্রেমের অস্তিত্ব অঙ্গসঙ্গে নহে, প্রেমের স্থান হৃদয়ে। তাই কবি গোবিন্দদাস বলিয়াছেন, যে অসীম লালসায় বিচলিত হইয়া শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের মিলন কামনা করিয়াছিলেন, সেই লালসার সম্পূর্ণ পরিণতি ফল প্রাপ্তির কালেই এই প্রেমিক যুগল বুঝিতে পারিলেন যে, সম্পূর্ণ দৈহিক মিলনেই পূর্ণ বিরহাবস্থা উপস্থিত হয়। বিদ্যাপতি প্রেমের লালসা, চণ্ডীদাস প্রেমের উন্মাদ ও গোবিন্দদাস প্রেমের আধ্যাত্মিকতা দেখাইয়াছেন। বৈষ্ণব কবিতার পবিত্র ভাবে অনুপ্রাণিত আধুনিক ক্ষমতাশালী কবি রবীন্দ্রনাথ গোবিন্দদাসের এই চিত্রের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিয়া লিখিয়াছেন—"হৃদয়ের ধন কিরে ধরা যায় দেহে"। প্রেম-বৈচিত্র্যে প্রেমের আদর্শ ও আধ্যাত্মিকতা চিত্রিত হইয়াছে।

প্রেমের সাধনায় লালসা বড় উপকারী। তীব্র লালসা মনে না আসিলে আকাঙ্ক্ষিতের জন্য লালায়িত হইতে পারা যায় না। যদি প্রাণ ঢালিয়া ভাল বাসিয়াছ ত হৃদয়ে প্রিয়-সঙ্গের জন্য অসীম লালসা পোষণ কর, তোমার প্রতি অঙ্গকে বাঞ্ছিতের প্রতি অঙ্গের আশ্লেষ-সুখ-সম্ভোগের অমৃত রসাস্বাদনে প্রেরিত কর; তবে ইষ্টলাভ কামনা হৃদয়ে জাগিয়া থাকিবে। রূপ—রূপ নয়, যে অবধি সে রূপ প্রিয়তমের সুখ উৎপাদন না করে; অঙ্গ—অঙ্গ নয়, যে অবধি তাহার দ্বারা প্রিয়তমের সেবা না হয়; দেহ—দেহ নয়, যে অবধি তাহা প্রিয়তমের ভোগার্থ উৎসর্গীকৃত না হয়। মনকে সর্ব্বদা প্রিয়-চিন্তায় নিযুক্ত রাখ। কিন্তু মনে আকাঙ্ক্ষার বা লালসার বিন্দুমাত্র লোপ করিও না। মনের সমস্তটাই প্রিয়তমের সঙ্গ-কামনারূপ অতল জলে ডুবাইয়া দাও। গোবিন্দদাসের পদাবলীর প্রথম স্তর এই ভাবে বিরচিত। গোবিন্দদাসের প্রথম স্তরে কেবল সৌন্দর্য্য ও লালসা, রূপ ও আকাঙ্ক্ষা। এখানে

দেখিবে রূপের জয়, রূপতৃষ্ণা, আসঙ্গলিপ্সা, মিলনের চাঞ্চল্য, হৃদয়ের তরলতা মান অভিমান, সকলই কিন্তু একটী সুবর্ণসূত্রে গ্রথিত অনন্ত ভালবাসা। তিনি বলিতেছেন তুমি মনে মনে ভালবাস, তাহাতে তোমার প্রিয়তমের কি আসে যায়, তোমার যাহা কিছু—দেহ, মন, ইন্দ্রিয়—সব তাঁহাকে অর্পণ কর, তাঁহার রূপসম্ভোগ-তৃষ্ণা মিটাও, তোমার অঙ্গ-সঙ্গ-কামনা চরিতার্থ কর, প্রিয়তমকে বুকে রাখ; মনকে সাক্ষীস্বরূপ এ সকল কাজেই নিযুক্ত কর, কিন্তু তাহার বেশী এখন আর তাহার কর্ত্তব্য নাই, তাহার বেশী তাহাকে আর কিছু করিতে দিও না। লালসার দ্বারা প্রিয়তমকে লাভ কর। স্বভাবজ্ঞ কবি এই স্তরে মনুষ্য-স্বভাবের নিখুঁত ছবি তুলিয়াছেন।

তাঁহার দ্বিতীয় স্তরে উপস্থিত হইয়া আমরা প্রেম-সাধনার দ্বিতীয় তত্ত্ব জানিতে পারি। প্রেম-বৈচিত্র্য এই স্তরের অন্তর্গত। ইহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে লালসা দ্বারা প্রিয়তমের কাছে উপনীত হইয়া ইন্দ্রিয় দ্বারা তাঁহাকে অনুভব করিবার ইচ্ছা করা স্বাভাবিক বটে, কিন্তু ইন্দ্রিয় দ্বারা তাঁহাকে ধরিবার উপায় নাই, সেই অমৃত স্বরূপের কাছে ইন্দ্রিয়গ্রাম পরাভূত, ইন্দ্রিয়ের কার্য্য একেবারে বিলুপ্ত, ইন্দ্রিয় দ্বারা তাঁহার অনুভূতি হইয়াও হয় না। এখানে আর গোবিন্দদাস প্রণয়ের কথা কহিতেছেন না, এখানে তিনি প্রেমের কথা, ভক্তির কথা কহিতেছেন। এখানে আর তাঁহার নায়ক-নায়িকা নরনারী নহে, ভক্ত ও ভগবান্। কিন্তু তাঁহার যে অমৃতময় উপদেশ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার মিলন-ব্যপদেশে বিবৃত হইয়াছে, তাহা যদি পার্থিব প্রণয়ের আদর্শ করিয়া লইতে পারি, তাহা হইলেও আমাদের অশেষ উপকার।

গোবিন্দদাসের তৃতীয় স্তর আরও উপাদেয়। এই স্তরে শ্রীরাধার বিরহ, দিব্যোন্মাদ, ভাবোল্লাস, ও ভাবসম্মিলন বর্ণিত হইয়াছে। এখানে উপস্থিত হইয়া গোবিন্দদাস দেহ বিস্মৃত হইয়াছেন, যে টুকু ইন্দ্রিয়-স্মৃতি আছে, তাহাও আর স্বার্থ-ময়ী নহে, যে টুকু ইন্দ্রিয়ের আকাঙ্ক্ষা আছে, তাহাও আধ্যাত্মিকতায় উন্নীত হইয়াছে। এমন ইন্দ্রিয়ের মধ্যে জাগরূক আছে মন; আর জাগিয়াছে মনের প্রবর্ত্তক আত্মা। এখন রসাস্বাদ, সম্ভোগ-বাসনার পরিবর্ত্তে আছে একীকরণ বাসনা, আপনাকে সম্পূর্ণরূপে প্রেমাস্পদের সহিত মিশাইয়া দিবার বাসনা—হৃদয় দিয়া বাঁধিবার আকুল আকাঙ্ক্ষা। এখন শ্রীরাধার মনে দেহের কথা আসে না, আসে প্রাণের কথা; নিজের সুখের কথা আসে না, কেবল বঁধুর সুখের চিন্তা লইয়া, বঁধুর স্মৃতি লইয়া, তাঁহাকে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিবার কামনা লইয়া এখন তাঁহার দিন কাটিতেছে। গোবিন্দদাস এই খানে কবিত্বের উচ্চতম সোপানে আরোহণ করিয়া অমর সঙ্গীত গাহিয়াছেন:—

এই তো মাধবী তলে, আমার লাগিয়া পিয়া
যোগী যেন সতত ধেয়ায়।
পিয়া বিনে হিয়া কেন ফাটিয়া না পড়ে গো
নিলাজ পরাণ নাহি যায়॥

প্রভৃতি পদ হৃদয়ের অন্তঃস্তল আলোড়িত

করিয়া চণ্ডীদাসের মর্ম্ম-গীতির প্রতিধ্বনি আনয়ন করে। পিয়ার বিরহে বিরহিণী রাধিকার শরীর আর শরীর নাই, জীবনে আস্থা নাই, কেবল মর্ম্মভেদী গভীর ক্রন্দন।

মো যদি জানিতাম পিয়া যাবেরে ছাড়িয়া।
পরাণে পরাণ দিয়া রাখিতাম বাঁধিয়া॥

নবপ্রবুদ্ধা রাধিকার চৈতন্য ফিরিয়া আসিয়াছে, তাঁহাতে মনের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে, আত্মার কাজ আরম্ভ হইয়াছে; এখন তাঁহার কাছে শরীর নিতান্ত ছার, প্রাণ উপেক্ষার বিষয়—

এ ছার শরীরে রহে নিলাজ পরাণি।

যাঁহার মান-অভিমান, সাজ-সজ্জা, চাঞ্চল্য ছিল, তাঁহার এখন একমাত্র চিন্তা

সো গুণনিধি যদি প্রেম হামে ছোড়।
তিল এক হেরইতে লাজ বহু মোর॥
জমু বড় বাসল হৃদি মাহা এহ।
কিয়ে সুখ লাগি ভষম নহ দেহ॥

এখন সেই মানিনী, গর্ব্বিতা শ্রীরাধা, যিনি কথায় কথায় শ্রীকৃষ্ণকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, সেই প্রেম-দর্পিতার ঐকান্তিক বাসনা—

জনমে জনমে হউ সে পিয়া আমার।
বিধি পায়ে মাঙ্গ মুক্তি এই বর সার॥

যে রাধিকা মিলনের সময়ে বলিয়াছিলেন—

আমার অঙ্গের সৌরভ পাইলে।
ঘুরি ঘুরি যেন ভ্রমরা বুলে॥

তিনিই এখন সেই অঙ্গের একমাত্র সদ্ব্যবহার করিতে চাহেন কেমন করিয়া?

যাঁহা পহু অরুণ চরণে চলি যাত।
তাঁহা তাঁহা ধরণী হইও মঝু গাত॥
যো দরপণে পহু নিজ মুখ চাহ।
হাম অঙ্গ জ্যোতিঃ হইও তছু মাহ।
যো সরোবরে পহু নিতি নিতি নাহ।
হাম অঙ্গ জ্যোতিঃ হইও তছু মাহ॥
যোই বীজনে পহু বীজইত গাত।
মঝু অঙ্গ তাহে হইও মৃদু বাত॥
যাঁহা পহু ভরমই জলধর শ্যাম।
মঝু অঙ্গ গগন হইও তছু ঠাম॥

ইহা ভক্তের আত্মসমর্পণ সত্য, কিন্তু প্রেমের আত্মসমর্পণ ও ভক্তির আত্মসমর্পণে প্রভেদ নাই, যাহা ভক্তের আত্মসমর্পণ তাহাই প্রেমিকের আত্মসমর্পণ। এমনি মধুর নিঃস্বতায় গোবিন্দদাসের পদাবলী সমাপ্ত হইয়াছে, এমনি দীনতায় তাঁহার শ্রীরাধার বিরহ-তপস্যার পরিসমাপ্তি হইয়াছে।

শুন সুন্দর শ্যাম ব্রজ বিহারি।
হৃদি মন্দিরে রাখি তোমারে হেরি॥
গুরুজন গঞ্জন অঙ্গভূষা।
রাধাকান্ত নিতান্ত তব ভরসা॥
শৈলসম কুলমান দূর করি।
তব চরণে শরণাগত কিশোরী॥
আমি কুরূপা গুণহীনা গোপনারী।
তুঁহি জগরঞ্জন মোহন বংশীধারী॥
আমি কুলটা কলঙ্কী সৌভাগ্যহীনী।
তুঁহি রস পণ্ডিত রসিক চূড়ামণি॥

শ্রীরাধার সহিত সায় দিয়া ভক্ত কবি কহিয়াছেন—

গোবিন্দদাস কহে শুন শ্যামরায়।
তুয়া বিনে মোর মনে আন নাহি ভায়॥

এইরূপ ভক্তিমিশ্র আত্ম পুষ্পাঞ্জলি প্রিয়তমের পবিত্র চরণে ভক্তি-নম্র হৃদয়ে প্রেম-বিগলিত চিত্তে সমর্পণ করিয়া ভক্ত কবি গোবিন্দদাস তাঁহার পদাবলীর উপসংহার

করিয়াছেন আমরাও কি তাঁহার সহিত বলিতে পারিব—

তুয়া বিনে মোর মনে আন নাহি ভায় ?

গোবিন্দদাসের কবিত্বের এই যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় লইয়াই আমরা বুঝিতে পারিলাম যে তাঁহার শিল্পকৌশল বিচিত্র, তাঁহার কবিত্ব সরস ও প্রগাঢ়। বৈষ্ণব সাহিত্যে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও গোবিন্দদাস তিনটী উজ্জ্বল নক্ষত্র। বিদ্যাপতি রসিক, চণ্ডীদাস ও গোবিন্দদাস ভক্ত, তিন জনেই প্রেমিক, তিন জনেরই কবিত্ব বঙ্গসাহিত্যে এক অভাবনীয় ভাব-বন্যার সৃষ্টি করিয়াছে, প্রেমরাজ্যে এক অভূতপূর্ব্ব উল্লাসের অবতারণা করিয়াছে, বৈষ্ণব দার্শনিকের পথ সুগম করিয়াছে, বৈষ্ণব ভক্তের হৃদয়ে মন্দার-সুরভি মলয়ানিল প্রবাহিত করিয়াছে, প্রেমিকের প্রেমতৃষ্ণা মিটাইয়াছে, ভবিষ্যৎ কবির ভাব-প্রসূন বিকশিত করিয়াছে, সাহিত্যসেবী মাত্রেরই হৃদয়ে পবিত্র আনন্দের উৎস উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে।

শ্রীজিতেন্দ্রলাল বসু।

মানবের জন্মকথা। *

সমস্ত মানবকে যদি একটী জাতি মনে করা যায় তবে এই জাতির বিস্তৃতি অত্যন্ত অধিক দেখা যায়। কিন্তু ইহার কতিপয় বর্গের বিস্তৃতিও সামান্য নহে। জীব-বিজ্ঞানের এক সুপরিজ্ঞাত নিয়ম এই যে, সংকীর্ণ জাতি অপেক্ষা বিস্তৃত জাতি অধিকতর পরিবর্ত্তনশীল। মানবের পরিবর্ত্তনশীলতা বিস্তৃত জাতির পরিবর্ত্তনশীলতার সহিত তুলনীয়; গৃহপালিত জন্তুর পরিবর্ত্তনের সহিত তাদৃশ তুলনীয় নহে।

মানবের এবং ইতর জন্তুগণের পরিবর্ত্তন একই প্রকার সাধারণ কারণ হইতে উৎপন্ন হয়। শুধু তাহাই নহে, উভয়ের দেহের তুল্যাংশগুলিও প্রাণতুল্য রূপেই পরিবর্ত্তিত হয়। গড্রুণ এবং কোয়াতারফেজেস্ এই কথা এত বিশদরূপে প্রমাণ করিয়াছেন যে, তাঁহাদিগের গ্রন্থের কথা উল্লেখ করিলেই আমার পক্ষে যথেষ্ট হইতে পারে। ঈষৎ পরিবর্ত্তন, যাহা ক্রমে ক্রমে অতি বিকৃতাবস্থায় পরিণত হয়, তাহাও মানবে এবং ইতর জন্তুতে এত

* Lobule—নতি
Cartilege—কোমলাস্থি।
Coccum—অন্ধান্ত্র।
Vertebra—কশেরু, মেরুদণ্ডাস্থি।
Sacrum—ত্রিকাস্থি।
Convoluted—কুণ্ডলীকৃত।
Monstrosity—বিকৃতি।
Optic-nerve—দর্শন-স্নায়ু।
Humerus—প্রগণ্ডাস্থি।
Ulna-radius—প্রকোষ্ঠাস্থি।
Development—পরিবর্দ্ধন, বিবর্দ্ধন
Growth—বৃদ্ধি।
Anatomy—গঠন বিদ্যা
Coustitution—ধাতু।
Molar Bone—গণ্ডাস্থি।
Metatarsus—প্রপদাস্থি, পদাস্থি
Metacarpus—করভাস্থি।
Cornua—শৃঙ্গ (জরায়ুর)।

সমভাবাপন্ন যে তাহাদিগকে তুল্যরূপেই শ্রেণী বিভাগ করা যায়, এবং তুল্য নামাকরণও করা যাইতে পারে; জিওফ্রী সেণ্ট হিলেয়ার ইহা প্রদর্শন করিয়াছেন। গৃহপালিত জন্তুগণের পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে আমি যে পুস্তক রচনা করিয়াছি, তাহাতে পরিবর্ত্তনের কারণ সকল মোটামোটি নিম্নলিখিত ভাগে বিভক্ত করিয়াছি। (১) অবস্থার পরিবর্ত্তনে যে সকল নির্দ্দিষ্ট পরিবর্ত্তন সাক্ষাৎস্বরূপে উৎপন্ন হয়, যদ্দারা একবর্গীয় সমস্ত অথবা প্রায় সমস্ত প্রাণীই তুল্য অবস্থায় তুল্যরূপে পরিবর্ত্তিত হয়। (২) দীর্ঘকাল কোন অঙ্গের ব্যবহারে অথবা অব্যবহারে যে পরিবর্ত্তন উৎপন্ন হয়। (৩) তুল্য অঙ্গের সংযোজন। (৪) অধিকাঙ্গের * অতিমাত্র পরিবর্ত্তন। (৫) ক্ষতিপূরণ;† কিন্তু মানবে আমি এই নিয়মের উত্তম দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হই নাই। (৬) এক অঙ্গের চাপবশত অন্য অঙ্গের যে পরিবর্ত্তন হয়; যেমন বস্তিগহ্বরের চাপে গর্ভস্থ ভ্রূণের করোটির আকার-পরিবর্ত্তন। (৭) পরিবর্দ্ধন রুদ্ধ হওয়ায় কোন অঙ্গের খর্ব্বতা অথবা লোপ-প্রাপ্তি। (৮) যে অঙ্গ কোন পূর্ব্ববর্ত্তী প্রাণীর ছিল কিন্তু পরবর্ত্তী প্রাণীদেহে উৎপন্ন হয় নাই, তৎপরিবর্ত্তিগণের মধ্যে কাহারও দেহে সেই অঙ্গের পুনরুৎপত্তি, ইহা পুনরাবর্ত্তন-বশত হইয়া থাকে। * (৯) সহ-পরিবর্ত্তন। এই সকল তথাকথিত বিধান সকল মনুষ্যে এবং ইতর জন্তুতে তুল্যরূপেই খাটে; এবং এ সকল মধ্যে অনেকগুলি উদ্ভিদেও প্রযোজ্য। সকলগুলির আলোচনা করা এ স্থলে বাহুল্য মাত্র; কিন্তু কতকগুলি এত গুরুতর যে এ স্থলে তাহাদিগের বিস্তৃত আলোচনা করা অত্যাবশ্যক।

অবস্থার পরিবর্ত্তনে সাক্ষাৎস্বরূপে নির্দ্দিষ্ট পরিবর্ত্তন।—এইটী অতীব জটিল বিষয়। ইহা অস্বীকার করা যায় না যে, অবস্থার পরিবর্ত্তনে সকল জীবদেহেই কিছু কিছু, কখন বা গুরুতর, পরিবর্ত্তন উৎপন্ন হয়। প্রথমে মনে হয় যেন দীর্ঘ সময় পাইলে এইরূপ ফল সর্ব্বত্রই উৎপন্ন হওয়া সম্ভব। কিন্তু এই সিদ্ধান্তের সানুকূলে আমি পরিষ্কার প্রমাণ প্রাপ্ত হই নাই; পক্ষান্তরে ইহার প্রতিকূলেও সঙ্গত আপত্তি উত্থাপন করা যাইতে পারে। অন্তত যে সকল অসংখ্য দেহাংশ বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনসিদ্ধির উপযোগী, তাহাদিগের সম্বন্ধে ত বিপরীত তর্ক উপস্থিত হইতে পারে-ই। পরিবর্ত্তিত অবস্থা হইতে যে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিবর্ত্তন উৎপন্ন হইতে পারে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। ইহাতে সমস্ত জীবদেহটাই পরিবর্ত্তনশীল হইয়া পড়ে।

আমেরিকার যুক্তরাজ্যে ১০,০০,০০০ দশ লক্ষ সৈন্যের দেহ মাপ করা হইয়াছিল।

---

* যদি কোন অঙ্গ অতিরিক্ত থাকে, যথা ৬টী অঙ্গুলি থাকিলে, তবে যেটা অতিরিক্ত, তাহার পরিবর্ত্তনও কিছু বেশী মাত্রায় হইয়া থাকে।

† কোন অঙ্গের ক্ষতি হইলে অন্য অঙ্গ বা তাহার ক্রিয়া কিছু বর্দ্ধিত হইয়া ঐ ক্ষতি পূরণ করে।

‡ একব্যক্তির দেহে ও বিভিন্ন অঙ্গে এই রূপ হইতে পারে।

* পুনরাবর্ত্তন বিধি আর পূর্ব্ববৎ স্বীকৃত হইতেছে না। এক্ষণে লুপ্ত অঙ্গের, কিম্বা বর্ণের পুনরাবির্ভাব মেণ্ডেলের বিধান অনুসারে ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে।

উহারা গত যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। উহারা যে যে প্রদেশে জন্মিয়াছিল ও যে যে প্রদেশে প্রতিপালিত হইয়াছিল, তাহা লিপিবদ্ধ করা হইয়াছিল। ইহাতে দেখা গেল যে স্থানীয় কারণ সকল সাক্ষাৎস্বরূপে সৈন্যগণের দৈর্ঘের তারতম্য উৎপাদন করিয়াছিল। ইহাতে আরও বুঝা গেল যে "যে প্রদেশে উহারা বংশানুক্রমে জন্মিয়াছিল তাহার এবং জন্মাবধি অধিকাংশ কাল যে প্রদেশে বৰ্দ্ধিত হইয়াছিল তাহার, উভয়েরই অবস্থানুসারে দৈর্ঘ্য স্পষ্টত নিয়মিত হয়। যথা, "বৃদ্ধির সময় যাহারা পশ্চিম প্রদেশে বাস করিয়াছিল তাহাদিগের দৈর্ঘ্য বাড়িয়া গিয়াছিল"। পক্ষান্তরে দেখা যায় যে নাবিকগণের জীবন যেরূপ ভাবে অতিবাহিত হয়, তাহাতে নিশ্চয় তাহাদিগের শরীরের বিনাশ, কম হয়। "১৭।১৮ বৎসর বয়সের সৈন্য ও নাবিকদিগের মধ্যে দৈর্ঘ্যের অনেক প্রভেদ দৃষ্ট হয়।" মিষ্টার বি, এ, গোণ্ড দৈর্ঘ্যের এইরূপ পরিবর্ত্তনের কারণ নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি কৃতকার্য্য হন নাই। তিনি কেবল এইমাত্র স্থির করিয়াছিলেন যে জলবায়ু উহার কারণ নহে, প্রদেশের উচ্চতাও কারণ নহে, মাটির অবস্থাও নহে, বিলাসোপকরণের সদ্ভাব কি অভাবও উহার বিশেষ কারণ নহে। ফ্রান্সের বিভিন্ন প্রদেশের সৈন্যগণের দৈর্ঘ্য মাপিয়া যে তালিকা সংগ্রহ হইয়াছিল, ডিগার্ম্মি তাহা পর্য্যালোচনা করিয়া যেরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, মিষ্টার গোণ্ডের সিদ্ধান্ত তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। একই পলিনেসিয়া দ্বীপের দলপতিদিগের দৈর্ঘ্যের সহিত নিম্নশ্রেণীস্থ ব্যক্তিগণের দৈর্ঘ্য তুলনা করিলে, একই সমুদ্রের আগ্নেয় উৎপাত জাত উর্ব্বর প্রবালদ্বীপের অধিবাসীদিগের সহিত অনুর্ব্বর অনুচ্চ প্রবালদ্বীপ সমূহের অধিবাসিগণের দৈর্ঘ্য তুলনা করিলে, ফিউজিয়ানদিগের দেশের পূর্ব্ব ও পশ্চিম উপকূলের অধিবাসিগণের দৈর্ঘ্য তুলনা করিলে,—(পূর্ব্বে ও পশ্চিমে আহার-সংস্থানের ইতরবিশেষ আছে,)—এই সকল তুলনা করিলে এ সিদ্ধান্ত অস্বীকার করা অতীব অসম্ভব যে, উত্তম আহার এবং অধিক আরাম ও সুবিধাবশত দৈর্ঘ্যের তারতম্য হয়। কিন্তু উপরে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহাতেই ইহা বুঝা যাইতেছে যে এ বিষয় স্থির মীমাংসা করা কত কঠিন। ডাক্তার বিডো সম্প্রতি প্রমাণ করিয়াছেন যে, ব্রিটসের অধিবাসিগণ মধ্যে নগরে বাস এবং কোন কোন বিশেষ ব্যবসা অবলম্বন হেতু আকৃতি খর্ব্ব হয়। তিনি বিবেচনা করেন যে ঐ খর্ব্বাকৃতি কিয়দংশে বংশানুগত হয়। যুক্তরাজ্যেও তদ্রূপই হয়। ডাঃ বিডো বিশ্বাস করেন যে, যে স্থলে কোন মানব-বর্গ দৈহিক বৃদ্ধির চরম সীমায় উপনীত হয়, সে স্থলে তাহার মানসিক শক্তি এবং তেজস্বিতাও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উন্নত হয়।

বাহ্যিক অবস্থা পরিবর্ত্তনবশত মানব সাক্ষাৎস্বরূপে অন্য কোন বিষয়ে পরিবর্ত্তিত হয় কি না, তাহা জানা যায় নাই। জলবায়ুর পরিবর্ত্তনে মানবের বিশেষ পরিবর্ত্তন হইবে, এরূপ আশা করা যায়; কারণ

তাপের ন্যূনতা হইলে ফুস্‌ফুস্ ও মূত্রপিণ্ড অধিক ক্রিয়াশীল হয়, এবং বৃদ্ধি হইলে যকৃৎ ও চর্ম্মের ক্রিয়াশক্তি বর্দ্ধিত হয়, আলোক এবং উত্তাপবশতঃ চর্ম্মের বর্ণ এবং কেশের আকৃতির ইতর বিশেষ হয়, এইরূপ পূর্ব্বে বিবেচনা করা হইত। যদিও কিছু কিঞ্চিৎ হওয়া অস্বীকার করা যায় না, তথাপি প্রায় সকল পরিদর্শকগণই এখন এক বাক্যে বলিতেছেন যে বর্ণ ও কেশের আকৃতি সম্বন্ধে আলোক অথবা উত্তাপের ক্রিয়া থাকিলেও অতীব কম। এমন কি বহুযুগ উহারা ক্রিয়া করিলেও বিশেষ কিছু ফল দেখা যায় না। যাহা হউক, মানবজাতির বিভিন্ন বর্ণের বিষয় যখন আলোচনা করিব সেই সময়ই এই বিষয় বিবেচনার যোগ্য হইবে। আমাদিগের গৃহপালিত জন্তুগণের চুল বা রোম-বৃদ্ধি সাক্ষাৎস্বরূপে হিম ও শৈত্য দ্বারা আক্রান্ত হয়, এরূপ বিবেচনা করিবার কারণ আছে। কিন্তু মানবের এইরূপ হওয়ার কোন প্রমাণ আমি পাই নাই।

কোন অঙ্গের অধিক ব্যবহার অথবা অব্যবহারের ফল।—ইহা সকলেই জানেন যে কোন ব্যক্তির পেশির ব্যবহার থাকিলে উহা সবল হয়, এবং ব্যবহার না থাকিলে, অথবা পেশি-চালক স্নায়ু বিনষ্ট হইলে ঐ পেশি দুর্ব্বল হয়। চক্ষু নষ্ট হইলে দর্শন-স্নায়ু হ্রস্ব ও অকর্ম্মা হয়। একটী ধমনীকে বাঁধিলে, (বাঁধাস্থানের উপর দিকে) পার্শ্বের প্রণালীগুলির ব্যাস ত বৃদ্ধি হয়-ই, উহাদিগের বহিরাবরণও অধিক পুরু এবং সবল হয়। একটী মূত্রপিণ্ড পীড়াবশতঃ অকর্ম্মা হইলে দ্বিতীয়টী আয়তনে বাড়ে, এবং দ্বিগুণ কর্ম্ম করে। অধিক ভার বহিতে বহিতে অস্থি অধিক পুরু হয় এবং দীর্ঘ হয়। ব্যবসায় ভেদে দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরিমাণও বিভিন্ন হয়; অর্থাৎ দীর্ঘকাল কোন ব্যবসা করিলে অঙ্গও তদুপযোগী ভাবে পরিবর্ত্তিত হয়। (আমেরিকার) যুক্তরাজ্যের কমিশন অবধারণ করিয়াছেন যে, গত যুদ্ধে যে সকল নাবিক কার্য্য করিয়াছিল, তাহাদিগের জঙ্ঘা সৈন্য-দিগের জঙ্ঘা অপেক্ষা প্রায় $\frac{1}{4}$" ইঞ্চি অধিক দীর্ঘ; কিন্তু সৈন্যদিগের দেহ অপেক্ষা নাবিকদিগের দেহ হ্রস্ব। নাবিকদিগের প্রগণ্ড (অর্থাৎ হাত) সৈন্যদিগের হাত অপেক্ষা প্রায় $1\frac{1}{25}$" ইঞ্চি ছোট, সুতরা দেহের অনুপাত অনুসারে অমিল দেখায়। নাবিকদিগের হাতের ব্যবহার অধিক, সুতরাং হাত ছোট হইয়া যাওয়া এক আশ্চর্য্য ঘটনা, কিন্তু নাবিকগণের হস্ত প্রায়শঃ টানা-কার্য্যে* ব্যবহৃত হয়, ভারবহা-কার্য্যে নহে। সৈন্যদিগের অপেক্ষা নাবিক-দিগের গ্রীবা এবং পাদোর্দ্ধভাগ অধিক মোটা; কিন্তু বক্ষের, কটির ও নিতম্বের পরিধি কম।

বংশানুক্রমে দীর্ঘকাল ঐ সকল কর্ম্ম করিলে উপরের বর্ণিত পরিবর্ত্তনগুলি বংশানুগত হইবে কি না তাহা জানা যায় না; কিন্তু হওয়া সম্ভব। † পায়াগ্না ইণ্ডিয়ান-দিগের জঙ্ঘা সরু এবং বাহু মোটা। রেঙ্গার

* দড়ি টানা, পাল টানা ইত্যাদি।

† ওয়াইস্‌ম্যান প্রমুখ পণ্ডিতগণ বলেন যে কোন কালেও বংশানুগত হইতে পারে না।

বিবেচনা করেন যে উহারা বংশানুক্রমে নৌকায় বাস করে, তাহাতে উহাদিগের পায়ের বেশি ব্যবহার নাই, সুতরাং ঐরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এই প্রকার অন্যান্য স্থলে অপর লেখকগণও এইরূপ কারণই অনুমান করেন। ক্রান্‌ৎস্‌ এস্‌কুইসক্‌-দিগের মধ্যে বহু দিন বাস করিয়াছিলেন; তিনি বলেন যে সিল-শিকারে দক্ষতা বংশানুগত বলিয়া উহাদিগের বিশ্বাস। এ বিশ্বাসের মূলে কিছু আছে, কারণ শৈশবে পিতৃবিয়োগ হইলেও এস্‌কুইসক্‌ বালক পিতার ন্যায় সিল-শিকারে দক্ষ হইয়া থাকে।* কিন্তু এ স্থলে দেহ-গঠনের ন্যায় মনের উৎকর্ষতাও বংশানুগত হয় বলিয়া বিবেচনা করা যায়। অনেকে বলেন ইংরাজ শ্রমজীবিগণের হস্ত ভদ্রলোকের হস্ত অপেক্ষা জন্মাবধিই দীর্ঘ। হস্তপদের সহিত হনুর (চুয়ালের) যেরূপ সমপরিবর্ত্তন হইয়া থাকে, অন্তত কতিপয় স্থলে যেরূপ জানা গিয়াছে, তাহাতে বোধ হয় যে, যে সকল ব্যক্তির হস্তপদের ব্যবহার কম, তাহাদিগের হনুর আয়তনও এই কারণ-বশতঃ কমিয়া যাইতে পারে। শ্রমজীবী এবং অসভ্যদিগের অপেক্ষা সভ্য মানবের হনু সাধারণতঃ ছোট, ইহা নিশ্চিত। অসভ্যগণ কাঁচা খাদ্য খায়, রন্ধন করে না। এই সকল কাঁচা, মোটা আহার্য্য বস্তু চর্ব্বণ করিতে তাহাদিগের চর্ব্বণ-পেশি সকল এবং তৎসংলগ্ন অস্থিও ঐ কারণবশতঃই পরি-বর্ত্তিত হয়। সদ্যোজাত শিশুর পদতলের চর্ম্ম পুরু, অন্যান্য স্থানের চর্ম্ম তদ্রূপ নহে। দীর্ঘকাল বহু পুরুষ-পরম্পরায় পদতলে (সমস্ত দেহের) চাপ পড়াতে বংশানুক্রমের বিধানানুসারে এইরূপ হইয়াছে, এ কথা অবিশ্বাস করা যায় না। *

ইহা সকলেই জানেন যে ঘড়ী-প্রস্তুত-কারকগণের ও খোদাই-কারিকরগণের দৃষ্টি-শক্তি কমিয়া যায়; তাহারা দূরের বস্তু ভাল দেখিতে পায় না। আর যাহারা বাড়ীর বাহিরে কার্য্য করে তাহারা এবং অসভ্যগণ দূরের বস্তুই ভাল দেখে, নিকটের বস্তু তত ভাল দেখে না। হ্রস্ব-দৃষ্টি ও দূর-দৃষ্টি বংশানুগত হয়। অসভ্যগণের তুলনায় ইউরোপীয়দিগের চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সকলের শক্তি কম; এই ভাব বহু পুরুষপরম্পরায় ঐ সকল ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার হ্রাস হওয়ার পুঞ্জীকৃত ফল, তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ রেঙ্গার বলেন যে তিনি অনেক ইউরোপীয় ব্যক্তিকে দেখিয়াছেন, যাহারা অসভ্য ইণ্ডিয়ানদিগের মধ্যে চিরদিন লালিত-পালিত হইয়াছে এবং চিরজীবন তাহাদিগের মধ্যেই বাস করিয়া আসিতেছে, কিন্তু তথাপিও ইণ্ডিয়ানদিগের ন্যায় ইন্দ্রিয়ের তীক্ষ্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই। তিনি বলেন যে ইউরোপীয়দিগের অপেক্ষা আমেরিকার

* কর্ম্ম বংশানুগত হয় না। যে সকল দেহাংশ ঐ কর্ম্মের উপযোগী, সেই সকল দেহাংশ বংশানুগত হয়। সিল-শিকার কর্ম্ম বহু পুরুষ করিলেও তৎপরবর্ত্তিগণ নূতন করিয়া শিক্ষা না করিলে স্বভাবতঃ পারিবে না। —অনুবাদক।

* এক্ষণে ঈদৃশ কারণ এরূপ স্থলে স্বীকৃত হয় না। ব্যক্তির জীবনে যে সকল পরিবর্ত্তন অর্জ্জিত হয়, তাহা বংশানুগত হইবার প্রমাণাভাব, সুতরাং পণ্ডিতগণ এক্ষণে উহা বংশানুগত হওয়া আর স্বীকার করেন না।

আদিম নিবাসিগণের মাথার খুলীতে যে সকল ইন্দ্রিয় গহ্বর আছে, তাহা কিছু বড়। ইহা হইতে বোধ হয় যে ঐ সকল ইন্দ্রিয়ও আমেরিকানদিগের বড়। তাহাদিগের খর্পরের নাসারন্ধ্রও ইউরোপীয়ানদিগের অপেক্ষা বড়; এ কথা ব্লুম্যান ব্যাস বলিয়াছেন; এবং তিনি বিবেচনা করেন যে এই কারণবশতঃই তাহাদিগের ঘ্রাণশক্তি অধিক। প্যালাস্ বলেন যে উত্তর আশিয়া-খণ্ডের সমতলবাসী মঙ্গলীয়গণের ইন্দ্রিয়সকল চমৎকার শক্তি-শালী। এবং প্রীচাড্ বিশ্বাস করেন যে তাহাদিগের ইন্দ্রিয় সকল অতিশয় পরিপুষ্ট হওয়াতেই হনু ও শঙ্খের মধ্যবর্ত্তী করোটীর * বিস্তৃতিও অধিক।

দক্ষিণ আমেরিকার পেরু-প্রদেশের অধিত্যকাবাসী কোয়েচুয়া ইণ্ডিয়ানদিগের ফুস্ফুস্ এবং বক্ষের আয়তন অত্যন্ত বেশি; য়্যাল্সিডি ডিয়র্বিণী বলেন যে তাঁহারা উচ্চ প্রদেশের অতিশয় সূক্ষ্ম বায়ু শ্বাসপ্রশ্বাস করাতেই ঐরূপ হইয়াছে। ইউরোপীয়-দিগের অপেক্ষা তাহাদিগের ফুস্ফুসের কোষ সকল আয়তনেও বড় এবং সংখ্যায়ও অধিক। এই সকল পরীক্ষার ফল কেহ কেহ সন্দেহের চক্ষে দেখেন; কিন্তু মিষ্টার ডিকর্ব্বেস্ কোয়েচা ইণ্ডিয়ানদিগের সম-শ্রেণীর অনেক আইমারাদিগের দেহ যত্ন পূর্ব্বক মাপিয়াছেন; উহারা ১০ হাজার হইতে ১৫ হাজার ফুট উচ্চে বাস করে; তিনি আমাকে জানাইয়াছেন যে তাঁহার পরীক্ষিত সমস্ত মানবের সহিত উহাদিগের দৈর্ঘ্য এবং পরিধির প্রভেদ স্পষ্ট দেখা যায়। তাঁহার মাপের তালিকায় প্রত্যেক ব্যক্তির দৈর্ঘ্যকে ১০০০ গণ্য করিয়া অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাপ ঐ অনুপাতে হিসাব করা হইয়াছে। তাহাতে দেখা যায় যে, আই-মারাদিগের বাহু ইউরোপীয়দিগের অপেক্ষা ছোট, এবং নিগ্রোদিগের অপেক্ষা অনেক ছোট, জঙ্ঘাও ছোট। আর তাহাদের এই একটা বিশেষত্ব দেখা যায় যে প্রত্যেক আইমারার টিবিয়া * নামক জঙ্ঘাস্থি অপেক্ষা ফিমার † নামক উর্ব্বস্থি ছোট। উহাদিগের দৈর্ঘ্যের গড় অনুপাত ২১১ : : ৫২। ইউরোপীয়দিগের ফিমার ও টিবিয়ার দৈর্ঘ্যানুপাত ২৪৪ : ২৩০ এবং তিন জন কাফ্রির ঐ অনুপাত ২৫৮ : ২৪১। আই-মারাদিগের প্রকোষ্ঠাস্থি অপেক্ষা প্রগণ্ডাস্থি ছোট। উহাদিগের দেহ অত্যন্ত দীর্ঘ বাহুর এবং উরুর অস্থি ছোট হইবার কারণ বোধ হয় ক্ষতিপূরণবিধির দৃষ্টান্তস্থল; ‡ এ বিষয়ে মিষ্টার ফর্বস্ সাহেবও আমাকে এইরূপই বলিয়াছেন। আইমারাদিগের দেহগঠনে আরও কয়েকটী আশ্চর্য্যজনক বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে; তাহার মধ্যে একটী এই যে, তাহাদিগের গুল্‌ফ বাহিরের দিকে অল্প পরিমাণে আসে মাত্র।

এই সকল লোক অত্যুচ্চ শীতপ্রধান

* Zygoma.

* জঙ্ঘাতে দুই খানি অস্থি আছে; টিবিয়া ও ফিবুলা। ইহাদিগকে দীর্ঘাস্থি ও শকাস্থি বলে।

† উরুর অস্থিকে ফিমার অর্থাৎ উর্ব্বস্থি বলা যায়।

‡ বাহু ছোট হওয়ার ক্ষতি দেহ দীর্ঘ হওয়াতেই পুরণ হইয়াছে। একাঙ্গ বড় আর একাঙ্গ ছোট হওয়াকে ক্ষতিপুরণ অথবা সমীকরণ বলা যায়।

দেশে বাস করিতে এরূপ অভ্যস্ত হইয়াছে যে, স্প্যানিয়ার্ডরা যখন ইহাদিগকে পূর্ব্ব প্রদেশের সমতল ক্ষেত্রে নাবাইয়া আনিয়াছিল, এবং অদ্যাপিও যে সময় ইহারা অধিক বেতনের লোভে * নিম্ন সমতলে আগমন করে, তখন ইহারা অত্যন্ত অধিক সংখ্যায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়। যাহা হউক, মিঃ ফর্বেস্ কয়েকটী আইমারা-পরিবার চিনিতেন, উহারা দুই পুরুষ সমতলে বাস করিতেছিল; তথাপি উহাদিগের বিশেষ বিশেষ লক্ষণ সকল এখনও বংশানুগত হইয়া থাকে। কিন্তু অঙ্ক পরিমাপ না করিয়াও শুধু চক্ষে দেখিয়াই বুঝা যায় যে সেই সকল বিশেষ লক্ষণ কমিয়া আসিয়াছে। পরে পরিমাপান্তে দেখা গেল যে সমতলবাসীদিগের দৈর্ঘ্য উচ্চ অধিত্যকাবাসীদিগের অপেক্ষা কম হইয়াছে, তাহাদিগের ফিমার একটু লম্বা হইয়াছে, এবং টিবিয়াও কিছু লম্বা হইয়াছে, কিন্তু ফিমারের ন্যায় নহে। মিঃ ফর্ব্বেসের পুস্তিকা দেখিলেই প্রকৃত মাপাদি অবগত হওয়া যায়। এই সকল হইতে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বহুপুরুষ ক্রমে অত্যুচ্চ প্রদেশে বাস করিলে সাক্ষ্যাৎস্বরূপেই হউক অথবা গৌণভাবেই হউক, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দৈর্ঘ্যাদির ইতর বিশেষ হইয়া থাকে।

যদিও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অধিক ব্যবহার অথবা অব্যবহারবশতঃ মানবজাতি শেষযুগে বেশি পরিবর্ত্তিত হয় নাই, কিন্তু উল্লিখিত ঘটনাসমূহ হইতে বুঝা যায় যে মানবের প্রথমাবস্থায় ঐ কারণবশতঃ যে পরিবর্ত্তন উৎপন্ন হইত, এখনও সেই পরিবর্ত্তনশীলতা নষ্ট হয় নাই। ইতর প্রাণীদিগের সম্বন্ধে এ কথা সত্য, তাহা আমরা প্রত্যক্ষ জানি। সুতরাং মানবের সম্বন্ধেও ইহা অনুমিত হইতে পারে যে, যখন সুদূর অতীত কালে মানবের পূর্ব্ববর্ত্তিগণ পরিবর্ত্তিত হইতেছিল, এবং চতুষ্পদ অবস্থা হইতে দ্বিপদ অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছিল * তখন অঙ্গাদির অধিক-ব্যবহার বা অব্যবহারজনিত ফল বংশানুগত হইয়া প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল। † (ক্রমশ)

শ্রীশশধর রায়।

* সুবর্ণ ব্যবসায়ীরা স্বর্ণ ধুইয়া বাহির করিবার ব্যবসায়ে ইহাদিগকে অধিক বেতনে নিযুক্ত করে।

* অর্থাৎ দাঁড়াইতে আরম্ভ করিয়াছিল।

† পরিবর্ত্তনের মূল সহায় প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন এবং অতি-ব্যবহার বা অব্যবহার তাহার সঙ্গীমাত্র, ইহাই বলা হইল।

বেদান্ত।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে অজ্ঞান দুঃখের কারণ, জ্ঞান দ্বারা তাহার নিবৃত্তি হয় এবং অজ্ঞান বিনষ্ট হইলে তৎসঙ্গে দুঃখ বিদূরিত হইয়া থাকে। যদি অজ্ঞান আমাদের দুঃখের কারণ হয়, তাহা হইলে তাহার সহিত আমাদের কোনরূপ সম্বন্ধ অবশ্যই থাকিবে। যেহেতু কোনরূপ অসংসৃষ্ট পদার্থ, কখনও কাহারও দুঃখের কারণ হইতে পারে না।

তবে অজ্ঞানের সহিত আমাদের কিরূপ সম্বন্ধ থাকিতে পারে? তাহাই প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য। আমরা অর্থাৎ আমাদের আত্মা অসীম এবং স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ। যাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে, কোন সময়ে কোনরূপ সংশয় হয় না, তাহাই স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ। আমাদের নিজ নিজ অস্তিত্ব সম্বন্ধে, কখনও কোন সন্দেহ হয় না, সুতরাং আমরা স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য বলিয়াই বিবেচিত হয়। জ্ঞান আলোকের মত স্বপ্রকাশ, ইহা নিজকে এবং অপরকে প্রকাশ করিতে পারে। অজ্ঞান তাহার বিপরীত। ইহা জ্ঞানকে আচ্ছাদন করিয়া রাখিতে চেষ্টা করে, এবং স্বয়ং জড়তা-সম্পন্ন। আমাদের আত্মা অসীম, স্বপ্রকাশ জ্ঞানস্বরূপ হইলেও, অজ্ঞান দ্বারা আবৃত হওয়ায়, সসীমভাবে অনুভূত হইয়া থাকে। এই সসীমত্ব তাহার স্বাভাবিক নহে, ইহা অজ্ঞান দ্বারা কল্পিত। যেমন আত্মার সসীমত্ব অজ্ঞানকল্পিত, সেইরূপ তাহার দুঃখাদিও অজ্ঞানের কার্য্য, সুতরাং কল্পিত। যাহা অজ্ঞানকল্পিত, তাহা জ্ঞান-নাশ্য, এই সিদ্ধান্ত সর্ব্বসম্মত। অজ্ঞান দ্বারা আবৃত থাকায়, আত্মার অসীমতা, দুঃখহীনতা ও সুখরূপতা আমরা বুঝিতে পারি না। আমাদের মন ও শরীর আত্মা হইতে ভিন্ন, কিন্তু আমরা এ উভয়কেই 'এক' মনে করিয়া থাকি। সে জন্য, শারীরিক ও মানসিক দুঃখ দ্বারা, আমরা আত্মাকে দুঃখী মনে করিতে পারি। যদি কোন ব্যক্তির কখনও কোন বৃক্ষে মনুষ্য ভ্রম উৎপন্ন হয়; তখন সে ব্যক্তি সে বৃক্ষে মনুষ্যের গতি ও হস্ত-সঞ্চালনাদি প্রভৃতি পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করিতেছে, এইরূপ মনে করিয়া থাকে। সেইরূপ, যখন আমরা শরীর মনের সঙ্গে আত্মাকে এক বলিয়া মনে করি, তখন শরীর ও মনের দুঃখ প্রভৃতি আত্মাতেই অবস্থিত এইরূপ জ্ঞান হইয়া থাকে। এই শরীর, মন প্রভৃতির একতা-জ্ঞান বেদান্ত শাস্ত্রে অধ্যাস নামে অভিহিত। এই অধ্যাস দ্বিবিধ, তাদাত্ম্যাধ্যাস ও সংসর্গাধ্যাস। এক বস্তুকে অপর পদার্থস্বরূপে জানার নাম তাদাত্ম্যাধ্যাস, এবং এক বস্তুর সহিত অপর বস্তুর কোন রূপ সম্বন্ধ জ্ঞানের নাম সংসর্গাধ্যাস। আমাদের শরীর ও মনের সহিত আত্মার একীভাব জ্ঞান তাদাত্ম্যাধ্যাস, এবং বস্ত্রালঙ্কার প্রভৃতিতে, আমাদের সম্বন্ধ জ্ঞান সংসর্গাধ্যাস। যাহাতে আমাদের অধিক স্নেহ তাহাতে তাদাত্ম্যাধ্যাস, এবং যাহাতে তাহার অল্পতা তাহাতে সংসর্গাধ্যাস হইয়া থাকে। বস্ত্রালঙ্কার অপেক্ষা শরীরের প্রতি অধিক স্নেহ, সে জন্য তাহাতে তাদাত্ম্যাধ্যাস এবং শরীর অপেক্ষা বস্ত্রালঙ্কারাদিতে স্নেহের অল্পতা প্রযুক্ত তাহাতে সংসর্গাধ্যাস হয়। আমাদের আত্মা স্বভাবতঃ নির্ব্বিকার। তাহার কোন রূপ দুঃখাদি নাই। দুঃখাদি মন ও শরীর প্রভৃতির ধর্ম্ম। যখন মন ও শরীর প্রভৃতির সহিত আত্মার একতা ও সংসর্গ বোধ (অর্থাৎ অধ্যাস) হয়, তখন মন প্রভৃতির সেই সকল দুঃখ আত্মাতে আরোপিত হইয়া থাকে, আরোপিত বা কল্পিত পদার্থের নিবৃত্তির কারণ, বস্তুবিষয়ক বা প্রকৃত জ্ঞান। সুতরাং আত্মার প্রকৃত স্বরূপ

জ্ঞান এই দুঃখনিবৃত্তির কারণ। ভাষ্যকার শঙ্কর প্রথমেই আত্মা ও তদ্ভিন্ন পদার্থের পরস্পর অধ্যাস প্রদর্শন করিয়াছেন। তদ্দ্বারা তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে এই জাগতিক দুঃখ কল্পিত, তাহার সহিত আমাদের আত্মার বাস্তবিক কোন সম্বন্ধ নাই, ভ্রান্ত সংস্কার বা অজ্ঞানের বশবর্ত্তী বলিয়া, আমরা ঐরূপ দুঃখ সম্বন্ধ অনুভব করিয়া থাকি। সুতরাং প্রকৃত জ্ঞান প্রভাবে অজ্ঞান বিনষ্ট হইলে ঐরূপ দুঃখসত্তা বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। এই জন্য তিনি ভাষ্যের প্রথমেই দুঃখের কারণ অধ্যাস নিরূপণ করিয়াছেন।

শঙ্করের এই সিদ্ধান্তের মূল "তরতি শোকমাত্মবিৎ" "তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়" এই দুইটী শ্রুতি। এই দুইটীর সংক্ষিপ্তার্থ এই যে আত্মজ্ঞান মুক্তির (দুঃখবিনাশের) কারণ, তদ্ভিন্ন মুক্তির (দুঃখবিনাশের) আর কোন উপায় নাই। এই শ্রুতিদ্বয় হইতে তিনি, আত্ম ভিন্ন জগৎ কল্পিত, এই সিদ্ধান্ত স্থির করিয়াছেন। তাঁহার অভিপ্রায় এই যে, সত্য পদার্থ কখনও জ্ঞান দ্বারা বিনষ্ট হইতে পারে না, কল্পিত পদার্থই তদ্দ্বারা বিনষ্ট হইয়া থাকে। যখন শ্রুতি বলিতেছেন যে আত্মজ্ঞান দ্বারা দুঃখের বিনাশ সাধিত হয়, তখন ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে দুঃখ আত্মবিষয়ক অজ্ঞান দ্বারা কল্পিত। যাহা জ্ঞাত হইলে পদার্থের বিনাশ সাধিত হয়, সে পদার্থ তাহার অজ্ঞান দ্বারা কল্পিত। যেমন বৃক্ষে কল্পিত মনুষ্য; ইহা বৃক্ষজ্ঞান দ্বারা উৎপন্ন এবং বৃক্ষবিষয়ক জ্ঞানদ্বারা তাহা বিনষ্ট বা বিলুপ্ত হইয়া থাকে। যদি দুঃখ কল্পিত হয়, তবে তাহার কারণ অবশ্যই কল্পিত পদার্থ হইবে। কল্পিত পদার্থের কারণ কখনও সত্য পদার্থ হইতে পারে না। সত্য পদার্থ তাহার কারণ হইলে, কারণের অবস্থিতি সময়ে, সেই কল্পিত পদার্থের বিনাশ, কোন মতেই সম্ভাবিত বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না। আমাদের শরীর ইন্দ্রিয় প্রভৃতি দুঃখের কারণ, সুতরাং তাহাদের সহিত সম্বন্ধ থাকিলে দুঃখ অবশ্যম্ভাবী; যদি শরীর ইন্দ্রিয় প্রভৃতি আত্মবিষয়ক অজ্ঞান প্রভাবে কল্পিত হয়, তবেই তাহা আত্মজ্ঞান দ্বারা বিনষ্ট বা বিলুপ্ত হইতে পারে। এই সকল বিবেচনা করিয়াই শঙ্কর প্রথমে দুঃখ ও তৎকারণ শরীর ইন্দ্রিয় প্রভৃতি কল্পিত ইহা জ্ঞাপন করিতে চেষ্টা করিয়া, অনন্তর তাহার বিনাশ বা বিলোপকারক ব্রহ্মজ্ঞান নিরূপণ করিয়াছেন। ব্রহ্ম সর্ব্বগত, যখন তিনি কল্পনা বা অজ্ঞান দ্বারা মন ও শরীর প্রভৃতির সহিত অভিন্নভাবে প্রতীত হন, তখনই তাঁহার জীব-ভাব উপস্থিত হয়; এবং সে সময়ে তিনি মন ও শরীরাদির দুঃখ প্রভৃতি দ্বারা সমাচ্ছন্ন রূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকেন। সুতরাং এই পরিচ্ছিন্ন জীবভাব ব্রহ্মে কল্পিত। অসীমভাবে ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ রূপে জানিতে পারিলে ইহা থাকিতে পারে না।

বেদান্তাদ্বৈতবাদানুসারে, জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে, জীবভাব আমরা সর্ব্বদা অনুভব করিতে পারি, কিন্তু ব্রহ্মভাব সকল সময়ে অনুভব করিতে পারি না। তাহার কারণ অজ্ঞানপ্রসূত পরিচ্ছিন্নতা প্রভৃতি জীবভাব দ্বারা ব্রহ্মের অসীমতা প্রভৃতি আচ্ছাদিত থাকে। যুক্তি সহকৃত

বিচার প্রভাবে, যদি প্রত্যক্ষভাবে ব্রহ্মজ্ঞান উদিত হয়, তাহা হইলে জীব ও ব্রহ্ম উভয়ই "এক" এইরূপ প্রতীত হইতে থাকে। তখন অজ্ঞান বিদূরিত হওয়ায়, তৎকল্পিত দুঃখকারণ ভূত পরিদৃশ্যমান জগৎ, স্বপ্নদৃষ্ট ব্যাঘ্রাদির মত অকিঞ্চিৎকর বলিয়াই অনুভূত হয়।

বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদিগণ জীব ও ব্রহ্ম এক, এইরূপ বলিয়া থাকেন। কিন্তু অন্যান্য দার্শনিকগণ তাহা স্বীকার করেন না। সুতরাং এই স্থলে জীবাত্মা সম্বন্ধে দার্শনিকগণের বিভিন্ন মত প্রদর্শন করা যাইতেছে।—

(১) লোকায়ত মত—ইহা চার্ব্বাকমত নামে অভিহিত। ইহাদের মধ্যে আত্মা সম্বন্ধে ত্রিবিধ মত দৃষ্ট হয়—

১ম—শরীরাত্মবাদ;

২য়—ইন্দ্রিয়াত্মবাদ;

৩য়—মন-আত্মবাদ।

এই ত্রিবিধ মতই বৃহস্পতিশিষ্যগণের প্রবর্ত্তিত। ইঁহারা পুনর্জ্জন্ম স্বীকার করেন না। ইঁহাদের মতে মৃত্যুর পরে আত্মার অস্তিত্ব থাকে না। ইঁহারা স্বাধীনতাকে মুক্তিনামে অভিহিত করিয়া থাকেন।

(২) বৌদ্ধমত—ইহাদের মধ্যে দুইটী মত প্রচলিত আছে—

১ম—বিজ্ঞানাত্মবাদ;

২য়—সর্ব্বশূন্যাত্মবাদ।

বিজ্ঞানাত্মবাদিগণ ক্ষণিক জ্ঞানকেই আত্মা বলিয়া থাকেন। এই মতে এক আত্মা হইতে অন্য আত্মার উৎপত্তি হয়। ইঁহারা প্রত্যেক প্রাণীরই অসংখ্য আত্মা স্বীকার করেন। ক্ষণিক বিজ্ঞানরূপ এক আত্মার বিনাশ হওয়া মাত্র অন্য ক্ষণিক আত্মার উৎপত্তি হইয়া থাকে। ইঁহাদের মতে বিজ্ঞান ভিন্ন সমস্তই মিথ্যা। নীল পীতাদি বিষয় সকল জ্ঞানেরই একপ্রকার আকার বিশেষ। জ্ঞানের বিষয়শূন্যতাই ইঁহাদের মতে মুক্তি

শূন্যাত্মবাদীর মতে বিজ্ঞান ও বাহ্য বিষয় সমস্তই মিথ্যা। সুতরাং সর্ব্বশূন্যতা-অভাবই আত্মা এবং ইহাই সত্য। আমাদের সুষুপ্তি সময়ে বিজ্ঞান ও বাহ্য বস্তুর অস্তিত্ব থাকে না, কিন্তু তখনও সকলেই আত্মাস্তিত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বশূন্যতা স্বাভাবিক, বিজ্ঞান প্রভৃতি আগন্তুক, সুতরাং অস্বাভাবিক। যাহা অস্বাভাবিক তাহা মিথ্যা, যাহা মিথ্যা তাহা আত্মা নহে; আত্মা সত্য, অতএব সর্ব্বশূন্যতাই আত্মা। এই উভয় মতেই পুনর্জন্ম স্বীকৃত হইয়াছে। ইঁহাদের মতে মৃত্যুর পরেও বিজ্ঞানজনিত সংস্কার থাকে। সেই সংস্কার দ্বারা পুনর্জ্জন্ম হয়। যোগপ্রভাবে সংস্কারের বিনাশ হইলে মুক্তি হইয়া থাকে। বিজ্ঞান ও শূন্যবাদীর মধ্যে মুক্তি সম্বন্ধে মতভেদ আছে। বিজ্ঞানবাদীর মতে মুক্তি সময়ে বিজ্ঞান থাকে, কিন্তু তাহার বিষয় গ্রহণ করিবার ক্ষমতা থাকে না। শূন্যবাদীর মতে সে সময়ে বিজ্ঞানও থাকে না। যে বিজ্ঞানের বিষয়-গ্রহণক্ষমতা নাই, সে বিজ্ঞানের থাকা ও না থাকা উভয়ই সমান। বিষয়-গ্রহণ-ক্ষমতারহিত বিজ্ঞান কোন রূপেই প্রমাণ-গম্য হইতে পারে না, সুতরাং শূন্যবাদী এরূপ অপ্রামাণিক বিজ্ঞান স্বীকার করা সঙ্গত মনে করেন না।

(৩) জৈনমত—ইহাদের মতে আত্মা স্বপ্রকাশ নিত্য এবং সাবয়ব, আত্মা যখন যে শরীরে অবস্থান করে তখন সেই শরীরের পরিমাণ অনুসারে তাহার পরিমাণ হইয়া থাকে। এই মতে আত্মার পুনর্জন্ম আছে। মুক্তি অবস্থায় আত্মা উপরে উঠিয়া যায়।

(৪)—ন্যায়, বৈশেষিক ও মীমাংসক মত—ইহাদের মতে আত্মা নিত্য, সর্ব্ব-ব্যাপী এবং জড়স্বভাব। মনসংযোগবশতঃ তাহার জ্ঞান, ইচ্ছা, যত্ন, সুখদুঃখ প্রভৃতি গুণ উৎপন্ন হয়। মোক্ষাবস্থায় তাহার ঐ সকল গুণ থাকে না। ন্যায় বৈশেষিক মতে সে সময়ে কোনরূপ সুখ থাকে না, কিন্তু মীমাংসকেরা সে সময়েও অবিনাশী সুখ স্বীকার করেন। নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক দার্শনিকগণ আত্মার অতিরিক্ত ঈশ্বর স্বীকার করেন। মীমাংসক ঈশ্বর মানেন না। লোকায়ত, বৌদ্ধ, জৈন, নৈয়ায়িক, বৈশেষিক, মীমাংসক ইঁহারা সকলেই আত্মার কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব স্বীকার করেন এবং আত্মা অসংখ্য এইরূপ বলিয়া থাকেন।

(৫) সাংখ্য পাতঞ্জল মত—ইহাদের মতে আত্মা জ্ঞানরূপ স্বপ্রকাশ, নিত্য এবং সর্ব্বব্যাপী। আত্মা স্বভাবতঃ কোন কার্য্য করিতে পারে না এবং কোনরূপ সুখ দুঃখ ভোগ করে না। তাহার কোনরূপ বিকার নাই, সুতরাং জ্ঞান, ইচ্ছা, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি তাহার গুণ নহে। এই সমস্তই মনের ধর্ম্ম, মনের সহিত আত্মার অভিন্নতা বোধ হওয়ায়, মনের ঐ সকল ধর্ম্ম বা গুণ আত্মাতে অনুভূত হইয়া থাকে। ইহাদের মতেও আত্মা অসংখ্য। মুক্তি সময়ে মনের সহিত আত্মার অভিন্নতা বোধ বিনষ্ট হইয়া যায়, সুতরাং সে সময়ে তাহার কোনরূপ সুখ-দুঃখ প্রতিভাস থাকে না, তখন আত্মা বিশুদ্ধ চিৎ (জ্ঞান) রূপে অবস্থিত থাকে। সাংখ্য ও পতঞ্জলি এ দুইয়ের মধ্যে পতঞ্জলি ঈশ্বর-বাদী, সাংখ্যবাদী কপিল ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন প্রমাণ প্রদর্শন করেন নাই। সে জন্য পতঞ্জলি সেশ্বর এবং কপিল নিরীশ্বর সাংখ্যবাদী বলিয়া বিখ্যাত।

(৬) বেদান্তাদ্বৈত মত—ইহাদের সহিত পূর্ব্বোক্ত দ্বিবিধ সাংখ্য মতেরই অনেক অংশে সামঞ্জস্য আছে। কারণ, বৈদান্তিক ও উভয় সাংখ্যই আত্মার নির্গুণত্ব, নির্ব্বিকারত্ব, অসীমত্ব জ্ঞানরূপত্ব স্বীকার করিয়াছেন। অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিক মতে আত্মা সৎচিৎ ও আনন্দরূপ, সর্ব্বব্যাপী এবং নির্ব্বিকার। ইঁহারা একাত্মবাদী, অর্থাৎ এই মতে সকলেরই এক আত্মা। মন ও শরীরের বিভিন্নতা প্রযুক্ত সকল সময়ে সকল ব্যক্তি সুখ দুঃখাদি ভোগ করে না। এই মতে আত্মা ও ব্রহ্মের ভেদ নাই। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে "অহং ব্রহ্মাস্মি" আমিই ব্রহ্ম, এইরূপ জ্ঞানই মুক্তির কারণ। এই জ্ঞান হইলে পরিদৃশ্যমান জগৎ বিলুপ্ত হয়; কারণ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, এই জগৎ অজ্ঞানপ্রভাবে ব্রহ্মে কল্পিত, সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞান হইলে তাহার অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। ইহার মতে মুক্তি সময়ে এই জগতের অস্তিত্ব থাকে না। এই জগৎ দুঃখের কারণ, এবং ইহা ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা কল্পিত, জীব ও ব্রহ্ম এক; এই বেদান্ত সিদ্ধান্ত।

যদি ব্রহ্ম ও জীব এক হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মজ্ঞান ও জীবতত্ত্বজ্ঞান একই পদার্থ এবং ব্রহ্মকে জানিলেই জীবকে জানা যাইবে। সুতরাং ব্রহ্মজিজ্ঞাসা প্রদর্শন ক্রমে, সূত্রকার বাদরায়ণ জীব-জিজ্ঞাসাই প্রকাশিত করিয়াছেন। কোন বিষয়ে সংশয় হইলেই জিজ্ঞাসা হইয়া থাকে। আত্মা সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত নানাবিধ মত দেখিলে, লোকের মনে সহজেই সন্দেহের উদয় হয়। সেই সন্দেহমূলক ব্রহ্মজিজ্ঞাসা, প্রথম সূত্রে জিজ্ঞাসা প্রদর্শন করিয়া, দ্বিতীয় সূত্রে তাহার লক্ষণ, এবং তৃতীয় সূত্রে ব্রহ্মবিষয়ে প্রমাণ প্রদর্শন করা হইয়াছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় সূত্রের অর্থ প্রথম প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে। সে জন্য এ স্থলে তাহার উল্লেখ করিলাম না। ব্রহ্মসম্বন্ধে উপনিষদবাক্যই প্রমাণ, ইহা তৃতীয় সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু উপনিষদ-বাক্যের অন্যরূপ অর্থ হওয়ার সম্ভাবনা না থাকিলে, ব্রহ্মবিষয়ে তাহার প্রামাণ্যে সংশয়ের উদয় হইতে পারে। অতএব উপনিষদের ব্রহ্মপরতা (একমাত্র ব্রহ্মই উপনিষদের তাৎপর্য্য) নির্ণয়ার্থ চতুর্থ সূত্র বলা হইয়াছে—

"তত্তু সমন্বয়াৎ ১।১।৪"

তিনি (ব্রহ্ম)ই উপনিষদ-প্রতিপাদ্য; কারণ, তাহাতে (ব্রহ্মে) উপনিষদের সমন্বয় (তাৎপর্য্য) পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। যাহা যে শব্দের তাৎপর্য্য বিষয়, তাহাই সেই শব্দের অর্থ। ব্রহ্ম উপনিষদের তাৎপর্য্য বিষয়, অতএব ব্রহ্মই তাহার অর্থ। ব্রহ্ম ভিন্ন কিছুই উপনিষদের তাৎপর্য্য বিষয় নহে। সে জন্য তাহারা উপনিষদ-প্রতিপাদ্য নহে, এই বিষয়টীর যথাবিশদ বর্ণনা করা যাইতেছে।

জৈমিনি-শিষ্য পূর্ব্বমীমাংসকগণ বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড প্রামাণ্যবাদী। তাঁহারা "স্বর্গকামো যজেত" স্বর্গকামী ব্যক্তির যজ্ঞ করা উচিত, "পাণ্ডিত্যকামো জন্মতিথাবামিষং ন ভুঞ্জীত" পাণ্ডিত্যাভিলাষী ব্যক্তির পক্ষে জন্মতিথিতে আমিষ ভোজন কর্ত্তব্য নহে, ইত্যাদি ক্রিয়া ও নিষেধ এবং তৎসংসৃষ্ট অর্থবোধক বাক্যেরই প্রামাণ্য স্বীকার করিয়া থাকেন। তাহাদের মতে বেদবাক্য চারিভাগে বিভক্ত। মন্ত্র, বিধি, নিষেধ ও অর্থবাদ। বেদের সংহিতাভাগ মন্ত্রনামে অভিহিত। অবশিষ্ট তিন ভাগের সাধারণ নাম ব্রাহ্মণ। যে বাক্য দ্বারা কোন কার্য্যে লোকের প্রবৃত্তি হয় তাহা বিধি, এবং যে বাক্য দ্বারা কোন কার্য্য হইতে লোক নিবৃত্ত হয় তাহা নিষেধ। যে বাক্য দ্বারা প্রবৃত্তির উপযোগী প্রশংসা প্রভৃতি অথবা নিবৃত্তির উপযোগী নিন্দা প্রভৃতি জ্ঞাত হওয়া যায় তাহার নাম অর্থবাদ। বিধিবোধিত কর্ম্ম করিবার সময়ে সেই সেই মন্ত্রের উচ্চারণ পূর্ব্বক, তত্তৎকর্ম্মাঙ্গ দ্রব্যের প্রয়োগ করিতে হয়, অর্থবাদবাক্য প্রশংসা ও নিন্দা প্রভৃতি দ্বারা বিধি ও নিষেধ বাক্যের প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তক শক্তির উত্তেজনা করে, অতএব বিধি ও নিষেধ বাক্যের সাহায্যকারী বলিয়া, মন্ত্র ও অর্থবাদ বাক্য প্রমাণ মধ্যে গণ্য হইয়া থাকে। স্বভাবতঃ প্রধানভাবে তাহার কোন প্রামাণ্য নাই। যে বাক্য কোনরূপ ক্রিয়াবিষয়ক প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তির কারণ নহে,

অথবা যাহার কোনরূপ ফল নাই, এইরূপ বাক্য উন্মত্তবাক্যের মত, কখনও প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। "তত্ত্বমসি" তুমিই সেই ব্রহ্ম, "অহং ব্রহ্মাস্মি" আমিই ব্রহ্ম, ইত্যাদি উপনিষদবাক্য, কোনরূপ ক্রিয়া বিষয়ে প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তির কারণ নহে, এবং উক্ত বাক্য জন্য জ্ঞান হইতে কোন রূপ ফলও দৃষ্ট হয় না। উপনিষদে উক্ত হইয়াছে যে, বেদান্তবাক্য দ্বারা আত্মবোধ হইলেই মুক্তি হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ সকল বাক্য জন্য জ্ঞান সত্ত্বেও আমাদের মুক্তি লাভ হইতেছে না, এই অবস্থায় উপনিষদ বা বেদান্তবাক্যকে প্রমাণ বলা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। পূর্ব্বমীমাংসকগণ বেদান্ত-বাক্যের প্রামাণ্য সম্বন্ধে এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ করিয়া থাকেন। এই পূর্ব্বপক্ষ সমাধানের জন্য, মহর্ষি বাদরায়ণ "তত্তু সমন্বয়াৎ" এই সূত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। শঙ্কর উক্ত সূত্রের এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন যে, বিধি ও নিষেধ অর্থাৎ ক্রিয়া-বিষয়ে প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তির কারণ না হইলে কোন বাক্যই প্রমাণ হইবে না; এইরূপ সিদ্ধান্ত স্বীকার করায় মূলে কোন রূপ যুক্তি বা প্রমাণ নাই, এবং বেদান্তবাক্য জন্য জ্ঞানের কোন রূপ ফল নাই, এই কথাও স্বীকার করা যাইতে পারে না। ক্রমশঃ এই উভয় বিষয়ের যুক্তি প্রদর্শন করা যাইতেছে। কোন বাক্য শুনিলেই, সেই বাক্য দ্বারা তৎক্ষণাৎ আমাদের এক প্রকার জ্ঞান উৎপন্ন হয়, এবং সে সময়ে সেই জ্ঞানকে আমরা যথার্থ জ্ঞান বলিয়াই মনে করিয়া থাকি। উক্ত জ্ঞান আমাদের প্রবৃত্তির কারণ, তৎসম্বন্ধে আমরা সে সময়ে কোন রূপ বিচার করি না। সুতরাং প্রবৃত্তির কারণ হওয়া বা না হওয়া দ্বারা, প্রামাণ্যের কোন রূপ উপকার বা ক্ষতি হয় না। যে বাক্য দ্বারা যথার্থ জ্ঞান হয়, তাহাই প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। বেদান্তবাক্য দ্বারা আমাদের যথার্থ জ্ঞান হয়, সুতরাং তাহা প্রমাণ। উপনিষদের পৌর্ব্বাপর্য্য আলোচনা করিলে ইহা স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, অদ্বিতীয় ব্রহ্মই তাহার একমাত্র লক্ষ্য, এই অবস্থায় তাহাকে অপ্রমাণ বলা যায় না। দ্বিতীয় পূর্ব্বপক্ষ বেদান্তবাক্য জন্য জ্ঞানের কোন ফল নাই; এই সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, "তত্ত্বমসি" "অহং ব্রহ্মাস্মি" প্রভৃতি বাক্য দ্বারা আমাদের যে জ্ঞান হইয়া থাকে, তাহা ঠিক প্রত্যক্ষ ভাবে ব্রহ্মজ্ঞান নহে। ঐ সকল বাক্য-প্রভাবে প্রত্যক্ষভাবে যখন ব্রহ্মজ্ঞান সমুদিত হইবে, তখনই মুক্তি-লাভের সম্ভাবনা। সম্প্রতি ঐ সমস্ত বাক্য জন্য আমাদের যে জ্ঞান আছে, তাহা অপ্রত্যক্ষ জ্ঞান, প্রত্যক্ষ জ্ঞান নহে; সুতরাং ঐরূপ অপ্রত্যক্ষ জ্ঞান নিষ্ফল হইলেও, প্রত্যক্ষ জ্ঞান অবশ্যই নিষ্ফল নহে। তাহার ফল বেদান্ত-প্রতিপাদ্য অজ্ঞান-নিবৃত্তি বা ব্রহ্মভাব-প্রাপ্তি।

(ক্রমশ)

শ্রীগুরুচরণ তর্কদর্শনতীর্থ

উৎকল-প্রসঙ্গে।

উৎকলে এতই প্রাচীন ইতিহাসের উপকরণ রহিয়াছে, এতই হিন্দুরাজাদিগের ক্ষীণকীর্ত্তি ইতস্ততঃ চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে যে, একবার দেখিয়াও সেগুলিকে পুনঃপুনঃ দেখিতে ইচ্ছা হয়, পুনঃপুনঃ দেখিয়াও অবলোকন-স্পৃহা বিলুপ্ত হয় না। ইহা আশ্চর্য্য, বিস্ময়, ও গৌরবের বিষয় যে, সেই হিন্দুকীর্ত্তিগুলি মহাকালের সহিত, কালযবনের সহিত, যবনসেনানী কালা-পাহাড়ের সহিত, বর্ষাতপ, ভূকম্প, ঝঞ্ঝাবাত, জলপ্লাবনের সহিত যুদ্ধ করিয়াও লোক-লোচনের সমক্ষে আত্ম-সত্তা জ্ঞাপন করিতেছে। উদাহরণ স্বরূপ পুরুষোত্তমের মন্দির, ভুবনেশ্বরের মঠ, কোণার্কের সূর্য্য-দেবের প্রাসাদ, প্রভৃতি দেবমণ্ডপগুলির, অরুণস্তম্ভ প্রভৃতি স্তম্ভ ও প্রশস্ত আকাশগর্ভ তোরণগুলির ভগ্ন ভিন্ন দেবমূর্ত্তি-সমূহের উল্লেখ করিতে পারি, সেই সঙ্গে সঙ্গে কাঠযুড়ীর জলপ্লাবন হইতে নগর ও দেশরক্ষার উদ্দেশে নির্ম্মিত সোপানশ্রেণী দ্বারা অলঙ্কৃত বজ্রকল্প বন্ধনীর উল্লেখ করিতে পারি। প্রভূত অর্থবৃষ্টি করিয়া কেশরীরাজগণ এই সকল কীর্ত্তির উৎপাদন করিয়াছেন, উৎকলের উচ্চ-সভ্যতার সময়ে উৎকলে শিক্ষিত স্থপতি, শিক্ষিত-ভাস্করের সত্তা ছিল বলিয়াই তাঁহারা অর্থের বিনিময়ে এই সকল কীর্ত্তি ক্রয় করিতে পারিয়াছেন; নয় ত অসভ্যদেশ হইলে কখনই তাঁহারা কৃতকার্য্য হইতেন না।* সেই দেশের সহিত বর্ত্তমান কালের এই বর্ত্তমান দেশের তুলনা করিলে স্তম্ভিত হইতে হয়, বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। এই অল্পকালের ভিতরে এইরূপ শোচনীয় পরিবর্ত্তন কোন দেশে হইয়াছে বলিয়া শুনি নাই, ইতিহাস এতদ্‌ভিন্ন আর অন্য দেশের সম্বন্ধে এইরূপ অচিন্তনীয় অবনতির সাক্ষ্য প্রদান করে নাই। উৎকল যে কারণে তীব্রবেগে এইরূপে শোচনীয় অবনতির দিকে প্রপতিত হইয়াছে, তাহার কারণ-নির্দ্দেশের অবসর এক্ষণে নাই। ইহাও আমরা নির্ব্বন্ধ সহকারে বলিতে পারি যে, যে দেশের বা সমাজের রাজা বা ধনীদিগের সৌন্দর্য্য-জ্ঞান বা সৌন্দর্য্যে রুচি নাই, সে দেশে বা সমাজে স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, চিত্রবিদ্যা ও চিত্রকলার উন্নতি হয় না। আবার যে দেশের বা সমাজের সৌন্দর্য্য-জ্ঞান বা সৌন্দর্য্যে রুচি নাই, সেই দেশের ও সমাজের রাজা বা ধনীদিগেরও সেইরূপ জ্ঞান বা রুচি হয় না। আবার যে দেশে বা সমাজে সভ্যতা-বিস্তার হয় নাই, সেই দেশবাসীদিগের ও সেই সমাজের কখনই

* "The skill and resource both of builders and masons are clearly shown by the fact that they were able to move and lay in place, without mortar, such gigantic stone blocks, and to produce the vigorous and often exquisitely carved figures; foliage and arabesque patterns, which lend a charm to the carvings adorning these shrines."—Gazetteer of the Puri District, p. 27.

সেরূপ জ্ঞান বা রুচি হয় না। যে দেশে বা সমাজে শিক্ষাবিস্তার নাই, সে দেশ বা সমাজ কখনই সভ্যতার উপরে অধিরূঢ় হয় না। এই সকল কীর্ত্তিকলাপ দেখিয়া আমরা অবধারণ করিতে পারি, উৎকল-বাসীদিগের সৌন্দর্য্য-জ্ঞান ছিল, সৌন্দর্য্যে রুচি ছিল, সভ্যতা ছিল, ও উৎকলে শিক্ষাবিস্তার ছিল। * সৌন্দর্য্য-জ্ঞান সৌন্দর্য্যে রুচি জন্মায়, সৌন্দর্য্য-রুচি সুন্দর দ্রব্যের সৃষ্টি করে, আবার সেই সুন্দর দ্রব্য যখন অল্প সময়ে নষ্ট হইয়া যায়, তখন তাহার স্থায়িত্বের জন্য সৃষ্টিকর্ত্তার চিন্তা আসে, সেই চিন্তা দ্বারা স্থাপত্যের উন্নতি। উৎকলে যখন ইহার চরম উন্নতি বুঝিতে পারি, তখন বলিতে হইবে উৎকল যুগযুগান্তর ধরিয়া এই সাধনায় প্রবৃত্ত ছিল।

মনুসংহিতা লিখিত হইবার পূর্ব্বেও উৎকল ও কলিঙ্গের সত্তা ছিল, "ওড়্" উৎকলেরই নামান্তর। পরবর্ত্তি-সময়ে এই উভয় দেশ এক রাজার অধীন ছিল। কখনও কলিঙ্গরাজ এই উভয় দেশের শাসন করিতেন, কখনও বা উৎকলরাজ এই উভয় দেশের ভাগ্যবিধাতা ছিলেন। এই সমস্ত কীর্ত্তি এক রাজার যত্নে এক সময়ে সম্পন্ন হয় নাই। এই সকল রাজাদিগের রাজপ্রাসাদ কোন্ স্থানে নির্দ্দিষ্টরূপে অবস্থিত ছিল, তাহা নির্ণয় করিবার সম্ভাবনা নাই। নানাস্থানে ইঁহাদিগের রাজপ্রাসাদের চিহ্ন লক্ষিত হয়। সে সময়ে রাজাদিগের অধিকারের ভিতরে একটি মাত্র নির্দ্দিষ্ট স্থানে একটি মাত্র রাজপ্রাসাদ ছিল বলিয়া বোধ হয় না। যে স্থানটি তাঁহারা শত্রু-প্রবেশের উন্মুক্ত দ্বার বলিয়া মনে করিতেন, শত্রু-দিগকে বাধা দিবার জন্য সেই স্থানে দুর্গ নির্ম্মাণ করিতেন; আর যে যে স্থান শত্রুর দুরতিক্রম্য ও দুরধিগম্য বলিয়া অবধারিত হইত, সেই সেই স্থানে নিজের ও পুরস্ত্রীবর্গের রক্ষণ-বিধানের নিমিত্ত প্রাসাদ ও দুর্গনির্ম্মাণের ব্যবস্থা হইত। যে সময়ে হিমালয়-শৃঙ্গের ন্যায় উচ্চতরঙ্গরাশির উৎপাদন করিয়া জলরাশির উপরে সন্তরণশীল ভীষণ যাদঃ-কুলের ভীষণ আকার প্রদর্শন করিয়া রুদ্ররূপী অসীম সমুদ্র মানবমনে বিভীষিকা উৎপাদন করিত, সে সময়ে শত্রুর অনধিগম্য মনে করিয়া তাহার বেলাভূমিতে রাজারা রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করিলেন; আবার যখন বিদেশেও পোত-নির্ম্মাণ-পদ্ধতি ও সমুদ্রবক্ষে পোত-সঞ্চালনের শিক্ষা প্রসার লাভ করিল, বিদেশীয়দিগের নিকটেও যখন সমুদ্র অবাধ প্রশস্ত রাজমার্গ বলিয়া পরিচিত হইল; তখন সেই দ্বারে শত্রুদিগকে বাধা দিবার নিমিত্ত সেই স্থানে সেই প্রাসাদের সঙ্গে দুর্ভেদ্য রাজদুর্গের সৃষ্টি হইল। সেই সেই কারণে সমুদ্রকূলে পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে দুর্গনির্ম্মাণ, একাম্র-কাননে (ভুবনেশ্বরে) প্রাসাদ-নির্ম্মাণ, বৈতরণীতীরে যাজপুরে রাজদুর্গনির্ম্মাণ ও

* কটকে আমি যে বাসায় অবস্থিতি করিতেছি, তাহার সন্নিধানে কয়েকটি অশিক্ষিত মৎস্যজীবী বাস করে। তাহারা সময়ে অসময়ে উৎকলি-ভাষায় অনূদিত গীতগোবিন্দের গান করে ও সেই সঙ্গে সঙ্গে মূল গীতগোবিন্দের ২।১টি দীর্ঘ ছন্দের কবিতা আবৃত্তি করে; আশ্চর্য্যের বিষয়, সেই নিরক্ষর ইতর শ্রেণীর উচ্চারণে অতি অল্পই ছন্দপাত লক্ষিত হয়। আমার পূর্ব্বোক্ত অনুমানের ইহাও একটি সাধক।

মহানদী দ্বারা বলয়াকারে বেষ্টিত কটক নগরে দুর্ভেদ্য রাজদুর্গের সৃষ্টি হইয়াছে।

উত্তালতরঙ্গসঙ্কুল ঘাট-পর্ব্বত-শ্রেণীর পাদদেশ পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ গিরিনিঃসৃত নির্ঝরমালা দ্বারা স্ফীতবক্ষা মহানদীর তীরভূমিতে দুর্গম কটকদুর্গ অবস্থিত ছিল, দুর্গের চতুর্দ্দিকে হীরক-হারের ন্যায় স্বচ্ছবীচিমালালঙ্কৃত দুর্গপরিখা ছিল, মহানদীর সহিত সেই পরিখার সম্বন্ধ ছিল, ইচ্ছা করিলে যন্ত্র দ্বারা পরিখার জল নিঃসারিত করিয়া পরিখাকে শুষ্ক করা যাইত, আবার ইচ্ছা করিলে মহানদীর জলরাশি দ্বারা পরিখাকে পূর্ণ করা যাইত। আজ কেবল শুষ্ক কর্ত্তিত ভূমিভাগ ও তাহার সহিত মহানদীর সন্ধিস্থান দেখিয়া আমরা তাহার অবধারণ করিতে পারি। এক্ষণে সে দৃঢ় দুর্গের কিছুই নাই, আছে কেবল তোরণদ্বারের কিয়দংশ আর দুর্গমধ্যে অবস্থিত শ্রেণীবদ্ধ চূড়াত্রিতয়-বিশিষ্ট একটি মাত্র গৃহ। দূর হইতে গৃহটির চূড়ার অবস্থান দেখিলে মুসলমানের সমাধি-মন্দির বা উপাসনা-মন্দির বলিয়া ভ্রম হয়। কিন্তু এই গৃহে কটকেশ্বরী কটকচণ্ডী বাস করিতেন। বলিতে হইবে, মুসলমানেরা হিন্দুস্থানে আসিয়া নানা আকারের হিন্দুর দেবমন্দির ও বাসভবন দেখিয়াছিলেন; তন্মধ্যে যে প্রণালীর গৃহ মুসলমানদিগের মনোনীত হইয়াছিল, তাঁহারা হিন্দুস্থপতি দ্বারা উপাসনার জন্য ও সমাধির জন্য সেই প্রণালীর গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া ছিলেন। পরে হিন্দুরা মুসলমান-গৃহীত প্রণালী পরিহার করিয়া মুসলমানের অবলম্বিত প্রণালীর গৃহ হইতে স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিবার উদ্দেশে স্বতন্ত্র প্রণালীতে দেবমন্দির নির্ম্মাণ করাইতেন। হিন্দুগৃহের আকার স্বতন্ত্র, বৌদ্ধ-গৃহের আকার স্বতন্ত্র, মুসলমান-গৃহের আকার স্বতন্ত্র, এই সিদ্ধান্তের মূলে কটকচণ্ডীর সেই প্রাচীন মন্দিরটি সবলে কুঠারাঘাত করিতেছে। সুতরাং দেবগৃহের আকৃতি-গঠন দেখিয়া আমরা আর কোনরূপ স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিতেছি না।

দুর্গের ও রাজ্যের কটকচণ্ডীই রক্ষা-বিধাত্রী ছিলেন। রামায়ণে দেখিতে পাই, রাবণপূজিতা কোন শক্তির সহিত হনুমানের প্রথম সাক্ষাৎকার হয়। হিন্দুরা যখন শক্তির উপাসক ছিলেন, জাগ্রতশক্তিও তখন হিন্দুর ও হিন্দুস্থানের রক্ষা বিধান করিতেন, তাই প্রত্যেক হিন্দুর রাজপ্রাসাদে শক্তিমূর্ত্তির বিকাশ। এতদ্দেশের প্রচলিত কিম্বদন্তী,—বিজয়ী মুসলমানেরা এই দুর্গের কিছুই করিতে পারেন নাই, হিন্দুসেনানী পরাভূত হইলে হিন্দুসৈন্য চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইলে স্বয়ং কটকচণ্ডী দুর্গদ্বারে অবতীর্ণ হইয়া স্বহস্তে তোপ চালাইয়াছিলেন। তাই, বলোন্মত্ত কালাপাহাড়ের কঠোরঅমেধ্য হস্তে অন্যান্য দেবমূর্ত্তির মত কটকচণ্ডীর লাঞ্ছনা হয় নাই, তিনি সেই পবিত্র মূর্ত্তিকে স্পর্শ পর্য্যন্ত করিতে পারেন নাই। যে কারণেই হউক, কটকচণ্ডী আজও অক্ষত শরীরে কটকে অবস্থান করিতেছেন। কটকচণ্ডী ভগ্ন দুর্গ হইতে অন্যত্র নীত হইয়া অপেক্ষাকৃত নবনির্ম্মিত-একটি গৃহে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন। কত যুগযুগান্তর অতিবাহিত হইয়াছে, এখনও দেবীমূর্ত্তির অঙ্গজ্যোতিঃ

বিনষ্ট হয় নাই, এখনও প্রত্যেক অঙ্গে মসৃণতা আছে, স্নিগ্ধতা আছে; বোধ হয় যেন প্রবীণ ভাস্কর এইমাত্র কৃষ্ণপ্রস্তর-ফলক হইতে মূর্ত্তিটির উৎকীরণ করিয়াছেন। চণ্ডীর সস্মিত মুখমণ্ডল দেখিলে, তাঁহার বিস্তৃত দয়ার্দ্র নয়ন-ত্রিতয় দেখিলে, হস্ত-চতুষ্টয়ের মধ্যে দুইখানি হস্তে বরাভয়ের ভাব স্পষ্টতঃ লক্ষ্য করিলে স্বতঃই দেবভাব আসিয়া হৃদয়কে অধিকার করে, মনঃপ্রাণ মুগ্ধ হইয়া যায়, ভক্তিতে হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। ইহাই প্রকৃত ভাস্কর্য্যের নিদর্শন, ইহাই প্রকৃত সৌন্দর্য্যের বিজ্ঞাপক। এই স্থানে কোন অভিমানী শিক্ষিত বাঙ্গালীর মুখে শুনিলাম, "কোন অজ্ঞাত কারণে মুসলমানের হাত হইতে কটকচণ্ডীর রক্ষা হইয়াছিল বলিয়া এইরূপ আখ্যায়িকার সৃষ্টি হইয়াছে, নয় ত হিন্দুরা তোপ পাইবেন কি করিয়া? মুসলমানের অধিকারের সময়ে এ দেশে ইউরোপীয়দিগের আগমন হইয়াছিল, তাঁহাদিগের নিকট হইতে মুসলমানেরা অনেকটা ইয়ুরোপীয় প্রণালীর যুদ্ধ শিক্ষা করিয়াছিলেন, সেই সঙ্গে সঙ্গে এদেশে আগ্নেয়াস্ত্রের আমদানি হইয়াছে।" তাঁহাদিগের এই কথার পূর্ব্বাংশ সত্য হইলেও হইতে পারে; কিন্তু শেষাংশের বিরুদ্ধে ইউরোপীয় পণ্ডিতেরাই যখন সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন; তখন ভারতে বাস করিয়া ভারতবাসী জগদ্‌গুরু ব্রাহ্মণবংশে জন্ম-গ্রহণ করিয়া কি করিয়া তাঁহাদিগের এই মতের সমর্থন করিব? কল্যাণভাজন শ্রীযুক্ত পণ্ডিত উমেশচন্দ্র গুপ্ত বিদ্যারত্ন মহাশয় এক বেদ হইতেই প্রাচীন ভারতে আগ্নেয়াস্ত্র (তোপ), বাষ্পীয়-পোত, বাষ্পীয়-শকট, তদুপযোগী লৌহবর্ম্ম, ব্যোমযান প্রভৃতি ছিল প্রমাণ করিতেছেন। তাঁহার সেই যুক্তিভিত্তিক গবেষণাপূর্ণ নিদ্ধারণের উপরে কাহারও কিছু বলিবার নাই। তবে তিনি যে "আয়স" এই বিশেষণ পদ দেখিয়া বেদোক্ত "বজ্র"শব্দের তোপ অর্থ করিয়াছেন, সেই বিষয়ে আমি সংশয়শূন্য হইতে পারি নাই। বিশ্বকর্ম্মা দ্বারা ইন্দ্র বজ্র নির্ম্মাণ করাই-তেন, মহাভারত ও পুরাণে আছে; তোপ ও বন্দুকের ন্যায় বজ্রও লৌহ দ্বারা নির্ম্মিত হইত, এ কথা বেদে আছে; তথাপি বজ্রকে তোপ ও বন্দুক বলিতে সাহস হয় না। বজ্রের অপর নাম"শতকোটি"; অস্ত্রের অগ্রের নাম কোটি, যে অস্ত্রের একশত বা বহু অগ্রভাগ আছে, তাহার নাম শতকোটি। তোপ বা বন্দুকে আমরা বহুসংখ্যক অগ্রভাগ দেখিতে পাই না। বীরপুরুষের দেহ বজ্রের ন্যায় কঠিন,—"বজ্রসংহননো যুবা"। সংস্কৃত সাহিত্যে আমরা এ ভাবের কথা অনেকবার দেখিয়াছি. লৌহনির্ম্মিত বজ্র এই জন্য বজ্রের ন্যায় কঠিন বলা অপেক্ষা লৌহবৎ-কঠিন বলাই সহজ ও সুবোধ্য। লৌহ দ্বারা বজ্র নির্ম্মিত হইলেও কোন রূপ প্রণালীতে বজ্রকে লৌহ অপেক্ষা কঠিন করা হইত। বজ্রের ন্যায় কঠিন বলিয়াই হয় ত হীরকের নাম বজ্র হইয়াছে। বাষ্পীয়-পোত, বাষ্পীয়-শকট, লৌহবর্ম্ম, ব্যোমযান প্রভৃতি বেদে আছে বলিয়া বিদ্যারত্ন মহাশয় যে সকল যুক্তি প্রদান করেন, তাহাতে একমত হইলেও উল্লিখিত কারণে "বজ্র"কে তোপ, বন্দুক বলিতে পারি

না। আমার বিশ্বাস, পূর্ব্বকালে বিদ্যুৎবর্ষী কোনরূপ অস্ত্র ছিল, সেই অস্ত্রের তীক্ষ্ণধার অনেকগুলি অগ্রভাগ ছিল, সেই প্রত্যেক অগ্রভাগ হইতে বিদ্যুৎ ক্ষরিত হইত, তাহাকেই হিন্দুরা বজ্র বলিতেন। এই বজ্রাস্ত্রের আবিষ্কার করিতে যাইয়া সেই বজ্রাগ্নি দ্বারা মহর্ষি দধীচি দগ্ধ হইয়াছিলেন। তাই, দধীচির অস্থি দ্বারা বজ্র নির্ম্মিত, পুরাণে এই কথা লিখিত হইয়াছে। দধির আবিষ্কার করিয়াছেন বলিয়াই হউক, বা বজ্রাগ্নি হইতে আত্মরক্ষার নিমিত্ত সর্ব্বাঙ্গে দধি ম্রক্ষণ করিয়াছেন বলিয়াই হউক দধীচির নাম দধীচি হইয়াছে। থিমিস্‌টিয়াস (Themistias), এলফিন্‌ষ্টোন্ (Elphinstone) হিন্দুদিগের বিদ্যুৎবজ্র দ্বারা যুদ্ধের উল্লেখ করিয়াছেন। এ্যালেকজাণ্ডার (Alexander the Great) তাঁহার গুরু আরিষ্টোটলকে (Aristotle) ও ঐরূপ মর্ম্মে পত্র লিখিয়াছিলেন। ফিলোস্‌ট্রেটাস্ "হিন্দুরা ঝটিকা ও বজ্র দ্বারা শত্রুকে বাধা দিতে সমর্থ" স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ করিয়াছেন। ঝটিকার উল্লেখ করাতে স্পষ্টতঃ বায়ব্যাস্ত্রের কথা বুঝিতে পারা যায়। বিশ্ববিজয়ী গ্রীক্ সৈনিক-পুরুষগণ ও জ্ঞানী গ্রীক্ পরিব্রাজকগণ যখন সমস্বরে হিন্দুর এই অদ্ভুত ক্ষমতার বর্ণনা করিয়াছেন, তখন রামায়ণ-মহাভারতে কথিত অগ্নি, বায়ু, জল প্রভৃতি দৈবাস্ত্রগুলিকে সম্মোহন অস্ত্র দ্বারা সহস্র সহস্র শত্রু-সৈন্যের সম্মোহনের উল্লেখকে গঞ্জিকা-সেবনের ফল বলিয়া বৃদ্ধা পিতামহীর মুখনিঃসৃত বিহঙ্গম-বিহঙ্গমীর রূপকথা বলিয়া, আরব্যোপন্যাস বলিয়া, ভদ্র ভাষায় কবিকল্পনার সৃষ্টি বলিয়া আর উড়াইতে পারা যায় না। যতদিন ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকেরা ব্যোমযানের আবিষ্কার করেন নাই; ততদিন সংস্কৃত সাহিত্যে এবং সংস্কৃত অভিধানে একার্থ বুঝাইবার জন্য এক পর্য্যায়ে "ব্যোমযান" ও "বিমানের" উল্লেখ থাকিলেও, আমরা তাহাতে আস্থা স্থাপন করিতে পারি নাই, কল্পনা-প্রসূত বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছি। বলা বাহুল্য কল্পনাই বিজ্ঞানের জনয়িত্রী। প্রথমে মানুষের মনে কল্পনার আবির্ভাব হয়, সেই কল্পনাই মানুষকে সেই কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করে, কল্পনা কাব্যের সৃষ্টি করিয়া তাহার ফল আনয়নে সমর্থ হইলে সভ্য জগতে বিজ্ঞান বলিয়া পরিচিত হয়। ইউরোপে অদ্যাপি তাদৃশ বিজ্ঞানের উন্নতি হয় নাই, প্রাচীন ভারতের মত ইচ্ছাচালিত ব্যোমযানের সৃষ্টি করিতে ইউরোপ অদ্যাপি অসমর্থ রহিয়াছে। সর্ব্ববিধ্বংসকারী কুরুক্ষেত্রের সেই মহাসমরে বীরপুরুষদিগের, স্থপতিদিগের, চিকিৎসকদিগের মহাযাত্রার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের জ্ঞান, বিজ্ঞান অন্তর্দ্ধান করিয়াছে; ধনুর্ব্বেদ, আয়ুর্ব্বেদ, স্থাপত্য-বিদ্যাও অন্তর্হিত হইয়াছে। সেই মহাসমরের পরে জ্ঞান-বিজ্ঞানের গুরু মহর্ষিরা কোন্ পথে কোন্ অচিন্ত্য দেশে চলিয়া গিয়াছেন, কেহ বলিতে পারে না। শিক্ষকের অভাবে রাজমহিষীরা শিশুরাজকুমারদিগের শিক্ষা-বিধান করিতে পারেন নাই। এই ভাবে বৈদ্যকুমারদিগের আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা হয় নাই, স্থপতিকুমারেরা স্থাপত্যবিদ্যা শিক্ষা করিতে পারে নাই। সেই দিন হইতেই ভারতের সর্ব্বনাশ হইয়াছে, যে দিন ভ্রাতার বিরুদ্ধে ভ্রাতা, পিতামহের বিরুদ্ধে পৌত্র, গুরুর বিরুদ্ধে শিষ্য অস্ত্র ধারণ করিয়াছে, পূজনীয়া অনিন্দ্যচরিতা পুরস্ত্রীর লাঞ্ছনা করিবার জন্য যে দিন দুর্ব্বৃত্তের পাপহস্ত প্রসারিত হইয়াছিল, অথচ সমাজের নেতৃবৃন্দ

তাহাকে বাধা দিবার জন্য সাহসী হয়েন নাই, সেই দিন হইতেই ভারতের অধঃপতনের সূত্রপাত হইয়াছে। এই সূত্রে ভারতের ভাগ্যবিধাতা ভারতের ভাগ্য পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। আর ময়নির্ম্মিত ইন্দ্রপ্রস্থের সেই জগৎবিস্ময়কর সভামণ্ডপের মত সভাগৃহ ভারতের বক্ষে প্রতিষ্ঠিত হইবার সম্ভাবনা নাই, মনুষ্যের বর্জনীয় দেহাবয়বে বলিষ্ঠ পশুর দেহাংশ সংযোজিত হইবার সম্ভাবনা নাই, বিমানে আরোহণ করিয়া মেঘবিদ্যুৎবিভূষিত নীলাকাশে বিচরণ করিয়া পৃথিবীর চিত্র বিলোকন করিয়া মুগ্ধ হইবার আশা নাই। অভিজ্ঞান শকুন্তলে রাজা দুষ্মন্তের স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে অবতরণের বর্ণনা পাঠ করিয়া কে বলিবে কবি কালিদাস ভারতেশ্বরের সহায়তায় অন্ততঃ একবারও আকাশপথে বিচরণ করেন নাই। যে দেশে মুদ্রার পরিবর্ত্তে মুক্তাই দ্রব্যসমূহের মূল্য প্রদানের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল, * সে দেশে এক্ষণে মুক্তা দুর্লভ, শুক্তি আর নিজগর্ভে মুক্তা ধারণ করে না. রাজমহিষীরাও আর মুক্তাহার দ্বারা লাবণ্য তরঙ্গিত উন্নত বক্ষঃস্থলের শোভাবর্দ্ধন করিতে সমর্থ হয়েন না। পুরাকালের মত ভূতত্ত্ববিৎ খনিলক্ষণবিৎ পণ্ডিতের অভাবে হীরকখচিত স্বর্ণসিংহাসনে আরোহণ করা দূরের কথা, উৎকলের রাজবৃন্দ ক্ষুদ্র অঙ্গুরীয়কেও এক্ষণে ক্ষুদ্র হীরক সংযোগ করিতে অসমর্থ হইয়াছেন। ভারতবাসীর অজ্ঞাতসারেই ভূগর্ভ হইতে খনি হইতে ধাতুসংগ্রহের ব্যবস্থা, রত্ন-আহরণের প্রণালী অন্তর্হিত হইয়াছে। ম্যাঞ্চেষ্টারের বণিক্‌কুলের করুণায় যেমন দেশীয় বস্ত্রবয়নের পদ্ধতি নির্ব্বাণোন্মুখ হইতেছিল, স্বদেশী আন্দোলন না হইলে ভবিষ্যৎ বিংশতি বর্ষের মধ্যে যেমন তন্তুবায়-কুল বয়ন-পদ্ধতি একেবারে ভুলিয়া যাইত, বিদেশীয় বণিকদিগের অনুকম্পায় ভারতে সেইরূপ মণি-আহরণবিদ্যা বিলুপ্ত হইয়াছে। রত্নাকরের তীরে অবস্থিত রত্নাকরসমূহ বক্ষে ধারণ করিয়াও আর উৎকল সেই খনিগুলি চিনিয়া বাহির করিতে পারে না, গড়জাতের রাজন্যবৃন্দ প্রজার নিকট হইতে বার্ষিক কর আহরণ করিয়াই নিশ্চিন্ত, আর সেই সমস্ত খনির অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয়-তার উপলব্ধি করিতে পারেন না, কেহ বা বুঝিয়াও অর্থব্যয়ের সফলতায় ও পরিশ্রমের কৃতার্থতায় সন্দিহান হয়েন। এখনও উড়িষ্যার নানা স্থানের দরিদ্র কর্ম্মকারকুল প্রস্তরখণ্ড হইতে লৌহ সংগ্রহ করে ও সেই লৌহ হইতে মণ্ডুর (লৌহমল) নিঃসরণ করিয়া কার্য্যোপযোগী করিয়া লয়। বলা বাহুল্য যে, ইউরোপীয়দিগের ভারতাগমনের পূর্ব্বেও ভারতবাসী কাংস্যপাত্র ও পিত্তলের ভাণ্ড ব্যবহার করিতে অভ্যস্ত ছিল, সুতরাং তাহারা কাংস্য প্রস্তুত ও পিত্তল-প্রস্তুতের পদ্ধতি অবগত ছিল। কল্যাণভাজন শ্রীযুক্ত পণ্ডিত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের সংগৃহীত "রত্নপরীক্ষা" পাঠ করিলেই আমার কথার যাথার্থ্য পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিবেন। তাহা পাঠে জানা যায়, এদেশে ব্রোঞ্জ (Bronze) পর্য্যন্ত প্রস্তুত হইত। কোণার্কের মন্দিরের সন্নিধানে অবস্থিত সুদীর্ঘ লৌহময় বীম দেখিবার পূর্ব্বে কে বিশ্বাস করিত যে বিগত বৎসরের ভিতরে যে লৌহময় বীম ব্যবহারের প্রচলন হইয়াছে, তাহার অনেক শত বর্ষ পূর্ব্বেও ভারতে তাহার ব্যবহার ছিল।

(ক্রমশ)

শ্রীযাদবেশ্বর তর্করত্ন।

* Travels of Yuan Chwang, Mr. Watters, II. 196-7

২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিসন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত

বঙ্গদর্শন

বরেন্দ্র-ভ্রমণ।

পত্নম-সহর।

বরেন্দ্রভূমির পল্লীপথ কখন ধূলায়, কখন কাদায় সম্পূর্ণ সমাচ্ছন্ন থাকে। দরিদ্র পল্লীবাসিগণকে তাহার উপর দিয়াই প্রতি দিবসের সুখদুঃখ লইয়া যথাসম্ভব অধ্যবসায়ের সঙ্গে ইতস্ততঃ যাতায়াত করিতে হয়। সে পথ নাগরিকবর্গের পক্ষে নিয়ত ক্লান্তিজনক। কিন্তু তাহারই উভয় পার্শ্বে অতীত গৌরবের নানা কীর্ত্তিচিহ্ন ভগ্নাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। দেশের কথা জানিতে হইলে সে পথে পদার্পণ করিতে হইবে। তাহা সকল সময়ে সকলের পক্ষে সুখকর বলিয়া কথিত হইতে পারে না। যানবাহন সর্ব্বত্র সুলভ নয়, সকল স্থানে তাহাদের গতিবিধির পক্ষে সুব্যবস্থা করাও সকল সময়ে সম্ভব হয় না, সুতরাং পদার্পণ-ব্যাপারটি কখন কখন নিষ্ঠুর গদ্যের মত প্রতিভাত হইতে পারে। জলাশয়ের অভাব নাই,—সুপেয় সলিলের অভাব; দর্শনীয় বস্তুর অভাব নাই,—আশ্রয়-স্থানের অভাব। এরূপ অনেক অভাব অনেক স্থলেই পরিদর্শন-ব্যাপারের অনিবার্য্য ক্লেশ চিরসঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে।

এবার শীতের শেষে,—বসন্তোদয় সময়ে, বরেন্দ্রের এইরূপ দুরধিগম্য পল্লীপথে একটি সুদীর্ঘ ভ্রমণ-ব্যাপারের আয়োজন আরব্ধ হইয়াছিল। "মৃগয়া" না হইলেও, কাহারও কাহারও বিচারে তাহা "ব্যসন" বলিয়াই প্রতিভাত হইয়াছিল। কারণ, এই অভিযানটি কেবল ঐতিহাসিক তত্ত্বানুসন্ধানের উদ্দেশ্যেই সংকল্পিত হইয়াছিল। তজ্জন্য বিশ্বনিন্দুকের মুখে নানা তর্ক ফুটিয়া উঠিয়াছিল,—"মাথা নাই, মাথা ব্যথা; ইতিহাস নাই, ঐতিহাসিক তত্ত্বানুসন্ধান!" কিন্তু অভিযানটি কিছুতেই "মাঠে মারা" গেল না; কুমার শরৎকুমার রায় বাহাদুরের পরিচালন-কৌশলে সকল দ্বিধা, সকল অতিসাবধানতা, সকল বাধা, সকল বিতর্ক অতিক্রম করিয়া, যাত্রাপথে দণ্ডায়মান হইল।

নিরক্ষর পল্লীবাসীর নিকট তাহা প্রথমে একটি মৃগয়া-ব্যাপার বলিয়াই প্রতিভাত হইয়া থাকিবে। কারণ, হস্তী ছিল, বন্দুক ছিল, লোকলস্কর ছিল, পটাবাস ছিল, চিত্র-সংগ্রহের জন্য বিচিত্র যন্ত্রপত্র ছিল। গোটা

কম্বল ছিল, বিছানা-বালিশ ছিল, বোতল-গেলাশ ছিল, খন্তা কুড়ালি ও কোদালিগুলি গোযানের উপর হইতে তাহাদের চিরপরিচিত অশোভন অঙ্গশোভা বাহির করিয়া, পল্লীবাসিগণকে বিস্মিত করিয়া তুলিয়াছিল।

বিস্ময়ের উপর বিস্ময়; সাহেব নয়, কেবল বাঙ্গালী; ছোট, বড়,
—কায়া, বপু, কলেবর! কেহ বাঘের সন্ধান লইতে লালায়িত নয়; অথচ বাঘের দেশে অগ্রসর হইতেছে। এরূপ উদ্দেশ্য লইয়া, এরূপ অভিযান ইহার পূর্ব্বে এ দেশে আর কখনও এরূপ বিজয়-যাত্রায় বহির্গত হয় নাই। সুতরাং যাঁহারা অকারণ বিভীষিকায় বা স্বভাবসুলভ নিদ্রাপরতন্ত্রতায় ইহার সঙ্গে যোগদান করিতে পারিলেন না, তাঁহারা "শিবাস্তে পন্থানঃ" বলিয়া বিদায় দান করিলেন। যাঁহারা অগ্রসর হইলেন, তাঁহারা কথা-কৌতুকে পল্লীপথ মুখরিত করিয়া তুলিলেন।

পথপার্শ্ব হইতে গোপালকগণের সকল শাসন অতিক্রম করিয়া, সুরভিনন্দিনীগণ ঊর্দ্ধপুচ্ছে পলায়নপর হইল; মহিষেরা কিছু সাহসী,—দূরে সরিয়া দাঁড়াইয়া, নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত করিতে করিতে, চাহিয়া দেখিতে লাগিল;—চারিদিকে ধূলা উড়িয়া, বসন্তের সকল শোভা আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল! নগর হইতে পাঁচ ক্রোশের মধ্যেই প্রথম 'জয়-স্কন্ধাবারে'র স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। রথারোহণে অর্দ্ধপথ অতিক্রম করিতে না করিতেই, কেহ কেহ জলযোগের জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। ব্যবস্থাগুণে ধূলার মধ্যেও তাহার অসুবিধা ঘটিতে পারিল না।

ক্রমে সন্ধ্যা ঘনীভূত হইয়া আসিতে লাগিল, কিন্তু অন্ধকার ঘনীভূত হইতে পারিল না। মেঘমুক্ত সুনীল গগনতলে শুক্লপক্ষের সুবিমল শীতল কিরণ চারিদিক এক অপূর্ব্ব শোভায় উদ্ভাসিত করিয়া তুলিল। যাহা কিছু কুৎসিত ছিল, তাহা আর দেখা যায় না; যাহা দেখা যায়, তাহার উপর রজতকিরণের বিচিত্র মোহাবরণ ইন্দ্রজালের মত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। দূরে দীপ জ্বলিয়া উঠিল,—একটি, দুইটি, অনেকটি,—ক্রমে তাহা নিকট হইতে নিকটতর হইতে লাগিল। তাহাই অবশেষে 'জয়স্কন্ধাবারে'র আলোকমালা বলিয়া প্রকাশিত হইয়া পড়িল।

পথের ধারে মাঠ,—মাঠের ধারে একটি ক্ষুদ্র খাড়ি, খাড়ির ধারে কয়েকটি অতীত সাক্ষী মহামহীরুহ,—তাহারই অনতিদূরে এক সদ্য সুমার্জ্জিত বিস্তৃত প্রাঙ্গণভূমির এক পার্শ্বে একখানি সুসজ্জিত কুটির; অপর পার্শ্বে ছোটবড় পট্টাবাস;—তাহার সম্মুখে কদলী-তোরণ, পুষ্পগুচ্ছ, আলোক-মালা, পূর্ণকুম্ভের উপর নববিকশিত আম্র-মঞ্জরীর মাঙ্গলিক বিচিত্র বিন্যাস। পথশ্রান্ত সাহিত্যিকবর্গ সে প্রাঙ্গণে আসন গ্রহণ করিবা মাত্র, চা, ডাব, সরবং আসিয়া তাহাদিগকে যথোপচারে অভ্যর্থনা করিয়া লইল।

তখন "দিবসাঃ পরিণাম-রমণীয়াঃ"; —কিছু কিঞ্চিৎ শীত থাকিলেও, তাহা "উপভোগক্ষমঃ।" কেবল শীত কেন, সকল ব্যবস্থাই "উপভোগক্ষমা" বলিয়া মানিয়া লইতে হইল। বরেন্দ্রভূমির পুরাতন আতিথ্য-গৌরবের মর্য্যাদা-রক্ষার প্রশংসনীয় প্রবল

উদ্যমে জনৈক মুসলমান জমিদার তাঁহার পাত্রমিত্র সমভিব্যাহারে সময়োচিত বিনম্র আপ্যায়নে সাহিত্যিকবর্গের যেরূপ সাদর অভ্যর্থনা সুসম্পন্ন করিলেন, তাহাতে কাহারও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের অবসর রহিল না। গড়-গড়ার উপর হইতে তাম্রকূটের কুণ্ডলায়িত ধূমপুঞ্জ আকাশমণ্ডলে সুগন্ধ বিস্তার করিয়া, বিনা বাক্যব্যয়ে 'জয়স্কন্ধাবারে'র সকল স্থানে আরাম-আনন্দের সুসমাচার প্রচারিত করিয়া দিল।

বরেন্দ্রের নতোন্নত পুরাতন পল্লীভূমি বহুদিন জনশূন্য অবস্থায় পড়িয়া ছিল। সম্প্রতি সাঁওতাল পাহাড়িয়া প্রভৃতি কর্ম্মঠ কৃষক আসিয়া হলকর্ষণের সূত্রপাত করিতেছে। তাহারা জয়স্কন্ধাবার হইতে সসম্ভ্রমে দূরে দাঁড়াইয়া, তাহাদের কৌতূহল-পূর্ণ নয়ন সকল আলোকপুলকে "ঝলকিত" করিয়া তুলিতেছিল। কোন কোন সাহিত্যিক তাহাদিগকে পট্টাবাসের মধ্যে টানিয়া আনিয়া যন্ত্র সাহায্যে তাহাদের মাথা মাপিতে প্রবৃত্ত হইবা মাত্র, তাহাদের সকল কৌতূহল এক অনির্ব্বচনীয় বিভীষিকায় পরিণত হইয়া পড়িল। কাব্যামোদিগণ প্রভাতে পল্লীচিত্র সংগৃহীত করিবার আশায়, যন্ত্রগৃহ সুবিন্যস্ত করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। ঐতিহাসিক সম্প্রদায় পল্লীবাসি-গণকে সস্নেহে প্রত্যভিবাদন করিয়া, বিচিত্র মানচিত্রের উপর রেখাপাত করিতে করিতে নানা স্থানের পরিচয় সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সে দৃশ্য অনুভব করিবার,—অনুভব করিয়া বঙ্গসাহিত্যের গৌরব উপ-ভোগ করিবার;—তাহা ভাষায় প্রকাশিত করিবার নহে। সদ্ভাব, সদালাপ, সাধু-সংকল্প, উদ্যম, অধ্যবসায়, অপরাজিত উৎসাহ, যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া দেদীপ্য-মান!

যেখানে এই "জয়স্কন্ধাবার" এরূপ সুব্যবস্থায় সুসংস্থাপিত হইয়াছিল, তাহার নাম পলাশবাড়ী, থানা গোদাগাড়ী, জেলা রাজসাহী। পলাশবাড়ীর অনতিদূরে এক দিকে পালপুর,—তাহার উত্তরে পশ্চিমে এবং দক্ষিণে দুর্গপরিখার পুরাতন চিহ্ন এখনও সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই। তাহার নিকটে ধরমপুর; তাহার ডাকনাম পালপুর, ধরমপুর, উপকণ্ঠ এখনও "মালঞ্চ" নামে কথিত হইয়া আসিতেছে। পলাশবাড়ীর একপার্শ্বে যে খাড়িটি বর্ত্তমান, তাহা ক্ষুদ্র হইলেও, সুগভীর। তাহার উপর একটি সেতু; তাহা উত্তীর্ণ হইলেই একটি পুরাতন পল্লী। তাহা এখন "দেওপাড়া" নামে সুপরিচিত। দেওপাড়ার নাম সকল সভ্য-দেশের সাহিত্যেই স্থানলাভ করিয়াছে; সুতরাং তাহা এক্ষণে জগদ্বিখ্যাত। এই খ্যাতির মূল একখানি পুরাতন প্রস্তরলিপি।

এই পল্লীটি এখনও একরূপ জনশূন্য বলিলে অত্যুক্তি হয় না; অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে ইহার অবস্থা আরও শোচনীয় ছিল। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে মেটকাফ্ সাহেব এখানে মৃগয়া উপলক্ষে উপনীত হইয়া, একটি বিস্তৃত সরোবর তীরে কতকগুলি প্রস্তরখণ্ডের মধ্যে একখানি প্রস্তরে একটি প্রাচীন লিপি খোদিত থাকা দেখিতে পাইয়া, তাহা এসিয়াটিক সোসাইটিতে পাঠাইয়া-লেন সে প্রস্তর-লিপি এখ

কলিকাতার "যাদুঘরে" সযত্নে সুরক্ষিত হইতেছে।

যে সরোবরতীরে এই পুরাতন প্রস্তরলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তাহা এখনও বর্ত্তমান আছে;—এখনও তাহার জল তক্ তক্ করিতেছে। এক পার্শ্বে পদ্মবন সমুদ্ভূত হইয়া, তাহার স্বাভাবিক শোভা বর্দ্ধিত করিয়া তুলিয়াছে। এই সরোবরে অবতরণের জন্য সোপানাবলী ছিল; তাহা অদৃশ্য হইলেও, তাহার স্থান-নির্দ্দেশের সম্ভাবনা তিরোহিত হয় নাই। সাহিত্যিকবর্গ প্রত্যুষে শিবির ত্যাগ করিয়া, পদব্রজে এই সরোবরতীরে উপনীত হইবা মাত্র, ইহার শোভা-সন্দর্শনে পুলকিত হইয়া উঠিলেন।

"কিবা মধুর সরসী শোভা।
নিরমল পরিপূরিত জল,
এহি কত কত ভাঁতি কমল,
অতুলিত অলি বলিত মঞ্জু গুঞ্জত চিতলোভা।

সরোবরটি সুবিস্তৃত বলিয়াই কথিত হইতে পারে। তীরভূমিতে পুরাতন প্রাসাদাবলীর ধ্বংসাবশেষ ভূগর্ভে বিলীন হইয়া রহিয়াছে। উত্তরতীরে একটি সুবিস্তৃত ভূমিখণ্ডের সকল স্থানে ইষ্টকচিহ্ন; একটি স্থান "দরগা" বলিয়া সুপরিচিত। কাহার "দরগা" কবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, কতদিন হইতে ভগ্নস্তূপে পর্য্যবসিত হইয়াছে, কেহ তাহার সন্ধান প্রদান করিতে পারে না। মুসলমান-শাসন প্রবর্ত্তিত হইবার প্রবল প্রকোপের সময়ে যে সকল "দরগা" সগৌরবে আকাশে মস্তকোত্তোলন করিয়াছিল, তাহার অনেক "দরগা"ই এখন এই রূপে ভূমি চুম্বন করিয়া, ক্রমে চিহ্নহীন হইয়া পড়িতেছে! ইহাও সেইরূপ একটি জয়পরাজয়ের কীর্ত্তিচিহ্ন;—কালের কঠোর শাসনের অসংদিগ্ধ নিদর্শন। "দরগা" ছিল; তাহার স্মৃতি এখনও একেবারে বিলুপ্ত হইয়া পড়ে নাই। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে কি ছিল, সে স্মৃতি একেবারে বিলুপ্ত হইয়া পড়িয়াছে! কেবল একটি অতীত সাক্ষী স্মৃতিচিহ্ন "দরগা"র ধ্বংসাবশেষের পার্শ্বদেশে নীরবে কালগণনা করিতেছিল। তাহা একখানি মসৃণ কৃষ্ণপ্রস্তর;—সুবিন্যস্ত শিল্পকৌশলে সুরচিত মকরমুখের ভগ্নাবশেষ!

এখানে একদিন এক দেবমন্দির ছিল, তাহার উপর "দরগা" উঠিয়াছিল; এখন আবার "দরগা"র ধ্বংসাবশেষের উপর এক বিল্ববৃক্ষ জন্মগ্রহণ করিয়াছে। লোকে তাহার ফলের উপর হস্তার্পণ করে না; ভূপতিত হইলেও, আহরণ করিবার জন্য সাহস প্রকাশ করে না। একবার এক হতভাগ্য যুবক একটি ফল পাড়িতে গিয়া জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছে; তাহার কথা এখনও পল্লীসমাজকে সন্ত্রস্ত করিয়া রাখিয়াছে; পল্লিবাসিগণ যুবকের দুরাকাঙ্ক্ষা প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল;—যুবক ইংরাজ;—সে কাহারও কথায় কর্ণপাত না করিয়া, যেমন তাহার বন্দুকের সাহায্যে ফল পাড়িবার উপক্রম করিল, অমনি তাহার গুলি তাহারই মস্তক ভেদ করিয়া বাহির হইয়া গেল! যুবকের নাম বারক্লে। হতভাগ্য বারক্লে জীবনের কত আশা লইয়া এদেশে আসিয়া, এইরূপে অকালে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিল! বারক্লে লেখকের সহিত সুপরিচিত

ছিল ;—এই গ্রামে এই সরোবর-তীরে তাহার আপন বন্দুকেই তাহার অকাল মৃত্যু সংঘটিত হইয়াছিল ;—এ সকলই সত্য কথা। কিন্তু এইরূপে এই চৈত্যবৃক্ষের ফলা-হরণ করিতে গিয়াই যে দুর্ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা এখানে আসিয়া প্রথম অবগত হইলাম। কি জানি কেন,—একটি ফল লইয়া বারক্রের সমাধির উপর রাখিয়া আসিতে ইচ্ছা হইল ; কিন্তু বৃক্ষে তখন ফল ছিল না! তাহার উদ্দেশে অজ্ঞাতসারে একবিন্দু অশ্রু ঝরিয়া পড়িল!

সরোবরটির নাম "পদুম-সহর"। পল্লীর মধ্যে আরও দুইটি পুরাতন সরোবর আছে,—একটির নাম "শীতল সহর", আর একটির নাম "ওপ্‌সহর", সরোবরের এরূপ নাম অন্য কোন স্থানে প্রচলিত আছে কি না, জানি না। এরূপ নামকরণের কারণ কি, কেহ তাহার সন্ধান প্রদান করিতে পারে না। "পদুম-সহরের" পূর্ব্বতীরে এক বিস্তৃত ভূমিখণ্ড ; তাহার উপর দিয়া আধুনিক রাজপথটি উত্তরাভিমুখে চলিয়া গিয়াছে। সেই পথের পূর্ব্বধারে—পথ হইতে অনতি-দূরে—মেট্‌কাফ্‌ সাহেব প্রস্তরলিপি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। লিপিটি সংস্কৃত ভাষায় রচিত, পুরাতন বঙ্গাক্ষরে উৎকীর্ণ। তাহা এখন "বিজয়সেন-প্রশস্তি" বলিয়া সুধী-সমাজে সুপরিচিত।

দাক্ষিণাত্যের ব্রহ্মক্ষত্রিয়দিগের সুপরিচিত চন্দ্রবংশে বীরসেন প্রভৃতি কীর্ত্তিমানগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া, বিজয়ী বিজয়সেন এখানে একটি অত্যুচ্চ মন্দির নির্ম্মিত করাইয়া, তন্মধ্যে হরিহর-মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই সকল কথা রাজকবি উমাপতি ধরের রচনা-কৌশলে সুলিখিত, এবং "বারেন্দ্রক-শিল্পি-গোষ্ঠি-চূড়ামণি রাণক শূলপাণি" কর্ত্তৃক প্রস্তরফলকে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। বিজয় সেন দেব সুবিখ্যাত বল্লালসেনের পিতা ;—সেন-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ;—তাঁহার কথা এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত এই দেব-মন্দিরের কথা প্রস্তরফলকে যেরূপ ভাবে লিখিত আছে, তাহা একটি ঐতিহাসিক প্রমাণ বলিয়া স্বীকৃত হইলেও, অতিশয়োক্তির আধার বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। সেকালে এবং একালে,—কোন কালেই মানুষ অতিশয়োক্তির হাত হইতে সম্পূর্ণ পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে নাই ; কখনও পারিবে বলিয়াও বোধ হয় না।

সেকালের আলঙ্কারিকগণের বিচারে অতিশয়োক্তি দোষ-পরিচ্ছেদে স্থান লাভ করিত না, কাব্যের অলঙ্কার বলিয়াই বিবেচিত হইত। এখন এই বিজ্ঞান-যুগের রুচিবিবর্ত্তনে তাহা দোষের মধ্যেই গণ্য হইয়া পড়িয়াছে। এখন মাপকাঠি হাতে লইয়া রচনা-কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার দিন পড়িয়াছে ;—একচুল ইতরবিশেষ হইলেই সর্ব্বনাশ! কিন্তু অতিশয়োক্তি যে অতি-শয়োক্তি, তাহা ত বালকেও বুঝিতে পারিত। তবে সেকালে তাহা অলঙ্কার বলিয়া মর্য্যাদা লাভ করিয়াছিল কেন? তাহা একটি সাহিত্য-সমস্যা। সাহিত্যিকগণ তাহার মীমাংসার জন্য সময় নষ্ট করিতে পারিলেন না ;—সরোবরতীরে কোথায় সেই পুরাতন দেবমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ ভূগর্ভে বিলীন

হইয়া রহিয়াছে, তাহারই অনুসন্ধান-কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া পড়িলেন।

আমরা একালের রচনারুচি লইয়া অতিশয়োক্তির উপর একেবারে খড়্গহস্ত হইয়া উঠিয়াছি। কিন্তু,—কেহ কেহ বলিবেন, ইহাতে আবার "কিন্তু" কি? কিন্তু ইহাতেই কিন্তু "কিন্তু"র অভাব নাই। সরোবরতীরে বসিয়া, তাহার সুবিস্তৃত সলিলরাশির দিকে চাহিয়া, তাহার তীরে কিরূপ আয়তনের দেবমন্দির গঠিত হইলে, সামঞ্জস্য সুরক্ষিত হইতে পারিত, তাহার কথা চিন্তা করিলেই, "কিন্তু"র সন্ধান লাভ করা যায়। রচনা-সামঞ্জস্যের মধ্যে যে বিচিত্র সুষমা আপনা হইতে আত্মবিকাশ করে, তাহার কোন আকার নাই;—মাপ-কাঠি লইয়া তাহার আয়তন মাপিয়া লইবার সম্ভাবনা কোথায়? কবি সে চেষ্টায় সময় নষ্ট করেন নাই। মন্দির-তলে উপবেশন করিয়া, তাহার রচনাগাম্ভীর্য্য যে পরিমাণে অনুভূতির আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, সেই অনুভূতি তাঁহাকে সকল প্রকার ক্ষুদ্রসীমা অতিক্রম করাইয়া, একেবারে মেঘ-লোকে দৃষ্টিনিবদ্ধ করিতে বাধ্য করিয়াছিল। তাই তিনি মন্দিরবর্ণনা করিতে গিয়া লিখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন,—

দিক্ শাখা-মূলকাণ্ডং গগন
তলমহাম্ভোধিমধ্যা-স্তরীয়ং
ভানোঃ প্রাক্প্রত্যগদ্রিস্থিতিমিল-
দুদয়াস্তস্য মধ্যাহ্ন শৈলম্।
আলম্বস্তম্ভমেকং ত্রিভুবন
ভবনস্যৈকশেষং গিরীণাং
সপ্রদ্যুম্নেশ্বরস্য বাধিত
বসুমতীবাসবঃ সৌধমুচ্চৈঃ॥

ইহা কদাপি রচনা-দোষ বলিয়া কথিত হইতে পারে না;—ইহা কাব্যালঙ্কার মাত্র। মন্দির মধ্যে যে দেবমূর্ত্তি অর্চ্চনা লাভ করিত, তাহা হরিহর-মূর্ত্তি,—"প্রদ্যুম্নেশ্বর" নামে পরিচিত ছিল। প্রদ্যুম্ন (হরি) ঈশ্বর (হর) এই অর্থে প্রদ্যুম্নেশ্বর। তাহারই ক্ষীণস্মৃতি এখনও সরোবরকে "পদুম-সহর" বলিয়া পরিচিত করিয়া রাখিয়াছে। সাহিত্যিকগণ বুঝিলেন,—শীতল-সহর এবং তপ্-সহর নামক অপর দুইটি সরোবরের নামের মধ্যেও এইরূপ ঐতিহাসিক রহস্য নিহিত রহিয়াছে;—সে দুইটি সরোবরতীরেও এক সময়ে শীতলেশ্বরের এবং তপেশ্বরের দেব-মন্দির বর্ত্তমান ছিল!

এ অঞ্চলে যে আরও অনেক সরোবর এবং দেবমন্দির বর্ত্তমান ছিল, এখনও তাহার কিছু কিছু আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। উমাপতি ধর কাব্যচ্ছলে তাহারও ঐতিহাসিক প্রমাণ রাখিয়া গিয়াছেন। বিজয়সেন দেব নিয়ত শত্রুনিপাত করিতেন। নিহত অরাতিবৃন্দ সংগ্রাম-মৃত্যু লাভ করিয়া, স্বর্গলোকে আশ্রয় প্রাপ্ত হইত। বিজয়সেন দেব নিয়ত যাগযজ্ঞ করিতেন। আহূত দেববৃন্দ আহুতির লোভে মর্ত্ত্য-লোকেই অবস্থিতি করিতে বাধ্য হইতেন। তজ্জন্য এখানে অনেক 'সুরসদ্ম' এবং অনেক 'বিতত তল্প' দেখিতে পাওয়া যাইত। তাহাতে স্বর্গমর্ত্ত্যের মধ্যে 'ব্যত্যাস' সংস্থাপিত হইয়াছিল;—স্বর্গ মর্ত্ত্য হইয়া উঠিয়াছিল, মর্ত্ত্যই স্বর্গলোক বলিয়া প্রতি-ভাত হইয়াছিল। এখন 'দেওপাড়া' জগদ্বিখ্যাত; সেকালে তাহা এইরূপে

বিশ্ববিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিল। কবি লিখিয়া গিয়াছেন,—

মেরোরাহৃতবৈরিসঙ্কুল
তটাদাহূয় যজ্বামরান্
ব্যত্যাসং পুরবাসিনাম্
কৃত যঃ স্বর্গস্য মর্ত্ত্যস্য চ।
উত্তুঙ্গৈঃ সুরসদ্মভিশ্চ
বিততৈস্তল্লৈশ্চ শেষীকৃতং
চক্রে যেন পরস্পরস্য চ
সমং দ্যাবাপৃথিব্যোর্বপুঃ ॥২৫॥

ইহাও কাব্যালঙ্কারের নিদর্শন। কিন্তু ইহা আবার ঐতিহাসিক তথ্যেরও আধার। বিজয়সেন যুদ্ধজয় করিতেন, তিনি যাগযজ্ঞ করিতেন, বিস্তৃত সরোবর খনন করাইতেন, দেবালয় নির্ম্মিত করাইতেন,—ইহার সকল কথাই ইতিহাসের কথা। আর একটি কথা আরও বিশিষ্ট কারণে ইতিহাসের কথা। সেকালে সরোবরের নাম ছিল 'তল্ল,'—কথাটি সংস্কৃতমূলক না হইয়াও, প্রবল প্রচলন গৌরবে কাব্য মধ্যে স্থান লাভ করিয়াছে। একালের 'তালাও' যে মুসলমানী ভাষা হইতে জন্মলাভ করে নাই, মুসলমানাগমনের পূর্ব্বকালবর্ত্তী প্রস্তরলিপির এই 'তল্ল'-শব্দ তাহারই অভ্রান্ত ঐতিহাসিক প্রমাণ। এই শব্দ এখন সাহিত্য হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছে। সাহিত্যিকগণ এক বাক্যে ইহাকে আবার সাহিত্যে স্থান দান করিবার জন্য অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন।

প্রদ্যুম্নেশ্বরের পুরাতন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ কোথায় ভূগর্ভে নিহিত হইয়া রহিয়াছে, তাহার সন্ধান লাভ করিতে বিশেষ আয়াস স্বীকার করিতে হইল না। কৃষকেরা দেখাইয়া দিল,—একটি স্থানে তাহাদের হলকর্ষণের বিশেষ অসুবিধা ঘটিয়া থাকে। সেখানে ভূগর্ভে এক প্রস্তর নির্ম্মিত "রাজার মার ঢেঁকি" পড়িয়া রহিয়াছে। তাহার অনতিদূরে আরও একটি ঐরূপ ঢেঁকি; তাহা হয় ত "রাজার বাপের ঢেঁকি" হইবে। তাহাদের মূল পাতালে চলিয়া গিয়াছে,—কতবার কত লোকে ভূমি খনন করিয়া তুলিয়া দেখিতে চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারে নাই; একবার এক কালেক্টার সাহেব পর্য্যন্ত বিফল-মনোরথ হইয়া ফিরিয়া গিয়াছেন!" একজন খুব গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে দৃঢ়স্বরেই ব্যক্ত করিল,--"রাজা বা রাজপুত্র না আসিলে, ঢেঁকি উঠিবে না!" সাহিত্যিকগণ নির্দ্দিষ্ট স্থানে সমবেত হইয়া, খননকার্য্যের ব্যবস্থা করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু ব্যস্ত হইলে কি হইবে;—অর্থলোভ, অনুনয়-বিনয়, ব্যর্থ হইয়া গেল;—কেহ খননকার্য্যে অগ্রসর হইতে সাহসী হইল না। একজন একেবারে কাঁদিয়া ফেলিল! তখন সাহিত্যিকগণ কোদালী ধরিলেন। বরেন্দ্রভূমির কঠিন মৃত্তিকা প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড তাপে "পাথর" হইয়া উঠিয়াছিল;—সুকুমার সাহিত্যের সুকুমার সাধকগণ সমালোচনা-পটুত্বের পরিচয় প্রদানে সিদ্ধহস্ত হইলেও, খনন-পটুত্বের পরিচয় দান করিতে পারিলেন না। অবশেষে হৃষ্ট পুষ্ট বলিষ্ঠ সাঁওতালগণ সেই দুরূহকার্য্যে নিযুক্ত হইল। বুঝিতে পারা গেল;—ধৈর্য্য ভিন্ন উপায় নাই; প্রতীক্ষা ভিন্ন কৌতূহল চরিতার্থ করিবার সরল পথ নাই। খনন-কার্য্য চলিতে লাগিল, —সাহিত্যিকগণ চারিদিকে উপবেশন

করিয়া স্বরসংযোগে প্রশস্তি পাঠ করিয়া, সেই পুরাতন দেবভূমিকে আবার সংস্কৃত শ্লোক পাঠে মুখরিত করিয়া তুলিলেন। আবার,—কিন্তু কতদিন পরে,—সেখানে দেবভাষায় সুললিত রচনা-মাধুর্য্য উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল!

তখন ক্ষণকালের জন্য "সেকাল" যেন কালের ব্যবধান অতিক্রম করিয়া, প্রত্যক্ষবৎ প্রতিভাত হইতে লাগিল, রচনা-কৌশলের অমোঘ মাহাত্ম্যে প্রদ্যুম্নেশ্বরের মন্দির, মন্দির মধ্যস্থ দেবমূর্ত্তি, তাহার বসন-ভূষণ, তাহার অর্চ্চনা-আরাধনা, সকলই যেন এক সঙ্গে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সরোবর নূতন শোভায় বিকশিত হইল, তাহার তীরভূমি যেন নূপুরশিঞ্জনে মুখরিত হইয়া গেল। যখন প্রশস্তি-পাঠক সকলকে বুঝাইয়া বুঝাইয়া শুনাইতে লাগিলেন,—এই সেই সরোবর, যেখানে পুরাঙ্গনাগণের স্তনচন্দন-সৌরভে উচ্ছলিত মধুকরনিকর নিতান্ত বিভ্রান্ত হইয়া, জলের উপর নিরন্তর সঞ্চরণ করিয়া বেড়াইত;—এই সেই সরোবর, যাহার পাতালস্পর্শী তলদেশ নাগরাণীর মুকুটমণির স্নিগ্ধজ্যোতি বিচ্ছুরিত করিয়া দিত;—এই সেই সরোবর, যাহার শীতল সলিলে আকণ্ঠমগ্ন পুরাঙ্গনাগণের অঙ্গজ্যোতি আবৃত হইয়াও, সমধিক বিকশিত হইয়া উঠিত; তখন সহসা মনে পড়িয়া গেল, আজ দোলপূর্ণিমা! এই দিনে, এমন স্থানে, সেকালে না জানি কত আনন্দ, কত কৌতুক, কত কোলাহল সরোবরতীরকে লালে লাল করিয়া তুলিত। বলিতে না বলিতেই ব্যবস্থাকুশল ভৃত্যগণ আবীর-ভাণ্ড উপস্থিত করিল। তখন আর গুরুলঘু বিচারের অবসর রহিল না। অনেক দিনের পর, প্রদ্যুম্নেশ্বরের সরোবরতীর আবার আবীরে লালে লাল হইয়া গেল। তখনকার সাহিত্যিকগণের শোভা—তাঁহাদের কলহ-কৌতুক, তাঁহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও সরোবরে অবতরণ করিবার একান্ত আগ্রহ,—কেবল অনুভূতির বিষয় হইয়া, সুখের স্মৃতিকে মধুময় করিয়া রাখিয়াছে। তজ্জন্য উমাপতি ধরের সেই সুরচিত শ্লোক এখনও থাকিয়া থাকিয়া ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিতেছে।

> বিলেশয়বিলাসিনী-মুকুটকোটিরত্নাঙ্কুর-
> স্ফুরৎকিরণমঞ্জরীচ্ছুরিতবারিপূরং পুরঃ।
> চখান পুরবৈরিণঃ সজলমগ্নপৌরাঙ্গনা-
> স্তনৈণমদসৌরভোচ্ছলিতচঞ্চরীকং সরঃ॥

বিশ্বরূপ আত্মপ্রকাশ করিলে, চিরাভ্যস্ত পূজার মন্ত্র বিস্মৃত হইতে হয়, হাতের পুষ্পাঞ্জলি স্খলিত হইয়া পড়ে, পাদপদ্মে অর্পণ করিবার প্রয়োজন অনুভূত হয় না, অনুভূতিই অর্চ্চনার সকল অঙ্গ অধিকার করিয়া লয়। তখন আর স্থানকালের ব্যবধান অন্তরায় হইতে পারে না। সরোবরতীরে সাহিত্যিকগণ কি দেখিয়াছিলেন, জানি না; সকলেই আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তখন ভগবান্ মরীচিমালী মধ্যগগনে চরণ সঞ্চার করিয়া, ত্রিবিক্রম নামের পরিচয় প্রদান করিতেছিলেন; তথাপি সাহিত্যিকগণের উৎসবানন্দ বাধাপ্রাপ্ত হয় নাই।

স্নানাহারের পর, অত্যল্পকাল বিশ্রাম লাভ করিয়া, সাহিত্যিকগণ দুই দলে বিভক্ত হইলেন। এক দল পদব্রজে পুনরায় খনন-কার্য্যের পর্য্যবেক্ষণে নিযুক্ত হইলেন।

আর একদল দুইটি হস্তী লইয়া,নিকটস্থ গ্রাম-মণ্ডলী পর্য্যটন করিয়া, ভৌগোলিক তত্ত্বের আবিষ্কার-সাধনের জন্য অগ্রসর হইলেন। মধ্য এসিয়ায় বা মধ্য আফ্রিকায় এবং (সাহস ও সুযোগ পাইলে,) তুষারাচ্ছন্ন তিব্বতের উপত্যকায় ভৌগোলিক তত্ত্বের অনুসন্ধান করাই শোভা পায়। দেশের মধ্যে, গৃহের কোণে, আবার ভৌগোলিক তত্ত্বের অনুসন্ধান কি? আমরা কি সত্য সত্যই এমন কথা বলিয়া, উপহাস করিবার যোগ্য হইয়া উঠিয়াছি? আমরা বরং মেরুমণ্ডলের মানচিত্র অঙ্কিত করিয়া, তাহার উপর প্রত্যেক ভ্রমণকারীর ভ্রমণপথ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতে পারি;—দেশের মধ্যে, গৃহের কোণে, কোথায় কাহার প্রকৃত অবস্থান, তাহার কিছুমাত্র সন্ধান প্রদান করিতে পারি না! আমাদের সাহিত্যে "দেওপাড়া"র নাম একেবারে অপরিজ্ঞাত নয়;—কিন্তু "দেওপাড়া" কোথায়, তাহার আসে-পাশে কি ছিল, এখনই বা কি আছে, তাহার কথা আমাদের সাহিত্যে স্থান লাভ করিতে পারে নাই। তর্ক ছাড়িয়া, সরল ভাবে ইহার আলোচনা করিতে গেলে, ধিক্কার ধ্বনিত হইয়া উঠে। আমরা সন্ধান লই নাই বলিয়াই আমাদের দেশ আমাদের কাছে এরূপ অপরিচিত!

আমাদের ইতিহাস নাই, তাহা অল্প কথা। উপাদান সংগৃহীত হইলে, ইতিহাস রচিত হইতে কতক্ষণ? কিন্তু উপাদান সংকলিত করা কোনরূপেই অনায়াস সাধ্য বলিয়া স্বীকার করিবার উপায় নাই। তাহার সংখ্যা অল্প হইলে,—অনায়াসলভ্য হইলে,—সাধারণ শিক্ষার অধিগম্য হইলে,—সংকলনকার্য্য সহজ হইতে পারিত। সৌভাগ্যক্রমে উপাদানের সংখ্যা সীমাশূন্য; —দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা যথাযোগ্য জ্ঞানে অধিগত করিবার উপযুক্ত বিশিষ্ট শিক্ষা এখনও অপরিজ্ঞাত। এখনও তথ্যানুসন্ধানের ভার নিরক্ষর পল্লীবাসীর উপরেই ন্যস্ত হইয়া রহিয়াছে। যাহা কিছু জানা গিয়াছে, তাহারাই তাহার প্রথম সন্ধান-দাতা;—অনেক স্থলে তাহারাই প্রকৃত আবিষ্কর্ত্তা। তাহারা নিরক্ষর বলিয়াই অশেষ ঐতিহাসিক কৌতূহলের আধার "অশোকের লাট" দেশের লোকের নিকট "ভীমের গদা",—বরেন্দ্রভূমির "গরুড়-স্তম্ভ" এখনও "ভীমের পান্টি,"—দেওপাড়ার "রাজার মার ঢেঁকিও" তাহার অধিক পরিচয় লাভ করিতে পারে নাই। যেখানে এত যত্নে, এত অর্থব্যয়ে, এরূপ সরোবর এবং দেব-মন্দির অস্তিত্ব লাভ করিয়াছিল, তাহার নিকটবর্ত্তী স্থান কখনও মরুভূমির মত নিরন্তর ধূ ধূ করিত না,—সেখানেও জন-নিবাস ছিল, সেখানেও তাহার প্রকৃতি-বিজ্ঞাপক নানা চিহ্ন বর্ত্তমান থাকিবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু তাহার প্রকৃতি কিরূপ, কৃষক তাহার সন্ধান প্রদান করিতে পারে না। তাহার সন্ধান লইবার জন্যই এই আয়াস-স্বীকারের প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছিল।

সে চেষ্টা ব্যর্থ হইল না, পালপুরের পরিখা, ধরমপুরের মহামহীরুহতলে বৃক্ষ-মূলাচ্ছন্ন পুরাতন দেবমূর্ত্তি, মালঞ্চের নানা শ্রীমূর্ত্তির ভগ্নাবশেষ এই সকল স্থানের

পুরাতন অবস্থানের এবং বিলুপ্তগৌরবের পরিচয় প্রদান করিতে লাগিল। আরও কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে, যগপুর নামক পল্লী দেখিতে পাওয়া গেল। একটি সুদীর্ঘ সরোবর, তাহার তীরে একটি পুরাতন বৃক্ষ, বৃক্ষমূলে এক সুবৃহৎ দেবমূর্ত্তির ভগ্নাবশেষ;—গ্রামের মধ্যে একখানি প্রস্তরফলকে যোগাসনোপবিষ্ট নয়টি নারীমূর্ত্তি, দৃষ্টিপথে পতিত হইয়া কৌতূহল বর্দ্ধিত করিয়া তুলিল। গ্রামের লোকে সন্ধান দিল,—মাঠের মধ্যে একটি সরোবর আছে, তাহার নাম—"মঠ-পুকুর।" সেখানে গিয়া বিস্ময়ের অবধি রহিল না। গ্রামের লোকে ইষ্টকাহরণের লোভে সরোবরতীরে মৃত্তিকা খনন করিয়া, এক অতিপুরাতন মঠের ভিত্তি বাহির করিয়া ফেলিয়াছে। তাহাদের খননশ্রমই সার হইয়াছে। মঠ এত পুরাতন যে তাহার ইষ্টকরাশি জীর্ণ হইয়া গিয়াছে। নিকটে একখানি সুবৃহৎ কৃষ্ণপ্রস্তরের দ্বারফলক পড়িয়া রহিয়াছে।

তখন সূর্য্যদেব অস্তাচলের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, বরেন্দ্রের নতোন্নত বিস্তৃত প্রান্তরের উপর সন্ধ্যার অঞ্চলছায়া ধীরে ধীরে নামিয়া আসিবার আয়োজন করিতেছে। হস্তী পরিশ্রান্ত হইয়া থাকিয়া থাকিয়া আর্ত্তনাদ জ্ঞাপন করিতেছে। পিপাসার জল অনেকক্ষণ ফুরাইয়া গিয়াছে, মাহুত পথ ভুলিয়া যে সীমাশূন্য প্রান্তরের মধ্যে হস্তীকে চালিত করিয়া আনিয়াছে, তাহার কোন্ খানে আরম্ভ এবং কোন্ খানে শেষ, তাহা আর প্রতিভাত হইতেছে না। অবশেষে গৃহাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তনকারী জনৈক কৃষকের নির্দ্দেশে কোনরূপে শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে করিতে রাত্রি অধিক হইয়া গেল।

শিবিরে আনন্দ-কোলাহল পড়িয়া গিয়াছে। "রাজার বাপের ঢেঁকি" উঠিয়াছে, তাহাকে একেবারে মাঠের সমতলক্ষেত্রের উপর তুলিয়া রাখা হইয়াছে। "রাজার মার ঢেঁকি" সম্পূর্ণরূপে শেষ পর্য্যন্ত বাহির হইয়া পড়িয়াছে;—পঞ্চাশ জন সাঁওতাল দড়িদড়া লইয়াও তাহাকে উপরে টানিয়া তুলিতে পারে নাই! দুইটি ঢেঁকির দৈর্ঘ্য প্রায় একরূপ;—ঢেঁকি নহে,—প্রদ্যুম্নেশ্বর মন্দিরের দ্বারফলক,—চৌকাঠের উপরের এবং নীচের প্রস্তরফলক,—কারুকার্য্য খচিত,—আট হাত,—বার ফিট,"—ইত্যাদি সংবাদ (হস্তীর উপর হইতে অবতরণ করিতে না করিতেই) অভ্যর্থনা করিতে লাগিল। কৌতূহল প্রবল হইলেও, সে রজনীতে আর চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জনের অবসর রহিল না।

বরেন্দ্রের নন্দনাবাসী গ্রামনিবাসী দিবাকর ভট্টের সুযোগ্য পুত্র কুল্লুক ভট্ট "মনুসংহিতার" টীকা রচনা করিয়া, অমর হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার নাম, তাঁহার পাণ্ডিত্য, সভ্যসমাজে সুপরিচিত। বরেন্দ্রের এক নিভৃত পল্লীতে,—ভাণপুর নামক গ্রামে,—কুল্লুক ভট্টের এক বংশধর এখনও বাস করিয়া থাকেন। আমরা প্রত্যূষে ভাণপুরের নিকটবর্ত্তী কোন কোন গ্রামে তথ্যানুসন্ধানে বহির্গত হইব, মধ্যাহ্নে শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারিব না, এই সকল বিবেচনা করিয়া, কুল্লুকবংশধর স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, তাঁহার গৃহে মধ্যাহ্নে আতিথ্য-স্বীকারের

জন্য অনুরোধ জানাইতে শিবিরে আসিয়া উপনীত হইয়াছেন। ইহা এত অল্প কথায়, এত সরল ভাবে, অভিব্যক্ত হইল যে, ইহাকে "অনুকূল গলহস্ত" অপেক্ষাও অধিক অনুকূল বলিয়া মানিয়া লইতে হইল। ভট্ট সহাস্য মুখে বিদায় গ্রহণ করিলে, সাহিত্যিকগণ সে রজনীতে বড় অধিকক্ষণ বিশ্রামের অবসর লাভ করিলেন না। নগর হইতে পত্র আসিয়াছিল; ফলমূল-মিষ্টান্ন আসিয়াছিল; ডাব এবং বরফ আসিয়াছিল; আলোকচিত্রের মালমসলা আসিয়াছিল; সে সকল বুঝিয়া লইতে, তাহার সদ্ব্যবহার করিতে, ধন্যবাদ সহ পত্রোত্তর প্রদান করিতে, এবং অনুসন্ধানসমিতির সংগৃহীত দ্রব্যসম্ভার নগরে প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা করিতে, রজনী অধিক হইয়া পড়িল। তথাপি ভাল করিয়া প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই, বনগাহন কোলাহলে শিবির প্রতিবোধিত হইয়া উঠিল। কেহ দেখাইবার জন্য, কেহ দেখিবার জন্য, প্রবল আগ্রহের অনিবার্য্য তাড়নায়, শয্যাত্যাগ করিতে কাতরোক্তি করিলেন না। সূর্য্যোদয়কালে সকলেই সেই পুরাতন মন্দিরের দ্বারফলকের নিকটে উপনীত হইয়া, তাহার পর্য্যবেক্ষণ কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। মন্দির-দ্বার প্রায় আট হাত প্রশস্ত ছিল; সুতরাং তাহার উচ্চতা প্রায় ষোল হাত। না জানি কত লোকের দেবদর্শনের সৌকর্য্যসাধনের উদ্দেশ্যে এরূপ আয়তন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল! দ্বারের উচ্চতার সঙ্গে বেদিকার ও দেবমূর্ত্তির উচ্চতার, এবং বেদিকার উচ্চতার সঙ্গে দেবমূর্ত্তির উচ্চতার একটি শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট পরিমাণ-সামঞ্জস্য সেকালের মন্দির-রচনায় সুরক্ষিত হইত। তজ্জন্য মূর্ত্তি পাইলে, তাহা ধরিয়া মন্দিরের আয়তন কিরূপ ছিল, তাহার আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়;—মন্দির-দ্বার পাইলেও, তাহা ধরিয়া শ্রীমূর্ত্তির আয়তন কিরূপ ছিল, তাহা বুঝিতে পারা যায়। দ্বার যত উচ্চ, তাহার অষ্টমাংশ বিয়োগ করিলে যাহা থাকে, তাহাই বেদিকা এবং শ্রীমূর্ত্তির উচ্চতার সমষ্টি;—এই সমষ্টির এক-চতুর্থাংশ বেদিকার, ও তিন-চতুর্থাংশ শ্রীমূর্ত্তির উচ্চতা বিজ্ঞাপিত করিয়া থাকে। এই নিয়মের অনুসরণ করিলে বুঝিতে পারা যায়,—প্রদ্যুম্নেশ্বরের বিগ্রহমূর্ত্তি নিতান্ত ক্ষুদ্রমূর্ত্তি বলিয়া পরিচিত ছিল না।

এত বড় মূর্ত্তি কোথায় গেল? মন্দির ধ্বংসের সময়ে, তাহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলেও, তাহার ধ্বংসাবশেষ কোথায় গেল? তাহাতে কাহারও কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা ছিল না। তাহা হয় ত সরোবরের জলে নিহিত হইয়া রহিয়াছে, তাহাই সম্ভব বলিয়া মনে হইয়াছিল। তজ্জন্য কোন উৎসাহী সাহিত্যরথী কদলীবৃক্ষে ভেলা রচনা করিয়া, সরোবরের জলে শ্রীমূর্ত্তির অনুসন্ধানের আয়োজন করিয়াছিলেন। বরেন্দ্রের বিশীর্ণ কদলীতরু সাহিত্যিকের গুরুভার সহ্য করিতে পারে নাই,—অগত্যা শ্রীমূর্ত্তির অনুসন্ধানব্যাপার অসম্পন্ন রহিয়া গিয়াছে। সুতরাং সকলে মিলিয়া দ্বার-ফলক ধৌত করিয়া, তাহার আলোকচিত্র লইয়া, ভট্টবংশধরের আতিথ্যের উপর নির্ভর করিয়া, একটি দিনব্যাপী দীর্ঘভ্রমণের জন্য বিজয়যাত্রায় বহির্গত হইলেন। তখন প্রভাতবায়ু সংস্পর্শে আম্রবনের মধ্যে কোকিলের কলকণ্ঠে বসন্তের বিজয়বার্ত্তা সগৌরবে বিঘোষিত হইয়া উঠিতেছিল।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

উৎকল-প্রসঙ্গে।

(২)

রাজা মরকত কেশরী যে স্থানে মহানদী দ্বিধা বিভক্ত হইয়াছে, সেই স্থানটিকে প্রাকৃতিক দুস্তর পরিখা-বেষ্টিত মনে করিয়া সেই স্থানেই কটক রাজধানী স্থাপন করেন। বর্ষাকালে এই নদী ভীষণ আকার ধারণ করে, নানা স্থানে ভীতি-উৎপাদক প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আবর্ত্ত উৎপাদিত হয়, নানা নদী আসিয়া মহানদীর কলেবর-বৃদ্ধির সহায়তা করে; সুতরাং বহিঃশত্রু আসিয়া এই দুরাক্রম্য স্থানে সহসা উপস্থিত হইতে পারিবে না—রাজা এই সমস্ত বিষয় চিন্তা করিয়াই স্থানটি মনোনীত করিয়াছিলেন। রাজধানী-নির্ম্মাণের পর যখন দেখিলেন, মহানদীর জলপ্লাবনে অচিরেই নগরটি বিনষ্ট হইতে পারে, তখন তিনি মহানদীর দ্বিতীয় শাখা কাঠযুড়ীর তীরভূমিতে বজ্রকল্প প্রস্তরখণ্ড দ্বারা বিপুল বজ্রকল্প বন্ধনীর (Revetment) সৃষ্টি করিলেন। বলয়াকারে মহানদী এই স্থানটিকে বেষ্টন করিয়াছে বলিয়া এই স্থানটি বলয়বাটী কটক এই নামে অভিহিত হইয়াছে; চক্রাকারে নগরটি পরিদৃশ্যমান হইত বলিয়া স্থানটি চক্রবাটী কটক নামে কীর্ত্তিত হইয়াছে। ভূকবলিত পর্ব্বতের সমতলভূমিতে নগরটি অবস্থিত বলিয়া সানুবাটী কটক নামে কথিত হইয়াছে, অথবা এই নগরে সেনানিবাস স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়া সেনাবাটী কটক এই নামে নগরের নামকরণ হইয়াছে বলিতে পারি না। নগরের নামে পরে জনপদেরও নামের সৃষ্টি হয়। কটক-দুর্গের নাম বারবাটী, এই দুর্গের মধ্যে বারটি চত্বর ছিল,* এই জন্যই দুর্গের নাম বারবাটী হইয়াছে। আইন-ই-আকবরি পাঠে জানা যায়, এই দুর্গে ধূসর বর্ণের গ্রানাইট প্রস্তরে নির্ম্মিত নবতল গৃহ ছিল। কেহ কেহ এই দুর্গের নির্ম্মাতা উড়িষ্যার শেষ রাজা মুকুন্দদেব, কেহ কেহ পুরুষোত্তম-মন্দিরের নির্ম্মাতা অনঙ্গ ভীমদেব বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। যিনিই হউন, তাঁহার যে উন্মুক্ত বিপুল রাজকোষ বহু বর্ষের জন্য শূন্য করিয়া এই দুর্গ-প্রাসাদের নির্ম্মাণের জন্য বহুবর্ষ ব্যাপী ধনধারার মহাবৃষ্টি হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। যে দুর্গ-প্রাসাদের নির্ম্মাণের জন্য দেশের প্রধান প্রধান স্থপতির, প্রধান প্রধান শিল্পীর, প্রধান প্রধান ভাস্করের চিন্তানিপুণ বুদ্ধি ও কর্ম্মনিপুণ হস্ত বহু বর্ষ ব্যাপিয়া নিয়োজিত ছিল, যে বিপুল রাজ-প্রাসাদকে সুসজ্জিত করিবার জন্য, বিভূষিত করিবার জন্য নানা দিগ্‌দেশ হইতে বহুবর্ষ ব্যাপিয়া বহুমূল্য সৌন্দর্য্যবর্দ্ধক

* ঐতিহাসিকদিগের এইরূপ একটি ভ্রম হইয়াছিল; এই ভ্রমে পতিত হইয়া আইন-ই-আকবরিকার দুর্গস্থ নয়টি চত্বর দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। কোন কোন ঐতিহাসিক আবার "বার" শব্দের পরিবর্ত্তে সংস্কৃত "বরাহ" শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। উৎকলে "বাটী" একটি ভূমির পরিমাণ, বার বাটী পরিমিত ভূমিতে দুর্গটি স্থাপিত হইয়াছিল, সেই জন্য দুর্গটির নাম বারবাটী হইয়াছে। ৩ বিঘায় এক মান, ২০ মানে এক বাটী।

অগণিত দ্রব্যসম্ভার আনীত হইয়াছিল, ভাগ্যলক্ষ্মীর অপ্রসন্নতায় এক দিন তাহা হিন্দু রাজার হস্ত হইতে বিচ্যুত হইয়া গেল। মুসলমান রাজার উৎকট ভোগতৃষ্ণা-নিবারণের জন্য তাঁহার শোণিতদিগ্ধ হস্তে ভগবান্ অর্পণ করিলেন। সুবর্ণস্তম্ভ-নিবদ্ধ পার্শ্বলম্বমান বহুমূল্য মুক্তাজালে উদ্‌গ্রথিত, মহার্ঘ্য রত্নসমূহে উদ্‌ভাসিত, সুবর্ণসূত্রে বিস্ফুরিত, বহুমূল্য কৌশেয় বস্ত্রে নির্ম্মিত, চন্দ্রাতপের নিম্নে সুবর্ণসূত্রে গ্রথিত ফল, পুষ্প, লতা, বৃক্ষ, পশু, পক্ষীর চিত্র-সমাকুল কোমল পশুলোমনির্ম্মিত বহুমূল্য আস্তরণে সমাচ্ছাদিত গৃহাভ্যন্তরের মধ্যস্থলে রক্ত বর্ণের মকমল-নির্ম্মিত সুবৃহৎ উপাধানে পৃষ্ঠদেশ রক্ষা করিয়া উপবিষ্ট দিল্লীশ্বরের প্রতিনিধি গর্ব্বিত আগা মহম্মদ জমানকে দেখিয়া, আর সেইরূপ ভাস্বর রত্নসমূহে সমুদ্ভাসিত গৃহসজ্জা দেখিয়া উইলিয়ম ব্রুটন বিস্মিত, মোহিত ও স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। * বলা বাহুল্য যে, ইহার একটিও মুসলমান রাজা বা রাজপ্রতিনিধির আহৃত ও আনীত নহে, সমস্ত গৃহোপকরণই হিন্দু রাজার বহু শতাব্দীর পোষিত সৌন্দর্য্য-স্পৃহা, যত্ন চেষ্টা ও অজস্র ধনধারা-বর্ষণের কর্ম্মলব্ধ মহার্ঘ্য মহাফল।

উৎকল-কলিঙ্গরাজের কীদৃশ শক্তি ও প্রতাপ ছিল, ইহা দ্বারাই তাহার অনুমান করা যাইতে পারে যে, রাজনীতি বিশারদ মহাশক্তি দিল্লীশ্বর আকবরের রাজদূত হাসান খাঁ উৎকল-কলিঙ্গের শেষ হিন্দু রাজা মুকুন্দদেবের রাজসভায় সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিতেন। মুকুন্দদেব যখন কোটসমা নামক সীমান্ত দুর্গে—অসতর্ক ভাবে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেই সময়ে গৌড়েশ্বর সোলেমান কোরাণীর জামাতা ও সেনাপতি, একটাকিয়া ভাদুড়ী কুলে সমুৎপন্ন রাজা নয়ানচাঁদ রায়ের পুত্র কালাচাঁদ বা রাজচন্দ্র নামে অভিহিত, মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণের পর কালাপাহাড় নামে বিখ্যাত, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ—গৌড়েশ্বরের অনুমতি লইয়া দ্বাদশ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্যের সহিত তীব্রবেগে ময়ূরভঞ্জে উপস্থিত হয়েন ; সে স্থানের রাজ-প্রতিনিধিকে পরাভূত করিয়া যাজপুরের সন্নিধানে মুকুন্দদেবের সহিত ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করেন। সেই যুদ্ধে হিন্দুর সৌভাগ্যলক্ষ্মীর সহিত উৎকলরাজ মুকুন্দদেব নিহত হয়েন। কেহ কেহ বলেন, উৎকলের দক্ষিণাংশে একটি বিদ্রোহী দলের সৃষ্টি হয়, সেই বিদ্রোহ দমনের জন্য রাজা মুকুন্দদেব দক্ষিণ উৎকলে গমন করেন। বিদ্রোহীর হস্তে মুকুন্দদেবের মৃত্যু হয়, সেই সুযোগে কালাপাহাড় উৎকলে প্রবেশ করেন। আবার কেহ কেহ বলেন কুম্ভকর্ণের মত রাজা মুকুন্দদেব ছ'মাস জাগিয়া থাকিতেন, আর ছ'মাস নিদ্রাদেবীর উপাসনা করিতেন। রাজা যখন নিদ্রিত থাকিতেন, সে সময়ে মন্ত্রী, সেনাপতি এবং সেনাবৃন্দ সকলেই একরূপ বিশ্রাম-সুখ অনুভব করিবার সুযোগ পাইত। কুম্ভকর্ণ যখন নিদ্রায় অভিভূত, সেই সময়ে ভগবান্ রামচন্দ্র লঙ্কায় প্রবেশ করিয়াছিলেন, আর আজ স্বধর্ম্মত্যাগী নব ধর্ম্মে দীক্ষিত হিন্দু ও হিন্দুধর্ম্মের

* Mr Wilson's 'The Early Annals of the English of Bengal'.

উপরে খড়্গহস্ত বলোন্মত্ত কালাপাহাড় সেইরূপ নিদ্রাভিভূত রাজা মুকুন্দদেবের দুর্গে প্রবেশ করিলেন, কুম্ভকর্ণের মত অকাল-জাগ্রত রাজা মুকুন্দদেবকে নিহত করিলেন; যে উৎকল-কলিঙ্গে মহাবীর বৌদ্ধরাজা অশোক লক্ষ মস্তক ছিন্ন করিয়াও দীর্ঘকাল বৌদ্ধসাম্রাজ্য স্থাপন করিতে পারেন নাই, আজও উদয়াচলের প্রস্তরগাত্রে অশোকের উৎকীর্ণ শাসন-শিলালিপি রহিয়াছে; কিন্তু অশোকের অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গে একরূপ উৎকল-কলিঙ্গ হইতে বৌদ্ধসাম্রাজ্যও অন্তর্হিত হইয়াছে, বঙ্গবিজয়ী বক্তিয়ার খিলিজি সেনাপতি মহম্মদ-ই-সিরাণ দ্বারা ১২০৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম উড়িষ্যা আক্রমণ করিয়া উড়িষ্যা-রাজের শৌর্য্য, বীর্য্য, প্রবল প্রতাপ বুঝিয়াছিলেন, বঙ্গদেশের মত সহজে উৎকলে দন্তস্ফুট করিবার সম্ভাবনা নাই অবধারণ করিয়া আর দ্বিতীয় বার যে উৎকল-কলিঙ্গ আক্রমণের জন্য সাহসী হয়েন নাই, মহারাজ অনঙ্গভীমের মন্ত্রী শৌর্য্যবীর্য্যের অবতার ব্রাহ্মণবংশাবতংস বিষ্ণুর ভুজবীর্য্যে ভীত ও বিত্রস্ত হইয়া যবন-সেনা যে উৎকলের সীমা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল, যে বীর-প্রসবিত্রী উৎকল-কলিঙ্গভূমির সাহসী বীর-কুমারেরা বঙ্গদেশ আক্রমণ করিয়া বঙ্গেশ্বর তুগ্রিণ-ই তুগান খাঁকে ব্যতিব্যস্ত ও বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল, বঙ্গেশ্বর তুগান খাঁ যে উৎকল আক্রমণ করিয়া সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হইয়া পলায়ন ভিন্ন আর গত্যন্তর নাই অবধারণ করেন, যে উৎকল-কলিঙ্গের অধিপতি কোণার্ক-মন্দিরের নির্ম্মাতা মহারাজ নরসিংহ দেবের জামাতা ও সেনাপতি সামন্ত রায় কর্ত্তৃক চালিত আড়াইশত মাত্র সৈন্যের আক্রমণে পরাভূত ও ভীত হইয়া সেনানীর সহিত পাঁচ সহস্র মুসলমান সৈন্য 'কটাসেন' ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছিল, সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গরাশির মত যে উৎকল-সেনার অপ্রতিহত তীব্রবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া গৌড়ের রাজধানী লক্ষ্মণাবতী পুনঃপুনঃ কম্পিত হইতেছিল; আজ সেই বীরপ্রসূ গিরিবপ্রা সাগরপরিখা বিপুলকলেবরা নদীসহস্রে অগম্যা উৎকলকলিঙ্গভূমি কুলপাংশুল ব্রাহ্মণকুমার পাপিষ্ঠ কালাপাহাড়ের পাপ হস্তে বিপর্য্যস্ত, বিদ্ধস্ত ও লাঞ্ছিত হইল! মহাত্মা মহর্ষি কশ্যপের পুত্র হিরণাক্ষ, হিরণ্যকশিপু; ব্রহ্মজ্ঞ ঋষিসত্তম পুলস্ত্যের পৌত্র রাবণ, কুম্ভকর্ণ; রাজর্ষি উগ্রসেনের পুত্র কংসাসুর; আসুরভাবাপন্ন ভ্রাতার হস্তে দেবভাবাপন্ন ভ্রাতার নিগ্রহ চিরকাল আছে, অসুরের হস্তে দেবতার নিগ্রহ চিরকাল আছে। কালাপাহাড়ের পাপমলিন কঠোর হস্ত কেবল রাজার ন্যায় নিদ্রিত-অচেতন দেবপ্রতিমাগুলির লাঞ্ছনা করিয়া ক্ষান্ত হয় নাই, গৃহে গৃহে প্রতিষ্ঠিত সচেতন জাগ্রত দেবপ্রতিমারূপিণী পূজনীয়া হিন্দুপুরস্ত্রীদিগেরও লাঞ্ছনা করিতে অগ্রসর হইয়াছিল। জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে অনেক দেবপ্রতিমা কালাপাহাড়ের কঠোর হস্ত দ্বারা নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, যবনের পাপহস্তস্পর্শের ভয়ে অনেক জীবন্ত সচেতন প্রতিমা আপনা হইতেই আকাশস্পর্শী-সর্ব্বভক্ষ্যের কুক্ষিগত হইয়াছিল; সচেতন অচেতন অনেক দেবপ্রতিমা আবার আত্মসম্মানাভিজ্ঞ অনেক

ভক্তের পবিত্র দুঃখকম্পিত হস্ত দ্বারা অতল জলরাশির অগাধ বক্ষে নিমজ্জিত হইয়াছিল; উৎকল-কলিঙ্গে হাহাকার উঠিয়াছিল! এ প্রস্তাবে দুর্বৃত্ত কালাপাহাড়ের সকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত, পরিদেবনাময়, পরিতাপময়, শোচনীয় পরিণাম বলিবার অবকাশ নাই। পাঠকবর্গের জানিবার আকাঙ্ক্ষা হইলে "বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস" পাঠ করিতে পারেন।

কটকদুর্গ মুসলমানের হস্তগত হইয়া মুসলমান-রাজপ্রতিনিধির বিলাস-নিকেতন হইয়া উঠিল, মুসলমানেরা হিন্দুর মত কটকদুর্গের ব্যবহার করিতে লাগিলেন। দুঃখের বিষয়! সভ্য ইংরাজ রাজার হস্তে পড়িয়া কটকদুর্গের আর তাদৃশ ব্যবহারের সৌভাগ্য রহিল না। পাব্লিক ওয়ার্কসের নির্দ্দয় হস্ত সেই দুর্গের অস্থিপঞ্জরগুলি একে একে নির্দ্দয়ভাবে উন্মুক্ত করিয়া রাজপথে ও অন্যান্য কার্য্যে নিয়োজিত করিতে লাগিল। বিজ্ঞ ম্যালি সাহেবও এ জন্য ইঙ্গিতে দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন।* লর্ড কর্জ্জনের লোকে যতই কেন দোষ কীর্ত্তন করুক না, তিনি যে ভারতের প্রাচীন কীর্ত্তি রক্ষা করিবার জন্য বদ্ধপরিকর ছিলেন, তিনি যে ভারতের প্রাচীন গৌরবের নিদর্শনস্বরূপ প্রাচীন সৌধ, প্রাচীন সেতু, প্রাচীন গুহা রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার যত্নের একশেষ ছিল, তিনি যে এজন্য গৌড়ের দুর্গম অরণ্যানীতে পর্য্যন্ত প্রবেশ করিয়াছিলেন, এ কথা কৃতজ্ঞহৃদয়ে ভারতবাসীর একান্ত স্বাকার্য্য; কটকদুর্গের ধ্বংসের পূর্ব্বে যদি লর্ড কর্জ্জন এদেশে আসিতেন; তবে আমরা দুর্গের এরূপ শোচনীয় পরিণাম দেখিতাম না।

কটকে অনেক দেবমন্দির ও তাহাতে অনেক দেবমূর্ত্তি ছিল, ইতস্ততঃ তাহার অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়। আমি যে বাড়ীতে বাস করিতেছি, তাহার অদূরে একটি শিবের নূতন ক্ষুদ্র মঠের কুরঙ্গাতে একটি বরাহদেবের সুন্দর মূর্ত্তি রহিয়াছে। এইরূপ নানা স্থানে নানা দেবমূর্ত্তি অযত্নে রক্ষিত হইয়াছে। তাঁহারা হিন্দু-নরনারীর মনে দেবভাব জাগ্রত করিবার জন্য, হিন্দু নরনারীর সভক্তি পূজোপহার গ্রহণ করিবার জন্য অবস্থিত নহেন, প্রত্নতত্ত্বান্বেষীদিগের প্রত্নতত্ত্ব-জ্ঞানের উন্মেষণ করিবার জন্য, তাহাদিগকে প্রাচীন ভারতের শিল্পকলা বুঝাইবার জন্য যেন মলিনভাবে অবস্থিতি করিতেছেন। মহানদীর বেলাভূমিতে গড়গড়েশ্বর মহাদেবের মন্দির রহিয়াছে, প্রকম্পিত হইয়া পৃথিবী অন্যান্য প্রাচীন মন্দিরের মত তাহার অর্দ্ধাংশ উদরস্থ করিয়াছে, পরবর্ত্তী সময়ে সেই মন্দিরের অভ্যন্তরে অবতরণ করিবার উদ্দেশে সোপান নির্ম্মিত হইয়াছে। মন্দিরের অগ্রভাগে প্রস্তরনির্ম্মিত সুন্দর বৃষভমূর্ত্তি; মন্দিরের সেই অংশ ভূমিকম্পে প্রোথিত হয় নাই, হয় ত উহা পরবর্ত্তী সময়ে

* "The Public Works Department, in early vandal days, stripped the old buildings for the sake of their stone, which they used for the False Point light-house and other buildings as well as for metalling the roads, and thus converted the fort into an unsightly series of mounds, and the ground within the moat into a wilderness of stone pit."

নির্ম্মিত। তরী-সহায়ে চৈতন্যদেব মহানদী উত্তরণ করিয়া এই ঘাটে অবতরণ করিয়াছিলেন। ভক্তিতে উচ্ছ্বসিত হইয়া ভাবোন্মত্ত মহাপ্রভু অবতারণ করিয়াই গড়াগড়ি দিতে দিতে মহাদেবের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিলেন; তদবধি সেই কারণে মহাদেবের নাম গড়গড়েশ্বর হইয়াছে। রাভেন্সা-কলেজের নিকটে লণ্ডা দেউল; এই প্রাসাদে শিবলিঙ্গ আছেন, আর একটি উদাসীনরক্ষিত প্রস্তরে স্বভাবজাত অনন্তদেবের ক্রোড়ে শালগ্রাম চক্র আছেন। পূর্ব্বে মন্দিরটির চূড়া নির্ম্মিত হয় নাই, * সেই জন্য লোকে লণ্ডা দেউল বলিত, এক্ষণে চূড়া নির্ম্মিত হওয়াতেও আর সে নামের পরিবর্ত্তন হয় নাই। অন্যত্র একটি মন্দিরে কালীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন ভারতবর্ষের অধিকাংশ স্থানেই কালীবাড়ী আছে, বাঙ্গালীর আরাধ্যা কালী সর্ব্বত্র বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠিত। এখানেও সেইরূপ ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে কোন ভক্ত বাঙ্গালী কালী প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, অদ্যাপি বাঙ্গালীর চাঁদায় ধূমধামের সহিত দেবীর পূজা চলিতেছে। কটকে সোপান-মন্দির প্রভৃতি আরও কয়েকটি দেবমন্দির আছে, সর্ব্বত্র রাধাকৃষ্ণমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। সে সকল মন্দিরেও নিত্যপূজার ব্যবস্থা আছে, ধূমধামের সহিত সাময়িক উৎসব আছে। গোপাল-মন্দিরের বাড়ীর অভ্যন্তরে ও কালীমন্দিরের বাড়ীর অভ্যন্তরে ময়রার দোকান আছে, সেই ময়রার দোকানের সন্দেশই শ্রীগোপালের ও দেবীর ভোগে নিয়োজিত হয়; আশ্চর্য্য ও বিস্ময়ের বিষয়, সেই দোকানে কাঁচা সন্দেশের সহিত একত্র জিলাপী প্রভৃতি পক্কান্নও রহিয়াছে! জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, এদেশে ময়রার প্রস্তুত পক্কান্ন দেবভোগে দিবার রীতি আছে। দেওয়ানি কাচারি-গৃহের নিকটে হরিবল্লভ বাবুর কয়েকটি ভাড়ার বাড়ী আছে; সেই বাড়ীগুলি যে স্থানে নির্ম্মিত হইয়াছে, পূর্ব্বে সেই স্থানে দেবীগিরি-মঠ ছিল, সেই সুবৃহৎ মঠের ৩৬৫ টি পৃথক্ পৃথক্ গৃহ ছিল, মঠস্বামী একবৎসর কাল প্রত্যহ এক একটি গৃহে বাস করিতেন। এই মঠে অনেক সাধু-সন্ন্যাসী বাস করিতেন। এক্ষণে সেই মঠের কিঞ্চিন্মাত্র চিহ্নও নাই; কোন সুবৃহৎ দীর্ঘিকা ও দীর্ঘিকার ঠিক মধ্যস্থলে একটি বিশ্রামগৃহ। কটক নগর হইতে কিঞ্চিদ্দূরে মহানদীর পর পারে মহানদীবেষ্টিত একটি অনুচ্চ পর্ব্বত আছে। পর্ব্বতের নাম ধবলগিরি, এই পর্ব্বতে ধবলেশ্বর মহাদেব আছেন, ও তাঁহার মন্দির আছে। স্থানটি অত্যন্ত মনোহর; দেবভক্তি ও প্রাকৃতিক শোভা যুগপৎ মানুষের মনকে অধিকার করে। বৈদ্যনাথ, তারকেশ্বরের মত এস্থানেও রোগক্লিষ্ট ব্যক্তি মহাদেবের পবিত্র সম্মুখ হত্যা দিয়া থাকে।

উৎকল-কলিঙ্গেশ্বরের অধীনে অনেকগুলি সামন্ত রাজা ছিলেন। তাঁহাদিগের প্রত্যেকের এক একটি দুর্গ ছিল, সৈন্য ছিল,

* সংস্কৃত "মুণ্ডিত" শব্দ হইতে বাঙ্গালায় "নেড়া" শব্দের উৎপত্তি এবং উড়িষ্যা ও হিন্দিতে "লণ্ডা" শব্দের উৎপত্তি। রঙ্গপুরি-ভাষায় শাখামস্তকশূন্য বৃক্ষমূলকে "মুড়া" বলে। কেহ কেহ স্বৈরিণী স্ত্রীবাচক "রণ্ডা" শব্দ হইতে নেড়া শব্দের উৎপত্তি বলেন।

যুদ্ধোপকরণ অস্ত্রশস্ত্র ছিল। যুদ্ধ উপস্থিত হইলে তাঁহারা সৈন্যসামন্ত লইয়া কলিঙ্গেশ্বরের সাহায্য করিতেন, কলিঙ্গেশ্বরকে সম্রাট বলিয়া স্বীকার করিতেন; তাঁহাদিগের এতদ্‌ভিন্ন অন্য কর ছিল না। ব্রিটিশরাজও তাঁহাদিগের স্বাধীনতা বিলুপ্ত করেন নাই, অদ্যাপি তাঁহারা স্বাধীন রাজা বলিয়া খ্যাত, আজও তাঁহাদিগের অধীনে দেওয়ানি, ফৌজদারি বিচারালয় আছে। এক্ষণে তাঁহারা গড়জাত রাজা বলিয়া রাজপুরুষদিগের নিকটে ও দেশীয়দিগের নিকটে পরিচিত। এই গড়জাতের মধ্যে ময়ূরভঞ্জও অন্তর্নিবিষ্ট। কণিকার রাজা গড়জাতের রাজা নহেন, ইনি বাঙ্গালার জমীদারের মত এক জন জমীদার মাত্র। ইংরাজের প্রথম অধিকারের সময়ে কণিকার রাজাই উড়িয়াদিগকে উত্তেজিত করিয়া বিদ্রোহী করিয়াছিলেন; তাহারা ইংরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিল। দুর্দ্ধর্ষ উড়িয়াদিগকে শাসন ও দমন করিতে বিজ্ঞ রাজপুরুষদিগকে ভীম ও কান্ত উভয় নীতির অবলম্বন করিতে হইয়াছিল।

গড়জাতের দুর্গসমূহ ভিন্ন কলিঙ্গেশ্বরের নিজের অধীনে পাঁচটি দুর্গ ছিল। তন্মধ্যে যাজপুরের অনতিদূরে চাতিয়া পর্ব্বতের উপরে অমরাবতী দুর্গ ও বিরূপা নদীর উত্তর তীরে চৌহুয়ার নামক গ্রামে একটি দুর্গের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। অমরাবতী দুর্গ প্রস্তরনির্ম্মিত, দুর্গ-প্রবেশের নিমিত্ত সুখারোহ সোপান আছে, সব স্তম্ভগুলি নাই, কতকগুলি ভগ্ন স্তম্ভ দণ্ডায়মান থাকিয়া নিজেদের উচ্চতা ও বিস্তার দর্শকদিগকে বুঝাইয়া দিতেছে। দুর্গের সমতল স্থানে একটি ভগ্নমন্দিরে পুরুষ-পরিমিত ইন্দ্র ও ইন্দ্রানীর মূর্ত্তি রহিয়াছে, দেখিলে স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইতে হয়; উৎকলের প্রত্যেক দেবমূর্ত্তিতেই ভাস্করের রুচি ও হস্তনৈপুণ্য প্রকাশ পায়। দুর্গটি দুই মাইল স্থান অধিকার করিয়া অবস্থিত। পাবলিক্ ওয়ার্কস বিভাগের কর্ম্মচারী মহাত্মাদিগের কৃপায় মেঘচুম্বী বিস্তীর্ণ সুবৃহৎ দুর্গপ্রাচীর দেখিয়া আর চক্ষুকে কৃতার্থ করিবার সম্ভাবনা নাই, প্রাচীরাবয়বপ্রস্তরে ট্রাঙ্ক রোডের বৃহৎ কলেবরের ক্ষতস্থানে চিকিৎসা-কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে।* দ্বিতীয় দুর্গটি এক এক দিকে দুই মাইল করিয়া বিস্তৃত ছিল, এক্ষণে কিছুই নাই, ভগ্নাবশেষ মাত্র আছে। ভূগর্ভ হইতে উত্থাপিত তাম্রশাসন দেখিয়া প্রত্নতাত্ত্বিকেরা সেখানি ষষ্ঠ শতাব্দীর বলিয়া অবধারণ করিয়াছেন। যাজপুরের অনতিদূরে ১১ ফুকার বিশিষ্ট ২৪০ ফিট লম্বা নানা কারুকার্য্যে খচিত নানা উৎকীর্ণ মূর্ত্তিতে অলঙ্কৃত প্রসিদ্ধ তেস্তুলীমল সেতু। এ সেতুটিও "আঠারনালা সেতুর" মত প্রসিদ্ধ। যাজপুর হইতে দুই মাইল দূরে ব্রাহ্মণী নদী দ্বারা বেষ্টিত দেউলি পর্ব্বত; সেই পর্ব্বতের উপরে গোকর্ণেশ্বরের প্রাচীন মন্দির, নিকটে বটবৃক্ষের মূলে নদী হইতে উত্তোলিত মনুষ্যপরিমিত শায়িত বিষ্ণু-

* "......the great wall which surrounded it was demolished by the Public Works Department for the sake of the stone, which was used for the construction of the Orissa Trunk Road"—Gazetteer of Cuttack, p. 200.

মূর্ত্তি।* ভগবানের ভুবনমোহন মূর্ত্তির স্পষ্ট ছায়া এই সুদৃশ্য মনুষ্যনির্ম্মিত মূর্ত্তিতে প্রতিফলিত ও প্রতিভাত হইতেছে; হয় ত এক দিন এই মূর্ত্তির মেঘচুম্বী মন্দিরের সৌন্দর্য্য দেখিয়া, অর্চ্চনার আড়ম্বর ও বিপুল ঐশ্বর্য্যের সগর্ব্ব পরিচালন দেখিয়া দর্শকমাত্রেই চকিত, বিস্মিত, পুলকিত ও ভক্তিতে উচ্ছ্বসিত হইত; আজ সেই দেবপ্রতিমা বৃক্ষমূলে ধূলীধূসরিত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে, তাহার মন্দির যে কোথায় অবস্থিত ছিল, নির্ণয় করিবার সম্ভাবনা নাই; আজ তাহার চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই। দেবভক্ত উৎকল-কলিঙ্গের রাজারা যে কত স্থানে কত দেবমূর্ত্তি স্থাপিত করিয়াছিলেন, কত স্থানেই যে তাঁহাদিগের উত্থাপিত কত শত দেবমন্দিরের উচ্চপতাকা সমুদ্র-বায়ুহিল্লোলে গর্ব্ব ও আনন্দে প্রকম্পিত হইত, আকাশমার্গে ক্রীড়া করিত, তাহার সংখ্যা করিবার সম্ভাবনা নাই। এক যাজপুরেই সহস্রাধিক শিবমন্দির ছিল। আজ তাহার কি আছে? সমস্তই বিনষ্ট, থাকিবার মধ্যে আখণ্ডলেশ্বর, অগ্নীশ্বর, ত্রিলোচনেশ্বর, বিরজা, যজ্ঞবরাহ বা আদিবরাহ ও বৈতরণী নদীর তীরে অষ্টমাতৃকার সামান্য মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। স্বয়ং ব্রহ্মা যে স্থানে যজ্ঞ করিয়াছিলেন বলিয়া পৌরাণিকেরা সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন; সেই যাজপুরের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিলে, বিশ্ববিশ্রুত কোণার্ক-মন্দিরের ধ্বংস-পরিণাম দেখিলে ক্ষোভে, দুঃখে ও অধীরতায় অভিভূত হইতে হয়, আবার সেই বিনাশের উপরে ভারত-সমৃদ্ধির, বিশ্ববিজয়ী রাজাদিগের কীর্ত্তি-সুন্দরীর ক্ষীণ পদচিহ্ন দেখিয়া বিস্ময়ে আপ্লুত হইতে হয়। চন্দ্রভাগা নদীর পবিত্র তীরে অর্কক্ষেত্রে বহুমূল্য কৃষ্ণপ্রস্তরে নির্ম্মিত সৌরজগতের রাজা সূর্য্যদেবের রাজপ্রাসাদ। কপিলসংহিতার প্রাচীন মাহাত্ম্য পাঠ করিলে এই তীর্থের প্রাচীনত্বে সন্দেহ থাকে না। এই স্থানেই উদীয়মান সূর্য্যের প্রথম রশ্মিপাত হয়। এই তীর্থমাহাত্ম্য দেখিয়া, এই স্থানের সহিত প্রাভাতিক সূর্য্যের সুবর্ণকিরণ-স্পর্শের আদি সম্বন্ধ অবধারণ করিয়া উৎকলরাজ নরসিংহদেব এই স্থানেই সবিতার মণ্ডপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; স্থানের ভগ্নপ্রবণতার দিকে লক্ষ্য করিয়াও সে দিকে ভ্রূক্ষেপ করেন নাই। কে বলিতে পারে, উৎকলরাজ-নির্ম্মিত এই সুবৃহৎ সূর্য্যমন্দিরের পূর্ব্বে এ স্থানে সূর্য্যদেবের অন্য মন্দির ছিল না; কে বলিতে পারে যে উৎকলরাজই এই স্থানের আদি নির্দ্দেশক। ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া নানা স্থানে তীর্থভূমি আছে, যুগযুগান্তর ধরিয়া সেই সকল তীর্থ হিন্দুর নিকটে পূজিত, হিন্দুনরনারী যোগবিশেষে সেই সেই তীর্থ যাত্রা করিয়া আত্মাকে পবিত্র করিয়া আসিতেছে। প্রাতঃস্মরণীয়া অহল্যাবাইর জন্মের বহুকাল পূর্ব্বে মগধে গয়াতীর্থ ছিল, বিষ্ণুর পবিত্র পদচিহ্ন ছিল; রণবীর রণজিৎ সিংহের জন্মিবার বহুপূর্ব্বে পবিত্রতীর্থ কাশীক্ষেত্র ছিল। অহল্যাবাই গয়াক্ষেত্রে গদাধরের মন্দির নির্ম্মাণ, রণজিৎ সিংহ কাশী-

* "At the foot of a vanyan tree is a life-sized monolithic image of the four-handed Vishnu, which was recovered some years ago from the river-bed"—Gazetteer of Cuttack, p. 203.

বিশ্বনাথের মঠ সুবর্ণ পত্রে আবৃত, করিয়াছেন। এই বৃহৎ দেবপ্রাসাদের পুরোভাগে শত হস্ত উচ্চ অরুণ-স্তম্ভ ছিল; সেটি এক্ষণে শ্রীক্ষেত্রে নীত হইয়া পুরুষোত্তমের শ্রীমন্দিরের সম্মুখে স্থাপিত রহিয়াছে। এক্ষণে সূর্য্যদেবের মন্দিরটি নাই, আছে কেবল নাটমন্দির। সেই নাটমন্দিরের উচ্চতা, তাহার ভাস্কর্য্য, তাহার স্থাপত্য ও উপরিভাগে উত্তোলিত সুবৃহৎ প্রস্তরখণ্ড দেখিয়া ইংরাজ দর্শকমাত্রেই বিস্মিত হইয়াছেন। নাটমন্দিরেরও চূড়া ও কুম্ভ ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। নাটমন্দিরটি ১২৮ ফিট উচ্চ। নয়টি সোপানের উপরে উত্তীর্ণ হইলে গৃহের সুবৃহৎ অভ্যন্তর ভাগ বিস্মিত চক্ষুর উপরে পতিত হয়। গৃহের ছাদ কড়ি-বর্গার উপরে স্থাপিত নয়, প্রাচীন পদ্ধতি অনুসারে খিলান। মেলি সাহেব অনুমান করেন, প্রকৃত সূর্য্যমন্দির ১৯০ ফিট উচ্চ ছিল; কিন্তু আইন-ই-আকবরির গ্রন্থকার স্বচক্ষে দেখিয়া লিখিয়াছেন, সূর্য্যমন্দির ২২৫ ফিট উচ্চ। চতুর্দ্দিকের প্রাচীর ১৫০ হস্ত পরিমিত উচ্চ, পার্শ্বের বিস্তৃতি উনিশ হাত। প্রাচীরের তিনটি তোরণ আছে, পূর্ব্ব তোরণ দ্বারে দুইটি সুদৃশ্য প্রস্তর ক্ষোদিত হস্তী, পশ্চিমে উচ্চ অশ্বদ্বয়ের উপরে বীরবেশে সজ্জিত অশ্বারোহী-দ্বয়, উত্তরদ্বারে সিংহমথিত হস্তীদ্বয়। পূর্ব্ব দ্বারের উপরে উনিশ ফিট উচ্চ নবগ্রহের মূর্ত্তি আছে। গৃহের ছাদেও নবগ্রহের মূর্ত্তি অঙ্কিত রহিয়াছে। ১৫০ ফিট উচ্চে অবস্থিত চূড়ার নিকটে সম্মুখভাগে নিঃসারিত, হস্তীর উপরে সন্নিবেশিত প্রকাণ্ড সিংহমূর্ত্তি উত্তোলিত ও স্থাপিত হইয়াছে।* হস্তী ও সিংহের প্রতিকৃতিটি ২০ ফিট উচ্চ। কি করিয়া এই প্রকাণ্ড মূর্ত্তি অক্ষতরূপে অত্যুচ্চ স্থানে উত্থাপিত হইয়াছে? কি করিয়াই বা পচিশ ফিট ঘন দুই হাজার টন (৫৪ হাজার ৫০০ মণ) ওজনের বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড সেই উচ্চ মন্দিরের শিরোভাগে উত্তোলিত হইয়া সংযোজিত হইয়াছে? ফার্গুসেন সাহেব বিস্মিত, মেলি সাহেব বিস্মিত, আরকিউলজিক্যাল বিভাগের ডিরেক্টার জেনেরাল মার্সেল সাহেব বিস্মিত; বিস্ময়ের আরও কারণ, চতুর্দ্দিকে ২৫ মাইলের ভিতরে কোনও রূপ প্রস্তরের খনি নাই, যে ষ্টেটিট (Steatite) প্রস্তরের ব্যবহার হইয়াছে, তাহার খনি ৮০ মাইলের ভিতরে নাই।* এই প্রস্তরগুলি দূর হইতে আনীত হইয়াছে, তবে কি সে সময়ে ভীষণ সমুদ্রের বক্ষে হিন্দুদিগের সুবৃহৎ পোতের ইতস্ততঃ বিচরণ ছিল? সুবৃহৎ প্রস্তরখণ্ড উচ্চে উঠাইবার জন্য হিন্দুরা কপিকলের ব্যবহার জানিতেন? জেনারেল মার্সেল সাহেব বলেন, ফার্গুসেন সাহেব ইহার অর্দ্ধাংশ দেখিয়াই বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছিলেন। তখনও সূর্য্যের রথ ও অশ্ব ভূগর্ভ হইতে উত্তোলিত হয় নাই। যাহার অপূর্ব্ব কারু-

* "This colossal figure was cut out of two solid blocks of stone, and both these stones had to be raised to a height of 150 feet above ground, where they were fastened into the wall."—Report, Arch. Surv., Ind., pp. 48 49.

* "There are no stone quarries within a radius of 25 miles, and no steatite slabs like those found in the temple are available within 80 miles."—Report,, Arch. Surv. Ind., pp. 48-49.

কার্য্য দেখিলে, রথ-অশ্বের গঠন-প্রণালী দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। এই সকল উৎকীর্ণ মূর্ত্তির সর্ব্বত্র অবয়বের উপযুক্ত পরিমাণ (Proportion) ঠিক আছে, সৌন্দর্য্য ও ভাবব্যঞ্জকতা আছে, ভাস্কর্য্যের অপূর্ব্ব চাতুর্য্য আছে। বহু পূর্ব্বে একদিন চীন-পরিব্রাজক হুয়েঙ্গ সায়েঙ্গ উৎকল-কলিঙ্গের ঐশ্বর্য্য ও সভ্যতা দেখিয়া শত মুখে প্রশংসা করিয়াছিলেন, আর এক দিন মুসলমান-গ্রন্থকার আবুল ফজেল কোণার্ক-মন্দিরের সৌন্দর্য্য দেখিয়া মোহিত হইয়াছিলেন; আর আজ সভ্যতাভিমানী, সভ্যতার খরস্রোতে ভাসমান, জ্ঞানবিজ্ঞানে দৃপ্ত, অহঙ্কৃত ইংরাজের মুখেও কোণার্ক-মন্দিরের প্রশংসা! বিদেশীর মুখে ভারতের পূর্ব্ব-গৌরবের কথা শুনিলে কাহার মনে পূর্ব্ব গৌরবের স্মৃতি জাগরূক না হয়? কাহার মনে পূর্ব্বপুরুষদিগের উপরে কূলপ্লাবী ভক্তি-উচ্ছ্বাসের প্রবর্ত্তনা না হয়? এই অল্প দিনে এই সভ্যজাতির শোচনীয় পরিণাম ও অধঃ-পতন দেখিয়া কালের অপ্রতিহত প্রভাবে স্তম্ভিত হইতে হয়; শিক্ষা, দীক্ষা, সভ্যতার উপরে অণুমাত্র আস্থা স্থাপন করিতে প্রবৃত্তি হয় না।

কোণার্কের সহিত তুলনা করিলে ভগবৎ-প্রসাদে যাজপুর এখনও সমৃদ্ধিশালী আছে বলিতে হয়, আবার যাজপুরের সহিত তুলনায় এখনও ভুবনেশ্বর জগতের সমক্ষে আত্ম-জ্ঞাপন করিতে সমর্থ, বলিতে হয়। এক দিন দিল্লীশ্বরের সেনানায়ক মুনিম খাঁ দুর্দ্ধর্ষ পাঠানরাজ দাউদ খাঁকে পরাজিত করিয়া, বিজয়োল্লাসে গর্ব্বিত হইয়া ভুবনেশ্বরে প্রবেশ করেন ও ভুবনেশ্বরের মেঘচুম্বী মন্দিরসমূহ, দেবপ্রতিমানিবহের পূজাড়ম্বর, দেবতার সম্মুখে ব্রাহ্মণদিগের প্রদত্ত সভক্তি উপহার, ব্রাহ্মণের সংখ্যাধিক্য ও নগরের সমৃদ্ধি দেখিয়া বিস্ময় সহকারে বলিয়াছিলেন, "এ পবিত্র স্থান মানুষের বিজয়ের উপযোগী নয়, ইহা ঈশ্বরাধিকৃত ভূমি, তীর্থযাত্রীর গন্তব্য মহাতীর্থ, মনুষ্য-হৃদয়ের দুরাকাঙ্ক্ষা ও কল্পনার অনেক উপরে অবস্থিত।" * মন্দিরের গাত্রে উৎকীর্ণ লতা, পত্র, পুষ্পদাম, পশু, পক্ষী, মনুষ্য ও দেবতার মূর্ত্তিগুলি দেখিয়া ফার্গুসেন সাহেব বলিয়াছিলেন, "এই মন্দিরগুলির নির্ম্মাণে যে অর্থব্যয় হইয়াছে, তাহার তিনগুণ অর্থ সম্ভবতঃ এই সমস্ত ক্ষোদিত কার্য্যে ব্যয়িত হইয়াছে" † ভুবনেশ্বরের প্রত্যেক দেব-মন্দিরই বিবিধ কারুকার্য্যে অলঙ্কৃত, লিঙ্গ-রাজ ভুবনেশ্বরের আকাশস্পর্শী মন্দিরের ত কথাই নাই। সেই সুবৃহৎ মন্দিরের পাদ-দেশ হইতে আরম্ভ করিয়া মস্তকের নিম্ন পর্য্যন্ত কতরূপ যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ভাস্কর্য্যের নিদর্শন আছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। এই ভাস্কর্য্যের ভিতরে প্রাচীন ভারতের কত যে গ্রন্থ-তত্ত্ব গূঢ়ভাবে অবস্থিত

* "This country is no fit subject for conquest or for schemes of human ambition. It belongs entirely to the gods and is one great region of pilgrimage throughout." —Puri by L. S. S. O' Malley, p. 32.

† "It is perhaps not an exaggeration to say that if it would take, say lakh of rupees, to erect such a building as this, it would take three lakhs to carve it as this one is carved."—History of India and Eastern Architecture, Book v, Ch. vi, pp. 421-3.

রহিয়াছে, যাঁহার চক্ষু আছে, তিনিই তাহা বাহির করিতে পারেন। ইতিহাস-জগতে সুগৃহীতনামা বন্ধুবর শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় যদি দীর্ঘকাল ভুবনেশ্বরে অবস্থিতি করেন; তাহা হইলে আমরা ভারতীয় প্রাচীন ইতিহাসের অনেকগুলি পৃষ্ঠা উদ্ঘাটন করিতে সমর্থ হই। কলিকাতা হাইকোর্টের উজ্জ্বলরত্ন ভক্ত জ্ঞানী শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় চৈতন্যদেবকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ উৎকল ভ্রমণ করিয়াছেন, বিশ্বকোষের প্রণেতা প্রত্ন-তাত্ত্বিক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় ময়ূরভঞ্জে আসিয়া অনেকগুলি তাম্রশাসন ও শিলালিপি সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন; সূক্ষ্মদর্শী মৈত্রেয় মহাশয়ও উৎকলে আসিয়া দর্শনীয় স্থান, মন্দির ও গুহাগুলি বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন। এই পুরুষত্রয়ের যত্ন চেষ্টায় আমরা অচিরে উৎকলের সম্পূর্ণ প্রাচীন ইতিহাস দেখিতে পাইব, এইরূপ আশা করিবার আমার অধিকার আছে। পৃথিবীর আদি-কাব্য রামায়ণ ও জগতের অদ্বিতীয় পুস্তক মহাভারতকে অবলম্বন করিয়া, সংস্কৃতের সমস্ত কাব্যগ্রন্থ লিখিত। পৃথিবীর সমস্ত ভাষায় রামায়ণ মহাভারতের অনুবাদ হইয়াছে, অদ্যাপি হইতেছে। ভারতবর্ষের সমস্ত প্রচলিত ভাষাতেই রামায়ণ মহাভারতের অনুবাদ আছে, কাব্য আছে, নাটক আছে, গান আছে। কবি হউক, অকবি হউক, সকলেই রামায়ণ মহাভারত অবলম্বনে পুস্তক লিখিতে ইচ্ছা করে, উৎকল-কলিঙ্গে আসিয়া উৎকল-কলিঙ্গের অতীত ঐশ্বর্য্য দেখিয়া তত্ত্বনির্দ্ধারণে শক্তি থাকুক বা না থাকুক, সেই বিষয়ে কিঞ্চিৎ লিখিবার জন্য সকলেরই আগ্রহ হয়। সেই প্রলোভনের হস্ত হইতে আমিও দূরে অবস্থান করিতে পারিলাম না তাই আমার এই লিপি-কণ্ডুয়ন। আমি পাঠকবর্গের নিকটে কোনও রূপ প্রত্ন-তত্ত্বের উপহার দিতে পারিব, এরূপ দুরাকাঙ্ক্ষা আমার নাই, স্থূলচক্ষে যাহা দেখিয়াছি, তাহাই আজ উপস্থাপিত করিতেছি। লিঙ্গরাজের মন্দিরের উত্তরাংশের ভিত্তিতে ও ভুবনেশ্বরীর মন্দিরের গাত্রে অশ্বারোহী সৈনিকের চিত্র আছে, অশ্বের পৃষ্ঠে আধুনিক প্রণালীর চর্ম্মময় জিন আছে, আরোহীর পায়ে আধুনিক প্রণালীর বুট জুতা আছে এবং জুতার নিম্নে রেকাব আছে। অশ্বারোহীর পরিচ্ছদ আধুনিক প্রণালীর পরিচ্ছদ। উদয়গিরির রাণী-গুম্ফার উপরের দক্ষিণাংশেও উৎকীর্ণ সৈনিক পুরুষের চিত্র আছে, তাহার পার্শ্বে লম্বিত কোষবদ্ধ আধুনিক প্রণালীর দীর্ঘ ঋজু তরবারি আছে। * অভিজ্ঞান শকুন্তলে রাজা দুষ্মন্তের শরীর-রক্ষিকা ধনুর্বাণহস্তা যুবতী বীরাঙ্গনা আছে, লিঙ্গরাজের মন্দিরেও বীরোচিত বেশে সজ্জিত অশ্বারোহী স্ত্রীসৈনিকের চিত্র দেখিতে পাই। ইহা দ্বারা প্রাচীন ভারতের সামাজিক চিত্র অনেকটা বুঝিতে পারা যায়। ভুবনেশ্বরের বৈতাল দেউলের চূড়ার গঠনবৈলক্ষণ্যে

---

* "........a kilted warrior, 4 feet 4 inches high, booted and turbaned, with a straight sword in a scabbard hanging from his left side.'—Gazetteer of Puri., p. 252.

দর্শকের বিশেষতঃ প্রত্ন-তাত্ত্বিকের চক্ষু স্বভাবতঃ সেই চূড়ার উপরে আকৃষ্ট হয়। বাঙ্গালাদেশে মিষ্ট কুষ্মাণ্ড "বিলাতি কুমড়া" নামে পরিচিত। যে দেশে যে বস্তু পূর্ব্বে ছিল না, পরে অন্য দেশ হইতে আনীত হইয়াছে, সেই দেশবাসী সেই নবানীত বস্তুটিকে "বিলাতি" বলিয়া ব্যবহার করে। এই "বিলাতি" বিশেষণ পদ দেখিয়া বাঙ্গালী-মাত্রেই এই জাতীয় কুষ্মাণ্ডকে বাঙ্গালাদেশের প্রাচীন সম্পত্তি মনে করে না। উৎকল-বাসী মিষ্ট কুষ্মাণ্ডকে "বৈতাল" বলে। রঙ্গ-পুরবাসী রাজবংশীদিগের মধ্যেও "বৈতাল" শব্দের প্রচলন আছে। তাহারা স্বৈরিণী স্ত্রীলোককে বৈতালী বলিয়া গালি দেয়, অনেক সময়ে "জাহাজী মায়া"ও বলে। আমরা এই "জাহাজী" শব্দ দেখিয়া "বৈতালী" শব্দের ভিতরেও "জাহাজ"বাচক কোন শব্দের সম্বন্ধ আছে মনে করিতে পারি। সংস্কৃত "বহিত্র" শব্দ হইতে ক্রমে "বহিতর" "বহিতল" "বইতল" "বৈতল" শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। উড়িয়া ভাষায় প্রচলিত "বৈত" শব্দের অর্থ জাহাজ। সম্ভবতঃ যখন উৎকল, কলিঙ্গে জাহাজ অর্থে "বৈতল" শব্দের ব্যবহার ছিল, সেই সময়ে তাদৃশ চূড়াবিশিষ্ট মঠের "বৈতাল" নামের সৃষ্টি হইয়াছে ও বিদেশ হইতে জাহাজে আনীত বলিয়া এই নবাগত কুষ্মাণ্ডের "বৈতাল" এই নামকরণ হইয়াছে। সমুদ্রের বেলাভূমিতে অবস্থিত উৎকলের সহিত সুদূর হিমালয়ের পাদবর্ত্তী রঙ্গপুরের ভাষা-সাম্য দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়।*

উদয়গিরিস্থ হস্তিগুম্ফার শিলালিপি পাঠে জানা যায় যে, কলিঙ্গরাজ মহামেঘবাহন ব্রাহ্মণ ও অর্হৎ উভয়ের উপরে তুল্যভাবে শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শন করিতেন, উভয়ের উপরে তাঁহার বদান্যতা ও দাক্ষিণ্য ছিল, তিনি অনেক গুহা ক্ষোদিত ও অনেক স্তম্ভ স্থাপিত করিয়াছিলেন, অনাথাশ্রমগুলির পুনঃ সংস্কার করিয়াছিলেন। তাঁহার অভিযানে তাঁহার শৌর্য্য-বীর্য্যে ভীত হইয়া মগধরাজ তাঁহার সহিত সন্ধিবন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিলেন।* কলিঙ্গ যে প্রাচীন সময়ে একটি সমৃদ্ধ জনপদ ছিল, কলিঙ্গ যে সেকালে সভ্যতার চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল, তাহার অনেক নিদর্শন আছে। চরক-সংহিতার কল্পস্থানে অভিনব চিকিৎসার উদ্ভাবনের জন্য কলিঙ্গের উল্লেখ আছে, বৃহৎ সংহিতায়, কলিঙ্গের খনি হইতে উত্থাপিত, কর্ত্তিত ও বিশোধিত হীরকের কথা আছে। মালয় উপদ্বীপে ভারতবর্ষীয়েরা ক্লিং নামে পরিচিত, ক্লিং যে কলিঙ্গেরই স্খলিত শব্দ, তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছু নাই। বৌদ্ধনরপতি অশোক কলিঙ্গ জয় করিয়া উৎকল, কলিঙ্গে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রচার

---

* উড়িয়া ভাষায় ভোয়াসিন্ শব্দের অর্থ অসূর্য্য-ম্পশ্যা, রঙ্গপুরি ভাষায় বোয়াসিন শব্দের অর্থ কনিষ্ঠ ভ্রাতৃবধূ। উড়িয়া ও রঙ্গপুরি উভয় ভাষাতেই শেফালিকা পুষ্পের নাম শিঙ্গাহার, নাটমন্দিরের নাম জগমোহন। রথযাত্রায় রথে আরোহণ করিয়া জগন্নাথ দেব যে বাড়ীতে অবতরণ করিয়া অবস্থিতি করেন, উড়িয়া ভাষায় সেই বাড়ীর নাম গুঞ্জিকা বাড়ী, রঙ্গপুরি ভাষায় গুঞ্জাবাড়ী, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

* Report Arch. Surv., Eastern Circle, 1905-06.

করিয়াছিলেন, পর্ব্বত-গাত্রে গুহা নির্ম্মাণ, শিলালিপির উৎকীরণ ও স্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিলেন। অশোকের তিরোধানের পর বৌদ্ধনৃপতি বীরসঙ্কুল উৎকল-কলিঙ্গকে আর আয়ত্ত রাখিতে পারিলেন না, উৎকল-কলিঙ্গ তাঁহাদিগের শিথিলমুষ্টি হইতে স্খলিত হইয়া আবার হিন্দুনৃপতির বীর্য্যপ্রসারিত হস্তের আশ্রয় গ্রহণ করিল। বৌদ্ধাধিকারের সময়ে উৎকল-কলিঙ্গের অনেক অধিবাসী বৌদ্ধ-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। রাজনীতিজ্ঞ রাজা মহামেঘবাহন প্রজারঞ্জনের জন্য রাজার উপরে প্রজার ভক্তি আকর্ষণের জন্য নিজে হিন্দু হইলেও বৌদ্ধসন্যাসীর উপরে, বৌদ্ধমঠের উপরে সমধিক শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেন। সে সময়ে হিন্দু-দেবমন্দিরের মত হিন্দু-দেবমন্দিরের পার্শ্বে বৌদ্ধস্তূপ, স্তম্ভ, মঠ ও পর্ব্বতোৎ-কীর্ণ গুহাগুলি তুল্যভাবে অর্চ্চিত ও রক্ষিত হইত। মহামেঘবাহনের লোকান্তরে প্রস্থানের পর বৌদ্ধমঠ ও সঙ্ঘারাম তাদৃশ রাজসাহায্য পাইতে সমর্থ হইল না, প্রজাদিগেরও বৌদ্ধধর্ম্মের উপরে ক্রমে শ্রদ্ধা কমিয়া গেল, ক্রমে তাহারা হিন্দুধর্ম্মে শ্রদ্ধালু হইয়া আবার সেই সনাতন হিন্দু-ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিল। হিন্দু-ধর্ম্মে বার মাসে তের পার্ব্বণ আছে, বারব্রত আছে, বিপদে পড়িলে বিপদ উদ্ধারের জন্য দেবতার সহায়তা লইবার ব্যবস্থা আছে, বিপন্নের বন্ধু ভগবান্ আছেন, আবার প্রতিমা-পূজা আছে। নিপুণ শিল্পীর শিক্ষিত হস্তে উৎকীর্ণ পাষাণ-মূর্ত্তি, দক্ষ কুম্ভকারের কুশল হস্তে নির্ম্মিত ভাব-প্রভাবে উদ্ভাসিত প্রসন্নবদনা দেব-প্রতিমা বিবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া পূজামণ্ডপে উচ্চবেদীর উপরে স্থাপিত হইলে সুগন্ধী সুদৃশ্য পুষ্পভারে, নানাবিধ দ্রব্যসম্ভারে, সুগন্ধিধূমোদ্গারি ধূপে ও নির্ম্মলদীপে অর্চ্চিত, বন্দিত ও ভক্তি-গদ্গদ ভাষায় সংস্তুত হইলে দর্শকের মন স্বভাবতঃ গলিয়া যায়, সেই দিকে আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারে না; পক্ষান্তরে, বৌদ্ধধর্ম্মের কঠোর দার্শনিকতায় মনের অবস্থান্তর হইবার সম্ভবনা নাই। মনের উপরে যাহার আধিপত্য করিবার শিক্ষা আছে, প্রতিমা-পূজায়, দেবভক্তি ও ঈশ্বর-ভক্তিতে তাহার মনের আকর্ষণ না হইতে পারে, যাহারা সেইরূপ কঠোর অভ্যাসের বশবর্ত্তী হয় নাই, তাহাদিগের যে স্বভাবতঃ সেই দিকে আকর্ষণ হইবে, তাহা আর যুক্তি দ্বারা প্রতিপন্ন করিতে হইবে না। যখন বঙ্গ, কলিঙ্গ, উৎকলের বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হিন্দুরা বৌদ্ধধর্ম্মের পরিহার করিয়া দলে দলে প্রায়শ্চিত্তান্তে আবার হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে লাগিল, তখন বৌদ্ধাচার্য্যেরা হিন্দুধর্ম্মে আকর্ষণের মূল কারণ বুঝিতে পারিলেন; ব্রতোপবাস, প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা না থাকিলে দেবার্চ্চনা ও দেবপ্রতিমা-স্থাপনের পদ্ধতি না থাকিলে, আর বৌদ্ধধর্ম্ম টিকে না অবধারণ করিলেন। সেই অবধারণের ফলেই মহাযান বৌদ্ধসম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইল। আচার্য্যেরা হিন্দুতন্ত্র দেখিয়া সেই আকারের কতকগুলি বৌদ্ধতন্ত্র প্রস্তুত করিলেন। তাহাতে বোধিসত্ত্বদিগের

মন-কল্পিত ধ্যান, প্রণাম ও তন্ত্রোক্ত মন্ত্রতুল্য বীজসংযুক্ত কতকগুলি মন্ত্র সন্নিবেশিত হইল। ধ্যানস্থ বুদ্ধমূর্ত্তির সহিত তারা, লোকনাথ, হয়গ্রীব প্রভৃতি বোধিসত্বদিগের প্রতিমা নানা স্থানে স্থাপিত ও পূজিত হইতে লাগিল।

উপনিষদ, তন্ত্র ও পুরাণে দেবযান ও ধূমযানের উল্লেখ আছে। মৃত্যুর পরে কর্ম্মানুসারে কেহ দেবযানে স্বর্গলোকে গমন করে, কেহ বা ধূমযানে পিতৃলোকে প্রস্থান করে। বৌদ্ধেরা এই শাস্ত্রোক্ত যান স্বীকার করিতেন না বলিয়া হিন্দুরা তাঁহাদিগকে হীনযান নামে আখ্যাত করিতেন। শাক্যপ্রচারিত তত্বজ্ঞানের বলে বৌদ্ধেরা নির্ব্বাণে অধিকারী, তাঁহাদিগের কোন পথে যাইতে হইবে না, এই জন্য তাঁহারাও এই উপাধি গৌরবের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন। বৌদ্ধদিগের এক সম্প্রদায়ে যখন দেবদেবীর পূজা, মন্ত্র-জপ, প্রতিমা-স্থাপনের ব্যবস্থা হইল, সেই সকল কর্ম্মের প্রবর্ত্তক বুদ্ধিপ্রসূত তন্ত্র-শাস্ত্রের প্রচার হইল, তখন বৌদ্ধনৃপতির শাসিত মগধের অধিবাসী বৌদ্ধেরা এই প্রতিমা-পূজক বৌদ্ধদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতে লাগিলেন ও হিন্দু অপেক্ষাও ইহারা অধঃপতিত মনে করিয়া মহাযান এই নামে ইঁহাদিগকে অভিহিত করিলেন। সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম অনুসারে যে সকল শব্দে পথ বা যাত্রা বুঝায়, সেই সকল শব্দের পূর্ব্বে মহৎ শব্দ দিলে তাহার অর্থ মৃত্যু হয়। এই সম্প্রদায়ের বৌদ্ধেরা মৃত্যুমুখে পতিত এই নিন্দিত অর্থ বুঝাইবার উদ্দেশে হীনযানের বৌদ্ধেরা মহাযান শব্দের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। আবার মহাযানের বৌদ্ধেরা আপনাদিগের অবলম্বিত পথ উৎকৃষ্ট মনে করিয়া মহাযান উপাধি গ্রহণ করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই, হীনযানের বৌদ্ধদিগের অবলম্বিত পথ অতি নিকৃষ্ট এই অর্থ করিয়া তাঁহাদিগকে হীনযান বলিতে সঙ্কুচিত হয়েন নাই। বেদের অনেক সূক্তে অসু (প্রাণের) দাতা বলিয়া অসুর শব্দের প্রয়োগ আছে। সুন্দররূপে যাঁহারা দান করেন, তাঁহারা সুর; যাঁহারা সুন্দর-দানের পরিপন্থী, তাঁহারা অসুর, এ অর্থেরও সমাবেশ অনেক সূক্তে আছে। দেবতার নিকটে নিন্দিত অর্থে অসুর হইলেও জেন্দাভেস্তায় পূজিত অর্থে তাহার ব্যবহার হইয়াছে। অদ্যাপি সম্প্রদায়-বিশেষের নিকটে সম্প্রদায়-বিশেষের নাম ঘৃণ্য অর্থে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। ধ্যানস্থ বুদ্ধমূর্ত্তির পার্শ্বে কৃতাঞ্জলিপুটে হিন্দুর অনেক দেবমূর্ত্তিরও সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। যে শাক্যসিংহের উপদেশে দেবদেবী দূরের কথা, ঈশ্বরের পর্য্যন্ত নাম-গন্ধ নাই, যে বুদ্ধ শাক্যসিংহ নিরীশ্বর-বাদের প্রবর্ত্তক বলিয়া তাৎকালিক দার্শনিকদিগের নিকটে, হিন্দু জনসাধারণের নিকটে পরিচিত, তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মে প্রতিমা-প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা, প্রতিমা-পূজার পদ্ধতি, তন্ত্র-মন্ত্র থাকিবে, অসম্ভব। ইংরাজের চক্ষে এবং ইংরাজ-গুরুর নিকটে বা ইংরাজি পুস্তকের নিকটে শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করিয়া, সেই ভাব-মদিরার উন্মাদনায় যাঁহারা অধিকৃত, তাঁহাদের রাগবিচ্ছুরিত চক্ষুর সম্মুখে উপলব্ধি হইতে পারে যে, হিন্দুরা বৌদ্ধের নিকট

হইতে প্রতিমা-পূজা, তন্ত্র মন্ত্র, নির্ব্বাণ-মুক্তি গ্রহণ করিয়াছে, আরও কত কি গ্রহণ করিয়াছে। যাঁহারা বুদ্ধপ্রচারিত দার্শনিক মত আলোচনা করিয়াছেন, যাঁহারা তত্ত্বানুসন্ধান দ্বারা বৌদ্ধধর্ম্মের ধারাবাহিক ইতিহাস বিশ্লেষণ করিয়া বুঝিয়াছেন, তাঁহারা কখনই ঐরূপ বিদেশী মতে মত দিতে পারিবেন না। যদি বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিমা-পূজার চমকে হিন্দুর মন আকৃষ্ট হইয়া থাকে, নির্ব্বাণের জন্য লালায়িত হইয়া হিন্দু যদি সেই দিকে ধাবিত হইয়া থাকে, তবে যাহাতে সত্য আছে, ভক্তি আছে, জ্ঞান আছে, নির্ব্বাণ আছে, আবার অকাট্য যুক্তি দ্বারা স্থাপিত জন্মান্তরবাদ আছে, হিন্দুর পক্ষে একেবারে সেই সত্য ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করা কর্ত্তব্য ছিল। তাহা না করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের সমস্ত মালমসলা লইয়া বৌদ্ধপ্রণালীতে মন্দির রচনা করিয়া তাহার হিন্দুমন্দির এই নামকরণ করিয়া লাভ কি? বুদ্ধদেবের প্রচারিত ধর্ম্মে যাহার বিশ্বাস আছে, বুদ্ধদেবের উপরেও তাহার ভক্তি আছে, ইহাই স্বাভাবিক, ইহাই প্রকৃতির অচ্ছেদ্য নিয়ম। বুদ্ধদেবকে ভক্তি না করিয়া তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মে অনুরক্ত হইয়া বেমালুম তাহা নিজের করিয়া লইলাম, ইহা কোন্ নিয়মের অধীন, কোন তর্ক দ্বারা ইহার অবধারণ, বুঝিতে পারি না। আমি হিন্দু, আমি কোন ধার্ম্মিক মুসলমানকে, কোন ধার্ম্মিক খ্রীষ্টয়ানকে ভক্তি করিতে পারি; কিন্তু তাঁহার অবলম্বিত ধর্ম্ম-পুস্তকের বিধি-নিষেধ মানিয়া চলিতে পারি না। তাহা করিলে ত আর হিন্দু থাকিব না, হয় মুসলমান হইব, নয় খ্রীষ্টিয়ান হইব। পক্ষান্তরে, মুসলমান এবং খ্রীষ্টিয়ানও কোন ধার্ম্মিক হিন্দুকে ভক্তির চক্ষে দেখিতে পারেন; কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রের আদিষ্ট নিয়ম প্রতিপালন করিতে পারেন না। এই জন্যই আমরা বৌদ্ধধর্ম্মকে না মানিয়াও বুদ্ধদেবকে ভগবানের অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়াছি, নাস্তিক চূড়ামণি চার্ব্বাককে বৃহস্পতির অবতার বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছি। এই পাশ্চাত্য ভাবের খরস্রোতে আপ্লাবিত দেশে ও কালে অবস্থান করিয়াও যখন উদ্যানের শোভা-বর্দ্ধক মোরগ্ ফুলে অদ্যাপি হিন্দু দেবতার পূজা করেন না, ও দেবভোগে পলাণ্ডুর প্রয়োগ করেন না, তখন সেই আদিযুগে শাস্ত্রবিশ্বাসী হিন্দু কি করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম আত্মসাৎ করিলেন, বুঝি না। আর বুঝি না, যে হিন্দু-বিধবা রোগে শোকে ক্লিষ্ট হইয়াও নিজে পাক করিয়া লয়েন, একবেলা দুটি অন্ন ভোজন করিয়া দীর্ঘ দিবা রজনী কাটাইয়া দেন, পুরীগমনের পথে পূর্ব্বদিনেও যিনি সেই ভাবে আহার করিয়াছেন, সেই সদাচারনিরতা হিন্দুবিধবা আজ পুরীক্ষেত্রে অর্থাৎ বুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়াই সমস্ত সদাচার ভুলিয়া গেলেন, পুরুষোত্তম বুদ্ধদেবের দারুময় শ্রীমূর্ত্তি অবলোকন করিয়াই জাতিভেদ ভুলিয়া গেলেন, অম্লান মুখে অসন্দিগ্ধ চিত্তে সকল বর্ণের স্পৃষ্ট, উচ্ছিষ্ট প্রদত্ত বুদ্ধদেবের প্রসাদ দিনের ভিতরে বহুবার ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। অন্য কোন বৌদ্ধতীর্থে এইরূপ আচার আছে কি না জানি না, শুনি নাই, কল্পনার চক্ষেও

দেখি নাই। যাহা বৌদ্ধশাস্ত্রে নাই, বৌদ্ধ আচারে নাই, প্রবাদে নাই, হিন্দু কিন্তু বুদ্ধমূর্ত্তি স্থাপিত করিয়া বৌদ্ধের নিকট হইতে সেই আচার গ্রহণ করিয়া জাতি-ভেদের মূলে কুঠারাঘাত করিবার উদ্দেশে নিজেদের ভিতরে তাহার প্রবর্ত্তনা করিল। কত যুগযুগান্তর অতীত হইল, শ্রীপুরুষোত্তমের তথাবিধ প্রসাদ ভক্ষণ করিয়াও হিন্দুর হিন্দুত্ব বিলুপ্ত হইল না, জাতিভেদ অক্ষুণ্ণ রহিল। এই সকল কল্পনাপ্রসূত তর্কের মূলে কি আছে আমরা তাহা অবধারণ করিতে পারি না; পারেন কেবল তাঁহারা, যাহারা বেদ অপেক্ষা বিদেশী গুরুর কথাতে শ্রদ্ধালু। পুরুষোত্তম বুদ্ধমূর্ত্তি; সে সম্বন্ধে আর একটি অখণ্ডনীয় তর্ক আছে, একথা কাহারো কাহারো মুখে শুনিতে পাই। ভারতীয় স্থূলবুদ্ধি গোতম বুঝিতে পারিবেন না। তর্কটি এই, পুরুষোত্তমের মন্দিরে আমরা তিনটি মূর্ত্তি দেখিতে পাই, একটি জগন্নাথের, একটি বলভদ্রের, একটি সুভদ্রার। যতগুলি বুদ্ধমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে কোন কোনটিতে তিনটি মূর্ত্তি আছে, একটি বুদ্ধের, একটি ধর্ম্মের ও একটি সঙ্ঘের। যখন কোন বুদ্ধপ্রতিমার সঙ্গে আমরা আরও দুইটি মূর্ত্তি দেখিতে পাই, তখন বলিতে হইবে, বুদ্ধের প্রতিকৃতিতে ত্রিমূর্ত্তির সমাবেশ আছে; যাহাতে ত্রিমূর্ত্তির সমাবেশ আছে, বলিতে হইবে, তাহা বুদ্ধের প্রতিকৃতি; যখন জগন্নাথমূর্ত্তিতে আরও দুইটি মূর্ত্তির সমাবেশ আছে, তখন সে ত্রিমূর্ত্তি; যখন সে ত্রিমূর্ত্তি, তখন সে বুদ্ধের প্রতিকৃতি। এই তর্কের উপরে আর বলিবার কি আছে? বলিবার কিছুই নাই, জিজ্ঞাসা করিবার কিছু আছে। খ্রীষ্টয়ানের ত্রিত্ববাদ বৌদ্ধ-ধর্ম্ম হইতে গৃহীত? না, খ্রীষ্টধর্ম্মের নিকট হইতে এই ত্রিত্ববাদ বৌদ্ধধর্ম্মে সংক্রামিত? খ্রীষ্টধর্ম্ম হইতে বৌদ্ধধর্ম্মে ত্রিত্ববাদ সংগৃহীত হইল, আবার হিন্দুধর্ম্মে বৌদ্ধদিগের নিকট হইতে সেই ত্রিত্ববাদ গোপনে অপহৃত হইল; এই যুক্তিতেই বিনিগমনা আছে, অনুকূল তর্ক আছে, এই মূল সত্যের অনুসরণ না করিয়া শাখার আশ্রয় গ্রহণ করা সুসঙ্গত হয় নাই। তাহা হইলে আর বুদ্ধদেবের আবির্ভাবকাল লইয়াও গোলযোগে পড়িতে হয় না। খ্রীষ্ট জন্মিবার অন্ততঃ দুইশত বৎসর পরে বুদ্ধের আবির্ভাবের কাল অবধারণ করা যাইতে পারে। আর, হিন্দুর বেদ, উপনিষদ, স্মৃতি, পুরাণ সমস্তই তৎপরে অর্থাৎ দ্বাদশ শতাব্দীর ভিতরে রচিত হইয়াছে, সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। তন্ত্র ত ইংরাজাধিকারের পরে লিখিত, সে সম্বন্ধে অভ্রান্ত যুক্তি আছে, ক্লাইবের নাম দেখিয়াই তন্ত্রে ক্লীঁ বীজ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। বলা আবশ্যক, হিন্দুর ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব বৌদ্ধের নিকট হইতে বা খ্রীষ্টয়ানের নিকট হইতে গৃহীত। অনেকের গৃহে রাম, লক্ষ্মণ, সীতার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত, অনেকের গৃহে গণেশজননীর মূর্ত্তি ও মহাদেব আছেন; এ সমস্তই বুদ্ধ, সঙ্ঘ ও ধর্ম্মমূর্ত্তি। রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তির সহিত শালগ্রাম চক্র আছেন; বলা বাহুল্য যে, সে মূর্ত্তিত্রয়ও বুদ্ধ, সঙ্ঘ ও ধর্ম্মের মূর্ত্তি। বুদ্ধ ও ধর্ম্মের পুরুষ মূর্ত্তি, সঙ্ঘের স্ত্রী-মূর্ত্তি। পূর্ব্ব কথিত হিন্দুদেবমূর্ত্তিগুলির ভিতরেও এক

* জেনারেল কনিংহাম কৃত The Ancient Geography of India দ্রষ্টব্য।

একটি স্ত্রী-মূর্ত্তি, অপর দুই দুইটি পুরুষ-মূর্ত্তি আছে; সুতরাং জগন্নাথদেবের মূর্ত্তি যে বুদ্ধ মূর্ত্তি, এই অনুমানে কোনরূপ হেত্বাভাসের (Fallacy) সম্ভাবনা নাই। এই ত্রিমূর্ত্তির নিকটে প্রস্তরনির্ম্মিত সুদর্শনচক্র আছে। আর কি? ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট প্রমাণ কি থাকিতে পারে? বুদ্ধেরও যে চক্র আছে, এই চক্রই যে বুদ্ধত্বসাধক অব্যর্থ প্রমাণ। ষড়্‌বর্ষবয়স্কা সরোজকুমারী তাহার পিত্রালয়ের সন্নিধানে একটি ক্ষুদ্র গৃহে বৃদ্ধা গৌরীর নিকটে যাইয়া তাহার মুখে রূপকথা শুনিত। দরিদ্রা গৌরী তাহাকে রূপকথা শুনাইত, আর হাতে চরকার সূতা প্রস্তুত করিত। সরোজকুমারী গৌরীর চরকা ভিন্ন আর কখনও চরকা দেখে নাই। কোন এক সময়ে সরোজকুমারী মাতার সঙ্গে মাতামহের গৃহে যাইয়া কোন এক দাসীর একটি চরকা দেখিতে পায় ও সেই চরকা দেখিয়াই জিদ্ ধরে, গৌরী ঠানদিদিকে ডাকিয়া দেও, আমি তাহার মুখে রূপকথা শুনিব। সকলে বলিল, গৌরী কে? গৌরীনামে এখানে কেহ নাই, কাহাকে ডাকিব? সরোজকুমারী চরকা দেখাইয়া বলিল, কেন থাকিবে না? যখন ওটা আছে, তখন গৌরী ঠানদিদিও আছে, ওটা যে গৌরী ঠানদিদির। এই বিদেশী অনুমান শুনিয়া সরোজকুমারীর অনুমানের কথা মনে হয়, হায়, সুদর্শনচক্র! তোমাকে লইয়াও বিভ্রতে পড়িতে হইল! চীন, জাপান, তিব্বত, বর্ম্মা, ভারত যে স্থানেরই বুদ্ধমূর্ত্তি দেখিবে, সমস্ত মূর্ত্তিরই একরূপ গঠন, চক্ষুঃমুখ, নাসিকা এক ভাবেই গঠিত, সর্ব্বত্র এক সাম্য বিদ্যমান। আবার সমস্ত মূর্ত্তিই যোগাসনে উপবিষ্ট, চক্ষু ভ্রূমধ্যে সন্নিবেশিত, পাণিতল অঙ্কে স্থাপিত। জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি, জগন্নাথদেবের মূর্ত্তিতে ইহার কি আছে? বুদ্ধ মূর্ত্তির সহিত জগন্নাথদেবের মূর্ত্তির কতটুকু সৌসাদৃশ্য আছে? অর্দ্ধনিমীলিত বুদ্ধনেত্রের সহিত জগন্নাথদেবের ভীষণ বিশাল নেত্রদ্বয়ের কি সাদৃশ্য আছে? আর অঙ্কন্যস্ত পাণিতলের সহিত পাণি-তলবিহীন এবং ঋজুভাবে সম্মুখে শূন্যে প্রসারিত বাহুযুগলের কিরূপ সাম্য আছে? কলিঙ্গ-উৎকলের ভাস্কর্য্য এক সময়ে জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল, উৎকল-কলিঙ্গের শিল্পী কঠোর প্রস্তরফলক হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাণিতলের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র রেখাপাতগুলি পর্য্যন্ত বাটালীর মুখে বাহির করিতে সমর্থ হইয়াছিল; আর কোমল কাষ্ঠফলকে জগন্নাথদেবের কমনীয় মূর্ত্তি বাহির করিতে পারিল না, অস্বাভাবিক ভাবে বাহুদ্বয়ের সৃষ্টি করিয়া তাহাতে পাণিতলের সন্নিবেশ করিতে পারিল না; ইহার অর্থ কি? জগন্নাথদেবকে বুদ্ধমূর্ত্তি স্বীকার করিলে এ প্রশ্নের উত্তর হইবে না, হিন্দুর নিকটে জিজ্ঞাসা করিলে সহজেই মীমাংসা হইবে। শাস্ত্রের সিদ্ধান্তে জগন্নাথ প্রণবমূর্ত্তি;—অর্থেও প্রণব, আকারেও প্রণব। দেবনাগর-বর্ণমালায় ওকরের পৃথক্ আকার নাই, যে প্রণালীতে ব্যঞ্জনবর্ণে ওকারের সংযোগ করা হয়, অকারে সেই প্রণালী অবলম্বন করিয়া ওকারের চিত্র লিখিত হয়, যাঁহারা দেবনাগর-বর্ণমালার গঠন হইতে সমস্ত ভারতীয় বর্ণমালার সৃষ্টি

হইয়াছে বলেন, তাঁহাদিগকে এই বিষয়ে মনোযোগ প্রদানের জন্য অনুরোধ করি। বাঙ্গালা অক্ষর আধুনিক নয়, বাঙ্গালা অক্ষরের বর্ণনা আছে বলিয়া তন্ত্রশাস্ত্রও আধুনিক নয়। তন্ত্র প্রাচীন প্রমাণ করিতে হইলে স্বতন্ত্র প্রবন্ধের আবশ্যকতা হইবে। বুদ্ধদেব যখন বাঙ্গালা অক্ষর শিখিয়াছিলেন প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, তখন বাঙ্গালা বর্ণমালা যে প্রাচীন, সে সম্বন্ধে আর প্রমাণান্তরের প্রয়োজন করে না। প্রণবের শীর্ষস্থ বিন্দুটি জগন্নাথদেবের মস্তক, চন্দ্রটি ঋজু বাহুযুগল, ওকারের ঊর্দ্ধাংশ নাভি পর্য্যন্ত বক্ষঃস্থল, নিম্নাংশ নাভি হইতে নিম্নাবয়ব। অবশ্য, বাঙ্গালা প্রণবই এই ভগবন্মূর্ত্তির আদর্শ। তন্ত্রের অনেক বাঙ্গালা অক্ষরকে আদর্শ করিয়া লিখিবার ব্যবস্থা আছে। "তস্য বাচকঃ প্রণবঃ" পাতঞ্জল-দর্শনের সূত্র, সেই ঈশ্বরের বাচক-শব্দ প্রণব, উপনিষদে তাহাই আছে, ভগবদ্গীতাতেও তাহাই আছে। অকার, উকার, মকার এই তিনবর্ণের ঘনসন্নিবেশে এই বর্ণের সংস্থান। তিন বেদ; জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এই তিন বৃত্তি; ভূর্লোক, ভুবোলোক, স্বর্লোক, এই তিন ভুবন; ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এই তিন দেবতা প্রণবের অর্থ। ধরিতে গেলে ভগবানের বিশ্বরূপই প্রণব। আবার নাদবিন্দু শক্তি, অকার বিষ্ণু, উকার ব্রহ্মা ও শিব। অর্থ সৃষ্টি, স্থিতি, সংহারের কারণ। বিন্দু তুরীয়ব্রহ্ম; নাদ শক্তি; অকার, উকার ঈশ্বর। এক প্রণবেই বেদান্ততত্ত্ব নিগূঢ় ভাবে অবস্থিত। বেদ, উপনিষদ, তন্ত্রে যাহা বলা হইয়াছে, এক প্রণবেই তাহা বিদ্যমান, ভগবানের বিশ্বরূপ এক প্রণবেই নিহিত। একদিন ক্ষত্রিয়ান্তকারী প্রশয়-সমুদ্রের তীরভূমি কুরুক্ষেত্রে ভক্ত অর্জ্জুন ভগবানের এই বিশ্বরূপ অবলোকন করিয়াছিলেন, আর আজ এই কল্লোলময় মহাসমুদ্রের বেলাভূমিতে প্রাণের পিপাসা মিটাইয়া চক্ষু ভরিয়া ভগবানের এই ভীষণ জলময় মূর্ত্তি এই বিশ্বরূপ বিলোকন করিয়া সাধক তুমি, ভক্ত তুমি, মানব জন্ম সার্থক কর। অর্জ্জুনে প্রদর্শিত বিশ্বরূপে সহস্র চক্ষু, সহস্র বক্ত্র, সহস্র বাহু, সহস্র উদর ছিল; আর এ বিশ্বমূর্ত্তিতে বিশাল ভয়ানক লোচনদ্বয়ে সহস্র চক্ষুর সত্তা আছে, আকাশরূপ বিশাল ললাটে উদ্ভাসিত বিশাল নেত্রদ্বয়ে সহস্র সহস্র উজ্জ্বল চন্দ্র-সূর্য্যের সত্তা আছে, কালানলস্বরূপ জ্বালাময় ভয়ানক বিশাল বদনমণ্ডলে সহস্র মুখের সত্তা আছে, অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের জন্য অগ্রপ্রেরিত বাহুযুগলে বাহুসহস্রের ভাবসমাবেশ আছে। কে বলিবে কোন্ কর্ম্ম করিবার জন্য এই বাহুদ্বয়ের অগ্রভাগ প্রবৃত্ত বা নিযুক্ত? কর্ম্ম অনন্ত, কর্ম্মের শেষ নাই, বিশ্বরূপের বাহুযুগলেরও শেষ নাই, অগ্রভাগ নাই; তুমি জ্ঞানী, তুমি সাধক, তোমাকে বুঝাইবার জন্য বাহুর কিয়দংশ প্রদর্শিত হইয়াছে, বুঝাইবার জন্যও আবার অগ্রভাগ পাণিতল প্রদর্শিত হয় নাই। এক মূর্ত্তিতে যেমন ত্রিমূর্ত্তির সমাহার, সেইরূপ পৃথক্ পৃথক্ তিন মূর্ত্তি প্রদর্শিত হইয়া এই তিন মূর্ত্তির সমষ্টিতে একমূর্ত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। দক্ষিণে ধূম্রযান, বামে সংকর্ষণ বলরাম, সুভদ্রা মহাশক্তির আশ্রয়ে ব্রহ্ম রূপে

সৃষ্টি, রুদ্ররূপে প্রলয় সূচিত হইতেছে, বামে দেবযান, বামে অবস্থিত হইয়া জগন্নাথ এক শক্তিরই আশ্রয়ে জগতের সৃষ্টিতত্ত্ব, স্থিতি-তত্ত্ব, প্রলয়-তত্ত্ব বুঝাইয়া দিয়া আত্মস্বরূপ বুঝাইয়া দিতেছেন; ইহাকেই বলে পুরুষোত্তম দর্শন। পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে বিমলা দেবী আছেন, সরস্বতী আছেন, লক্ষ্মী আছেন, চামুণ্ডা আছেন। লোকনাথ মহাদেব, মার্কণ্ডেশ্বর মহাদেব, ইন্দ্রদ্যুম্নেশ্বর মহাদেব অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। যাজপুর বিরজাক্ষেত্র, পুরী শ্রীক্ষেত্র বা বিমলাক্ষেত্র। ভদ্রাও অন্যকেহ নহেন, স্বয়ং দুর্গা ভুবনেশ্বরী, ইহা একটি যোগী সন্ন্যাসীর মুখে শুনিয়াছি। এ সন্ন্যাসী কখনও পুরীতে, কখনও কাশীতে, কখনও উত্তরাপথে থাকিতেন। যাজপুরে বিরজার কর্তৃত্ব, শ্রীক্ষেত্রে বিমলার আধিপত্য, বিল্বপত্র তুলসী পত্রের সংযোগে দ্বাদশাক্ষরি বাসুদেব-মন্ত্রে শ্রীভুবনেশ্বরের অর্চ্চনা দেখিয়া শ্রীপুরুষোত্তমের শ্রীমন্দিরে রক্ষিত তাল-পত্রে লিখিত উৎকলের ইতিহাস-মাদলপঞ্জিকা পাঠ করিয়া বিদেশী ভাবে শিক্ষিত মহাত্মাদিগের মনঃকল্পিত শৈবযুগ, শাক্তযুগ, বৈষ্ণবযুগের সিদ্ধান্তে সম্মতি প্রদান করিতে না পারিয়াও একান্ত দুঃখিত হইতেছি। উৎকল-কলিঙ্গের রাজা যে যযাতি-কেশরী ভুবনেশ্বরের বিশ্ববিশ্রুত মন্দির নির্ম্মাণের আরম্ভ করেন,; তিনিই সমুদ্রকূলের বালুকাস্তূপ উৎসারিত করিয়া স্বপ্নাদিষ্ট এই ভগবৎ-মূর্ত্তিত্রয় লাভ করেন ও পুরুষোত্তমের প্রাচীন মন্দির নির্ম্মাণ করেন। নবীন সন্ন্যাসী বৈষ্ণবধর্ম্মের নবীন প্রবর্ত্তক চৈতন্যদেবের একান্ত ভক্ত হইয়াও রাজা প্রতাপ-রুদ্র ধবলেশ্বর প্রভৃতির মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন। স্বয়ং চৈতন্যদেবও সর্ব্বত্র মহাদেবের মন্দিরে প্রবেশ করিয়া অর্চ্চনা বন্দনা ও স্তোত্র পাঠ করিয়াছেন। আজ যেমন শাক্তের গৃহে রাধাকৃষ্ণমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত, শালগ্রামচক্র অর্চ্চিত হইতেছেন, আজ যেমন বৈষ্ণবের গৃহে শিবলিঙ্গের প্রতিষ্ঠা আছে, আড়ম্বরের সহিত শারদীয়া দুর্গাপূজা সম্পন্ন হইতেছে, যুগযুগান্তর পূর্ব্বেও তাহাই ছিল। এই জন্য শ্রীকৃষ্ণের নিত্য সহচর রাজা যুধিষ্ঠির দুর্গার স্তোত্র পাঠ করিয়াছেন, অর্জ্জুন শিবের তপস্যা করিয়াছেন, ব্রজ-কুমারীরা কাত্যায়নীব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। সুতরাং ঐ সমস্ত যুগবিভাগ যে একান্ত মনঃকল্পিত, সে সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কিছু নাই।

বৌদ্ধাচার্য্যেরা অনুষ্ঠান-প্রবল মহাযান বৌদ্ধসম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়াও ভারতবর্ষে অধিক দিন বৌদ্ধধর্ম্মের রক্ষা করিতে পারেন নাই; বৈদিক ধর্ম্মের প্রখরমার্ত্তণ্ডপ্রভায় তামস ধর্ম্ম স্থির থাকিতে না পারিয়া ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া দিগ্‌দিগন্তরে প্রস্থান করিয়াছে; উৎকল-কলিঙ্গে আজ একটিও বৌদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায় না। উদয়গিরি, খণ্ডগিরির গাত্রে ক্ষোদিত গুম্ফাগুলি না থাকিলে, পর্ব্বতগাত্রে উৎকীর্ণ অশোকের শাসনলিপি না থাকিলে এক সময়ে যে উৎকল-কলিঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব ব্যাপ্ত হইয়াছিল, তাহা বলিবার উপায় থাকে না। উৎকল-কলিঙ্গে প্রত্নতত্ত্বের অনেক উপকরণ,—অনেক নিদর্শন ইতস্তত

পড়িয়া রহিয়াছে, এক জীবনে বহুবর্ষব্যাপী পরিশ্রম করিলেও সমস্ত সংগ্রহ করিবার আশা করা যাইতে পারে না।

উৎকল-প্রসঙ্গ লিখিতে যাইয়া বাধ্য হইয়া আমার অনেক অবান্তর কথা বলিতে হইয়াছে। দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়া আমি পাঠক পাঠিকার ধৈর্য্যচ্যুতি জন্মাইয়াছি বলিয়া শঙ্কিত হইয়াছি। উপসংহারে তাঁহাদিগের নিকটে একমাত্র ক্ষমা প্রার্থনা ভিন্ন আর আমার বলিবার কিছু নাই।

শ্রীযাদবেশ্বর তর্করত্ন।

ঊষার তারা।

বিরলে গগণ কোলে কে তুমি যাপিছ নিশি
ম্লান আঁখি বিরহিণী প্রায়,
কি ব্যথা ধরিয়া বুকে বল কি আশার আশে
অনিমেষ চাহিছ ধরায়?
সাথী কি এসেছ ফেলি তাই পথ চেয়ে চেয়ে
নাহি সুখ, বিনিদ্র অধীর?
বিরহের মর্ম্মব্যথা শিশির সম্পাতে কি গো
ঝরিতেছে,—তব আঁখি নীর?

অথবা কি ধ্যানমগ্না আছ তুমি নভতলে
উমা যথা হিমগিরি পরে,
সংজ্ঞাহীন হর লাগি ছিলেন কঠোর ব্রতে
একাসনে মিলনের তরে।
যুগযুগান্তর হতে সাধনা সমাধি মাঝে
বল দেবি কতকাল হায়!
ওগো প্রেম-সন্ন্যাসিনী কোন পুণ্যক্ষণ লাগি
রবে তুমি চাহি দেবতায়।

শ্রীপ্রফুল্লনারায়ণ রায়।

'কৃষ্ণ-চরিত'

সাহিত্যাচার্য্য বঙ্কিমচন্দ্র সর্ব্বপ্রথম নব্য-সম্প্রদায়ের মধ্যে কৃষ্ণভক্তি প্রচারের চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থে তিনি কৃষ্ণের মানব-চরিত্রেরই আলোচনা করিয়াছেন সত্য, কিন্তু কৃষ্ণকে যে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস ছিল, এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে যে তাঁহার সেই বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হইয়াছিল, উক্ত গ্রন্থেই তিনি এ কথার উল্লেখ করিয়াছেন। ভক্তি দ্বারা বিশেষতঃ ভগবদ্ভক্তি দ্বারা, মানুষ উন্নত হয়; কিন্তু ভগবচ্চরিত্র সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা থাকিলে সেই উন্নতির ব্যাঘাত ঘটে। "কৃষ্ণ আমাদের দেশে সর্ব্বব্যাপক," সুতরাং কৃষ্ণ চরিত্র সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান আমাদের জাতীয় উন্নতির পক্ষে তিনি একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া বুঝিয়াছিলেন। সেই চরিত্র সম্বন্ধে লোকের অমূলক বিশ্বাস দূর করিবার ইচ্ছায় তিনি যথাসাধ্য পুরাণ-ইতিহাসাদির আলোচনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণের বিমল শুভ্র চরিত্র তাঁহার গ্রন্থে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু বিষয়টি যেরূপ সুবিস্তৃত ও বহু আলোচনাসাপেক্ষ এবং আচার্য্য-দেবের জীবন যেরূপ কর্ম্মবহুল ছিল, তাহাতে এরূপ গুরুতর বিষয়ে অনন্য-সহায় ব্যক্তিবিশেষের সিদ্ধান্তের উপর সর্ব্বাংশে নির্ভর না করিয়া এদিকে সমবেত চেষ্টা প্রয়োগই সাহিত্য-সেবিগণের পক্ষে কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হয়।

এবম্বিধ কার্যে আমার মত অযোগ্য লোকের হস্তক্ষেপ দেখিয়া অনেকেই মনে করিবেন (এবং সেরূপ মনে করা অসঙ্গতও হইবে না) যে "Fools rush in where Angels fear to tread" কিন্তু এইরূপ ধৃষ্টতার সমর্থন-কল্পে আমার বিনীত উত্তর এই যে, একটি সমবেত চেষ্টার সূত্রপাত করাই আমার মুখ্য উদ্দেশ্য ।

পূজ্যপাদ বঙ্কিম বাবু কৃষ্ণ-চরিত্র বুঝিবার জন্য প্রধানতঃ মহাভারতের উপর নির্ভর করিয়াছেন, এবং কৃষ্ণের কলঙ্কমোচন-প্রয়াসে মহাভারতের অনেকগুলি অংশ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া স্থির করিয়াছেন। নৈতিক ধর্ম্মাধিকরণে শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে প্রধান প্রধান অভিযোগ যাহা আছে, তৎসম্পর্কীয় প্রমাণ-সমূহের বিশ্লেষণ করিয়া তিনি বুঝিয়াছেন যে, সে অভিযোগ ভিত্তিহীন ; ঘটনাগুলি সত্য নহে—কাজেই তিনি কৃষ্ণকে নির্দ্দোষ বলিয়াছেন ! বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি অনুসারে আমি দেখাইতে চেষ্টা করিতেছি যে, ঐ ঘটনাগুলি সত্য হইলেও উহারা কৃষ্ণ-চরিত্রের কলঙ্ক নহে।

"অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ" ও বৃন্দাবনের গোপী—এই দুইটিকে কৃষ্ণের প্রধান অপবাদ ধরিয়া প্রথমটি সম্বন্ধে বঙ্কিম বাবু বলিয়াছেন —"বৃত্তান্তটি নিতান্তই যে উপহাস্য তাহার সাত রকম প্রমাণ দিলাম।" কিন্তু যাহাকে তিনি 'প্রমাণ' নাম দিয়াছেন, বস্তুতঃ তাহা প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না,—অনুমান মাত্র। বৃত্তান্তটি যে প্রক্ষিপ্ত নহে এ কথা অবশ্য আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি না ; তবে আমার বক্তব্য এই যে উহা সত্য হইলেও উহাতে কলঙ্কের কারণ প্রকৃত পক্ষে কিছুই নাই। ইহা দেখাইতে হইলে কৃষ্ণ কথিত ধর্ম্মতত্ত্ব বঙ্কিম বাবু যেরূপ বুঝিয়াছেন, তাহা একবার দেখা উচিত।

তিনি কৃষ্ণ-প্রোক্ত ধর্ম্মতত্ত্বের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন :—

সত্য, শৌচ, দান, অহিংসাদি শ্রুতিবিহিত বিধিসমূহের সকলগুলিই সাধারণতঃ ধর্ম্ম, আবার অবস্থা-বিশেষে অর্থাৎ অনুপযুক্ত প্রয়োগে সকলগুলিই অধর্ম্ম হইয়া দাঁড়ায় ; পক্ষান্তরে, অসত্য হিংসাদি যে সকল কার্য্য সাধারণতঃ অধর্ম্ম অর্থাৎ শাস্ত্রনিষিদ্ধ, তাহারাও স্থলবিশেষে ধর্ম্ম বলিয়া গণ্য হয়। উদাহরণ স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন :—(১) দস্যুর নিকট সত্য কথা কহিয়া প্রাণভয়ে পলায়িত ব্যক্তির সন্ধান বলিয়া দেওয়াতে সত্যনিষ্ঠ কৌশিক নরকে গিয়াছিলেন। (২) পাপাত্মাদিগকে ধনাদি দান করা অধর্ম্ম। (৩) লোক-হিংসাকারীর হনন করিয়া বালক-ব্যাধ স্বর্গ লাভ করিয়াছিল ; ইত্যাদি। শ্রুতি সাধারণতঃ ধর্ম্মের প্রমাণ হইলেও উহাতে সমস্ত ধর্ম্মতত্ত্ব নির্দ্দিষ্ট নাই। তজ্জন্য অনুমান দ্বারাও অনেক স্থলে নিতান্ত দুর্ব্বোধ্য ধর্ম্মের নির্ণয় করিতে হয়। কিন্তু সম্মুখে একটি আদর্শ না থাকিলে কি ধরিয়া অনুমান অগ্রসর হইবে ? তাই ধর্ম্মাধর্ম্ম নির্ণয়ের জন্য একটি সর্ব্বত্র প্রযোজ্য, বিশ্বজনীন মূলসূত্র চাই। শ্রীকৃষ্ণের মতে সেই মূলসূত্রটি এই—"যদ্দ্বারা প্রাণিগণের রক্ষা হয় তাহাই ধর্ম্ম। পাশ্চাত্য হিতবাদী Sidgwickএর সহিত এই মতের ঐক্য আছে। Kant, Hegel প্রমুখ নৈতিক ও দার্শনিকদিগেরও এইরূপ

এক একটি মূলসূত্র আছে। উহাকে ভিত্তি বা আদর্শ ধরিয়া সমস্ত কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণীত হয়।

অহিংসা সত্যাদি শ্রুতি-বিহিত স্থূল নীতি-গুলি যখন উক্ত লোকহিতরূপ চরম লক্ষ্যের প্রতিকূল হয়, তখন তাহারা অধর্ম্ম। আবার অসত্য হিংসাদি সাধারণতঃ নিষিদ্ধ কার্য্যগুলি উহার অনুকূল হইলে ধর্ম্ম বলিয়া গণ্য হয়। ইহাই বর্জ্জিত তত্ত্ব। সুতরাং দেখা যাইতেছে এই মতে অহিংসা ও লোক-রক্ষাই পরম চরম ও অনন্যসাপেক্ষ ধর্ম্ম। অন্যান্য বিধিসমূহের নৈতিক মূল্য আপেক্ষিক, অর্থাৎ উক্ত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মানুকূল্যসাপেক্ষ। সত্য —শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, কেননা ইহা লোক স্থিতির অনুকূল ও উপায়ীভূত। সত্য ও অহিংসার বিরোধ স্থলে অহিংসাকেই প্রাধান্য দিতে হয়। আবার লোক-স্থিতির সহিত অহিংসার বিরোধ স্থলে লোকস্থিতিকেই প্রাধান্য দেওয়া উচিত। অর্থাৎ লোকরক্ষার্থ দুষ্টের প্রতি হিংসাচরণ ধর্ম্ম্য। কৌশিক ও বালকের বৃত্তান্তে এই দুই কথার উল্লেখ হইয়াছে।

লোকরক্ষার্থ স্থূল নীতির বর্জ্জন অপরি-হার্য্য হইলে তাহার ঔচিত্য সম্বন্ধে বঙ্কিম বাবু কৃষ্ণের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন,—যথা "স্থলবিশেষে সত্য মিথ্যাস্বরূপ এবং মিথ্যা সত্যস্বরূপ হয়।" গীতা ও মহাভারত হইতে ইহার অনুরূপ আরও ২।৪টি উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি—

"কর্ত্তব্য কি এবং অকর্ত্তব্য বা কি, এই তত্ত্ব পণ্ডিতজনের পক্ষেও অতি দুর্জ্ঞেয়। স্থলবিশেষে অর্থাৎ প্রয়োগ-ভেদে কর্ত্তব্য কর্ম্মও অকর্ত্তব্য এবং অকর্ত্তব্যও কর্ত্তব্য বলিয়া গণ্য হয়। বুদ্ধিমান্, যোগযুক্ত ব্যক্তি কর্ম্মের এই গহন গতি বুঝিতে পারেন।" (গীতা, ৪র্থ অধ্যায়ে কৃষ্ণোক্তি) "কোন স্থলে অধর্ম্ম ধর্ম্মের ন্যায় এবং কোন স্থানে ধর্ম্ম অধর্ম্মের ন্যায় লক্ষিত হয়; কিন্তু পণ্ডিত ব্যক্তিরা কোন্‌টি যথার্থ ধর্ম্ম আর কোন্‌টি যথার্থ অধর্ম্ম, তাহা অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন।" (শান্তিপর্ব্ব, ৩৩শ অধ্যায়)। "ধর্ম্মের গতি অতি সূক্ষ্ম, বিজ্ঞেরাও তাহা সম্যক নিরূপণ করিতে পারেন না।" (সভাপর্ব্বে ভীষ্মোক্তি) এক ব্যক্তিকে বিনাশ করিয়া একটি কুল, এবং একটি কুলকে নির্ম্মূল করিয়া রাজ্যরক্ষা করা ধর্ম্ম।" "কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ।" ইত্যাদি।

"যাহা ৫২ তাহা ৫৩" বলিয়া একটি গল্প আছে, তাহার তাৎপর্য্য এই যে কোন সতীর উপর অত্যাচার করণোদ্যত জনৈক দুষ্ট লোকের বিনাশ করায় এক দস্যু তাহার সমস্ত নর-হত্যা জনিত পাপ হইতে মুক্তি-লাভ করিয়াছিল। বস্তুতঃ সঙ্কীর্ণ, লৌকিক দৃষ্টিতে যাহা সাধারণতঃ পাপ বা পুণ্য বলিয়া বোধ হয় তাহা দেখিয়া, দেশ কাল পাত্র ও আনুসঙ্গিক অবস্থাদির বিচারক্ষম, সূক্ষ্মার্থ-দর্শী ধর্ম্মরাজ অনেক সময়েই হয় ত বলিয়া থাকেন—

"থাক তব ক্ষুদ্র মাপ, ক্ষুদ্র পুণ্য ক্ষুদ্র পাপ,
সংসারের পারে।"

বঙ্কিম বাবুর ব্যাখ্যাত ও অনুমোদিত কৃষ্ণোক্ত ধর্ম্মের বর্জ্জিত তত্ত্বানুসারে লোক-রক্ষার্থ সত্য ও অহিংসা এই স্থূলনীতিদ্বয়ের ব্যতিক্রম দ্বারা দ্রোণভীষ্মাদির বধ ব্যাপারে

তাঁহার কোন আপত্তি থাকা উচিত ছিল না। তাঁহার ব্যাখ্যানুসারে কৃষ্ণের ধর্ম্মতত্ত্ব পাশ্চাত্য হিতবাদেরই অনুরূপ বলিয়া বোধ হয়। এই ব্যাখ্যাকে সত্য ধরিয়া লইলে কৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠিরাদির কলঙ্কমোচন আমার পক্ষে অপেক্ষাকৃত অনায়াসসাধ্য হইত। কিন্তু ইহার মধ্যে আর একটি অতি জটিল বিবেচ্য বিষয় আছে। বর্জ্জিত তত্ত্বানুসারে সত্য অহিংসাদি স্থূলনীতির ব্যতিক্রমে কি একেবারেই পাপ নাই? ঐরূপ ব্যতিক্রম সম্পূর্ণরূপে ধর্ম্ম, না মোটের উপর ধর্ম্ম? বঙ্কিম বাবু এই প্রশ্নটি তোলেন নাই। কৃষ্ণেরও এ সম্বন্ধে স্পষ্টতঃ কোন উক্তি পাওয়া যায় না। তবে মহাভারত ও অন্যান্য গ্রন্থে কৃষ্ণের ভক্ত ও মতাবলম্বী ব্যক্তিদিগের এরূপ অনেক উক্তি আছে যাহা হইতে বুঝা যায় যে সত্য অহিংসাদির ব্যতিক্রম মাত্রেই অল্পাধিক পরিমাণে পাপ আছে। নিষ্কাম ভাবে কর্ম্ম করিতে না পারিলে হিংসা মাত্রই পাপজনক। এই ভাবের কয়েকটি কথা উদ্ধৃত করিতেছি:—"সকল কার্য্যেই আংশিক দোষ ও আংশিক গুণ থাকে। দুর্ব্বলের রক্ষার্থ, প্রবলের বিনাশ সাধন পক্ষেও এই কথা।" (শান্তিপর্ব্ব ৫শ অধ্যায়)। "রাজ্যলাভ ও রাজ্যরক্ষা উভয়েই ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম আছে।" (শান্তিপর্ব্ব ১৭শ অধ্যায়)। "যুদ্ধান্তে তীর্থযাত্রাং বৎ প্রজ্ঞাতে বান্ধবঃ রণঃ। তেন জানীমহে হিংসা ধর্ম্মাঽপি দুরিত-প্রদা॥" (আদিপর্ব্বে নীলকণ্ঠধৃতা গাণেশী টীকা)। শ্যেনযজ্ঞ দ্বারা শত্রুক্ষয়রূপ শ্রেয়োলাভ হয় বটে, কিন্তু পরিণামে জীবহিংসাজনিত নরকভোগরূপ শ্রেয়োলাভও হইয়া থাকে। সাংখ্যকারিক ব্যাখ্যায় বাচস্পতি মিশ্র ধৃত পঞ্চশিখাচার্য্যের "স্বল্পসঙ্করঃ সপরিহারঃ সপ্রত্যবমর্ষঃ" এই উক্তিও উক্ত মতের সমর্থন করিতেছে। হিংসা মাত্রেই পাপ; এমন কি অজ্ঞানকৃত হিংসাতেও পাপ আছে। চুল্লী, জাঁতা, উদূখলাদি দ্বারা অনিচ্ছাকৃত জীবহিংসাহেতু পঞ্চশূনাদি পাপ হইতে মুক্তিলাভার্থ গৃহস্থকে পঞ্চ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে হয়। জৈনদিগের মধ্যেও অজ্ঞানকৃত জীবহিংসা নিবারণার্থ আহার-বিহার সম্বন্ধে অনেক সতর্কতাবলম্বন করিবার বিধি আছে। কৃষ্ণোক্ত ধর্ম্মেরও প্রথম কথা "অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ" ইহা বঙ্কিম বাবু বলিয়াছেন। বস্তুতঃ সর্ব্বপ্রকার হিংসাই পাপজনক, হিন্দু-শাস্ত্রের অভিপ্রায় এইরূপই বোধ হয়। আবার ইহার বিপরীত ভাবের কথাও আছে, যথা:—"আততায়ী ব্যক্তি ব্রাহ্মণ হইলেও তাহার বিনাশে ব্রহ্মহত্যা পাপ হয় না।" "লোকরক্ষার্থ হিংসাকারীর বিনাশ স্থলে অধর্ম্মই ধর্ম্মস্বরূপ হয়।" এক ব্যক্তিকে বিনাশ করিয়া একটি কুল এবং একটি কুলকে বিনাশ করিয়া রাজ্যরক্ষা করা ধর্ম্ম।" ইত্যাদি। এই সকল উক্তি এই ভাবে বুঝিতে হইবে যে, ঐ সকল স্থলে হিংসা মোটের উপর ধর্ম্ম, কেননা উহাতে পাপ অপেক্ষা পুণ্যই বেশী হয়। বস্তুতঃ অবিমিশ্র শ্রেয়োলাভ মানুষের ভাগ্যে সাধারণতঃ ঘটে না। মন্দের ভাল লইয়াই তাহাকে সন্তুষ্ট হইতে হয়। বৃহত্তর শ্রেয়োলাভার্থ ক্ষুদ্র আশ্রয়ঃ স্বীকার করিয়া বুদ্ধিমান ব্যক্তি মোটের উপর লাভবান্ হয়েন।

সুতরাং যে যে স্থলে বর্জ্জিত তত্ত্বানুসারে স্থূলনীতির ব্যতিক্রম ধর্ম্ম্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তত্তৎ স্থলে ধর্ম্ম্য অর্থে মোটের উপর ধর্ম্ম্য এইরূপ বুঝিতে হইবে।

অজ্ঞানকৃত বা অনিচ্ছাকৃত হিংসায় ইচ্ছার স্বাধীনতা নাই, তথাপি তাহাতে পাপ হয় কেন? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নহে। তবে ইহা বুঝা যায় যে প্রাণিগণের রক্ষাতেই যদি ধর্ম্ম হয় তবে যে পরিমাণে জীবহিংসা হইবে সেই পরিমাণে অধর্ম্মও হইবে, সুতরাং অধিকাংশ লোকের রক্ষার্থ স্বল্পসংখ্যক দুষ্টের সংহার স্থলে কিয়ৎ পরিমাণে পাপ হইবেই। কিন্তু ঐরূপ হিংসা মোটের উপর ধর্ম্ম্য, কেননা উহাতে অধিক লোকের হিত ও অল্প লোকের অহিত হয়। এবং যে পরিমাণে অহিত হয় সেই পরিমাণে পাপও হয়।

লোকরক্ষারূপ শ্রেষ্ঠতম ধর্ম্মের প্রতিকূল হইলে অহিংসা সত্যাদি যেরূপ অধর্ম্মে পরিণত হয়, ক্ষমা, প্রেম, দয়া, দান, ভক্তি প্রভৃতিও তদ্রূপ হইয়া থাকে। ইহার অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। প্রবন্ধের দৈর্ঘ্যআশঙ্কায় তাহা দিলাম না।

আর একটি কথার উল্লেখ করা উচিত। লোকরক্ষারূপ মহত্তর উদ্দেশ্য সাধনার্থ স্থূলনীতির ব্যতিক্রম যে স্থলে নিতান্তই অপরিহার্য্য, এবং যে স্থলে উক্ত উদ্দেশ্য সাধন হওয়া সম্বন্ধে সন্দেহের অবসর মাত্রও নাই, কেবল তদ্রূপ সুনিশ্চিত শ্রেয়োলাভের স্থলেই স্থূলনীতির বর্জ্জন ধর্ম্ম্য (অর্থাৎ মোটের উপর ধর্ম্ম্য)। কৃষ্ণোক্ত ধর্ম্মতত্ত্বের ব্যাখ্যাকালে সত্যের অনিত্যত্ব সম্পর্কে বঙ্কিম বাবু বলিয়াছেন যে—'এ বিষয়ে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে ঘোর মতভেদ।' কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। এ বিষয়ে প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে বড় মতভেদ দৃষ্ট হয় না। প্রথমেই বলা উচিত প্রতীচ্য বা পাশ্চাত্য মত বলিয়া কোন একটা মত নাই। আমাদের দেশের মত পাশ্চাত্য নৈতিকদিগের মধ্যেও নানা মুনির নানা মত। কিন্তু ইহা নিশ্চিতরূপে বলা যায় যে নিত্যত্ববাদিগণের অগ্রণী যে Dr. Martineau, তিনিও স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে স্থলবিশেষে, মিথ্যাপ্রয়োগই ধর্ম্ম্য। উদাহরণ স্বরূপ তিনি বলিয়াছেন, রোগীর কাছে তাহার প্রকৃত অবস্থা জানাইলে যে স্থলে রোগবৃদ্ধির সম্ভাবনা, সে স্থলে পরিণাম ফলের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করাই শ্রেয়স্কর। কৃষ্ণোক্ত কৌশিক বৃত্তান্তের সহিত এই কথার সাদৃশ্য আছে। হিতবাদী Sidgwick এরও এই মত। প্রাচীন গ্রীক মনীষী Aristotle এর মতেও নৈতিক বিধিসমূহ নিত্য ও অপরিবর্ত্তনীয় নহে, কিন্তু অবস্থাভেদে ব্যবস্থাভেদ প্রয়োজনীয়।

কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে, বিশেষতঃ দ্রোণাদির বধব্যাপারে, উল্লিখিত ধর্ম্মতত্ত্বের প্রয়োগ বিষয়ে এখন আলোচনা করিব।

সকলেই জানেন কৃষ্ণ কর্ত্তৃক সন্ধিস্থাপনের চেষ্টা দুর্য্যোধনের দোষে বিফল হওয়াতেই অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা সমবায়ে কুরুক্ষেত্র-প্রান্তরে লোক-ভয়ঙ্কর সমরানল প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল। পরস্বাপহারক অসুরাবতার দুর্য্যোধন ধর্ম্মতঃ পাণ্ডবদের বধ্য। ভীষ্মদ্রোণাদি মহাত্মাগণ তাহার রক্ষক, সুতরাং ধর্ম্মস্থাপনের পথে অন্তরায় বলিয়া

তাঁহারাও বধ্য। এ পর্য্যন্ত কোন গোল নাই। কিন্তু বিষম সমস্যার কথা এই যে ন্যায় যুদ্ধে অর্থাৎ ধৃত-শস্ত্রাবস্থায় ভীষ্ম দ্রোণ অপরাজেয়। যুদ্ধের প্রাক্কালে যুধিষ্ঠিরের প্রতি তাঁহার উক্তিই ইহার প্রমাণ। কৌরব পাণ্ডব কোন পক্ষকেই ইঁহারা ছাড়িতে পারেন না। একদিকে অর্থ দ্বারা বদ্ধ; অন্যদিকে ধার্ম্মিকের প্রতি ধার্ম্মিকের স্বাভাবিক আকর্ষণ ও সহানুভূতি। ধর্ম্মনিষ্ঠ পাণ্ডবদিগেরই যে জয়ী হওয়া উচিত, ইঁহারা তাহা বুঝেন এবং মনে মনে তদ্রূপ আকাঙ্ক্ষাও করেন। সুতরাং উভয় পক্ষের প্রতি কর্ত্তব্য পালনের জন্য ইঁহারা কৌরব পক্ষে থাকিয়াই যথাসাধ্য যুদ্ধ করিলেন বটে, কিন্তু পাণ্ডবেরা যাহাতে জয়ী হয় (যুধিষ্ঠির প্রার্থনাক্রমে) তদ্রূপ মন্ত্রণা, এমন কি নিজেদের বধের উপায় পর্য্যন্ত বলিয়া দিলেন। অধিকন্তু "তাঁহারা প্রতিদিন প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সংযত হইয়া 'পাণ্ডবদিগের জয় হউক' বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেন।' তপঃপ্রভাব-সম্পন্ন ভীষ্ম-দ্রোণ কর্ত্তৃক এই আশীর্ব্বচন-রূপ আধ্যাত্মিক শক্তিপ্রয়োগ পাণ্ডবদিগের পক্ষে অল্প লাভের বিষয় ছিল না। অতএব দেখা যাইতেছে কৃষ্ণ যেমন উভয় পক্ষের প্রার্থনাক্রমে ক্ষাত্রধর্ম্মানুরোধে উভয় পক্ষকেই সাহায্য দান করিয়াছিলেন,—একপক্ষে তাঁহার দৈহিক বলের প্রতিনিধি স্বরূপ তাঁহার সমযোদ্ধা নারায়ণী সেনা, অন্য পক্ষে তাঁহার মানসিক বল বা মন্ত্রণাশক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন, কৃষ্ণভক্ত ভীষ্ম ও ভীষ্ম-ভক্ত দ্রোণও তদ্রূপ একপক্ষে বাহুবল, অন্যপক্ষে মন্ত্রণা ও আশীর্ব্বাদরূপ আধ্যাত্মিকী শক্তিদ্বারা সাহায্য করিয়াছিলেন। ভীষ্মদ্রোণের ন্যায় কৃপ-শল্যও পাণ্ডবদিগকে মন্ত্রণা ও আশীঃশক্তি দ্বারা সাহায্য করিয়াছিলেন। এইরূপে, কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে কৃষ্ণ-ভীষ্ম-প্রমুখ পাঁচ জন প্রধান অধিনায়কের বাহুবল এক দিকে এবং বুদ্ধিবল ও অধ্যাত্ম-বল অন্য দিকে প্রযুক্ত হইয়াছিল; এবং পরিণামে মানসিক বলই জয়-লাভ করিয়াছিল। ভীষ্ম দ্রোণ ন্যায় যুদ্ধে অপরাজেয়। তাঁহাদিগের দ্বারা যখন রাশি রাশি পাণ্ডব-সৈন্যের ধ্বংস হইতে লাগিল, তখন তাঁহাদিগের নির্দ্দেশিত অন্যায়োপায় অবলম্বন পূর্ব্বক তাঁহাদের বধসাধন পাণ্ডবপক্ষে অপরিহার্য্য হইল। কিন্তু যিনি ঐরূপ উপায় অবলম্বন করিবেন, তাঁহাকে নিরয়-গামী হইতে হইবে। এরূপ স্থলে ধর্ম্ম-সংস্থাপন ও লোকরক্ষার্থ ব্যক্তিবিশেষের নিরয়-গমন কি শ্রেয়স্কর? এ বড় কঠিন সমস্যার কথা।

পরার্থে স্বার্থত্যাগ মহত্ত্বের পরিচায়ক। স্বার্থত্যাগের আবার ইতর-বিশেষ আছে। যিনি আত্ম-সুখ কিয়ৎ-পরিমাণে খর্ব্ব করিয়া স্বকীয় অর্থ দ্বারা আত্মীয়-স্বজনের হিত সাধন করিতে পারেন, সেই স্বজন-প্রতিপালক ব্যক্তি অতি মহৎ, সন্দেহ নাই। আবার তাঁহার বদান্যতা যখন স্বজন, স্বজাতি ও স্বদেশের সীমা অতিক্রম পূর্ব্বক বিশ্ব-প্রীতিতে পরিণত হইয়া উহার বিশ্ববিস্তৃত স্নেহচ্ছায়ার আশ্রয়ে ত্রিতাপ-দগ্ধ জীবমাত্রকে টানিয়া লয়, তখন তাঁহার মহত্ত্ব আরও অধিক। এ স্থলে কার্য্যক্ষেত্রের ব্যাপ্তি বা বিস্তৃতি দ্বারা আত্মত্যাগের মাত্রাধিক্য সূচিত হইতেছে।

পক্ষান্তরে আবার দত্ত-পদার্থ দাতার নিকট যে পরিমাণে প্রিয় ও মূল্যবান, অর্থাৎ উহার ত্যাগহেতু তাঁহার যে পরিমাণে কষ্ট হইবার কথা, তাঁহার আত্মত্যাগের গভীরতাও সেই পরিমাণে অধিক। পরার্থে আত্ম-প্রাণ-বিসর্জ্জন সাধারণতঃ দুষ্কর। সেই জন্য দধীচি, দামিয়েন, রেগুলাস্ প্রভৃতির আত্মত্যাগ বিশ্ব-বিশ্রুত। আবার আত্মপ্রাণ-দান অপেক্ষা পুত্রবলিদান অধিকতর দুষ্কর বলিয়া ধাত্রী পান্না, ভেটুরিয়া, ব্রুটাস্, এব্রাহাম, কর্ণ প্রভৃতির আত্মত্যাগের গভীরতা অধিকতর। অর্থদান অপেক্ষা প্রাণদান সাধারণতঃ দুষ্কর হইলেও, যে কৃপণ ব্যক্তি দস্যুর নিকট গুপ্তধনের সন্ধান বলিয়া দেওয়ার পরিবর্ত্তে প্রাণ দিতে প্রস্তুত হয়, পরার্থে তাহার আজন্ম-সঞ্চিত অর্থরাশি দান বড় শ্রেষ্ঠ দান বলিতে হইবে। বুদ্ধভক্ত অনাথা রমণীর একমাত্র পরিধেয়খানির দান অতিশ্রেষ্ঠ দান, কেননা লজ্জাত্যাগ স্ত্রীলোকের পক্ষে নিরতিশয় দুষ্কর। মহাভারতোক্ত বুভুক্ষা-পীড়িত ঋচীক ঋষির ভিক্ষালব্ধ শক্তুপ্রস্থ দান, বাইবেলে বর্ণিত বিধবারমণীর কপর্দ্দকদান, মুমূর্ষু Sydney Smithএর পানীয়দান, প্রভৃতি পরিমাণে অল্প হইলেও অবস্থানুসারে অতিশ্রেষ্ঠ দান। পৃথু, হরিশ্চন্দ্র, উশীনর, যুধিষ্ঠির, জোব্, রিড্লি, ল্যাটিমার প্রভৃতি ধর্ম্মবীরের পক্ষে পরার্থে ধর্ম্মবিসর্জ্জনই সর্ব্বাপেক্ষা দুষ্কর আত্মত্যাগ। পদ্মিনী, সরোজিনী প্রমুখ রাজপুত-ললনা সতীত্ব ও সম্মানরক্ষার্থ জহর-ব্রতাবলম্বন পূর্ব্বক জীবন আহুতি দিয়াছিলেন। আবার প্রবাদ আছে কোন সাধ্বী নারী পতির প্রাণরক্ষার্থ তাঁহার অজ্ঞাতসারে স্ত্রীলোকের শেষরত্ন বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হইয়া শেষে লুক্রেশিয়ার মত আত্মহত্যা করিয়াছিলেন। পরলোকের ধর্ম্মাধিকরণে তাঁহার কার্য্যের বিচার-কালে ধর্ম্মরাজের সূক্ষ্ম নিক্তির কাঁটা কোন্ দিকে হেলিয়াছিল বলিতে পারি না। "শাস্ত্র এখানে মূক, মনুষ্যের জ্ঞান এখানে অসমর্থ।" সতীত্বরক্ষার্থ প্রাণবিসর্জ্জন যত দুষ্কর, পতিপ্রাণ-রক্ষার্থ সতীত্ববিসর্জ্জন তদপেক্ষা সহস্র গুণে অধিক দুষ্কর। পরার্থে সাধ্বীনারীর আত্মত্যাগের ইহাই বোধ হয় শেষ সীমা। আর লোকহিতার্থ ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তির পক্ষে ক্ষণকালের জন্যও ধর্ম্ম-বিসর্জ্জন সাধ্বী রমণীর সতীত্ব-বিসর্জ্জনের ন্যায় সর্ব্বাপেক্ষা দুষ্কর, সর্ব্বাপেক্ষা কষ্টকর। Abraham ও Brutus-এর, ধাত্রী পান্না ও কর্ণের পুত্র-বলিদান অপেক্ষাও ইহা কঠোরতর কর্ত্তব্য। ধর্ম্মবিসর্জ্জনেই স্বর্গ-বর্জ্জন ও নিরয়-গমন; স্বর্গবিসর্জ্জনেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুখ-বিসর্জ্জন ও ক্লেশস্বীকারকরণ। সকাম ব্যক্তির পক্ষে ইহাই আত্মত্যাগের চরম সীমা।

নিরপেক্ষ-বিচারক্ষম পাঠক! যুধিষ্ঠিরের 'হত ইতি গজ' বিষয়ক আচরণ এখন একবার চিন্তা করুন। পূর্ব্বে সত্য প্রভাবে যুধিষ্ঠিরের রথ চতুরঙ্গুল পরিমাণে উচ্ছ্রিত ছিল; দ্রোণবধ কালে অসত্যাচরণবশতঃ তাঁহার রথ-চক্র ভূতল-স্পর্শ করিল। এই উক্তিটির মধ্যেই কৃষ্ণোক্ত জটিল ধর্ম্ম-তত্ত্ব প্রচ্ছন্ন ভাবে নিহিত রহিয়াছে। লোকরক্ষারূপ মহত্তর উদ্দেশ্য সাধনার্থ ব্যক্তিবিশেষকে যদি ধর্ম্ম-চ্যুত ও নিরয়গামী হইতে হয়, তবে ব্যক্তিগত ক্ষতি স্বীকার করিয়াও সেই

লোকরক্ষার সহায়তা করিতে হইবে। এই স্থলেই যথার্থ আত্মত্যাগের পরিচয়। সাধ্বী ভার্য্যাকে সভামধ্যে দুষ্ট কর্ত্তৃক নিগৃহীতা দেখিয়াও তিনি ধর্ম্মচ্যুত হয়েন নাই; আততায়ী কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ লাঞ্ছিত, হৃতসর্ব্বস্ব ও নির্ব্বাসিত হইয়াও যিনি প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর ধর্ম্মধনকে ত্যাগ করিতে পারেন নাই, অনৃতাচরণ দ্বারা গুরুহত্যা ও ব্রহ্মহত্যা রূপ অনার্য্যোচিত জঘন্য কার্য্যে তাঁহার প্রবৃত্তি কেন হইল? ইহার একমাত্র উত্তর—নিজে ডুবিয়া পৃথিবীকে উদ্ধার করিবার জন্য। ধর্ম্মসংস্থাপন দ্বারা লোক রক্ষার অভিপ্রায়েই তিনি আজন্মসঞ্চিত মহামূল্য তপঃপ্রভাব খর্ব্ব করিয়া তাঁহার সত্যোচ্ছ্রিত রথখানি পৃথিবীর ধুলিতে সংলগ্ন করিয়াছিলেন। যাঁহারা পরের জন্য ভাবেন, তাঁহাদিগকে সময়ে সময়ে এইরূপ একটু নীচে নামিতে হয়; পরের জন্য পৃথিবীর ধুলিতে দেহ মলিন করিতে হয়। পরহিতার্থ ধন-বিসর্জ্জনকে যদি মহত্ত্ব বল, আর্ত্তত্রাণার্থ নিয়ম ভঙ্গ করিয়া বনবাস স্বীকার করাকে যদি আত্মত্যাগ বল, পরার্থে পুত্র-বলিদান বা আত্ম-বলিদান দেখিয়া যদি বিস্ময়ে স্তম্ভিত হও, তবে ধন-প্রাণ-পুত্রাদি অপেক্ষাও সত্য যাঁহার নিকট প্রিয় ও মূল্যবান, লোকহিতার্থে তাঁহার সত্য-বিসর্জ্জন ও নরকালিঙ্গন দেখিয়া কেন যে অধোবদন হইবে তাহা ত আমি বুঝিতে পারি না

শ্রীকৃষ্ণের উপদিষ্ট এবং যুধিষ্ঠিরের অনুবর্ত্তিত এই নীতিকে Machiavellian policy বলিয়া ভ্রম হওয়া অন্যায় হইলেও, বিচিত্র নহে। এমন কি স্বয়ং অর্জ্জুনও যুধিষ্ঠিরের দ্রোণবধ-বিষয়ক আচরণকে রামচন্দ্রের বালিবধের ন্যায় চির-অকীর্ত্তিকর বলিয়াছিলেন। লৌকিক দৃষ্টিতে যে ইহা অকীর্ত্তিকর তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। কিন্তু তাঁহার এই অকীর্ত্তি-কালিমা জগতের হিতার্থ নীলকণ্ঠের বিষধারণের ন্যায় মহত্ত্বেরই পরিচায়ক। মহাপ্রাণ ব্যক্তি ব্যতীত আর কে লোকরক্ষার্থ নরক-যন্ত্রণারূপ তীব্র হলাহল পান ও কলঙ্ক কালিমা ধারণ করিতে পারেন? দ্রোণবধ না হইলে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের ফল পৃথিবীর পক্ষে কিরূপ অকল্যাণকর হইত, তাহা চিন্তা করিলে পাঠকবর্গ আমার মতাবলম্বী হইবেন আশা করা যায়। দ্রোণাচার্য্য অস্ত্রানভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের প্রতি ব্রহ্মাস্ত্র-প্রয়োগরূপ অধর্ম্ম যুদ্ধ করিতেছিলেন এবং তৎপূর্ব্বে অভিমন্যু-বধ কালেও তিনি সপ্তরথীর অন্যতম হইয়া অন্যায় যুদ্ধে যোগ দিয়াছিলেন। কিন্তু এইরূপ অন্যায় যুদ্ধ যদি তিনি নাও করিতেন তথাপি ধর্ম্ম সংস্থাপন পক্ষে তাঁহার বধ অপরিহার্য্য ছিল। এবং বৈধ উপায়ে তাহা করা অসম্ভব বলিয়াই অবৈধ উপায় অবলম্বিত হইয়াছিল।

দ্রোণবধের ন্যায় ভীষ্ম-কর্ণ-দুর্য্যোধনাদির বধ-কালেও অল্পাধিক পরিমাণে অবৈধ উপায় অবলম্বিত হইয়াছিল এবং কৃষ্ণের উপদেশ-ক্রমেই সেরূপ হইয়াছিল। কথা উঠিতে পারে,—কৃষ্ণ ইচ্ছা করিলে কোন ন্যায়-সঙ্গত উপায়ে কি ইহাদের বধ সাধন করিতে পারিতেন না? কোন প্রকৃষ্টতর উপায় কি ছিল না?—না, মনুষ্য-সাধ্য উপায়ান্তর ছিল না। তবে অতি-মানুষ উপায়ে কৃষ্ণ ইচ্ছামাত্র

দ্রোণাদিকে উড়াইয়া দিতে পারিতেন। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও উহা অবৈধ উপায়ই হইত। যে উপায় বিপক্ষের আয়ত্ত নহে, তদবলম্বনে বিপক্ষের পরাভব অবৈধ উপায় মধ্যেই গণ্য। গন্ধর্ব-অসুরাদির মায়াযুদ্ধ এইজন্য অধর্ম্ম যুদ্ধ। প্রাকৃতই হউক বা অতি প্রাকৃতই হউক অবৈধ উপায় প্রয়োগ ভিন্ন ভীষ্ম-দ্রোণাদির নিপাত অসম্ভব ছিল। যে অবৈধ উপায়াবলম্বন দেখিয়া আপনি আপত্তি ও অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছেন, তাহা অবলম্বিত না হইলে যুদ্ধের যে ফল হইত তাহাতে আপনি আরও অধিক অসন্তোষ প্রকাশ করিতেন। "কোন কার্য্যই সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ নহে।" পূর্ব্বে উদ্ধৃত মহাভারতের সেই উক্তিটি স্মরণ করুন। মন্দের ভাল লইয়াই মানুষকে তুষ্ট হইতে হয়। ষোল আনা শ্রেয়োলাভ তাহার ভাগ্যে প্রায়ই ঘটে না। দুষ্ট ব্যক্তির দোষে, বাধ্য হইয়া নির্লোভ ব্যক্তিকে সময়ে সময়ে অনিচ্ছাসত্ত্বে ধর্ম্মচ্যুত হইতে হয়। ইহাতে তাঁহার দোষ হয় না (অর্থাৎ পাপ অপেক্ষা পুণ্যই অধিক হয়)। যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তিতে ইহা পাওয়া যায়। কৌশল ও অধর্ম্ম ঐরূপ স্থলে পরপীড়নের অস্ত্র-স্বরূপ নহে, কিন্তু আত্মরক্ষার্থ ও লোকরক্ষার্থ অপরিহার্য্য বলিয়াই বাধ্য হইয়া একান্ত অপ্রীতিকর কর্ত্তব্যরূপে উহা স্বীকার করিতে হয়। জল দিয়া কাণের জল বাহির করার মত, বিষনাশের জন্য বিষান্তর প্রয়োগ করার মত, দেহরক্ষার্থ ব্রণ-দুষ্ট অঙ্গে অস্ত্রপ্রয়োগ করার মত, ঐরূপ ধর্ম্ম-সঙ্কট স্থলে ধর্ম্মকে বিধ্বংক্ষণের জন্য আঘাত করিয়াই তাহাকে রক্ষা করিতে হইবে। অধর্ম্মই সে স্থলে ধর্ম্ম, অকর্ম্মই সে স্থলে কর্ম্ম। অধর্ম্মই সেস্থলে ধর্ম্ম অর্থাৎ মোটের উপর ধর্ম্ম। ধর্ম্মার্থে আচরিত ঐ পাপ পাপই থাকিবে। এক নিষ্কাম কর্ম্ম ব্যতীত তাহা একেবারে উড়াইয়া দিবার উপায় নাই (বলা বাহুল্য যুধিষ্ঠির নিষ্কাম ছিলেন না)। সে পাপের ভোগ ভুগিতেই হইবে। একজনকে সেই বিষ পান করিতেই হইবে। তাই মহাদেবের প্রয়োজন। মহাপ্রাণ ব্যক্তি ঐ পাপের বোঝা মাথায় লইয়া জগতের উদ্ধার সাধন করুন, পরার্থে আত্ম-শ্রেয়োরূপ স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া নরক-যন্ত্রণা স্বীকার করুন, একা একা স্বর্গে না যাইয়া আর সকলকে সঙ্গে লইতে চেষ্টা করুন। ইহাই শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ, ইহাই কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের অন্যতম শিক্ষা। তপোবলে দুর্দ্ধর্ষ, বর-প্রভাবে অবধ্য বা অপরাজেয় আসুর শক্তি যখন বলদর্পান্ধ হইয়া স্বীয় ক্ষমতার অপব্যবহার দ্বারা ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের প্রবর্ত্তন করিয়া জগতের উন্নতি-স্রোত রুদ্ধ করিতে থাকে, তখন কৌশলাবলম্বন পূর্ব্বক উহার ধ্বংস-সাধন কর্ত্তব্য কি না এই জটিল ধর্ম্ম-সমস্যার সমাধান পুরাকালে দেবাসুর-সংগ্রামে একবার হইয়াছিল। কলির প্রারম্ভে লোকশিক্ষার্থ কুরুক্ষেত্র-প্রান্তরে পুনরায় সেই দুরূহ সমস্যারই সমাধান হইল। ধর্ম্মস্থাপন ও লোকরক্ষার্থ ক্ষণিক অধর্ম্মাশ্রয় নিতান্তই অপরিহার্য্য হইলে, তদবলম্বন পূর্ব্বক ধর্ম্মের উদ্ধার সাধন করিয়া তৎপর পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত কর। যুদ্ধান্তে নির্ব্বিণ্ণ-হৃদয় যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক ব্যাসদেবের উপদেশক্রমে অশ্বমেধ যজ্ঞ ও নানাবিধ দানের অনুষ্ঠান এবং

তৎপর প্রজারঞ্জন ও রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি-সাধনাদি সদনুষ্ঠান দ্বারাও তাঁহার পাপের খণ্ডন হয় নাই ; অবশেষে নরক-ভোগ দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত সম্পূর্ণ করিতে হইয়াছিল। অর্জ্জুনকে মণিপুরে স্বীয় পুত্র বভ্রুবাহন কর্ত্তৃক পরাজিত ও নিহত হইয়া শিখণ্ডী সাহায্যে ভীষ্মবধ জনিত মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইয়াছিল। আর স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও সতীর অভিসম্পাত-গ্রহণচ্ছলে ন্যায়ের মর্য্যাদাই রক্ষা করিয়াছিলেন।

যুধিষ্ঠির যে প্রধানতঃ পর-হিতৈষণা প্রেরিত হইয়াই যুদ্ধে প্রবৃত্ত এবং কৃষ্ণের ইঙ্গিত অনুসারে কাজ করিতে সম্মত হইয়াছিলেন, সে বিষয়ে বোধ হয় কাহারও সন্দেহ হইবে না। অধিকন্তু তাঁহার মত ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মাদিগের স্বার্থ ও পরার্থ পৃথক্ নহে। স্বার্থকে তাঁহারা পরার্থ-সাধনের উপায় মাত্র মনে করেন। তাঁহাদের অর্থ-সংগ্রহ মেঘের বারি-সংগ্রহের ন্যায় একমাত্র জগতের হিতার্থই হইয়া থাকে।

অতএব ভীষ্ম-দ্রোণাদির বধ-বিষয়ক প্রচলিত মতগুলি যদি ঐতিহাসিক সত্যও হয়, তথাপি উহারা বস্তুতঃ কৃষ্ণ-যুধিষ্ঠিরাদির চরিত্রে কলঙ্ক নহে, আমার এইরূপ ধারণা। আমি যেরূপ বুঝিয়াছি তাহা প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিলাম, ইহার বিচার-ভার এখন সহৃদয় বিদ্বন্মণ্ডলীর উপর। কৃষ্ণের ধর্ম্মমতকে ঠিক আধুনিক হিতবাদ বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহার ধর্ম্মতত্ত্বে আপাতবিরোধী হিতবাদ ও নিত্যত্ববাদের সামঞ্জস্য আছে বলিয়া বোধ হয়। প্রবন্ধান্তরে এ বিষয়ের আলোচনা করিবার ইচ্ছা থাকিল।

দুষ্কৃদ্‌গণের বিনাশ দ্বারা ধরার পাপভার হরণ এবং সাধু-পরিত্রাণ দ্বারা ধর্ম্ম-সংস্থাপনের জন্যই কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ ; আবার কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের ফলেই ন্যায়ের মর্য্যাদা-রক্ষার্থ প্রভাসের তীরে কৃষ্ণের আত্মবংশ-নাশ, ব্যাধ হস্তে আত্ম-জীবন-বিসর্জ্জন এবং যুধিষ্ঠিরাদি প্রিয়ভক্তের নিরয়-গমন। অতএব বলা যাইতে পারে যে, অসুর-গ্রাস হইতে পৃথিবীর উদ্ধারার্থ ধর্ম্ম-সংস্থাপন দ্বারা বিশ্বমানবের পরিত্রাণার্থ, শ্রীকৃষ্ণ আত্ম-বলিদান ও ভক্ত-বলিদান করিয়া ন্যায়ের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন।

পূজ্যপাদ বঙ্কিম বাবু কর্ত্তৃক আরব্ধ কার্য্যের অগ্রসর-সাধনই আমার অভিপ্রেত। "বঙ্গের নরকাঙ্কারে যিনি শাপভ্রষ্ট দেবতা" রূপে মহৎকার্য্য-সাধনার্থ আসিয়াছিলেন, বাল্যকালে আমোদের লোভে যাঁহার গ্রন্থমধ্যে প্রবেশ করিয়া পুণ্যচরিত্রের পাবনী শক্তি অনুভব করিতে করিতে ভক্তি-বিস্ময়-পূর্ণ হৃদয়ে গ্রন্থ শেষ করিয়া উঠিতাম, যে বিশাল-বুদ্ধি ব্রাহ্মণ স্বাধীন চিন্তাপ্রভাবে কুহকময়ী পাশ্চাত্যশিক্ষার মোহপাশ ছিন্ন করিয়া বিভ্রান্ত দেশবাসীর উদ্ধারার্থ তাহাদের সুপ্ত আত্মানুভূতিকে প্রবুদ্ধ করিয়াছিলেন ; ইয়ুরোপীয়েরা যাহা জানে না এমন সত্যও জগতে আছে,—ইয়ুরোপীয়েরা এ পর্য্যন্ত যাহা জানিতে পারে নাই এমন তত্ত্বও ঋষিদিগের জানা ছিল—এই মহতী শিক্ষা সর্ব্বপ্রথম যাঁহার নিকট প্রাপ্ত হইয়া নূতন জীবন লাভ করিয়াছিলাম ;—আজ আমি তাঁহারই অঙ্গে অস্ত্রনিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইয়াছি, কেহ যেন এরূপ মনে না করেন। কৃষ্ণ-চরিত্রের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তিবশতঃই মহাভারতের কতকগুলি

অংশকে প্রক্ষিপ্ত ও অমৌলিক বলিয়া আচার্য্যদেবের মনে সন্দেহ হয়। পরে তিনি চিন্তা ও আলোচনা দ্বারা তাঁহার সন্দেহের সমর্থন-কল্পে কতকগুলি যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছিলেন। যাহা বিশ্বাস করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হয় নাই, যাহা কৃষ্ণ-চরিত্রের কলঙ্ক বলিয়া তাঁহার ধারণা, তাহার প্রতিকূল যুক্তিও স্বভাবতঃ তাঁহার মনে উপস্থিত হইয়াছে। সেই যুক্তিগুলি পরীক্ষা ও বিচার করিয়া দেখা কর্ত্তব্য মনে করি। আমার অবলম্বিত প্রণালী কিঞ্চিৎ ভিন্ন হইলেও চরম লক্ষ্য সম্বন্ধে তাঁহার সহিত আমার বিভিন্নতা কিছুমাত্র নাই। তাঁহার ন্যায় এ ক্ষুদ্র লেখকেরও উদ্দেশ্য কৃষ্ণ চরিত্রের কলঙ্ক-মোচন ও মাহাত্ম্য-প্রচার। তবে একটু ভিন্ন পথে আমি সেই উদ্দেশ্যের অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছি মাত্র।

বঙ্কিম বাবু অতি প্রকৃতে অবিশ্বাসী ছিলেন না। তবে অন্য কারণে তিনি মহাভারতের অনৈসর্গিক ঘটনাপূর্ণ অংশগুলিকে প্রক্ষিপ্ত মনে করিয়াছিলেন। তাঁহার লোকান্তর প্রাপ্তির পর এবং কিয়ৎকাল পূর্ব্বে জ্ঞান-পিপাসু থিওসফিষ্ট সম্প্রদায়ের অজস্র অনুসন্ধান এবং লণ্ডনের "Society For Psycical Researches" প্রভৃতি সমিতি ও অন্যান্য বিদ্বন্মণ্ডলীর দীর্ঘকালব্যাপী চেষ্টার ফলে বিজ্ঞান ও অধ্যাত্ম-জগতের অনেক অজ্ঞাত ও লুপ্তপ্রায় তত্ত্ব মনুষ্যের জ্ঞান-গোচর হইয়াছে। আচার্য্যদেব তৎ সমুদয়ের সাহায্য পান নাই, বিশেষতঃ তত্ত্ববিদ্যার প্রতি তিনি কিছু বীতশ্রদ্ধও ছিলেন। নচেৎ তাঁহার সিদ্ধান্তগুলি সম্ভবতঃ আরও পরিবর্ত্তিত আকার ধারণ করিত। এখন তাঁহার আত্মা পূর্ণজ্ঞানের পরিপন্থী দেহ মনের নিগড় হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছে। পূর্ব্বে তাঁহার নিকট যাহা জটিল, অসম্পূর্ণ ও অবোধ-গম্য ছিল, তৎসম্বন্ধে সম্প্রতি—

"জন্মান্তের নব প্রাতে, সে হয় ত আপনাতে
পেয়েছে উত্তর।"

শ্রীপ্রাণনাথ সরকার।

বেদান্ত।

পূর্ব্বপ্রবন্ধে বলা হইয়াছে যে, বেদান্ত-বাক্য দ্বারা যথার্থ প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়, সুতরাং বেদান্তবাক্য প্রমাণ, এবং তজ্জনিত জ্ঞানের ফল মুক্তি। এই দুইটি বিষয়ে একটু বলা কর্ত্তব্য। পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলা হইয়াছে যে, যদ্বারা প্রমা অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহার নাম প্রমাণ। যদি বেদান্তবাক্য দ্বারা যথার্থ জ্ঞান উৎপন্ন হয় এবং জ্ঞানের সেই যথার্থতা আমরা অনুভব করিতে পারি, তবেই বেদান্তবাক্যকে প্রমাণ বলা যাইতে পারে। এই অবস্থায় প্রথমতঃ বেদান্তবাক্য প্রমাণ কি না? এই বিষয়ের মীমাংসার পূর্ব্বে প্রামাণ্য অর্থাৎ জ্ঞানের প্রমত্বাবধারণ সম্বন্ধে আমাদের

দার্শনিক মতভেদ প্রদর্শন করা যাইতেছে—
প্রমাণত্বাপ্রমাণত্বে স্বতঃ সাংখ্যাঃ সমাশ্রিতাঃ
নৈয়ায়িকাস্তে পরতঃ সৌগতাশ্চরমং স্বতঃ।
প্রথমং পরতঃ প্রাহুঃ প্রামাণ্যং, বেদবাদিনঃ
প্রমাণত্ব স্বতঃ প্রাহুঃ পরতশ্চাপ্রমাণতাং॥
(সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ)

সাংখ্যমতাবলম্বিগণের মতে প্রামাণ্য ও অপ্রামাণ্য অর্থাৎ জ্ঞানের প্রমাত্ব ও অপ্রমাত্ব উভয়ই স্বতঃসিদ্ধ, নৈয়ায়িকগণের মতে উভয়ই প্রমাণান্তরসিদ্ধ। বৌদ্ধ প্রভৃতির মতে অপ্রামাণ্য (অযথার্থত্ব) স্বতঃসিদ্ধ এবং প্রামাণ্য (যথার্থত্ব) প্রমাণান্তরসিদ্ধ, বেদবাদিগণের (বৈদান্তিক ও মীমাংসকের) মতে প্রামাণ্য স্বতঃসিদ্ধ এবং অপ্রামাণ্য প্রমাণান্তরসিদ্ধ। যাঁহারা জ্ঞানের যথার্থতা অর্থাৎ প্রমাত্ব স্বতঃসিদ্ধ বলেন, তাঁহারা প্রমাণ অর্থাৎ জ্ঞান-কারণের স্বতঃসিদ্ধতাবাদী এবং যাঁহারা তাহা স্বীকার করেন না, তাঁহারা প্রামাণ্যের প্রমাণান্তরগ্রাহ্যতা-বাদী।

সাংখ্যমতে, প্রামাণ্য ও অপ্রামাণ্যের স্বতঃসিদ্ধতা স্বীকৃত হইয়াছে, সুতরাং তাহাদের মতে, সকল জ্ঞানেই, এক সময়ে প্রামাণ্য ও অপ্রামাণ্য উভয় গৃহীত হইতে পারে, এবং তাহা হইলে কোন জ্ঞানই প্রমাণ বলিয়া বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না।

প্রামাণ্য ও অপ্রামাণ্যের প্রমাণান্তরসিদ্ধতাবাদী নৈয়ায়িক। তাঁহাদের মতে প্রমাণ্য বা অপ্রামাণ্যের জ্ঞান হওয়া এক প্রকার অসম্ভাব্য বলিয়াই মনে হয়। কারণ যে প্রমাণ দ্বারা প্রামাণ্য সিদ্ধ করিতে হইবে, সে প্রমাণের প্রামাণ্য অন্য প্রমাণসিদ্ধ, আবার তাহার প্রামাণ্যও অন্য প্রমাণসিদ্ধ, সুতরাং অনবস্থা-দোষ-প্রযুক্ত কোন জ্ঞানেই প্রামাণ্য অবধারিত হইতে পারে না।

বৌদ্ধমতে অপ্রামাণ্য স্বতঃসিদ্ধ, প্রামাণ্য প্রমাণান্তরসিদ্ধ। তাঁহাদের মতেও প্রামাণ্য অজ্ঞেয় বলিয়াই বিবেচিত হয়। যে প্রমাণ দ্বারা প্রামাণ্য জানিতে হইবে, সেই প্রমাণের স্বতঃসিদ্ধ অপ্রামাণ্য নিরাস করিবার জন্য প্রমাণান্তরের অন্বেষণ করা আবশ্যক এবং সেই প্রমাণান্তরের স্বাভাবিক অপ্রামাণ্য নিরসনার্থও প্রমাণান্তর ইত্যাদি রূপে ন্যায়মতোক্ত অনবস্থা-দোষ হইয়া পড়ে। সেই দোষ হইতে অব্যাহতি পাওয়ার কোন রূপ সম্ভাবনা নাই।

বৈদান্তিক ও মীমাংসক উভয়েই স্বতঃ-প্রামাণ্যবাদী। তাঁহাদের অভিপ্রায় এই যে, যখনই কোন বিষয়ে আমাদের জ্ঞান হয়, তখনই সেই জ্ঞানকে আমরা যথার্থ বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকি। জ্ঞান হওয়া মাত্রই, তাহাকে অপ্রমাণ মনে হয় না। জ্ঞানের কারণে কোনরূপ দোষ-সংসর্গ আছে, এইরূপ জানিতে পারিলেই, সেই জ্ঞানের অপ্রামাণ্য অনুমীত হইয়া থাকে।

এই অবস্থায় উক্ত সিদ্ধান্ত অনুসারে বেদান্তবাক্য জন্য জ্ঞানের যথার্থত্ব স্বতঃসিদ্ধ, সুতরাং বেদান্তবাক্যের প্রামাণ্যও স্বতঃসিদ্ধ। কারণ, বেদান্তবাক্য দ্বারা অদ্বিতীয় ব্রহ্মজ্ঞান উৎপন্ন হওয়া মাত্রই, সেই জ্ঞানের যথার্থতা নিশ্চয় হইয়া যাইবে। যদি বেদান্তবাক্য জন্য জ্ঞানের যথার্থতা প্রথমেই অবধারিত হয়, তবে তৎসম্বন্ধে অযথার্থতা-জ্ঞানের সম্ভাবনা থাকে না। অদ্বিতীয় ব্রহ্মজ্ঞানের কারণ বেদান্তবাক্য, তাহাতে কোন রূপ

দোষ-সংসর্গ প্রমাণিত হইলে, তজ্জন্য জ্ঞানে অপ্রামাণ্য বোধের সম্ভাবনা করা যায় কিন্তু তাহাতে কোন রূপ দোষ-সংসর্গ প্রামাণসিদ্ধ নহে। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, বেদ সকল প্রতারক বাক্য, তদ্বারা কোন রূপ যথার্থ জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। কিন্তু এই কথার অনুকূলে, তাঁহারা কোন প্রমাণ দিতে পারেন না। বৈদান্তিক-গণ বলিয়াছেন যে, জ্ঞানের যথার্থতা স্বতঃসিদ্ধ, জ্ঞান হওয়া মাত্রই তাহাকে আমরা যথার্থ বলিয়া বুঝিয়া থাকি। এমন কি, ভ্রম-জ্ঞানকেও প্রথমে আমরা যথার্থ বলিয়াই মনে করিয়া থাকি। যদি কোন ব্যক্তির দিক্‌ভ্রম হয়, তবে সে ব্যক্তি ভ্রম হওয়া মাত্র সেই জ্ঞানকে যথার্থ বলিয়াই মনে করেন। অনন্তর যুক্তি প্রভৃতি দ্বারা উক্ত জ্ঞানের অযথার্থতা সাধিত হইয়া থাকে। সেই রূপ, যিনি বৈদিক জ্ঞানের অযথার্থতা সিদ্ধ করিতে ইচ্ছুক, তিনিই তাহার অনুকূল প্রমাণ প্রদর্শন করিতে বাধ্য। অযথার্থতা সম্বন্ধে প্রমাণ প্রদর্শিত না হওয়া পর্য্যন্ত কোনও রূপে তাহাকে মিথ্যা বলা যাইতে পারে না। বেদাপ্রামাণ্যবাদিগণ বলিতে পারেন যে, যদি বেদপ্রতিপাদ্য অদ্বিতীয় ব্রহ্মজ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ যথার্থ হয়, তাহা হইলে তৎসম্বন্ধে সকলের বিশ্বাস না হওয়ার কারণ কি? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, স্বতঃ-সিদ্ধ যথার্থ জ্ঞানের প্রতি বিশ্বাস না হওয়ার কারণ,—অতি প্রাচীন অজ্ঞানজ সংস্কার। যেমন চন্দ্রের স্বাভাবিক আলোক নাই, সৌরালোকেই ইহা আলোকিত হইতেছে, ইহা জ্যোতিঃশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের সিদ্ধান্ত, কিন্তু এই কথা কোন শাস্ত্রানভিজ্ঞ ব্যক্তিই, বোধ হয়, স্বীকার করেন না। সেই রূপ যাঁহারা জড় জগৎ সত্য, এইরূপ মনে করেন, তাঁহারা জড়জগৎ সম্বন্ধে সত্যতা-সংস্কারের অসারতা প্রতিপাদন না হওয়া পর্য্যন্ত, কোন ক্রমেই অদ্বিতীয় ব্রহ্মজ্ঞানের স্বাভাবিক সত্যতা, স্বীকার বা বিশ্বাস করিতে পারেন না। ভাষ্য-কার শঙ্কর জড়জগতের মিথ্যাত্ব সংস্থাপনের জন্য নানাবিধ যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। তৎপ্রদর্শিত যুক্তি দ্বারা জড়জগতের মিথ্যাত্ব স্থাপিত হইলে, অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞানের সত্যতার প্রতি অসন্দিগ্ধ বিশ্বাস অবশ্যই উৎপন্ন হইবে। যাহার রজ্জুতে চাক্ষুষ সর্পভ্রম হইয়াছে, সে ব্যক্তি "ইহা রজ্জু, সর্প নহে" এই বাক্যের উপর কখনও যুক্তি ব্যতীত বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে না। সেই রূপ আমাদের জড়জগৎ সম্বন্ধে চাক্ষুষ দ্বৈতভ্রম থাকায়, অদ্বৈত বোধে বিশ্বাস স্থাপিত হয় না। জড়জগতের মিথ্যাত্ব সম্বন্ধে যুক্তি জানিতে পারিলেই, তৎসম্বন্ধে বিশ্বাসের সম্ভাবনা করা যায়। এই বিষয়ে মধুসূদন সরস্বতী অদ্বৈতসিদ্ধির প্রারম্ভেই লিখিয়াছেন যে "অদ্বৈতসিদ্ধের্দ্বৈতমিথ্যাত্ব সিদ্ধিপূর্ব্বকত্বাৎ প্রথমতোঽদ্বৈতমিথ্যাত্বং নিরূপ্যতে", দ্বৈত (জড়জগৎ)-এর মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হইলেই অদ্বৈত (ব্রহ্ম)এর সিদ্ধি হইয়া থাকে, অতএব প্রথমে দ্বৈতবর্গের (জড়-জগতের) মিথ্যাত্ব নিরূপণ করা যাইতেছে। জড়জগতের মিথ্যাত্ব সম্বন্ধে গৌড়পাদাচার্য্য বলিয়াছেন যে "আদাবন্তে চ যন্নাস্তি বর্ত্তমানে-ঽপি তত্তথা। বিতথৈঃ সদৃশাঃ সন্তোঽবিতথা ইব লক্ষিতাঃ।" যাহা অতীত ও ভবিষ্যৎ

কালে থাকে না, তাহা বর্ত্তমান কালেও অসৎ, মিথ্যা। কিন্তু তাহা মৃগতৃষ্ণিকা প্রভৃতির মত মিথ্যা হইলেও মূঢ় ব্যক্তিগণের নিকট অজ্ঞানবশতঃ সত্যস্বরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে। উক্ত যুক্তি প্রভৃতি দ্বারা জড়জগতের মিথ্যাত্ব সাধিত হইলে, বেদান্তবাক্য জন্য জ্ঞানের স্বতঃসিদ্ধ যথার্থতার প্রতি বিশ্বাস জন্মিয়া থাকে, এইরূপে উক্ত বিশ্বাস ও একাগ্রতা প্রভাবে অদ্বৈত ব্রহ্মাত্মভাবের প্রত্যক্ষ হয়. এই প্রত্যক্ষই মুক্তির কারণ। এই সকল বিচার দ্বারা অদ্বৈতবাদ-সম্মত এই সিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত হইতেছে যে, জ্ঞানের প্রমাত্ব এবং জ্ঞানকারণের প্রমাণত্ব অবধারণের জন্য, প্রমাণান্তর প্রদর্শনের আবশ্যকতা নাই; কারণ, প্রমাত্ব এবং প্রমাণত্ব স্বতঃসিদ্ধ, যেমন জ্ঞান স্বপ্রকাশ, সে জন্য তাহার অস্তিত্ব-সাধনের জন্য জ্ঞানান্তরের অপেক্ষা করে না. সেইরূপ জ্ঞানের স্বীয় প্রমাত্ব অবধারণের জন্যও অন্য জ্ঞানের সাহায্য অপেক্ষা করে না। জ্ঞান স্বয়ংই নিজকে এবং নিজের প্রমাত্বকে অবধারণ করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। এবং জ্ঞান-কারণের অস্তিত্ব যে প্রমাণ দ্বারা অবগত হওয়া যায়, সেই প্রমাণই সেই জ্ঞান-কারণের প্রমাণত্ব অবধারণ করিয়া থাকে। যদি জ্ঞানের প্রমাত্ব স্বতঃসিদ্ধ হয়, তবে তাহার কারণের প্রমাণত্ব অবশ্যই স্বতঃসিদ্ধ হইবে। কারণ, যে জ্ঞান দ্বারা তাহার কারণ অনুমিত হয়, সেই জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ প্রমা, সুতরাং তাহার কারণও স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ, এইরূপ সিদ্ধান্ত যুক্তিসঙ্গত বলিয়াই গৃহীত হওয়ার উপযুক্ত। বেদের প্রামাণ্য সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার থাকিলেও এস্থলে প্রকৃত বিষয়ের অনুরোধে তাহা পরিত্যাগ করিলাম। এইক্ষণ বেদান্ত-বাক্য জন্য জ্ঞানের ফল মুক্তি, এই বিষয়ে কয়েকটি কথা বলিতেছি।

মুক্তি শব্দের অর্থ, বন্ধন-নিবৃত্তি। বন্ধন দুঃখের কারণ, ইহা সর্ব্ববাদি-সিদ্ধ। এই অবস্থায় বন্ধনের কারণ কি? তাহা জানিতে পারিলে, তাহার নিবৃত্তির কারণ বুঝা সহজ হইবে বলিয়া মনে হয়। অতএব অগ্রে বন্ধনের কারণ সম্বন্ধে একটু বিশদভাবে বলা কর্ত্তব্য। আমরা সংসারে দ্বিবিধ বন্ধন অনুভব করিয়া থাকি। শারীরিক ও মানসিক। শারীরিক বন্ধনের কারণ শৃঙ্খল প্রভৃতি। তাহা আমরা সহজেই বুঝিতে পারি। মানসিক বন্ধনের কারণ অজ্ঞান। তাহা আমরা সাধারণ জ্ঞানে বুঝিতে পারি না, এবং তাহাকে বন্ধন বলিয়াই মনে করি না, বরং বিশেষ প্রীতির চক্ষেই দেখিয়া থাকি। অজ্ঞান প্রযুক্ত আমরা সাংসারিক বিষয়ে আসক্ত হইতেছি। এবং ঐ সকল বিষয়কে আমাদের সুখের উপকরণ মনে করিতেছি, কিন্তু তাহা প্রকৃতপক্ষে আমাদের সুখের কারণ নহে, বরং দুঃখেরই কারণ, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ঐ সকল বিষয়ের সংসর্গে আমরা তাহাদের অধীন হইয়া পড়িতেছি। যেমন রজ্জু দ্বারা বদ্ধ পশু প্রভৃতি প্রাণিগণ স্বাধীন ভাবে বিচরণ করিতে পারে না, সেরূপ আমরাও অজ্ঞানরূপ রজ্জু দ্বারা সংসার-বৃক্ষে আবদ্ধ হইয়া স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে

পারিতেছি না। যেরূপ রজ্জুবদ্ধ প্রাণিগণ বন্ধন কর্ত্তার অধীন, সেরূপ অজ্ঞানবদ্ধ মনুষ্যগণ স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে বেদ, স্মৃতি, সদাচার বা যথেচ্ছাচারের অধীন। অজ্ঞান অন্ধকারের মত তাহা বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ আচ্ছাদিত করিয়া কল্পিত মিথ্যা ভাবের উৎপাদন করিয়া থাকে। এই পরিদৃশ্যমান সংসারে আমাদের অতিশয় আসক্তি আছে। ইহা পরিত্যাগ করিতে আমাদের কথনও প্রবৃত্তি হয় না। ইহার মূল অজ্ঞান। অজ্ঞান আমাদের নিকট সংসারের প্রকৃত দোষ আচ্ছাদিত করিয়া মিথ্যা ভাবের উদ্ভাবন করিয়া দেয়। আমরা যে সকল বস্তু অত্যন্ত প্রীতিপূর্ণ নয়নে নিরীক্ষণ করিয়া থাকি, সে সমস্ত প্রকৃত পক্ষে আমাদের প্রিয় হইতে পারে না। বিষ্ণুপুরাণে কথিত আছে—

"কলত্র মিত্র পুত্রার্থ গৃহক্ষেত্র ধনাদিকৈঃ।
ক্রিয়তে ন তথা ভুরি সুখং পুংসাং যথাঽসুখং"॥

স্ত্রী, মিত্র, পুত্র, ধন, গৃহ, ক্ষেত্র প্রভৃতি যে পরিমাণ অসুখ সম্পাদন করে, সেই পরিমাণ সুখ উৎপাদন করে না। ইহার অভিপ্রায় এই যে পূর্ব্বোক্ত সুখোপকরণ দ্বারা যখন আমরা সুখ উপভোগ করি, তখনও তাহাদের ভাবী অনিষ্ট-চিন্তা আমাদিগকে দুঃখ প্রদান করিতে থাকে। কিন্তু আমরা অজ্ঞানের মোহিনী শক্তির বশবর্ত্তী হইয়া, একবারও এই সকল বিষয় চিন্তা করিতে বা আপাত-মনোহর এই সকল সুখোপকরণ পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করি না। বরং ঐ সকল বিষয়ের নিকটে থাকিতে বা তাহাদিগকে নিকটে রাখিতে ইচ্ছা করিয়া থাকি, এবং যাহাতে তাহাদের পুষ্টি হয়, তজ্জন্য যত্ন করিয়া থাকি; উক্ত বিষয়-সমূহ দুঃখপ্রদ, কিন্তু আমরা তাহাদের আসক্তি ছাড়িতে পারি না, সুতরাং আমরা তাহাদের অধীন। এবং সে অধীনতা প্রযুক্তই আমরা দুঃখ অনুভব করি। এই অধীনতা দৃঢ়তর বন্ধন, ইহার হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভই মুক্তি বা মোক্ষ। মুক্তি-লাভের জন্য বৈদান্তিকের উপদেশ অতিশয় সমীচিন বলিয়াই মনে হয়। তাহাদের প্রথম উপদেশ আত্মা নিত্য, নির্ব্বিকার, জ্ঞান ও সুখ-স্বরূপ; দ্বিতীয় উপদেশ জগৎ মিথ্যা এবং সেই আত্মা অদ্বিতীয়। যদি আমরা প্রথম উপদেশ অনুসারে, আত্মা নিত্য, নির্ব্বিকার জ্ঞান ও সুখস্বরূপ এইরূপ ধারণা পুনঃপুনঃ আলোচনা ও যুক্তিপ্রভাবে দৃঢ়ভাবে আয়ত্ত করিতে পারি, তাহা হইলে জন্ম ও মৃত্যুভয়-জনিত কষ্ট আমাদিগকে আক্রমণ করিতে পারিবে না। দ্বিতীয় উপদেশানুসারে, জগতের মিথ্যাত্ব ও আত্মার অদ্বিতীয়ত্ব অসন্দিগ্ধভাবে অবধারিত হইলে, "দুঃখের কোনরূপ কারণ নাই"—এই ধারণাই হইবে। যদি আমরা এই ধারণা সাধন করিতে পারি, তাহা হইলে এ জগতের কোন বস্তুই, আমাদের দুঃখদায়ক হইতে পারিবে না। কারণ, যে সকল বস্তু আপাততঃ দুঃখের নিদান, সে সমস্তই মিথ্যা, সুতরাং মিথ্যা পদার্থ দ্বারা কোনরূপ দুঃখ হওয়া সম্ভাবিত নহে। এই বিষয়ে শ্রুতি বলিয়াছেন,

"কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ।
যত্রত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ॥"

যিনি সকল বস্তুকে এক বলিয়া দেখিতে

পান, তাহার শোকই বা কি মোহই বা কি ? অর্থাৎ এইরূপ ব্যক্তির কোনরূপ শোক বা মোহ হয় না। যখন তত্ত্বজ্ঞানপ্রভাবে জ্ঞানী ব্যক্তি সমুদয়ই আত্মস্বরূপে অনুভব করিতে থাকেন, তখন তিনি কাহা দ্বারা কাহাকে দেখিবেন। অর্থাৎ তখন তিনি কাহাকেও নিজ হইতে ভিন্ন বলিয়া দেখিতে পান না। তাঁহার নিকট সেই অবস্থায় সকলই আত্মস্বরূপ, সুতরাং আত্মা স্বয়ং নিজ দুঃখের কারণ হইতে পারে না। আত্মার সহিত অন্য পদার্থের সম্বন্ধজ্ঞানই দুঃখের কারণ, সে সময়ে সর্ব্বত্র আত্মদর্শনপ্রভাবে অন্য সকলই বিলুপ্ত হইয়া পড়ে, সুতরাং ঐ সময়ে কোনরূপ দুঃখকারণের অস্তিত্বের সম্ভাবনা থাকে না। যতক্ষণ রজ্জুতে সর্পভ্রম বর্ত্তমান থাকে, ততক্ষণই ভয়প্রযুক্ত তাহার নিকটে যাইতে সাহস হয় না, কিন্তু সেই ভ্রম বিদূরিত হইলে আর ভয় থাকে না। সেই রূপ বেদান্তবিচার-প্রভাবে অদ্বিতীয় ব্রহ্মভাব জানিতে পারিলে, যখন সংসার-রূপ সর্পভ্রম বিলুপ্ত হইয়া যায়, তখন আর কোনরূপ ভয় বা দুঃখ থাকে না এবং থাকিতেও পারে না।

মুক্তি সম্বন্ধে দর্শনশাস্ত্রে বহুবিধ মতভেদ দৃষ্ট হয়।

(১) নাস্তিক মত—এই মতে অপরাধীনতা বা স্বাধীনতাই মুক্তি। কোন কোন নাস্তিক মৃত্যুকেই মুক্তি বলিয়া থাকেন। এই তাহাদের উক্তি "অপরাধীনতা মুক্তিঃ" "মরণমেবাপবর্গঃ—বার্হস্পত্য সূত্র অপরাধীনতা বা মরণই মুক্তি।

(২) বৌদ্ধমত—তাঁহাদের মধ্যে মাধ্যমক মতে, আত্মনাশ মুক্তি এবং বিজ্ঞানবাদী যোগাচার বৌদ্ধমতে,বিষয়-সংস্কার-শূন্য জ্ঞানই মুক্তি নামে অভিহিত।

"মহোদয়ো নাম সবাসনাসমুচ্ছেদো জ্ঞানো পরম ইত্যেকে"। "নিখিল বাসনোচ্ছেদে বিগতবিষয়াকারোপপ্লব-বিশুদ্ধ-জ্ঞানোদয়ো মহোদয় ইত্যপরে" প্রশস্ত পাদভাষ্য। "রাগাদি-জ্ঞান সন্তান বাসনাচ্ছেদ সম্ভবা-চতুর্ণামপি বৌদ্ধানাং মুক্তিরেষা প্রকীর্ত্তিতা (বিবেকবিলাস)

সংস্কার বিনাশ হইলে জ্ঞানের নিবৃত্তি হইয়া থাকে, এই নিবৃত্তিই কোন কোন বৌদ্ধমতে মুক্তি। কাহারও মতে সংস্কার বিনষ্ট হইলে বিষয়-সংস্কার বা বিষয়াকার-রহিত বিমল জ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে, তাঁহাদের মতে সেই বিমল জ্ঞানই মুক্তি। বৌদ্ধমতে মুক্তির অপর নাম মহোদয়।

(৩) জৈন মত—তাহার মতে জ্ঞানজ সংস্কার ও কর্ম্মের নিবৃত্তি হইলে আত্মার ঊর্দ্ধদেশে অবস্থিতির নাম মুক্তি। কোন কোন জৈন মোক্ষাবস্থায় আত্মার সুখ স্বীকার করেন।

(৪) রামানুজ ও পূর্ণপ্রজ্ঞ মত—ইহারা উভয়ই বৈষ্ণব. ইহাদের মতে বিষ্ণুর সহিত এক লোকে অবস্থানই মুক্তি, মুক্ত ব্যক্তি তৎসময়ে জগৎ সৃষ্টি ব্যতীত সকল বিষয়েই বিষ্ণুর মত ক্ষমতা লাভ করিয়া থাকেন।

আবির্ভবন্তি কল্যাণাঃ সর্ব্বজ্ঞত্বাদয়ো গুণাঃ এবং গুণাঃ সমানাঃ স্যুর্মুক্তানামীশ্বরস্য চ। সর্ব্ব-কর্ত্তৃত্বমেবৈকং তেভ্যো দেবে বিশিষ্যতে॥ (পাঞ্চরাত্র রহস্য) মুক্ত পুরুষের সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি কল্যাণময় গুণ

সকল আবির্ভূত হইয়া থাকে। ঈশ্বর ও মুক্ত পুরুষের সর্ব্বজ্ঞত্বাদি গুণ সমান হইলেও একমাত্র সর্ব্ব কর্তৃত্ব ঈশ্বরেই থাকে। মুক্ত পুরুষে তাহা থাকে না। ঐ সময়ে মুক্ত ব্যক্তির অবিনাশী সুখ হয় এবং মুক্ত ব্যক্তি সে সময়েও বিষ্ণুর সেবা করিতে থাকেন।

(৫) মাহেশ্বর মত—ইঁহাদের মতে মহেশ্বরের নিকটে অবস্থিতিই মুক্তি। এই মতে মুক্তাবস্থায় কোনরূপ দুঃখ থাকে না। এবং মুক্তাত্মা ঈশ্বরের কোনরূপ সেবা করেন না।

"মুক্তাত্মনোঽপি হি শিবাঃ কিন্তৈতে তৎপ্রসাদতো মুক্তাঃ। সোঽনাদি মুক্ত একো বিজ্ঞেয়ঃ পঞ্চমন্ত্রতনুঃ"। (তত্ত্বপ্রকাশ)

সকল মুক্তাত্মাই শিব, কিন্তু তাহারা সেই শিবের (ঈশ্বরের) অনুগ্রহে মুক্ত হইয়াছেন। তিনি (শিব) অনাদি মুক্ত এবং পঞ্চমন্ত্রময় শরীরধারী, অর্থাৎ তাহার প্রাকৃতিক শরীর নাই।

মাহেশ্বরদিগের মধ্যে চারি মত প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে (১) নকুলীশ পাশুপত, (২) শৈব, (৩) প্রত্যভিজ্ঞা এবং (৪) রসেশ্বর মত। ১ম ও ২য় মাহেশ্বর মতে মুক্তাত্মা ঈশ্বর হইতে ভিন্ন, এবং মুক্ত পুরুষ প্রাকৃত শরীরধারী নহেন। তৃতীয় মাহেশ্বর—ঈশ্বর প্রত্যভিজ্ঞাবাদী—তাঁহার মতে মুক্ত পুরুষ ও ঈশ্বরের তাদাত্ম্য স্বীকৃত হইয়াছে। অর্থাৎ মুক্ত পুরুষের "সোঽহং" আমিই সেই ঈশ্বর, এইরূপ জ্ঞান হইয়া থাকে। জীব ও ঈশ্বরের তাদাত্ম্য সম্বন্ধে আগমাধিকারে উক্ত হইয়াছে—

"তদৈক্যেন বিনা নাস্তি সংবিদাং লোক পদ্ধতিঃ প্রকাশৈক্যাত্তদেকত্বং মাতৈকঃ স ইতি স্থিতঃ।"

ঈশ্বর এক এবং স্বপ্রকাশ জ্ঞানস্বরূপ, আমরা যে সকল লৌকিক জ্ঞান অনুভব করিয়া থাকি, সে সকল ঈশ্বররূপ জ্ঞান হইতে ভিন্ন নহে। বিষয়াংশ পরিত্যাগ করিলে সকল জ্ঞানই স্বপ্রকাশ রূপে পরিস্ফুট হয়, অতএব সর্ব্বজীব সাধারণ, সেই প্রমাতা এক; ইহাই স্থিরীকৃত শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত। প্রত্যভিজ্ঞ-দর্শনের মতে মুক্তাত্মাসকল ঈশ্বর-ভাবাপন্ন হন এবং তাঁহারা জাগতিক সকল পদার্থকে নিজ হইতে অভিন্ন বলিয়া মনে করেন। তত্ত্বার্থসংগ্রহে কথিত আছে যে—

"মেয়ং সাধারণং মুক্তঃ স্বাত্মাভেদেন মন্যতে মহেশ্বরো যথা বদ্ধঃ পুনরত্যন্তভেদবৎ।"

যেরূপ মহেশ্বর জগতের সমুদয় প্রমেয়কে নিজ হইতে অভিন্ন মনে করিয়া থাকেন, সেইরূপ মুক্তাত্মাও জগতের সকল প্রমেয়কে নিজ হইতে অভিন্ন মনে করেন। কিন্তু বদ্ধ পুরুষগণ সেরূপ মনে করেন না, তাহারা সকলকে ভিন্ন বলিয়াই মনে করিয়া থাকেন। এই প্রত্যভিজ্ঞাবাদিগণ বিদেহ (দেহরহিত) মুক্তি স্বীকার করেন।

চতুর্থ মাহেশ্বর মত, তাহা রসেশ্বরদর্শন নামে প্রসিদ্ধ। ইঁহারা মুক্তি সময়ে আত্মার শরীর স্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন যে, মুক্তি সময়ে জীবের ঈশ্বর-ভাব হয়, কিন্তু শরীর না থাকিলে সে ভাব অনুভব করা যাইতে পারে না। সে জন্য মুক্তিসময়েও শরীর স্বীকার করা কর্তব্য। ইঁহারা বিদেহ (দেহশূন্য) মুক্তি স্বীকার করেন না। মাত্র জীবন্মুক্তি স্বীকার করিয়া থাকেন। জীবন্মুক্তি সময়ে জীবের ঈশ্বর-ভাব অনুভবের জন্য, যে

শরীর থাকে, তাহা অবিনশ্বর 'আয়ুর্ব্বেদোক্ত সংশোধিত পারদাদি দ্বারা শরীরের অক্ষয়ত্ব সম্পাদিত হইয়া থাকে। মুক্ত পুরুষের শরীর থাকা সম্বন্ধে রসার্ণবে উক্ত হইয়াছে যে—

"ষড়দর্শনেঽপি মুক্তিস্তু দর্শিতা পিণ্ডপাতনে
করামলকবৎ সাপি প্রত্যক্ষেনোপলভ্যতে।
তস্মাৎতং রক্ষয়েৎ পিণ্ডং রসৈশ্চৈব রসায়নৈঃ।"

বৈশেষিকাদি ষড়দর্শনে শরীরপাতের পরে মুক্তি হয়, এইরূপ কথিত হইয়াছে। কিন্তু এইরূপ মুক্তি, হস্তস্থিত আমলক ফলের মত প্রত্যক্ষভাবে অনুভূত হইতে পারে না। অতএব প্রত্যক্ষভাবে সেই মুক্তির অনুভব করার জন্য, পারদরূপ রসায়ন দ্বারা শরীরের রক্ষা করা কর্ত্তব্য।

(৬) বৈশেষিক ও নৈয়ায়িক মত—ইঁহাদের মতে দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তির নাম নাম মুক্তি। দুঃখের যেরূপ নিবৃত্তি হইলে আর কখনও কোনরূপ দুঃখ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না, সেইরূপ দুঃখ নিবৃত্তিকে আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি বলা যায়। এই উভয় মতেই বিদেহ মুক্তি সময়ে আত্মার জড়তা স্বীকৃত হইয়া থাকে। ইঁহারা জীবন্মুক্তি ও বিদেহমুক্তি উভয়ই স্বীকার করেন। কিন্তু জীবন্মুক্তি অবস্থায় যে শরীর থাকে, তাহার বিনাশ স্বীকার করিয়া থাকেন।

(৭) সাংখ্য মত—ইঁহাদের মতে দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিই মুক্তি। ইঁহারা জীবন্মুক্তি ও বিদেহ-মুক্তি স্বীকার করেন। বিদেহ-মুক্তি সময়ে আত্মার জড়তা স্বীকার করেন না। তখনও আত্মার জ্ঞানরূপতাই স্বীকার করেন।

(৮) পাতঞ্জল মত—এই মতে নির্ব্বিকার ভাবে, জ্ঞানরূপে আত্মার অবস্থানই মুক্তি। "মুক্তির্হিত্বান্যথা ভাবং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ" প্রকৃতিসংযোগ জন্য বিকার ভাব পরিহার পূর্ব্বক জ্ঞানস্বরূপে অবস্থানই মুক্তি।

(৯) মীমাংসক মত—এই মতে অবিনশ্বর সুখভোগই মুক্তি নামে অভিহিত হইয়াছে। ইঁহাদের মতে যাগ প্রভৃতিই মুক্তির কারণ, আত্মজ্ঞান মুক্তির কারণ নহে। অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিকগণ যেমন মুক্তি সময়ে আত্মার অদ্বিতীয়ত্ব স্বীকার করেন, ইঁহারা সে রূপ বলেন না। তাঁহাদের মতে মুক্তি সময়েও জগতের অস্তিত্ব থাকে, এবং মুক্তি সময়ে আত্মা, যে সুখ উপভোগ করেন, সে সুখ আত্মা হইতে ভিন্ন, বেদান্তাদ্বৈতবাদানুসারে সেই সুখ আত্মস্বরূপ।

(১০) অদ্বৈতবাদী বেদান্ত ও পাণিনি মত—ইহারা বলেন ব্রহ্মানন্দ লাভ এবং দুঃখনিবৃত্তি, উভয়ই মুক্তি। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে "ব্রহ্মবিদ্ব্রহ্মৈব ভবতি," "তরতি শোকমাত্মবিৎ" ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রহ্মস্বরূপ হন। আত্মজ্ঞানী শোক অর্থাৎ দুঃখ উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন। অদ্বৈতবাদিগণ আত্মার সৎ চিৎ ও আনন্দরূপতা স্বীকার করেন। অজ্ঞানের আবরণ প্রযুক্ত সকল সময়ে আনন্দরূপতার অনুভব হয় না। আত্মজ্ঞান দ্বারা অজ্ঞানের বিনাশ হইলে, সেই আত্মস্বরূপ সুখ বা ব্রহ্মানন্দ উপলব্ধ হইতে থাকে। এবং মুক্তি সময়ে আত্মা ভিন্ন আর কিছুই থাকে না। একমাত্র আত্মাই অদ্বিতীয় ভাবে অবস্থিত থাকেন।

শ্রীগুরুচরণ তর্কদর্শন তীর্থ।

বিদুলা-সঞ্জয়-সংবাদ।

(মহাভারত হইতে গৃহীত)

বিদুলা ও সঞ্জয়।

সঞ্জয়—

কেন মা কালিমাময় হেরি ও বদন?
ক্ষুণ্ণ কি গো পরাজয়ে? পরাক্রান্ত অরি
ছত্রভঙ্গ করি বল, দিয়েছে আমায়
মা গো রণস্থল হ'তে খেদাইয়ে বলে।
রাখিতে পরাণ মোর, ত্যজি আশাহীন
নিস্ফল বিরোধ, আসিতে হল মা আজি
পলাইয়ে; এবে শ্রান্ত দেহ, ক্ষুব্ধ হিয়া
জুড়াইল শ্রীচরণ করিয়ে দর্শন।
বড় ভাগ্যে মা তোমার, এসেছি বাঁচিয়া!
জয় পরাজয় নিত্য সমরপ্রাঙ্গণে;
ক্ষুব্ধ কেন তার লাগি? জননী আমার,
পেয়েছ আমারে ফিরে এই ভাগ্য গণি!

বিদুলা—

হীনপ্রাণে নীচ সম শিখেছিস্ বাণী
কুলাঙ্গার! ভাগ্যে মোর এসেছিস্ ফিরে?
ঢেকে ফেল্ ঢেকে ফেল্ কলঙ্কমণ্ডিত
কুৎসিৎ বদন তোর মোর আঁখি হ'তে,
নহে মোর মর্ম্মভেদী নয়নের জ্বালা
অতিতীক্ষ্ণ অসহন নারিবি সহিতে।
রে বর্ব্বর! কেন বহ ঘৃণিত জীবন?
জন্মি ক্ষত্র কুলে তুই, আশীবিষ সম
নাহি দংশি অরাতিরে, কুক্কুরের প্রায়
পলা'য়ে আনন্দে এত হয়েছ অধীর?
হাসে যার শত্রুকুল জয় গর্ব্বোল্লাসে
সে কোন্ লজ্জায় বদন দেখাতে চায়
জগত মাঝারে? ভুলি নিজ মর্য্যাদায়
সে কোন্ লজ্জায় গৃহকোণে পশে আসি
নিশ্চিন্ত হৃদয়ে? তোর কাজে ভাবি মনে
আমি কি ধরেছি তোরে আমার জঠরে?
বিধিবিড়ম্বনে আসি অঙ্গার জন্মিল
সুবর্ণ খনির গর্ভে? দিল মাধবিকা
কিংশুকে জনম? বায়স আসিল ফিরে
কোকিলার নীড়ে? হায়! কত ছিল আশা
উজ্জ্বল হবে রে মুখ তব বীর্য্যবলে,
বীর-প্রসবিনী খ্যাতি জাগিবে জগতে,
দ্বিগুণ উজ্জ্বল হ'বে পিতার গরিমা।
বড় আশে কুলাঙ্গার!—বীরাঙ্গনা আমি,
অঙ্গের শোণিত দানে পালিনু যে তোরে—
হেরিতে কি তোর শুধু অপকীর্ত্তিরাশি?
অর্জ্জিতে জগতমাঝে অতি অসহন
কাপুরুষ-ধাত্রী নাম? কেন, হায়! যবে
অকলঙ্ক শিশু মুখে, রে কুলঘ্ন, তোর
অর্পিতাম প্রীতিভরে স্তন্য পয়ঃবাহী,
সে ক্ষীর হ'ল না মোর গরলের ধারা?
তা হ'লে তো আজি এই কলঙ্ক কালিমা
দেখিতে হত না তোর অনিন্দ্য বদনে;
অনাঘ্রাত ফুলকলি যেত শুকাইয়া
সৌরভবিহীন প্রাণ লভিবার আশে।
কোন্ পাপে, হে বিধাতঃ, অভাগীর ভালে
লিখেছিলে এত জ্বালা? যার মুখ চেয়ে
এত দিন তুচ্ছ প্রাণ রাখিনু এ ভবে
সর্ব্বস্ব হারায়ে মোর—সেই আজি মোরে
জীবনের সাধ হ'তে করিল বঞ্চিত।

সঞ্জয়—

মা আমার, আমি তব অঞ্চলের নিধি,
একমাত্র রত্ন কোলে, একটি প্রদীপ
তব এ আঁধার ঘরে, সেই ভাবি মনে
পরাজয়ে রণরঙ্গে না সঁপি জীবন।
এসেছি তোমার কাছে, তোমার অঙ্কেতে
লয়েছি আশ্রয় তাই,—কেন দাও গালি?
কেন তবে চ্যুত করি সুধাক্রোড় হতে
নীরস হৃদয়ে মোরে দিবে ফেলি দূরে?
কোন্ অবলম্ব ল'য়ে রহিতে জগতে
মরণে বরিলে আমি? হৃদয় তোমার
কোমল মৃণাল সম, মৃত্যু মোর তারে
মত্ত মাতঙ্গের বলে পীড়িত, জননী!
কেমনে বাঁচিতে তুমি নিষ্ঠুর পেষণে?

বিদুলা—

আরে মৃত্যু-ভীত! আপনার হীনপ্রাণ
ভেবেছ মায়ার পথে করি সঞ্চারিত
মোর দৃপ্ত হৃদে তুমি, লক্ষ্যভ্রষ্ট মোরে
পারিবে করিতে? স্নেহের দোহাই দিয়ে
নিজের ক্ষুদ্রত্ব চাহ ঢাকিয়া ফেলিতে?
বৃথা সে সাধনা তব। বৃথা ভাব মনে
স্নেহবশে হ'বে মোর হৃদি বিপ্রকৃত।
তুই কি বুঝিবি মোর স্নেহের মহিমা—
রে অবোধ, হীনমতি? ভ্রান্ত হিয়া ল'য়ে
নারিবি বুঝিতে মোর হৃদয়ের প্রথা।
কূপোদকবাসী ক্ষুদ্র ভেক পারেনা ক'
বুঝিবারে সাগরের বিরাট বিস্তার।
পারিবি না বুঝিবারে কত স্নেহপ্রীতি
ধরে মোর হিয়া। কর্ত্তব্যবিবেকহীন
যে অভাগা, ভবে সে কি নিজ হৃদিমাঝে
স্নেহের পবিত্ররূপ পারে ধরিবারে?
মৃত্যুভয় দেখাও আমারে? আজি যদি
সমরপ্রাঙ্গণে বিজয়লক্ষ্মীর কৃপা
না পারি লভিতে, ক্ষত্রিয় কুমার তুই,
বক্ষ পাতি ধরিতিস্ সমর-মরণে,—
মৃত্যু হ'ত পরাজিত, লভিতিস তবে
প্রাণ দিয়ে বিশ্বমাঝে অনশ্বর প্রাণে।
প্রতি অস্ত্রলেখা, হৃদয় সমুদ্র মোর
করিয়া মন্থন, তুলিত যে স্নেহসুধা,
সে সুধা পিয়ায়ে চির অমৃতত্ব তোরে
করিতাম দান, অনন্ত জীবন তোর
জীবনবিহীন দেহে হ'ত প্রতিষ্ঠিত।
এবে তোর মূল্যহীন প্রাণ কোন্ লাজে
দিতে চাস্ মোর পায়ে? চরণদলিত
পত্র-পুষ্পে চাস্ তুই পূজিতে দেবতা?
তুচ্ছ জীবনের তরে পিতৃ মর্য্যাদায়
অতল সলিল মাঝে দিলি ডুবাইয়া,
চির-মৃত্যু আহ্বানিলি মরণের ভয়ে?
জীবনের যে মুহূর্ত্ত অনায়াসে তোর
অনন্ত মুহূর্ত্ত হ'ত, আজি শুধু তাহা
অনন্ত অকীর্ত্তিকর হ'ল সর্ব্বনাশী।
গেল মান, তুচ্ছ প্রাণ শব সম দেহে
রাখিবি কি আশে?

সঞ্জয়।

এত স্নেহ যদি মা হৃদয়ে
এই অভাগার প্রতি, তবে কেন চাহ
ধ্রুব মৃত্যুমুখে মোরে প্রেরিতে আগ্রহে?
বধি মোরে দিবি কারে সে স্নেহের রাশি?
শূন্য নগ্ন হৃদি লয়ে বাঁচিবি কেমনে?
অতৃপ্ত রবে মা তোর সুধারাশি মোরে
পিয়াবার তীব্র আশা, যদি যাই চলে
অকালে হারায় মোর নবীন জীবন।

বিদুলা—

কারে তোর নীচ মুখে ডাক বারে বারে

মা বলিয়ে? আমি তোর নইয়ে জননী।
তোর কদাচারে দুষ্ট স্নেহ মোর হৃদে
হয়েছে গরল রাশি, সে বিষের দাহ
মৃত্যুভীত কাপুরুষ নারিবি সহিতে।
অমৃত দেবের ভোগ্য, দানবের ভালে
কালকূট। স্নেহ মোর নহে, তোর মত
কর্ত্তব্যবিমুখ হীন ঘৃণিতের তরে।
স্নেহের পেটিকা মাঝে ভেবেছিস্ বুঝি
পূরে রেখে শিখে ধরি ফিরিব অধমে?
ফেলে দিব খুলে দূরে মহিমামণ্ডিত
কিরীট মস্তক হ'তে, বহিতে আদরে
কুৎসিৎ আয়সে শিরে? সিংহিনী হইয়ে
যতনে ধরিব বুকে ফেরুর শাবক?
বজ্রদগ্ধ তরুমূলে অজস্র ধারায়
ঢালিব নিস্ফল রসে? ক্ষত্রিয় ললনা
হেন হীন স্নেহ লয়ে জনমে না ভবে।
আজি হ'তে তোর ফুরাল সংসার মাঝে
জননীর স্নেহ—রহিল যা, মরীচিকা,—
দুস্তর মরুর মাঝে প্রবাসীর প্রাণে
বিফল তৃষ্ণার শান্তি আশা-প্রদায়িনী।

সঞ্জয়—

হতভাগ্য আমি, হারাব মুহূর্ত্তে কি গো
সকলি এ ভবে? এর চেয়ে ছিল না কি
মৃত্যু শ্রেয়ঃ! মৃত্যুশ্রেয়ঃ? নব মুকুলিত
বাসনা কুসুমকলি নিষ্পেষিত করি
এ নব জীবনে, জীর্ণ মরণ কঙ্কালে
ছুটে গিয়ে বাঁধিব কি অভেদ্য বন্ধনে?
এই তো উঠেছে সবে গগনের ভালে
সুধাকর গণে বাঁধি তারকার মালা;
প্রদোষে, কি দোষে হায়! এত সুখময়ী
রজনী ফুরায়ে যাবে, দেখা দিয়ে শুধু?
মা না মা কোমল হিয়ে কঠিন ক'র না
স্নেহে দিয়ে জলাঞ্জলি; বৃন্তচ্যুত করে
স্নেহের প্রসূনে তব দ'ল না চরণে।
করাল মূরতি ত্যজি মা হ'য়ে আবার
নেমে এসে লহ পুত্রে শ্রী তমাখা মুখে
অভয়ে! অভয় দিয়ে রাখি রাঙা পায়ে।

বিদুলা—

এখনও এখনও, ভ্রান্ত, মৃত্যু-বিভীষিকা
ঘুচিল না তব? এখনও ফিরিতে চাহ
সংসারের ঘনঘোর বিপিনের মাঝে
কোন আশে পুত্র মোর? অমৃত নির্ঝর
অবহেলি মৃগতৃষ্ণা চাহ ধরিবারে?
চাহ যদি মোর স্নেহ, সিংহিনীর শিশু!
সিংহের বিক্রমে, জয়াজয় তুচ্ছ করি
কর আক্রমণ বীরদম্ভে শত্রুকুলে।
ভীমা ভুজঙ্গিনী হেরি মন্ত্রমুগ্ধ যথা
পক্ষীকুল পড়ে লুটি, লুটিবে তেমতি
অরি তোর হেরি তব ভীষণা শকতি।
হার জিন যাও রণে বীরেন্দ্র-বিক্রমে;
জন্মিলে এ ক্ষুদ্র দেহ অবশ্য ভাঙ্গিবে,
তবে কেন এ দেহের অলীক মমতা?
আর, যদি হেয় প্রাণে হেয় বাসনার
দাস হ'য়ে অমরত্ব ভুলে মৃত্যুভয়ে
থাকিস লুকায়ে গৃহ কোণে, পলে পলে
শতবার হীনমৃত্যু মরিবি জীবনে।
তুমি যদি নাহি যাও কর্ত্তব্য সাধনে
রণরঙ্গিণীর বেশে নিজে যাব আমি।
ঝলসি চপলা সম আকস্মিক তেজে
শত্রু শিরঃ নিভে যাবে কাল মেঘ মাঝে;
নিভে যাবে এ জগতে আশার প্রদীপ
তোর ভালে। আরে ভ্রান্ত! বৃথা দ্বিধা ত্যজি
চল চল বীরসাজে, আকুল আহ্বানে
ডাকিছে কর্ত্তব্য তোরে, চল ত্বরা করি।

চল যাই দোঁহে যথা দামিনীর সাথে
নির্ম্মম অশনি ছোটে মহা মহীরুহে
চূর্ণ দীর্ণ দগ্ধ করি প্রলয় হুঙ্কারে।
মরি যদি কিবা ক্ষতি? ফিরে যদি আসি
গর্জ্জনান্তে বরষিব সহস্র ধারায়,
সুধাসম বারি রাশি তোর ক্লান্ত হৃদে।

সঞ্জয়—
থাক থাক এ দেউলে দেবতা আমার
বরাভয়-প্রদায়িনি! প্রচণ্ড শকতি
করিয়াছ সঞ্চারিত হৃদয়ে জননি!
দাও শিরে পদধূলি, চলিনু এখনি
পশিতে সমরে; চূর্ণি অরাতির শির,
ফিরে এসে যোগ্য হস্তে বন্দিব চরণ!

শ্রীজিতেন্দ্রলাল বসু

তারা।

চাষার ঘরে এমন সুন্দর মেয়ে কেহ কখনো দেখে নাই। প্রভাতে সোণার মত সূর্য্যের আলো যেমন করিয়া ক্ষীণ অবকাশ-পথে নিবিড় বনের ঘনান্ধকার বক্ষের উপর ক্ষণেকের জন্য আসিয়া পড়ে, এই স্বর্গের জ্যোতিকণা তেমনি করিয়া বুঝি দরিদ্র হারাধনের অন্ধকার কুটিরে পথ ভুলিয়া আসিয়াছিল!

হারাধন আদর করিয়া কন্যার নাম রাখিয়াছিল—তারা। তারা নৈশাকাশে তারারই মত হারাধনের আঁধার ঘরে দিন রাত্রি ঝক্ মক্ করিত।

হারাধন ও তাহার পত্নী ভবসুন্দরী গুরুতর কর্ম্মের মধ্যে যখনই অবকাশ পাইত, একবার ছুটিয়া আসিয়া তারার কুসুমপেলব মুখখানি সতৃষ্ণ নয়নে দেখিয়া যাইত। তারা কাঁদিতে জানিত না। সে যেখানে থাকিত তাহার আয়তলোচনের স্নিগ্ধরশ্মি সেই স্থানকেই অমৃতময় করিয়া রাখিত। যে দেখিত সেই বলিত "মেয়ে যেন সাক্ষাৎ মা-লক্ষ্মী।"

কিন্তু হায় "হাদে লক্ষ্মী, লক্ষ্মীছাড়া!" তারার পিতামাতা অনুরক্ত হৃদয়ের পরিপূর্ণ স্নেহরস দানে তারাকে পরিপুষ্ট করিতে করিতে এক দিন অন্ধকার নিশীথে নিঃশেষিত-রস তরুর মত সংসারারণ্য হইতে উৎপাটিত হইলেন। নিদারুণ বিসূচিকা শুধু দয়া করিয়া তারাকেই ফেলিয়া গেল।

তারা তখন নবমবর্ষীয়া বালিকা। ক্ষুদ্র মুকুল ফুটিবার পূর্ব্বেই হরিত শাখার স্নেহান্তরাল হারাইল। তারার পিতার কিছু জমি-জমা ছিল। তারার পিতামাতার মৃত্যু সংবাদ পাইয়া তারার এক মাসী শোকে অধীর হইয়া স্বামী-পুত্র সমভিব্যাহারে গ্রামান্তর হইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তারার এই বিপদের সময়ে কি তাহার মাসী স্থির থাকিতে পারেন? যত দিন ভগ্নী জীবিত ছিলেন, তত দিন কোন খোঁজ-খবর লওয়ার আবশ্যক হয় নাই। কিন্তু মাতৃহীনা

কন্যার এই দুঃসময়ে কি আর নিশ্চিন্ত থাকা যায়! কিন্তু আমরা সত্য কথা বলিব, এখন আর মাসী ছাড়া তারার আপনার কে আছে? তারার মাসী অপেক্ষা মেসোর সহানুভূতিই কিছু অধিক! নিজের লোক-জন থাকিতে সেই দুধের মেয়ে তারা—দেখা শুনার অভাবে—কষ্ট পাইবে? না, তা কিছু-তেই হইতে পারে না। তারার মেসো পুরুষানু-ক্রমের পুরাতন বাস্তু ভিটা এবং পিতৃপুরুষের কৃত, অধুনা জীর্ণ ভগ্ন ঘরগুলি এবং কাংস্য ও মৃত্তিকার তৈজস পত্রের মায়া পরিত্যাগ করিয়া সপরিবারে তারার পিতৃগৃহে উপনীত হইলেন। মেসো ও মাসী প্রথম প্রথম কয়েক দিনে তারার প্রতি সস্নেহ ব্যবহারে, গ্রামবাসীদের সহিত আলাপ-আপ্যায়নে, এবং আত্মীয়তায় সকলেরই মন অধিকার করিল। তারার একটা গতি হইল ভাবিয়া সকলেই যেন নিশ্চিন্ত হইল। এ দিকে সাধারণের মনের সঙ্গে সঙ্গে তারার মেসো তারার পৈত্রিক সমস্ত সম্পত্তিও অধিকার করিয়া বসিল, ক্রমে মেসো ও মাসীর নিজমূর্ত্তি প্রকাশ পাইতে লাগিল। তারা 'নিজ বাসভূমে পরবাসী' হইল! ইহাদের সংস্পর্শে বেচারী যেন দিনে দিনে স্পর্শকাতর লজ্জাবতীর মত নিতান্ত সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতে লাগিল। সে বসন্তের মুকুল যেন করকাঘাতে ভূমিতলে পড়িয়া দিনে দিনে শুকাইতে লাগিল। তারার পেশীবহুল মেসো মহাশয়ের হাঁকডাক এবং তাহার নবাগত ভ্রাতাভগিনী-গণের লম্ফঝম্ফ তাহাকে বিব্রত করিয়া তুলিল। তারার দেবতার মত মূর্ত্তি দেখিয়া দেখিয়া, কুৎসিৎ পুত্রকন্যার জননী তারার মাসী বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাহার সে অসন্তোষের তীক্ষ্ণকণ্টক তারার কোমল বক্ষকে সর্ব্বদাই বিদ্ধ করিতে লাগিল।

২

তারা অনেক চেষ্টা করিয়াও কিছুতেই এই হীন পরিবারের সঙ্গে মিশিয়া যাইতে পারিল না। ছেলেরা পাঁক ও কাদা লইয়া মাতামাতি করিয়া বেড়ায় এবং মেয়েরা কুৎসিৎ ভাষায় পরস্পরকে গালাগালি দেয় ও মারামারি করে, তারা কেমন করিয়া তাহাদের সঙ্গে যোগদান করে? সে দূর হইতে বড় বড় চক্ষু মেলিয়া এই অসংযত উপদ্রব দেখিয়া ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া যাইত।

তারার মাসী সর্ব্বদা তাহাকে শাসাইতেন "দেখো, দেখো, এত তেজ থাক্‌বে না।"

তারা এ অনুযোগের হেতু কিছু খুঁজিয়া পাইত না, অনির্দ্দিষ্ট ভয়ে সে শুধু শুকাইয়া যাইত।

সুশীলা তারাকে গ্রামের সকলেই স্নেহ করিতেন, তাহার ম্লান মুখ এবং অশ্রুসিক্ত চক্ষু দেখিয়া অনেকেই তাহাকে আপনার গৃহে ডাকিয়া লইয়া গিয়া তাহার মাসী মাতা ও মেসো মহাশয়ের ব্যবহারের কথা জিজ্ঞাসা করিতেন। তারা কিছুই বলিতে পারিত না। শুধু ছল ছল চক্ষে তাঁহাদের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত। কোন দিন বা এক ফোঁটা অশ্রু সেই শান্ত চক্ষুর প্রান্ত বহিয়া নীরবে গড়াইয়া পড়িত। দেখিয়া সকলেই সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন, কেহ বা রুষ্ট হইয়া বলিতেন "তারার বাপের বিষয় খেয়েই মানুষ, তবু হতভাগারা মেয়ে-টাকে একটু যত্ন করে না।" এ সকল

অপ্রিয় উক্তি কিরূপে তারার মাসীর কর্ণগোচর হইত, সে এক জটিল প্রহেলিকা।

কিন্তু যে দিন এই সকল মন্তব্য প্রকাশিত হইত, সে দিন আর তারার লাঞ্ছনার সীমা থাকিত না—সে দিন গ্রামস্থ সমুদয় জীবিত নরনারীর সঙ্গে তারার স্বর্গগত পিতামাতা পর্য্যন্ত মহাসমারোহে অভিনন্দিত হইতেন। তারার মেসো মহাশয়কে ভগবান তাহার মাংসপেশীর ঠিক বিপরীত অনুপাতে মস্তিষ্ক দান করিয়াছিলেন, প্রিয়তমা পত্নীর কণ্ঠস্বর শুনিয়া সে এক এক দিন গর্জ্জন করিয়া বলিত "বটে! এত তেজ? এক দিনে মেরে 'গোব্ড়েন' করে দেব না!" এবং সে এত দিন "কথায় যা বলিত তা দেখাইত —কাজে", কিন্তু তারার মাসী জানিত সে "চাষার মরদের লাঠি খাইলে সুকুমারী তারার প্রাণহানি ঘটা বিচিত্র নহে। কাজেই কর্ম্মবীর স্বামীকে বহু কষ্টে সে হস্তচালনা হইতে নিবৃত্ত করিয়া রাখিত।

কিন্তু কিছু একটা করা প্রয়োজন হইয়া উঠিল। বৎসর অতীত হইতে না হইতে তারার মাসী একদিন সভয়ে শুনিল যে গ্রামের লোকে তারার পিতার বিষয় তাহাদের হাত হইতে কাড়িয়া লইবার জন্য ষড়যন্ত্র করিতেছে। তারার মেসো গোবিন্দের একটি অনুগত ভাগিনেয় ছিল। ভাগীনেয়টি নামে গণেশ এবং রূপে ও গুণে "নরাণাং মাতুলক্রমঃ।" তাহার 'জমি-জারত' 'বাস-বাগিচা' কিছু কিছু থাকা সত্ত্বেও, কয়েক বৎসর উপর্য্যুপরি অজন্মা ইত্যাদি কারণে গণেশ ত্রিশ বৎসর বয়সে গৃহশূন্য হইয়া শূন্য গৃহ পূর্ণ করিতে পারে নাই। তাহার হিতৈষী মাতুল ও মাতুলানী তাহারই সঙ্গে তারার শুভ বিবাহ স্থির করিয়া ফেলিলেন। বংশলোপভয়ে ভীত গণেশ সুন্দরী পাত্রীর লোভে তারার বিষয় সম্বন্ধে সমস্ত দাবি পরিত্যাগ করিতে স্বীকৃত হইল ও মাতুল গোবিন্দ দয়াপরবশে মাত্র কিছু উপস্বত্ত বৎসরে বৎসরে দিবার বন্দোবস্ত করিল। প্রতিবেশিগণ সম্বন্ধের কথা শুনিয়া উদ্বিগ্ন ও শঙ্কিত হইয়া উঠিল, কিন্তু তারার মাসী 'মন্ত্র-গুপ্তি' ও কূটবুদ্ধির প্রভাবে তাহাদের সমস্ত উদ্যোগ পণ্ড করিয়া দিলেন।

আষাঢ়ের শুভ বাসরে তারার সঙ্গে গণেশের শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল। আরক্ত চক্ষু স্বামীর যমদূতের মত মূর্ত্তি দেখিয়া তারা সভয়ে চক্ষু মুদিল।

৪

দ্বাদশ বর্ষ অতিক্রম করিতে না করিতে তারা স্বামীগৃহে নীত হইল। সহসা গৃহস্থালীর ভার পাইয়া অশিক্ষিতা তারা বিষম বিপদে পড়িল। তারার পিতামাতা স্নেহময়ী কন্যাকে কোন কাজ করিতে দিতেন না, তারার মাসীও আক্রোশবশতঃ তাহাকে কোন দ্রব্য স্পর্শ করিতে দেন নাই, কাজেই পরীক্ষার দিনে তারা পদে পদে বিপন্ন হইয়া উঠিতে লাগিল। অঙ্গনে গোময়ের প্রলেপ দিতে তারার চাঁপার মত অঙ্গুলি ফাটিয়া রক্ত পড়ে, আগুন ধরাইতে তাহার বিশাল চক্ষুতে জলের স্রোত বহিয়া যায়, ঘাট হইতে জল আনিতে তাহার সামর্থ্যে কুলায় না, তারা কি করিবে ভাবিয়া পায় না।

সুন্দরী কিশোরী ভার্য্যার দুরবস্থা দেখিয়া গণেশ প্রথম প্রথম তাহাকে যথাসম্ভব সাহায্য করিত। কিন্তু অধিক দিন সে নিজের সংকল্প রক্ষা করিতে পারিল না—'মিসিরঞ্জিতদশনা কৃষকগৃহিণীকুলে'র তীব্র পরিহাস-বাণী তাহার চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করিয়া দিল।

যে দিন প্রতিবেশিনীগণের বাক্যবাণ স্থূলবুদ্ধি গণেশকে অধিক পরিমাণে বিদ্ধ করিত, সে দিন সে ধৈর্য্য হারাইয়া হুঙ্কার করিয়া তারার উদ্দেশে বলিত, সেবা করিবার জন্য সে তাহাকে গৃহে আনে নাই। কিন্তু তাহাতে ফল বিপরীত হইত, যে দিন তারা স্বামীর নিকট তাড়না সহ্য করিত সে দিন তাহার ত্রুটির পরিমাণ অসম্ভব রূপে বাড়িয়া যাইত। উত্তেজিত গণেশ ক্রোধান্ধ হইয়া মনে করিত, তারাকে প্রহারের দ্বারা রীতিমত শিক্ষা দেয়, কিন্তু তাহার সকরুণ দৃষ্টি এবং কুসুমপেলব শরীর দেখিয়া তাহার মায়া হইত—প্রহার করা ঘটিয়া উঠিত না।

আজ গণেশ নিজগৃহে আহারের একটু বিশেষ রকম আয়োজন করিয়াছিল, আজ কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধু তাহার গৃহে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। গণেশ বিশেষ করিয়া তারাকে শাসাইয়া গিয়াছিল, আজ কোন ত্রুটি হইলে তারার আর 'রক্ষা থাকিবে না।' তারা ভয়ে ভয়ে রন্ধনাদি করিতেছিল। গণেশ বাহিরের ঘরে বন্ধুবান্ধবদের লইয়া আমোদ-প্রমোদে মগ্ন ছিল। রন্ধনাদি প্রায় সম্পন্ন হইয়া আসিয়াছিল, মাংসপাত্র নামাইলেই মোটামুটি রন্ধনকার্য্য সমাপ্ত হয়। তারা অত্যন্ত সাবধান হইয়া মাংস পাত্র নামাইতে গেল। ভাল করিয়া কোমরে কাপড় জড়াইয়া প্রাণপণ শক্তিতে সে পাত্রের গলদেশ চাপিয়া ধরিল। ধরিয়া নামাইতে যাইবে, এমন সময়ে একটা বৃহৎ কুক্কুর লম্ফ দিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। করিবামাত্র চকিত তারার অঙ্গনিবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া রন্ধনপাত্র সশব্দে মাটিতে পড়িয়া চূর্ণ হইয়া গেল। তারা ভয়ে পাণ্ডুর হইয়া উঠিল।

শব্দ শুনিয়া 'ধাঁটি'-সেবিত গণেশ ছুটিয়া ভিতরে আসিল। আসিয়া দেখিল তাহার সযত্নে আহৃত মাংসখণ্ড চারি দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়া আছে এবং তারা পাণ্ডুর মুখে পাষাণ-প্রতিমার মত তাহার মধ্যে দাঁড়াইয়া আছে। পান-বিহ্বল গণেশ আজ আর ধৈর্য্য রক্ষা করিতে পারিল না। এক হস্তে তারার গ্রীবা ধারণ করিয়া "খিড়কির" দ্বারের নিকটে লইয়া গিয়া পদাঘাতে তাহাকে বাটির বাহিরে দূরে নিক্ষেপ করিল। বলা বাহুল্য সে রাত্রে বন্ধুবর্গের আহারাদির তেমন সুবিধা হইল না। গণেশ আদরে আপ্যায়নে, গল্পে ও গানে, পানে আহারের ত্রুটি মোচন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কাজেই তারার সংবাদ লইবার সে রাত্রে আর তাহার অবকাশ হইল না।

গণেশ তারাকে খিড়কির বাহিরে দিয়া আসিবার পর তারা অনেকক্ষণ "আড়ষ্ট" হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তার পর কি মনে করিয়া কতকটা রমণী-সুলভ আশঙ্কা, কতকটা বা সাধারণ ভয়ের তাড়নায় সে বাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়া ধীরে ধীরে খিড়কি বন্ধ করিয়া দিল। তারা সহজে

ভীরু—স্বভাবে মৃদু—লজ্জাবতী লতার মত সে পরুষস্পর্শে মুদিয়া আসে। আজিকার গণেশের এই অমানুষিক ব্যবহারে—পাশব আচারে—সে ভয়ে ঘৃণায় শরমে মরমে মরিয়া গিয়াছিল, তাহার বুকের ভিতর হইতে যেন একটা "কাঁপুনি" উঠিতে লাগিল, সে আর স্থির থাকিতে পারিল না, দাওয়ায় বসিল, বসিয়া বসিয়া শুইয়া পড়িল। তার পর প্রবল জ্বর, জ্বরের দাহে দেহ জ্বলিতে লাগিল, পিপাসায় যেন ছাতি ফাটিয়া যাইতেছিল। সে যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া তারা অনেক কষ্টে উঠিয়া কলসীর জল আকণ্ঠ পান করিল, কিন্তু তৃষ্ণা কমিল না; আবার—আবার—কতবার সে জল খাইল, তবু সেই যেন মরুভূমে বারি বিন্দু! পীড়া কঠিন হইতে কঠিনতর দাঁড়াইল।

বেলা প্রায় দশটার সময় গণেশের নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন নেশা ছুটিয়াছে, সহসা তার তারার কথা মনে পড়িল, ছুটিয়া খিড়কির পথে যাইতে দাওয়ায় ভূমিশয্যায় শায়িতা, আলুথালুবেশা তারাকে ছট ফট করিতে দেখিল,—তখন সে ম্লানজ্যোতিঃ প্রভাতের তারা নিভ নিভ হইয়াছে, আকাশের চাঁদ ভূমিতে পড়িয়া গড়াগড়ি যাইতেছে, পূজার প্রস্ফুটিত কুসুম বালকের নখাঘাতে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া কর্দ্দমে লুটাইতেছে!

অনুতপ্ত গণেশ, তখন তারাকে বুকে করিয়া, গৃহমধ্যে শয্যায় শয়ন করাইল, গ্রাম্য চিকিৎসার ত্রুটি করাইল না, কিন্তু সে গোড়া কাটিয়া আগায় জল ঢালার মত! হায়!—

"নির্ব্বাণে দীপে কিমু তৈলদানম্!"

শ্রীযতীন্দ্রমোহন গুপ্ত।

ভ্রান্তি।

১

মুগ্ধ শিশু সারা বেলা
পথে পথে করে খেলা,
ধূলা মাটী ছাই পাঁশ কত মাখে গায়
স্নেহময়ী মা'র পানে ফিরিয়া না চায়।

২

সন্ধ্যা যবে আসে ধীরে
অন্ধকারে ধরা ঘিরে
ভীত শিশু খেলা ফেলি গৃহমুখে ধায়
আকুল কাতর কণ্ঠে ডাকে মা কোথায়!

৩

ও মা আমি শিশু তোর
মায়া-ঘোরে ছিনু ঘোর
সন্ধ্যা দেখি কাঁপে হিয়া ডাকি 'মা' 'মা' বলে
ঝেড়ে দে মা ধুলামাটী তুলে নে মা কোলে।

৪

মাগো! আমি পথভ্রান্ত
বড় ভীত, বড় শ্রান্ত
জননীর বুক ছাড়া কোথা পাব ঠাঁই?
তুলে নে মা, কোল দে মা, আরামে ঘুমাই।

শ্রীপ্রেমানন্দ গুপ্ত।

গ্রন্থ-সমালোচনা।

॥৺দুর্গা পূজার বলি ও জীব-বলি—শ্রীঅনাথকৃষ্ণ দেব প্রণীত। দুর্গাপূজায় জীব-বলির আবশ্যকতা আছে কি না তাহারই আলোচনা। কারুণ্যের অবতার বুদ্ধদেব যে দিন যজ্ঞার্থ বলিদানের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া জগত-সমক্ষে মৈত্রীর আদর্শ স্থাপন করিয়াছিলেন, সে দিন হইতে ভারতবর্ষে এ বিষয়ে অনেক বাদানুবাদ চলিয়া আসিতেছে। প্রেমাবতার চৈতন্যদেবও অনেক পরিমাণে এই নিঃসহায় জীবের রক্তস্রোত রুদ্ধ করিয়াছিলেন; কিন্তু তথাপি ধর্ম্মের দোহাই দিয়া,—"জীব জননীর পূজাচ্ছলে"—বলিদান চলিয়া আসিতেছে। আজকালকার এই যুক্তির দিনে গ্রন্থকার শাস্ত্রাদি হইতে জীব-বলির বিরুদ্ধে যে সকল মতবাদ সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছেন—তাহা বিশেষ বিবেচ্য ও আলোচ্য। সমগ্র গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া করুণ-হৃদয় গ্রন্থকারের ব্যাকুলতা আমাদের মর্ম্ম স্পর্শ করিয়াছে। গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য সফল হউক—ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

দিনচর্য্যা।—শ্রীভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল প্রণীত—মূল্য চারি আনা।

আশ্রম-চতুষ্টয়।—শ্রীভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল প্রণীত—মূল্য আট আনা।

পাশ্চাত্য-আদর্শের প্রভাবের এই যুগে, ইংরাজী-শিক্ষাপ্লাবিত দেশে এই গ্রন্থ দুই-খানি যেন মাতৃভূমির পবিত্র আহ্বানের মত আমাদের সমস্ত হৃদয়কে উদ্বোধিত করিয়াছে। মানুষের সমস্ত জীবন-যাপনের এবং প্রাত্যাহিক কর্ত্তব্যের যে প্রণালী ভারতবর্ষের প্রাচীন আদর্শ তাহাই ভাল, না মানুষে মানুষে কঠোর প্রতিযোগিতা জীবন-সংগ্রামের এই নিষ্ঠুরতা, পাশ্চাত্য-আদর্শ "dying in harness"ই ভাল—তাহা আলোচনা করিবার সময় আসিয়াছে। পাশ্চাত্য-আদর্শের প্রবল স্রোতে আমাদের দেশের আদর্শ আজ নিমজ্জিত—আমরা পুরাতন হারাইয়াছি এবং নূতনও আমাদের 'ধাতের' সঙ্গে খাপ খায় নাই—তাই শিক্ষা কেবল বহিরাবরণের মত বাহিরেই আছে—তাহা আমাদের চরিত্র-গঠনের কোন কাজেই আসিতেছে না—তাই সকল কর্ম্মে, সকল উদ্যোগে আমাদের এত ব্যর্থতা—এত দৈন্য। আমরা ভাষা শিক্ষা করিতেছি—কিন্তু আমরা মানুষ হইতেছি না। এই গভীর সমস্যার দিনে গ্রন্থকার আমাদের সম্মুখে ভারতবর্ষীয় আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন। যে আদর্শে হিন্দুজাতি কর্ম্ম ও জ্ঞানের সর্ব্বোত্তম ফল লাভ করিয়াছিলেন, গ্রন্থকার আজ সেই দিকে ফিরিবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন। আমরা কি করিব? পরম দুঃখ-দৈন্যের মধ্য দিয়া সর্ব্বকালনিয়ন্তা আমাদিগের সে সমস্যার মীমাংসা করিবেন।

এই গ্রন্থ দুইখানি সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার ছিল কিন্তু সমালোচনার বৃথা বাগজাল বিস্তার করিয়া এই গুরু বিষয়কে লঘু করিবার প্রবৃত্তি নাই। তাই সমস্ত দেশবাসীকে এই গ্রন্থ দুইখানি পাঠ করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি মাত্র। গ্রন্থকার বলিয়াছেন—"দিন দিন লইয়া মাস, মাস মাস লইয়া বৎসর, বৎসর বৎসর লইয়া এই জীবন"—এই হিসাবে "দিনচর্য্যা" ও "আশ্রম-চতুষ্টয়" অভিন্ন। যিনি প্রতি দিন সাধুভাবে, সুন্দর ভাবে যাপন করিবেন—তাঁহার কি ব্রহ্মচর্য্য, কি গার্হস্থ্য, কি বাণপ্রস্থ, কি সন্ন্যাস—সকল আশ্রমই সুন্দর, শোভন এবং ভগবন্মুখী হইবে। কিন্তু এই বিলাসিতার দিনে ভারতের কঠোর আদর্শ কি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবে?

২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিসন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত

বঙ্গদর্শন।

সাহিত্য-প্রচার

"জ্ঞানং সংপ্রাপ্য সংসারে যঃ পরেভ্যো ন যচ্ছতি।
জ্ঞানরূপী হরিস্তস্মৈ প্রসন্ন ইব নেক্ষতে ॥"

জ্ঞান অন্তরের বস্তু। ভাষা-গৃহীত প্রতিমূর্ত্তি জ্ঞান,—ভাষার সাহায্যেই জ্ঞান জ্ঞাতার নিকটে পরিস্ফুত ও স্পষ্টীভূত এবং অন্যের নিকটে প্রতীত হয়। কিন্তু ভাষা স্থানে এবং কালে সীমা-বদ্ধ। এই স্থান এবং কালের কঠোর নিগড় হইতে বিমুক্ত করিয়া ভাষাকে পৃথিবী-পরিচ্ছিন্ন স্থানে এবং অপরিচ্ছিন্ন কালে পরিব্যাপ্ত করিবার যে উপায়, তাহাই সাহিত্য। এই কথাই বালক-বোধ্য সহজ ভাষায় বলা হইয়াছে—

"কথায় মুখের শব্দ বাতাসে মিলায়,
লিখিয়া রাখিলে তাহা শতাব্দে না যায়।"

সাহিত্যের সৃষ্টি হইতেই প্রচারের চেষ্টা দেখা যাইতেছে। শ্রুতি যখন শ্রুতি-নিবদ্ধ ছিল, তখনও জন হইতে জনান্তরে উহা প্রচারিত হইয়াছে, বেদ-প্রচারের জন্যই ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের সৃষ্টি হইয়াছিল। শ্রুতি-যুগের পর লিপি-যুগ; তখন হাতে লিখিয়া গ্রন্থ প্রচার করিবার প্রথা ছিল; তখন এক এক খানি গ্রন্থ সহস্র মুদ্রায় বিক্রীত হইত, এক এক খানি গ্রন্থ নকল করিয়া সহস্র সহস্র লেখক পরিবার প্রতিপালন করিত। লিপি-যুগের পর বর্ত্তমান মুদ্রা-যুগ; এই যুগে মুদ্রা-যন্ত্রের প্রভাবে গ্রন্থ-বাহুল্য ঘটিয়াছে, প্রচারের অত্যধিক সুবিধাবশতঃ প্রয়োজন অপেক্ষা যোগান বাড়িয়া উঠিয়াছে, প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে কত জনের কত গ্রন্থাগার বিবিধ গ্রন্থে পরিশোভিত হইতেছে। এখন আর প্রচারের জন্য ভাবনা নাই, ভাবনা কেবল প্রচার-যোগ্য গ্রন্থের জন্য। তখন আর বাছাই যাচাই করিবার দরকার হইত না, গ্রন্থমাত্রেই তখন গ্রহণ-যোগ্য ছিল; এখন প্রচারের সুবিধার জন্য মালের এতই আমদানি হইতেছে যে, অনেক সময়ে খাঁটি মাল বাছিয়া লওয়া কঠিন হয়। কিন্তু ইহা সাহিত্য-প্রচারের ব্যবসায় মাত্র। প্রচারের প্রয়োজনই বিচার্য্য, ব্যবসায় বিচার্য্য নহে; প্রয়োজন উপলব্ধি হইবার অনেক পরে ব্যবসায়ের সৃষ্টি হয়, আবার ব্যবসায় মাটি হইয়া গেলেও প্রয়োজন থাকিতে পারে।

সর্ব্বাদৌ সাহিত্য-প্রচারের আকাঙ্ক্ষা কেন হইল, এই প্রবন্ধের শীর্ষস্থ শ্লোকটি পাঠ করিলেই তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। এ সংসারে জ্ঞান লাভ করিয়া যে ব্যক্তি পরকে তাহা দান না করে, জ্ঞান-স্বরূপ ভগবান তাহার প্রতি প্রসন্ন হন না। ইহাই সাহিত্য-প্রচারের

প্রথম প্রবর্ত্তক, বিশেষতঃ আর্য্যদেশে। যে সকল তত্ত্বপিপাসু মহর্ষি জ্ঞানানন্দে বিভোর হইয়া সাধন-সমুদ্রে ভাসিতেন, অশান্তির আশঙ্কায় লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া নির্ব্বিলাস সত্ত্ববিবর্দ্ধক তপোবনে জীবন যাপন করিতেন, লোকের নিন্দা-প্রশংসায় ভ্রুক্ষেপ-শূন্য হইয়া নিরাবিল নির্ভীক চিত্তে একমাত্র সত্যের সেবা এবং সত্যের প্রচারই পরম পুরুষার্থ মনে করিতেন, তাঁহারা কেবল জগতের মঙ্গল-সাধন-সংকল্পেই পরিচালিত হইতেন, নিজের কঠোর তপস্যা-লব্ধ জ্ঞানামৃত জন-সাধারণের কঠোর নীরস হৃদয়-ক্ষেত্রে সিঞ্চন করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থম্মন্য করিতেন। জ্ঞান-স্বরূপ ভগবান্ এই বিষয়টা এই ভাবে যে আমার নিকট প্রকাশ করিলেন, এজন্য আমি ধন্য, আর জন-সমাজে ইহার প্রচারই পরম পুণ্য, এই ভাবেই তাঁহারা ভাবিতেন, এই কথাই তাঁহারা বুঝিতেন।

পরম কারুণিক ঋষিদিগের এই পবিত্র জগন্মঙ্গলভাব হতভাগ্য আমাদিগের প্রকৃতি হইতে ত বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছেই, আমাদের আদর্শ হইতেও অনেক দূরে সরিয়া গিয়াছে। কিন্তু আশা করি, আমরা এখনও এত দূরে সরিয়া পড়ি নাই, জগদম্বা এখনও আমাদিগকে এতটা অধঃপাতিত করেন নাই যে, এখনও আমরা কল্পনা-চক্ষে তাহা না দেখিতে পারি, ধ্যান-যোগে সেই ভাব হৃদয়ে না আনিতে পারি। যজ্ঞ-ধূম-পূত, বিহঙ্গ-কূজনানন্দিত, শান্তি-রস-সমাপ্লুত সেই তপোবনে যখন তাঁহারা লেখনী হস্তে লইয়া গ্রন্থ লিখিতে বসিতেন, তখন নিন্দা-প্রশংসার চিন্তা তাঁহাদের হৃদয়ে স্থান পাইত না, অনুরাগ-বিরাগের কথা তাঁহাদের মনে উদিত হইত না, ক্ষতি-লাভের গণনা তাঁহাদের হিসাবেও আসিত না। যজ্ঞাগ্নিতে পবিত্র হব্য অর্পণ করিবার সময়ে যে পুণ্য-পবিত্রতা এবং সদ্ভাব-সম্পত্তি লইয়া তাঁহারা স্রুগ্‌দণ্ড ধারণ করিতেন, লেখনী-ধারণের সময়েও ঠিক সেই পুণ্য-পবিত্রতা এবং সদ্ভাব-সম্পত্তি তাঁহাদের হৃদয়কে স্পন্দিত করিত। তাঁহারা এক এক জন জীবন-ব্যাপী কঠোর তপস্যায় সিদ্ধি লাভ করিয়া এক একখানি গ্রন্থ লিখিতেন, তাই তাঁহাদের এক একখানি গ্রন্থ এক একটি জ্ঞান-ভাণ্ডার স্বরূপ আজিও বর্ত্তমান থাকিয়া মানবের জ্ঞান-পিপাসা পরিতৃপ্ত করিতেছে, সভ্যতার এই উৎকট উৎকর্ষের দিনেও মনীষীদিগের বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে। তাঁহাদের লেখার আরম্ভ, স্থিতি এবং পরিণাম, সমস্তই পবিত্রতাময়; তাঁহাদের চিন্তা-প্রবাহ পবিত্রভাবে উদ্‌বুদ্ধ হইয়া পবিত্রভাবেই প্রবাহিত হইত, এবং পাঠক ও শ্রোতার হৃদয়ে সেই পবিত্রভাবই ঢালিয়া দিত। সাহিত্যের সেই সুবর্ণ-যুগে গ্রন্থ বাছিয়া লইবার প্রয়োজন হইত না; যে যাহা পাঠ করিত, সে তাহাতেই যুগপৎ শিক্ষা এবং আনন্দ পাইত। তাঁহারা কেবল তৃপ্তিই দিতেন না; তাঁহারা পাঠককে চিন্তা করিতে শিক্ষা দিতেন, এবং চিন্তা করিবার অবসরও দিতেন। তাহার প্রমাণ, আজিও যিনি ঋষিদিগের গ্রন্থ নিয়মিতরূপে শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করেন, তিনি স্বভাবতঃ চিন্তাশীল হন; ধৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য এবং প্রগাঢ় বিচার-শক্তি

তাঁহার চরিত্রের অলঙ্কার হয়। তিনি গ্রন্থ-পাঠে ঔদারিকতা পরিহার করেন, ঝোল-অম্বল-নির্ব্বিচারে আকণ্ঠ উদর পূর্ণ করিয়া অজীর্ণ-রোগও জন্মান না।

অধুনা বাঙ্গালার সাহিত্য-রথীদিগের মধ্যে অনেকেই মহারথী, কেহ কেহ বা 'সাহিত্য-সম্রাট' বলিয়া পরিগণিত। এ সমস্তই তাঁহাদের সাহিত্য-সেবার যোগ্য পুরস্কার এবং নিতান্ত গৌরব, সন্দেহ নাই; কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কেহ কি সাহিত্য-ঋষি হইয়া বাঙ্গালী জাতিকে ধন্য করিতে পারেন না? তাঁহাদের স্বাভাবিক শক্তি এবং প্রতিভা লইয়া এই পথে চলিলে—আর্ষভাবে অনু-প্রাণিত হইয়া তাঁহারা সাহিত্যের জন্য লেখনী ধারণ করিলে বাঙ্গালী জাতি পবিত্র হইতে পারে, তাঁহারাও কৃতার্থ হইতে পারেন।

সরস্বতী আমাদের দেবতা, সুতরাং তাঁহার অর্চ্চনায় হিংসা-দ্বেষ-স্বার্থ-বিরহিত অনাবিল পবিত্রতার নিতান্ত প্রয়োজন। সরস্বতীর প্রকৃত অর্চ্চনা গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপে নহে, কিন্তু নির্ম্মল হৃদয়-জাত বিশুদ্ধ চিন্তার স্বভাব-সিদ্ধ অবাধ বিজৃম্ভনে। দেবতার চরণে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিতে গেলে ভক্তের হস্ত যেমন যুগপৎ ভয় এবং আনন্দভরে কাঁপিতে থাকে, যিনি সাহিত্যের জন্য লেখনী ধারণ করিলে সেইরূপে এবং সেইভাবে হস্ত-কম্প অনুভব করেন, সাহিত্য-সাম্রাজ্যে তিনিই ঋষি-পদবীতে আরোহণ করিবার যোগ্য। জানি না এমন কেহ আমাদের মধ্যে বর্ত্তমান আছেন কি না, কিন্তু থাকিলেও তিনি আমি-দুর্ভাগার চক্ষের অন্তরালে রহিয়াছেন।

সাহিত্য-প্রচারের প্রথম কল্পে যেমন জ্ঞান-বিস্তার উদ্দেশ্য ছিল, দ্বিতীয় কল্পে সেইরূপ যশোবিস্তার উদ্দেশ্য হইল—অনেকে "কবি-যশঃপ্রার্থী" হইয়া লেখনী ধারণ করিলেন। জগতের মঙ্গল-সাধনের আকাঙ্ক্ষা হইতে নিজের যশোবাসনা যতটা নিম্নে, জ্ঞান-গাম্ভীর্য্যে এবং গুণ-গরিমায় ঋষিদিগের গ্রন্থ হইতে এই সকল যশঃ-প্রার্থীর গ্রন্থও ততটা নিম্নে। যশ ঋষিদিগের কার্য্যের একটা গৌণফল মাত্র, কিন্তু এই গৌণফলই ইঁহাদিগের উদ্দেশ্য হইয়া উঠিল। ঋষিদিগের ছিল মঙ্গল-সাধন উদ্দেশ্য, জ্ঞান-বিস্তার তাহার উপায়; কবিদিগের হইল যশোলাভ উদ্দেশ্য, পাঠকের চিত্ত-রঞ্জন তাহার উপায়। এই হইতেই সেব্য-সেবকের আসন-বিনিময় হইয়া গেল; ঋষিদিগের সময়ে লেখক সেব্য এবং পাঠক সেবক ছিলেন, এখন হইলেন পাঠক সেব্য এবং লেখক সেবক, সুতরাং লেখকের আসন অনেক নিম্নে পড়িয়া গেল। ঋষিদিগের মধ্যে যাঁহারা কবি ছিলেন, তাহারা যশঃ-প্রার্থী হইয়া আদর্শকে অবনত করেন নাই, তাহারা দুর্ব্বল রোগীর জন্য তিক্ত ঔষধকে মধুর রসে সিক্ত করিয়াছিলেন মাত্র। রামায়ণ এবং মহাভারত একাধারে ইতিহাস, ধর্ম্ম-গ্রন্থ এবং কাব্য; কিন্তু ইহারা কাব্য হইলেও যশঃপ্রার্থীর কাব্য নহে।

কেহ কেহ বলেন, প্রকৃত কবি প্রকৃতির কৃত্রিমতা-বর্জ্জিত সরল সন্তান; তিনি নিন্দা-প্রশংসা-নিরপেক্ষ হইয়া কাব্য এবং সঙ্গীতচ্ছলে তত্ত্ব-কথাই বলিয়া থাকেন, কে

শুনিল বা না শুনিল,সে দিকে ভ্রুক্ষেপ করেন না। ইহা কবির উচ্চ আদর্শ বটে; কোন কোন কবি যে কোন কোন অতিবিরল মাহেন্দ্র মুহূর্ত্তে এই উচ্চগ্রামে আরোহণ করিতে পারেন, তাহাও স্বীকার করি; কিন্তু এ আদর্শ দৃশ্যমান বাস্তব হইতে অনেক দূরে, অনেক ঊর্দ্ধে। শুনিয়াছি, ঋষিকল্প পারস্য-কবি সাদি ভাগিনেয়ের বাড়ীতে থাইতেন, আর একটা গাছতলায় সারাদিন বসিয়া চিন্তা করিতেন এবং কবিতা লিথিতেন। তিনি মাটির খাপরায় চক দিয়া কবিতা লিথিয়া খাপরাগুলি ফেলিয়া দিতেন, আর তাহা ফিরিয়া দেখিতেন না। তাঁহার ভাগিনেয় থাপরা এবং চক যোগাইতেন, আর লেখাগুলি নকল করিয়া রাথিতেন, তাই সাদীর রসময়ী কবিতায় আজ পারস্যভাষী পাঠক এত পরিতৃপ্ত, এত মুগ্ধ। এই কবিতার আবির্ভাব যেমন আশ্চর্য্য, স্বাদও সেইরূপ অলৌকিক! শুনিয়াছি, একই মজলিসে উপবিষ্ট সংসারী তাঁহার কবিতা শুনিয়া হাসিয়া আটখান; তত্ত্বজ্ঞানী তাহা শুনিয়া কাঁদিয়া ব্যাকুল। এক সময়ে এক ব্যক্তি একখানি গ্রন্থ সম্মুখে লইয়া উপবিষ্ট ছিল; তাঁহার গণ্ডদ্বয় অশ্রু-জলে প্লাবিত, আবার সে মধ্যে মধ্যে হো হো করিয়া হাসিতেছে; দেখিয়া আর এক জন বলিলেন, "হয় এ ব্যক্তি পাগল হইয়াছে, না হয় সাদির কবিতা পড়িতেছে।" এ সব অতিরঞ্জিত গল্প হইতে পারে, কিন্তু ইহাতে প্রকৃত স্বভাব-কবি পদার্থটা যে কি, তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে।

অধিক দূরের কথা কেন, কিম্বদন্তীর আশ্রয় লইবার প্রয়োজন কি? আমরা চক্ষের সম্মুখে কি দেখিলাম। যশোহর ঝিকারগাছায় বিরাট জন-সমাগম; কলিকাতা হইতে আমাদের আদরের সুরেন্দ্র-নাথ প্রভৃতি জননায়কগণ আসিয়াছেন, জন-সাধারণকে দুইটা কথা বলিবেন, দেশে প্রজাশক্তির উদ্বোধন করিবেন। কিন্তু তাহাদের কথা বুঝে কে, আর শুনে কে? মহা গণ্ডগোল উপস্থিত, কাণের কাছে চিৎকার করিয়া কথা বলিলেও শ্রুতিগোচর হয় না। গণ্ডগোলে সমস্ত উদ্যোগ পণ্ড হইবার উপক্রম, এমন সময়ে এক মহাপুরুষ সেই বিশাল জন-সঙ্ঘের মধ্যে দাঁড়াইয়া সঙ্গীতের তান ছাড়িলেন, আর অমনি সেই কলরবাকুলিত পঞ্চাশ হাজার লোক তাঁহাকে ঘেরিয়া নিস্তব্ধ পুত্তলিকার ন্যায় দাঁড়াইয়া গেল! এই মহাপুরুষ কে? না-হিন্দু, না-মুসলমান, বিখ্যাত লালন ফকিরের শিষ্য, একজন দরবেশ, নাম পাগলা কানাই। পাগলা কানাই নিরক্ষর ছিলেন। তিনি পরের গান শিখিতেন না, নিজের গানও ফিরিয়া গাইতে পারিতেন না; কিন্তু যতক্ষণ ইচ্ছা পেটে হাত বুলাইতেন, আর মুখে চমৎকার ভাবব্যঞ্জক নূতন নূতন গান গাইয়া যাইতেন। পাগলা কানাই অতীত যুগের দুর্ভেদ্য অন্ধকারে জন্মগ্রহণ করেন নাই, তিনি বর্ত্তমান যুগের জ্ঞানবিজ্ঞান-কিরণো-দ্ভাসিত দিবালোকেই সশরীরে উপস্থিত ছিলেন। অন্য দেশে জন্মিলে এতদিনে তাঁহার প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্ত্তি তদ্দেশীয় শিল্প-কলার সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিত; কিন্তু আমরা তাঁহার কি আদর করিয়াছি, তাঁহার প্রতি

কি সম্মান প্রদর্শন করিতেছি? বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ অতীতের গ্রন্থাদি সংগ্রহ করিতেছেন, বর্ত্তমানের তৈলচিত্রাদি দ্বারা সারস্বত-মন্দির সাজাইতেছেন; কিন্তু এই দৈব-শক্তি-সম্পন্ন পাগলা কানাইর একটা গান, একটা ফটো, একটুকু জীবন-চরিত সংগ্রহ করিয়াছেন কি না প্রকাশ নাই। সুদূর ভবিষ্যতে এই মহাপুরুষের নাম উপকথায়ও বর্ত্তমান থাকার সম্ভাবনা দেখি না।

সাহিত্য-প্রচারের তৃতীয় কল্প ব্যক্তিগত মত-বিস্তার। ধর্ম্ম-প্রচার, সমাজ-সংস্কার, রাজনৈতিক চর্চ্চা, ঐতিহাসিক বিরোধ প্রভৃতি এই কল্পের অন্তর্নিবিষ্ট। ঝগড়া, বিরোধ, তর্ক-বিতর্ক, গালাগালি, সাক্ষ্য, প্রমাণ, নজির ইত্যাদি ইহার প্রণালী; সংযোগ-বিয়োগ, শত্রুতা-বন্ধুতা, সুখ-দুঃখ, আত্মশ্লাঘা-আত্মগ্লানি প্রভৃতি মিশ্র বিচিত্র অবস্থা ইহার ফল। এই সাহিত্যের আলোচনায় নানা বিষয় জানা যায়, নানা দিকে চক্ষু পড়ে, বিচার-বিতর্কের অভ্যাস এবং প্রবৃত্তি জন্মে, বুদ্ধি-বৃত্তি প্রাখর্য্য লাভ করে, এবং ভাষার কৌটিল্য ও কৌশল-জাল পাঠকের হৃদয়ে সংক্রামিত হয়। শিক্ষায় মানুষের সরলতা নষ্ট করে বলিয়া যে একটা প্রবাদ আছে, এই শ্রেণীর সাহিত্য তাহার জন্য অনেক পরিমাণে দায়ী। ফল ভাল হউক আর মন্দ হউক, সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় এরূপ সাহিত্যের প্রচার অনিবার্য্য, ইহা দূর করা সম্ভব হইলেও সমাজ তাহাতে রাজি হইতে পারিত বলিয়া বোধ হয় না।

সাহিত্য-প্রচারের শেষ কল্প—অতি নিকৃষ্ট উদ্দেশ্য—অর্থাগম। ইহাতে সাহিত্য একটা ব্যবসায়ে পরিণত হইয়াছে। অবশ্য ব্যবসায় সভ্যসমাজের একটা অপরিহার্য্য অঙ্গ, উন্নতির নিদান। ব্যবসায় যত দিন 'সাধু'র কার্য্য ছিল, যত দিন ইহা 'সাধু'-দিগের পবিত্র কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত ছিল, যত দিন ইহাতে অন্যায় প্রতিযোগিতা প্রবেশ করিবার অবসর পায় নাই, তত দিন ব্যবসায় অবিমিশ্র সাধুতার কার্য্যই ছিল, তত দিন ইহা দ্বারা সমাজের অবিমিশ্র মঙ্গলই সাধিত হইতেছিল। কিন্তু যে দিন হইতে ইহাতে অন্যায় প্রতিযোগিতা প্রবেশ করিয়াছে, সেই দিন হইতেই ইহাকে পাপে স্পর্শ করিয়াছে, সেই দিন হইতেই মিথ্যা বহুরূপী সাজিয়া ব্যবসায়কে কলুষিত করিতেছে। ত্রিকালদর্শী ঋষিগণ এই অন্যায় প্রতিযোগিতার বিষময় ফল অনুভব করিয়াই ব্যবসায়কে জাতিগত করিয়াছিলেন। এই ব্যবস্থায় আচণ্ডাল ব্রাহ্মণ সকলেরই একটা নির্দ্দিষ্ট জীবনোপায় ছিল, এক শ্রেণীর অন্য শ্রেণীর জীবিকার্জ্জনে পরিপন্থী হইবার কোন প্রয়োজন বা প্রলোভন ছিল না। এখন আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা সেই ব্যবস্থা পদ-দলিত করিতেছে, সেই সুন্দর শৃঙ্খলা ভাঙ্গিয়া দিয়াছে, তাই সমাজের নানা দিকে নানা বিশৃঙ্খলা দেখা যাইতেছে। এখন যে বলবান্, সুতরাং প্রতিযোগিতায় সমর্থ, সে একটার উপরে পাঁচটা ব্যবসায়ে হাত দিতেছে; আর যে অসমর্থ, সে নিজের কৌলিক ব্যবসায়ে পর্য্যন্ত নিরবকাশ হইয়া দারিদ্র্য-পেষণে অনাহারে মরিতেছে। হায়

হায়, দেখিতে দেখিতে কি হইল! একদিন হিন্দুর এই সুব্যবস্থার প্রতি জগতের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে, আমরাও ফিরিয়া তাহার দিকে তাকাইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিব; কিন্তু তখন আর সংশোধনের পথ থাকিবে না, তখন দেখিব, আমরা কুপুত্র হইয়া পৈত্রিক সৌভাগ্য ও শান্তি হইতে চিরদিনের তরে বঞ্চিত হইয়াছি!

যাহা হউক, পুস্তক-বিক্রেতাদিগের হাতে ব্যবসায়ের ভারটা চাপাইয়া গ্রন্থকারগণ যদি ব্যবসায় হইতে দূরে থাকিতে পারেন, তাহা হইলেও কতক রক্ষা। গ্রন্থ লইয়া হাজার লোক ব্যবসায় করুক, তাহাতে ক্ষতি-বৃদ্ধি কি? যাঁহার হাতে সাহিত্যের প্রাণ, সেই গ্রন্থকার যদি আর্থিক লাভ-লোকসান গণনায় দৃক্‌পাত না করিয়া, সাময়িক নিন্দা-প্রশংসার চিন্তাকে মনে স্থান না দিয়া, কেবল ন্যায়-সত্য-জ্ঞান-ধর্ম্ম-মঙ্গল-পবিত্রতার আদর্শকে ধ্রুবতারার ন্যায় মনশ্চক্ষের সম্মুখে রাখিয়া চলিতে থাকেন, তাহা হইলে ব্যবসায়ীর ব্যবসায়ে কি আসে যায়? বৃক্ষ অমৃত ফল প্রসব করে; তাহার কতটা দেব-পূজায় লাগে, কতটা আদাড়ে পড়িয়া পঁচে, কতটা দস্যু তস্করে লইয়া যায়, কতটা লইয়া শিয়াল-কুকুরে কামড়া-কামড়ি করে; কিন্তু তাহাতে বৃক্ষের মাহাত্ম্যের কি লাঘব হয়, আর তাহাতে ফলের আদরই বা কোথায় কমিয়া যায়? গ্রন্থকার ঠিক থাকিলে সাহিত্যের দুর্দ্দশা ঘটে না, কর্ণধার ঠিক থাকিলে নৌকা ডুবে না।

কিন্তু যে কেহ গ্রন্থ লিখিবেন, তিনিই যে এই আদর্শে চলিবেন, এমন আশা করিতে পারি না। যদি ইহা সম্ভব হইত, তাহা হইলে আমাদের জাতীয়-সাহিত্যে আজ এত আবর্জ্জনা জমিত না। আজ কাল অধিকাংশ পাঠকের রুচি কোন্ দিকে, সাধারণতঃ ইহারা কি পড়িতে এবং কি শুনিতে ভালবাসে, কোন্ বিষয়ে কি প্রণালীতে একখান বই লিখিলে দু'পয়সা আয় হইবে, ইত্যাকার চিন্তা যে গ্রন্থ লিখিবার পূর্ব্বে বহু গ্রন্থকারের হৃদয়কে আন্দোলিত করে, অর্থাৎ বহু গ্রন্থকার যে গ্রন্থ লিখিবার সময়ে কেবল ব্যবসায়-বুদ্ধি দ্বারাই পরিচালিত হন, আমাদের সাহিত্য-ভাণ্ডারেই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

সৌভাগ্যের বিষয়, মানবের সরল সহজ বুদ্ধি অনেক পরিমাণে তাহাকে রক্ষা করে। প্রবঞ্চনা, প্রতারণা, কদাদর্শ এবং কুরুচির সাময়িক প্রাবল্য যতই হউক না কেন, সমাজ তাহাতে চিরদিন ভুলিয়া থাকে না, প্রতিভার প্ররোচনায় একবার উদ্‌ভ্রান্ত হইলেও কিছুকাল পরে আবার চক্ষের ধাঁধা সরিয়া যায়, সমাজ গন্তব্য পথ দেখিতে পায়। কিন্তু এই কদাদর্শ এবং কুরুচি ক্ষুদ্র ক্ষণধ্বংসী হইলেও যে অফুরন্ত! ক্ষুদ্র দংশ-মশকের ন্যায় ইহারা সমাজের কর-মর্দ্দনে অনবরত বিনষ্ট হইতেছে, যে একবার দেখা দিতেছে, সে আর প্রায় দ্বিতীয়বার দেখা দিবার আয়ুঃ পাইতেছে না, তথাপি ইহাদের বিরাম নাই, স্রোতের ন্যায় অবিরাম ইহাদের উদ্ভব চলিতেছে। সত্য বটে, যেখানে জ্ঞানালোক বিকীর্ণ হইতেছে, যেখানে সমালোচনের প্রখর অগ্নি প্রজ্বালিত হইয়া থাকে, সে স্থানে ইহারা পাখা পুড়িয়া মরিবার ভয়ে

যায় না; কিন্তু আমাদের সমাজে অন্ধকারের ভাগই যে অধিক, জ্ঞানালোকের পরিসর যে নিতান্ত অল্প, সমালোচনার অগ্নি যে নাই বলিলেই হয়! অন্ধকারে দংশ-মশকের উৎপাত-নিবারণের জন্য মানব-বুদ্ধি মশারির উদ্ভাবন করিয়াছে, সমাজকে কুসাহিত্য হইতে বাঁচাইবার জন্য আমাদের সুধীগণ কি কোন একটা সুষ্ঠু উপায় উদ্ভাবন করিতে পারেন না?

সমাজ এইরূপ একটা কিছু চায়। জল আসিলে তাহার সঙ্গে মাছও আইসে, এই যেমন বিশ্বাস, শরীরে বার্দ্ধক্য আসিলে তাহার সঙ্গে সেইরূপ জ্ঞানও আইসে, এই বিশ্বাসে অনেক সময়ে যুবকেরা ভাল ভাল পুস্তকের একটা তালিকা চাহিয়া থাকে। বলা বাহুল্য, এ ক্ষুদ্র জ্ঞানে তাহা কুলায় না। যুবকেরা যেখানে নিতান্ত না-ছোড় হয়, সেখানে রামায়ণ এবং মহাভারতের অনুবাদ ছাড়া আর কোন গ্রন্থের নাম করা নিরাপদ মনে করি না। যদি আমার সেরূপ জ্ঞান থাকিত, তাহা হইলে বাছা বাছা পুস্তকের একটা তালিকা প্রস্তুত করিয়া তাহাদিগের হাতে দিতে পারিতাম। অনেক স্থলে বঙ্গ-সাহিত্যের কোন কোন মহারথীর নাম ও ঠিকানা দিয়া পত্র লিখিতে তাহাদিগকে উপদেশ দিয়াছি, এবং একাধিক তালিকায় যে সকল গ্রন্থের নাম থাকিবে, তাহাই সংগ্রহ করিতে বলিয়াছি। যুবকেরা ঐরূপ পত্র লিখিয়াছে কি না, অথবা তাহাদের প্রার্থনা সফল হইয়াছে কি না, তাহা জানিবার উপায় নাই।

যুবকেরা যে বৃদ্ধের নিকট সদ্‌গ্রন্থের তালিকা চায়, ইহা একটা শুভলক্ষণ। ইহাতে বুঝা যায়, তাহাদের মধ্যে প্রকৃত জ্ঞানের, মঙ্গলকর সাহিত্য-পাঠের পিপাসা জন্মিয়াছে; অথচ তাহারা নিজের বিচার-শক্তিকে বিশ্বাস করে না, বর্ত্তমান ব্যবসায়িক সমালোচনেও নির্ভর করিতে পারে না। কিন্তু এই স্পৃহনীয় অবস্থায় জ্ঞান-বৃদ্ধ সমাজ-নায়কগণ তাহাদের সহায়তার কি ব্যবস্থা করিতেছেন? অনেক স্থানে, অনেক সমৃদ্ধ পল্লীগ্রামে পর্য্যন্ত, আমাদের উৎসাহী যুবকদিগের যত্নে পুস্তকালয় স্থাপিত হইয়াছে ও হইতেছে। এই সকল পুস্তকালয় বা পাঠাগার যদি সুব্যবস্থিত হয়, যদি সংগৃহীত পুস্তকগুলি প্রকৃত জ্ঞান-দানে সমর্থ হয়, এবং পল্লীবাসী সকলে যথাযোগ্য ভাবে ঐ সকল গ্রন্থ পাঠ করিয়া যাহাতে উপকৃত হইতে পারে, এমন ব্যবস্থা যদি করা যায়, তাহা হইলে বিনা আড়ম্বরে এবং বিনা বাক্যব্যয়েও যে দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইতে পারে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু উৎসাহ ও অনুষ্ঠানের অনুরূপ সুব্যবস্থা যে সর্ব্বত্র আছে, এমন বোধ হয় না। পল্লীগ্রামে পাঠাগারের সংবাদ পাইলে আনন্দ অনুভব করি, সুযোগ পাইলে দুই একটা দেখিতেও যাই; কিন্তু যাহা দেখিতে পাই, তাহাতে সচরাচর সুব্যবস্থার ত্রুটিই লক্ষিত হইয়া থাকে। চাঁদা-দাতৃগণ স্বীকৃত চাঁদা দেন না; যাঁহারা তাস পাশা খেলিবার সময় পান, তাঁহারাও পুস্তক পড়িবার সময় পান না; কেহ বা পুস্তক পড়িতে লইয়া যাইয়া পড়েনও না, ফেরতও দেন না; কেহ পুস্তক ফেরত না দিয়াই বলেন দিয়া-

ছেন ; কেহ বা বলেন চুরি হইয়াছে। কেহ পুস্তকাধার হইতেই অধ্যক্ষকে না জানাইয়া পুস্তকখানি স্বায়ত্ত করিয়া ফেলেন, কেহ কেহ বা গোপনে গোপনে পুস্তকের পাতা কাটেন, ছবি সংগ্রহ করেন। পাঠাগারের অনুষ্ঠাতাদিগকে ইত্যাকার অসংখ্য অসুবিধা, অসংখ্য দুর্ব্যবহার সহ্য করিতে হয়। এত সহ্য করিয়াও যে সকল অনুষ্ঠাতার উৎসাহ থাকে, তাঁহারা অবশ্যই আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। ঔষধ যখন ধরিবে, সদ্‌গ্রন্থ পাঠের ফল যখন ফলিবে, পাঠাগারের প্রতি সাধারণের অনুরাগ যখন জন্মিবে, তখন এ সকল অসুবিধা, পাঠকের এরূপ দুর্নীতি ও দুর্ব্যবহার অবশ্যই থাকিবে না। কিন্তু সে শুভদিন কে আনিবে? সদ্‌গ্রন্থের পরিবর্ত্তে আবর্জ্জনা দিয়া গ্রন্থাগার পূর্ণ করিলে কি পড়িয়া, কি শিখিয়া, কাহার প্রভাবে লোকের দুর্নীতি দূর হইবে? অসদ্‌গ্রন্থ পড়া অপেক্ষা না পড়া শতগুণে ভাল। পূর্ব্বে না পড়িয়াও লোক নীতিমান হইত, এখন পড়িয়াও দুর্নীতিপরায়ণ হয়, ইহার কারণ কেবল অসদ্‌গ্রন্থ-পাঠ, এবং অসদ্‌গ্রন্থ-পাঠক-দিগের জীবন-গত দৃষ্টান্ত। পুস্তকে যাহা পড়া যায়, সমাজের মধ্যে অবস্থাপন্ন বা পদস্থ লোকের দৃষ্টান্তেও যদি তাহাই দেখা যায়, তবে অমার্জ্জিত-বুদ্ধি সাধারণ লোকে তাহার অনুসরণ করিবে না কেন? কোন্ শ্রেণীর পাঠক অধিক, সুতরাং কি প্রকার জ্ঞান, কি প্রকার নীতি সমাজে প্রসার লাভ করিতেছে, তাহা অবধারণ করিতে অধিক প্রয়াসের প্রয়োজন হইবে না, প্রত্যেক পাঠাগারের গ্রন্থ-বিলির খাতাখানি একবার দেখিলেই তাহা বেশ জানা যাইবে। দেহ-রক্ষার জন্য আহারের প্রয়োজন, কেবল ইহা জানিলেই যথেষ্ট হইল না; কিরূপ খাদ্য আহার করিলে দেহ রক্ষা হয়, তাহাও জানা চাই; নতুবা অখাদ্য খাইয়া প্রাণান্ত হওয়া বিচিত্র নহে।

এ সমস্যার একটা সুমীমাংসা হওয়া উচিত, এ অনিষ্ট-নিবারণের একটা সদুপায় উদ্‌ভাবন করা দেশের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সুধী-গণের কর্ত্তব্য। গবর্ণমেণ্ট সংপ্রতি এক শ্রেণীর গ্রন্থের বিরুদ্ধে দণ্ড উত্তোলন করিয়া-ছেন, রাজ-পুরুষগণ যে গ্রন্থকে রাজ-বিদ্বেষের উত্তেজক মনে করিতেছেন, তাঁহারা তাহারই প্রচার বন্ধ করিয়া দিতেছেন। এ ব্যাপারে গবর্ণমেণ্টের শক্তির সিদ্ধান্তই চরম সিদ্ধান্ত, সুতরাং ইহা প্রজা-সাধারণের সমালোচনার অতীত। সাহিত্যের দুর্দ্দশা দেখিয়া এক একবার মনে হয়, যদি দেশে সাহিত্য-প্রচারিত দুর্নীতির প্রতিকূলে পরিচালিত করিবার এইরূপ একটা অমোঘ শক্তি আমাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী জ্ঞান-বৃদ্ধ-দিগের হস্তে ন্যস্ত থাকিত, তাহা হইলে বুঝি এই শ্রেণীর অনিষ্ট নিবারিত হইতে পারিত। কিন্তু যাহা মনে হয়, তাহাই যে কর্ত্তব্য, এমন নহে। লেখামাত্রেরই গ্রন্থরূপে প্রচারিত হইবার অধিকার থাকিবে; কিন্তু জ্ঞান-পুণ্য-বিস্তার দ্বারা জগতের মঙ্গলসাধনে যাহার যত শক্তি থাকিবে, সে তত আদর পাইয়া দীর্ঘজীবী হইবে; আর যাহার সে শক্তি নাই, সে নিরবচ্ছিন্ন অনাদরে এবং অনাহারে মরিয়া যাইবে, এই প্রাকৃতিক নিয়মের সহায়তা-সম্পাদনের কোন সুবিবেচিত

সুচিন্তিত ব্যবস্থা সুধীগণ ইচ্ছা এবং যত্ন করিলে অবশ্যই উদ্ভাবন করিতে পারেন।

মুদ্রা-যন্ত্রের প্রসাদে কত ভাবে, কত প্রকারে এবং কত নামে কত পুস্তক বাহির হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। বিজ্ঞাপনের কৌশল এখন একটা বিস্তায় পরিণত হইয়া পড়িয়াছে। অনেকে কেবল বিজ্ঞাপন লেখায় সিদ্ধহস্ত, যেন মূর্ত্তিমান ব্যাস; আবার এই বিদ্যার যথেষ্ট আদরও আছে, কত বিজ্ঞাপন-ব্যবসায়ী কেবল এই বিস্তার খাতিরেই ইহাদিগকে রীতিমত বেতন দিয়া পুষিতেছে। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে অরুণের ন্যায়, নবাব-বাদসাহের পুরোগামী নকীবের ন্যায়, পরিক্রমণোৎসবের পুরোবর্ত্তী জয়ঢাকের ন্যায়, অথবা সে কালের যাত্রার দলে সং বাহির হইবার পূর্ব্বে খবর-দারের ন্যায় এই সকল বিজ্ঞাপন যখন নূতন নূতন পুস্তকের সংবাদ লইয়া বাহির হয়, তখন সেই বিজ্ঞাপনের ভাষার চমকে পুস্তক দেখিবার জন্য বৃদ্ধের হৃদয় পর্য্যন্ত নাচিয়া উঠে, তরুণ-বয়স্ক পাঠকের ত কথাই নাই। এই বিজ্ঞাপনের জোরে কত কদর্য্য বিষয়, কত অশ্লীল বিজ্ঞাপন, মাত্র নামে এবং আকারে পুস্তক সাজিয়া দেবী সরস্বতীর পবিত্র পূজা-মণ্ডপে নিঃশঙ্কভাবে নৃত্য করিতেছে, তাহাদিগকে নিষেধ করিবার, সারস্বত-কুঞ্জ হইতে তাহাদিগকে বাহির করিয়া দিবার কেহ নাই!

সমাজে অত্যাচার করিবার অধিকার কাহারও নাই; কিন্তু কেহ কোন অত্যাচার করিলে তাহা হইতে আত্ম-রক্ষা করিবার অধিকার সকলেরই আছে। কিন্তু অধিকার থাকিলেই শক্তি থাকিবে, এমন নহে। কুগ্রন্থের অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারেন সমাজের মধ্যে পনের আনা পাঠকেরই সে শক্তি নাই। যাঁহারা গ্রন্থের দুই চারি ছত্র পড়িলেই তাহার মূল্য বুঝিতে পারেন, এমন পাঠকের সংখ্যা অতি অল্প; যাহারা ছাপার অক্ষর দেখিলেই তাহাকে ব্রহ্মার বেদের ন্যায় অভ্রান্ত মনে করে, যাহারা গ্রন্থের আদ্যোপান্ত পড়িয়াও উপকার হইল, কি অপকার হইল বুঝিতে না পারে, পাঠক-সমাজে তাহাদিগের সংখ্যাই অধিক। এই সকল বিচার-বিমূঢ় পাঠককে কুগ্রন্থের অত্যাচার হইতে রক্ষা করা শক্তিমান পাঠকদিগের কর্ত্তব্য।

অত্যাচার বলিতেছি কেন? অবধান করুন। যাহাতে আমাকে আমার স্বার্থের বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে বাধা করে, তাহাকেই অত্যাচার বলিতে পারি। কুগ্রন্থ কি করে, এখন তাহাই দেখুন। কুগ্রন্থ পাঠকের অর্থ হরণ করে, ততোধিক মূল্যবান সময় হরণ করে, ততোধিক মূল্যবান আত্মোন্নতির সুযোগ হরণ করে। এখন ভাবিয়া দেখুন, কুগ্রন্থ সমাজের কি সর্ব্বনাশ করে। যেমন অনিত্য শরীরের সহায়তায় জ্ঞান-ধর্ম্মাদি নিত্যবস্তু লাভ করা যায়, সেইরূপ অকিঞ্চিৎ-কর অর্থের সহায়তায় সংসারে নানারূপ ইষ্ট লাভ করা যায়। এমন উপকারী, অথচ কঠোর শ্রমোপার্জ্জিত অর্থকে আমারই দ্বারা নিরর্থক ব্যয় করান কি অত্যাচার নহে? তাহার পরে সময়-হরণ। মানবের সমস্ত সুখ, সৌভাগ্য এবং উন্নতির মূল, সমস্ত সাধন-ভজন এবং সিদ্ধি-লাভের হেতু, এই সময়। সময়ই জীবন—সময় বৃথা গেলে জীবনই বৃথা গেল। যে আমাকে দিয়াই আমার জীবনটা বৃথা

ব্যয় করাইল, তাহার মত অত্যাচারী কে? সর্ব্বশেষে আত্মোন্নতির সুযোগ হরণ। মানবের মনুষ্যত্ব—মানবের দেবত্ব আত্মোন্নতি-সাধনে। যে আমার আত্মান্নতির সুযোগ হরণ করিয়া আমাকে আত্মাবনতির অবসর দিল, যে আমাকে উপল-খণ্ড সংগ্রহে ব্যাপৃত রাখিয়া আমার হীরকখণ্ড সংগ্রহ করিবার সুযোগটা নষ্ট করিল, তাহাকে অত্যাচারী না বলিয়া আর কাহাকে বলিব? এখন যে দিন আসিয়াছে একটি পয়সা উপার্জ্জনে লোকের কত কষ্ট! আর কষ্টোপার্জ্জিত অর্থের এই ব্যবহার? সমাজে এখন আমোদ-প্রমোদ নাই, গান-বাজনা নাই, জ্ঞান-ধর্ম্মের চর্চ্চা নাই; আছে কেবল জীবন-সংগ্রামের হুড়াহুড়ি পাড়াপাড়ি। পশু-সমাজ যেমন কেবল মাত্র আহার-অন্বেষণে ক্ষিপ্তপ্রায় থাকিয়া সারাটা জীবন অতিবাহিত করে, বর্ত্তমান মনুষ্য-সমাজও সেইরূপ অবিরাম কেবল আহারের জন্য, কেবল ধনের জন্য, কেবল যশোমানের জন্য ব্যাকুল থাকিয়া মানব-জন্ম সার্থক করিতেছে। সাহিত্যের আলোচনায় যাঁহাদের স্বাভাবিক আনন্দ নাই, অথবা সাহিত্যকে যাঁহারা জীবনের প্রধান অবলম্বন করেন নাই, এই অবিরাম ছুটাছুটির মধ্যে সাহিত্য-পাঠের জন্য দুই এক ঘণ্টা সময় বাহির করা যে কিরূপ কঠিন ব্যাপার, তাহা যাঁহারা করেন তাঁহারাই জানেন। এত যত্নের, এত কষ্টের এমন যে মূল্যবান সময় তাহার সার্থকতা কি এইরূপ গ্রন্থ-পাঠে? পয়সা দিয়া বই কিনিলাম, সময় ব্যয় করিয়া পড়িলাম, কিন্তু তাহাতে মনের তৃপ্তিদায়ক আত্মার উপজীব্য কিছুই পাইলাম না। ইহা কি ঘোর প্রবঞ্চনা, প্রতারণা, অত্যাচার নহে?

পুস্তক পড়িয়া ক্ষুব্ধ হইলাম, বিজ্ঞাপনের উপরে রাগ হইল, আবার সেই বিজ্ঞাপন খানি পড়িতে লাগিলাম। কিন্তু পড়িতে বসিয়া দেখি কি চমৎকার চাতুরি, কি অপূর্ব্ব কৌশল, পাঠক ধরিবার কি বিচিত্র বাক্য-জাল! একটি মিথ্যা কথা নাই, অথচ ফাঁকা কথার এমন বিচিত্র গাঁথুনি যে, তাহা পড়িলেই পুস্তকখানি পাইবার জন্য মনের মধ্যে একটা তাড়না উপস্থিত হয়।

কলিকাতায় বড় রাস্তার ধারে বিজ্ঞাপন দিয়া ধূর্ত্তলোকে সং দেখাইয়া অর্থ উপার্জ্জন করে। একবার দুইটা ধূর্ত্ত লোক নিঃস্ব হইয়া পয়সা উপার্জ্জনের একটা পরামর্শ করিল, কলিকাতার এক রাস্তার ধারে একখানি ঘর ভাড়া লইল, ঘরের সম্মুখে পরদা টাঙ্গাইল, পরদার উপরে বড় বড় চিত্রবিচিত্র অক্ষরে বিজ্ঞাপন দিল, এবং একজন পরদার বাহিরে দাঁড়াইয়া অনবরত ঘণ্টা নাড়িয়া "অপূর্ব্ব নৃত্য! এক পয়সা!" বলিয়া চিৎকার করিতে লাগিল। এত বড় জালে কি মাছ না পড়িয়া যায়? রাস্তার জন-স্রোতের মধ্য হইতে অনেকে সেই চিৎকারে আকৃষ্ট হইল, দলে দলে লোক একজন একজন করিয়া একটি পয়সা অগ্রিম দিয়া সেই পরদার ভিতরে প্রবেশ করিতে লাগিল। কিন্তু প্রবেশ করিয়া দেখিল কি, না একটা নগ্ন-প্রায় মনুষ্য সর্ব্বাঙ্গে চূণকালি মাখিয়া লাফাইতেছে! তখন দণ্ডবিধি জারি হইয়াছিল কি না জানি না। যাহারা সং দেখিল, তাহারা প্রতারিত হইয়া

ক্ষুব্ধচিত্তে ফিরিল, কিন্তু একজনও মুখ ফুটিয়া একটি কথা বলিল না। বলিবে কি? বিজ্ঞাপনের "অপূর্ব্ব নৃত্য" "এক পয়সা" ইহার একটি বর্ণও যে মিথ্যা নয় তাহা ত প্রত্যক্ষই হইল। দুঃখের বিষয় সাহিত্য-সাম্রাজ্যেও এইরূপ বিজ্ঞাপন প্রবেশাধিকার পাইতেছে, বিশুদ্ধ সাহিত্যের উপরেও নিরীহ ভদ্র পাঠকের বিরাগ জন্মাইতে সমর্থ হইতেছে।

তীব্র, কঠোর, নিরপেক্ষ সমালোচনা বর্ত্তমান থাকিলে সাহিত্যের এরূপ দুর্দ্দশা ঘটিত না। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে সেরূপ সমালোচনা যে একরূপ অসম্ভব, সাহিত্য-পরিষৎ প্রভৃতি বড় বড় সাহিত্য-সভার তুষ্ণীভাবই তাহার প্রমাণ।

তবে কি একটা উপায় হইবে না? আপনারা বর্ত্তমান থাকিতে সমাজের একটা অমঙ্গল, জাতীয় উন্নতির এত বড় একটা অন্তরায় ঘুচিবে না? আপনারা ইহার একটা ব্যবস্থা করুন, আবর্জ্জনা-রাশির মধ্য হইতে মণি-মুক্তা বাছিয়া দেখাইয়া, বিজন বিপথ নিবিড় সাহিত্যারণ্যে ভীত ও সন্দিগ্ধ পাঠককে অভ্রান্ত পথ প্রদর্শন করিয়া সামাজিক মঙ্গল বিধান করুন।

আপনাদের মধ্যে অনেকেই এ কার্য্যে সমর্থ, জানি; কিন্তু সমর্থ হইলেও চক্ষুলজ্জার খাতিরে অনেকেই যে এ কার্য্যে সম্মত হইবেন না, তাহাও বুঝি। জজ হইতে গেলেই কঠোর হইতে হয়. অনেক সময়েই হৃদয়ের প্রতিকূল হইলেও অপরাধীকে প্রাণদণ্ডের আদেশ শুনাইতে হয়। কিন্তু তাই বলিয়া কি জজের পদ কেহ গ্রহণ করে না? অথবা বিনা বিচারকে সমাজ কি নিরাপদে চলিতে পারে?

এ বিষয়ে আপনাদিগের নিকটে কোন প্রস্তাব করি, এমন সাহস আমার নাই। তবে আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যে একটা উপায় ফলপ্রদ হইতে পারে বলিয়া বোধ হইতেছে, আপনাদের অবগতির জন্য তাহা নিম্নে নিবেদন করিলাম।

আপনাদের মধ্যে যাঁহারা সমালোচনার প্রয়োজন অনুভব করেন, এবং সে জন্য কিছু পরিশ্রম স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছেন, তাঁহাদিগের দ্বারা একটি সমিতি গঠিত হউক। এই সমিতির উদ্দেশ্য থাকিবে, বাঙ্গালা পুস্তকগুলি রীতিমত পাঠ করিয়া তাহা হইতে সদ্-গ্রন্থগুলি নির্ব্বাচিত করা, এবং মধ্যে মধ্যে ঐ সকল নির্ব্বাচিত গ্রন্থের তালিকা সমিতির নামে ছাপাইয়া সর্ব্বত্র প্রচার করা। ইহাকেই আমি সাহিত্য-প্রচার মনে করি; মুদ্রাযন্ত্র যে ছাপার পুস্তক দিয়া দেশকে প্লাবিত করিতেছে, তাহাকে সাহিত্য-প্রচার বলা বিড়ম্বনা।

ইহাতে দ্বিবিধ উপকার হইবে। প্রথম, যাঁহারা নিজের জন্য, পারিবারিক ব্যবহারের জন্য, অথবা সাধারণ পাঠাগারের জন্য ভাল গ্রন্থের নাম খুজিয়া বেড়ান, তাঁহারা সমিতির তালিকা হইতে প্রচুর উপকার পাইবেন; তাঁহাদের পরিশ্রম, অর্থ এবং সময় অনেক বাঁচিয়া যাইবে, যাহা ব্যয় হইবে তাহাও সম্পূর্ণ সার্থক হইবে। দ্বিতীয়, সমিতি আপনার কর্ত্তব্য যথোচিত রূপে সম্পাদন করিলে দেশে তৎপ্রকাশিত তালিকার একটা প্রয়োজন ক্রমে অনুভূত হইবে, ক্রমে সর্ব্বত্র ইহার

আদর বাড়িবে, অবশেষে এমন এক সময় আসিতে পারে, যখন লোকে সাহিত্যের জন্য বিজ্ঞাপনের দিকে না চাহিয়া সমিতির তালিকার জন্য উৎসুক চিত্তে প্রতীক্ষা করিয়া রহিবে। যদি এমন দিন আইসে তাহা হইলে ব্যবসায়ী লেখকেরাও আর বিজ্ঞাপনের উপরে নির্ভর করিবেন না। তাঁহাদের অনেকেই সাহিত্য-ক্ষেত্র ছাড়িয়া ব্যবসায়ান্তর গ্রহণ করিবেন; আর যাঁহারা নাছোড় হইয়া সাহিত্যকেই ধরিয়া থাকিবেন, তাঁহারাও বিজ্ঞাপনের যত্নও পরিশ্রমটা লিখিত গ্রন্থেই প্রয়োগ করিবেন।

শুনিয়াছি, কোন কোন প্রসিদ্ধ পরীক্ষায় পরীক্ষক পরীক্ষার্থীর নাম জানিতে পারেন না, প্রশ্নের উত্তরে একটি সংখ্যা মাত্র থাকে, ফল-প্রকাশের সময়ে প্রত্যেক সংখ্যা-সূচিত নাম বাহির হয়। এ স্থলেও সে নিয়ম গ্রহণ করিলে মন্দ হইবে না। সমিতির সম্পাদক গ্রন্থের প্রথম পাতাগুলি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া কেবল মাত্র মূল গ্রন্থখানিই সমালোচকের হাতে দিবেন। ইহাতেও সমালোচক যদি গ্রন্থকারকে চিনিয়া ফেলেন, তবে তিনি উহা সমালোচন না করিয়া ফেরত দিবেন। সম্পাদক যাঁহাকে যে গ্রন্থ সমালোচনার জন্য দিবেন, তিনি তাহারই সমালোচন করিবেন, অন্য গ্রন্থের নহে। যদি কোন সমালোচক সম্পাদকের নিকট কোন গ্রন্থ চাহেন, তিনি উহা লইয়া পড়িতে পারেন, কিন্তু তাঁহার নিকট হইতে উহার সমালোচন গ্রাহ্য হইবে না।

এরূপ অনুষ্ঠানে অবশ্য কিছু ব্যয় আছে; কিন্তু সে জন্য চিন্তার কারণ দেখি না। দরিদ্র সাহিত্য-সেবকেরা যদি দেশের মঙ্গলের জন্য এতটা ত্যাগ স্বীকার করিতে প্রস্তুত হন, তবে আমাদের ধনবান সাহিত্য-পোষকেরা কি উদাসীন রহিবেন?

শ্রীশরচ্চন্দ্র চৌধুরী

বরেন্দ্র-ভ্রমণ।

চতুর্ভুজা।

দেওপাড়া হইতে উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইবা মাত্র, বরেন্দ্রের নগ্নমূর্ত্তি প্রকাশিত হইতে লাগিল। যতদূর দৃষ্টি-সঞ্চালনের সম্ভাবনা, ততদূর কেবল এক দৃশ্য;—নতোন্নত প্রান্তরভূমি, ক্বচিৎ "তালীবননীলা," কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই বৃক্ষলতা দেখিতে পাওয়া যায় না। যে তৃণদল ধরিত্রীর শ্যামল অঞ্চল বলিয়া কবিকল্পনায় সমুজ্জল হইয়া রহিয়াছে, এখানে তাহা শ্যামল নহে, পীতাভ। কেবল হেমন্ত কালেই বরেন্দ্র-প্রান্তর ভিন্নমূর্ত্তি ধারণ করে; তখন প্রান্তরভূমি শস্যসম্ভারে পুলকিত হইয়া উঠে; তাহার উপর দিয়া বায়ুহিল্লোল এক অনির্ব্বচনীয় শোভা তরঙ্গায়িত করিয়া রাখে। হেমন্তের শেষে তাহার সন্ধান লাভের উপায় নাই;—তখন কেবল সৌন্দর্য্যের স্থানে অটল

গাম্ভীর্য্য ;—যেন কোন মহাযোগী শ্মশান-ভূমিতে যোগাসন বিস্তৃত করিয়া দীর্ঘধ্যানে সমাধিমগ্ন,—ভয়ে সমীরণ পর্য্যন্ত সতর্ক পদ-বিক্ষেপে বিচরণ করিতে বাধ্য হইয়াছে!

প্রান্তরের অপর প্রান্তে একটি পুরাতন নগর বর্ত্তমান ছিল;—এখন তাহার নাম চব্বিশ-নগর। অধিবাসীর সংখ্যা দিন দিন হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে। কিন্তু শতবর্ষ পূর্ব্বেও গ্রামের অবস্থা এরূপ ছিল না। গ্রামখানির অধিকাংশ অধিবাসীই মুসলমান। তাহাদের মধ্যে একজন শতবর্ষ পূর্ব্বে একটি মস্‌জেদ নির্ম্মাণ করিয়াছিল। তাহা এখন ধ্বংসদশায় নিপতিত হইয়াছে। যে প্রস্তরলিপিতে নির্ম্মাণকাল লিখিত ছিল, তাহা গ্রামান্তরে নীত হইয়াছে। এখানে কতকাল হইতে মুসলমান অধিবাসীর প্রাধান্য সংস্থাপিত হইয়াছে। তাহার কিছু কিছু নিদর্শন এখনও বর্ত্তমান আছে। তাহা অতি পুরাতন মস্‌জেদ এবং দরগার ধ্বংসাবশেষ।

একটি দরগার ধ্বংশাবশেষের মধ্যে এক খণ্ড প্রস্তরনির্ম্মিত মন্দিরের দ্বারের ভগ্নাংশ দৃষ্টিপথে পতিত হইল। তাহাতে কারু-কার্য্যের আভাস প্রাপ্ত হওয়া গেল। তাহা হয় ত দরগার সোপানরূপে ব্যবহৃত হইত ; —সেই ভাবেই তাহা ভূগর্ভে অর্দ্ধ প্রোথিত হইয়া রহিয়াছে। গ্রামের মধ্যে এরূপ পুরাতন প্রাসাদশিলার অভাব নাই। গ্রামবাসিগণে একস্থানে ইষ্টকাহরণের আশায় ভূমি খনন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল ; ভূমিতল হইতে বৃহদায়তনের প্রস্তরস্তম্ভ বাহির হইয়া পড়িয়াছে। গ্রামবাসিগণের সঙ্গে পদব্রজে গ্রামখানি পরিভ্রমণ করিয়া, এই সকল পুরা-কীর্ত্তির নিদর্শন পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আসিতে, সাহিত্যিকগণ গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া উঠিলেন। অবশেষে গ্রামের শেষ প্রান্তে আসিয়া, সকলে সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিলেন,—বহু "বিতত তল্ল"—একটির পর একটি,—কত কিংবদন্তী অতল সলিলে চিরনিমগ্ন করিয়া রাখিয়াছে। কাহারও সোপানাবলী কাচপ্রলেপযুক্ত বিচিত্র ইষ্টকাবলীতে সুসজ্জিত ছিল ;—কাহারও তীরভূমিকে মন্দির-শোভা সুশোভিত করিয়া রাখিয়াছিল ;—এখন কেবল দেবমূর্ত্তির প্রস্তর-বেদিকা প্রান্তরভূমিতে পড়িয়া রহিয়াছে! একটি "তল্ল" সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ; তাহা এ অঞ্চলের সুবিখ্যাত "তপ্‌সহর" ;—যেমন বৃহৎ, সেইরূপ সুন্দর ;—যেন সরোবর নহে, একটি ক্ষুদ্র হ্রদ, তাহার স্বচ্ছ সলিলে সেকালের সৌভাগ্যগর্ব্ব এখনও প্রতিবিম্বিত করিয়া রাখিয়াছে!

"তপ্‌সহর ছাড়িয়া আবার প্রান্তরভূমি; তাহারই অপর প্রান্তে মাড়ইল গ্রামের সীমা। এখানকার মন্দিরস্তূপ এবং তাহার জনশ্রুতি বরেন্দ্রভূমিকে এখনও শত বিভীষিকায় পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। এখানে একটি প্রস্তর-মন্দিরে এক রক্তৃষাতুরা দেবীমূর্ত্তি নরবলি গ্রহণ করিতেন। মন্দির এখন ভূগর্ভে নিহিত হইয়া রহিয়াছে ;—যখন কিয়ৎ পরিমাণে দৃষ্টিগোচর হইত, তখন তাহার রুদ্ধদ্বার উদ্ঘাটিত করিতে গিয়া, কতলোকে জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছে! এখন কেহ আর তাহার স্থান অঙ্গুলি নির্দ্দেশেও দেখাইয়া দিতে সম্মত হয় না। সাহিত্যিকগণ যেন এখানে পদার্পণ না করেন,—আসিবার সময় অনেক অন্তঃপুর হইতে এরূপ অব্যক্ত

কাতরোক্তি নয়নকোণে সুব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছিল! কতক্ষণের পরে সকলে শ্মশানভূমিতে সমবেত হইলেন।

সত্য সত্যই তাহা অতীত গৌরবের শ্মশানভূমির ন্যায় প্রতিভাত হইল। নিকটে লোকালয়ের চিহ্নমাত্র বর্ত্তমান নাই। গ্রামের দক্ষিণে, লোকালয় হইতে বহুদূরে প্রান্তর-সীমায় কবে কি উদ্দেশ্যে কাহার যত্নে এই দেবায়তন নির্ম্মিত হইয়াছিল, কেহ তাহার সন্ধান প্রদান করিতে পারে না। চারিদিকে চারিটি "তল্ল",—তাহাতে এখনও রক্তপদ্ম বিকশিত হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু পূজার জন্য কেহ আর তাহাতে হস্তার্পণ করিতে সাহস প্রকাশ করে না। মধ্যস্থলে মন্দিরস্তূপ;—তাহার উপর এক মহামহীরুহ,—কত কাল দেবমন্দিরটি ভূগর্ভে আশ্রয় লাভ করিয়াছে, তাহারই সাক্ষ্য দান করিতেছে। চতুর্দ্দিকের সমতলভূমি এক সময়ে প্রাঙ্গণ রূপে ব্যবহৃত হইত। তাহা হইতে মন্দির-স্তূপের শীর্ষদেশ চল্লিশ ফিট উচ্চ,—সকল স্থানই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইষ্টকখণ্ডে আচ্ছন্ন। কেহ সেখানে পদার্পণ করে না,—ইষ্টক-আহরণের জন্যও সাহস প্রকাশ করে না। তাহার উপর দিয়া ঝড় বৃষ্টি বহিয়া যায়, শীত গ্রীষ্ম চলিয়া যায়,—এইরূপে শতাব্দীর পর শতাব্দী চলিয়া গিয়াছে, আরও কত শতাব্দী চলিয়া গেলেও স্থানটি চিহ্নহীন হইবে না।

এক সময়ে বরেন্দ্রক্ষেত্র তান্ত্রিক-সাধনার সিদ্ধিক্ষেত্র বলিয়া সুপরিচিত ছিল, কোন্ অতীত যুগে কিরূপ প্রয়োজনে তান্ত্রিকাচার জনসমাজের মধ্যে প্রভাববিস্তারে কৃতকার্য্য হইয়াছিল, এখন তাহার তথ্য-নির্ণয়ের জন্য সুধীসমাজে নানা তর্কবিতর্ক প্রচলিত হইয়াছে। চারিশত বৎসর পূর্ব্বে বরেন্দ্রদেশে তান্ত্রিকাচারের অবস্থা কিরূপ ছিল, প্রসঙ্গ-ক্রমে একখানি বৈষ্ণবগ্রন্থে তাহার কিছু কিছু বিবরণ লিখিত হইয়াছিল। তখন মুসলমান-শাসনের প্রবল প্রতাপ! কিন্তু দেশের মধ্যে তখনও দেশের লোকের স্বেচ্ছাচারের প্রবল প্রতাপ মন্দীভূত হয় নাই। তাহারা তখনও দেবীর তুষ্টি সম্পাদনের আশায় নরমুণ্ড উৎসর্গ করিয়া দিত।

"এ দেশের লোক দস্যুকর্ম্মে বিচক্ষণ।
না জানয়ে ধর্ম্ম কিবা কর্ম্ম বা কেমন॥
করয়ে কুক্রিয়া যত কে কহিতে পারে।
ছাগ-মেষ-মহিষ-শোণিত ঘরদ্বারে॥
কেহ কেহ মনুষ্যের কাটামুণ্ড লৈয়া।
খড়্গাকরে করয়ে নর্ত্তন মত্ত হৈয়া॥
সে সময়ে যদি কেহ সেই পথে যায়।
হইলেও বিপ্র তার হাতে না এড়ায়॥
সবে স্ত্রী-লম্পট জাতি-বিচার রহিত।
মদ্যমাংস বিনা না ভুঞ্জয়ে কদাচিত॥"
(নরহরি চক্রবর্ত্তি-বিরচিত নরোত্তম-বিলাসে সপ্তমোবিলাসঃ)

মাড়ইলের মন্দিরস্তূপের সঙ্গে হয় ত এই সকল কাহিনী জড়িত হইয়া, ইহাকে বিভীষিকার আধার করিয়া রাখিয়াছে। সে দেবীমূর্ত্তি এখনও বর্ত্তমান আছে। তাহা বীভৎস নহে, সুন্দর;—যেমন বৃহৎ, সেইরূপ সুন্দর;—বরেন্দ্র ভাস্কর্য্য-কৌশলের অনির্ব্বচনীয় নিদর্শন। মন্দিরস্তূপের উপর হইতে অদূরে একটি উচ্চভূমি দৃষ্টিপথে পতিত হইল। একটি সুগভীর তল্ল, তাহার পার্শ্বদেশে একটি উচ্চভূমি, তাহার

উপর নানা লতাগুল্ম জন্ম গ্রহণ করিয়া অধিকাংশ স্থান আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। তাহার পার্শ্বে একটি বৃক্ষ,—সেই বৃক্ষমূলে দেবী চতুর্ভুজা আশ্রয় লাভ করিয়াছেন। সাহিত্যিকগণ সেখানে আসিয়া শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া, বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন;—তল্ল হইতে সদ্য প্রস্ফুটিত কমলদল আহরণ করিয়া সসম্ভ্রমে, দেবীমূর্ত্তিকে বিভূষিত করিয়া দিলেন। এক সময়ে যে দেবীমূর্ত্তি দেউলের মধ্যে, ধূপদীপের মধ্যে, আলো ও ছায়ার মধ্যে, বসন-ভূষণের চাক্‌চিক্যের মধ্যে, অর্চ্চনা-আরাধনার অনির্ব্বচনীয় মোহমন্ত্রের মধ্যে, দূর হইতে দৃষ্টিপথে নিপতিত হইয়া, ভক্তিসিন্ধু উদ্বেলিত করিত, এখন তাহাকে মুক্ত সমীরণের উন্মুক্ত ক্ষেত্রে নিকট হইতে নিকটে দেখিয়া, তাহার রচনা-কৌশলের সকল সৌন্দর্য্য সম্পূর্ণরূপে উপভোগ করিবার সম্ভাবনা নাই। তথাপি এই শ্রীমূর্ত্তি সে বনভূমিকে উজ্জ্বল কারয়া রাখিয়াছিল।

এই দেবীমূর্ত্তির অনতিদূরে—উচ্চভূমির অপর প্রান্তে—দুইখানি দ্বার-ফলকের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া গেল। একখানি বিচিত্র কারুকার্য্যে খচিত,—কৃষ্ণ-প্রস্তরের স্তরে স্তরে নানা নারীমূর্ত্তির অনিন্দ্যসুন্দর লাস্যবিকাশে উদ্ভাসিত। তখন সমগ্র মন্দির-দ্বারটির অনুসন্ধান আরব্ধ হইল। সকল স্থান তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়াও, আর কোন ভগ্নাবশেষের সন্ধান লাভ করা গেল না। পরে জানিতে পারা গেল,—মন্দির-দ্বারের উপরের অংশটি এবং দেবীপদতললগ্ন বেদিকাপ্রস্তরটি এক ব্রাহ্মণ কুড়াইয়া লইয়া পূজা করিতেন। তাঁহার বাস্তুভূমির উপর এখন এক মুসলমান বাস করিতেছে। প্রস্তর খণ্ডগুলি সেখানেই পড়িয়া রহিয়াছে।

গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ইষ্টকাচ্ছাদিত পুরাতন রাজপথের চিহ্ন দেখিয়া বুঝিতে পারা গেল,—মাড়ইল চিরদিন এরূপ গণ্ডগ্রাম বলিয়া পরিচিত ছিল না। ইহা যে এক সময়ে একটি নগর রূপে পরিচিত ছিল, তাহার নানা নিদর্শন প্রকাশিত হইতে লাগিল। স্থানে স্থানে কারুকার্য্য-খচিত ইষ্টকশোভা পুরাতন প্রাসাদাবলীর রচনা-রীতির পরিচয় দান করিতে লাগিল। কিন্তু সাহিত্যিকগণ তখন সেই মন্দিরদ্বারের সন্ধান লাভের আগ্রহে কোন স্থানে অধিক কাল হরণ না করিয়া, মুসলমান কৃষকের কুটিরদ্বারে উপনীত হইলেন। দ্বারফলক দেখিবামাত্র সকলে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। দ্বারফলকের মধ্যস্থলে একটি শিবলিঙ্গ; উভয় পার্শ্বে কত লতাপাতার সাজসজ্জা, তাহার মধ্যে হংসমূর্ত্তি; তাহার উপরে যে স্তরবিন্যাসে চিত্রবিভাগ সূচিত হইয়াছে, তাহাতে আকাশপথ,—সেই আকাশপথে বিদ্যাধর বিদ্যাধরী পূজার অর্ঘ্য লইয়া ভেরী বাদন করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছে!

কৃষক তাহার কুটিরদ্বারে সাহিত্যিকগণের এরূপ অচিন্তিতপূর্ব্ব সমবেশ দেখিয়া ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া, আতিথ্যের জন্য একখানি গোযানের উপর আসন নির্দ্দেশ করিয়া তাম্রকূট হস্তে অভ্যর্থনা করিল। এত সরল, এত স্বাভাবিক, এত আন্তরিক, এত মর্ম্মস্পর্শী,—সে অভ্যর্থনা প্রত্যাখাত হইবার সম্ভাবনা

ছিল না। সাহিত্যিকগণ সগৌরবে গোযানের আবরণহীন বংশবিতানের উপর উপবেশন করিয়া, কথা-কৌতুকে মগ্ন হইয়া পড়িলেন। কৃষক এদেশের অধিবাসী ছিল না;—কিরূপে কাহার অত্যাচারে, কত দিন হইল, স্ত্রীপুত্র লইয়া এদেশে আসিয়া, আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে, তাহার কাহিনী আদ্যন্ত বিবৃত করিয়া সমবেদনার উদ্রেক করিয়া দিল। বাঙ্গালার কঙ্কালাবশিষ্ট কৃষকদেহের মধ্যেও হৃদয় আছে। বেলা অধিক হইয়া উঠিয়াছে, ভট্টনিবাস এখনও অনেক দূরে,—সুতরাং কৃষক তাহার কুটিরে আতিথ্য গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানাইতে কুণ্ঠিত হইল না। ভট্টগৃহে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করায় অন্যত্র আতিথ্য গ্রহণের স্বাধীনতা ছিল না, তাহা বুঝিবামাত্র কৃষক পথ দেখাইয়া দিল;—সকলে আবার গজারোহণ করিয়া, সম্মুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

গ্রামের বাহিরে আসিলে, অতিদূরে ছায়া-চিত্রের ন্যায় ভট্টভবন দেখিতে পাওয়া গেল। তখন মধ্যাহ্ন গগনের প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডকিরণ বরেন্দ্রপ্রান্তরের উপর অনল বর্ষণ করিতে-ছিল। ধৈর্য্যের শেষ উপস্থিত না হইলে, দীর্ঘপথের শেষ দেখিতে পাওয়া যায়,—যথাকালে সাহিত্যিকগণ তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হইলেন। শীতল জলে স্নান করিয়া স্নানের পর বরেন্দ্রভূমির পুরাপ্রচলিত শিষ্টাচার রক্ষার্থ জলযোগ করিয়া, সাহিত্যিকগণ মধ্যাহ্নের আহারের জন্য প্রস্তুত হইতে কিছুমাত্র বিলম্ব করিলেন না। ভট্টবংশধর যথাশাস্ত্র অতিথি-সৎকার করিবার আশায়, একটি মেষ বলি দিয়া, পূজা সাঙ্গ করিয়াছিলেন; সুতরাং প্রসাদলাভে বিলম্ব ছিল। সেই অবসরে পুরাতন পুথির অনুসন্ধান আরব্ধ হইল। জীর্ণবস্ত্রখণ্ডে আবদ্ধ তন্ত্রসার, কুলার্ণব, তাহার সঙ্গে বিষ্ণুশর্ম্মার হিতোপদেশ, মারণ উচাটন বশীকরণের মন্ত্রসংগ্রহ, স্মরণ করাইয়া দিল;—"অশেষবিৎ পাণিনিরেকসূত্রে শ্বানং যুবানং মঘবানমাহ"।

আর না আর না করিয়াও, মধ্যাহ্ন-ভোজন বড় গুরুভোজন হইল,—মেষমাংস সম্পৃক্ত আতপতণ্ডুলের পলান্ন, তাহার সঙ্গে বিবিধ ব্যঞ্জন, দধি ক্ষীর মিষ্টান্ন এবং পায়স-পিষ্টকের আক্রমণে সাহিত্যরথিগণ রণে ভঙ্গ দিবার উপক্রম করিয়া তুলিলেন। আহারের পর বিশ্রাম করিতে করিতে স্থির হইল,—একটি হস্তী লইয়া একদল নিকটস্থ অন্যান্য গ্রামে ভৌগোলিক তত্ত্বানুসন্ধানে বহির্গত হইবেন; অন্যান্য সকলে ভট্টবংশধরকে সঙ্গে লইয়া, পুনরায় মাড়ইল পরিদর্শনে নিযুক্ত হইবেন।

পুনরায় মাড়ইলে উপনীত হইয়া এক বৃক্ষতলে বহুসংখ্যক শ্রীমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া গেল। একটি শ্রীমূর্ত্তি বৃক্ষকোটরে এরূপ ভাবে বৃক্ষ-ত্বকে জড়িত হইয়া পড়িয়াছে যে বৃক্ষমূলের কিয়দংশ ছেদন না করিলে, তাহাকে বাহির করিবার উপায় নাই। কেহ ছেদন করিতে সম্মত হইল না, উপযুক্ত অস্ত্র দান করিতে কাতরতা প্রকাশিত করিল। তখন এই গুরুভার একজন সাহিত্যিকের উপর সমর্পণ করিয়া অন্যান্য সকলে চতুর্ভুজার নিকটে উপনীত হইলেন। বেলা আর অধিক নাই; অনেক অনুসন্ধানের পর গোযান সংগৃহীত হইয়াছে, এখন চতুর্ভুজাকে

ও মন্দিরদ্বারের প্রস্তরফলকগুলিকে তাহাতে বোঝাই করিতে পারিলেই, প্রত্যাবর্ত্তন আরব্ধ হইতে পারে। কিন্তু এই কার্য্য কিছুতেই সহজ হইল না;—সাহিত্যিকগণকে কোদালি ধরিতে হইল, কাঁধ লাগাইতে হইল, গোযানে বোঝাই করিবার সকল শারীরিক ক্লেশই অম্লানবদনে বহন করিতে হইল। বৃক্ষমূল ছেদন করিয়া শ্রীমূর্ত্তিগুলি সঙ্গে লইয়া, অপর সাহিত্যিক সন্ধ্যার সময়ে গো-যানের নিকট উপনীত হইলেন; কিন্তু যাঁহারা ভৌগোলিক তত্ত্বানুসন্ধানে বাহির হইয়াছিলেন তাঁহাদের আর সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া গেল না। অন্ধকার ঘনীভূত হইতে লাগিল, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া আসিতে লাগিল, পিপাসা প্রবল হইয়া পড়িল; সুতরাং শিবিরাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করাই স্থির হইল। ভট্ট বিদায় গ্রহণ করিলেন।

শিবিরে প্রত্যাবৃত্ত হইতে রাত্রি অধিক হইয়া গেল। কিন্তু তথনও ভৌগোলিক তত্ত্বানুসন্ধানকারিগণ প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই। দুই এক বিন্দু বৃষ্টি পতিত হইতেছে, চারিদিক মেঘাচ্ছন্ন হইয়া আসিয়াছে, নিকটে ব্যাঘ্রের উপদ্রবের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে,—দুর্ব্বৃত্ত মধ্যাহ্নে গোহত্যা করিয়াছে,—তাহার ভয়ে রজনীতে শিবির রক্ষার ব্যবস্থা হইতেছে। এমন সময়ে সেই হস্তীটি ফিরিয়া আসিল। বন্ধুগণের কুশল জিজ্ঞাসা করিতে গিয়া জানিতে পারা গেল, —তাঁহারা পথ হারাইয়া বনের মধ্যে পদব্রজে আসিতে আসিতে ব্যাঘ্রের কবলে নিপতিত হইবার আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছিল। সকলেরই হস্তপদে ক্ষতচিহ্ন,—তাহার সহিত ব্যাঘ্রের সম্বন্ধ থাকিলেও ব্যাঘ্রনখরের সম্বন্ধ ছিল না। তাড়াতাড়ি গজপৃষ্ঠে আরোহণ করিবার সময়ে কণ্টকবনে হস্তপদ ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিল। বরফজলে ক্ষতস্থান ধৌত করিয়া, সকলে মিলিয়া নৈশভোজন-ব্যাপারে নিবিষ্ট হইলেন। আবার মাংসসংপৃক্ত পলান্ন,—কিন্তু কেহ আর তাহাতে কিছুমাত্র প্রতিবাদ করিলেন না। চতুর্ভুজার আশীর্ব্বাদে রজনী নির্ব্বিঘ্নে অতিবাহিত হইয়া গেল।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

বিলাতের কথা।

বসন্তের বাহার।

আমাদের বসন্ত কবিকল্পনায় যেরূপ ফুটিয়াছে, বর্ত্তমানে প্রকৃতি-অঙ্গে তেমন ভাবে প্রায়ই ফুটিতে দেখা যায় না। শীত ফুরাইতে না ফুরাইতে, তড়িৎ গতিতে নিদাঘ আসিয়া উপস্থিত হয়। সুতরাং বসন্তের প্রকৃত বাহার আমরা প্রত্যক্ষ করিবার অবসর পাই না। এক দিন, বোধ হয়, এমন ছিল না। এক দিন হিন্দু বসন্ত কল্পনা করে নাই, প্রত্যক্ষ করিত। তখন হয় ত সে ভারতের অন্য ভূভাগ অধিকার করিয়া ছিল। অথবা তখন হয় ত, দেশে কাল-প্রভাবে এমন করিয়া ঋতুবিপর্য্যয় ঘটে

নাই। তখন হয় ত, তারন্তেও তুষারপাত হইত, নিদারুণ শীতে প্রকৃতির অঙ্গ কঠোর, শুষ্ক, জীবনের চিহ্নহীন হইয়া পড়িত। সে সময়ে শীতাবসানে বসন্তের বাহারও ফুটিয়া উঠিত। এখানে, আমাদের দেশের মত ঋতুবৈচিত্র্য নাই। এ দেশে চার ঋতুতে বর্ষ শেষ হয়; আমাদের ছয় ঋতুতে বর্ষ গণনা হইত, এখনো হইয়া থাকে। ফলে, এখন আমাদের ঋতু ছয়টা না তিনটা, তাহা বিচার্য্য বটে। এখানে শীত যেমন দুরন্ত, বসন্ত তেমনি সুন্দর, অদ্ভুত, অলৌকিক। এখানে শীতে বহিঃপ্রকৃতি যেন মরিয়া যায়, মাঠে ঘাস থাকে না, গাছে পাতা থাকে না, কোথাও প্রকৃতি-অঙ্গে জীবনের চিহ্ন লক্ষিত হয় না। তার পর, যখন বসন্তের হাওয়া মৃদু মৃদু বহিতে আরম্ভ করে, তখন সহসা এই মৃত প্রকৃতি যেন নবজীবন পাইয়া শিহরিয়া উঠে। এ জন্য বসন্ত এখানে সত্য সত্যই যেন মৃতসঞ্জীবন মন্ত্র মুখে লইয়া উপস্থিত হয়। এই দু' মাস পূর্ব্বে—এই লণ্ডন সহরের গাছপালাগুলো শুকনো কাঠ হইয়া যেন দাঁড়াইয়াছিল। এরা যে আবার হরিত-কোমল পত্রপল্লবে সুশোভিত হইয়া উঠিবে, তখন এ কল্পনাও যেন অসম্ভব বোধ হইত। আর আজ সহসা এই মৃত প্রকৃতি জীবন-রসে ভরিয়া উঠিয়াছে। মরা ডালে পল্লব, মরা গাছে ফুল, শুষ্ক বনে হরিত-আচ্ছাদন ছাইয়া গিয়াছে। এমন জীবনের সম্ভার, এমন লতাপাতার বাহার, এমন বরণ-কীরণ-গন্ধের ছড়াছড়ি আমাদের বসন্তে দেখা যায় নাই। আর, যেমন প্রকৃতি তেমনি মানুষেও যেন বসন্ত-সমাগমে এক নূতন আভা ফুটিয়া উঠে। ঋতুতে ঋতুতে এ দেশে প্রকৃতি যেমন বেশপরিবর্ত্তন করে, সাহেব-মেমেরাও তেমনি করিয়া থাকেন। বিশেষ মেম-সাহেবেরা, শীতের গাঢ় কৃষ্ণ পরিহার করিয়া, বসন্তে বিচিত্র বর্ণের পরিধেয়ে আপনাদিগের বরবপু সুসজ্জিত করিয়া থাকেন। বিলাতী বরবর্ণিনীগণ এ সময়ে যেন নিজেরাও বসন্তের বরণ-কীরণ-গন্ধ সম্ভার লইয়া বসন্তের মলয়-হিল্লোলের ন্যায় মুগ্ধ মানবের ক্ষুব্ধ চিত্তকে দোলাইয়া, নাচাইয়া, লুটিয়া, ফেলিয়া চারিদিকে বিলাসের তরঙ্গ তুলিয়া বনে উপবনে, পথে ঘাটে, নাচে ও নাট্যে, জলে স্থলে, সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে আরম্ভ করেন।

বসন্তের বাহার ও শোকের আঁধার

রাজশোকে এবারে এ বসন্ত লীলায় কতকটা ব্যাঘাত জন্মিয়াছে। এ দেশে শোকের রং কালো। শোকার্ত্তের চিহ্ন কৃষ্ণ পোষাক। প্রথম অবস্থায় গাঢ় কৃষ্ণতা শোকের নিদর্শন। তখন হ্যাট্-কোট-বুট, টুপি-ওড়না-গাউন, স্ত্রীপুরুষ সকলেরই পরিচ্ছদ নিরবচ্ছিন্ন কালো হওয়া চাই। যত দিন যায়, ততই এই কৃষ্ণত্বের গাঢ়তাও হ্রাস হইতে থাকে। পুরা-শোকে—ইংরেজিতে ইহাকে full mourning কহে,—সকলই নিরবচ্ছিন্ন কালো হওয়া আবশ্যক। তার পর আর্দ্ধেক শোকে বা হাফমোর্ণিংএ (half mourning) কালোর সঙ্গে সাদা মিশিতে পারে। ক্রমে শোকচিহ্ন সরু কালো ফিতায় পর্য্যন্ত পরিণত হয়। সাদায় কালোয় রাষ্ট্রীয়-নীতিতে যতই বেশি কালো হউক না কেন,

পরিচ্ছদ-নীতিতে বড়ই মিলিয়া মিশিয়া যায়। কালোর উপরে সাদার বা সাদার উপরে কালোর বাহার বড় ফুটিয়া উঠে। ক্রমে এখানেও শোকের তীব্রতা যত কমিতেছে, ততই কৃষ্ণত্বের সঙ্গে নানা উজ্জ্বলতার বর্ণের সমাবেশ হইতেছে। এ বর্ণবৈচিত্র্য বসন্তের বাহার নষ্ট না করিয়া বরং বাড়াইয়াই দিয়াছে। সচরাচর বাসন্তী বিহারের মধ্যে একটা অসংযত ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। শীতে মানুষ ও উদ্ভিদ সকলেই এ দেশে কতকটা সংকুচিত হইয়া, কতকটা মুশড়িয়া যায়। বসন্তে এ সংকোচভাব নষ্ট করিয়া ফেলে। সকলেই যেন আপনাকে ছড়াইবার জন্য, বাড়াইবার জন্য, জগতের জীবন-স্রোতে ভাসাইবার জন্য, বিশ্বের রসে ডুবাইবার জন্য, স্বল্পবিস্তর ব্যাকুল হইয়া পড়ে। এ বাসনা-তরঙ্গে সংযমের অবসর অল্প। বসন্ত সর্ব্বদাই একটু অসংযত। পোষাক-পরিচ্ছদে, আমোদ-প্রমোদে, ক্রীড়াকৌতুকে সকল বিষয়েই বসন্ত একটা অসংযত ভাব আনিয়া দেয়। কিন্তু রাজ-শোকে এ বৎসর বিলাতে বাসন্তী লীলায় কতকটা সংযম আনিয়া দিয়াছে। কৃষ্ণ বর্ণের সমাবেশে বাসন্তী পরিচ্ছদের বর্ণবৈচিত্র্য সংযত হইয়াছে। রাজ-দরবারের অশৌচে নৃত্যগীতের কোলাহল অনেকটা কমিয়াছে, এ জন্য অভিজাত-সমাজেও কতকটা সংযম আসিয়া পড়িয়াছে। আর শ্রেষ্ঠ জনেরা যাহা করেন, জনসাধারণে সর্ব্বদাই তার অনুকরণ করিয়া চলে; এ জন্য জনমণ্ডলী মধ্যেও যেন কতকটা সংযম আসিয়াছে। সংবাদপত্রে প্রকাশ যে, এ বৎসর ঘোড়দৌড়ের মেলায় যে সংযতভাব দেখা গিয়াছে, এমন কখনো পূর্ব্বে দেখা যায় নাই।

আমোদ-প্রমোদ।

কিন্তু সমাজের আমোদ-প্রমোদের কোনই হ্রাস লক্ষিত হয় নাই। ফলতঃ এ দেশের লোক আমোদ-প্রমোদ নহিলে থাকিতে পারে না। প্রাতে নয়টা হইতে সন্ধ্যা ছয়টা পর্য্যন্ত এরা প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়া ধনোপার্জ্জন করে, তার পর একবার নিশ্চিন্ত হইয়া, মনটাকে হাত পা ছড়াইয়া খানিকটা বিশ্রাম করিবার অবসর না দিলে চলে না। শরীরের পক্ষে যেমন অন্ন-পান, মনের পক্ষে এদের সেইরূপ নাচ-তামাসা। এই লণ্ডন সহরে, পাড়ায় পাড়ায় নাট্যশালা ও রঙ্গালয়। আর এই সকল প্রতিদিন লোকে পরিপূর্ণ হইয়া থাকে। অনেক রঙ্গালয়ে ও প্রায় প্রত্যেক নাচঘরে বা মিউজিক হলে (Music hall) দিনে দুবার করিয়া অভিনয়, নাচ-গান হয়। অপরাহ্ণ দুই ঘটিকায় একবার, রাত্র ৮৷৷০ টায় আর একবার। আর দু'বারই ঘরগুলো লোকে লোকারণ্য হইয়া যায়। মনে হয় যেন এই লণ্ডন সহরের স্ত্রী-পুরুষ কেহ অন্ততঃ সপ্তাহে একবার করিয়া নাচ-ঘরে বা রঙ্গালয়ে না গিয়া থাকিতে পারে না। এ সকল আমোদ-প্রমোদের ক্ষেত্রে প্রতিদিন যে জনতা হয়, এ দেশে যত গীর্জ্জা আছে তার সকলে মিলিয়াও এত লোকের সমাগম হয় না। এই লণ্ডন সহরে শতকরা আশীজন কখনো কোন গীর্জ্জায় যায় না, শতকরা সত্তরজন বোধ হয় সপ্তাহে একবার করিয়া

কোন না কোন নাচ ঘরে বা রঙ্গালয়ে না গিয়া থাকিতে পারে না।

বিলাতী নাট্যকলা।

আর এই সকল আমোদ-প্রমোদের ক্ষেত্রে জনমণ্ডলীর ভিতরকার চরিত্রের যে প্রমাণ পাওয়া যায় আর কোথাও তাহা পাইবার সম্ভাবনা নাই। নাট্যকলা এক সময়ে ইংরেজ-সমাজে বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল সন্দেহ নাই। নাট্যকলার এরূপ উৎকর্ষতা ব্যতীত এ দেশে শেক্ষপীয়রের সম্ভব কখনো সম্ভব হইত না। কিন্তু শেক্ষপীয়রের নাটক এখন শেক্ষপীয়র উৎসব উপলক্ষে কেবল একবার, একটি মাত্র রঙ্গালয়ে অভিনীত হইয়া থাকে। পরলোকগত স্যার হেনরি আইভিং শেক্ষপীয়রের অভিনয়ে বিশেষ কৃতিত্ব লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার হ্যামলেট অপূর্ব্ব সৃষ্টি ছিল। আইভিংয়ের পরে বিয়রভসৃষ্টি কতকটা শেক্ষপীয়রের অভিনয়ে কৃতিত্ব লাভ করিয়াছেন, সত্য; কিন্তু লোকে আর শেক্ষপীয়রের নাটকের অভিনয় পচ্ছন্দ করে না। শেক্ষপীয়রের শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি যে গুলি তাহাতে আর এখন জনসাধারণের তৃপ্তি হয় না। হ্যামলেট্ বা টেম্পেষ্ট বা ম্যাকবেথ বা জুলিয়াস্ সীজার এ সকলের রস আস্বাদন করিতে হইলে যে অভিনিবেশের প্রয়োজন, এখন ইংরাজ আর সেরূপ ভাবে নিবিষ্ট চিত্তে কোনো বিষয়ের অনুসন্ধান করিতে পারে না। বিলাসিতা যে পরিমাণে বাড়িয়া যায় সে পরিমাণে গভীরতর রস আস্বাদনে লোকের শক্তি-সামর্থ্যও বোধ হয় হ্রাস হইতে থাকে। একেবারে বর্ব্বরতাতে যেমন নাট্যকলার শ্রীবৃদ্ধি অসম্ভব, একান্ত ভোগ-বিলাসেও সেইরূপ। দুই-ই মানুষকে একান্ত-ভাবে ইন্দ্রিয়াধীন করে। বিশেষতঃ কলার অনুশীলনে মানুষের অতীন্দ্রিয় বৃত্তি সকলকে সজাগ করিয়া তুলিতে হয়, নতুবা কোন প্রকারের রসাস্বাদনেই মানবের অধিকার ও সামর্থ্য জন্মে না। বর্ত্তমানে ভোগবিলাসিতার তাড়নায় সভ্যসমাজে অতীন্দ্রিয় বৃত্তির অনুশীলনের আত্যন্তিক ব্যাঘাত জন্মিয়াছে। এ জন্য ক্রমে এত অভূতপূর্ব্ব বর্ব্বরতা আসিয়া এই গর্ব্বিত মদোন্মত্ত সভ্যতাকে অলক্ষিতে আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। বিলাতী নাট্যালয় সকলে ইহার বিলক্ষণ প্রমাণ পাওয়া যায়। সর্ব্বত্রই কেবল অদ্ভুত রসের ছড়াছড়ি। বিলাতী রঙ্গমঞ্চে এখন বিয়োগান্ত নাটকের অভিনয় আর দেখা যায় না। ইংরেজ, শোককে সম্ভোগ করিবার যে উচ্চ অধিকার, তাহা হইতে একেবারে বঞ্চিত হইয়াছে। এখন মেলোড্রামারই (melo-drama) এখানে ছড়াছড়ি, আর যা কিছু অভিনীত হউক না কেন তাতেই রংএর ছড়াছড়ি ও হাত-পা নাড়ার হুড়াহুড়ি চাই। না হইলে দর্শক-মণ্ডলীর মন উঠে না। পান্টোমাইম লোকে ভালবাসে, নাচঘর সকলে কেবলই মাতা-মাতি হুড়াহুড়ির পালা পড়িয়াছে। ইহার শেষ কোথায় হইবে কে জানে? ইংরেজ এখন একটা নতুন কিছু দেখিবার জন্য ব্যগ্র।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

ভবিষ্যতের ভাবনা।

বঙ্গবিভাগের পর আমরা এ কয় বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছি, যাহাতে বিভাগ রহিত হইয়া আবার ছিন্ন অংশদ্বয় যুক্ত হয়। কেননা এই বিভাগের সুযোগে যদি একদিন বাঙ্গালী জাতিও দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়, তবে এই উদীয়মান জাতির সর্ব্বনাশ হইবে। জাতীয় জীবনের যে সমস্ত শক্তিকেন্দ্র আছে, জনসংখ্যা তাহার মধ্যে একটি সর্ব্বপ্রধান। আরও একটি বিপদ আছে। ভাই যখন ভাইকে পরিত্যাগ করে, অতি সামান্য ঘরাও কথায় যদিও এই দুর্ঘটনা ঘটে, কিন্তু বিবাদ এমন গুরুতর আকার ধারণ করে যে পরস্পরের মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয়। পাড়া প্রতিবাসীর সঙ্গে যে সাধারণ সৌহার্দ্দ্য তাহাও উভয়ের মধ্যে থাকে না। এই জন্য ইংরাজীতে একটা প্রবাদ বাক্য আছে, সমুদ্রের উভয় তীরবর্ত্তিগণের মধ্যে যে দূরত্ব তাহা অপেক্ষা নদীতীরবর্ত্তীদিগের দূরত্ব বেশী (Brooks make wider difference than Oceans). সেই জন্যই দেখা যায় বাঙ্গালীর সঙ্গে উড়িয়া, আসামী বা বেহারীর যেমন রেষারেষি, দূরবর্ত্তী অন্যান্য ভারতবাসীর সঙ্গে তেমন নহে। সেই জন্যই বঙ্গবিভাগে আমাদের এত আশঙ্কা। ইহা উপলব্ধি করিয়া আমরা জাগ্রত এবং সতর্ক আছি, ঘুমাইয়া না পড়িলে আর কোন ভাবনা নাই। কিন্তু একটি বিষয় সর্ব্বাগ্রে বিবেচ্য, তাহা এই—সমগ্র বাঙ্গালী জাতির একতার মূলসূত্র কি? সামাজিক রীতিনীতি, বিধি-ব্যবস্থা, আচার-ব্যবহার, যাহাদিগকে সাধারণতঃ জাতীয় একতার মূল উপাদান বলিয়া সকল জাতির মধ্যে ধরা যায়, তাহাই কি বাঙ্গালীর সম্বন্ধেও খাটিবে? কিয়ৎপরিমাণে খাটিবে সন্দেহ নাই, কিন্তু সম্পূর্ণ খাটিবে না। বাঙ্গালী দুইটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধর্ম্মে বিভক্ত। একদেশবাসী বলিয়া আচার-ব্যবহার কিয়ৎপরিমাণে এক হইলেও ধর্ম্মের বিভিন্নতা এ বিষয়ে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ প্রভেদ উৎপন্ন করিয়াছে। সুতরাং ইহার উপর আমরা বিশেষ জোর দিতে পারি না। দূরত্ব এবং নিকটবর্ত্তিতাও এখানে মাণদণ্ডরূপে ব্যবহার করা চলিবে না। সিলেটবাসী, কলিকাতাবাসী বা মানভূমবাসী বাঙ্গালী; কিন্তু বালেশ্বরবাসী ও মেদিনীপুরবাসী এক জাতি নহে। অন্ততঃ একজাতি বলিয়া গণনা করা হয় না। এখনই কথা উঠিয়াছে যে, পূর্ব্ববঙ্গবাসীদিগের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গবাসীদিগের কোনও বিষয়েই মিল নাই—আচার-ব্যবহারে মিল নাই, পরস্পরের মধ্যে বিবাহাদি আদান-প্রদান নাই। সুতরাং একত্র থাকিবার আন্দোলনটার যে কোনও মূলগত ভিত্তি আছে তাহা নহে। ইহা কেবল ভারতবাসীর রক্ষণশীল প্রকৃতির একটা উচ্ছ্বাস মাত্র, তাহাদের পরিবর্ত্তন বিরোধিতার একটা বহিঃপ্রকাশ। উড়িয়াকে যদি বাঙ্গালী হইতে একটি স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া মনে করা যায়, তাহা হইলে উপরোক্ত আপত্তি খণ্ডন করা দায় হইবে। কেননা, বাঙ্গালীর

সহিত মোটের উপর উড়িয়ার যে পার্থক্য, পশ্চিমবঙ্গ হইতে পূর্ব্ববঙ্গের পার্থক্য বোধ হয় তাহা অপেক্ষা কম নহে। সুতরাং ভাষার কথা ছাড়িয়া দিলে, উভয়কে দুই দেশে পরিণত করা অতি কষ্টকর ব্যাপার নহে। পূর্ব্ব ও পশ্চিমবঙ্গ বিভিন্ন শাসনের অধীন হইয়া পড়িয়াছে। আমরা আন্দোলন না থামাইতে পারি, কিন্তু উভয়কে একত্র করা আমাদের ইচ্ছাধীন নহে। এখন যদিও শাসনপ্রণালী একই আছে, কিন্তু চিরদিন এক থাকিবে না। অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান দিন দিন যেমন ভিন্ন হইবে, জাতীয় প্রকৃতিও সেই পরিমাণে ভিন্ন হইবে, ইচ্ছা না করিলেও হইবে। এই তো স্ত্রী-শিক্ষা বিষয়ে পূর্ব্ববঙ্গের গবর্ণমেণ্টের কিঞ্চিৎ বেশী আগ্রহ দেখা যাইতেছে। অন্য দিকে আবার পশ্চিমবঙ্গে শাসনের কঠোরতা কিঞ্চিৎ কম। তার পর যদি ইউনিভার্সিটি ও হাইকোর্ট নূতন করা হয় তাহা হইলে বাহিরের দিক্ হইতে একতা-বন্ধন একরূপ ছিন্ন হইয়া যাইবে। চিন্তাস্রোত পর্য্যন্ত বদ্‌লাইয়া যাইবে। বাহির হইতেও যে সময়ে সময়ে মনোমালিন্যের কারণ ঘটিবে না তাহা নহে। রাজনৈতিক দিক্ হইতে দিন দিন বিভিন্নতা বাড়িবেই, আমাদের জাতিভেদ ও রক্ষণশীলতা কোনও প্রকার সামাজিক ঘন নিবিষ্টতার অন্তরায় চিরদিনই রহিয়াছে। তাহা যে আজ আমরা হঠাৎ পরিত্যাগ করিয়া রাজনৈতিক রোগের ভেষজস্বরূপ ব্যবহার করিতে পারিব, তাহা নহে। বরং দিন দিন মেলামেশার ব্যাঘাতই উৎপন্ন হইবে, দুই বঙ্গ একত্র থাকিবার সময় কাজকর্ম্মোপলক্ষে পরস্পরের মধ্যে যাতায়াত ছিল, সুতরাং আদান-প্রদানের একটা সুবিধা ছিল। দিন দিন সেটাও যে কমিয়া যাইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। পূর্ব্ববঙ্গবাসী পাইলে কেন আর পশ্চিমবঙ্গবাসীকে নূতনবঙ্গে চাকুরী দেওয়া হইবে? সুতরাং ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক দিন দিন উভয়ের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য বৃদ্ধিই পাইবে। এরূপ স্থলে বাঙ্গালীকে একজাতি রাখিবার উপায় কি? এমনও যাহা সমগ্র বাঙ্গালীকে বাঙ্গালী করিয়া রাখিয়াছে, সকল বিভিন্নতার মধ্যে ঐক্যবন্ধনের রজ্জু-স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে, সেই নিরাশ্রয়ের আশ্রয়কে আরও শক্ত করিয়া ধরিতে হইবে। কে শ্রীহট্ট, শান্তিপুর, পুরুলিয়াকে একসূত্রে গাঁথিয়া বাঙ্গালী-হারে পরিণত করিয়াছে? তিনি আর কেহ নহেন, আমাদের বরণীয়া মাতৃভাষা। যে ভাষা অর্দ্ধশতাব্দীর মধ্যে ভারতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিয়াছেন, এ বিপদে তাঁহার শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া বাঙ্গালীর আর অন্য গতি নাই। অসতর্ক হইলে আমরা নিজেরাই আমাদের বক্ষ বিদীর্ণ করিব। কেন, এখন তাহাই নির্দ্দেশ করিতেছি।

ভাষার দুই দিক্, সংস্কৃত ও প্রাকৃত। কথোপকথনের ভাষা ও লিখনের ভাষা সর্ব্বত্র বিভিন্ন। ইহা কেবল বাঙ্গালীর বিশেষত্ব নহে। একই দেশে একই জাতির মধ্যে কথোপকথনের ভাষা নানা হইতে পারে, কিন্তু লিখিবার ভাষা এক। এই লিখিবার ভাষা একাধিক হইলে জাতীয় একতা বেশী দিন টিকিতে পারে না। বহু

প্রাকৃতের মধ্যে এক সংস্কৃতই কেবল সকলকে এক করিয়া রাখিয়াছে। লণ্ডনের কথিত ভাষা, পার্থের কথিত ভাষা নহে, কিন্তু ইংরাজীর সংস্কৃত এক। শরীরের বিভিন্ন অংশ যেমন একমাত্র জীবনীশক্তির দ্বারা পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত, কিন্তু বিভিন্ন অংশের জীবনী·শক্তি যদি ভিন্ন ভিন্ন হয়, তবে যেমন অংশ সকলের একতা বিনষ্ট হইয়া যায় তেমনি বিভিন্ন প্রাকৃত সকল এক বন্ধন-রজ্জুতে আবদ্ধ হইয়া ভাষার একত্ব বিধান করিতেছে। যে প্রাকৃত ভাষাতেই আমরা কথা কহি না কেন, লিখিবার সময় সকলেরই আশ্রয় এক সংস্কৃত। শ্রীহট্টের প্রাকৃত ভাষা রাঁচিতে সম্পূর্ণ অবোধ্য হইলেও শ্রীহট্ট ও রাঁচিতে লিখিবার ভাষা একই। এই সংস্কৃত ভাষাই একতার ভিত্তি। লিখিয়া যখন মনের ভাব প্রকাশ করিলাম, তখন সকলের নিকট সুবোধ্য। সংস্কৃতের একতা রক্ষাই জাতীয় একতা-রক্ষার একমাত্র উপায়। এই একতা হারাইলে জাতীয় একতা রক্ষা অসম্ভব। আজ যে আসামী ও উড়িয়া বাঙ্গালী হইতে স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছে, তাহার কারণ এই যে তাঁহাদের লিখিবার ভাষা ভিন্ন হইয়া গিয়াছে। নতুবা উড়িয়া ভাষার মধ্যে এমন কিছু নাই, যাহাতে উহা বাঙ্গালার একটা প্রাদেশিক ভাষা বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। শ্রীহট্টের কথোপকথনের ভাষা লিপিবদ্ধ করিলে তাহার সঙ্গে বাঙ্গালার সংস্কৃতের যে বিভিন্নতা দেখা যাইবে, উড়িয়া ভাষার বিভিন্নতা তাহা অপেক্ষা কিছুতেই অধিক দাঁড়াইবে না। অথচ শ্রীহট্টবাসী বাঙ্গালী, কিন্তু উড়িয়া বাঙ্গালী নহেন। অর্থাৎ একটি প্রাকৃতকে সংস্কৃত করিয়া জাতির এক অংশ বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। এক শাসনাধীনে থাকিয়াও সে বিচ্ছিন্নতা দূর করিবার উপায় মিলিতেছে না। ভাষার বন্ধন ছিন্ন হইলে আর কিছুতেই জাতীয় একতা রক্ষা করা যায় না। এই ভাষাগত বিপত্তিতেই বাঙ্গালী উড়িয়া ও আসামীকে হারাইয়া শক্তিহীন হইয়াছে। সুতরাং এ বিষয়ে আমাদিগকে বিশেষ সতর্ক হইতে হইবে। বাঙ্গালাভাষায় সংস্কৃতের বিশুদ্ধতা সর্ব্বপ্রযত্নে রক্ষা করিতে হইবে। কিন্তু সে দিকে সম্প্রতি কিঞ্চিৎ শিথিলতা দৃষ্ট হইতেছে। সেই জন্য আমরা ভীত হইয়াছি। পশ্চিমবঙ্গে এক নূতন সংস্কৃতের আবির্ভাব হইয়াছে। অন্ততঃ কেহ কেহ পশ্চিমবঙ্গের কোন কোন প্রাদেশিক ভাষায় লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এরূপ চলিলে বঙ্গবিভাগে আর বেশী বিলম্ব হইবে না। কলিকাতাবাসী যদি তাঁহার কথোপকথনের ভাষায় লেখেন, তবে ঢাকাবাসী না লিখিবেন কেন? এই রূপে বাঙ্গালার দুইটি সংস্কৃতের সূচনা হইবে। দুইটি সংস্কৃত হওয়াও যা, আর জাতীয় একতা বিনষ্ট হওয়াও তা,—একই কথা। কলিকাতার ভাষাকে সংস্কৃত করিলে যেমন তাহার চতুষ্পার্শ্বে কতকগুলি প্রাকৃত মিলিবে, পূর্ব্ববঙ্গের সংস্কৃতের চারিদিকেও প্রাকৃতের অভাব হইবে না। সুতরাং বাঙ্গালী ধীরে ধীরে দুই জাতিতে বিভক্ত হইয়া যাইবে। তার পর লিপি-পার্থক্য ঘটিলে তো ষোল কলা পূর্ণ। আমাদিগকে এখনই বিশেষ সাবধান হইতে

হইবে। যে পথে সামান্য একটু আশঙ্কার কারণ সে পথে আমরা যাইতেই পারি না। কেননা, ভাষার একতাই আমাদের এক মাত্র সম্বল। এখন চারিদিকে বাঙ্গালা ভাষার নানা প্রকার পরিবর্ত্তনের যেরূপ প্রস্তাব সকল উপস্থিত হইতেছে তাহাতে ভয় হয়, এক বঙ্গ তাহা গ্রহণ করিলেও অপর বঙ্গ যদি তাহা গ্রহণ না করে তবে বিপদ ঘনীভূত হইয়া উঠিবে। দুই বঙ্গের শাসন-বিভাগ যখন ভিন্ন, তখন উভয়ের পক্ষে সব বিষয়ে একযোগে চলা সম্ভব হইবে না। পূর্ব্ববঙ্গের কর্ত্তারা যদি বলেন, রোমান অক্ষর প্রচলিত হউক, তাহা হইলে বালকেরা দুই রকম অক্ষর পরিচয়ের পরিশ্রম হইতে রক্ষা পাইবে এবং আমাদের মন্ত্রমুগ্ধ নেতৃ-বর্গের অনেকে সে প্রস্তাবে অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া সায় দিবেন। ইতিপূর্ব্বে একবার ঢাকায় স্বতন্ত্র ভাষা প্রচলনের দেশীয় অনু-মোদনকারী মিলিতে দেরী হয় নাই। আবার সেই প্রস্তাবটিকে পুনর্জ্জীবিত করিলে কি উত্তর দিবার আছে? কলি-কাতার যদি কলিকাতার ভাষায় পুস্তক লেখা অন্যায় না হয়, ঢাকায় কেন অন্যায় হইবে? এখন তো সোনায় সোহাগা। ঢাকা এখন স্বতন্ত্র রাজ্যের রাজধানী। ঢাকার ভাষায় বই লিখিয়া দেবনাগর অক্ষরে ছাপাইতে আরম্ভ করিলে কে ঠেকাইয়া রাখিবে। দেবনাগর অক্ষর প্রচলনের জন্যও তো সভা-সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। এক বঙ্গ তাহা গ্রহণ করিয়া অন্য তাহা গ্রহণ না করিলেই তো কার্য্যসিদ্ধি। এইরূপ যখন চারিদিকে বিপদের সম্ভাবনা রহিয়াছে, তখন কোনও প্রাদেশিক ভাষাকে সংস্কৃতের আসনে তুলিয়া দেওয়া নিতান্তই অবিবেচনার কাজ হইতেছে বলিয়া মনে হয়। একদিকে শাসন-বিভাগ ইতিপূর্ব্বেই সংঘটিত হইয়াছে, একতাসূত্রের এক তার ছিঁড়িয়াছে। আচার-ব্যবহার, ভাবভঙ্গী, শিক্ষাসভ্যতার, সর্ব্বোপরি কথোপকথনের ভাষার এক দুরতিক্রমণীয় বিভিন্নতা তো চলিয়াই আসিয়াছে, শাসন বিভক্ত হওয়ায় আরও বাড়িবে। এরূপ স্থলে জাতীয় একতার মেরুদণ্ড স্বরূপ লিখিত ভাষার মধ্যে ভেদ উৎপন্ন করা বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের বিনাশ-পথ উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া নয় কি? আমরা বলিতে বাধ্য, যাঁহারা প্রাদেশিক ভাষাকে বাঙ্গালায় সংস্কৃতের পদবীতে উন্নতি করিয়া দিতেছেন, তাঁহারা নিজেদের অজ্ঞাতসারে খাল কাটিয়া কুমীর ডাকিয়া আনিতেছেন। কোনও বিশেষ প্রাকৃত ভাষা যতই শ্রুতিমধুর হউক না কেন, কথোপকথনের উপযোগিতা তাহার মধ্যে যতই বেশি থাকুক না, ভাষার একতা বিনাশ না করিয়া সে সংস্কৃতের আসন গ্রহণ করিতে পারে না। বাঙ্গালীর পক্ষে ভাষার একতার বিনাশ আর জাতীয় একতার বিনাশ একই কথা। সুধীগণ কথাটা একবার প্রণিধান করেন, এই প্রার্থনা।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

বিষবৃক্ষ।

বিষবৃক্ষে কবি যেরূপ অমৃত ক্ষারণ করিয়াছেন, এরূপ বুঝি আর কুত্রাপি নহে। জীবনের অতি সাধারণ সাধারণ ঘটনা লইয়া, কবি যে ইন্দ্রজাল সৃজন করিয়াছেন, তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে, চক্ষের জলে ভাসিতে হয়, কিন্তু সে মায়াপুরী পরিত্যাগ করিয়া যাইতে ইচ্ছা হয় না। তাঁহার পূর্ব্ব-রচিত কাব্যত্রয়ের কবিত্ব প্রধানতঃ কল্পনার উদ্ভাবনশক্তিমূলক, সে শক্তি বৈদেশিক ও জাতীয় সাহিত্যের অধ্যয়ন হইতে সহায়তা লাভ করিয়াছিল। বিষবৃক্ষে উদ্ভাবনশক্তির অভাব লক্ষিত না হইলেও, মূলে ইহার কবিত্ব ভিন্ন প্রকৃতির, এবং এই কাব্যেই কবির আখ্যায়িকা-কাব্য-প্রণয়ন-প্রতিভা প্রথম স্বীয় শক্তিতে প্রতিভাত দেখিতে পাওয়া যায়। ইষ্টকাদি অকিঞ্চিৎকর নির্ম্মাণসামগ্রীর সমাবেশে স্থপতি সুরম্য হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করে। সুনিপুণ শিল্পী বাঙ্গালী জীবনের অতি-প্রাত্যহিক ঘটনাবলী সজ্জিত করিয়া, নিজের অসাধারণ প্রতিভাবলে, যে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের অবতারণ করিয়াছেন, জাতীয় সাহিত্য-ভাণ্ডারে তাহা চিরদিন অমূল্য রত্নরূপে দীপ্তি প্রদান করিবে। যে কল্পনা, প্রান্তরপার্শ্বে, প্রকৃতি-বিপ্লবমধ্যে, শৈলেশ্বর-মন্দিরে, কুমার জগৎসিংহ ও গড়মন্দারণের অধীশ্বরপুত্রী তিলোত্তমার প্রথম সন্দর্শন ঘটাইয়াছিল; যাহা হইতে বিমলার সাহস ও চতুরতা, এবং বিলাস-ভবনে, ইন্দ্রিয়সেবা-মধ্যে, দেবীপ্রতিমারূপে প্রতিষ্ঠিতা আয়েসার অপ্রাপ্য প্রণয়োৎসর্গ প্রক্রত; যে মহতী উদ্দীপ্ত-কল্পনা হইতে সমুদ্র-সৈকতে, বালুকাস্তূপে, বা বিজন কাননে, দয়া ও পর-দুঃখকাতরতার স্বভাবপ্রতিমা এবং কৃত্রিম-ব্যবহারানিয়ন্ত্রিত রমণীপ্রকৃতির আদর্শ কপালকুণ্ডলা, ও তজ্জীবনপিপাসু, অবিচলিত-সংকল্প, অদ্ভুত-তন্ত্রধর্ম্মোপাসক, ভয়াবহচরিত্র কাপালিকের উদ্ভব; সে কল্পনার ক্রীড়াক্ষেত্র এখানে দেখিতে পাওয়া যায় না। সে কল্পনার নিকৃষ্টতর সৃষ্টি মনোরমারূপ চিত্রও এ কাব্যে স্থান প্রাপ্ত হয় নাই। এখানে যাহা কল্পনার সৃষ্টি, তাহাতেও যেন পরিচিত বস্তুর সমাবেশ। তাহার অভিনবত্ব দেখিয়া চমৎকৃত হইবার কিছু নাই, অথচ তাহার মাধুর্য্য অতুলনীয়। সুতরাং যাহা দেখিলেই সুপরিচিত বলিয়া প্রতীতি হয় না, যাহা চিন্তার আয়ত্ত করিতে প্রয়াস পাইতে হয়, এরূপ জিনিসের এখানে সম্পূর্ণ অভাব। কবি যেন আপনার কিছুই এখানে সন্নিবেশিত করেন নাই, সকলই যেন আমাদের নিজের জিনিস, যাহার সহিত প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্ত্তে, অতি ঘনিষ্ঠভাবে, প্রীতির ভাবে, মেশামিশি করিতেছি, সকলই তাহাই, কবি কেবল সে সকলকে আপনার মত সাজাইয়া গিয়াছেন। কিন্তু সেই সংযোজনার মধ্যে, ঘটনার পর ঘটনা, কাব্যপাত্রগণের কার্য্যের পর কার্য্য, সংস্থাপিত করিতে, পাত্রবিশেষের সহিত পাত্রবিশেষকে সম্বন্ধবিশিষ্ট করতঃ প্রত্যেকের প্রকৃতির পরিস্ফুরণ ও পরিণতি সম্পাদনে, এবং সর্ব্বোপরি, সম্পূর্ণ চিত্রের সুমহৎ ফলস্বরূপ, মানবশিক্ষার জন্য, স্বর্গ-

নরকের প্রকৃতি-ভেদ চিত্রার্পিত করিতে, কবি যেরূপ স্বভাবজ্ঞান ও সৌন্দর্য্যানুভূতি, চিন্তানিরতি ও কৌশলকুশলতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। শিল্পীর সৌন্দর্য্য-কল্পনার এখানে উচ্চতম প্রকাশ।

কবির স্বসম্পাদিত সাময়িক পত্র বঙ্গদর্শনে বিষবৃক্ষ প্রথম প্রকাশিত হয়, এবং উক্ত পত্রিকার প্রকাশিত কবির কাব্যসমূহমধ্যে বিষবৃক্ষই প্রথম। বঙ্গদর্শনকে একখানি প্রথম শ্রেণীর পত্রিকা করিতে কবি যেরূপ প্রয়াসবান ছিলেন, বঙ্গদর্শনে প্রথম প্রকাশিত স্বরচিত কাব্যখানিকেও সেইরূপ উচ্চশ্রেণীর করিতে যত্ন পাইয়াছিলেন। কবি সে যত্নে সম্পূর্ণ সফলতা লাভও করিয়াছেন। বিষবৃক্ষ যে তাঁহার বিশেষ যত্নের ফল, তাহা প্রতিপদে পরিলক্ষিত হয়। ইহার ভাষা, আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত, একই ভাবে প্রবহমান, অতি সুমার্জ্জিত, সমগতিবিশিষ্ট, এবং কাব্যের বিষয় বিবেচনায়, সরল ও সুখপাঠ্য, অর্থ সহজে বোধগম্য—এবং স্থলবিশেষে ভাষা বিশেষ অর্থব্যঞ্জক; ইহার গল্পগঠনে জটিলতা নাই, অথচ সেই সরল ঘটনাবিন্যাসমধ্যে কবি যেরূপ চিন্তাশীলতা ও কৌশলকুশলতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা অসাধারণ বলিতে হইবে; স্বভাব বা দৃশ্য-বর্ণনের বাহুল্য আর কুত্রাপি এরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না, সে বর্ণনা এরূপ যথাযথ, এরূপ পূর্ণতাময় যে, পড়িতে বোধ হয় দৃশ্য যেন চক্ষের সম্মুখে বিদ্যমান রহিয়াছে, কবি যেন, পাঠককে সম্মুখে দণ্ডায়মান রাখিয়া, অঙ্গুলিনির্দ্দেশপূর্ব্বক, তাহার ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রাংশ পর্য্যন্ত দেখাইয়া দিতেছেন—আর দৃশ্য যেখানে কল্পনাপ্রসূত সেখানে তাহা অতীব কবিত্বময়; এ কাব্যে চরিত্রাঙ্কনেও সেইরূপ পূর্ণতা, কবি প্রস্ফুরণ ক্ষমতার একশেষ প্রদর্শন করিয়াছেন; লোকশিক্ষার জন্যই এ কাব্য প্রথম রচিত, সে শিক্ষা ইহাতে হৃদয়স্পর্শী।

আমরা কবির কাব্যান্তর-সমালোচনায় বলিয়াছি, স্বল্পমাত্র ভাষায়, দুই একটি কথায়, অনেক সময়ে একটিমাত্র নাম দ্বারা, অঙ্কিত চরিত্রের আভাস-প্রদানে তাঁহার যেরূপ ক্ষমতা, অতি বিস্তৃত বর্ণনায়ও সেরূপ অভিব্যক্তি সম্ভাবিত হয় না। তাঁহার কাব্যপাত্রগণের নাম-নির্ব্বাচনেও আমরা তাঁহাকে বিশেষ সৌভাগ্যের অধিকারী দেখিয়াছি। বিষবৃক্ষেও, একাধিক স্থলে, কবির সেই সৌভাগ্যশালিতা, চরিত্রস্ফূর্ত্তি-সম্পাদন-ক্ষমতার সেই বিশেষত্ব, দেখিতে পাওয়া যায়। এ কাব্যে, অতি ক্ষুদ্রাংশের সমাবেশেও, চিন্তা ও কৌশল প্রতীয়মান। সূর্য্যমুখী, কমলমণি, কুন্দনন্দিনী, সকলেই নিজ নিজ রমণীয়ত্ব, নিজ নিজ বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য্য-হেতু, ফুলের সঙ্গে তুলনীয়া। কিন্তু সে তুলনায় প্রভেদ আছে, সেই পৃথকত্বে চরিত্রত্রয়ের প্রকৃতি ও প্রকৃতিভেদ সূচিত হইতেছে। জড়-প্রকৃতিতে মনুষ্যপ্রকৃতির প্রতিচ্ছায়া কবির চক্ষেই সহজে অনুভূত হয়। ফুলেও মনুষ্যপ্রকৃতির ছায়া আছে; ভাষায় তাহা প্রকাশ করা সহজ নহে, কিন্তু কল্পনার চক্ষে দেখিলে সে সাদৃশ্যের অনুভূতি অনিবার্য্য। সূর্য্যমুখী, কমল, ও কুন্দতে

যে প্রভেদ, তন্নামক পুষ্পত্রয়ে তাহা প্রতিবিম্বিত দেখিতে পাওয়া যায়। গৌরব ও গাম্ভীর্য্য সূর্য্যমুখীর প্রকৃতির প্রকৃষ্ট লক্ষণ; তিনি প্রৌঢ়ত্বে উপনীতা, গৃহিণীভাবে গর্ব্বিতা, তাঁহার বাহ্য সৌন্দর্য্যেও সে বয়সের, সে প্রকৃতি-গাম্ভীর্য্যের ভাব প্রতিফলিত; তাঁহার স্বামীপ্রেমেও সেই গৌরব, সেই গাম্ভীর্য্য, সেই স্থিরশান্ত ঘোরাল ভাব, অথচ তাঁহার পূর্ণপ্রকৃতি প্রকাশমান; তাঁহাতে কমলমণির চাঞ্চল্যেরও যেমন অভাব, তাঁহার চরিত্রপ্রভা তেমনই কুন্দনন্দিনীর ন্যায় স্তিমিতজ্যোতি বা স্বল্পপ্রকাশ নহে। এরূপ প্রকৃতির প্রতিবিম্ব ফুলের মধ্যে সূর্য্যমুখীতে ভিন্ন আর কোথায় পাইব? সূর্য্যমুখী বৃহৎ, উজ্জ্বল, গুরুত্বের ভাবে পরিপূর্ণ। আবার সূর্য্যমুখী সূর্য্যদেবকে সর্ব্বদা সম্মুখে রাখিয়া দিক্‌পরিবর্ত্তন করে, সূর্য্যদেব অস্তমিত হইলে শুকাইয়া যায়। পতি-মাত্রজীবিতা নগেন্দ্রবনিতাও পতির পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলিতেন, পতির প্রফুল্ল প্রীতিপূর্ণ মুখপানে তাকাইয়া জীবনের সার্থকতা বোধ করিতেন; যেই সে সুখ-সূর্য্য তাঁহার পক্ষে অস্তমিত হইল, অমনি কালিমা আসিয়া সে সৌন্দর্য্য ঢাকিল, সে গৌরবের ফুল শুকাইয়া গেল। কমলও ভানুকর-প্রদীপ্ত; সে পবিত্র, শুভ্র, বিমল কান্তি, দিনমণির রশ্মি-সংযোগ ব্যতিরেকে, সারাদিন ওরূপ কোমল অথচ ভাস্বর জ্যোতিঃ প্রতি-ভাত করিত না। প্রেমময়ী কমলমণি প্রস্ফুটিত কমলবৎ সর্ব্বদা ফুটিয়াই থাকিতেন, কিন্তু সে নিত্য প্রফুল্লতা স্বামীর আদরে পরিপোষিত না হইলে, তাহার অস্তিত্বের সম্ভাবনা হীনতাপ্রাপ্ত হইত। কমলমণিতে নিত্য প্রসন্নতা, তাঁহার প্রকৃতি চাঞ্চল্যময়; সে চাঞ্চল্য প্রেমময়ীর প্রেম-পারাবারের তরঙ্গভঙ্গ। সূর্য্যমুখীতে যে পূর্ণতায় স্থিরতার উদ্ভব করিয়াছে, কমল-মণিতে সেই পূর্ণতা-হেতুই সে প্রকৃতি টল-মলায়মান, যেন প্রাবৃট-জল-সম্ভার-সমন্বিতা স্রোতস্বিনীবৎ কূলপ্লাবনোন্মুখী। সূর্য্য-মুখীর প্রেমের ঐকান্তিকতা, আপনার স্বামীতে তাহার কেন্দ্রীভূত ভাব, তাহার আত্মগত সংযতভাব, আর সূর্য্যমুখী ফুলের বর্ণগাঢ়তা, তাহার নিবিড়তা, সে উজ্জ্বল পীতের উপর কৃষ্ণাভার প্রক্ষেপ, আমরা একই প্রকৃতিব্যঞ্জক বলিয়া বুঝি। অন্য দিকে, পদ্ম শুভ্র, পবিত্র, নয়নপ্রীতিকর, সুগন্ধে মনোমুগ্ধকর, ভাস্বর অথচ বিরলবর্ণ, —সে গাঢ়তাশূন্য, সে অসংযত ভাসাভাসা ভাবে, সে পবিত্রতার আদর্শে, আমরা কমলের প্রেমের বিক্ষিপ্ত অথচ বিশুদ্ধ প্রকৃতি, তাহার অন্যে বিস্তৃতি, তাহার সার্ব্বজনীন ভাব, প্রকাশপ্রাপ্ত দেখিতে পাই। সূর্য্যমুখীর হৃদয়কৌমার্য্য যেন একে সমর্পিত, চির-প্রেমময়ী কমলের প্রীতির ভাব, স্বামীর চতুর্দ্দিকে বিবর্ত্তমান থাকিয়াও, যেন অন্যে ব্যাপ্তি লাভ করিত। এই ঐকান্তিক বা আত্মগত এবং বিক্ষিপ্ত বা সার্ব্বজনীন ভাব সূর্য্যমুখী ও পদ্মপুষ্পে সাদৃশ্যগত। সেইরূপ, কুন্দনন্দিনীও কি কুন্দ-প্রকৃতিক নহে?—শুভ্র, পবিত্র, জ্যোতিষ্মান্, কিন্তু ক্ষুদ্র, মৃদুস্ফূর্ত্তি, অপ্রকাশ —যেন বিজনে ফুটিয়া বিজনেই খলিত হয়, মানবচক্ষু কদাচিৎ আকৃষ্ট করে।

নগেন্দ্রনাথ নৌকারোহণে কলিকাতা যাইতেছেন, পথে বিষম ঝড় উঠিল। তাঁহার আদেশক্রমে নাবিকেরা নৌকা কিনারায় বাঁধিল। নগেন্দ্র সঙ্কটে পড়িলেন, ঝড়ের ভয়ে নৌকা হইতে নামিলে নাবিকেরা তাঁহাকে কাপুরুষ মনে করিবে—না নামিলে সূর্য্যমুখীর কাছে মিথ্যাবাদী হইতে হয়, কেননা, ভার্য্যা সূর্য্যমুখী নৌকাযাত্রাকালে মাথার দিব্য দিয়া ঝড়ের সময়ে তাঁহাকে নৌকায় থাকিতে নিষেধ করিয়াছিলেন এবং তিনি স্বীকৃত হইয়া আসিয়াছিলেন। ভার্য্যার মনস্তুষ্টির জন্য, তাঁহার রমণীসুলভ অনিষ্টাশঙ্কার নিরাকরণার্থ, কৃত অঙ্গীকারের বিরুদ্ধাচরণেই বা ক্ষতি কি, এ কথা যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন মনে করিয়া, আখ্যায়িকাকার উত্তর করিতেছেন, "আমরা জানি না, কিন্তু নগেন্দ্র ক্ষতি বিবেচনা করিতেছিলেন।" নাটককার হয় ত এত টুকুও বলিতেন না, তিনি হয় ত স্বগত বাক্যে নগেন্দ্রকে দিয়া এইরূপ বলাইয়াই সন্তুষ্ট হইতেন, "নৌকা হইতে নামিলে নাবিকেরা আমাকে কাপুরুষ মনে করিবে, কিন্তু আমাকে নামিতেই হইবে, কারণ ভার্য্যা সূর্য্যমুখী মাথার দিব্য দিয়া ঝড়ের সময় আমাকে নৌকায় থাকিতে নিষেধ করিয়াছেন।" পাঠক ইহা হইতেই বুঝিতেছেন, নগেন্দ্রনাথ ভার্য্যার ভক্তি ও ভালবাসায় কতদূর আস্থাবান্ ছিলেন, সে গৌরবান্বিত পতিপ্রেমকে তিনি কতদূর সম্মান করিতেন, অসাক্ষাতেও, কেবলমাত্র কথার খাতিরেও, সে ভাবের বিনিময় সম্পাদনে তাঁহার মন কিরূপ আগ্রহান্বিত ছিল। অল্প কথায় কবি এই দাম্পত্যপ্রণয়ের প্রকৃতির যেরূপ আভাস প্রদান করিয়াছেন, তাহা অন্যরূপে প্রকাশ প্রাপ্ত হইত না। ইহা কবির কৌশলময় উপায়, তাঁহার নিজস্ব। এ ক্ষমতা সেক্ষপীয়র প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর নাটককারদিগের ক্ষমতার সদৃশ।

"স্তিমিত প্রদীপে," "ছায়া," ও "পূর্ব্ববৃত্তান্ত" নামক পরিচ্ছেদত্রয়ে কবি যে অপূর্ব্ব দৃশ্যের অবতারণ করিয়াছেন, তাহার শেষ চিত্রে নগেন্দ্র-সূর্য্যমুখী পরস্পরের স্কন্ধে মস্তক ন্যস্ত করিয়া বিনা বাক্যে অবিশ্রান্ত রোদন করিতেছেন, রোদনে কত সুখ অনুভব করিতেছেন। সে রোদনসুখবিহ্বলতার অবসানে, সূর্য্যমুখী পূর্ব্ববৃত্তান্ত বিবৃত করিয়া, নগেন্দ্রনাথের কৌতূহল নিবারণ করিলেন, এবং এই বলিয়া শেষ করিলেন, "এ সুখ যে আমার কপালে হইবে, তাহা জানিতাম না। কিন্তু ছি! তুমি আমায় ভালবাস না। তুমি আমার গায়ে হাত দিয়াও আমাকে চিনিতে পার নাই—আমি তোমার গায়ের বাতাস পাইলেই চিনিতে পারি।" স্বামীর প্রীতিপ্রসন্নতায় পূর্ণবিশ্বাসে সূর্য্যমুখী কেমন পূর্ব্ববৎ সংস্থাপিতা! কি অসাধারণ রমণীসুলভ সরলতা! বিচ্ছেদের পর পুনর্ম্মিলনে সূর্য্যমুখী যেন আপনার স্বামীকে অধিকতর আপনার মনে করিতেছেন, দুঃখের স্মৃতি যেন নিশ্চিহ্নিতরূপে মুছিয়া গিয়াছে। এ অভিব্যক্তির ভাষা কবির আপনার সম্পত্তি। ইহার তুলনা কেবল প্রথম শ্রেণীর কবিগণের লেখাতেই পরিদৃশ্যমান।

কুন্দনন্দিনীর স্বপ্নদ্বয়ের কল্পনাও অতীব মনোহর এবং কবিত্ব ও কৌশলপূর্ণ। এই স্বপ্নদ্বয় ও কুন্দচরিত্রই এ কাব্যে বিশুদ্ধ উদ্ভাবনশক্তিসম্ভূত, এবং ইহাদের সৌন্দর্য্য কবির অন্যান্য কল্পনা হইতে নিকৃষ্টতর বলিয়া বোধ হয় না। এ স্বপ্নদৃশ্য-বর্ণনায় ভাষাও অতি লালিত্যময় এবং স্বপ্নদ্বয়ের অভিব্যক্তি বিশেষ চিন্তাশীলতার পরিচায়ক। কুন্দ একাকী রোগশয্যায় পিতার সেবাশুশ্রূষা করিতেছিল, ক্লান্তি ও অনিদ্রা জন্য পিতৃশবপার্শ্বে তন্দ্রাভিভূতা হইয়া আছে, কুন্দের স্বর্গগতা জননী তাহার মস্তকসান্নিধ্যে স্বপ্নাবির্ভূতা হইলেন। মাতৃমূর্ত্তি জ্যোতির্ম্ময়ী, কিরীটকুণ্ডলাদিভূষণালঙ্কৃতা, শুভ্র-সুবৃহৎ-দীপ্তিময় চন্দ্রমণ্ডলমধ্যবর্ত্তিনী, উচ্চ গগন হইতে ধীরে ধীরে নামিয়া সহস্র শীতলরশ্মি পাত করিতে করিতে, কুন্দনন্দিনীর মস্তকোপরি আসিল, জননীর কারুণ্যপ্রফুল্ল মুখমণ্ডল, স্নেহপরিপূর্ণ হাস্য অধরে স্ফুরিত হইতেছে। তিনি সস্নেহাননে কুন্দকে ভূতল হইতে উঠাইয়া ক্রোড়ে লইলেন এবং মুখচুম্বন করিয়া তাঁহার সহিত নক্ষত্রলোকে যাইবার জন্য আহ্বান করিলেন। কুন্দ যাইতে সাহস করিল না— দেখিয়া তাঁহার কারুণ্য-প্রফুল্ল অথচ গম্ভীর মুখমণ্ডলে অনাহ্লাদজনিতবৎ ভ্রুকুটি বিকাশ হইল। কুন্দ এক সময়ে মনঃপীড়ায় ধূল্যবলুণ্ঠিতা হইয়া সেই নক্ষত্রলোকে যাইবার জন্য কাতর হইবে, তখন তিনি পুনরায় দেখা দিবেন, এই বলিয়া তিনি অন্তর্হিতা হইলেন। যাইবার সময় অঙ্গুলিসঙ্কেতদ্বারা কুন্দকে গগনপ্রান্তে এক পুরুষমূর্ত্তি এবং এক শ্যামাঙ্গী পদ্মপলাশনয়না যুবতীর মূর্ত্তি দেখাইয়া, তাহাদিগকে, ইহ জগতে তাহার অশুভের কারণ-স্বরূপ, পরিহার করিতে উপদেশ করিয়া গেলেন। সে পুরুষমূর্ত্তি দেবনিন্দিত মূর্ত্তি, তাঁহার উন্নত, প্রশস্ত, প্রশান্ত ললাট; সরল সকরুণ কটাক্ষ; তাঁহার মরালবৎ দীর্ঘ ঈষৎ বঙ্কিম গ্রীবা এবং অন্যান্য মহাপুরুষলক্ষণ দেখিয়া কাহারও বিশ্বাস হইতে পারে না যে, তাঁহা হইতে আশঙ্কা সম্ভবে। নারীমূর্ত্তিও দেখিতে কুন্দের হৃদয়ে ভীতি সঞ্চার করিল না, কিন্তু জননী তাহাকে নারীবেশে রাক্ষসীনির্দ্দেশে তাহাকে বিষধরবৎ প্রত্যাখান করিতে বলিলেন। কুন্দনন্দিনী মাতার সহিত নক্ষত্রলোকভ্রষ্ট হইয়া ভূতলে আসিয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। মাতার তল্লোকে প্রত্যাগমনের পর পিতৃ-সেবারূপ কর্ত্তব্য পালনের জন্য তাঁহাকে এ পৃথিবীতে থাকিতে হইয়াছিল। সে কর্ত্তব্যের অবসানে এখন তাঁহার স্বলোকে প্রত্যাগমন করিয়া এ সংসারের দুঃখক্লেশ হইতে মুক্তিলাভের অবসর ও সময় উপস্থিত। মাতা, যদি তাঁহাকে এই সুযোগসময়ে নক্ষত্রলোকে লইয়া যাইতে পারেন, এই আশাপ্রদীপ্ত মনে হাস্যময়ী। তাঁহার প্রস্থান পরে পিতৃ-সেবানুরোধে কুন্দনন্দিনীর এ পৃথিবীতে অবস্থান ও তদ্ধেতু এ সংসারের দুঃখভোগ স্মরণ করিয়া সন্তান প্রতি তাঁহার কারুণ্যের সঞ্চার। এ পৃথিবী হইতে লইয়া যাইবার চেষ্টায় সফলতা লাভ না করিলেও কন্যার ইহ জীবনের শুভাশুভ সম্বন্ধে যাহা বলিবার তাহা কন্যাকে বলিতে আসিবারও মাতার

পক্ষে এই অবসর সময় । আর সেই অপূর্ব্বসৌন্দর্য্যময় দৃশ্য কুন্দনন্দিনীর মনকে নক্ষত্রলোকের দিকে আকৃষ্ট করিবার সম্পূর্ণ উপকরণসমন্বিত । সুতরাং কুন্দজননীর এই ভাবে স্বপ্নাবির্ভূতা হওয়া তৎকালীন অবস্থার কি উপযোগী ! এই স্বপ্ন আবার কেবল কুন্দনন্দিনীর অপার্থিব প্রকৃতির আভাস প্রদান করে নাই, ইহাতে নগেন্দ্র-চরিত্রও অল্প রেখাপাতে চিত্রফলিত হইয়াছে, এবং কবি হীরা-চরিত্রেরও স্থূল রেখা ইহাতে অঙ্কিত করিয়াছেন। অন্য দিকে, কুন্দকে নগেন্দ্রনাথের দেবোপম শরীর-কান্তির প্রতি আকৃষ্ট এবং কারুণ্যপূর্ণ মুখভাবের সহিত সুপরিচিত করিয়া, তাঁহাকে অপরিচিত পুরুষসঙ্গে বিদেশগমনজন্য প্রস্তুত করা হইয়াছে। যেমন আখ্যায়িকার প্রারম্ভেই এক কথায় কবি নগেন্দ্র-সূর্য্যমুখীর দাম্পত্যপ্রণয়ের প্রকৃতি সূচিত করিয়াছেন, তেমনই স্বল্প ভাষায় এখানে নগেন্দ্রপ্রকৃতিরও পূর্ব্বাভাস প্রদান করা হইয়াছে । একত্রে একস্থলে এত উদ্দেশ্যের সাধন কৌশলবুদ্ধি ব্যতিরেকে সম্ভবে না। কুন্দনন্দিনীর দ্বিতীয় স্বপ্নও সেইরূপ অর্থব্যঞ্জক । এবার মাতা " বিশুদ্ধ-শুভ্র-চন্দ্রমণ্ডলমধ্যবর্ত্তিনী নহেন, এক অতি নিবিড় বর্ষণোন্মুখ নীলনীরদমধ্যে আরোহণ করিয়া অবতরণ করিতেছেন। তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে অন্ধকারময় কৃষ্ণবাষ্পের তরঙ্গোৎক্ষিপ্ত হইতেছে, সেই অন্ধকার মধ্যে এক মনুষ্যমূর্ত্তি অল্প অল্প হাসিতেছে । তন্মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে সৌদামিনী প্রভাসিত হইতেছে। কুন্দ সভয়ে দেখিল যে, ঐ হাস্য-নিরত বদনমণ্ডল, হীরার মুখানুরূপ। আরও দেখিল মাতার করুণাময়ী কান্তি এক্ষণে গম্ভীরভাবাপন্ন।" হীরাপ্রদত্ত বিষপানে কুন্দ এই স্বপ্নদর্শনের অব্যবহিত পরেই যে বিষাদের, যে কালিমার দৃশ্যের সংঘটন করিলেন, এই স্বপ্নদৃশ্যে তাহা কি সুন্দর সূচিত হইয়াছে ! স্বপ্ন ও প্রকৃতে কি আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য ! এ উদ্ভাবনে কি সুন্দর কবিত্ব ! এই খানে কবি হীরাচিত্রেরও দ্বিতীয় রেখা অঙ্কিত করিয়াছেন।

বিষবৃক্ষের গল্পরচনায় প্রথম কথা এই —কবি কুন্দনন্দিনীকে প্রথম অঙ্কে পরিণীতা করিয়া, বৈধব্যে নগেন্দ্রের প্রণয়পাত্রী করিলেন কেন ? নগেন্দ্রের কুন্দানুরাগ প্রকৃত জীবনের ঘটনা হইতে গৃহীত হইয়া থাকিলে, এ প্রশ্নের অনুসন্ধান নিষ্প্রয়োজন। ঘটনায় স্বাভাবিকত্বের অভাব কিছুই নাই, কবি প্রকৃত জীবনে যেরূপ দেখিয়াছেন, বা ঘটনার বিষয় যেরূপ জানিয়াছেন, কাব্যেও সেইরূপই সন্নিবেশিত করিয়াছেন। অন্যথা এ প্রশ্নের মূলে অনেক কথা নিহিত আছে। ঘটনা সত্য হইলেও, সেই সকল কথা বিবেচনা করিয়াই, অবিকল যাহা ঘটিয়াছিল, কবি তাঁহার কাব্যে তাহা সম্পূর্ণ অপরিবর্ত্তিত রাখিয়া থাকিতে পারেন। বালিকা কুন্দকে পথে কুড়াইয়া পাইয়া নগেন্দ্র তাহার রূপে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। কুন্দনন্দিনী বালিকা হইলেও, তাঁহার হৃদয়ে তৎকালে নগেন্দ্রনাথের অতুলনীয় রূপের প্রভাব অননুভূত ছিল না। তথাপি উভয়ের পরিণয়ের কল্পনা কাহারও হৃদয়ে স্থানাধিকার করে নাই। কুন্দনন্দিনী বালিকা, তাহার প্রকৃতি আত্মপ্রসারণ-

বিমুখ, আজীবন ঘটনাস্রোত তাহাকে যেরূপে বহন করিয়াছে, তাহারই অনুগমন করিয়া, সসংকোচে, আত্মবিলোপের সহিত, জীবনপাত করিয়াছে; তাহার পক্ষে ইহা স্বভাবোপযোগীই হইয়াছে। কিন্তু নগেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এ প্রশ্নের ব্যাখ্যা অন্যরূপ। যদি সেই বালিকার অপার্থিব দর্শনবিলাস, যদি তাহার শান্ত সুন্দর সুকুমার দেহলাবণ্য, তাঁহার হৃদয়ে এত অধিকার লাভই করিয়াছিল, তবে সে আকারগত চক্ষুকর, সে দেহসম্বদ্ধ পুষ্প-সৌরভের সহিত মিলিত হইতে বিরত থাকিলেন কেন? বৈধব্যে যাহার পরিণয় করিতে বিধবাবিবাহ-বিধির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল, কুমারীজীবনে তাহাকে গৃহিণী করিয়া সে সমাজ-বিরোধ পরিহার করিতে পারিতেন। ইহার উত্তর এক কথায় নহে। নগেন্দ্রের কুন্দানুরাগের অঙ্কুর যদিও এই সময়েই তাঁহার হৃদয়ে মূলস্থাপন করিয়াছিল, সূর্য্যমুখীর হৃদয়-প্লাবনকারী পতিপ্রেম সে অঙ্কুরকে বৃদ্ধি পাইতে দেয় নাই। নগেন্দ্রনাথকেও কবি প্রণয়ী, ভার্য্যাবৎসল করিয়া অঙ্কিত করিয়াছেন। তিনি এত সহজে সূর্য্যমুখীর প্রেমানুরাগকে প্রত্যাখ্যাত করিয়া কুন্দনন্দিনীর পাণিগ্রহণাভিলাষী হইলে, লোকে তাঁহাকে সে সম্বন্ধে পবিত্রতার হিসাবে দোষারোপ করিবার কারণ কিছু না দেখিলেও, তাঁহার দাম্পত্যপ্রণয়ের বিশেষ প্রশংসা করিত না। আর যুবতীর রূপে চিত্তের যেরূপ বিভ্রম জন্মায়, বালিকার রূপ মনোমুগ্ধকর হইলেও সেরূপ ভ্রান্তির উৎপাদন করে না। কুন্দনন্দিনী সুন্দরী হইলেও এখনও যুবতী নহে। কৌশলী কবি, একদিকে নগেন্দ্রের বিধবা রমণীর প্রতি অনুরাগের দোষাবহ প্রকৃতির লাঘব করিবার জন্য, যেমন সে অনুরাগের বীজ পূর্ব্বেই অবস্থান্তরে তাঁহার হৃদয়ে উপ্ত করিয়া রাখিলেন, অন্য দিকে, সেইরূপ, নগেন্দ্রের চরিত্র-গৌরব রক্ষার জন্য, অঙ্কুরোদ্গম রহিত করিবার অভিপ্রায়ে, নগেন্দ্রের সান্নিধ্য হইতে কুন্দকে স্থানান্তরিত করিলেন। প্রণয়-বীজ হৃদয়-ক্ষেত্রে নিক্ষিপ্ত হইলে তাহা সময়ে কলেবর ধারণ করিবেই। যাহা নগেন্দ্র প্রতিরোধ করিতে অসমর্থ হইলেন, তাহা স্বাভাবিক এবং সহসা অনুলঙ্ঘনীয় হওয়ায়, আত্মদমনশক্তির অভাবজনিত তাঁহার দোষ লঘুতাপ্রাপ্ত হইয়াছে। আবার তাঁহার ভার্য্যাবৎসলতারূপ চরিত্রের প্রস্ফুরণেও সুবিধা হইয়াছে। ইহাতেই উত্থাপিত প্রশ্নের সম্পূর্ণ নিরাকরণ হইল না। ইহার মূলে কবির চিন্তাশীলতার অধিকতর অবস্থান দেখিতে পাওয়া যায়। কুমারীর প্রতি প্রেমানুরাগ কাব্যের সামগ্রী হইলেও, তাহাতে অপবিত্রতার কথা কিছু না থাকিলেও, বাঙ্গালার হিন্দুসমাজে এরূপ অনুরাগ সামাজিক ভাবে অনুমোদনীয় নহে। হিন্দু-সমাজগঠন-প্রণালী, সে সমাজের ব্যবহাররীতি, এরূপ অনুরাগের অনুকূলও নহে। দাম্পত্য-প্রণয়ই, বিবাহিত স্ত্রী-পুরুষের পরস্পরের প্রতি অনুরাগই, ভক্তিবাৎসল্য ও সেবাসাহচর্য্যই, বাঙ্গালী হিন্দুসমাজের লক্ষ্য বা উৎকর্ষাদর্শ। নগেন্দ্র-সূর্য্যমুখীতে কবি সেই আদর্শই চিত্রিত করিয়াছেন। সে আদর্শের বিরোধী ঘটনা

কবিকে সুতরাং এ ভাবেও পরিহার করিতে হইয়াছে।

নগেন্দ্রনাথের কুন্দানুরাগ স্বভাব-প্রসূত হইলেও সমাজ-ধর্ম্মের অনুরোধে নগেন্দ্র-নাথের তাহা প্রতিহত করিবার প্রয়োজন ছিল। নগেন্দ্রনাথ তাহাতে কৃতকার্য্য হয়েন নাই, ইহাই তাঁহার চরিত্রের' দুর্ব্বলতা। মনুষ্য-প্রকৃতি এ দুর্ব্বলতা হইতে কখনও মুক্ত হইতে পারে কি না, তাহাও সন্দেহের কথা। ধর্ম্মবীর প্রতাপও তাঁহার শৈবলিনী-প্রণয়-স্রোত প্রতিরুদ্ধ করিতে পারেন নাই, অবশেষে সমাজ-ধর্ম্মরক্ষার জন্য আত্মবলিদান করিয়া, সে অবস্থা হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিয়াছিলেন। তবে প্রতাপ ও নগেন্দ্র সমাবস্থাপন্ন ছিলেন না। শৈবলিনী চন্দ্র-শেখরের পরিণীতা ভার্য্যা, তাঁহার প্রতি প্রতাপের প্রেমানুরাগ বাল্যে সঞ্জাত হইয়া থাকিলেও, সে অনুরাগের সফলতার প্রতিবন্ধক সমাজধর্ম্ম, প্রতাপের পক্ষে অধর্ম্মের পথে পদার্পণ না করিলে অলঙ্ঘনীয় হইয়াছিল। নগেন্দ্রর সম্বন্ধে সেরূপ নহে। বিধবা কুন্দনন্দিনীর পরিণয়ের পথে সেরূপ অলঙ্ঘ্য বাধা কিছু ছিল না। সমাজ সাধারণতঃ যদিও তাহার অনুমোদনে তখনও প্রস্তুত নহে, বিধবাবিবাহবিধি শাস্ত্রানুমোদিত বলিয়াই সংস্থাপিত হইয়াছিল। সে বিধির আশ্রয় লইলেই সমাজধর্ম্মের প্রতিরোধ নিরাকৃত হইল। নগেন্দ্রনাথ সমাজধর্ম্মের অবমাননা হইতে আপনাকে বাঁচাইবার জন্য তাহাই করিয়াছিলেন। কিন্তু, সমাজধর্ম্মের বাধার কথা তাঁহার সম্বন্ধে না ঘটিলেও, তিনি তাঁহার এই চিত্তবৃত্তির অনুগামী হওয়ায়, তাঁহাকে ব্যবহাররীতির প্রতিগমন করিতে হইয়াছিল। এখানেও, সমাজের প্রতি তাঁহার সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য, কবি তাঁহাকে প্রকাশ্যে এ বিবাহ করিতে দেন নাই। নগেন্দ্র-চরিত্রের গৌরব রক্ষার জন্য, সুতরাং কবি সর্ব্বতোভাবেই চেষ্টা করিয়াছেন এবং সে চেষ্টায় তিনি সম্পূর্ণ কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। কিন্তু আমরা এরূপ বুঝিলে ভুল হইবে যে, কবি নগেন্দ্রকে, তাঁহার কুন্দানুরাগ সম্বন্ধে, নির্দ্দোষ প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহার সামাজিক উপন্যাসত্রয় অতি উচ্চ নীতির ভিত্তির উপরে সংস্থাপিত। সমাজধর্ম্মকে তিনি মনুষ্যজীবনে অতি উচ্চ স্থান প্রদান করিয়াছেন। মনুষ্য-প্রকৃতি যথাযথ চিত্রিত করা তাঁহার কার্য্য হইলেও, তিনি সে ধর্ম্মের সহিত সর্ব্বত্র তাঁহার চিত্রের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। তাই তিনি সমাজধর্ম্মের অনুরোধে প্রতাপের জীবন বিসর্জ্জন শ্রেয়স্কর মনে করিয়াছেন, তাই তিনি শৈবলিনীর পাপস্খালনজন্য ওরূপ কঠোর প্রায়শ্চিত্তের বিধান করিয়াছেন, এবং গোবিন্দলালকে সে ধর্ম্মের প্রতিকূলা-চরণের ফলস্বরূপ গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী করিয়া ছাড়িয়াছেন। নগেন্দ্র-কুন্দনন্দিনীর প্রণয়কে তিনি স্বাভাবিক ও মনোহর করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন, তাহাতে এরূপ বর্ণ কিছু প্রয়োগ করেন নাই, যাহাতে তৎপ্রতি মানুষের ঘৃণা বা বিরাগের ভাব কিছু হইতে পারে; বরং নগেন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, কুন্দের দুঃখে সহানুভূতির উদ্রেক করিয়া সে চিত্রকে তিনি এরূপই করিয়াছেন, নগেন্দ্র-সূর্য্যমুখীর

পুনর্ম্মিলনে তাঁহাদের সুখাতিশয্য প্রদর্শন করিয়া, তাঁহাদের বিচ্ছেদজনিত দুঃখের এরূপেই নিরাকরণ করিয়াছেন যে, তাঁহার বিষবৃক্ষের শিক্ষার ফল সে চিত্রে যেন ব্যর্থতা প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া প্রতীতি জন্মে। কিন্তু তিনি পাঠককে, এইরূপ সন্দিগ্ধচিত্তে, সেই উচ্চ নীতির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিতেছেন, নগেন্দ্র-কুন্দনন্দিনীর প্রণয়ে দোষারোপ করিবার কিছু না থাকিলেও, নগেন্দ্রের পক্ষে সে অনুরাগকে সফলতায় বা ভোগে পরিণত করিবার চেষ্টা এবং কুন্দের পক্ষে সে চেষ্টার প্রতিরোধের অভাব দোষাবহ হইয়াছে। স্বভাবকে প্রতিহত করিতে না পারিলে, তিনি তাঁহাদিগকে জলে ডুবিয়া মরিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। তিনি নগেন্দ্রকে যেরূপ গৌরবের চরিত্র করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, কুন্দকে যেরূপ পবিত্র অপার্থিব প্রকৃতি প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে তাহাদিগের নিকট সেইরূপ অসাধারণ নৈতিক শক্তির আশা করিতে পারিতেন। নগেন্দ্রনাথ সেরূপ শক্তি প্রদর্শনে অকৃতকার্য্য হওয়াতেই, তাঁহার সম্বন্ধে বিষবৃক্ষের ফল ফলিয়াছে বলা যাইতে পারে। কুন্দেরও এ দুর্ব্বলতা দেখাইবার প্রয়োজন হইয়াছিল। কুন্দ নক্ষত্রলোক হইতে শাপভ্রষ্ট হইয়া বা অন্য কারণে পৃথিবীতে মানবী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই মানবীচরিত্রও তাঁহাতে দেখাইবার আবশ্যক ছিল। নগেন্দ্রকে কবি মহাপুরুষতুল্য করিয়াও তাঁহাতে মানুষের দুর্ব্বলতা রাখিয়াছেন। ইঁহাদের দৃষ্টান্তে মানুষকে পূর্ণতা শিক্ষা দিবার, কবির উচ্চাদর্শ কি তাহা হৃদয়ঙ্গম করাইবার, কবির অভিপ্রায়। প্রতাপকেও ধর্ম্মবীর গড়িয়া, প্রতাপ যে মানুষ তাহা দেখাইতে তিনি ভুলেন নাই, কারণ মানব-শিক্ষার জন্য এরূপ করা আবশ্যক। মানুষকে দেবতা দেখাইবার তত প্রয়োজন নাই, যত প্রয়োজন, মানুষে কোন্‌টুকুর অভাবের জন্য মানুষ দেবত্ব লাভ করিতে পারে না, তাহা দেখাইবার। শিক্ষায় যে মানব-চরিত্রের সে অভাব পূরণ হইতে পারে, সে দুর্ব্বলতার সংশোধন সম্ভবপর, তৎপ্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করাই কবির উদ্দেশ্য; এবং তাহা কেবল কবির কল্পনা বা আখ্যায়িকাগত বিষয় না রহিয়া, প্রকৃত জীবনে তৎসাধনের অনুষ্ঠান হইতে পারে, তাহাও তাঁহার অভিপ্রেত। নগেন্দ্রকে নির্দ্দোষ মহাপুরুষ এবং কুন্দকে পূর্ণ স্বর্গের ছবি করিয়া আঁকিলে, সে অভিপ্রায় সিদ্ধ হইত না। অন্য প্রকারেও, স্বগৃহে প্রতিপালিতা বিধবার প্রতি অনুরাগে, সামাজিক ভাবে যে দোষস্পর্শ হইতে পারে, কবি তাঁহার কাব্যনায়কের চরিত্রগৌরব রক্ষার জন্য, যতদূর সম্ভব, সে দোষের লঘুতাসাধনাভিপ্রায়ে, কৌশলাবলম্বন করিয়াছেন। কুন্দনন্দিনীর পূর্ব্ব-স্বামী তারাচরণকে কবি নগেন্দ্র বা সূর্য্যমুখীর সহিত সম্পর্ক-বিশিষ্ট করেন নাই। স্বগৃহে প্রতিপালিত বা আশ্রিত আত্মীয় বা কুটুম্ব-কন্যার ধর্ম্মরক্ষা গৃহপতির কর্ত্তব্যের মধ্যে, তাহা হিন্দু গৃহস্বামীর ধর্ম্ম। নগেন্দ্রকে সে ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইতে না হয়, সম্পর্কবিরুদ্ধ ভাবজনিত দোষ তাঁহার চরিত্রে কলঙ্ক লেপন না করে, এ জন্য কবি কুন্দনন্দিনীকে তাঁহার সহিত

নিঃসম্পর্কীয়া করিয়া রাখিয়াছিলেন। ইহাও কৌশলের কথা। কবি চিন্তা করিয়াই তারাচরণকে বাহিরে স্থাপন করিয়াছেন। নতুবা তারাচরণের সহিত একটি সুন্দরী ভদ্রঘরের কন্যার বিবাহ দিবার যখন সূর্য্যমুখীর আগ্রহাতিশয় ছিল, তখন কবি তাহাকে সূর্য্যমুখীর নিকটতর করিয়া প্রদর্শিত করেন নাই কেন? কুড়াইয়া পাওয়া মেয়ের সঙ্গে যাহার বিবাহ দেওয়া হইল, সূর্য্যমুখী বা নগেন্দ্র দত্তের ন্যায় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সহিত তাহাকে সম্পর্কবিহীন করাই সুসঙ্গত হইয়াছে, এই কি এ কথার উত্তর? কেন? নগেন্দ্র দত্ত ত কুন্দের পিতৃগৃহে উপস্থিত হইয়া প্রতিবাসিগণের নিকট তাহার কুলের পরিচয় লইয়া আসিয়াছিলেন। কেন? নগেন্দ্রনাথ ত কুন্দকে আপনার গৃহিণী করিতে এরূপ কোন বাধার কথা ভাবেন নাই। তারাচরণ তাঁহাদের স্বসম্পর্কীয় হইলে তাহার বিবাহ কুন্দের অপেক্ষা করিত না, অনেক পূর্ব্বেই সম্পন্ন হইয়া যাইত। তারাচরণ গ্রাম্য স্কুলের শিক্ষকতা করিতেও যাইত না, তাহার দেবেন্দ্র দত্তের সংস্রবে আসিবার কারণোদ্ভবও হইত না। উত্থাপিত প্রশ্নের ইত্যাকার অনেক উত্তর হইতে পারে। কিন্তু আমরা যে ব্যাখ্যা করিয়াছি, সমালোচ্য কাব্যপ্রণয়নে কবির সাধারণ চিন্তাশীলতার সহিত তাহাই সুসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। অথবা তিনি তারাচরণকে ওরূপ অবস্থাপন্ন করিয়া অনেক উদ্দেশ্যই সাধন করিয়াছেন।

যে প্রকৃতির পরিস্ফুরণে যেরূপ সামগ্রীর আবশ্যক, কবি তাহারই আয়োজন করিয়া রাখিয়াছেন। সূর্য্যমুখীর প্রীতিবৃত্তি আত্মগত, ধ্যানগত, তাহা বাহ্যবিকাশের সুবিধা তল্লাস করে নাই; তাই কবি তাঁহাকে পুত্রবতী করেন নাই। পুত্রবতী করিলে, তাঁহার পত্নীপ্রকৃতির পরিস্ফুরণে বাধা হইত। তাঁহাকে সন্তানবিহীনা করিবার সেও অন্যতম প্রকৃষ্ট কারণ। পতিপ্রেম ও সন্তানবাৎসল্যের প্রকৃতিভেদ থাকিলেও, উভয়ই হৃদয়কোমার্য্যমূলক, সে কোমলতা বিভক্ত হইলে, পাত্রবিশেষ সম্বন্ধে হ্রাসপ্রাপ্ত না হউক, এক পাত্র হইতে প্রতিহত হইলে, পাত্রান্তরে নির্ভর করে। তাহাতে ঐকান্তিকতার যে গাঢ়তা, যে অনন্যাবলম্ব ভাব, তাহা থাকে না। পতিকর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া, সন্তান বিদ্যমানে, সূর্য্যমুখীর হৃদয়কোমলতা সেই সন্তানরূপ অবলম্বনকে আশ্রয় করিলে, তিনি সান্ত্বনা প্রাপ্ত হইতেন, পতিনিগ্রহদুঃখ তাঁহাকে অতটা ব্যাকুলিত করিতে পারিত না। পুত্র থাকিলে, স্বামীর ভালবাসায় বঞ্চিত হইয়া সূর্য্যমুখীর গৃহত্যাগ সম্ভাবিত হইত না। অথচ সূর্য্যমুখীকে গৃহত্যাগ করাইয়া কবি তাঁহার চরিত্রের স্বাভাবিকত্ব রক্ষা এবং অন্যান্য প্রয়োজন সাধন করিয়াছেন। কবি সূর্য্যমুখীকে আদর্শ পত্নী করিয়া সৃজন করিবেন, তাই সে প্রকৃতির পূর্ণ বিকাশের পথে প্রতিবন্ধকের সংঘটন করেন নাই। অন্য দিকে, কমলমণির হৃদয়প্রবাহ বাহিরে ক্রীড়ার সামগ্রীর অনুসন্ধান করিত, সে উদ্বেল তরঙ্গ প্রতিঘাতের বস্তু না পাইলে শমতা লাভ করিত না। সে হৃদয়তারল্য স্বামীর প্রতি প্রবণতাময় হইলেও, অন্য ভাবে অন্য পাত্রেও বিস্তৃতি

পাইতে চাহিত। তাই স্বামীর কর্ম্মস্থান হইতে প্রত্যাগমনের অপেক্ষা করা অসহনীয় হইলে, পুত্র সে প্রীতি-ক্রীড়ন-ব্যগ্রতার শমতা বিধান করিত, তাই বাহির হইতে কুন্দ আসিয়াও সে বৃত্তির অংশ-ভাগিনী হইয়াছিল, কমলের বড় ভালবাসার ভ্রাতৃজায়া সূর্য্যমুখীর সুখ-কণ্টক হইয়াও সে কোমলতায় সে বঞ্চিতা হয় নাই। পুত্র এ প্রকৃতির বিকাশের সহায়তা করিয়াছে, কমলের কোলে পুত্র স্থাপন না করিলে, এ চরিত্র অসম্পূর্ণ থাকিত। সর্ব্বাঙ্গীন স্ফূর্ত্তির জন্য এক স্থলে যেমন সন্তানের অভাবই সুসঙ্গত হইয়াছে, অন্য স্থলে সন্তান সমাবেশ করিয়া, কবি সেইরূপ স্বভাবজ্ঞান ও কৌশল-কুশলতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

পূর্ণতা এ কাব্যের একটি সুব্যক্ত লক্ষণ। কি স্বভাব-বর্ণন, কি চরিত্র-প্রকটন, কি চরিত্রবিশেষের সমাবেশ-সাধন, কিছুতেই কুত্রাপি সর্ব্বাঙ্গীন পরিস্ফূরণের অভাব দৃষ্ট হয় না। গোচারণশীল-কৃষক-বালকসমন্বিত গঙ্গাতীরবর্ত্তী প্রান্তরভূমি হইতে, মসীবৎ-মলিন-বস্ত্রপরিধানা রৌপ্যা-লঙ্কারভূষিতা কৃষকপত্নীশোভিত স্নানের ঘাট হইতে, ধনীর সুবৃহৎ সুপ্রশস্ত সুনির্ম্মিত ও সুসজ্জিত, বিবিধ-লোক-সমাগম-চিহ্নিত অট্টালিকা এবং তৎপার্শ্বস্থিত উদ্যান বাপীতট ও বৃক্ষশ্রেণী পর্য্যন্ত, তাঁহার কাব্যের বিষয়-সংশ্লিষ্ট কোন দৃশ্য কবি অবর্ণিত রাখেন নাই, এবং যে কোন দৃশ্যে যাহা কিছু থাকে বা থাকিতে পারে, তত্তাবৎ যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিতে, কবি কোথায়ও বিস্মৃত হইয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। এ কাব্যে প্রেমানুরাগের তিনটি দৃশ্য কবি চিত্রার্পিত করিয়াছেন, তাহাদের প্রকৃতি-পার্থক্য পরস্পরের বিশেষত্ব স্পষ্টীকৃত করিতেছে, এবং প্রেমানুরাগের সফলতা, ফলরাহিত্য, ও বিমিশ্রভাব, পরস্পরের পার্শ্বস্থাপিত হইয়া, এ চিত্রের পূর্ণতা সম্পাদিত হইয়াছে। আবার কেবল সুন্দর দৃশ্যের পূর্ণতা সাধন করিয়াই কবি বিরত হয়েন নাই। সংসার-চিত্রের পূর্ণতা সম্পাদনা-ভিপ্রায়ে, তিনি, এ মনোহর দৃশ্যের বিপরীত সমাবেশে, স্বর্গ ও নরকের প্রভেদ অঙ্কিত করিয়া, যে মহতী শিক্ষা এ কাব্যের উদ্দেশ্য তাহার বিধান করিয়া, পূর্ণ সফলতা লাভ করিয়াছেন। সুখবোধ্যতা এ গ্রন্থের আর একটি সুস্পষ্ট রেখা। পাত্রগুলির কথার পর কথা, কার্য্যের পর কার্য্য, একত্র করিয়া দেখিলেই, প্রত্যেকের প্রকৃতি অতি সহজেই হৃদ্গত হইবে, বুঝিবার জন্য ব্যাখ্যার প্রয়োজন করিবে না। দৃশ্যগুলি অতি সুপরিচিত দ্রব্যের গ্রন্থনে রচিত, তাহাদের সৌন্দর্য্য সহজে পরিদৃশ্যমান। নগেন্দ্র-সূর্য্যমুখীর শয্যাগৃহবর্ণনে অতি মনোমুগ্ধকর নবীনত্ব থাকিলেও, সে দৃশ্যের গঠনসামগ্রী সকল হিন্দুপাঠকের অজ্ঞাত নহে, সহজেই তাহার সৌন্দর্য্য হৃদয়ঙ্গম হয়। "দীপ-নির্ব্বাণ" ও "ছায়া" নামক পরিচ্ছেদদ্বয়ের দৃশ্যটি অতুলনীয়, এরূপ অপূর্ব্ব চিত্র জগতের সাহিত্যপটে বিরল বলিতে হইবে। এ দৃশ্যে কবি যদি ভবভূতির "উত্তরচরিত" হইতে আভাসমাত্রও গ্রহণ করিয়া থাকেন, কবি স্বীয় প্রতিভাবলে তদুপরি যে উৎকর্ষ

সাধন করিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয়, পুরাতন কবিকে তাঁহার নিকট পরাভব মানিতে হইবে। এরূপ অপূর্ব্ব কবিত্ব ও কৌশলময়তা পৃথিবীর কবিগণমধ্যে সাধারণ নহে, এবং প্রথম শ্রেণীর প্রতিভারই উপযুক্ত। পাঠক প্রণিধান করিবেন উত্তরচরিতের "ছায়া" আর বিষবৃক্ষের "ছায়া" একই কথা নহে, এবং উভয় স্থলেই "ছায়া" শব্দটি একার্থে ব্যবহৃত হয় নাই। উত্তরচরিতের ছায়া কল্পনামাত্র অপ্রাকৃ কেবল কবির উদ্দেশ্যসাধন-বিষয়ে উৎকৃষ্ট কৌশল; বিষবৃক্ষের ছায়ায় অপ্রাকৃত কিছু নাই, বরং খুব সম্ভবপর ঘটনা, পাঠক সহজেই বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত। কালিদাসকেও, দুষ্মন্তের শকুন্তলা-বিস্মৃতি সম্ভবপর করিবার জন্য এবং দুষ্মন্তচরিত্রের গৌরবরক্ষার্থ, দুর্ব্বাসার শাপ ও অভিজ্ঞান-অঙ্গুরীয়ের কৌশল অবলম্বন করিতে হইয়াছে। সেখানেও পাঠককে কবি ঋষিবাক্যের অব্যর্থতায় বিশ্বাসবান্ হইতে অনুরোধ করিতেছেন, কিন্তু বঙ্গের কবি তাঁহার কৌশল প্রয়োগে পাঠকের বিশ্বাসের উপর এরূপ অপ্রাকৃতিক দাবি-দাওয়া কিছু রাখেন নাই। ইহাই বিষবৃক্ষের কবির বিশেষত্ব।

মনুষ্য-হৃদয়ের প্রীতি, প্রেম, বিভিন্ন ধারায় প্রস্রুত হইয়া, মানবসমাজে অমৃত সিঞ্চন করে। জননীর সন্তানবাৎসল্য, শিশুহৃদয়ের অস্ফুট আকারব্যক্ত প্রতিঘাত; পত্নীর পতিপ্রেম ও পতিভক্তি, স্বামীর ভার্য্যানুরাগ; সৌভ্রাত্র, সৌহার্দ্য, স্বজন-প্রীতি; উদার প্রেমপূর্ণ হৃদয়ের সার্ব্বজনীন প্রেম, পরোপকারীর পরসেবার আত্মোৎসর্গ; যাহাতে ভূতলে মানবের স্বর্গের সৃজন, বিষবৃক্ষে কবি তাহা চিত্রিত করিতে কুণ্ঠিতহস্ত হয়েন নাই। তাই এ কাব্যের নিত্যনূতনত্ব, পড়িলে কখনও পুরাতন হয় না। বাঙ্গালী, সকল ভুলিয়া, সকল হারাইয়া, এই মোহের বশে জীবনাতিপাত করিতেছে; তাহার শুষ্কতায় রসসিঞ্চন করিয়া, তাহার দারিদ্র্যে রত্নাধিকার প্রদানে, কবি তাহার আন্তরিক কৃতজ্ঞতার্জ্জন করিয়াছেন। সূর্য্যমুখীর পতিপ্রাণতা জগতে অতুলনীয়া,—যে হিন্দুর পত্নীত্বের আদর্শ, সেই হিন্দুর মধ্যেও বিরল। সে সাধ্বী পতিমাত্রজীবিতা গৌরবান্বিতা রমণীর সম্মুখে উপস্থিত হইলে সম্ভ্রম হৃদয়াধিকার করে; নগেন্দ্রনাথও, তাঁহার সাময়িক চিত্তবৈকল্যসত্ত্বেও, গৌরবান্বিত-চরিত্র, ভার্য্যাবৎসল পতির জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত, তাঁহারও প্রতি সম্মান ভিন্ন অন্য ভাবের উদয় হয় না; আর শ্রীশ-কমল যুবকযুবতী, প্রথম যৌবনের মত্ততামধ্যে এখনও বিভোর-চিত্ত; কবি তাহার মধ্যে স্নেহের পুত্তলি সতীশচন্দ্রকে সংস্থাপন করিয়া, সে উচ্ছ্বসিত প্রবমান প্রীতিদৃশ্যের রমণীয়তা সংবর্দ্ধন করিয়াছেন, তাহাতে সে প্রেমপ্রকৃতির পরিস্ফুরণের সহায়তা হইয়াছে;—অনন্ত-প্রেমময়ী কমলমণির নিত্যস্ফূর্ত্তি দেখিলে হৃদয় আনন্দসলিলে পরিপ্লুত হয়, চিত্ত-প্রসাদ সে চরিত্রের প্রভাবের অবশ্যম্ভাবী ফল। আর কুন্দনন্দিনীও প্রীতিপ্রদ চিত্র, তবে তাহার অদৃষ্ট-লিপি, কবি যে স্বর্গের ছবির সহিত তাহাকে মিলিত করিয়াছিলেন,

তাহার উপর ক্ষণিক বিষাদের ছায়া পাতিত করিয়া, একদিকে যেমন স্বর্গসুখের নিত্যত্বভ্রংশ কিরূপে ঘটে দেখাইয়াছে, অন্য দিকে, নিয়তির বলে, এ সংসারে স্বর্গের বস্তুও কিরূপে বিলয় প্রাপ্ত হয় প্রমাণ করিয়াছে। কুন্দের প্রতি দৃষ্টি করিলে, দয়া প্রীতি দুঃখ যুগপৎ হৃদয়ে উদ্বেলিত হয়। ভ্রাতার স্নেহ এবং ভগিনীর ভ্রাতৃপ্রেম, কবি বিশিষ্টরূপে চিত্রিত করিয়া না থাকিলেও, আভাসে বা স্বল্পমাত্র রেখাপাতে, নগেন্দ্র-কমলে একরূপ সুস্পষ্ট প্রতীয়মান; শ্রীশ-নগেন্দ্র এবং নগেন্দ্র ও হরদেব ঘোষালের বন্ধুতা সৌহৃদ্যের অতি সুন্দর দৃষ্টান্ত। কবির অনেক কাব্যেই হিন্দুজীবনাদর্শের অঙ্গীভূত সন্ন্যাসীর চিত্র সমাবিষ্ট হইয়াছে; হিন্দুর মহতী কল্পনার সৃষ্টি এবং প্রকৃত জীবনের কর্ম্মযোগী সন্ন্যাসিগণ, সার্ব্বজনীন প্রেমের অধীন হইয়া, চিরজীবন পরহিত-ব্রতে নিয়োজিত থাকেন। ব্রহ্মচারী শিবপ্রসাদ শর্ম্মা বিষবৃক্ষের সংসারত্যাগী লোকহিতব্রতধারী সন্ন্যাসী, মরণোন্মুখী সূর্য্যমুখীকে পুনর্জীবিতা করিয়া তিনি পাঠকের বিশেষ ভক্তি আকর্ষণ করিয়াছেন। কমলকে কেহই ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারে না। অনন্যচিন্তা পতিধ্যানে মগ্না সূর্য্যমুখীও ভালবাসিতেন। কমলই সে গাম্ভীর্য্যময়ী রমণীরত্নের নিভৃতে আলাপের ও মনোদুঃখ প্রকাশের একমাত্র স্থল ছিলেন; কিন্তু সূর্য্যমুখীর প্রতি কমলের ভালবাসা একটু ভিন্ন প্রকৃতির, তাহা কতকটা কমলের অকৃত্রিম ভ্রাতৃস্নেহের ফল; ভ্রাতৃজায়া এবং ভ্রাতার বিশেষ অনুরাগপাত্রী বলিয়া কমল তাঁহাকে ভাল বাসিতেন, কিন্তু প্রধানতঃ সে ভালবাসা কমলের সার্ব্বজনীন প্রেমের প্রকৃতিসম্ভূত। আমরা বলিয়াছি কমলের এ প্রেমের স্রোত কুন্দনন্দিনীতেও প্রবাহিত হইয়াছিল—বালিকা কুন্দ যখন তাঁহার ভ্রাতা কর্ত্তৃক তাঁহার হস্তে অর্পিত হইয়াছিল, তখন এক ভাবে, আর যুবতী কুন্দ যখন নগেন্দ্রের প্রণয়পাত্রী এবং নিজেও নগেন্দ্রানুরাগিণী, তখন অন্য ভাবে,—তাহার প্রণয়নৈরাশ্যে সহানুভূতিরূপে। নগেন্দ্র দত্তের গৃহে অগণিত আত্মীয়া-কুটুম্বিনী প্রতিপাল্য করিয়া কবি হিন্দুর স্বজনপ্রীতি এবং স্বজনোপকার-প্রবৃত্তিরও দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন।

একদিকে কবি যেমন স্বর্গের প্রকৃতি চিত্রার্পিত করিয়া মানবমনের উৎকর্ষ-সাধনের উপায় বিধান করিয়াছেন—সে চিত্রের ঔজ্জ্বল্যসম্পাদনাভিপ্রায়ে, তাহার প্রভাব মানব-হৃদয়ে গভীরাঙ্কিত করিবার উদ্দেশ্যে; অন্য দিকে তেমনই বিপরীত প্রকৃতির চিত্র সংস্থাপন করিয়া তৎপ্রতি ঘৃণার উদ্রেক করিয়া দেওয়ায়, তাঁহার কৌশলময়তা প্রদর্শিত হইয়াছে। হৈমবতী, দেবেন্দ্র দত্ত, হীরা দাসী এ বিসদৃশ চিত্রের স্থূলরেখ মূর্ত্তি। অবশ্য কবি দেবেন্দ্র দত্তকে রূপগুণসম্পন্ন করিয়া, তাঁহার জীবনে চরিত্রচ্যুতির কারণোদ্ভব ঘটাইয়া, অশ্রদ্ধার পাত্র হইলেও তাঁহাকে কতকটা ক্ষমার এবং সহানুভূতির যোগ্য করিয়া তুলিয়াছেন। কেহ কেহ পাঠক হৃদয়ে এরূপ চিত্রের ফল শুভ বলিয়া মনে করিবেন না; কেননা অনেক যুবক, জীবনের অবস্থা দেবেন্দ্র দত্তের সদৃশ হইলে,

তাহার পথানুসরণ তদ্বারা সমর্থন করিতে পারেন, জীবনে দুঃখের কারণকে চরিত্র-ভ্রষ্টতার দলিলস্বরূপ দোষদর্শীর সমক্ষে উপস্থাপিত করিয়া, স্বপথের স্বাভাবিকত্ব সংস্থাপনে চেষ্টিত হওয়া তাঁহাদের পক্ষে সম্ভাবিত। তবে অন্য দিকে নির্ম্মল স্বর্গসুখের ছবি নয়ন-সমক্ষে প্রতিভাত থাকিতে, দেবেন্দ্র দত্তের দৃষ্টান্ত, অনিষ্টের পথে তত কার্য্যকরী হইবে না, এরূপ আশা করা যাইতে পারে। বিশেষতঃ কবি, এ স্থলেও তাহার স্বাভাবিক কৌশলময়তার অনুসরণ করিয়া, দেবেন্দ্রের মাতুলপুত্র এবং হিতকামী সহৃদয় শীতল-কান্তি বিশুদ্ধচরিত্র সুরেন্দ্রকে তৎপার্শ্বে সংস্থাপিত করিয়া,—সেই ইন্দ্রিয়সেবার দৃশ্যের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াও তিনি কেমন আপন চরিত্রপবিত্রতা রক্ষা করিয়াছেন, পাপীকে ভালবাসিয়াও কেমন নিজকে পাপ-মুক্ত রাখিয়াছেন,—তাহা প্রদর্শন দ্বারা, সে দৃষ্টান্তের বিষময় ফলের একরূপ নিরাকরণ করিয়াছেন। দেবেন্দ্র স্বভাবতঃ রূপগুণ-সম্পন্ন ছিলেন এবং তাঁহার বিদ্যারও অভাব ছিল না, কিন্তু তাঁহার আত্মদমনের ক্ষমতার অভাবে সে সকলই বৃথা হইল; ইহাও শিক্ষার কথা, এবং সামান্য শিক্ষার কথা নহে। এই শিক্ষার জন্যই দেবেন্দ্র দত্তকে চরিত্রচ্যুত করিয়াও, কবি সে চরিত্রে গুণের সমাবেশ করিয়াছেন, এ শিক্ষায়ও কবির সেই উচ্চ নীতির কথা। চিত্তদমনের শিক্ষার অভাবে মানুষের চিত্তবিকার ঘটে, তাহা হইতেই মানুষের অধঃপতন ও দুঃখ-ভোগ। তাহার এ বিকার সাময়িক, দুঃখভোগও সাময়িক, যেমন নগেন্দ্র দত্তের; তাহার অধঃপতনে মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিলয়, যেমন দেবেন্দ্র দত্তের। গোবিন্দলাল ইহ জীবনেই দুঃখভোগ দ্বারা সংশোধিত হইয়া-ছিলেন, কিন্তু ইহ জীবনের সুখের অধিকার আর পুনঃ প্রাপ্ত হয়েন নাই, সর্ব্বদুঃখহরের পদারবিন্দে মনোনিবেশ করিয়া হৃদয়ের শান্তি লাভ করিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রের অধঃপতন বহুদূরগত, তাঁহার উদ্ধার, পর-কালের দুঃখভোগ ব্যতিরেকে, অসম্ভাবিত। দেবেন্দ্রের ইহ জীবনের পরিণাম রোগভোগ, সুখের অনুসন্ধানে নিরন্তর চিত্তের অশান্তি, এবং মনুষ্য-সমাজে চিরদিনের জন্য আত্ম-বিলোপ। ইহা কি প্রত্যেক যুবকের পক্ষেই শিক্ষাস্থল নহে? দেবেন্দ্র দত্তে কবি স্বাভাবিক চিত্রই অঙ্কিত করিয়াছেন, শিক্ষার মানসে দৃষ্টি করিলে, সে চিত্রে শিক্ষার নিস্ফলতা কিছু আছে বা তাহা নৈতিক অধোগতিকে প্রোৎসাহিত করিতে পারে, এরূপ মনে করা সঙ্গত হইবে না। আর একটি বড় কথা। মানুষ কদাচিৎ ইচ্ছা করিয়া নরকের পথে হাঁটে। মনুষ্য-প্রকৃতির দুর্ব্বলতাই প্রায় সর্ব্বত্র মানুষের অধঃপতনের কারণ, এবং অনেক স্থলেই সে দুর্ব্বলতা ক্ষমার চক্ষে দেখিবার যোগ্য হইতে পারে। এ কথার ব্যত্যয় থাকিলে তাহা কাব্যে চিত্রিত করিয়া মনুষ্য-সমাজের কোন উপকার করা হয় কি না সন্দেহ। এরূপ স্থলে, কঠোর নৈতিকের চক্ষে দৃষ্টি করিয়া, দুর্ব্বলকে নিরবচ্ছিন্ন ঘৃণার পাত্র করিয়া প্রদর্শিত করাই সমাজের মঙ্গলকর, না, পাপের প্রতি ঘৃণার উদ্রেক করিয়া দিয়া, পাপীকে ভালবাসাইতে পারিলেই, মনুষ্য-

সমাজকে অধিকতর সুখের স্থান করিতে পারা যায়? আমাদের বিশ্বাস, মানুষ যতই মানুষকে বুঝিবে, মনুষ্যমধ্যে যতই প্রীতির ভাব বিস্তৃতি লাভ করিবে, মনুষ্যসমাজ ততই উন্নত ও সুখশান্তির স্থান হইবে। বঙ্কিমচন্দ্র তাই তাঁহার কাব্যসমূহে প্রীতির সংসার সৃজনে প্রয়াস পাইয়াছেন, অবিমিশ্র ঘৃণার পাত্র সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করেন নাই; কেননা, সেরূপ চিত্র দ্বারা সংসারের প্রকৃত উপকার সাধিত হয় না। ইয়াগো-চিত্রে চিত্রকরের নৈপুণ্য থাকিলেও, সেরূপ চিত্র সমাজের বিশেষ কাজে আসে বলিয়া বোধ হয় না। মানুষে দেবচরিত্র সম্পূর্ণ অনুকরণ-যোগ্য না হইলেও, তাহা আদর্শের কাজ করে; কিন্তু নিরন্তর দুর্জ্জনতার চিত্র, ফলে যাহা তৎসামগ্রীতে গঠিত না হইলে কেহ অনুকরণ করে না এবং করিতেও পারে না, কল্পিত বা কদাচিৎ দৃষ্ট সেই প্রকৃতির প্রতি মনুষ্য-মনের কঠোর ঘৃণার ভাব জন্মাইয়া দিয়া কতক পরিমাণে মানুষের প্রতি মানুষের বিরাগের ভাব উদ্ভূত করে। মন্দ মানুষও সাধারণতঃ যেরূপ হইয়া থাকে, বঙ্কিমচন্দ্র তাহাই চিত্রিত করিয়াছেন। তাঁহার দেবেন্দ্র দত্তও, সুতরাং, মন্দ হইলেও নিরন্তর দুর্জ্জনতার চিত্র নহে। দেবেন্দ্রের অধঃ-পতনের স্বাভাবিক কারণ সংযোজনার জন্ম দেবেন্দ্র স্বয়ং দায়ী ছিলেন না, তাঁহার পিতা কর্তৃক ইহার সংঘটন হইয়াছিল। যদিও তাঁহার পিতা সদুদ্দেশ্যেই, পুত্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অবস্থাঘটিত অন্ধতাবশতঃ এরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তথাপি সে দিকেও সমাজের শিক্ষার প্রয়োজন আছে, কবি বোধ হয় তাহাও অনুভব করিয়াছিলেন। আবার হৈমবতীদিগের প্রভাবে সমাজে কি কুফলের আবির্ভাব হইতে পারে, তাহাও কি পাঠিকাগণের পক্ষে প্রদর্শনীয় নহে? হীরাচরিত্রের কতক ভাগ স্বাভাবিক কারণ-সম্ভূত এবং ক্ষমার চক্ষে দেখিবার যোগ্য হইলেও, তাহার ঈর্ষা ও পরের অহিতচিন্তামূলক চরিত্র অতি ঘৃণার জিনিস এবং তাহা নরকেরই চিত্র। হৈমবতীই এ সুখবিরোধী চিত্রের প্রধান দ্রষ্টব্যস্থল, এবং কবি অতি অল্প রেখাপাতে তাহা সুস্পষ্ট করিয়াছেন। অন্যান্য কথা বারান্তরে।

শ্রীলোকনাথ চক্রবর্ত্তী।

স্ত্রৈণ।

নিত্যানন্দপুরের যজ্ঞেশ্বর চাটুয্যের দাড়ি-গোঁফ-বর্জ্জিত শ্রীমুখ-পঙ্কজ কোন দিন প্রভাতে কাহারও দৃষ্টিপথে নিপতিত হইলে আর তাহার রক্ষা নাই; সে দিন তাহার উপবাস সুনিশ্চিত, ইহা গ্রামের আবাল বৃদ্ধ বনিতার ধ্রুব বিশ্বাস!

যজ্ঞেশ্বরের পিতা ৺গোপীমোহন চট্টোপাধ্যায় ওরফে গুপীঠাকুর মহাকুলীনের সন্তান ছিলেন, তিনি যৌবনারম্ভের পূর্ব্বে সাঁইত্রিশটি, যৌবনে ছাপ্পান্নটি ও বার্দ্ধক্যে ছয়টি মাত্র বিবাহ করিয়া নিরেনব্বুইটি কন্যাদায়-গ্রস্ত উমেদারের দুশ্চিন্তার ভার

হরণ করিয়াছিলেন, সুতরাং তিনি যে মহা পুণ্যবান প্রাতঃস্মরণীয় লোক ছিলেন সন্দেহ কি? এমন পুণ্যাত্মা লোকের সন্তান হইয়া যজ্ঞেশ্বর প্রভাতে যাহাকে মুখ দেখাইত, তাহার অদৃষ্টে সে দিন অন্ন জুটিত না, ইহা বিধাতার ভ্রম ভিন্ন আর কি বলিব?

গুপীঠাকুর গঙ্গালাভের পূর্ব্বে কি করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন, বলা কঠিন। কারণ তাঁহার জীবনের ইতিহাস এ পর্য্যন্ত সংগৃহীত হয় নাই। তবে বিবাহই যে তাঁহার উপজীবিকা বা পেষা ছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। এ বিষয়ে তিনি বড় ভাগ্যবান ছিলেন, তিনি দুইবার পূর্ব্ববঙ্গে কোন আত্মীয়ের বিবাহে বরযাত্রী হইয়া গিয়াছিলেন, সেই দুইবারই তিনি দুইটি কুলীন-কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া আসিয়াছিলেন, একটি কুলীনকুমারী তাঁহার অপেক্ষা সাতাশ বৎসরের বড়, আর একটি ছত্রিশ বৎসরের ছোট, কিন্তু বয়স সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন, তাঁহার কৌলীন্য-মর্য্যাদা বজায় থাকিলে অন্ধ খঞ্জ বিকলাঙ্গ বালিকা বৃদ্ধা কিছুতেই তাঁহার আপত্তি ছিল না। তিনি বলিতেন, ভদ্র লোকের কন্যাদায় মোচন করা বড় ভাগ্যের কথা।

গুপীঠাকুরের বয়স যখন ছাপান্ন বৎসর সেই সময় নিত্যানন্দপুরের জোতদার ষষ্ঠীবর মুখোপাধ্যায় তাঁহার একমাত্র কন্যা কালীতারাকে তাঁহার হস্তে সম্প্রদান করেন। ষষ্ঠীবর বড় ধর্ম্মনিষ্ঠ ও আচার-পরায়ণ ব্রাহ্মণ ছিলেন, কুলীনপুত্রদের তিনি সাক্ষাৎ দেবতা মনে করিতেন, তিনি বুঝিয়াছিলেন, গোপীমোহন রূপে গুণে কুলে শীলে সকল বিষয়ে কালীতারার যোগ্যবর,—তবে কি না বয়স একটু বেশী, তা কুলীনের ঘরে এমন হইয়া থাকে।

সম্বৎসরকাল শ্বশুরবাড়ী গুলিতে ঘুরিয়া গুপীঠাকুরের অশন-বসনের সংস্থান হইত, তিনি এক আধটু গুলি ভক্ষণ করিতেন—এজন্য সর্ব্বদা স্থান পরিবর্ত্তনে তাঁহার মৌতাতের বড় ব্যাঘাত ঘটিত, কিন্তু রতনে রতন চেনে, তিনি যেখানেই যাইতেন, আড্ডা খুঁজিয়া লইতে তাঁহার বিলম্ব হইত না। একবার কোন দূরতর পল্লীস্থ শ্বশুর-বাড়ী গমনোপলক্ষে তাঁহাকে নিত্যানন্দ-পুরের ভিতর দিয়া যাইতে হয়, সেখানকার এক আড্ডায় ষষ্ঠীবরের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়,—সেখানেই ষষ্ঠীবর গোপীমোহনের সহিত কন্যার সম্বন্ধ স্থির করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

ষষ্ঠীবরের সাংসারিক অবস্থা সচ্ছল ছিল। কালীতারা ভিন্ন তাঁহার অন্য সন্তান সন্ততি ছিল না; গোপীমোহন ভাবিয়া দেখিল, বৃদ্ধাবস্থায় উদরান্নের চেষ্টায় দেশে দেশে শ্বশুরবাড়ী ঘুরিয়া বেড়ানো বড় কষ্টকর, বিশেষতঃ তাহার শ্বশুরেরা প্রায় সকলেই দরিদ্র, সকলে তাহার কৌলীন্য-মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলিতে পারে না, এ অবস্থায় ষষ্ঠীবরের কন্যাটির পাণিগ্রহণ করিয়া এই নূতন শ্বশুরের স্কন্ধে কায়েমীভাবে ভর করিলে অন্নবস্ত্র-সংগ্রহের চেষ্টা হইতে সে মুক্তি লাভ করিতে পারিবে; সুতরাং বিবাহে তাহার আপত্তি হইল না। ষষ্ঠীবরের কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া সে সেখানেই

রহিয়া গেল। এবং গ্রামে 'জামাই-ঠাকুর' নামে সর্ব্বজন পরিচিত হইয়া উঠিল।

২

গুপীঠাকুর ছিয়াত্তর বৎসর বয়সে স্বষ্টীবরের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী একপুত্র রাখিয়া এবং নিরনব্বুইটি রমণীর হাতের নোয়া ও সিঁথির সিন্দুর ঘুচাইয়া সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করিলে, গ্রামের লোকেরা বলিল, এতদিনে বাঙ্গালাদেশে একটি খাঁটি মহাকুলীনের অভাব ঘটিল, কুলীন-সমাজের একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র খসিয়া পড়িল।

গোপীমোহনের পুত্র যজ্ঞেশ্বর বিবাহ বিষয়ে পিতার আদর্শের অনুকরণ করে নাই। সে এক পত্নীতেই সন্তুষ্ট ছিল; মাতামহের জোত-জমাতেই তাহার সংসার চলিতে লাগিল বটে, কিন্তু সে উচ্চাভিলাষী ছিল, তেজারতি, মহাজনী প্রভৃতি নানা উপায়ে সে সম্পত্তি বৃদ্ধি করিতে লাগিল; কিন্তু তাহাতে তাহার অর্থপিপাসা প্রশমিত হইল না. শেষে সে বহু চেষ্টায় একটা ষ্ট্যাম্প-ভেণ্ডরী জুটাইয়া লইয়া নিত্যানন্দপুরের মুনসেফী আদালতের কাছে একটা বটগাছের তলায় দোকান খুলিয়া বসিল এবং ডেমী, কোর্টফি, 'ইষ্টাম্বর' কাগজ প্রভৃতি বিক্রয় করিতে লাগিল।

যজ্ঞেশ্বরের উপার্জ্জনের আরও একটা পন্থা ছিল। মফস্বলের অনেক লোক মুনসেফী আদালতে মামলা করিতে আসিত; কাহারও হঠাৎ দুই পাঁচ টাকার আবশ্যক হইলে যজ্ঞেশ্বরের নিকটে আসিলেই সে টাকা পাইত, কিন্তু তাহাকে অঙ্গীকার করিতে হইত, পরদিন এক টাকা সুদসমেত সে ঋণ পরিশোধ করিবে। মামলা নষ্ট হয় দেখিয়া অনেক মক্কেল উকীলকে জামিন রাখিয়া যজ্ঞেশ্বরের নিকট এই ভাবে টাকা কর্জ্জ লইত। যজ্ঞেশ্বর পয়সা হাতে রাখিত না, কোন উপায়ে আটটি পয়সা হাতে হইলেই সে দুয়ানি গাঁথিত, ক্রমে দুয়ানি হইতে শিকি, শিকি হইতে আধুলি—তাহার পর টাকা। কোনরূপে একটি টাকা জমিলে যজ্ঞেশ্বর কখন তাহা ভাঙ্গাইত না।

যজ্ঞেশ্বরের স্ত্রী একটি পুত্র ও একটি কন্যা রাখিয়া ইহলোক ত্যাগ করিলে সে নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল, যজ্ঞেশ্বর সর্ব্বদাই আক্ষেপ করিয়া বলিত তাহার স্ত্রীর ন্যায় অমিতব্যয়ী ভূ-ভারতে আর দেখা যায় না। যজ্ঞেশ্বরের স্ত্রী পূজা-পার্ব্বণে দুই চারিটি পয়সা খরচ করিতেন ইহাই তাহার অভিযোগের কারণ। একটা প্রধান অপব্যয়ের হাত হইতে মুক্তি লাভ করিয়া যজ্ঞেশ্বর কিছুদিন নিশ্চিন্ত মনে অর্থ সঞ্চয় করিল, তাহার পর সুযোগ বুঝিয়া এক দিন পাকাচুলে কলপ লাগাইয়া, লাল চেলি পরিয়া ও টোপড় মাথায় দিয়া কালান্তর হইতে একটি পঞ্চদশী যুবতীকে বিবাহ করিয়া আনিল! সে সময় তাহার কন্যা হীরামণির বয়স কুড়ি বৎসর, চারি বৎসরের একটি পুত্র কোলে লইয়া সেইবার হীরামণি বিধবা হইয়াছিল। শ্বশুরকুলে তাহার কেহ ছিল না বলিয়া হীরামণি পিতৃগৃহেই বাস করিতে লাগিল।

যজ্ঞেশ্বরের পুত্র বিশ্বেশ্বর হীরামণির দুই বৎসরের বড়, সে কলিকাতায় বিবাহ করিয়া সেখানে শ্বশুরালয়ে বাস করিত, একটা আফিসে কেরাণীগিরি করিয়া তাহার সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইত। বিশ্বেশ্বর

উপার্জ্জনের সমস্ত টাকা পিতাকে পাঠাইত না বলিয়া যজ্ঞেশ্বর পুত্রের প্রতি সন্তুষ্ট ছিল না। চাকরী আরম্ভ করিয়া বিশ্বেশ্বর দুই একবার পূজার ছুটিতে সস্ত্রীক বাড়ী আসিয়াছিল, কিন্তু পিতার কার্পণ্যে ও বিমাতার ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া সে নিত্যানন্দপুরের সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়াছিল। বিধবা ভগিনীটিকে সে মধ্যে মধ্যে সাহায্য করিত।

যজ্ঞেশ্বর বন্ধুগণের নিকট আক্ষেপ করিয়া বলিত, "একালের ছেলেগুলা স্ত্রীর অত্যন্ত বাধ্য, মা বাপকে গ্রাহ্য করে না, অপব্যয়ী, সাহেবী মেজাজ, ঘোরতর বেতরিবৎ"—ইত্যাদি।

৩

কলিতে যে বয়সে বাণপ্রস্থাবলম্বনের ব্যবস্থা আছে—তাহা অপেক্ষাও অধিক বয়সে যজ্ঞেশ্বর সেই পঞ্চদশবর্ষীয়া কুলীন দুহিতাকে বিবাহ করিয়াছিল। গৃহে অন্নবস্ত্রের সংস্থান থাকিলে কেহ এমন পাত্রে কন্যা সম্প্রদান করে না, সুতরাং বিবাহের পর পিত্রালয়ের সহিত নব বধূর সম্বন্ধ বিলুপ্ত হইল।

বৃদ্ধ বয়সে বিবাহ করিয়া ষ্ট্যাম্পভেণ্ডর যজ্ঞেশ্বরের যৌবনকাল আবার নূতন করিয়া ফিরিয়া আসিল। সে পাকা গোঁফ কামাইয়া ফেলিল; কলপ-ব্যবহারের সুযোগ থাকিলে না কামাইলেও চলিত বটে, কিন্তু কলপ কিনিতে পয়সা খরচ হয় এবং কাহারও নিকট হইতে নিত্য তাহা চাহিয়াও গোঁফ কালো করা চলে না। তাহার মাথায় একটি টিকি ছিল—ছাঁটিয়া তাহার আকার ছোট করিয়া লইল এবং স্বদেশ-প্রেমিক ব্যক্তিরা একালে যেমন বিলাতী বস্ত্র বর্জ্জন করিয়াছেন, সে সেই ভাবে থান বর্জ্জন করিয়া কালাপেড়ে ধুতি পরিতে আরম্ভ করিল। এ সময় যদি কেহ জিজ্ঞাসা করিত, 'চাটুয্যে মশায়, আপনার বয়স কত হই য়াছে?' তাহা হইলে যজ্ঞেশ্বর খুব গম্ভীর হইয়া বলিত, "বয়স আর কম কি, চল্লিশ পার হয়ে গিয়েছে!"

মায়ের মৃত্যুর পর হইতে হীরামণি সংসারের কর্তৃত্ব করিয়া আসিতেছিল। বিবাহের পর দুই মাস যাইতে না যাইতে সামান্য সামান্য বিষয় লইয়া, যজ্ঞেশ্বরের 'দ্বিতীয় পক্ষে'র সহিত তাহার মনান্তর আরম্ভ হইল, এবং ক্রমে মনান্তর হইতে কলহের সৃষ্টি হইল। যজ্ঞেশ্বরের সংসারে অশন-বসনের ব্যবস্থা যে অতি শোচনীয় ছিল তাহা না বলিলেও চলে; এক পয়সার চিংড়ি বা পুঁটী মাছ ও দুই পয়সার তরকারী দৈনন্দিন বাজার নির্দ্দিষ্ট ছিল। নূতন গৃহিণী হওয়ার পর কি ভাবিয়া জানি না বাজারের বরাদ্দ কিছু বাড়িয়াছিল,কোন দিন দেড় পয়সা কোন দিন বা দুই পয়সা পর্য্যন্ত 'দুনো দুনি আর কি' বেশী খরচ হইত! শেষ বয়সের বিবাহের পর যজ্ঞেশ্বরের হাত খুলিয়া গিয়াছিল, লোকে বলাবলি করিত, লক্ষণ ভাল নয়।

হীরামণি স্বয়ং রন্ধন করিত; বিশ্বেশ্বর তাহার ছেলের জন্য দৈনিক আধসের দুধের রোজ করিয়া দিয়াছিল, কিন্তু আধসের দুধে চারিবৎসরের ছেলের পেট ভরে না, কাজেই সে বার দুই মাছভাত খাইত, পিতার পাতে সুতরাং চিংড়ি পুঁটী বড় বেশী স্থান পাইত না। যজ্ঞেশ্বর কোনদিন সে

জন্ম অসন্তোষ প্রকাশ করিত না। কিন্তু নূতন বৌ কুসুম হীরামণির পক্ষপাত দেখিয়া দেখিয়া আর স্থির থাকিতে পারিল না। একদিন রাত্রে আহারাদির পর যজ্ঞেশ্বর তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে গুড়গুড়িতে তামাক খাইতেছে এমন সময় শয্যাপ্রান্তস্থিত নববধূর অস্ফুট ক্রন্দনোচ্ছ্বাস তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল।

যজ্ঞেশ্বর গুড়গুড়ির নল ফেলিয়া ব্যগ্র ভাবে বলিল, "কুসুম, কাঁদিতেছ কেন?" কুসুম বলিল, "আমাকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও, আমি এখানে এত কষ্ট সহ্য করিতে পারিব না।"

যজ্ঞেশ্বর সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল "কেন, তোমার কষ্টটা কি?"

কুসুম বলিল, "কষ্ট নয় কি, কষ্ট দিতে বাকি রাখচো কি? তুমি বুড়ো হয়েছ, চোখে কিছু দেখতে পাও না। যে মাছ আন, তোমার মেয়ে ছেলের পাতেই সব ঢেলে দেয়, আর যারা আছে তারা কি দিয়ে ভাত খায় সে বিবেচনা নেই। বুড়ো বাপকে পর্য্যন্ত ফাঁকি দেয়! তা বলতে গেলেই আবার যা নয় তাই বলে গাল, কেনরে বাপু আমি ত নিজের জন্ম বলিনি 'যে এলো চষে সে থাকবে বসে' বাড়ীর কর্ত্তার উপর যেখানে দরদ নেই এমন সংসারে কি মানুষ থাকে?"

যজ্ঞেশ্বর বলিল, "আচ্ছা আমি কাল তোমার এ দুঃখ দূর করবো। তুমি কেঁদ না।" স্ত্রী যে সংসারে পদার্পণ করিয়াই তাহার দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করিতে শিখিয়াছে, ইহাতে তাহার আনন্দের সীমা রহিল না।

পরদিন যজ্ঞেশ্বর হীরামণিকে বলিল, "হীরেমণি আমার সংসারের অবস্থা ত এই, কত কষ্টে যে তোকে প্রতিপালন করচি, তা মা কালীই জানেন; তা তোর আক্কেল কি রকম বল দেখি! তোর নূতন মা ছেলে মানুষ, সে লজ্জায় তোকে কোন কথা বলতে পারে না, তার খাওয়া দাওয়ার সুবিধা অসুবিধা ত তোকে দেখ্তে হয়। মাছ রাঁধিস্ তাকে দু'এক খান দিস্। তোর এত বয়স হলো, আজ ও মাকে ভক্তি করতে শিখ্লি নে?"

হীরামণি কিঞ্চিৎ মুখরা, সে গালে হাত দিয়া জিহ্বা দংশন করিয়া বলিল, "ও মা কি লজ্জার কথা! আমি নূতন মাকে মাছ তরকারী খেতে দিইনে, শুধু ভাত দিই, এ কথা তোমাকে কে বল্লে? তুমি বাজার থেকে এক পয়সার মাছ আন, রেঁধে বেড়ে তা তোমাদেরই দিই; আমি বিধবা মানুষ, আমি কি মাছ খাই যে তুমি আমাকে এমন কথা বলচো? আমার রাম মাছ খেতে একটু ভাল বাসে, তা তোমাদের কম পড়বে ভেবে আমি তাকে এক খানার বেশী দু'খানা মাছ দিইনে। আচ্ছা, কাল থেকে আর তাকে মাছ খেতে দেব না।"

যজ্ঞেশ্বর বলিল, "এই উল্‌টো বুঝলি। আমি কি তোর ছেলেকে মাছ খাওয়াতে বারণ করচি? আমি বলচি, রামা ছেলে মানুষ, বেশী মাছ খাওয়ালে ওর পেটের ব্যারাম হতে পারে। খাওয়ার দোষেই ছেলে পিলের ব্যামো হয়।"

হীরামণি হাত নাড়িয়া বলিল, "আমার

দুধের ছেলে, দুধ পায় না তাই দু'বেলা দু'মুঠো ভাত খায়, এই জন্যে এত খোঁটা। আমার অদেষ্টে বেস্তর দুঃখ না থাক্‌লে আমারই বা হাতের নোয়া ঘুচবে কেন, আর তুমিই বা, বুড়ো বয়সে আবার একটা বিয়ে করে বস্‌বে কেন ?”

দ্বিতীয় বার বিবাহ করিবার পর, যজ্ঞেশ্বরকে কেহ বুড়া বলিলে, সে কথা তাহার সহ্য হইত না। সে আগুণ হইয়া বলিল, “কি, তোর যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা? আমি বুড়ো! ফের যদি তুই আমার বয়স তুলে কথা বলবি ত তোর ভাল হবে না বল্‌চি। বাপ বলে আমি অনেক সহ্য করচি, পড়েছিস্ ভাল মানুষের হাতে—” যজ্ঞেশ্বর রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে ষ্ট্যাম্প ও ডেমির বাণ্ডিল লইয়া কাছারি চলিল।

কুসুম বলিল “পান নিয়ে যাও, তোমার জন্যে যে মসলা দিয়ে পান তৈয়ারী করে রেখেছি। আমার মাথা খাও পান খেয়ে যাও।”

যজ্ঞেশ্বর তৎক্ষণাৎ জল হইয়া গেল।

৪

সেই দিন হইতে হীরামণি ছেলের পাতে মাছ দেওয়া বন্ধ করিল।

কিন্তু আর এক উপসর্গ উপস্থিত হইল, যজ্ঞেশ্বরের আফিংয়ের ধাত, রাত্রে একটু দুধ না খাইলে সে বাঁচিত না। সেই জন্য সে নিজের জন্য আধসের দুধের বরাদ্দ করিয়াছিল, কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষের গৃহিণীকে বঞ্চিত করিয়া অতি কৃপণেও স্বয়ং দুধ খাইতে পারে না, এই জন্য আর আধসের দুধের রোজ ছিল। এই এক সের দুধ জ্বাল দিয়া হীরামণি তাহা পিতার ও বিমাতার জন্য তুলিয়া রাখিত। তাহার ছেলের দুধ সে পৃথক ভাবে জ্বাল দিত।

যজ্ঞেশ্বরের নিকট ঘোষাণীর অনেক টাকা পড়িয়াছিল। ক্রমাগত তাগাদায় টাকা না পাইয়া সে দুধে জলের মাত্রা বাড়াইয়া দিল। যজ্ঞেশ্বর দেখিল, দুধ সাদা বটে, কিন্তু তাহার কোন স্বাদ নাই! একদিন রাত্রে সে আহারে বসিয়া বলিল, “কুসুম, ঘোষাণী আজ কাল কি রকম দুধ দিচ্ছে? গুড় দিয়েও যে এ দুধ মিষ্টি হয় না।”

কুসুম বলিল, “ঘোষাণীর দোষ কি? তোমার মেয়ে নিজের ছেলেকে দিয়ে সব দুধ খাইয়ে জল ঢেলে রাখ্‌বে, তা দুধ মিষ্টি হবে কোথা হ'তে?”

পরদিন যজ্ঞেশ্বর আবার হীরামণিকে তিরস্কার করিল। অনাথা নিরুপায় বিধবা পিতার তিরস্কার শুনিয়া ছেলেকে কোলে লইয়া অনেক ক্ষণ নীরবে কাঁদিল। তাহার পর চক্ষু মুছিয়া ভাত রাঁধিতে গেল।

কয়েকদিন উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা ঘটিল না। একদিন যজ্ঞেশ্বর বাজার হইতে আধ পয়সার নতি (পটলের পাতা) আনিয়া হীরামণিকে বলিল, “আজ নতির বড়া কর, অনেক দিন নতির বড়া খাওয়া হয়নি।”

হীরামণি বলিল, “এ আর শক্ত কাজ কি? ছটাক খানেক তেল এনে দাও।”

আধ পয়সার নতির বড়ায় একছটাক তেল! যজ্ঞেশ্বর রাগে জ্বলিয়া উঠিল, বলিল “সংসার খরচের জন্য আধপোয়া তেলের বরাদ্দ আছে, তিনটি মানুষের রান্নায় কি সব তেল খরচ হয়, সংসার করিস—আধ ছটাক তেলও বাঁচাতে পারিস্‌নে? যা পাবি সব

খরচ করে বস্‌বি, নিজের সংসার হলে কি করতিস্‌?”

হীরামণি বলিল “আমাকে এক মুঠো খেতে দিয়ে আজকাল তুমি সদাই খোঁটা দেও, আমার যেমন আর মরবার যায়গা নেই, তাই তোমার দুয়োরে দাসীগিরি করতে হচ্ছে! তেল কি আমি চুমুক দিয়ে খাই? আধ পোয়া তেলই বা কতটুকু? রান্না, মাথা, প্রদীপ-জ্বালা—সব সেই তেলে, তার উপর আবার বাঁচাতে হবে! এমন গিন্নিমো আমাকে দিয়ে হবে না, যে পারে সে করুক।”

“আমার যেমন কাজ ছিল না, তুত্তোর বড়া!” বলিয়া যজ্ঞেশ্বর সরোষে নতির আটিটা আস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করিল। সে দিন সে রাগ করিয়া কিছু খাইল না, শুষ্কমুখে দপ্তরটি লইয়া কাছারী চলিল।

কুসুম স্বামীর জন্য কিছু জলখাবার আনাইয়া রাখিল। স্বয়ং দুধ না খাইয়া সমস্ত দুধ ভাল করিয়া জ্বাল দিয়া রাখিল। সন্ধ্যার সময় যজ্ঞেশ্বর ভোগুারী করিয়া বাড়ী ফিরিলে কুসুম পতিভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া তাহাকে জল খাইতে দিল। ক্ষুধাতুর বৃদ্ধ ‘দ্বিতীয় পক্ষে’র পতিভক্তিতে মুগ্ধ হইয়া পরিতৃপ্ত ভাবে বলিল “আজ ত দুধটা বেশ লাগলো।”

কুসুম বলিল, “বেশ লাগবে না কেন? আজ যে আমি নিজে জ্বাল দিয়েছি, আজ তোমার মেয়ে দুধে জল মিশাতে পারেনি। তুমি ওবেলা তাকে তেলের কথা কি বলেছিলে, সে সমস্ত দিন রাগে গর গর করচে, বলেছে সে আর সংসারের কাজ করতে পারবে না; ভাইকে পত্র লিখে তোমাকে জব্দ করবে। মা গো মা, এমন মেয়ে বাপের জন্মে দেখিনি। বাপের একটা কথা গায়ে সয় না? এত তেজ! আমি তো চোখের মাথা খাইনি, সে কি করে না করে আমি সব দেখতে পাই। চাল বল, তেল বল, নুন বল—সব জিনিষ সে ভুলোর মাকে দিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে বিক্রী করে। হাতে কি কম পয়সা জমিয়েছে, গয়না বন্দক রেখে মহাজনী করচে।”

যজ্ঞেশ্বর বলিল “বটে! এ কথা এতদিন বলতে হয়! তাই ত বলি, মাসে দেড় মণ চাল কিনি, তাতেও কুলোয় না, দু’সের নুনে মাস যায় না। হারামজাদী দেখচি আমাকে ফেরার করবে, এমন উপায়?”

কুসুম বলিল, “উপায় আর কি? ভাঁড়ারের ভার ওর হাতে থাকলে কিছুতেই কুলোবে না!”

যজ্ঞেশ্বর বলিল, “তবে তুমি ভাঁড়ারের ভার লও। ও দু’বেলা দু’টো রেঁধে দিতে পারে দেক—না পারে তুমি ছেলেমানুষ দু’বেলা হাঁড়ি ঠেলতে পারবে কি?”

কুসুম বলিল, “আমার সংসার আমি না পারলে আর কে পারবে? দু’বেলা দু’টো রাঁধে, সে জন্য ওর কথা শুনতে হয়, তুমি ত সে সব কথা শুনতে পাও না। আমার কাণ ঝালাপালা হয়ে গেল। আমি বলি কি, ওকে এক বেলার মত চাল ডাল দিয়ে বলা যাক্‌ ও আলাদা যায়গায় রান্না করে থাক্‌, আমাদের কোন জিনিষ ওর হাত দেবার দরকার নেই।”

যজ্ঞেশ্বর বলিল, “তুমি খুব ভাল কথা

বলেছ, পাকা গিন্নির মত কথা বলেছ, কাল থেকে দাও ওকে পৃথক করে। কি করি গলায় পড়েছে, তাড়াতে ত পারবো না।”

কুসম বলিল “আহা তা কেন করতে গেলে! হাজার হোক নিজের মেয়ে ত বটে, ও যাই কেন করুক না, ওকে দু'মুঠো খেতে দিতেই হবে। এত ধর্ম্মজ্ঞান, বুড়া একেবারে গলিয়া গেল।

৫

যজ্ঞেশ্বরের যে কথা সেই কাজ। পর দিন হইতে কুসুম সংসারের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী হইল। সে হীরামণিকে একবেলার উপযুক্ত চাউল, ডাল, লবণ, তেল দিয়া বলিল “তোমাকে আর আমাদের সংসারের কাজও করতে হবে না, দশ কথা শুনিয়েও কাজ নাই, এই নাও তোমার সিদে, আলাদা করে রেঁধে খাও।”

হীরামণি পিতার ব্যবহারে মর্ম্মাহত হইল। সে বলিল, “আমার চাল-ডালে দরকার নেই, আমার দু'তোলা সোনাদানা আছে, তাই বিক্রি পরে আমার যে দশদিন চলে চলুক, তার পর অদেষ্টে যা থাকে হবে, চাল-ডাল দিয়ে আমার কোন দিন কি খোঁটা দেবে, অমন ভাতের পায়ে দণ্ডবৎ।”

হীরামণি শৈশবকালে অল্প লেখাপড়া শিখিয়াছিল, সে কোথা হইতে কাগজ ও দোয়াত-কলম সংগ্রহ করিয়া আনিল, তাহার পর দাদাকে পত্র লিখিতে বসিল। পত্রে সে পিতার ও বিমাতার ব্যবহারের সকল কথা আমুপূর্ব্বিক লিখিল, পিতার সংসারে আর তাহার স্থান নাই, স্বামীর কুলেও আর তাহার কেহ নাই, এখন দাদা যদি তাহাকে দু'টি খাইতে না দেন, তাহা হইলে তাহাকে অনাহারে মরিতে হইবে। আত্মহত্যা করিয়া সে সকল জ্বালা জুড়াইতে পারিত, কিন্তু রামার মুখ চাহিয়া সে মরিতে পারিতেছে না—ইত্যাদি। পত্রখানি লিখিয়া ঘোষাণীকে দিয়া সে তাহা ডাকঘরে পাঠাইল।

বিশ্বেশ্বর যথাকালে সকল কথা জানিতে পারিয়া মনে বড় আঘাত পাইল। কিন্তু সে শ্বশুরবাড়ীতে বাস করে, সেখানে ভগিনীকে লইয়া যাইবার সুবিধা নাই, অগত্যা সে তাহার ভরণ-পোষণের ব্যয় স্বয়ং গ্রহণ করিতে সম্মত হইল, এবং প্রতিমাসে তাহার খোরাকীর টাকা পাঠাইতে লাগিল, সেই টাকায় হীরামণি পৃথক ভাবে রাঁধিয়া খাইতে লাগিল। বিশ্বেশ্বর পিতাকে এ সম্বন্ধে কোন কথা না লেখায় যজ্ঞেশ্বর পুত্রের প্রতি খড়্গহস্ত হইয়া উঠিল।

হীরামণি ছেলেটির মুখের দিকে চাহিয়া অতি কষ্টে দিন কাটাইতে লাগিল। এই ভাবে এক বৎসর কাটিয়া গেল। রামা পাঁচ বৎসরের হইল।

রামা ছেলেমানুষ হইলেও দাদা মহাশয়ের উপেক্ষা বেশ বুঝিতে পারিত। সে দেখিত আজা মশায় তার দ্বিতীয় পক্ষের ছেলেটিকে আদর যত্ন করে, তাহাকে পোষাক পরাইয়া কোলে করিয়া বেড়ায়, আর রামাকে একটা কথাও জিজ্ঞাসা করে না, কখন তাহাকে একখানি কাপড় দেয় না, একটু আদর করিয়া কাছে ডাকে না। সে ইহার কারণ বুঝিতে না পারিয়া এক এক দিন তাহার মাতাকে জিজ্ঞাসা করিত, “মা, আজা মশায় আমাকে আর ভালবাসে না কেন?” হীরামণি অশ্রুপূর্ণ নেত্রে সন্তানের মুখ চুম্বন

করিত, মায়ের আদরে বালকের মনোবেদনা দূর হইত।

পাঁচ বৎসর উত্তীর্ণ হইলে হীরামণি রামাকে পাঠশালায় ভর্ত্তি করিয়া দিল।

রামা একদিন মধ্যাহ্নে পাঠশালা হইতে আসিয়া শয্যায় শয়ন করিল। মা বলিল, "পাঠশালা থেকে এসে শুলি যে!"

রামা বলিল, "মা, আমার জ্বর এসেছে, আমি বস্‌তে পারচিনে, বড় শীত লাগছে, একখান কাঁথা দে।"

হীরামণি পুত্রের ললাটে হাত দিয়া দেখিল, কপাল পুড়িয়া যাইতেছে, তাহার সুন্দর মুখখানি শুকাইয়া গিয়াছে। জ্বরের যন্ত্রণায় সে চক্ষু মেলিয়া চাহিতে পারিতেছে না।

সমস্ত রাত্রি সেই ভাবে কাটিয়া গেল। হীরামণি পুত্রের পাশে বসিয়া বিনিদ্র বিভাবরী অতিবাহিত করিল।

প্রভাতে বালক চক্ষু মেলিয়া চাহিল, কাতর ভাবে বলিল, "মা, দাদা মশায়কে একবার ডাক, আমি আর বাঁচবো না।"

হীরামণি বলিল, "ষাঠ, ষাঠ, ষেঠের বাছা ও কথা বলে না।" পুত্রের এরূপ জ্বর দেখিয়া হীরামণির উদ্বেগের সীমা রহিল না। এ বিপদে সে কাহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিবে? সে চারি দিক অন্ধকার দেখিল, তাহার পর পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, "বাবা, রামার বড় জ্বর, এক বার হাত খানা দেখে এস।"

যজ্ঞেশ্বর অনিচ্ছার সহিত কন্যার গৃহে প্রবেশ করিল, দৌহিত্রের হাত দেখিয়া বলিল, "তোর সকল কাজেই তাড়াতাড়ি, অল্প একটু জ্বর হয়েছে, দিন দুই উপোস দিলেই সেরে যাবে, এ জন্যে ডাক্তার কবরেজ ডাক্‌তে হবে না।"

৬

জ্বর ছাড়িল না। কিন্তু সে জন্য যজ্ঞেশ্বরকে কিছু মাত্র চিন্তিত দেখা গেল না। সে যথা নিয়মে আহার, আমোদ ষ্ট্যাম্প বিক্রয় করিতে লাগিল। হীরমণি আহার নিদ্রা বন্ধ করিয়া পুত্রের শুশ্রূষা করিতে লাগিল। কুসুম কোন দিন তাহার দ্বারের নিকটও আসিত না। সে হীরামণিকে শুনাইয়া বলিতে লাগিল, "দাদায় খেতে পরতে দিচ্ছে, সে এসে এখন ভাগনের চিকিস্যে করাক না কেন! বাপের অমান্যি করে বোনকে টাকা পাঠানো হয়, যেমন ভাই, তেমনি বোন্!"

গ্রামের কবিরাজ ভোলানাথ কবিভূষণ নিদান-সিন্ধু ভিষক্‌রত্ন যজ্ঞেশ্বরের প্রতিবেশী, যজ্ঞেশ্বরের সহিত তাহার পিতার বন্ধুত্ব ছিল। যজ্ঞেশ্বর কন্যার কাতরতা উপেক্ষা করিতে না পারিয়া তৃতীয় দিন সন্ধ্যার সময় ভোলানাথকে ডাকিয়া আনিল, সে জানিত ভোলানাথ তাহার নিকট টাকা লইতে পারিবে না। সুচিকিৎসক বলিয়া গ্রামে ভোলানাথের প্রতিষ্ঠা না থাকিলেও, সংবাদ-পত্রের বহু বিজ্ঞাপনে ভোলানাথের নাম ছাপা হইত।

ভোলানাথের এলোপ্যাথিক চিকিৎসাও নাকি কিছু কিছু জানা ছিল। কবিভূষণ, নিদানসিন্ধু ও ভিষকরত্ন, এই তিনটি উপাধি সে কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়াছিল তাহা কেহই জানিত না। ভোলানাথ থর্ম্মমেটার দিয়া জ্বর পরীক্ষা করিল, এবং রোগীর মাথায় Ice bag বসাইবার ব্যবস্থা

দিয়া প্রস্থান করিল। ভোলানাথ জানিত পল্লীগ্রামে Ice ও Ice bag উভয়ই অপ্রাপ্য, কিন্তু সে যে অসাধারণ কবিরাজ তাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য অসাধারণ জিনিসের ফরমাইস করা আবশ্যক।

তিন দিনেই জ্বর বিকারে দাঁড়াইয়াছিল, ভোলানাথ কবিরাজ তাহার কিছুই করিয়া উঠিতে পারিল না। অবশেষে সে বলিল "শ্লেষ্মার প্রকোপ অত্যন্ত অধিক, সাধারণ ঔষধে কোন ফল হইবে না, তিব্বত দেশ হইতে আমার বন্ধু তাসিলামা শীঘ্রই কিছু কস্তুরী পাঠাইবেন, তাহার একমাত্রা সেবনে রোগ সারিয়া যাইবে।"

যজ্ঞেশ্বর জিজ্ঞাসা করিল, "ততদিন ছেলেটা বাঁচিবে ত?"

নিদানসিন্ধু বলিল, "সে উহার অদৃষ্ট, আমরা চিকিৎসা করিতে পারি বটে, কিন্তু পরমায়ু দিতে পারি না।" তাসিলামার প্রেরিত কস্তুরী আসিল না, রোগীকে ডবল নিউমোনিয়ায় ধরিল।

হীরামণি অন্য উপায় না দেখিয়া তাহার দাদাকে টেলিগ্রাম করিল। রেলের ষ্টেসন গ্রাম হইতে অধিক দূরে নহে।

পরদিন প্রভাতে বিশ্বেশ্বর ব্যাগহস্তে পিতৃগৃহে উপস্থিত হইল। ভাগিনেয়ের অবস্থা দেখিয়া তাহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। রামাকে দেখিয়া আর চিনিতে পারা যায় না, এই কয় দিনের রোগেই তাহার দেহ চর্ম্মসার, চক্ষু নিষ্প্রভ, গণ্ডস্থল শুষ্ক। রামা তাহাকে দেখিয়াই 'মামা' বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

হীরামণি অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া বলিল, দাদা, বাছাকে বাঁচাও, আমার যে আর কেউ নেই দাদা।

বিশ্বেশ্বরের চক্ষু ফাটিয়া জল পড়িতে লাগিল, তাহার মুখ হইতে কোন কথা বাহির হইল না।

পুত্রের আকস্মিক আবির্ভাবে যজ্ঞেশ্বর বিরক্ত হইয়া বলিল, "হাঁপাতে হাঁপাতে হঠাৎ আসবার কি দরকার ছিল! জ্বর হয়েছে দু'পাঁচ দিন ভুগে সেরে উঠবে, জ্বর কি কারও হয় না? তোমাদের সকল তাতেই বাড়াবাড়ি, পয়সা খুব সস্তা কি না!"

বিশ্বেশ্বর বলিল, "না এসে করি কি? রামার যে রকম কঠিন রোগ, তার মত চিকিৎসা হচ্ছে কৈ?"

যজ্ঞেশ্বর বলিল, "চিকিৎসা হচ্ছে না, কলকাতা থেকে, ডাক্তার আনতে হবে না কি? ভোলানাথের মত কবিরাজ এ তল্লাটে নাই, খবরের কাগজে পর্য্যন্ত তার নাম ছুটেছে, সে দু'বেলা এসে দেখে যাচ্ছে, তাতেও ভাল চিকিৎসা হচ্ছে না? আমাদের ব্যারাম স্যারাম হ'লে যে কবিরাজও ডাকতে হয় না, অমনি সেরে যায়।"

বিশ্বেশ্বর কিছু উত্তর দিল না, অবিলম্বে তিন ক্রোশ দূরবর্ত্তী গঙ্গারামপুর হইতে একজন এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন লইয়া আসিল। ডাক্তার রোগী দেখিয়া বলিলেন, "প্রথম হইতে একেবারেই চিকিৎসা হয় নাই, 'কোলাপ্স ষ্টেটে' আসিয়া আমি কি করিব?"

ডাক্তার আসিয়াছে শুনিয়া কবিরাজ নিদানসিন্ধু বলিল, "এখন পুতিকাভরণ ব্যবস্থা, ডাক্তার মর্ফিয়া ইন্‌জেক্ট করিবে

বুঝি? তাহাতে কি ফল হইবে?”

নিদানসিন্ধুর কথাই ফলিল, ডাক্তার কিছুই করিতে পারিলেন না। অভাগিনী হীরামণি তাহার নয়ন-পুতলি পাচ বৎসরের পুত্রটিকে হারাইয়া মাটিতে লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিল। বিশ্বেশ্বর আর অগ্রপশ্চাত না ভাবিয়া পুত্রহারা ভগ্নীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেল। আমরা জানি বিদায়ের সময় বৃদ্ধ যজ্ঞেশ্বর কিন্তু চক্ষের জল সম্বরণ করিতে পারে নাই, তাহার মনটা যেন উদাস হইয়া গেল, কিন্তু সে বেশী ক্ষণের জন্য নহে, কুসুমের প্রফুল্ল মুখ দেখিয়া, তাহার ক্রোড়স্থ কনিষ্ঠ পুত্রের কচি মুখে মিষ্টি কথা শুনিয়া আবার প্রকৃতিস্থ হইল।

শ্রীদীনেন্দ্র কুমার রায়।

বেদান্ত

মুক্তি সম্বন্ধে, নাস্তিক ও আস্তিকদিগের যে সকল মতভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে, সে সকল মতেই মোক্ষাবস্থায় দুঃখ-নিবৃত্তি অবশ্য স্বীকার্য্য এবং বৈষ্ণব ভিন্ন সকল দার্শনিকই ঐ অবস্থায় অধীনতার অভাব স্বীকার করিতে বাধ্য। কারণ, তাহাদের মতে মোক্ষাবস্থায় কোন রূপ সম্বন্ধজ্ঞান থাকে না, সম্বন্ধজ্ঞান না থাকিলে অধীনতা থাকিতে পারে না। বৈষ্ণবাচার্য্য রামানুজ ও পূর্ণপ্রজ্ঞ মোক্ষাবস্থায় ঈশ্বরের সহিত সেব্য-সেবকত্ব সম্বন্ধ স্বীকার করেন, সুতরাং তাঁহাদের মতে সে সময়েও অধীনতা অপরিহার্য্য। সর্ব্বদর্শনসংগ্রহের শৈবমত প্রারম্ভে মাধবাচার্য্য লিখিয়াছেন “তদেতদ্বৈষ্ণবমতং পরতন্ত্রদুঃখাবহত্বান্নেপ্সিতাস্পদং” বৈষ্ণবদিগের দাসত্ববাদ সংস্থাপক মত, পরাধীনতা-জনিত দুঃখবোধক ; সে জন্য ইহা অভিলষিত হইতে পারে না। কিন্তু বৈষ্ণবাচার্য্যগণ ঐ সময়ে পরাধীনতা দুঃখ স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন যে, যখন মুক্ত পুরুষ ঈশ্বর-সেবায় নিযুক্ত থাকেন, তখন তাহার কোন রূপ দুঃখ হয় না, প্রত্যুত বিমল সুখ হইয়া থাকে। বাস্তবিক বিশেষ যুক্তি সহকারে বিচার করিলে, সে সময়ে অল্প পরিমাণ দুঃখ থাকারই সম্ভাবনা বলিয়া মনে হয়। তবে সেই দুঃখ, সে সময়ের সুখের তুলনায় অত্যন্ত অল্প, সুতরাং তাহা “স প্রত্যবমর্ষঃ” অর্থাৎ সহিষ্ণুতার সহিত অনুভবনীয় হইতে পারে। যদিও বৈষ্ণব ভিন্ন সকল দার্শনিকের মতেই অধীনতা দুঃখের কারণ তথাপি বৈষ্ণবদিগের উক্ত মত, শঙ্করসম্মত অদ্বৈত মুক্তির সোপান বলিয়া আদৃত হওয়ার যোগ্য। কারণ, চিত্তশুদ্ধি অদ্বৈতাত্মা-সাক্ষাৎকারের কারণ, এবং চিত্তশুদ্ধির হেতু ঈশ্বরোপাসনা। সুতরাং বৈষ্ণবসম্মত মোক্ষাবস্থায় ঈশ্বরোপাসনাপ্রভাবে চিত্তের নির্ম্মলতা বা শুদ্ধি সাধিত হইলে, অদ্বৈত ব্রহ্মরূপ আত্ম-সাক্ষাৎকার অবশ্যম্ভাবী। অতএব বৈষ্ণবসম্মত ঈশ্বরোপাসনা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি রূপ মুক্তির কারণ না

হইলেও, মুক্তির হেতু পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের কারণ বলিয়া মুক্তির বিশেষ উপযোগী। ভগবদ্গীতায় স্বয়ং ভগবান্ বলিয়াছেন

"লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা
পুরাপ্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং
কর্ম্মযোগেন যোগিনাং। ৩।৩।

হে নিষ্পাপ! আমি পূর্ব্বেই কল্যাণাকাঙ্ক্ষী মনুষ্যগণের জন্য দ্বিবিধ নিষ্ঠার কথা বলিয়াছি। একটি জ্ঞাননিষ্ঠা এবং অপর কর্ম্মনিষ্ঠা। যাহারা সাংখ্য অর্থাৎ আত্মবিষয়ে বিবেকসম্পন্ন ও শুদ্ধচিত্ত তাহারা জ্ঞাননিষ্ঠায় অধিকারী, এবং যাহারা আত্মবিবেক রহিত ও অশুদ্ধচিত্ত তাহারা কর্ম্মনিষ্ঠায় অধিকারী। এই বাক্য দ্বারা ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে যে যাহাদিগের চিত্তের কলুষতা বিদূরিত হয় নাই, তাহারা চিত্তের বিশুদ্ধতা সম্পাদনের জন্য ঈশ্বরোপাসনা প্রভৃতি কর্ম্মানুষ্ঠান করিবে। এবং যাহারা শুদ্ধচিত্ত, তাহাদের পক্ষে কর্ম্মানুষ্ঠান নিষ্প্রয়োজন। এই সম্বন্ধে ভগবদ্গীতায় কথিত হইয়াছে যে

"নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন।
ন চাস্য সর্ব্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ॥ ৩।১৮

যে জ্ঞানী ব্যক্তি বৈষয়িক সুখের ক্ষণিকতাদি দর্শনে আত্মসুখে নিরতিশয় প্রীতিযুক্ত এবং তাহাতেই পরিতৃপ্ত ও সন্তুষ্ট তাহার পক্ষে কর্ম্ম করা ও না করা উভয়ই সমান, অর্থাৎ নিষ্ফল। কারণ এই জগতের কোনও পদার্থেই, ঐরূপ ব্যক্তির কোনরূপ প্রয়োজন সম্বন্ধ নাই। ইহার ভাবার্থ এই যতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রয়োজনাভিলাষ থাকে, ততক্ষণই কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্তি হয়। জ্ঞানী ব্যক্তির কোনও রূপ প্রয়োজনাভিলাষ নাই। তিনি ব্রহ্মজ্ঞান প্রভাবে বিমল ও অবিনাশী ব্রহ্মানন্দ লাভ করায় তাহাতেই পরিতৃপ্ত থাকেন। ব্রহ্মানন্দ সকল আনন্দের শীর্ষস্থানীয়। যে ব্যক্তি এইরূপ উৎকৃষ্টতর আনন্দ লাভ করিতে পারেন, সে ব্যক্তি কোনরূপ কর্ম্ম করিতে অভিলাষ করেন না। উপাসনা প্রভৃতি কর্ম্ম ঈশ্বরের সন্তোষার্থ করা হইয়া থাকে। কারণ, ঈশ্বর সন্তুষ্ট হইয়া উপাসকের সুখ বিধান করেন। যখন জ্ঞানী ব্যক্তি আত্মানন্দে পরিতৃপ্ত এবং এই আত্মানন্দ অবিনশ্বর ও স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া অনুভব করিতে পারেন, তখন তাহার অন্য বিধ সুখাভিলাষ থাকে না, সুতরাং সে সময়ে তিনি নিষ্প্রয়োজন ঈশ্বরোপাসনা হইতে বিরত থাকিবেন, ইহাই যুক্তিসঙ্গত। বিশেষতঃ জ্ঞানী ব্যক্তির নিকট জগতের সকলই আত্মস্বরূপ, কিছুই জ্ঞানী ব্যক্তি হইতে ভিন্ন নহে, ঈশ্বর ও জ্ঞানী ব্যক্তি উভয়ই এক, সুতরাং উপাস্য ও উপাসক এ উভয়ের ভেদজ্ঞান না থাকিলে উপাসনা হইতে পারে না। এই অবস্থায় বৈষ্ণবসম্মত সেসব্যসেবকভাব— চিত্তের অশুদ্ধাবস্থার কার্য্য; ইহাই অদ্বৈতবাদিগণের সিদ্ধান্ত।

অদ্বৈত মতে মুক্তি দ্বিবিধ। জীবন্মুক্তি ও বিদেহ-মুক্তি। জীবন্মুক্তিসময়ে শরীর থাকে, বিদেহমুক্তিসময়ে শরীর থাকে না। জীবন্মুক্ত ব্যক্তি অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞানের প্রভাববশতঃ অজ্ঞানের মোহিনী শক্তি দ্বারা অভিভূত হন না। তিনি অজ্ঞান ও তৎ

কার্য্য সকলকেই মিথ্যা বলিয়া বুঝিতে পারেন, এবং শারীরিক দুঃখ প্রভৃতি দ্বারাও তিনি কোনরূপ উদ্বেগ অনুভব করেন না। ব্রহ্মজ্ঞানীর সপ্তবিধ অবস্থা শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। তন্মধ্যে পরবর্ত্তী তিনটি জীবন্মুক্তের অবস্থা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। যথা—

"চতুর্থী ভূমিকাজ্ঞানং তিস্রঃ স্যুঃ সাধনং পুরা।
জীবন্মুক্তেরবস্থাস্তু পরা স্তিস্রঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।

প্রথম তিনটি সাধনাবস্থা, চতুর্থটি জ্ঞানাবস্থা এবং পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম জীবন্মুক্তাবস্থা বলিয়া কথিত আছে। উক্ত সপ্তবিধ অবস্থা সম্বন্ধে লিখিত আছে যে

"জ্ঞানভূমিঃ শুভেচ্ছাখ্যা প্রথমা পরিকীর্ত্তিতা।
বিচারণা দ্বিতীয়াস্যা তৃতীয়া তনুমানসা।
সত্তাপত্তিশ্চতুর্থীস্যাৎ ততোঽসংসক্তিনামিকা।
পদার্থাভাবনীষষ্ঠী সপ্তমী তুর্য্যগা স্মৃতা।

প্রথম মুমুক্ষাবস্থা, দ্বিতীয় বিচারাবস্থা, তৃতীয় বিচারজ একাগ্রতাজনিত সূক্ষ্মবস্তু গ্রহণ যোগ্যতাবস্থা, চতুর্থ ব্রহ্মসাক্ষাৎ কারাবস্থা, পঞ্চম নির্ব্বিকল্প সমাধি অবস্থা, ষষ্ঠ নির্ব্বিকল্প সমাধির চিরস্থায়িতাবস্থা এবং সপ্তম সর্ব্বদা পরিপূর্ণানন্দ অবস্থা। প্রথম অবস্থাত্রয় জাগ্রৎ অবস্থা নামে অভিহিত। কারণ, আমাদের জাগ্রৎ সময়ের ন্যায় সে সময়েও জাগৎ প্রপঞ্চ সত্য-রূপে অনুভূত হইয়া থাকে। চতুর্থ জ্ঞানা-বস্থা, ইহা স্বপ্নাবস্থাতুল্য ; কারণ, সে সময়ে জগৎ প্রপঞ্চ স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর মত অনুভূত হইতে থাকে। চতুর্থাবস্থাপ্রাপ্ত জ্ঞানীকে ব্রহ্মবিৎ বলা যায়। পঞ্চম নির্ব্বিকল্প সমাধি অবস্থা, ইহা সুষুপ্তি নামে অভিহিত, কারণ, এই অবস্থায় কোনরূপ জাগৎ প্রপঞ্চ অনুভূত হয় না। স্বভাবতঃই জ্ঞানী ব্যক্তির এই অবস্থা ভঙ্গ হইয়া থাকে। এই অবস্থাপন্ন জ্ঞানীকে ব্রহ্মবিদ্বর বলা যায়। ষষ্ঠ অবস্থা গাঢ় সুষুপ্তি নামে অভিহিত, এই অবস্থায় নির্ব্বিকল্প সমাধি অধিক সময় স্থায়ী, এবং অন্যের চেষ্টা ব্যতীত এই অবস্থার ভঙ্গ হয় না। এই অবস্থায় জ্ঞানীকে ব্রহ্মবিদ্বরিয়ান্ বলা হইয়া থাকে। সপ্তম তুরীয়াবস্থা, এই অবস্থায় সর্ব্বদা পরিপূর্ণ ব্রহ্মানন্দ অনুভূত হয়, কখনও এই অবস্থার ভঙ্গ হয় না। এই অবস্থাপন্ন জ্ঞানী ব্রহ্মবিদ্বরিষ্ঠ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই অবস্থায় জ্ঞানী ব্যক্তির নিশ্বাসপ্রশ্বাস প্রভৃতির জন্যও কোনরূপ যত্ন থাকে না। এই অবস্থা হইতে যখন শরীর বিনষ্ট হইয়া যায়, তখন বিদেহ-মুক্তি হইয়া থাকে। এ স্থলে আর একটি কথা বলিয়া এ প্রবন্ধের উপসংহার করিব। সকলেই বলিয়া থাকেন যে, দর্শনশাস্ত্র নীরস। সে জন্য তাহার প্রতি অনেকেরই আংশিক উপেক্ষা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে দর্শনশাস্ত্র 'নীরস' নহে, তাহাতে 'রস' আছে। সে রসের নাম 'অদ্ভুত রস' ও 'শান্ত রস'। সকল দর্শনেই উভয় বিধ রস নাই। যথাসম্ভব কোন দর্শনে 'অদ্ভুত' ও কোন দর্শনে বা 'শান্ত' রস বর্ত্তমান আছে। যে সকল দর্শনের বিচারপ্রণালী দ্বারা বুদ্ধি-বৃত্তি সূক্ষ্ম হয়, সে সকল দর্শনে অদ্ভুত রস, যথা বৌদ্ধ ও ন্যায়াদি দর্শন। যে সকল দর্শনের বিচার দ্বারা সংসারের প্রতি যথা-সম্ভব আসক্তি নিবৃত্তি এবং আত্মজ্ঞানের প্রতি অগ্রসর হওয়া যায় সে সকল দর্শনে

শান্ত রস। যথা সাংখ্য ও বেদান্ত-দর্শন। সাহিত্যদর্পণকারের মতে অদ্ভুত রসের লক্ষণ যথা—"অদ্ভুতো বিস্ময় স্থায়ি ভাবঃ" বিস্ময় হইতে যে রস প্রকাশিত হয়, তাহার নাম অদ্ভুত রস। সাধারণবুদ্ধির অগম্য বিষয়ে বুদ্ধিবৃত্তির বিস্তৃতি, বিস্ময় নামে অভিহিত হইয়া থাকে। বৌদ্ধ ও ন্যায়াদি দর্শনের বিচারপ্রণালী দেখিলে, উক্ত দর্শন-প্রণেতৃগণের বুদ্ধিবৃত্তির বিশেষ প্রশান্ততা অনুভূত হয়, সুতরাং ঐ সকল দর্শনে অদ্ভুত রসই যুক্তিসিদ্ধ। সাহিত্যদর্পণকারের মতে শান্ত রসের লক্ষণ যথা "শান্তঃ শম স্থায়ি ভাবঃ" "অনিত্যত্বাদিনাঽশেষ বস্তু-নিঃসারতাতু যা, পরমাত্মস্বরূপং বা তস্যালম্বন-মিষ্যতে" শম হইতে যে রস প্রকাশিত হয়, তাহার নাম শান্ত রস, বিষয়াসক্তি শূন্যাবস্থায় আত্মানন্দে বিশ্রামজনিত সুখকে শম বলা যায়। অনিত্যতা প্রভৃতি দোষপ্রযুক্ত সকল পদার্থে অকিঞ্চিৎকরত্ব-জ্ঞান অথবা সচ্চিদানন্দরূপ আত্মা এই রসের অবলম্বন। কাব্যপ্রকাশকারের মতে শান্ত রসের লক্ষণ অন্যরূপ বর্ণিত হইয়াছে, যথা "নির্ব্বেদ স্থায়িভাবোঽস্তি শান্তোঽপিশমোরসঃ" তত্ত্বজ্ঞান আপদ্ বা ঈর্ষা প্রভৃতি প্রযুক্ত 'অহংকারে'র প্রতি অবজ্ঞা-বুদ্ধি হয়, সেই অবজ্ঞাবুদ্ধির নাম নির্ব্বেদ, এই নির্ব্বেদ হইতে অভিব্যক্ত রসের নাম শান্তরস। সাংখ্য ও বেদান্তের বিচার এবং যুক্তির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি থাকিলে শম বা নির্ব্বেদের উদয় হইতে পারে। সুতরাং উক্ত দর্শনসমূহে শান্ত রস থাকা যুক্তিসিদ্ধ বলিয়াই মনে হয়। শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস এই সপ্তবিধ রস সাধারণের উপভোগ্য। কাব্য-নাটকাদিতে বিশেষভাবে এই সপ্তবিধ রসেরই বর্ণনা আছে, সে জন্য কাব্য-নাটকা-দির প্রতি সহজেই সাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। অদ্ভুত এবং শান্ত রস সাধারণ বুদ্ধির উপভোগ্য নহে, বিচারের আতিশয্য ও মানসিক একাগ্রতা প্রভাবে উক্ত রসদ্বয়ের উপভোগ সম্পাদিত হইতে পারে। সাধারণ বুদ্ধি ও বিক্ষিপ্তচিত্ত ব্যক্তিগণ এই রসাস্বাদের তাদৃশ অধিকারী নয়, সে জন্য দর্শনশাস্ত্রের উপর, সাধারণের দৃষ্টি পতিত হয় না, এই অবস্থায় দর্শনশাস্ত্রের নীরসত্বপ্রবাদ যুক্তি ও অনুভব-বিরুদ্ধ বলিয়া উপেক্ষার যোগ্যই মনে হয়।

শ্রীগুরুচরণ তর্কদর্শনতীর্থ।

প্রকৃত নির্ব্বাণ কি?

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

এখানে একটা বিষয়ের উল্লেখ করা বিশেষ আবশ্যক। একটা বৃহৎ তত্ত্ব বৌদ্ধধর্ম্মে গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে। সেই তত্ত্বটির প্রসর বহুল বিস্তৃত। সেই তত্ত্বটি কি?—না, কর্ম্ম। কর্ম্মই বৌদ্ধধর্ম্ম-নীতির মূল ভিত্তি। কর্ম্ম কি? না, নৈতিক ফলা-ফল; কর্ম্মের এই নিয়ম যে, ভালই হোক মন্দই হোক,—আমাদের প্রত্যেক কার্য্যের

মধ্যেই দণ্ড পুরস্কার গূঢ়রূপে নিহিত আছে ; মানুষ জন্মগ্রহণ করিয়া কিরূপ অবস্থা লাভ করিবে, তাহার কার্য্য স্বতই তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া দেয়। ইহাতে প্রত্যেক মানুষের স্বকীয় কার্য্য নির্ব্বাচনের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। কেননা, প্রত্যেক মনুষ্যই আপনার মোক্ষ আপনিই সাধন করিতে পারে, এবং প্রত্যেক মনুষ্যকেই তাহা সাধন করিতে হইবে।

ভাল কাজ করিলে আমাদের সদ্‌গতি হইবে, আমাদের উন্নত অবস্থা হইবে, এমন কি আমরা মোক্ষলাভও করিতে পারিব। পক্ষান্তরে, মন্দ কাজ করিলে, আমরা দুঃখময় লোকে আবদ্ধ হইয়া থাকিব। এই তত্ত্বটির পরিণাম অতীব ফলগর্ভ। এই তত্ত্বটি মানুষকে বহু পরিমাণে নৈতিক কার্য্যোদ্যম ও নৈতিক বলবীর্য্য প্রদান করে। বৌদ্ধেরা জানে—মন্দ কার্য্যের পরিণাম হইতে স্বয়ং ভগবান্‌ও তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবেন না, অথবা কোন মধ্যবর্ত্তী সিদ্ধ পুরুষ তাহাদের হইয়া ভগবানের নিকট দরবার করিলেও কোন ফল হইবে না। আবার ভাল কাজ করিলে, কি মানব কি দৈব কোন শক্তিই সেই কাজের পুণ্যফল ও পুরস্কার হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করিতে পারিবে না ; বৌদ্ধেরা আপনা ছাড়া আর কাহারো উপর নির্ভর করে না ; কার্য্য-কারণের ফলাফল বেশ বুঝিয়াই তাহারা স্বকীয় কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করে।

মঠে দান করা, ভিক্ষা দেওয়া, পূর্ত্ত-কার্য্যের অনুষ্ঠান করা,—এই সব বাহ্য অনুষ্ঠানে তেমন পুণ্য নাই ; কারণ, যাহারা এইরূপ অনুষ্ঠান করে, তাহাদের ক্ষণিক সন্তোষ হয় মাত্র ; কর্ম্মের নিয়ম এই সকল অনুষ্ঠানেই বদ্ধ নহে। কর্ম্মের নিয়ম আরও বিশেষরূপে এই কথা বলে যে, শুধু জীবের কল্যাণ-সাধন ও দুঃখহ্রাস করিবার মানসেই কার্য্যসকল অনুষ্ঠান করিবে। ফলতঃ, কোন কাজে পুণ্য হওয়া না হওয়া সঙ্কল্পের বিশুদ্ধতার উপরেই নির্ভর করে।

পুণ্য কিংবা বিশুদ্ধ সংকল্পের অনুষ্ঠান তিন প্রকার। প্রথম—ইহলোকে পুরস্কারের আশায় যে পুণ্য কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়। ইহাতে মুক্তি হয় না। দ্বিতীয়—পারলৌকিক মুক্তির উদ্দেশে পুণ্য কার্য্যের অনুষ্ঠান হয়। ইহা উচ্চতর পুণ্য কর্ম্ম। এই কার্য্য-ফলে কার্য্য-কর্ত্তার উৎকৃষ্ট গতি হয় ও পরলোকে সে পুরস্কার লাভ করে। তৃতীয়—হিতৈষণা ও মৈত্রীর বশবর্ত্তী হইয়া যে কাজ নিঃস্বার্থ-ভাবে করা হয়। শুধু এইরূপ কাজের দ্বারাই নির্ব্বাণ লাভ করা যাইতে পারে। শুধু আপনার প্রতি কর্ত্তব্য সাধন করিলে এই নির্ব্বাণে উপনীত হওয়া যায় না। ইহাই বৌদ্ধধর্ম্মের চূড়ান্ত উপদেশ। আপনার প্রতি কর্ত্তব্য—এ জিনিসটা আসলে কি ? ইহা স্বার্থপরতার একটা ছুতামাত্র এবং এই স্বার্থপরতা হইতেই আমাদের যত অশুভ, যত ভ্রম, যত মন্দ কার্য্য উৎপন্ন হয়। অতএব স্বার্থপরতাকে নির্ম্মূল করিতে হইবে ; এবং বৌদ্ধধর্ম্ম, স্বার্থপরতাকে যে নির্ম্মূল করিতে চেষ্টা করিয়াছে, ইহাই বৌদ্ধধর্ম্মের পরম গৌরব বলিতে হইবে। এই উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য বৌদ্ধধর্ম্ম এ কথা বলিতে ভয় পায় নাই

যে, অহংকে পর্য্যন্ত উচ্ছেদ করিয়া যে আত্ম-বিসর্জ্জন--তাহাও একটা সদ্‌গুণ, এবং অহংকে লোপ করিতে পারিলে তবেই পরম পুরস্কার লাভ করা যাইতে পারে। এরূপ আত্মবিসর্জ্জন মানুষের পক্ষে একটা অলৌকিক বীরত্বের কাজ সন্দেহ নাই; কেননা, এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, মানুষ প্রায় স্বার্থের উদ্দেশেই সকল কাজ করে; এবং কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান-জনিত যে সুখ কিংবা বিবেকের কথা শুনিয়া চলিলে মনের যে শান্তি হয় তাহাও স্বার্থেরই প্রকারান্তর মাত্র। অতএব, বুদ্ধের মতে যদি কোন মনুষ্য শুধু আপনার হিতের প্রতি লক্ষ্য করিয়া, এবং অন্যের অহিত হইবে কি না তাহার প্রতি কিছু মাত্র লক্ষ্য না করিয়া, কোন স্বার্থপর কাজ করে, এবং তাহাতে বাস্তবিকও যদি কাহারও কোন অনিষ্ট না হয়, তবু তাহার সেই কাজকে খারাপ কাজ বলিতে হইবে। সদ্‌গুণের যাহা ভাণমাত্র তাহাকে বাস্তবিক সদ্‌গুণ বলিয়া লোকে যাহাতে ভ্রম না করে, এই মর্ম্মে বুদ্ধদেবের অনেক উপদেশ আছে। চক্ষু কর্ণকে মন্দ হইতে রক্ষা করিতে পারিলেই চরম সিদ্ধি লাভ করা যায় না; কেননা, তাহা হইলে বধির ও অন্ধেরাও চরম সিদ্ধি লাভ করিতে পারিত। বস্তুত, শুভ সংকল্পের দ্বারাই পুণ্য নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। বাক্য যদি কার্য্যে পরিণত না হয়, তবে সে বাক্যের কোন মূল্য নাই।

অতএব কর্ম্মবাদ ন্যায়ের ধারণার উপরেই প্রতিষ্ঠিত। পাপপুণ্য অনুসারেই মানুষ দণ্ডিত কিংবা পুরস্কৃত হইয়া থাকে। কিন্তু মানুষের পাপক্ষালন করিবার জন্য যদি প্রায়শ্চিত্ত আবশ্যক হয়, তাহা হইতে এরূপ সিদ্ধান্ত করা যায় না, সেই প্রায়শ্চিত্ত অনন্তকাল ধরিয়া চলিবে; কেননা, সসীম সময়ের মধ্যে যে অপরাধ কৃত হয়, তাহার ফলে অনন্ত শাস্তি কখনই হইতে পারে না। তাহা ন্যায়-বিরুদ্ধ। সেই-রূপ পুরস্কার লাভ ভাল কার্য্যেরই ফল; খৃষ্টানেরা যাহাকে ঈশ্বর-প্রসাদ (grace) বলে, এ স্থলে সেই ঈশ্বর-প্রসাদের কোন কার্য্যকারিতা দেখা যায় না। কারণ, রোমানদিগের প্রতি সম্ভাষিত পত্রে, সেন্ট-পল্‌ বলিয়াছেন, "ঈশ্বর যাহাকে স্বর্গ দিতে ইচ্ছা করেন, তাহাকেই তিনি স্বর্গ দান করেন"; তাঁহার সৃষ্ট জীবের মধ্যে কে স্বর্গে যাবে, কে নরকে যাবে তাহা তিনি পূর্ব্ব হইতেই নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন, যে সকল লোক ঈশ্বরের নির্ব্বাচিত, তাহা-দের প্রতি কে দোষারোপ করিবে? ঈশ্বর স্বয়ংই তাহাদের কার্য্যকে সমর্থন করেন। কারণ, ঈশ্বর মুসাকে বলিয়াছিলেন, "আমার যাহাকে ইচ্ছা আমি তাহাকে দুঃখ দিব, আমার যাহাকে ইচ্ছা আমি তাহার প্রতি কৃপা প্রকাশ করিব। অন্যের ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর কিছুই নির্ভর করে না, ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই কেহ দুঃখ পায়, ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই কেহ দৃঢ়তা লাভ করে (৭১)।" ইহা সহজেই বুঝা যায়, বৌদ্ধেরা এমন কোন পদ্ধতি কখনই গ্রহণ করিবে না, যাহাতে স্থায়িত্বের কোন প্রতিভূ নাই—যাহা সর্ব্ব-শক্তিমানের কেবল কৃপার উপরেই নির্ভর করে। Schlaginweitও এই কথার সত্যতা সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিয়াছেন। ভূতানের লামার সহিত তাঁহার যে কথোপকথন হয়

তাহার বিবরণ তিনি প্রকাশ করিয়াছেন। Huc ও Gabet এই দুই ধর্ম্মপ্রচারক পাদ্রির সহিত লামার একবার সাক্ষাৎ হয়। সেই সময়ে, লামা খৃষ্টধর্ম্মের বিরুদ্ধে এইরূপ তর্ক করেন যে খৃষ্টধর্ম্মে মোক্ষলাভের কোন পন্থা নাই। তিনি বলিলেন—"কারণ, খৃষ্টভক্তেরা, স্বকর্ম্মের পুরস্কার স্বরূপ, ঈশ্বরের সেবকদের মধ্যে জন্ম গ্রহণ করিবে। অতএব, উহারা পুনর্জন্ম হইতে নিষ্কৃতি পাইবে না। আবার যদি তাহারা স্বকীয় কর্ত্তব্যে শৈথিল্য করে, তাহারা ঈশ্বর-লোক হইতে বহিষ্কৃত হইয়া, তাহাদের অপরাধের দণ্ডস্বরূপ, কোন দুঃখময় লোকে জন্ম গ্রহণ করিবে না তাহা কে বলিতে পারে?" শেষে তিনি এই কথা বলিলেন—তোমাদের মত অপেক্ষা বৌদ্ধমত ঢের ভাল। বৌদ্ধ মতানুসারে "মানুষ স্বকীয় সুকৃতির ফল হইতে বঞ্চিত হয় না, এবং যদি একবার সিদ্ধিলাভ করিতে পারে, তাহা হইলে আর তাহার পুনর্জন্ম হয় না।" কর্ম্মের আর একটা পরিণাম এই, কর্ম্ম মানুষের পৈতৃক অপরাধকে বা গোড়ার অপরাধকে (original sin) রহিত করে। মানুষকে পৈতৃক অপরাধের জন্য দায়ী করা একটা অন্যায় কার্য্য। ফলত, এক জনের দোষে আর এক জনের কষ্ট পাওয়া ন্যায়সঙ্গত নহে; ইহাই সনাতন ধর্ম্মনিয়ম।

আর যদি আত্মহত্যার কথা বল—বৌদ্ধ-ধর্ম্মে আত্মহত্যা একেবারেই নিষিদ্ধ। "ভগবানের উপদেশ এই—আত্মহত্যা কখনই করিবে না।" বুদ্ধের মতে আত্মহত্যা একটা নৈতিক দুর্ব্বলতা, ইহা মোক্ষের পরিপন্থী। আত্মহত্যা করিলে, তাহার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ, নিকৃষ্ট যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। সংসারী বৌদ্ধদিগকে যে সকল কর্ম্ম অনুসরণ ও যে সকল কর্ম্ম পরিবর্জ্জন করিতে হয়—সেই সকল বিধিনিষেধের মুখ্য উপদেশগুলি আমি প্রায় সমস্তই বিবৃত করিয়াছি। যাহা বলিয়াছি, তাহাতে আমার মনে হয় বৌদ্ধ-ধর্ম্মের মহত্বও যথেষ্ট প্রদর্শিত হইয়াছে। আমি দেখাইয়াছি যে, এই ধর্ম্ম,—অহিংসা, মৈত্রী ও ইন্দ্রিয়দমনের উপর প্রতিষ্ঠিত।

বৌদ্ধধর্ম্ম, যে চরম লক্ষ্যের কথা বলেন, তাহার সহিত যদিও আমাদের স্পৃহা ও আকাঙ্ক্ষার মিল হয় না, কিন্তু সেই চরম লক্ষ্য সিদ্ধ করিবার জন্য যে সকল সদ্‌গুণের সাধনা আবশ্যক, তাহার প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। বৌদ্ধধর্ম্মে এমন কিছুই নাই, যাহা বিশুদ্ধ যুক্তির বিরোধী; কেননা, বৌদ্ধধর্ম্ম প্রকৃতিরও বিরুদ্ধ নহে, দর্শন-শাস্ত্রেরও বিরুদ্ধ নহে। মানুষ যে পুণ্য অর্জ্জন করে,—সে তাহা নিজ বলেই অর্জ্জন করে। যে দীন, যে অজ্ঞ,—তাহাকে বৌদ্ধধর্ম্ম বিশোধিত করিয়া সমুন্নত করে; কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি পণ্ডিত, তাহাদের সকলকেই বৌদ্ধধর্ম্ম এই শিক্ষা দেয় যে, জগৎ অসার শূন্যময়, এবং কেবল সদ্‌গুণের সাধনার দ্বারাই নির্ব্বাণে উপনীত হওয়া যায়, এবং এই শিক্ষাই তাহাদিগকে বিনীত করিয়া তুলে। তা ছাড়া, সেই জগদ্‌গুরু কি আমাদের পথ-প্রদর্শক নহেন—যিনি আমাদের মধ্যে আনন্দ আনিয়াছেন, যিনি জগতের প্রতি অনুকম্পা করিয়া, জগতের উদ্ধারের জন্য, মানুষের সমুন্নতি ও মোক্ষের জন্য,

জগতে আবির্ভূত হইয়াছেন; যিনি ধর্ম্মের পরম মিত্র, সেই বুদ্ধদেব অবিরাম এই উপদেশ দিতেছেন যে,—"বাসনা হইতে মুক্তিলাভ করাই মানুষের পরম কর্ত্তব্য; উহাই চিত্ত-শুদ্ধির একমাত্র পন্থা। তোমাদিগের নিকট আমি এই পথের ঘোষণা করিতেছি, কেননা আমি এই জ্ঞান লাভ করিয়াছি যে, জন্মমাত্রই নশ্বর ও দুঃখময়; এবং এই জন্ম, পূর্ব্ব জন্মেরই অবশ্যম্ভাবী পরিণাম মাত্র! যে শীলসম্পন্ন সাধু ব্যক্তি আমার কথা বুঝিয়াছেন, তাঁহার নির্ব্বাণের পথ পরিষ্কৃত হইয়াছে—সেই নির্ব্বাণ যাহার উপর আর সুখ নাই।"

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বেদনা।

যতবার আলো জ্বালাতে চাই নিবে যায় বারে বারে;
আমার জীবনে তোমার আসন গভীর অন্ধকারে।
যে লতাটি আছে শুকায়েছে মূল,
কুঁড়ি ধরে শুধু নাহি ফোটে ফুল;
আমার জীবনে তব সেবা তাই বেদনার উপহারে।
পূজাগৌরব পুণ্যবিভব কিছু নাহি, নাহি লেশ,
এ তব পূজারি পরিয়া এসেছে লজ্জার দীন বেশ।
উৎসবে তার আসে নাই কেহ,
বাজে নাই বাঁশী সাজে নাই গেহ,
কাঁদিয়া তোমায় এনেছে ডাকিয়া ভাঙা মন্দির দ্বারে॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রকাশ।

সীমার মাঝে, অসীম, তুমি বাজাও আপন সুর।
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর।
কত বর্ণে কত গন্ধে কত গানে কত ছন্দে
অরূপ, তোমার রূপের লীলায় জাগে হৃদয় পুর
আমার মধ্যে তোমার শোভা এমন সুমধুর।
তোমায় আমায় মিলন হলে সকলি যায় খুলে
বিশ্বসাগর ঢেউ খেলায়ে উঠে তখন দুলে।
তোমার আলোয় নাই ত ছায়া আমার মাঝে পায় সে কায়া
হয় সে আমার অশ্রুজলে সুন্দর বিধুর
আমার মধ্যে তোমার শোভা এমন সুমধুর॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মালদহ সাহিত্য-সম্মিলনে সভাপতির
অভিভাষণের সারাংশ।

সম্মিলন প্রকৃতভাবে সাহিত্য সৃষ্টি করিতে পারে না; তাহাতে সাহিত্যের পরিচালনা, জ্ঞান-প্রচারের আয়োজন এবং সাহিত্য-ক্ষেত্রে সকলের মিলিত চেষ্টার সমবায় সাধিত হয় মাত্র।

ভাষা, জাতি বা ধর্ম্মের অধীন নহে। তাহা প্রকৃতির জিনিস, প্রকৃতির পথেই চালিত হয়। এই 'সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা' বঙ্গদেশ যাঁহাদের একমাত্র জননী, তাহার জলবায়ুতে যাঁহাদের অস্থিমজ্জা গঠিত, 'আপনার ভূমি' বলিতে হইলে যাঁহাদিগকে বঙ্গদেশের প্রতিই তাকাইতে হয়, তাঁহারাই বাঙ্গালী, তাঁহারা যে জাতিরই বা ধর্ম্মেরই হউন না কেন। বঙ্গভাষার জন্ম তাঁহারাই দিয়াছেন, এবং সেই বঙ্গভাষা দ্বারা তাঁহারাই পুষ্ট হইতেছেন। একমাত্র এই বঙ্গভাষার ভিতর দিয়াই, তাঁহাদের সর্ব্বোচ্চ চিন্তা ভাব কল্পনা, তাঁহাদের বাঙ্গালিত্ব, পরিস্ফুট হইতেছে। তাই ভারতের সুদূরতম প্রান্ত-বাসী বাঙ্গালীও আজ বাঙ্গালী। ভারতের অন্যান্য সাহিত্য-হীন জাতির ন্যায়, বিভিন্ন জাতি এবং ভাষার প্রভাবের মধ্যে থাকিয়াও সে আজ আপনার বাঙ্গালিত্বটুকু হারায় নাই। বঙ্গ-সাহিত্যই তাহার একমাত্র কারণ। উপরন্তু উদার বঙ্গ-সাহিত্য কত বিভিন্ন দেশবাসীকে একেবারে কোলের ছেলে করিয়া লইয়াছেন। আমাদের 'পাঁড়ে' এবং 'মিশ্র' সাহিত্য-সেবিগণকে, 'এ পাণ্ডে' বা 'মিছির হো' বলিয়া আজ সম্বোধন করিলে তাহা শুধু তাঁহাদের অপমান স্বরূপই হইবে, কারণ তাঁহারা আজ পুরো বাঙ্গালী। গণেশ-তনয় সখারামের বাঙ্গলা পড়িয়া তাঁহাকে দেউস-নগরাগত বলিয়া কে বিশ্বাস করিবে? 'তেওয়ারীজী' কতকাল হইল 'টিকি'টিকে লুপ্ত হকার করিয়া, বঙ্গ-গৃহে ত্রিবেদীরূপে অজ্ঞাতবাস করিতেছেন তাহা ইতিহাসের একটা লুপ্ত তত্ত্ব।

সুতরাং, যখন বঙ্গভাষা এত উদার এত প্রভাবশালী, তখন, পুরুষানুক্রমে যাঁহারা বাঙ্গলার অধিবাসী—আমি মুসলমান ভ্রাতাগণের কথা বলিতেছি—তাঁহাদের পক্ষে, তাহার প্রভাব হইতে দূরে থাকা তাঁহাদের অনিষ্টেরই কারণ, এবং ইতিহাসের সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে হইলে, তাহা অধিক কাল সম্ভবপরও হইবে না। জনসাধারণের নিত্য ব্যবহারের ভাষার কথা, এবং সাহিত্যের ভাষার নিয়ম লইয়া আমি তাহা বুঝাইব।

প্রথম—জনসাধারণের ভাষা। ভাষার উৎপত্তি ও গতি প্রকৃতি-অনুযায়ী; তাহা প্রকৃতির পথে, সহজ এবং স্বাভাবিক ভাবে চলে। আমাদের নিত্যকার আলাপ-ব্যবহারই আমাদের ভাষার উপাদান, আশপাশের লোকের কথাবার্ত্তা হইতেই আমরা ভাষা শিখি। তাই বিভিন্ন দেশের ভাষাও বিভিন্ন—একস্থানের ভাষা জোর করিয়া অন্যস্থানে চালান যায় না; কারণ

ভাষার বিশেষত্ব ব্যাকরণে—শব্দসমষ্টিতে নহে। সুতরাং বিদেশী শব্দাবলী যদি দেশী ব্যাকরণানুমোদিত ভাবে ভাষার সহিত চালান যায়, তাহা হইলে ভাষাও ঠিক থাকে এবং তাহার পুষ্টিও হয়। এবং সেই নিয়মে বঙ্গ-ভাষার মধ্যে ফারসী ও আরবী শব্দ প্রচলন করিলেও ভাষার কোন হানি হয় না। কিন্তু, তাই বলিয়া বঙ্গভাষাকে ত্যাগ করিলে, যে কোন ধর্ম্মের বাঙ্গালীই হউন না কেন, নিত্য তাঁহাকে স্বভাবের প্রতিকূলে যুঝিতে হইবে; কারণ, সমস্ত বাঙ্গালীর প্রকৃতি-অনুমোদিত ভাষা বাঙ্গলা—এটা তাঁহাদের আপন সম্পত্তি।

সাহিত্যের ভাষা সম্বন্ধেও সেই নিয়মই খাটে। বঙ্গভাষার দৃষ্টান্ত লইয়াই দেখুন। যে পণ্ডিতগণ বাঙ্গলাকে বিভক্তিহীন সংস্কৃত করিতে চান, বা যে শব্দ-শিল্পিগণ একেবারে গ্রাম্য ভাষায় সাহিত্যচর্চ্চা করিতে চান, তাঁহাদের উভয়েরই চেষ্টা বিফল হইতেছে, হইবেও। কারণ, একদিকে—দুরূহ শব্দ-বহুল ভাষা, যাহাতে পদে পদে অভিধানের প্রয়োজন--সেরূপ ভাষা দু'একজন পণ্ডিতেরই উপযোগী, সাধারণে তাহার কখন আদর করিবে না; অপরদিকে—গ্রাম্যভাষা শ্রেণী-বিশেষে আবদ্ধ, এবং স্থানভেদে বিভিন্ন আকারের; সুতরাং তাহা সর্ব্ববিভাগের ভাষা হইতে পারে না; বিশেষতঃ, আমাদের উচ্চতম চিন্তা ভাব কল্পনা যাহা সরল ভাষায় পরিস্ফুট হয়, তাহা লঘু গ্রাম্য ভাষায় কখনও পরিব্যক্ত হইতে পারে না। তাই মধ্যবর্ত্তী কোন পথ খুঁজিয়া লইতে হইতে হইবে প্রকৃতিই সে পথ দেখাইয়া দেন। কারণ, ভাষা কাহারও নিজস্ব সম্পত্তি নহে। তাহার উপর জোর খাটে না। সহজ এবং স্বাভাবিক ভাবে তাহার গতির পরিবর্ত্তন করিতে হয়। সে ক্ষমতা মহাপুরুষগণের আছে। তাঁহারা প্রকৃতির অনুচর, বা তাহারাই প্রকৃতি সৃষ্টি করেন। তাঁহারা আপনাদের প্রতিভার বলে আপনাদের রচনার মধ্যে ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করেন যাহার কুহকে লোকে আপনাদের অজ্ঞাতসারে তাঁহাদের শিষ্য হইয়া, তাঁহাদের শব্দ-বিন্যাস প্রথা, তাঁহাদের প্রদর্শিত শব্দাবলী অবলম্বন করে। এইরূপে ভাষার পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। এ ক্ষমতা শুধু প্রতিভাবান লেখকেরই আছে, ইহা অন্যের সাধ্যায়ত্ত নহে। ইতিহাস তাহারই প্রমাণ দিতেছে।

আশী বৎসর পূর্ব্বে যখন নব গ্রীস স্বাধীন হয়, তখন স্বদেশপ্রেমিকেরা দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বেকার সেই প্রাচীন গ্রীক ভাষা, যাহার সাহিত্য, যাহার রাজনৈতিক প্রণালী তদানীন্তন এবং পরবর্ত্তী যুগে জগতে অতুল প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, সেই ভাষার পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিলেন। শিক্ষক, লেখক এবং সম্পাদকবর্গ প্রাচীন গ্রীসভাষার পথা-নুবর্ত্তী হইলেন। কিন্তু ৫।৬ বৎসর পরে দেখা গেল—ফল বিপরীত হইয়াছে। প্রাচীন গ্রীক শেখা দূরে থাক, লোকে বাধ্য হইয়া লেখাপড়ার চর্চ্চায় পর্য্যন্ত জলাঞ্জলি দিতে বসিয়াছে। তখন গ্রীস আবার নব পথে ফিরিয়া আসিল।

ইংলণ্ডেও, নর্ম্মাণগণ প্রথম ইংলণ্ড জয় করিয়া দেশের যাবতীয় কার্য্যে তাহাদের পৈত্রিক ফরাসী ভাষার প্রচলন আরম্ভ করি-লেন। কিন্তু, ইংলণ্ডের লোক তাহার কিছুই

বুঝিল না। এদিকে আবার, বহুকাল ফ্রান্সের সহিত বিচ্ছিন্ন থাকায়, কালক্রমে ইংলণ্ডস্থ নর্ম্মাণদের ভাষা হাস্যাস্পদ রূপে বিকৃত হইয়া উঠিল, সে ভাষায় আর তখন ভাল পুস্তকাদি লেখা চলিল না। তিনশত বৎসর পরে তাঁহারা তখন বুঝিলেন যে তাঁহারা নর্ম্মাণ হইলেও ইংরাজ; সুতরাং ইংরাজী ভাষা অবলম্বন করা তাঁহাদের শ্রেয়। সেইদিন হইতেই অপূর্ব্ব ইংরাজী-সাহিত্যের সূচনা হইল। কবি চসার তাহার আদিগুরু। তাঁহারই ভাষা ঈষৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া আজিও চলিতেছে।

পারস্য এবং তুরস্কও এ সত্যের সাক্ষ্য দেয়। ৬৪৪ খৃঃ নাহাবন্দ যুদ্ধে পারস্য জয় করিয়া আরবেরা সেখানে মহম্মদীয় ধর্ম্ম ও আরবী ভাষার প্রতিষ্ঠা করিলেন। গ্রন্থ ও দলিলদস্তাবেজাদি আরবীভাষায় লেখা আরম্ভ হইল এবং পারস্য হরফে আরবী গ্রন্থসমূহ পুনর্লিখিত হইল। জনসাধারণ তাহা বুঝিল না, তাহাদের জ্ঞানবিস্তার সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। অবশেষে ফের্দৌসী জন্মগ্রহণ করিলেন। তিনি গ্রাম্য ভাষায় কাব্য লিখিয়া সকলের মনোহরণ করিলেন। সেই হইতেই ফারসী পারস্যের ভাষা হইল। তুরস্কের কবিগণও একদিন এইরূপে তুর্ক-দেশে পারস্য ভাষা চালাইতে গিয়া নিরাশ হইয়াছিলেন এবং পরিশেষে তুর্কী ভাষাকেই মুখপত্র করিতে বাধ্য হন।

ভারতেও তাহাই ঘটিয়াছে। মুসলমানের উত্তরভারত-জয়ের একশত বৎসর যাইতে না যাইতে, উপরোক্ত কারণে, আরবী ছাড়িয়া ফারসীতে বই লেখা আরম্ভ হইল, এবং আরবী গ্রন্থগুলিকে ফারসীতে অনু-বাদিত করা আবশ্যক হইল, কারণ তখন আরবী ভাষা লোকে ভুলিয়াছে। চারিশত বৎসর পরে আবার ফারসী ভাষাও মুসল-মানের নিকট 'পর' হইয়া আসিল, তখন ভারতীয় উর্দ্দূর প্রচলন হইল। আরবী 'আখ্' বা ফারসী 'বেরাদর' ছাড়িয়া তাঁহারা হিন্দী 'ভাই' ও 'দাদা' ধরিলেন। 'পুঁটি বিবি' 'মতি বেগম' প্রভৃতি দেশী কথাও তাঁহাদের পরিবারে প্রবেশ করিল। শাহজাহান যে উর্দ্দূতে অতি সুন্দর গান রচনা করিতেন ও গাহিতেন পাদিশাহনামাই তাহার প্রমাণ দেয়। এখন যাহা গানের ভাষা তাহাই প্রাণের ভাষা; সুতরাং, আমরা যথেষ্ট প্রমাণ পাই যে, শাহজাহানের সময় হইতেই উর্দ্দূ বাদশাহদিগের আপনার ভাষা হইয়াছিল।

অতএব, যদি দিল্লীর বাদশাহগণ তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের আরবী ফারসী তুর্কী ছাড়িয়া উর্দ্দূ গ্রহণ করিলে তাঁহাদের খানদান বা ধর্ম্মের কোন হানি না হইয়া থাকে, তবে বঙ্গের মুসলমানগণ উর্দ্দূ ছাড়িয়া বাঙ্গলা ধরিলে তাঁহাদের সেরূপ কোন হানি হইবে কেন, আমি বুঝি না। উপরোক্ত সকল কারণে মুসলমানগণের বঙ্গভাষা গ্রহণ করা অনিবার্য্য। যাহা প্রকৃতির সনাতন নিয়ম, দেশভেদে তাহার ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে না। এ বিষয়ে মুসলমানদের উদাসীনতায় তাঁহারা নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছেন।

সেই ক্ষতির পরিমাণ আমি দেখাইতে চেষ্টা করিব। প্রথমতঃ শ্রীযুক্ত আবদুল

করিয়া দেখাইয়াছেন যে উর্দ্দুর মধ্য দিয়া উচ্চ শিক্ষা দিবার চেষ্টায় মুসলমান বালকগণকে হিন্দুর অপেক্ষা দুইটি অর্থাৎ পাঁচটী ভাষা শিখিতে হয়। ফলে, ভাষার বোঝা ঘাড়ে লইয়া তাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের মন্দিরে অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারে না। তাহারা অনেকেই ভাল উর্দ্দু শেখে না, অথচ বাঙ্গলার চর্চ্চাতেও লজ্জা পায়। ইংলিস ভার্ণাকুলার লইয়া পরীক্ষায় পাশ হইলেও, কর্ম্মক্ষেত্রে—যেখানে মাতৃভাষার নিত্য প্রয়োজন,—সেখানের পরীক্ষায় ইঁহাদের অবস্থা বড় শোচনীয় হইয়া দাঁড়ায়।

দ্বিতীয়তঃ, পারত্রিক ক্ষতি। মধ্য যুগে ইউরোপে যে বিভ্রাট ঘটিয়াছিল, আধুনিক যুগে বাঙ্গালায়ও তাহাই হইতেছে। ইয়ুরোপে তখন আদি-বাইবেল খানা গ্রীক ও হিব্রু হইতে ল্যাটিনে অনুবাদিত করিয়া গীর্জ্জায় গীর্জ্জায় পাঠ হইত এবং ঐ ভাষাতেই ভজনা ও সঙ্গীত চলিত। সাধারণে তোতাপাখীর মত তাহা আবৃত্তি করিত, কিছু বুঝিত না; কাজেই ধর্ম্ম তাহাদের নিকট একটা বাহিরের বস্তুতে রূপান্তরিত হইয়াছিল। তারপর ষোড়শ শতাব্দীতে লুথার যখন ধর্ম্মসংস্কার করিলেন, তখনই দেশী ভাষায় ধর্ম্মকথা শুনিয়া এবং পড়িয়া, লোকে ধর্ম্মকে যথার্থ প্রাণের বস্তু বলিয়া ধরিতে শিখিল। এখানে, এ বাঙ্গালা দেশেও, কোরাণ হদিস উর্দ্দুতে অনুবাদিত করিয়া উর্দ্দু ব্যাখ্যার সাহায্যে পড়ান হয়। ইহাতে ফল এই হয় যে ধর্ম্মপুস্তকগুলি অপরিচিত ভাষায় থাকিয়া যায়। মোল্লাগণ যদি বাঙ্গলা অনুবাদ গুলিকে ঘৃণার চক্ষে না দেখিতেন, তবে কত মুসলমান মাতৃভাষায় ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করিয়া ধন্য হইতে পারিতেন। ইহা বেশ মনে রাখা উচিত যে ধর্ম্মের সহিত ভাষার সম্বন্ধ নাই। ধর্ম্ম সীমাবদ্ধ নহে, তাহা কোন বিশেষ ভাষায় লিখিত পুস্তকে আবদ্ধ নহে। ধর্ম্ম সার্ব্বজনিক এবং সনাতন।

তৃতীয়তঃ, তাঁহাদের পক্ষে উর্দ্দুর পরিচালন সম্ভবপর হইলেও তাঁহাদের রমণীগণের তাহাতে বিশেষ ক্ষতি হইবে। বাঙ্গলা-বর্জ্জন এবং জ্ঞান-বর্জ্জন তাঁহাদের পক্ষে একই কথা। বাঙ্গলাভাষা শিক্ষার পক্ষে তাঁহাদের যেরূপ সুযোগ আছে, উর্দ্দু শিখিবার পক্ষে সেরূপ নাই। কাজেই বাঙ্গলা ত্যাগ করিলে তাঁহাদের সমাজের এক অঙ্গ বিকল হইয়া থাকিবে।

চতুর্থতঃ, বাঙ্গালী মুসলমানেরা প্রায়ই ভাল উর্দ্দুতে সুশিক্ষিত হন না। ফলে, অনেকস্থলে তাঁহাদিগকে অপরের কাছে লজ্জিত হইতে হয়। বাঙ্গলাভাষায় কথা বার্ত্তা কহিবার আগ্রহ যে তাঁহাদের সর্ব্বদাই হয় বিদেশস্থ অনেক মুসলমান তাহার প্রমাণ দিয়াছেন। তবে সে ভাষাকে মুসলমান সম্প্রদায় ত্যাগ করিতে চান কেন?

পঞ্চমতঃ, উর্দ্দুভাষার আদর্শ অতি পুরাতন। মধ্যযুগের সেই নিরাশা অবসাদ তাহার প্রতি কাব্য এবং রচনার মধ্যে প্রবাহিত হইতেছে। কিন্তু জগতের গতি আজ ভিন্ন প্রকার। যে নব ভাব উনবিংশ শতাব্দীতে প্রবাহিত হইয়া জগতের কর্ম্মে ধর্ম্মে এক নূতন তেজ আনিয়া জগতের আকৃতির পরিবর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহার তরঙ্গ বঙ্গ-

সাহিত্য-নদীতেই প্রবেশ করিয়াছে। বাঙ্গলাসাহিত্য আজ জগতের এই নব শক্তির সহিত আপন সংযোগ রক্ষা করিতেছে। প্রথম যুগযুগান্তরব্যাপী জড়তা, নিদ্রার অলসতা, উদাসীনতা পরিত্যাগ করিয়া, পৃথিবীর রণক্ষেত্রে দাঁড়াইতে হইবে। সে যুদ্ধের সমরসঙ্গীতের উৎসাহধ্বনি বঙ্গসাহিত্যেই মিলিবে, উর্দ্দুতে নহে। অবশ্য উর্দ্দুক আমি অবহেলা করি না, তাহার মধ্যে অতীতের অনেক রত্ন আছে। কিন্তু, সে ভাষা আধুনিক যুগের উপযোগী নহে।

সম্প্রদায়বিশেষের কথা ছাড়িয়া আমি সাহিত্যসেবিগণের নিকট একটি নিবেদন করি।—

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এইরূপ সভা সম্মিলন সাহিত্য-সৃজন করিতে পারে না। ইহারা পথ দেখায় মাত্র। কারণ, যেমন "A poet is born not made", তেমনি শুধু পণ্ডিতাই —চেষ্টা নহে—সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর মৌলিক সাহিত্য সৃজন করিতে পারে না। কিন্তু তবু চেষ্টা দ্বারা অনেক কাজ হয়। বাঙ্গলা-সাহিত্য এখন শিশুর ন্যায় চঞ্চল, শিশুর ন্যায় অশান্ত। তাহাকে সংযত করিয়া তাহার উচ্ছ্বসিত আবেগকে যোগ্য পথে পরিচালিত করিয়া তাহার পূর্ণ পরিণতির অভিমুখে তাহাকে চালিত করিতে হইবে। ছোট বড় সব জিনিসই জ্ঞান শিক্ষা দেয়; জগতে কিছুই উপেক্ষণীয় নহে। নবযুগের এই বিচিত্র ভাবের ও জ্ঞানের দিনে, জ্ঞান ক্ষেত্রের বিভাগ করিয়া প্রত্যেক লেখককে তাঁহার নিজের বিভাগ দেখাইয়া দিয়া, তাঁহাকে উপদেশ দিয়া, তাঁহার ব্যক্তিগত কার্য্যের সমালোচনা দ্বারা, যথার্থ সাহিত্য-সেবীর দল গড়িতে হইবে। তাঁহাদের ব্যক্তিগত চেষ্টার সমবায়ে এক বিশাল ব্যাপার এইরূপে সহজে স্বাভাবিকভাবে সম্পূর্ণতার পথে অগ্রসর হইবে।

উত্তরবঙ্গে ভাবিবার এবং খুঁজিবার জিনিস অনেক আছে। প্রাচীনতম ভারতের ইতিহাস, ভাষার ক্রমবিকাশের ইতিহাস, ধর্ম্মের পারম্পরিক ইতিহাসের উপকরণ এখানে যত আছে অন্যত্র কোথাও তত নাই। দুইটি পুরাতন পথে এখানে অতীত আপনার লেখা রাখিয়া গিয়াছে। পশ্চিম ভারতে যাহা মিলে না এখানে তাহা মিলে সুতরাং সেই সকলের এবং এই প্রদেশের বিশেষ তত্ত্বাদির উদ্ধার সাধনে এই সম্মিলনীর সচেষ্ট হইতে হইবে। স্থানীয় অনার্য্য জাতিদের পূজা-পদ্ধতি, আচার-বিচার, ভূতপ্রেতে বিশ্বাস, ভাষা-উপভাষার বিশেষত্ব প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা দ্বারা তাহাদের আদিম সভ্যতার কালানুসন্ধান প্রভৃতি বহু তথ্য সংগৃহীত হইতে পারে। কিন্তু সে পরিশ্রমে অভিনিবেশ চাই। সাহিত্যের সেবা সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়া করিতে হয়, তাহাতে জ্ঞান চাই, অধ্যবসায় চাই। তাহা শুধু খেয়ালের ঝোঁক নহে, তাহা অসম্পূর্ণ শিক্ষায় সম্ভবপর নহে। বাঙ্গলা-সাহিত্যে যাহা নাই, বিদেশী সাহিত্য হইতে তাহা সংগ্রহ করিতে হইবে। কারণ যাহা সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ সত্য বা প্রাকৃতিক তত্ত্ব তাহা সাহিত্য-বিশেষের সম্পত্তি নহে; তাহা সমগ্র মানবজাতির সম্পত্তি — তাহা সার্ব্বজনীন। প্রত্যেককে তাই জ্ঞানের সকল বিভাগেই

স্বদেশ-বিদেশের রত্নরাজি আহরণ করিয়া বঙ্গসাহিত্যকে সাজাইতে হইবে এবং প্রত্যেক বিষয়ে সর্ব্বোচ্চ জ্ঞান লাভকেই জীবনের কামনার বস্তু বলিয়া ধরিতে হইবে।

এই সম্মিলন, বঙ্গ-সাহিত্যের মধ্য দিয়া সেই উচ্চ আদর্শের প্রতি যেন আমাদের লইয়া যায়। আমরা যেন সমস্ত সঙ্কীর্ণতা, প্রাদেশিকতা, জাতিগত বিদ্বেষ, অজ্ঞানজ ভেদবুদ্ধি দ্বারা চালিত না হইয়া, দুঃখ-জরা-দৈন্যরহিত সেই সর্ব্বোচ্চ সাহিত্যজগতে প্রবেশাধিকার লাভ করিতে পারি,—যেখানে শুধু বিশ্বব্যাপী মহান্ শান্তি, মহা সংযম, মহা আনন্দ, মহা স্বাধীনতা বিরাজ করিতেছে! *

মানবের জন্মকথা

পরিবর্দ্ধনের রোধ। পরিবর্দ্ধনের রোধ এবং বৃদ্ধির রোধ, এতদুভয় মধ্যে প্রভেদ আছে; পরিবর্দ্ধন রুদ্ধ হইলেও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রাথমিক আকারেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে পারে। বিবিধ অঙ্গ-বিকৃতি ইহার দৃষ্টান্ত স্থল। খণ্ডিত তালু প্রভৃতি কতিপয় বিকৃতি সময় সময় বংশানুগত হয়। আজন্ম জড়-ভাবাপন্ন অবোধদিগের মস্তিষ্কের পরিবর্দ্ধন রুদ্ধ থাকে; ইহা উল্লেখ করিলেই এ স্থলে যথেষ্ট হইতে পারে। ভগ্ট প্রণীত পুস্তিকাতে এ বিষয় বিবৃত রহিয়াছে। সাধারণ মানবের তুলনায়, ঐ সকল অবোধের মাথার খুলী ছোট, এবং মস্তিষ্কের আবর্ত্তগুলিও কম জটিল। কপালের নালী অথবা ভ্রূযুগলের উপরিভাগ বর্দ্ধিত, এবং হনু বাহিরের দিকে পরিপুষ্ট। এই অবোধেরা নিম্নশ্রেণীস্থ (অর্থাৎ অসভ্য) মানবের ন্যায়। তাহাদিগের বুদ্ধি এবং প্রায় সকল মনোবৃত্তিই দুর্ব্বল। তাহারা কথা বলিবার শক্তি লাভ করিতে অক্ষম; তাহারা দীর্ঘকাল কোন বিষয়ে মনোনিবেশ করিতে পারে না, কিন্তু অনুকরণ করিতে বিশেষ পটু। তাহারা বলিষ্ঠ এবং অত্যন্ত কর্ম্মঠ, সর্ব্বদাই লাফঝাঁফ খেলাধূলা করে, এবং নানারূপ মুখভঙ্গি করিয়া থাকে। তাহারা অনেক সময়ে চারি পায়ের উপর হামাগুড়ি দিয়া সিঁড়িতে উঠে; এবং কোন জিনিষের কি বৃক্ষের উপরে চড়িতে ভাল বাসে। এই কথায় বালকদিগের কথা মনে পড়ে, উহারা প্রায় সকলেই গাছে চড়িতে ভালবাসে; ইহাতে মেষ এবং মেষশাবকের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়, উহারা মূলে পার্ব্বত্য জন্তু, তাই সামান্য একটু উঁচু স্থান পাইলেই তাহার উপর উঠিয়া নৃত্য করিতে ভালবাসে। উক্ত অবোধেরা আরও কতিপয় বিষয়ে নিম্নশ্রেণীর জন্তুর মত ব্যবহার করে। অনেকগুলি অবোধের কথা লিপিবদ্ধ আছে, উহারা খাইবার সময় প্রত্যেক গ্রাসের ঘ্রাণ লইয়া খায়। একটি অবোধের কথা লেখা আছে যে, সে যখন উকুন মারে তখন হাত ও মুখ দুই-ই ব্যবহার করে। অনেক সময় তাহাদিগের চাল-চলন নোংরা; এবং তাহাদের লজ্জাশীলতার জ্ঞানই নাই। ঐ প্রকার অবোধদিগের দেহ অতিশয় লোমশ হইয়া থাকে, এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত লিপিবদ্ধ আছে।

পুনরাবর্ত্তন। এই সম্বন্ধে যে সকল দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিব, তাহার মধ্যে অনেকগুলি উপরের লিখিত বিভাগেও লিখা যাইত। যখন দেহের কোন অংশ প্রাথমিক অবস্থাতেই থাকিয়া যায়, এবং ঐ অবস্থাতেই বর্দ্ধিত হইয়া কোন নিম্নশ্রেণীস্থ প্রাপ্তবয়স্ক প্রাণীর ঐরূপ দেহাংশের ন্যায় হয়, তখন তাহাকে এক অর্থে পুনরাবৃত্তি বলা যাইতে

* সভাপতি অধ্যাপক যদুনাথ সরকার, এম্-এ।

পারে। কোন এক শ্রেণীর জীবগণ মধ্যে যাহারা নিম্নশ্রেণীস্থ (অর্থাৎ অনুন্নত), তাহাদিগকে দেখিলেই কতকটা বুঝা যাইতে পারে, উহাদিগের আদি পুরুষ কিরূপ ছিল। ভ্রূণাবস্থাতেই যদি কোন জটিল দেহাংশের বিবর্দ্ধন * রুদ্ধ হয়, অথচ উহা ঐ প্রাথমিক আকারেই বাড়িতে থাকে, এবং অবশেষে উহার স্বকর্ম্ম নিস্পন্ন করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে বিবেচনা করিতে হয় যে, ঐ অবিবর্দ্ধিত অঙ্গ যখন কোন অতীত কালে কোন নিম্ন প্রাণীর দেহে সাধারণতঃই জাত হইত, তখনই উহা ঐরূপ কর্ম্ম নিস্পন্ন করিতে সক্ষম হইয়াছে। অন্য কোন সিদ্ধান্ত বিশ্বাসযোগ্য হয় না। আজন্ম জড়বুদ্ধি নির্ব্বোধের মস্তিষ্ক যে পরিমাণে বানরের মস্তিষ্কের ন্যায়, সেই পরিমাণে উহাকে পুনরাবর্ত্তনের দৃষ্টান্ত স্থল বলা যাইতে পারে। † সে যাহাই হউক, আরও অন্যান্য কতিপয় স্থলকে অধিকতর সঙ্গত রূপেই পুনরাবর্ত্তনের দৃষ্টান্ত মধ্যে গণ্য করা যাইতে পারে। মানব যে শ্রেণীর জীব সেই শ্রেণীর নিম্নতর জন্তুর দেহস্থ কতিপয় সাধারণ গঠন কদাচিৎ মানব দেহেও দেখা যায়, কিন্তু মানবীয় ভ্রূণে তাহা দৃষ্ট হয় না; অথবা ভ্রূণ-দেহে দৃষ্ট হইলেও পরে বিসদৃশভাবে বিবর্দ্ধিত হয়, কিন্তু ঐ সকল নিম্নতর জন্তুর দেহে উক্ত গঠনগুলি সাধারণতঃই ঐ ভাবে জাত হইয়া থাকে। এই সকল কথা নীচের দৃষ্টান্তগুলি বিবেচনা করিলে আরও বিশদরূপে বুঝা যাইবে!

অনেক স্তন্যপায়ী জীবের জরায়ু দ্বিমুখ এবং দ্বিরন্ধ্র। যথা মার্সুপিয়াল দিগের। * এইরূপ জরায়ুকে ডবল যন্ত্র বলা যায়। ইহা অপর স্তন্যপায়ী জীব-দেহে ক্রমে একটি যন্ত্রে পরিণত হইয়াছে। ইহার ভিতরে একটি ভাঁজ আছে। তদ্ভিন্ন ডবলের কোন লক্ষণই নাই। এই ভাঁজ উচ্চ শ্রেণীর বানরে ও মানবেও দেখা যায়। দ্বিরন্ধ্র জরায়ু ক্রমে কিরূপে এক রন্ধ্রে পরিণত হইয়াছে তাহা দন্তুর শ্রেণীতে (Rodants) সুন্দর দেখা যায়। সকল স্তন্যপায়ীর জরায়ুই দুইটি সরল নল হইতে গঠিত হয়, উহাদিগের নীচের অংশ হইতে জরায়ু-শৃঙ্গ উৎপন্ন হয়। ডাক্তার ফ্যারে বলেন যে "ঐ শৃঙ্গ দুইটির নীচের ভাগ পরস্পরের সহিত যুক্ত হইয়া মানবীয় জরায়ুর মধ্য ভাগ গঠিত হয়; কিন্তু যে সকল জন্তুর জরায়ুর মধ্যভাগ নাই, তাহাদিগের উহা পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হয় না। জীবরাজ্যে জরায়ুর বিবর্দ্ধন যেমন ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে থাকে, তেমনই শৃঙ্গ দ্বয় ক্রমে হ্রস্ব হইতে হইতে জরায়ুর মধ্যভাগে লুপ্ত হইয়া যায়।" অদ্যাপিও লোঙ্গর এবং বানরের উন্নত জীব শ্রেণীতেও জরায়ুর কোণ বর্দ্ধিত হইয়া শৃঙ্গ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

নারীদেহেও পরিণত জরায়ুর শৃঙ্গ থাকা সময় সময় দেখা যায়, কখন বা জরায়ু বিভক্ত হইয়া কিয়ৎ পরিমাণে ডবল হইয়া উঠে। এরূপ দৃষ্টান্ত নিতান্ত বিরল নহে। ওয়েন্ বলেন এরূপ স্থলে দন্তুরগণের জরায়ুর ন্যায় দ্বিরন্ধ্র হইতে একরন্ধ্র পরিণামের পর্য্যায় সকল পর পর লক্ষিত হইয়া থাকে। এ ক্ষেত্রে বোধ হয় ভ্রূণাবস্থাতেই জরায়ুর বিবর্দ্ধন বন্ধ হইয়া যায়, কি ঐ প্রাথমিক ভাবেই উহা বাড়িতে থাকে, এবং অবশেষে

* Development—Growth বৃদ্ধি

† ডারুইন এ স্থলে দীর্ঘ পাদটীকাতে তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ নম্রতা ও সত্যপ্রিয়তা বশতঃ পূর্ব্বের কয়েকটি ভ্রম স্বীকার করিয়াছেন। তাহার মর্ম্ম এই যে কতিপয় নরনারীর বক্ষে দুইটি স্তনের অধিক থাকা জানিয়া তিনি "পুনরাবর্ত্তন" বিবেচনা করিতেন। কিন্তু তাহা সঙ্গত নহে, কারণ বক্ষের ন্যায় পেটে, উরুতে এবং পৃষ্ঠেও ঐরূপ স্তন পাওয়া গিয়াছে। আর হস্ত-পদে অধিক অঙ্গুলি থাকিলেও তিনি পুনরাবর্ত্তন বিবেচনা করিতেন; তাহাও ভ্রম। এই সম্বন্ধে ঐরূপ মত এক্ষণে ত্যাগ করাই উচিত।

* কাঙ্গারু এই শ্রেণীভুক্ত।

সম্পূর্ণ কর্ম্মক্ষম হয়। কারণ ঐরূপ অংশ ডবল জরায়ুর দুই দিকই গর্ভধারণ কার্য্যোপযোগী। অত্যল্প স্থলে মানবীয় জরায়ুতেও দুইটি পৃথক মুখ, পৃথক রন্ধ্র এবং পৃথক গহ্বর থাকা দেখা যায়। কিন্তু যাহাদিগের এইরূপ থাকে তাহাদিগের ভ্রূণাবস্থায় ইহার কোন চিহ্নই পাওয়া যায় না। কাঙ্গারু শ্রেণীতে যেরূপ দুইটি পৃথক মুখ ও রন্ধ্র যুক্ত দুইটি জরায়ু থাকে, এবং প্রত্যেকের পৃথক পেশি, স্নায়ু, স্নায়ুগণ্ড এবং রক্ত কোণ থাকে, তদ্রূপ দুইটি পৃথক জরায়ু গঠন করিবার পূর্ব্ব হইতে অভ্যস্ত (*) না থাকলে ঐ প্রাথমিক নল দুইটি স্বয়ং জাত থাকিত, ইহা বিশ্বাস করা অসম্ভব না হইলেও কঠিন। নারী-দেহে ঐরূপ অ-মানবীয় ডবল জরায়ু অমন পূর্ণগঠিত ও কার্য্যক্ষম ভাবে যদিচ্ছা বশতঃ উৎপন্ন হয়, এরূপ কেহই বলিবে না। কিন্তু দেহের কোন অংশ নিম্ন প্রাণীর ছিল, অথচ কালে উহা পরিত্যক্ত হইয়া উচ্চ প্রাণীতে আর দেখা যায় না, এরূপ স্থলে যদি কখনও উচ্চ প্রাণীর দেহেও উহা পূর্ণাবস্থায় দৃষ্ট হয় তবে পুনরাবর্ত্তনের বিধান স্বীকার করিলেই তাহা দুর্ব্বোধ্য হয় না। †

এই সকল দৃষ্টান্ত এবং এইরূপ অন্যান্য অনেক দৃষ্টান্ত আলোচনা করিয়া অধ্যাপক ক্যানেস্ট্রিণীও এইরূপ সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছেন। তিনি আর একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়াছেন, উহা গণ্ডাস্থি। ঐ অস্থি কতিপয় বানরের এবং অন্যান্য স্তন্যপায়ী জীবের সচরাচর দুই অংশে বিভক্ত দেখা যায়। দুইমাস বয়সের মানব-ভ্রূণে উহা এই প্রকার। উহার বিবন্ধন বন্ধ হওয়ায় উহা কখন কখন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিরও ঐ আকারেই রহিয়া যায়। বিশেষতঃ যে সকল অসভ্য জাতির হনু বাহিরের দিকে বর্দ্ধিত, তাহাদিগের মধ্যে ঐ অস্থি ঐরূপ আকারের অনেক সময় দেখা যায়। এ নিমিত্ত ক্যানেস্ট্রিণী অনুমান করেন যে মানবের দূরবর্ত্তী পূর্ব্ব পুরুষের ঐ অস্থি সচরাচর ঐ রূপই হইত, পরে উহা যুক্ত হইয়া গিয়াছে। বয়স্থ মানবের কপালের উর্দ্ধভাগের অস্থি এক খণ্ড মাত্র; কিন্তু মানবগণের এবং শিশুগণের ও নিম্নশ্রেণীস্থ প্রায় সকল স্তন্যপায়ী জন্তুরই উহা দুই খণ্ড একত্রে শেলাইর মত যুড়িয়া গিয়া একখণ্ডের মত হইয়াছে। মানব পূর্ণবয়স প্রাপ্ত হইলে পরেও এই সেলাইটি কখন কখন অল্পাধিক স্পষ্টভাবে থাকিয়া যায়। বর্ত্তমান কালীয় অপেক্ষা প্রাচীন কালীয় মাথার খুলিতেই অপেক্ষাকৃত অধিকস্থলে এই সেলাই দেখা যায়। ক্যানেস্ট্রিণী দেখাইয়াছেন যে ঐরূপ অস্থি চওড়া-খুলিতেই বেশি পাওয়া যায়, এবং উহা ষ্ট্রীকট্ মধ্যে পাওয়া গিয়াছে। গণ্ডাস্থি অস্থি সম্বন্ধেও তিনি যেরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, এ ক্ষেত্রেও তিনি তদ্রূপ সিদ্ধান্তই করেন। আমি আরও কতিপয় দৃষ্টান্ত পরে উল্লেখ করিতেছি। এই সমস্ত দৃষ্টান্ত হইতে দেখা যাইবে যে, নিম্নতর জীবদেহের কোন কোন অংশে প্রাচীনকালীয় মানবের দেহে, বর্ত্তমান কাল অপেক্ষা অনেক সময় অল্প-বিস্তর দেখা যাইত। এক্ষণে তাদৃশ দেখা যায় না। তাহারা কারণ বোধ হয় যে প্রাচীনকালীয়গণ অর্দ্ধমানববৎ পূর্ব্বপুরুষের অধিকতর নিকটবর্ত্তী ছিলেন, (আমরা এখন অনেক দূরে পড়িয়া গিয়াছি)।

উপরের লিখিত গুলি ছাড়া আরও অনেক ইতরজন্তু-সুলভ দেহাংশ মানবে পাওয়া যায়। ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থকারগণ তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহারা ঐ সকলকেও পুনরাবর্ত্তন বলিয়াই ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু তাহাতে আমার কিঞ্চিৎ দ্বিধা হয়; কারণ ঐ সকল দেহাংশ ইতর জন্তুতে পূর্ণভাবে দেখিতে হইলে স্তন্যপায়িগণের অতি নিম্নশ্রেণীতে যাইতে হয়। (ক্রমশ)

শ্রীশশধর রায়।

* নিম্নতর জরায়ুজগণের দেহে ঐ নলদ্বয় ডবল জরায়ুতে পরিণত হইত, তাহাকেই পূর্ব্বের অভ্যাস বলা গেল। অনু:

† অধুনা অনেকেই এই বিধান স্বীকার করেন না; বিশেষতঃ মেণ্ডেলিয়ানগণ।

কলিকাতা ২৭ নং হরিতকি বাগান লেনে কমার্শিয়াল প্রেসে শ্রীকুঞ্জচন্দ্র আইচ দ্বারা মুদ্রিত।

মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র।

পূর্ব্বাভাস।

শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয় মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীকে অবিসম্বাদ বঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়াছেন, এবং কথিত আছে যে রাজা রামমোহন রায় একবার কাব্যপ্রণয়নে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন, কিন্তু ভারতচন্দ্রের মত লিখিতে পারিবেন না বুঝিয়া, সে ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এতৎসত্ত্বেও ইহা দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, মুকুন্দরাম আজকাল শিক্ষিতসমাজে উপেক্ষিত, এবং ভারতচন্দ্র অত্যন্ত অবজ্ঞাত। ভারতচন্দ্রকে অবজ্ঞা করিবার যে কারণ সাধারণতঃ নির্দ্দেশিত হয়, তাহা অনেক পরিমাণে ন্যায্য; কিন্তু মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীকে অবহেলা করিবার কোনও ন্যায্য কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। কারণ থাকুক বা না থাকুক, কিন্তু তিনি যে অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তির কাছে পরিচিত নহেন, এ কথা নিশ্চিত সত্য।

কেন এমন হয়, যে কবিদ্বয়ের গীত এক কালে সাধারণের এত প্রিয় ছিল, এখন তাঁহারা কেন অনাদৃত, এ বিষয় অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। এখন যে জীবসমষ্টি বাঙ্গালী বলিয়া অভিহিত, তাহারা ঠিক বাঙ্গালী নহে, আমরা এখন আমরা নহি, আমাদের সঙ্গে বিদেশীয় ভাবের এতটা মাখামাখি হইয়া গিয়াছে যে এখন কোনও বিষয়েই খাঁটি বাঙ্গালাজিনিষ আমাদের মনোগত হয় না। আচার্য্য বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন যে, "এখন আর খাঁটি বাঙ্গালা কাব্য হয় না, হইয়াও কাজ নাই।" "খাঁটি বাঙ্গালা কাব্য হয় না" সেটা সত্য, কিন্তু "হইয়াও কাজ নাই" এ কথা এখন আবার সকলে নত মস্তকে স্বীকার করিয়া লইতে প্রস্তুত হইবেন কি না জানি না। মুকুন্দরামের "চণ্ডী"কে আমরা খাঁটি বাঙ্গালার কাব্য বলিতে পারি। এমন একখানি কাব্য আজকাল যদি হয়, তাহা যে আদৃত কেন হইবে না তাহা বুঝিতে পারি না। কাব্যসম্বন্ধে আমরা যে একটা ধারণা গড়িয়া লইয়াছি, সেই ধারণার পোষক না হইলেই সেই কাব্যকে আমরা নিস্পৃহ চক্ষে দেখিয়া থাকি। আজকালকার কাব্যনিচয় সেই ধারণাপ্রসূত বলিয়া আমাদের কাছে, অর্থাৎ মুষ্টিমেয়ের কাছে আদৃত। আগেকার কাব্যগুলি সাধারণের জন্য, আজকালকার কাব্যগুলি বিদেশীভাবাপন্নের জন্য লিখিত। ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, সাধারণ বাঙ্গালী আজকালকার কাব্য পড়ে না, আর ইংরাজীভাবাপন্ন বাঙ্গালী আগেকার কাব্যগুলি

পড়ে না। কিন্তু কোনও ক্ষমতাপন্ন কবি যদি বাঙ্গালীর অস্থিমজ্জাগত ভাব বুঝিয়া বাঙ্গালীর কাব্য লেখেন, তাহা হইলে সে কাব্য 'হওয়া কাজ নাই,' বা তাহার অনাদর হওয়াই আবশ্যক, এ কথা আমি স্বীকার করিতে পারিতেছি না।

একদিন হঠাৎ আমরা শিখিয়া ফেলিয়াছিলাম যে, "ইংরাজী পুস্তকাগারের একটি সেল্‌ফে যে পুস্তক থাকিতে পারে, তাহাই এসিয়ার সমস্ত পুস্তকাগারের সমস্ত পুস্তকরাশির অপেক্ষা মূল্যবান্।" এই শিক্ষা আমাদিগকে বহুদিন দৃষ্টিহীন করিয়া রাখিয়াছিল ; বহুদিন আমরা বিশ্বাস করিয়াছিলাম যে, যাহা ইউরোপীয় ভাবে ওতঃপ্রোত নয়, তাহা ভাল জিনিষ হইতে পারে না, তা সাহিত্যেই হউক বা অন্য কিছুতেই হউক। নূতনত্বের মদিরাকর্ষণে আমরা অনেক দিন মত্তাবস্থায় কাটাইয়াছি, সে নেশা যে এখনও কাটিয়াছে তাহা বলিতে পারি না ; তবে নেশা কাটাইবার প্রয়াস হইতেছে, এবং তাহার ফলও যেন একটু একটু দেখা যাইতেছে। বাঙ্গালী আবার নিজের স্বাতন্ত্র্য কোথায় তাহা খুঁজিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে, বাঙ্গালী আবার বাঙ্গালিত্বের গৌরব অনুভব করিতে চেষ্টা করিতেছে। বাঙ্গালী আবার নিজের দোষগুণ খুঁজিয়া লইয়া বাঙ্গালী-জীবন গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছে ; বাঙ্গালী বুঝিতে শিখিতেছে যে, ভারতবর্ষের জল-হাওয়ায় যে শরীর গঠিত, ভারতবর্ষের তপোভূমিতে যে মন যুগযুগান্তর ধরিয়া পরিপুষ্ট, তাহা বিদেশীয় আদর্শে গঠিত বা পুষ্ট করিবার অভিলাষ অত্যন্ত অসমীচিন। তাই বলিতেছিলাম, এখন যদি কোনও ক্ষমতাশালী কবি কবিকঙ্কণের আদর্শে কাব্য রচনা করিয়া বাঙ্গালীর সমক্ষে আনয়ন করেন, তাহা হইলে এমন কাব্য হইয়া কাজ নাই, এমন কথা কি আমরা বলিতে পারি ?

কিন্তু তাহার এখনও বড় বিলম্ব আছে। যে চেষ্টার কথা বলিয়াছি, তাহা জনকতক সূক্ষ্মদর্শিগণের মধ্যেই নিবদ্ধ আছে, সাধারণে প্রসৃত হয় নাই। এখনও অনেক শিক্ষিত-নামধেয় বাঙ্গালী আছেন, যাঁহারা বাঙ্গালার পূর্ব্ব কবিগণের নাম পর্য্যন্ত অবগত আছেন কি না সন্দেহ। অনেকের এখনও বদ্ধমূল ধারণা আছে যে বাঙ্গালায় মাইকেলের পূর্ব্বে সাহিত্য ছিল না ; বাঙ্গালার পূর্ব্ব কবিগণ অপাঠ্য। ইহার একটি কারণ অবিসম্বাদে এই নির্দ্দেশ করা যায় যে তাঁহারা বাঙ্গালাভাষাটা এমন পরিপাটী ভাবে ভুলিয়াছেন যে, পূর্ব বঙ্গকবিগণের কাব্য বুঝিতে হইলে তাঁহাদের মাথার ঘাম পায়ে পড়িবার সম্ভাবনা ; কাজেই তাঁহারা নিজ অলস বিলাসী জীবনটাকে এই দুরূহ শ্রম স্বীকার করাইতে নিতান্ত নারাজ। দ্বিতীয় কারণ—সেই ধারণা যে—কাব্য এমন একটা জমকালো জিনিষ হওয়া চাই যাহাতে সাধাসিধে ঘরোয়া কথা কিছু থাকিবে না, সোজাসুজি নিত্যদৃষ্ট ঘটনা বা নিত্যপ্রযুক্ত ভাষা তাহাতে কিছুই থাকিবে না। তাহা যদি কোনও কাব্যে থাকিল তবেই সে কাব্য অপাঠ্য। আমরা একটা নূতন কথার মোহে এখনও বিশেষরূপে আবিষ্ট রহিয়াছি, সেটা "Sublime". কাব্য sublime হওয়া

প্রয়োজন এই বিশ্বাস আমাদের খুব, কিন্তু sublime জিনিষটা কি তাহা যে ঠিক বুঝিতে পারি, বা, বুঝিবার চেষ্টা করি, তাহা বোধ হয় না। কাব্যের ভাষাসম্বন্ধেও আমরা এমনই একটা কথার মোহে আবদ্ধ; সে কথাটা "Sonorous". আমাদের পূর্ব্ব কবিগণ যে এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া, কাব্য লিখিয়াছেন তাহা নহে, বরং তাঁহারা ভাবিতেন যে যেখানে সেখানে ভাষা খুব বিশুদ্ধ হওয়ার আবশ্যক করে না, ফলতঃ ভাষাসম্বন্ধে কোনও একটা অপরিহার্য্য নিয়ম তাঁহারা মানিতেন না। ইহাও বোধ হয় তাঁহারা স্বীকার করিতেন না যে, যাহা নিত্য-সঙ্ঘটিত ঘটনা তাহাতে উচ্চতা (sublimity) আসিতে পারে না। কাজেই তাঁহাদের কাব্যে এমন ঘটনা অনেক আছে। কাব্যের উচ্চতা প্রদান কবির ক্ষমতার উপর নির্ভর করে, তাহা কোন্ কবি কত দুর করিতে পারিয়াছেন, তাহা কাব্য সমালোচনা করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা এখনও অনেক পরিমাণে নেশার ঘোরে রহিয়াছি, তাই সে চেষ্টা করিতে প্রস্তুত হই না। যাঁহারা তাহা করিয়াছেন তাঁহারা বুঝিয়াছেন যে পূর্ব্বকালের বঙ্গকাব্য বহুমূল্য সম্পদে সম্পন্ন। সে সম্পদ অবহেলার বা অবমাননার উপযোগী নহে। সুখের বিষয় যে আমরা এই কথাটা আবার বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছি—অন্ততঃ এটুকু বুঝিতেছি যে বাঙ্গালাভাষার আদি কবিগণকে তাচ্ছিল্য না করিয়া তাঁহাদিগকে বুঝিবার চেষ্টা করিলে লাভ বৈ লোকসান নাই। তাঁহাদিগের চর্চ্চা করিলে অন্ততঃ বাঙ্গালীর পূর্ব্বাবস্থাও বেশ জানিতে পারা যাইবে। এরূপ স্থলে পূর্ব্ব বঙ্গকবিগণের কাব্য-সমালোচনায় কিঞ্চিৎ শ্রম স্বীকার করিলে সময় নিতান্ত অপব্যয়িত হইবে না ভাবিয়া, আমি মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্রের তুলনায় সমালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্রের তুলনায় সমালোচনা এ কথা শুনিলে আপাততঃ একটু মনে খট্‌কা লাগিতে পারে বটে। প্রথমেই এই প্রশ্ন উঠিবে যে, মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্রে কি সাম্য আছে যে তাঁহাদের তুলনা হইতে পারে? তুলনায় সমালোচনা অর্থে দুই কবিকে পাশাপাশি রাখিয়া দেখা, তা তাহাতে সাম্যই দেখা যাউক অথবা বৈষম্যই দেখা যাউক। এই হিসাবেই আমি তুলনায় সমালোচনা কথাটি ব্যবহার করিয়াছি। ইহার ফলাফল ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে, কিন্তু এ কার্য্য যে নিতান্ত নিষ্ফল নহে, তাহাই বলিবার ইচ্ছা আছে। আর কিছু ফল না পাওয়া যাইলেও অন্ততঃ এইটুকু বেশ বুঝা যাইবে যে বাঙ্গালীর কাব্যের আদর্শ-সম্বন্ধে, এবং জীবনের আদর্শসম্বন্ধে কতদূর পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। দুই কালের মানুষের মূর্ত্তি দুই কালের দুই কবির কাব্যদ্বয় হইতে বেশ চিনিতে পারা যাইবে।

মুকুন্দরামে ও ভারতচন্দ্রে যে সাম্য আছে তাহা অনেকটা বিষয়গত। রবির উজ্জ্বল কিরণ আর চাঁদের মৃদু চন্দ্রিকায় যে সাম্য আছে, ইহাও সেইরূপ। দুইই এক বস্তু, একটি অপরের প্রতিবিম্ব মাত্র। চাঁদের

আলো মিষ্ট ও সুদৃশ্য, কিন্তু তাহাতে জগৎ উদ্ভাসিত হয় না, তাহার জন্য সূর্য্যের রশ্মির প্রয়োজন হয়। মুকুন্দরামের কাব্য সূর্য্যালোক, ভারতচন্দ্রের কাব্য চন্দ্রশ্মি। ভারতচন্দ্র মুকুন্দরামে যাহা পাইয়াছিলেন, অনেক স্থলে তাহাই নিজ কাব্যে আনয়ন করিয়াছেন, কিন্তু মুকুন্দরামে যাহা উজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট, ভারতচন্দ্রে তাহাই স্তিমিত ও কৃত্রিম। উভয় কবির তুলনা-স্থল তাঁহাদের সাংসারিক জ্ঞান। কিন্তু এই সাংসারিক জ্ঞান প্রকাশ করিবার কৌশল দুই কবিতে বিভিন্ন। দুই কবিই আমাদের ঘরের কথা অনেক পরিমাণে নিজ-কাব্য-বিষয়ীভূত করিয়াছেন, কিন্তু যেমন সূর্য্যালোকে সমস্ত জগৎ আলোকিত হইয়া, সমস্ত দ্রষ্টব্য জিনিষ দেখা যায়, আর চন্দ্রালোকে লোকের মনে একটু সুখের আবেগ আসিলেও তাহা দ্বারা জগতের অন্য কোনও কার্য্য হয় না, সেইরূপ মুকুন্দরাম নিজ সহৃদয়তা ও রসাবতারণ-শক্তির সাহায্যে তাঁহার সাংসারিক জ্ঞান ও মনুষ্য হৃদয়জ্ঞতা অপূর্ব্ব কৌশলে আমাদের হৃদয়ে ও মর্ম্মে প্রবেশ করাইয়া দিয়াছেন, আমাদের দৃষ্টি উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন, আমরা তাঁহার সৃষ্ট জগতের সমস্তটুকু পরিষ্কাররূপে দেখিতে ও বুঝিতে পারি। ভারতচন্দ্র তাঁহার সাংসারিক জ্ঞান বা মনুষ্য-হৃদয়জ্ঞতা লইয়া যেন খেলা করিয়াছেন, কোথাও তাহা তাঁহার চন্দ্ররশ্মি স্পর্শে অর্দ্ধ প্রকাশিত হইয়া ঝিকিমিকি করিতেছে, কোথাও বা শুধু আভাস মাত্র দেখা যাইতেছে ; চন্দ্রালোকে মানুষ চেনা বড় কঠিন, শুধু একটা মানুষ আছে এই টুকুই বোঝা যায়। ভারতচন্দ্রও যে মানুষ বুঝিতেন তাহা নিশ্চয়, কিন্তু বোঝাইবার চেষ্টা করেন নাই। মনুষ্যের সুখদুঃখ লইয়া, মনুষ্যের মন লইয়া ভারতচন্দ্র সোহাগই করিয়াছেন, তাহার সর্ম্মগ্রতা প্রকাশ করিবার চেষ্টা করেন নাই, অথবা করিতে পারেন নাই ; চাঁদের আলোতে মানুষ সোহাগই করিতে ভালবাসে। এই প্রকার বিভিন্নতা থাকিলেও বলিতে হইবে যে কবিদ্বয়ের ভিতর কথঞ্চিৎ ঐক্য আছে।

ঐক্য শুধু ভাবে নহে, বিষয়েও। অতএব এ কথা নিঃসংশয় বলা যায় যে ভারতচন্দ্র অনেক স্থলে মুকুন্দরামকে অনুকরণ করিয়াছেন। এক জন সৃষ্টি করিয়াছেন, আর এক জন নকল করিয়াছেন। অনুকরণের যে দোষ তাহা ভারতচন্দ্রে বিশেষরূপে লক্ষিত হইবে। অনুকৃত বস্তুকে কথা সাজাইয়া লুকাইবার চেষ্টা ভারতচন্দ্রে সর্ব্বদা জাগরূক। ফল হইয়াছে এই যে, কৃষ্ণনগরের কারিগর এমন একটি মৃণ্ময় আম্র গড়িয়াছেন যে তাহা দূর হইতে দেখিলে তাহাতে আম্র ভ্রম অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু তাহার আস্বাদ গ্রহণ করিতে যাও, রসের বদলে মাটীতে মুখ পূরিয়া যাইবে। ভ্রান্তি দূর হইলেও কিন্তু বিস্ময় ঘুচে না, লোকে তখনও বলিতে বাধ্য হয় কি নিপুণ কারিগরি !

একটা বিষয় লইয়া এই কথাটা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করা যাউক। কবিকঙ্কণের 'চণ্ডী'কাব্যে ও ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গলে' হরগৌরীর কথা আছে সকলেই জানেন। বিষয়টি দুই কাব্যে প্রায়ই এক রকম। এই হরগৌরীর কথার ব্যপদেশে বাঙ্গালীর

ঘরের যে কথাটুকু প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাই এখন আমাদিগকে বিচার করিতে হইবে। এই ঘরের কথাটুকুর বর্ণনা রবি বাবুর মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় জানুন ভাল। তাহার মধ্যে হরগৌরীর কথা আমাদের ঘরের কথা। সেই হরগৌরীর কথায় আমাদের বাঙ্গালা দেশের একটা বড় মর্ম্মের কথা আছে। কন্যা আমাদের গৃহের এক মস্ত ভার। কন্যাদায়ের মত দায় নাই। * * * কন্যাকে অযোগ্য পাত্রে সমর্পণ করা ইহা আমাদের সমাজের নিত্য নৈমিত্তিক দুর্ঘটনা। ইহা লইয়া দুশ্চিন্তা, অনুতাপ, অশ্রুপাত, জামাতৃ-পরিবারের সহিত বিরোধ, পিতৃকুল ও পতিকুলের মধ্যবর্ত্তিনী বালিকার নিষ্ঠুর মর্ম্মবেদনা সর্ব্বদাই ঘরে ঘরে উদ্ভূত হইয়া থাকে। একান্ন পরিবারে আমরা দূর ও নিকট এমন কি নামমাত্র আত্মীয়কেও বাঁধিয়া রাখিতে চাই, কেবল কন্যাকেই ফেলিয়া দিতে হয়। যে সমাজে স্বামী স্ত্রী ব্যতীত পুত্র কন্যা প্রভৃতি সকলেই বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, তাহারা আমাদের এই দুঃসহ বেদনা কল্পনা করিতে পারিবে না। আমাদের মিলনধর্ম্মী পরিবারে এই একমাত্র বিচ্ছেদ। সুতরাং ঘুরিয়া ফিরিয়া সর্ব্বদাই সেই ক্ষত বেদনায় হাত পড়ে। হরগৌরীর কথা বাঙ্গালার একান্ন পরিবারের সেই প্রধান বেদনার কথা। শরৎ-সপ্তমীর দিনে সমস্ত বঙ্গভূমির ভিখারী বধূ কন্যা মাতৃগৃহে আগমন করে, এবং বিজয়ার দিনে সেই ভিখারী ঘরের অন্নপূর্ণা যখন স্বামীগৃহে ফিরিয়া যায়, তখন সমস্ত বাঙ্গালাদেশের চোখে জল ভরিয়া আসে।

এই সকল কারণে হরগৌরীসম্বন্ধীয় গ্রাম্যছড়াগুলি বাস্তব ভাবের। তাহা রচয়িতার ও শ্রোতৃবর্গের একান্ত নিজের কথা। সেই সকল কাব্যে জামাতার নিন্দা, স্ত্রীপুরুষের কলহ ও গৃহস্থালীর বর্ণনা যাহা আছে, তাহাতে রাজভাব বা দেবভাব কিছুই নাই; তাহাতে বাঙ্গালাদেশের গ্রাম্য কুটীরের প্রাত্যহিক দৈন্য ও ক্ষুদ্রতা সমস্তই প্রতিবিম্বিত।

হরগৌরীর কথা সম্পূর্ণরূপে দুই কাব্যের কোনও কাব্যেই নাই, তবে যতটুকু আছে তাহাতেই একটা গৃহচিত্র আবরণমুক্ত হইয়া আমাদের সমক্ষে দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু এই গৃহচিত্রাঙ্কণে দুই কবির মধ্যে একটু বৈলক্ষণ্য আছে। বিষয় প্রায়ই এক, দক্ষযজ্ঞ হইতে আরম্ভ করিয়া, শিব-পার্ব্বতীর কলহ পর্য্যন্ত দুই কাব্যেই অঙ্কিত ও বর্ণিত হইয়াছে। দুই কাব্যেই দারিদ্র্য নিবন্ধন শ্বশুরের কাছে জামাতার অপমান, স্ত্রীর পতিনিন্দা শ্রবণে দেহত্যাগ, পতির স্ত্রীর প্রতি ভালবাসা, আবার পতিপত্নী-সংযোগ ও শেষে দারিদ্র্যদোষে পতিপত্নীর কলহ প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। হরগৌরীর কথার ব্যপদেশে লিখিত হইলেও ইহা যে আমাদের ঘরের কথা সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। এই সকল চিত্র আঁকিবার সময় দুই কবিই হরগৌরীর দেবত্ব বিস্মৃত হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু মুকুন্দরাম আপনাকে পর্য্যন্ত ভুলিয়া সেই চিত্রের মধ্যে নিমগ্ন হইয়াছিলেন; ভারতচন্দ্র ভুলিতে পারেন নাই যে শ্রীভারতচন্দ্র রায় গুণাকর কবিতা লিখিতেছেন। মুকুন্দরাম দক্ষের মুখে শিব-

নিন্দা প্রচারিত করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, ভারতচন্দ্র নিন্দাচ্ছলে স্তুতি লিখিতে গিয়া কথা সাজাইয়াছেন; তাহাতে ধনী শ্বশুরের দরিদ্র জামাতার প্রতি শ্লেষ একেবারেই ব্যক্ত হয় নাই। মেনকার মুখে মুকুন্দরাম স্বামীর সহিত নিজগৃহে অবস্থিতা কন্যার প্রতি যে কথাগুলি বসাইয়াছেন এবং তচ্ছ্রবণে উমার কার্য্য বঙ্গগৃহের একটা দারুণ চিত্র প্রকাশ করিয়াছে; ভারতচন্দ্র সে চিত্র মোটেই আঁকেন নাই। মুকুন্দরামের চিত্রগুলি আমাদের নয়নের সমক্ষে দারিদ্র্যের একটি সম্পূর্ণ ছবি আঁকিয়া তোলে, ভারতচন্দ্রের চিত্রগুলি দারিদ্র্যের চিত্র হইলেও তাহা অসম্পূর্ণ ও অনেক স্থলে অসংলগ্নও বটে। ভারতচন্দ্র একবার গৌরী দ্বারা "মেলানী ভার" পূরণ করাইতেছেন, আবার পরক্ষণেই দারিদ্র্যের জন্য হরগৌরীর কোন্দল বাঁধাইতেছেন। মুকুন্দরামের দরিদ্র-গৃহ হঠাৎ সম্পদে পূর্ণ হইয়া উঠে নাই; তিনি অকাতরে গৌরী দ্বারা শিবকে ত্রিশূল বাঁধা দিবার পরামর্শ দেওয়াইয়াছেন। ইহাতে লোকের একটু রাগ হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু ভারতচন্দ্রের মহাদেব যেন একটু গায়ে পড়িয়া কন্দল উপস্থিত করিয়াছেন। মুকুন্দরামের গৌরী শিবের মুখের সম্মুখে "আমি আত্মঘাতী হব" ভিন্ন আর কিছু বলেন নাই, ভারতচন্দ্রের গৌরী খুব এক-পালা মহাদেবকে শুনাইয়া দিয়াছেন। মুকুন্দরামের গৌরী খেদ করিয়াছেন, ভারতচন্দ্রের গৌরী ঝগড়া করিয়াছেন। মুকুন্দরামের কবিতার ন্যায় তাঁহার গৌরীও দরিদ্রা, কিন্তু হৃদয়হীনা নহেন, বরং স্নিগ্ধা। ভারতচন্দ্রের গৌরী তাঁহার কবিতারই মত সখ করিয়া মুখরা, যিনি এক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে শূন্য ভাণ্ডার খাদ্যে পূর্ণ করিয়া দিয়াছিলেন, ও পরক্ষণেই অন্নপূর্ণা হইয়া বসিয়াছিলেন, তাঁহার সখ করিয়া বাক্‌যন্ত্রণা দিয়া স্বামীকে ভিক্ষা করিতে পাঠাইবার প্রয়োজন কি? কিন্তু সে যাহাই হৌক, এই চিত্রে অনেক স্থলে স্বাভাবিকতার দৃষ্টান্তও আছে, এবং সংসারিক জ্ঞানের পরিচয়ও আছে। বৃদ্ধ-বরে কন্যা-সম্প্রদান-প্রথার প্রতি যে তীব্র কটাক্ষপাত আছে, তাহা স্বাভাবিক ও হৃদয়-গ্রাহী। জয়া কুপিতা গৌরীর পিতৃগৃহগমন-সংকল্প রোধ করিবার জন্য যে উপদেশ দিয়াছে, তাহা অমূল্য—

"কহে সখী জয়া শুনগো অভয়া
একি কর ঠাকুরালি।
ক্রোধে করি ভর যাবে বাপ ঘর
খেয়াতি হবে কাঙালি॥
মিছে ক্রোধ করি আপনা পাসরি
কি কর ছাবাল খেলা।
সুখ মোক্ষধাম অন্নপূর্ণা নাম
সংসার সাগর ভেলা॥
অন্নপূর্ণা হয়ে অন্ন দেহ ক'য়ে
দাঁড়াবে কাহার কাছে।
দেখিয়া কাঙালি সবে দিবে গালি
রহিতে না দিবে পাছে॥
জননীর আশে যাবে পিতৃবাসে
ভাজে দিবে সদা তাড়া।
বাপে না জিজ্ঞাসে মায়ে না সম্ভাষে
যদ দেখে লক্ষ্মীছাড়া॥

বলা বাহুল্য যে এই উপদেশ বড় খাঁটি। কবি মুকুন্দরাম উপদেশচ্ছলে এই তথ্য

প্রকাশ না করিয়া ইহার সজীব চিত্র আঁকিয়াছেন :—

"তোমা ঝি হাতে মোর মজিল গিরিয়াল।
ঘরে জামাই রাখিয়া পুষিব কতকাল।
প্রভাতে খেজাড়ি মাঁঙ্গি কার্ত্তিক গণাই
চারি কড়ার সম্ভাবনা তোর ঘরে নাই।"
ইত্যাদি।

যে স্ত্রী পতির দারিদ্র্যে ভীত হইয়া বাপ মায়ের কাছে থাকিয়া সোহাগে খাইবার ও পাইবার আশা করে, তাহার ভাগ্যে এইরূপ বিড়ম্বনাই ঘটিয়া থাকে। তাই মুকুন্দরামের গৌরী "এই খোঁটা" খাওয়া অপেক্ষা তৎক্ষণাৎ পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া ভিক্ষুক পতির সহিত ভিক্ষাসম্বল করিয়াও নিজ ঘরে প্রস্থান করিলেন। এবং ভারতচন্দ্রের গৌরীও পিতৃগৃহ গমন সংকল্প ত্যাগ করিলেন। এই স্থলে এবং অন্যান্য অনেক স্থলে ভারতচন্দ্রের সাংসারিক জ্ঞান প্রকাশিত হইয়াছে।

তাই বলিতেছিলাম যে এই হরগৌরীর চিত্রে মুকুন্দরামের সহিত ভারতচন্দ্রের অনেকটা সাম্য আছে। কিন্তু সাম্যও যেমন আছে তেমনি এই সকল চিত্রেই দুই কবির মধ্যে যে বৈষম্য তাহাও বিশেষ রূপে ব্যক্ত হইয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে কবিকঙ্কণের চিত্র একটি সমগ্র দৈন্যের গৃহচিত্র, ভারতচন্দ্রের চিত্র সমগ্র নহে, খণ্ড চিত্র মাত্র। কিন্তু কেবল এইটুকুতেই সে বৈষম্য প্রকাশিত হয় নাই। আর একটি বিষয়ে তাহা বিশেষভাবে লক্ষিত হইবে। সে বিষয়টি গৌরীর বিবাহের পূর্ব্বের চিত্রগুলি। এইগুলি পাশাপাশি রাখিয়া দেখিলেই বেশ বুঝা যাইবে যে মুকুন্দরামে ও ভারতচন্দ্রে মৌলিক পার্থক্য কোথায়। মুকুন্দরাম আত্মসংযম, ভারচন্দ্র উচ্ছৃঙ্খলতা। ইহাই তাঁহাদের ভিতর যথার্থ পার্থক্য। মুকুন্দরাম দুঃখ, ভারতচন্দ্র সুখ; এ কথা বলিলে তাঁহাদের প্রকৃতিগত বিভিন্নতা ঠিক বুঝা যাইবে না। এই কথার পুনরুত্থাপন প্রয়োজন হইবে, এইজন্য এখানে দুই কবির মধ্যে যে প্রভেদের বিষয় উল্লেখ করিলাম তাহা স্মরণ রাখিতে হইবে। এখন দেখা যাউক এই হরগৌরীর কথার ভিতর এই পার্থক্য কিরূপে বিকশিত হইয়াছে।

হিমালয়ের গৃহে সতী গৌরীরূপে জন্মগ্রহণ করিবার পর হইতে শিবের সহিত তাঁহার বিবাহ পর্য্যন্ত ঘটনাবলী উভয় কবিই তাঁহাদের কাব্যে বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এই বর্ণনাতেই উভয়ের শিল্প-কৌশলের পার্থক্য উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। কাব্য উচ্ছৃঙ্খলতার লীলাক্ষেত্র নহে, তাহা একজন যেমন সুন্দরভাবে হৃদয়ে ধারণা করিয়াছেন, অপর একজন তেমনি তাহা ভুলিয়া গিয়া সুন্দর আদর্শ খর্ব্ব করিয়াছেন। দুই জনের সমক্ষেই একটি মহান্ বিরাট আদর্শ পড়িয়াছিল—কালিদাসের অমরসৃষ্টি কুমারসম্ভব। দুই জনেই সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন; ইহাও দেখা যায় ভারতচন্দ্রের মনে সে সময় কুমারসম্ভবের কথা একটু উদিত হইয়াছিল, কতকগুলি বর্ণনা তিনি কুমারসম্ভব হইতে সংগ্রহও করিয়াছিলেন। মুকুন্দরাম শুধু কবি ছিলেন না, তিনি সদ্বিবেচক ও রসগ্রাহীও ছিলেন, তাই তিনি কালিদাসের

কাছে ঋণ গ্রহণ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই, গৌরার শিবপূজা, ব্রহ্মার পরামর্শ, দেবগণ কর্তৃক মদনকে প্রেরণ, মদন কর্তৃক শিবের প্রতি অস্ত্রক্ষেপ, মদন-ভস্ম, গৌরীর তপস্যা ও ছলনা ও পরে বিবাহ এই সকল ঘটনাগুলি তিনি কুমারসম্ভব হইতে গ্রহণ করিয়া নিজ কাব্য মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। মহাকবির বিরাট, অখণ্ডিত রস তিনি কোথাও খণ্ডন করিবার প্রয়াস পান নাই। ইহা দ্বারা তাঁহার কাব্য-সৌভাগ্য কত দূর পুষ্ট হইয়াছে তাহা বলিয়া বুঝাইবার নহে। মহাযোগী যতক্ষণ গার্হস্থ্য অবলম্বন না করিয়াছেন ততক্ষণ তাঁহাকে গৃহস্থভাবে চিত্রিত করা সামান্য মানবভাবে চিত্রিত করা আদৌ শোভন নহে, তাহা তিনি বুঝিতেন। সেই বিবেচনার ফলে আমরা বাঙ্গালায় কালিদাসের অতুলনীয় কাব্যের কথঞ্চিৎ আভাস পাইয়াছি। তাঁহার হাতে পড়িয়া একটি মহান্ আদর্শ দীর্ণ হইয়া যায় নাই। মুকুন্দরামের প্রতিভা সহজ বুদ্ধিশালিনী তাই তিনি বুঝিতেন যে মহা-কবি কালিদাস যে বিষয়ের বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে কোনও নূতনত্ব প্রদানের চেষ্টা করা, বিকশিত শতদলে রং ফলানর চেষ্টার ন্যায় বিড়ম্বনাজনক। তাই তিনি কালি-দাসের ভাব অক্ষুণ্ণ রাখিবারই প্রয়াস করিয়াছেন। যেখানে সেই পথ ঈষৎ পরিত্যাগ করিয়া স্বকপোল কল্পনার আশ্রয় লইয়াছেন, সেই স্থানেই একটু রসভঙ্গ হইয়াছে এবং সমালোচকের তাব্রোক্তির হেতু হইয়াছে। কিন্তু এখানেও তিনি অতটা দোষাই নন; কেন তাহা পরে বলিতেছি। সে যাহা হউক ইহা স্পষ্টতঃ প্রমাণ হয় যে মুকুন্দরাম প্রণয়ের মাহাত্ম্য বুঝিতেন, প্রেম যে কেবল কলুষিত ইন্দ্রিয় বিকারমাত্র নহে, তাহা তিনি বেশ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন।

কিন্তু ভারতচন্দ্র এই সুন্দর অবকাশ, কবিত্বের এই মনোরম লীলাক্ষেত্র ছাড়িয়া দিয়া, শুধু নিজের অবিবেকিত্বই প্রকাশ করেন নাই, নিজের অসারত্ব ও অরসিকত্ব উজ্জ্বল অক্ষরে প্রকাশিত করিয়াছেন। তিনি প্রকাশ করিয়াছেন যে কোনও উচ্চ আদর্শ তাঁহার হৃদয়ে স্থান পায় না, কোনও মহৎ ভাব তিনি ধারণা করিতে পারেন না। তাঁহার কলুষিত কল্পনায় মহাযোগী মহাদেবেরও ইন্দ্রিয়নিগ্রহ অসম্ভব। মদন-ভস্মব্যাপারটা তাঁহার মাথায় একেবারে প্রবেশ লাভ করে নাই, তাই এই আধ্যা-ত্মিক ব্যাপারটা লইয়া তিনি ছেলেখেলা করিয়াছেন। মুকুন্দরামও যাহা ভাল করিয়া ধরিতে পারেন নাই, সেই মহোচ্চ ভাব ভারতচন্দ্রের মত সখের কবির হস্তে পড়িয়া একেবারে বিকৃত ও কলুষিত হইয়া পড়িয়াছে। যে মদনবাণে এত কাতর, সে আবার মদনকে ভস্ম করিবে কি করিয়া, এ কথাটা তাঁহার বিচারবিহীন মস্তিষ্কে প্রবেশ করিল না। মহাদেবের এই সাত্বিক ক্রোধ ধারণা করিবার শক্তি বা প্রবৃত্তি তাঁহার হইল না; তিনি শুধু শুধু মদন বেচারাকে ভস্ম করাইয়া, শেষ আবার সেই মদন জ্বালায় মহাযোগী মহাদেবকে পাগল সাজাইয়া দেখাইতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইলেন না। কি ঘৃণিত প্রবৃত্তি! কি অন্ধ ইন্দ্রি

বিকৃতিপাংশুল হৃদয়! অনেকে ভারতচন্দ্রকে বিদ্যাসুন্দর প্রণয়ন জন্য নিন্দা করেন, অনেকে ভাবেন যে এই বিদ্যাসুন্দর কাব্যেই ভারতচন্দ্রের অশ্লীলতা বিশেষরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু আমার বিবেচনায় ভারতচন্দ্রের অন্তর্নিহিত অশ্লীলতা আর কোথাও ততদূর ব্যক্ত হয় নাই যতটা এই শিবের তপোভঙ্গের চিত্রে হইয়াছে। যে কবি অপর এক মহাকবির আদর্শ নির্ম্মম ভাবে, কুৎসিত ভাবে চূর্ণ করিয়া, দেবতার স্থানে পশুর চিত্র আঁকিতে সঙ্কোচের লেশ মাত্র বোধ করেন না, যিনি আদর্শ যোগীকে কামোন্মত্ত পশুর সাজে সাজাইতে দ্বিধা বোধ করেন না, তিনি পরনারীর কামোন্মত্ততা প্রদর্শক বিদ্যাসুন্দর লিখিয়া নিজের বিকৃত রুচির পরিচয় দিয়াছেন, এ কথা কেমন করিয়া স্বীকার করা যায়। ভারতচন্দ্রের বিকৃত রুচির বিকাশ সর্ব্ব প্রথম ও সর্ব্ব প্রধানভাবে এই খানে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ভারতচন্দ্রের প্রধান দোষ, তাঁহার হৃদয়-হীনতা, অসংযম ও উচ্ছৃঙ্খলতা, সবই এই এক চিত্রে একত্র হইয়া দেখা দিয়াছে। কোনও কবির জাতীয় মহান্ আদর্শ খর্ব্ব করিবার অধিকার নাই, বিশেষতঃ হিন্দু কবি হইয়া হিন্দুর পরম দেবতার মহোপকারী আদর্শ বিনষ্ট করিবার অধিকার ভারতচন্দ্রের আদৌ ছিল না। ইহা দ্বারা তিনি নিজ হৃদয়ের যে হীনত্ব প্রকাশ করিয়াছেন তাহা কথায় ব্যক্ত করা যায় না। ফলতঃ এই কলুষ-কলঙ্কিত ইন্দ্রিয়বিকৃতিই ভারতচন্দ্রের কাব্যের প্রধান দোষ। কোনও সুসমালোচক বলিয়াছেন যে ইহা ভারতচন্দ্রের দোষ ততটা নহে যতটা তাঁহার সময়ের দোষ। কথাটা অনেক পরিমাণে সত্য হইলেও তাহা দ্বারা ভারতচন্দ্রের দোষ একেবারে ক্ষালিত হয় না। তিনি যদি বিদ্যাসুন্দর কাব্যেই এই দোষযুক্ত হইতেন তাহা হইলে আমি সে কথায় সায় দিতে পারিতাম, কিন্তু তিনি চক্ষের সমক্ষে একটি বিরাট আদর্শ বর্ত্তমান থাকিতেও তাহাকে অগ্রাহ্য করিয়া, অনায়াসে দেব-চরিত্র বিকৃত করিয়া যে নিজত্বের প্রমাণ দিয়াছেন, সে আত্মবিস্মৃত, ইন্দ্রিয়পরাভূত চঞ্চল ও বিবেকবিহীন নিজত্বের অপরাধ কেবল সময়ের ঘাড়ে চাপাইয়া দিবার চেষ্টা করিলে রাম বাবুর নিকট নিমচাঁদ দত্তের দোষস্খালন চেষ্টার ন্যায় হাস্যাস্পদ হইয়া উঠে। আমি সেরূপ কোনও চেষ্টার পক্ষপাতী নহি।

কবিকঙ্কণ প্রায়ই সমগ্র চিত্রে আত্ম-সংযম রাখিতে পারিয়াছেন, কেবল এক স্থলে একটু আদর্শ-ভ্রষ্ট হইয়াছেন ও এক স্থলে নিজের কথা কহিয়া আদর্শ নষ্ট করিয়াছেন। মহাকবি কালিদাস ধ্যান-মগ্ন মহাদেবের ধ্যান ভঙ্গ করেন নাই, তিনি বলিয়াছেন যে মহাদেব যখন যোগ ভঙ্গ করিয়া পার্ব্বতী-দত্ত মালা গ্রহণ করিতে গেলেন তখন কাম সম্মোহন বাণ প্রয়োগে তাঁহাকে ঈষৎ ধৈর্য্যচ্যুত করিতে সমর্থ হইল। কিন্তু পরক্ষণেই যোগী মহাদেব হৃদয়বলে ইন্দ্রিয়-বিকার নিগ্রহ করিয়া, মদনকে ভস্মীভূত করিলেন। এই স্বাভাবিক এবং উচ্চ ভাব মুকুন্দরাম একটু সঙ্কুচিত করিয়া ফেলিয়াছেন। তিনি

ধ্যানমগ্ন মহাদেবের ধ্যান ভাঙ্গাইয়াছেন। তিনিও ঠিক বুঝিতে পারেন নাই যে, যে চিত্ত পরমাত্মজ্যোতিঃ নিরীক্ষণে পর্য্যবসিত সে চিত্তে কামবিকার সম্ভব নহে। এই স্থলে আদর্শ কিঞ্চিৎ খর্ব্ব হইয়াছে। আর এক স্থলে কবিকঙ্কণ স্বকপোল-কল্পিত একটি ঘটনা সংযোজিত করিয়াছেন, শিবের কুৎসিৎ রূপে আবির্ভাব, পরে মোহনবেশ ধারণ এবং নারীগণের পতিনিন্দা। এ গুলি দ্বারা কাব্যের কোনও শোভা বৃদ্ধি হয় নাই বরং ক্ষতিই হইয়াছে। যাহা কবিকঙ্কণ শেষকালে করিয়াছেন তাহা কালিদাস পূর্ব্ব হইতেই করিয়াছেন, অর্থাৎ পূর্ব্বাবধিই কালিদাসের মহাদেব বরবেশে সজ্জিত। এবং কালিদাস মহাদেবদর্শনে মুগ্ধ স্ত্রীগণের মুখে উদার বচনাবলীই বসাইয়াছেন—সহৃদয় ও সাধারণতঃ সদ্বিবেচক কবি মুকুন্দরাম তবে কেন এই ব্যতিক্রম ঘটাইয়াছেন? একজন সমালোচক কহিয়াছেন "সুপুরুষ দেখিলেই নারীগণের দ্বারা স্বীয় পতির নিন্দা করিতে হইবে, প্রাচীন কবিদের এ এক সাধারণ রোগ। যে দেশে পতিপূজা দেব-পূজায় উন্নীত, সে দেশে এরূপ বিকৃত রুচি কোথা হইতে আসিল?" এই প্রশ্নের মীমাংসা আমাদের সমাজের একটি ভয়ঙ্কর কুপ্রথার উপর দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেই ভালরূপে হইবে; সেই কুপ্রথা দেবীবর ঘটক প্রচারিত কৌলীন্যপ্রথা। এই কৌলীন্যপ্রথার মোহে আবিষ্ট হইয়া আমাদিগের কুলবালাগণকে যে রাশি রাশি কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছে, অযোগ্য বরের হস্তে ন্যস্ত হইয়া সারা জীবন যে অসহ্য কষ্টে ব্যয়িত করিতে হইয়াছে তাহারই ফলে আমাদের সতীসাবিত্রীর আদর্শে অনুপ্রাণিত বঙ্গদেশেও এই অসহ্য-যন্ত্রণা-নিপীড়িতা ললনাগণের মুখে পতিনিন্দা প্রকাশ পাইয়াছে। এই ভীষণ কুপ্রথা মুকুন্দরাম প্রভৃতি কবিগণের সময় সম্পূর্ণ রূপে সমাজে উৎপাত করিতেছিল, এবং অসহায় কুলীন-ললনাগণের বৃদ্ধ নির্গুণ বরের সহিত বিবাহিত হওয়া নিত্য ঘটনার মধ্যে হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাই মহাদেবের সহিত গৌরীর বিবাহ বর্ণন কালে কবির মনে সহজেই এই বিসদৃশ চিত্রের আবির্ভাব হইয়াছিল; এবং পরে সুন্দর মহাদেবকে দেখিয়া নারীগণের নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিবার প্রবৃত্তি অশোভন হইলেও নিতান্ত অস্বাভাবিক নহে। মুকুন্দরাম ঘরের কথা কহিতে এত ভালবাসেন যে তাহার সুযোগ পাইলে আর ছাড়িতে পারেন না। তাঁহার রচিত নারীগণের পতিনিন্দা উচ্চ আদর্শানুমত নহে তাহা সত্য, কিন্তু তাহাতে অত্যন্ত কুভাবের পরিচয় পাওয়া যায় না, তাহাতে অদৃষ্টে ধিক্কার ভিন্ন ইন্দ্রিয়চপলতা প্রকাশ পায় নাই। যে টুকু আছে তাহাতে মনে হয় যেন সেই নারীগণের দুরদৃষ্ট প্রত্যক্ষ করিয়া তিনি লিখিতে বসিয়াছেন। ইহা উত্তম রুচির অনুমোদিত না হইলেও, ইহা দ্বারা কবির হৃদয়ের কোনও বিসদৃশ ভাবের প্রকটন হয় নাই। কবি এই নিন্দার ভিতরও নিপুণ অঙ্গুলি সঙ্কেতে সেইরূপ কোনও জঘন্য ভাবের পথ রোধ করিয়া রাখিয়াছেন।

"আপন স্বামী কণকচাঁপা পর শিমুলের ফুল।" ইহা দ্বারা কবি নিজ সংযম বজায় রাখিয়াছেন। ভারতচন্দ্রেও নারীগণের পতি-

নিন্দা আছে—তাহার পরিচয় এখানে দেওয়া প্রয়োজন নাই, এইটুকু বলিলেই চলিবে যে মুকুন্দরামে যাহা বাস্তব দৃশ্য, ভারতচন্দ্রে তাহাই হাস্যরস অবতারণের চেষ্টা। তা ছাড়া আরও যাহা আছে তাহা বড় গৌরবের বিষয় নহে। সে কথা পরে বলিব।

এই হাস্য রসাবতারণ প্রসঙ্গে এইটুকু লক্ষ্য করিবার বিষয় আছে যে মুকুন্দরাম যে হাস্যরসের অবতারণা করেন তাহা নাটককারের মত চরিত্রসৃষ্টির ব্যপদেশে। ভারতচন্দ্রের হাস্যরসের ভিতর একটু নষ্টামি আছে; তাঁহার পরকে অপদস্থ করিয়া হাসিবার ইচ্ছা করে, তাঁহার হাস্যরস একটু Mischievous এ সম্বন্ধে তাঁহার অনেকটা নিজসৃষ্ট নারদের সহিত তুলনা হয়। ঝগড়া বাধাইয়া মজা দেখিতে তিনি বেশ কৌতুক অনুভব করেন, লোকের সহিত কার্য্যতঃ পরিহাস (Practical joke) করিবার প্রবৃত্তি তাঁহার নারদের মতই প্রবল। হরগৌরীর চিত্রের মধ্যে মুকুন্দরাম তদীয় পরিহাস রসিকতার পরিচয় দেন নাই, ভারতচন্দ্র দিয়াছেন। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি চরিত্রের গৌরব ভারতচন্দ্রের যেন দ্রষ্টব্যই ছিল না, অতএব দেবচরিত্র লইয়াও তিনি ঠাট্টা-তামাসা করিতে বিরত হন নাই। এই দেখুন শিবের বরসজ্জা লইয়া দুষ্ট নারদ কেবল practical joke করিতেছেন—

নারদ বসিয়া　　হাসিয়া হাসিয়া
　সাজাইতে গেলা বর।
বসিছিলা হর　　উঠিল সত্বর
　নারদ কহে তৎপর ॥
জটা জুটে চূড়া　　সাপে বান্ধ খুড়া
　মুকুটে কি দিবে শোভা।
কি কাজ মুক্তায়　　হাড়ের মালায়
　কন্যার মা হ'বে লোভা ॥
কস্তুরী কেশরে　　চন্দন কি করে
　ঘন করে মাখ ছাই।
কি করে মণিতে　যে শোভা ফণিতে
　হেন বর কোথা পাই ॥
ফুল মালা যত　　শোভা দিবে কত
　যে শোভা মুণ্ডের মালে।
কাপড়ে কি শোভা　জগমন লোভা
　যে শোভা বাঘের ছালে ॥
রথ হস্তী আর　　কি কাজ তোমার
　যে বুড়া বলদ আছে।
তোমার যে গুণ　　কব কোটিগুণ
　আমি মেনকার কাছে ॥"

এমন না করিলে নারদের হাসিবার একটা মস্ত সুযোগ ভাসিয়া যায় তাই কবি মহাকবি কালিদাসের বর্ণনা রূপান্তর করিয়া একটু হাসিয়া লইয়াছেন—

কান্দে রাণী মেনকা চক্ষুর জলে ভাসে।
নখে নখ বাজায় নারদ মুনি হাসে ॥

আদর্শহীনতার দোষ ছাড়িয়া দিলে, আমি ঠিক বলিতে পারি না যে মদনভস্মের দৃশ্যে মহাদেবের ছাব আঁকিবার সময় এই নষ্টামিপ্রিয় হাস্যপ্রবণতা কবির মনে একেবারে উদিত হয় নাই। যে কৌতুকময় চিত্রের রেখাপাত সেখানে হইয়াছে তাহাই হাস্যরসিক কবি দীনবন্ধুর হাতে পড়িয়া বিয়েপাগ্লা বুড়োয়" দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু সে কথা আর না তোলাই ভাল, কারণ আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে এই চিত্রে কবির যে

দিক্ দৃষ্টিগোচর হয় তাহা আদৌ সুখকর নহে। এই স্থলে ভারতচন্দ্রের পরিহাস-প্রিয়তার যে টুকু পরিচয় পাইয়াছি তাহারই আভাস দিয়া রাখিলাম। ইহা আমরা আরও বিকশিতভাবে পরে দেখিতে পাইব।

এক্ষণে ভারতচন্দ্রের ও মুকুন্দরামের হরগৌরীচিত্রে তাঁহাদের কতটুকু ক্ষমতার বিকাশ হইয়াছে, এবং তাঁহাদের অপরাপর দোষগুণই বা কি রকমে ধরা পড়িতেছে তাহারই প্রসঙ্গক্রমে আর দুই একটি কথা বলিয়া রাখিলে ক্ষতি নাই। অবান্তর হইলেও উভয় কবির কাব্যেই রতিবিলাপ সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই রতিবিলাপ-ব্যাপার লইয়া দুই কবির মধ্যে বেশ একটু তারতম্য লক্ষিত হয়। আমরা দেখিতে পাই যে কবিকঙ্কণ জীবনের ঘটনার স্বাভাবিকতায় যে কবিত্ব তদ্ভিন্ন অপর কোনও কবিত্বের প্রতি আস্থাবান্ ছিলেন না; তাঁহার রতি-বিলাপ যথার্থই বিলাপ, তাহার ভিতর দিয়া পতিহীনা রমণীর আর্ত্ত ক্রন্দন ফুটিয়া উঠিতেছে।

"মোর পরমাণু লয়্যা, চিরকাল থাক জীয়া
আমি মরি তোমার বদলে।"

কি সুন্দর মর্ম্মস্পর্শী করুণাসিক্ত আর্ত্তধ্বনি! ইহাতে উহু-উহুর বাড়াবাড়ি নাই, মরি মরি নাই কিন্তু এ ক্রন্দন প্রাণের সহিত ক্রন্দন। স্বভাবজ্ঞ কবি যতটুকু স্বভাবানুযায়ী ততটুকু লিখিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন, এই রতি-বিলাপের ভিতর কথা বসাইবার বা কবিত্ব প্রকাশ করিবার চেষ্টা মোটেই নাই। অথচ ইহা দ্বারা একটি গভীর শোকের মূর্ত্তি সজীব ভাবে চিত্রিত হইয়াছে।

রতিবিলাপে ভারতচন্দ্র অনেক কথা বলিয়াছেন, অনেকগুলি "উহু" বসাইয়াছেন, কবিত্ব প্রকাশ করিবার সুযোগ ছাড়েন নাই, কিন্তু তৎসত্ত্বেও বুঝিতে কষ্ট হয় না যে রতির বিলাপ কবির মর্ম্মে তো অনেক দূরের কথা, তাঁহার কানেও প্রবেশ করিয়াছিল কি না সন্দেহ।

আহা আহা হরি হরি, উহু উহু মরি মরি
হায় হায় গোঁসাই গোঁসাই।
হৃদয়েতে দিতে স্থান করিতে কতেক মান
এখন দেখিতে আর নাই॥

* * * *

শিবের কপালে রয়ে প্রভুরে আহুতি ল'য়ে
না জানি বা ভুল কিবা গুণ।
একের কপালে রহে আরের কপাল দহে
আগুণের কপালে আগুণ॥

ইত্যাদি কবিতায় স্বাভাবিকতার পরিবর্ত্তে বাহাদুরি দেখাইবার চেষ্টাই বেশী। কোনও গভীর শোকমগ্না বিধবার প্রাণে "একের কপালে রাহু" প্রভৃতি হেঁয়ালি গড়িবার প্রবৃত্তি-আনা যে নিতান্ত অস্বাভাবিক তাহা কবি ভাবিবার সময় পান নাই।

"আরে নিদারুণ প্রাণ, কোন পথে পতি যান
আগে যারে পথ দেখাইয়া।
রাজীব চরণ রাজে মনঃশিলা পাছে বাজে
হৃদে ধরি লহরে বাহিয়া॥"

ইহাতে ভাব আছে সত্য, ভাবটি মনোরমও বটে, কিন্তু কথাগুলি ঠিক স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় না। গভীর শোক ভাবের উৎপাদক নহে, তাহা নিদারুণ মর্ম্মন্তুদ যন্ত্রণারই উৎপাদক। এই চারিটি ছত্রে একটি কোমল ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে সন্দেহ

নাই ; কিন্তু মর্ম্মের বেদনা তেমন ব্যক্ত হয় নাই। যে ক্রন্দনের প্রতিধ্বনি পাঠকের হৃদয়ে ব্যথার সৃষ্টি করে না, ঘাতপ্রতিঘাতের সৃষ্টি করে না, তাহা কবিত্বময় হইলেও রস হিসাবে তাহার সার্থকতা বড় বেশী নহে। কারণ রসের স্থায়ীভাব শোক, সেই শোকের উত্তাপ যত অধিক ফুটিবে, ততই করুণ রসের গাঢ়তা সম্পাদিত হইবে। শোকের সময় কবিত্ব স্ফূর্ত্ত হয় না, তাই এই ছত্রচতুষ্টয়ে যাহা সাধিত হইয়াছে তাহাতে রস প্রগাঢ়ত্ব প্রাপ্ত হয় নাই, বরং রসাভাসদোষ আসিয়া পড়িয়াছে। মনুষ্যচরিত্র বিশ্লেষণ কালে আমরা ভারতচন্দ্রের ও মুকুন্দরামের রসাবতারণ-শক্তির আরও বিশেষ পরিচয় লইবার অবকাশ পাইব, অতএব এখানে তাহার উল্লেখমাত্র করিয়া ক্ষান্ত হইলাম।

এই সময়েই বলিয়া রাখা উচিত যে হরগৌরীর কথাতে ভারতচন্দ্রের প্রধান দোষ যেমন পরিস্ফুট হইয়াছে, তেমনই তাঁহার প্রধান গুণের বিকাশও ইহাতেই দেখা দিয়াছে। যে অদ্ভুত শব্দ যোজন শক্তি লইয়া তিনি বঙ্গসাহিত্য-ক্ষেত্রে চিরজীবী হইয়া আছেন, সেই শক্তি এই হরগৌরীর কথায় সম্পূর্ণ মাত্রায় বিকশিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে তাঁহার শক্তি অসীম, বঙ্গসাহিত্যে এই এক বিষয়ে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী এখনও হইল না। অন্নদামঙ্গল কাব্যের প্রাণ এই শব্দমন্ত্রে প্রতিষ্ঠিত। স্বরাধ্যায় বীণায় কি বাজিতেছে বুঝি বা না বুঝি তাহার ধ্বনি কর্ণে মধু বর্ষণ করে ; কোকিল কি গায় তাহা কেহ বুঝিতে না পারিলেও তাহার গানে প্রাণ আকৃষ্ট হয়। ভারতচন্দ্রের কলধ্বনিও এমনি মধুর, এমনি চিত্তাকর্ষক।

কল কোকিল অলিকুল বকুল ফুলে
বসিলা অন্নপূর্ণা মণি দেউলে,
কমল পরিমল লয়ে শীতল জল
পবনে ঢল ঢল উছলে কুলে॥
বসন্ত রাজা আনি ছয় রাগিণী রাণী
করিল রাজধানী অশোক মূলে
কুসুমে পুণ পুণ ভ্রমর গুণ গুণ
মদন দিল গুণ ধনুক হুলে,
যতেক উপবন কুসুমে সুশোভন
মধু মুদিত মন ভারত ভুলে।

বহু কাল পরে বঙ্গসাহিত্যে আবার এই শব্দ মন্ত্রের আবির্ভাব হইয়াছে। বৈষ্ণবকবি গোবিন্দদাস যে শব্দযোজনা-শিল্প আবিষ্কার করিয়া বঙ্গভাষার পুষ্টি সাধন করিয়াছিলেন, ভারতচন্দ্রের হস্তে সেই শিল্প বহু গৌরবসম্পন্ন হইয়াছে। আধুনিক কবিগণের মধ্যে কবিবর রবীন্দ্রনাথ অনেক পরিমাণে এই শব্দবৈভবের অধিকারী হইয়াছেন সত্য, কিন্তু তিনিও ভারতচন্দ্রের কাছে পরাস্ত। কেবল শব্দের সাহায্যে একটি গম্ভীর বিরাট চিত্র অঙ্কিত করিবার ক্ষমতা ভারতচন্দ্রের মত আর কোনও কবিতে দেখি নাই। "ভারতচন্দ্রের লিপিচাতুর্য্যের গুণ এই যে তাহাতে শ্রমজনিত একটি স্বেদবিন্দুও পাঠকের নেত্র গোচর হইবে না, শিশুর হাসি ও পাখীর ডাকের ন্যায় তাহা আয়াস ও আড়ম্বর শূন্য। * * * * * * * * * এই শব্দ ও ছন্দৈশ্বর্য্যে মুগ্ধ হইয়া অনেক সমালোচক ভারতচন্দ্রের

কাব্যগুলকে 'ভাষার তাজমহল' আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন।" *

বলা বাহুল্য যে এ শব্দচাতুর্য্য বা এই অদ্ভুত শিল্পের পরিচয় আমরা মুকুন্দরামে পাইবার আশা করি না। মুকুন্দরাম নামে কবি, কার্য্যতঃ নাটককার। যাহা স্বাভাবিক—ভাব বা ভাষা দ্বারাই স্বাভাবিক, কবি অবিকল তাহা নিজ কাব্য মধ্যে বসাইয়া গিয়াছেন। তাহাতে সাজসজ্জা অর্পণ করিবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করিবার তাঁহার অবকাশ ছিল না। লিপিচাতুর্য্য মুকুন্দরামে একেবারে নাই—লেখার মুখে যাহা বাহির হইয়াছে তাহাই তিনি লিখিয়া গিয়াছেন। তাই বলিয়া তিনি যে আগাগোড়াই গ্রাম্য শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন তাহা নহে, যখন যাহা ব্যবহার করিবার আবশ্যক হইয়াছে তখন তাহাই ব্যবহার করিয়াছেন—তা সে সংস্কৃতই হউক বা গ্রাম্যই হউক। আমার বক্তব্য এই যে মুকুন্দরাম পাঠককে কোথাও শব্দমোহে সমাচ্ছন্ন করিবার প্রয়াস করেন নাই, প্রয়াস করিলেও পারিতেন কি না সন্দেহ, কারণ তাঁহার হৃদয় অন্যদিকে আবদ্ধ ছিল। কিন্তু ভারতচন্দ্রের শক্তির বিকাশ এই শব্দচাতুর্য্যকে অবলম্বন করিয়াই হইয়াছিল। তাঁহার মত কথায় চিত্ত হরণ করিতে প্রাচীন কালের অন্য কোনও কবি সক্ষম হ'ন নাই।" দীনেশ বাবুর এই উক্তি আংশিকমাত্র সত্য; ফলতঃ তাঁহার মত কথায় চিত্ত হরণ করিতে এ কালেরও কোনও কবি সক্ষম হ'ন নাই বলিলে সম্পূর্ণ সত্য হইত।

যাহা হউক এই শব্দপ্রয়োগশক্তি কবির চিত্রাঙ্কণী প্রতিভার সহিত এত সংশ্লিষ্ট যে সেই কথা বলিবার কালেই এ বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করিবার সুবিধা হইবে। হর-গৌরীর কথা উভয় কাব্যের মুখবন্ধ স্বরূপ। সেই মুখবন্ধে দুই কবির যে আভাস পাইয়াছি তাহাই এখন প্রকটিত করিবার চেষ্টা করিয়াছি মাত্র। কবিদ্বয়ের পূর্ণপ্রকাশ তাঁহাদিগের কাব্য মধ্যে প্রবেশ করিলে তবে পাওয়া যাইবে, বারান্তরে তাহা করিবার ইচ্ছা রহিল। (ক্রমশ)

শ্রীজিতেন্দ্রলাল বসু।

বাঙ্গালা-ব্যাকরণের একাংশ।

উপযুক্ত অভিধান ও ব্যাকরণ অভাবে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে বাঙ্গালাভাষার পর্য্যালোচনা দুরূহ—অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অভিধান বা ব্যাকরণ সর্ব্বাঙ্গীন করা ব্যক্তিগত চেষ্টার অসাধ্য। সমবেত ধারাবাহী চেষ্টা বিনা এ কার্য্য সুসম্পন্ন হইবার নহে।

ব্যক্তিগত পরিশ্রমলব্ধ ফল সুধীমণ্ডলীর সমক্ষে যাচাই না হইলে ব্যর্থ হয়। এই বুদ্ধিতে বর্ত্তমান প্রবন্ধ লিখিত। পরীক্ষান্তে প্রত্যাখ্যাত হইলেও ইহা সম্পূর্ণ নিষ্ফল হইবে না। সম্বাদী ভ্রমেরও সার্থকতা আছে। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্ত-রত্ন মহাশয় প্রবন্ধ প্রণয়নে সৎ পরামর্শ দিয়া কৃতজ্ঞতাভাজন

---

* দীনেশ বাবুর বঙ্গভাষা ও সাহিত্য।

হইয়াছেন। মতামতের জন্য তিনি দায়ী নহেন। ১৩০৭ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় প্রণীত "বাঙ্গালা শব্দদ্বৈত" (৬০ পৃষ্ঠা) ও "বাঙ্গালা ধ্বন্যাত্মক শব্দ" (২৫২ পৃষ্ঠা) এবং শ্রীযুক্ত বাবু ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রণীত "ভাষা-তত্ত্ব" (১৬৮ পৃষ্ঠা) প্রবন্ধগুলিও এ প্রসঙ্গে উল্লেখ যোগ্য।

বাঙ্গালা ব্যাকরণের ক্ষুদ্র একাংশ মাত্র উপস্থিত আলোচনার বিষয়। শব্দের দ্বিত্ব ও দ্বিত্বাভাসের বহুমুখী প্রয়োগ উত্তর ভারতীয় ভাষার একটি বিশেষত্ব। অন্যান্য ভাষায় ইহার চিহ্নমাত্র লক্ষিত হয়। যেমন, ইংরেজীতে wide wide world, hugger-mugger ইত্যাদি। সংস্কৃতে পরস্পর, পরম্পরা, কিলকিলা ইত্যাদি। কিন্তু এই এক সাধনায় বাঙ্গালায় যত প্রকার বিভিন্ন উদ্দেশ্য সিদ্ধি হয় তাহার অনুরূপ দৃষ্টান্ত বোধ হয় ভাষান্তরে অপ্রাপ্য। অনাদরে বাঙ্গালা-ভাষার অধ্যয়ন অধ্যাপন। এজন্য ইহার নগণ্য একাংশের আলোচনাতেও অজ্ঞাতসারে বলিয়া উঠিতে হয়—

মাতৃভাষারূপী খনি পূর্ণ মণিজালে।

বাঙ্গালা-ব্যাকরণের একাংশ

দ্বিরুক্তি।

১। উপর্য্যুপরি ব্যবহৃত একই শব্দের প্রত্যেকের অর্থ স্বাতন্ত্র্য থাকিলে তাহাকে দ্বিরুক্ত বলা যায়। যথা, রাম রাম, হরি হরি, ধিক্ ধিক্, হায় হায়, রে রে, আসুন আসুন ইত্যাদি।

২। মনোবৃত্তির প্রবলতা বশতঃ শব্দের একবার প্রয়োগে আক্ষেপ নিবৃত্তি না হইলে দ্বিরুক্তি বা বহূক্তি হয়। যথা, ভয়ে—সাপ সাপ, আগুণ আগুণ, পালাও পালাও। বিস্ময়ে—অ্যাঁ অ্যাঁ, দেখ দেখ, তাই ত তাই ত। ক্রোধে—মার মার, কাট কাট। ঘৃণায়—মহাভারত মহাভারত, রাম রাম, ধিক্ ধিক্। অবজ্ঞায়—ছি ছি, দুয়ো দুয়ো। দুঃখে—হায় হায়, যাই যাই। আনন্দে—বেশ বেশ, বাহবা বাহবা, সাধু সাধু। লজ্জায়—ছ্যা ছ্যা, রাম রাম। সম্বোধনে—রে রে, হে হে, পুত্র পুত্র, মা মা। আহ্বানে—আসুন আসুন, প্রত্যাখ্যানে—যাও যাও। সম্মতিতে—আচ্ছা আচ্ছা। অসম্মতিতে—না না, ইত্যাদি।

৩। মনোবৃত্তির আধিমাত্রিক প্রবলতায় বহূক্তি হয়। যথা, রে রে রে, হা হা হা, না না না ইত্যাদি।

৪। শব্দ ও বাক্যের দ্বিরুক্তি ও বহূক্তির একই সাধারণ নিয়ম। যথা, শুনিব না শুনিব না; যাব না, যাব না, যাব না ইত্যাদি।

৫। প্রতিজ্ঞা সূচক বাক্য উপর্য্যুপরি তিন বার উচ্চারণে শপথ হয়। যথা, যাব যাব যাব অর্থাৎ শপথ করিতেছি যে যাইব।

৬। মনোবৃত্তির প্রবলতাধিক্যে বাক্-শক্তি রোধ হয় বলিয়া বাক্য অপেক্ষা শব্দের দ্বিরুক্তিতে মনোবৃত্তির অধিকতর প্রবলতা সূচিত হয়। যথা, (১) তোমাকে দেব না। (২) তোমাকে দেব না তোমাকে দেব না। (৩) দেবনা, দেবনা। (৪) না, না।

[এখানে উত্তরোত্তর মনোবৃত্তির প্রবলতার বৃদ্ধি সূচিত হইতেছে।]

১। উপর্য্যুপরি ব্যবহৃত একই শব্দের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র অর্থলোপ হইয়া একটি মাত্র অর্থ নিষ্পন্ন হইলে তাহাকে শব্দের দ্বিত্ব বলা যায়। যথা, ডালে ডালে ফল ধরিয়াছে।

[এখানে "ডালে ডালে" একটী দ্বিত্ব শব্দ। ইহার আদ্য ও অন্ত্য ডালে শব্দের স্বতন্ত্র অর্থ লোপ পাইয়া বহু ডালে বা প্রতি-ডালে এই অর্থ নিষ্পন্ন হইয়াছে।]

২। গুণ, ক্রিয়া, কাল, সংখ্যা, অবস্থা নির্দ্দেশার্থে শব্দের দ্বিত্ব হয়। যথা, গুণ নির্দ্দেশার্থে—লাল লাল ফুল। ক্রিয়া নির্দ্দেশার্থে—যাইতে যাইতে দেখিও। কাল নির্দ্দেশার্থে—যখন যখন যাইবে। সংখ্যা নির্দ্দেশার্থে—এক এক জন। অবস্থা নির্দ্দেশার্থে—পরে পরে রাখ।

৩। অপ্রিয় বা সন্দিগ্ধ প্রিয়ভাব সূচনায় ও অনুরূপ অর্থে নিষ্পন্ন দ্বিত্ব শব্দে মূল শব্দের অর্থ হ্রাস হয়। যথা, অপ্রিয় সূচক—লোকটা পাগলপাগল, মাথাটা গরম গরম, গাড়ী ছাড়িল ছাড়িল। [এখানে পাগল, গরম, গাড়ী ছাড়া অপ্রিয় বলিয়া মূল শব্দের অর্থ হ্রাস হইয়াছে।]

সন্দিগ্ধ-প্রিয়—কথা শুনিলে ইহাকে পণ্ডিত পণ্ডিত বা জ্ঞানী জ্ঞানী বোধ হয় দেখিতে জোয়ান জোয়ান।

[এখানে পণ্ডিত, জ্ঞানী, জোয়ান, প্রিয় হইলেও প্রস্তাবিত ব্যক্তি সে প্রিয় গুণের আধার কি না সে বিষয়ে সন্দেহ বলিয়া দ্বিত্ব স্থলে মূল শব্দের অর্থ হ্রাস হইয়াছে।]

অনুরূপ—চোর চোর মূর্ত্তি, রাগ-রাগ দৃষ্টি, হাসি-হাসি মুখ, কান্না-কান্না সুর।

[এখানে চোর, রাগ, হাসি, কান্না অনুরূপ অর্থে দ্বিত্ব বলিয়া মূল শব্দের অর্থ হ্রাস হইয়াছে।]

৪। বর্ত্তমানে যে ক্রিয়া ঘটিলে মনের অনুকূল আহার ঘটিবার বিলম্বের তারতম্য অনুসারে, সেই ক্রিয়াবাচক শব্দের ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ কালীয় রূপের দ্বিত্ব হয় এবং বিলম্ব অপ্রিয় বলিয়া মূল শব্দের হ্রাস হয়। যথা, গাড়ী ছাড়িয়াছে ছাড়িয়াছে এমন সময় দেখিলাম, গাড়ী ছাড়িল ছাড়িল এমন সময় পাইলাম, গাড়ী ছাড়িবে ছাড়িবে এমন সময় উঠিলাম।

[এখানে প্রত্যেক পরবর্ত্তী উদাহরণে বিলম্বাধিক্য সূচিত এবং বিলম্ব অপ্রিয় বলিয়া প্রত্যেক উদাহরণেই মূল শব্দের অর্থ হ্রাস হইয়াছে।]

৫। অন্য সর্ব্বত্র দ্বিত্ব শব্দে মূল শব্দের অর্থ বৃদ্ধি হয়। অর্থ বৃদ্ধি পরিমাণে, কালে ও সংখ্যায় এই তিন প্রকারে হয়। যথা, পরিমাণে—মধুর মধুর রাতি, মৃদু মৃদু সমীরণ, শীঘ্র শীঘ্র চল। কালে—কাঁদিয়া কাঁদিয়া যাও, বলিয়া বলিয়া ক্লান্ত। সংখ্যায়—কাল কাল দাগ, বড় বড় জিনিষ, মুখে মুখে উত্তর।

৬। ব্যাপ্তি ও পৌনঃপুন্য কালে অর্থ-বৃদ্ধি এই দুই প্রকার। যথা, ব্যাপ্তি—কাঁদিয়া কাঁদিয়া যাও। [এখানে ক্রন্দন ক্রিয়ার দীর্ঘতর কাল ব্যাপ্তি সূচিত।] পৌন্যঃপুন্য—বলিয়া বলিয়া ক্লান্ত। [এখানে বলা ক্রিয়ার পৌনঃপুন্য সূচিত।]

৭। প্রত্যেকতা, বহুত্ব, সাকল্য ও পারম্পর্য্য এই চারি প্রকার সংখ্যায় অর্থবৃদ্ধি।

যথা, এক এক ঘরে চারি চারি জন। [এখানে প্রত্যেক ঘর ও প্রতি চারি জন সূচিত।] বহুত্ব—কাল কাল দাগ। [এখানে কাল দাগের বহুত্ব সূচিত।] সাকল্য—বড় বড় জিনিস। [এখানে বড় জিনিসের সাকল্য সূচিত অর্থাৎ সকল জিনিসই বড়।] পারম্পর্য্য—মুখে মুখে উত্তর। [এখানে প্রশ্নকর্ত্তা ও উত্তর-দাতার মুখের পারম্পর্য্য সূচিত।]

দ্বিত্বাভাস।

১। দ্বিত্ব হইবার সময় শব্দের রূপ বিকৃত হইলে তাহাকে দ্বিত্বাভাস বলা যায়। যথা, গাড়ী-টাড়ী, কাল-কোল ইত্যাদি।

২। দ্বিত্বাভাসের একাংশ নিরর্থক বা উভয়াংশই ধ্বন্যাত্মক হয়। যথা, পূর্ব্ব উদাহরণে 'টাড়ী' ও 'কোল' নিরর্থক। ছট্‌ফট, চটপট প্রভৃতিতে উভয় অংশই ধ্বন্যাত্মক।

৩। অর্থের বৈচিত্র্য অনুসারে দ্বিত্বাভাসের শেষাংশে আদ্যাংশের আদ্য আকার, ঋকার, ঔকার ভিন্ন স্বর ও ব্যঞ্জনের পরিবর্ত্তন হয়। যথা, লাকলিক, ফিটফাট ঝোপ-ঝাপ, বোকা-সোকা, গজর-মজর দান-টান ইত্যাদি।

৪। দ্বিত্বাভাসে স্বর ও ব্যঞ্জনের যুগপৎ পরিবর্ত্তন হয় না। প্রস্তাবে ধৃত সমুদয় দ্বিত্বাভাসই ইহার উদাহরণ।

৫। দ্বিত্বাভাসের আদ্যাংশে যাহা সূচিত হয় তাহার সহিত তাহার সজাতীয় আনুষঙ্গিক পদার্থের সমুচ্চয় সূচনায় আদ্যাংশের অ ঋ ঔ ভিন্ন স্বর শেষাংশে পরিবর্ত্তিত হয়। যথা, ডাক-ডোক, ছিট্-ছাট, কাল-কোল, গোল-গাল, ধুপ-ধাপ ঝাড়া-ঝোড়া, খোপ-খাপ ইত্যাদি।

৬। বিদ্রূপাত্মক দ্বিত্বাভাসে আদ্য আ-কার স্থানে শেষাংশে ই-কার হয়। যথা, লাট লিট, লাখ লিখ ইত্যাদি।

৭। দ্বিত্বাভাসে আদ্য আ-কারের পরবর্ত্তী স্বর উকার হইলে শেষাংশে আকার স্থানে উকার হয়। যথা, নাহুস নুহুস, গাবুর গুবুর, হাপুর হুপুর ইত্যাদি।

৮। ক্রিয়াপদের দ্বিত্বাভাসে আদ্য, আ-কার, ই-কার ও এ-কার স্থানে শেষাংশে উ-কার হয়। যথা, ডেকে ডুকে, টিপে টুপে, পেঁচিয়ে পুঁচিয়ে, ইত্যাদি।

৯। ক্রিয়াপদ হইতে নিষ্পন্ন বিশেষ্য ও বিশেষণপদের দ্বিত্বাভাসে আদ্য আ-কার ও এ-কার স্থানে শেষাংশে ও-কার হয়। যথা, সাফ সোফ, কাল কোল, ঘাঁটা ঘোঁটা, ঘেরা ঘোরা, ছেঁড়া ছোঁড়া, চেরা চোরা ইত্যাদি।

১০। অন্যত্র আকার ভিন্ন পরিবর্ত্তনশীল আদ্যস্বর স্থানে শেষাংশে আ-কার হয়। যথা, ঠিক ঠাক, ভিড় ভাড়, মিট মাট, ফুট ফাট, ঘুষ ঘাষ, টুপ টাপ, ফের ফার, বেগ বাগ, টের টার, খোপ খাপ, গোছ গাছ, থোক থাক ইত্যাদি।

১১। দ্বিত্বাভাসে তীব্র কার্য্যের কালে বৃদ্ধি সূচনায় হসন্ত বা অ-কারান্ত ধ্বন্যাত্মক আদ্য শব্দের শেষে আ-কার হয়। যথা, পটাপট, চটাচট, মটামট, গপাগপ, সপাসপ, কচাকচ ইত্যাদি।

১২। পারম্পর্য্য অর্থে দ্বিত্বাভাসে মূল

শব্দের অন্ত্য স্বরের স্থানে আ-কার হয় এবং সর্ব্বশেষে ই-কার হয়। যথা, কাণাকাণি, হাতাহাতি, ঘুষাঘুষি, জড়াজড়ি ইত্যাদি।

১৩। শেষোক্ত প্রকারের দ্বিত্বাভাসে মূল শব্দের আদিতে এ-কার থাকিলে তাহার স্থানে শেষাংশে ই-কার হয়, ও-কার থাকিলে তাহার স্থানে উ-কার হয়। লেখালিখি, ঘেরাঘিরি, পেজাপিজি, লোফালুফি, হোড়াহুড়ি, খোলাখুলি ইত্যাদি।

১৪। দ্বিত্বাভাসের আদ্য বা সার্থক শব্দে যাহা সূচিত হয় তাহার সহিত সজাতীয় বিজাতীয় আনুষঙ্গিক পদার্থের সমুচ্চয় সূচনায় সার্থক বা আদ্য শব্দের ট-কার ভিন্ন আদ্য ব্যঞ্জন বর্ণ নিরর্থক বা শেষ অংশে পরিবর্ত্তিত হয়। ট-কারের পরিবর্ত্তন হয় না। যথা, গাড়ী টাড়ী, নৌকাটৌকা, টাকাটাকা, টবটব ইত্যাদি।

১৫। ট-কার আদ্য ব্যঞ্জন হইলে শব্দের রূপ হয় দ্বিত্ব, কিন্তু অর্থ হয়, দ্বিত্বাভাসের নিয়মানুগত। যথা, টাকাটাকা, টাকটাক, টকটক ইত্যাদি।

১৬। ক্রোধ, তাচ্ছীল্য প্রভৃতি নিগ্রহ রসাত্মক দ্বিত্বাভাসে শেষাংশের আদ্য ব্যঞ্জন বর্ণ হয় ফ-কার। যথা, ফেলে দে তোর কাপড়-ফাপড়, রেখে দে তোর টাকা-ফাকা, ভাত ফাত ছড়িয়েছে ইত্যাদি।

১৭। অনুকম্পা প্রভৃতি অনুগ্রহ রসাত্মক দ্বিত্বাভাসে শেষাংশের আদ্য ব্যঞ্জন বর্ণ হয় স-কার। যথা, বোকাসোকা, মোটাসোটা, রোগাসোগা, কষ্টেসষ্টে ইত্যাদি।

১৮। বিরসাত্মক দ্বিত্বাভাসে শেষাংশের আদ্য ব্যঞ্জনবর্ণ হয় ম-কার। যথা, চিন্তে-মিন্তে, গজরমজর, কচরমচর, কচমচ, কটমট, ঘজমজ, টলমল, কাচুমাচু, থাবড়া-মাবড়া ইত্যাদি।

১৯। গতিসূচক দ্বিত্বাভাসে শেষাংশের আদ্যস্বর হয় প-কার কিম্বা ব-কার। যথা, চটপট, ছটপট, লটপট, তড়বড়, টগবগ, ঘড়বড়, কিলবিল ইত্যাদি।

২০। বিশৃঙ্খলতা সূচক দ্বিত্বাভাসে বর্ণের বিশৃঙ্খল প্রয়োগ হয়। যথা, ইলবিল, উসঘুষ, উস্কখুস্ক ইত্যাদি।

দ্বিত্বগন্ধী।

১। অবিরল সন্নিবিষ্ট সার্থক, সমমাত্রিক, অনুপ্রাসবদ্ধ বা মিত্রাক্ষর শব্দদ্বয়কে দ্বিত্বগন্ধী বলা যায়। যথা, চালচলন, চাঁচাছোলা, মাজাঘষা ইত্যাদি।

২। দ্বিত্ব-গন্ধী শব্দদ্বয়ের শেষ শব্দ ভাষান্তর হইতেও গৃহীত হয়। যথা, কাজ-কর্ম্ম, লজ্জাসরম, কলকৌশল ইত্যাদি।

৩। দ্বিত্বের ন্যায় দ্বিত্বগন্ধী শব্দেও প্রত্যেকের অর্থলোপ হইয়া একটি মাত্র অর্থ নিষ্পন্ন হয়। সেই নিষ্পন্ন অর্থ প্রত্যেক শব্দের অর্থের তুলনায় আধিমাত্রিক। যথা, কাজকর্ম্ম, সাজসজ্জা, বাচবিচার ইত্যাদি।*

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মাসিক অধিবেশনে পঠিত

শ্রীমোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়।

বরেন্দ্র-ভ্রমণ।

৩

সোণার গৌরাঙ্গ।

কুমারপুরের অনতিদূরে, পদ্মাবতী-তীরে, বরেন্দ্রতত্ত্বানুসন্ধানসমিতির দ্বিতীয় "জয়স্কন্ধাবারের" স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। তাহা প্রথম "জয়স্কন্ধাবার" হইতে পাঁচ ক্রোশ মাত্র। কিন্তু প্রত্যূষে যাত্রা করিয়াও, এই পাঁচ ক্রোশ অতিক্রম করিতে মধ্যাহ্নকাল অতিক্রান্ত হইয়া গেল। সে দিন আকাশে মেঘ ছিল, প্রান্তর মধ্যে বায়ুপ্রবাহের অভাব ছিল না। তথাপি নানাস্থান পরিদর্শন করিতে গিয়া, সাহিত্যিকগণ পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

এখন সে সকল স্থানে জনসংখ্যা হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে; কোন কোন পুরাতন জননিবাস প্রান্তর-ভূমিতেও পরিণত হইয়াছে। তথাপি তাহার সকল স্থানই ভাল করিয়া পরিদর্শন করিবার প্রয়োজন ছিল। কারণ, যাহা এক সময়ে একটি সম্পন্ন রাজনগর ছিল, তাহাই কালপ্রভাবে বহুসংখ্যক গণ্ডগ্রামে এবং নির্জ্জন প্রান্তরে পরিণত হইয়াছে। পলাশবাড়ীর পার্শ্বে পালপুর-ধরমপুরের পুরাতন পরিখার চিহ্ন এখনও সেকালের সেনানিবাসের অবস্থান সূচিত করিতেছে। দক্ষিণে একটি প্রান্তর এখনও "গড়খাই" নামে মানচিত্রে লিখিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু নিকটবর্ত্তী গ্রামের লোকে এখন আর সে সকল স্থানের জনশ্রুতির সন্ধান প্রদান করিতে পারে না। কেবল একটি জনশ্রুতি এত কালেও সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইতে পারে নাই; তাহা হিন্দু-মুসলমান সকল শ্রেণীর অধিবাসীর মধ্যেই সমানভাবে প্রচলিত আছে। তাহা এই;—"এক সময়ে কুমারপুরে কুমার রাজা নামে এক রাজা বাস করিতেন; তাহার পর বিজয়নগর নামক স্থানে বিজয় রাজা নামে আর এক রাজা বাস করিয়াছিলেন। বিজয় রাজার দুই ভ্রাতা, শীতল রাজা এবং উদয় রাজা, নিকটবর্ত্তী শীতলপুরে এবং উদয়পুরে বাস করিতেন। এই সকল স্থানে তাঁহাদের রাজবাড়ীর কিছু কিছু চিহ্ন এখনও দেখিতে পাওয়া যায়।" এতক্ষণে সাহিত্যিকগণ বুঝিলেন,—দেওপাড়ায় "শীতল-সহর" নামক যে তল্লটি দেখিয়া আসিয়াছেন, তাহা বিজয় রাজার ভ্রাতা শীতল রাজার নামের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। তখন কৌতূহল বড় প্রবল হইল;—কুমারপুর আর কত দূরে,—সকলে পুনঃ পুনঃ সেই কথাই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

ক্রমে একটি বিস্তৃত প্রান্তরের অপর প্রান্তে কুমারপুর দেখিতে পাওয়া গেল। তাহা তখনও বহু দূরে। নিকটে, সম্মুখে, উভয়পার্শ্বে, কেবল জনশূন্য প্রান্তরভূমি, তাহার মধ্যে তল্লের পর তল্ল। এই সকল তল্ল এখন আর বঙ্গসাহিত্যে সমাদর লাভ করে না। কিন্তু একদিন ইহারাই বঙ্গকবির কল্পনাপ্রবাহে কত ভাব-তরঙ্গ সঞ্চারিত করিয়া দিত।

"প্রমুদিত চিত নিরখত ঘন শ্যাম সরসী-শোভা।
নির্ম্মল পরিপূর্ণ বারি,
পীযুষভর গরবহারি,
মন্দ পবন পরশত মৃদুবীচি ভুবনলোভা॥
বিকশিত নব কুঞ্জ নিকর,
গুঞ্জত মধুমত্ত ভ্রমর,
মঞ্জু নটত খঞ্জন জনরঞ্জন অনুপামা।
সারস লস হংস লাখ, কিরতহি তহি চক্রবাক
ক্রৌঞ্চ-কীর-কোকিল-শিখি-কলরব অভিরামা॥
ঝলকত সর তীর অতুল,
কুসুমিত তরুবল্লী বকুল,
বল্লরিত জল ছলক ছাঁহ ছুটত ছবি ভারি।
অভিনব কুটি-মণ্ডপগণ,
মণ্ডিত কত বেদী রতন,
সুগঠন মণিজড়িত ঘাট লোচন-রুচিকারী॥"

কুমারপুরের উত্তরপ্রান্তে প্রান্তরের মধ্যে এইরূপ একটি "বিতত তল্ল" দেখিতে পাওয়া গেল। তাহা এখনও নির্ম্মল-বারি-পূর্ণ, এখনও মৃদুমন্দপবন সংস্পর্শে বীচিমালায় সুশোভিত। কিন্তু এখন আর তাহার তীরে "কুঞ্জনিকর" বর্ত্তমান নাই, কেবল অযত্নসম্ভূত লতাগুল্ম। তথাপি মধুলুব্ধ মধুপবৃন্দের আনন্দ-সঙ্গীত নিরস্ত হয় নাই, তাহার সহিত তাল রক্ষা করিয়া এখনও—"মঞ্জু নটত খঞ্জন জনরঞ্জন অনুপামা।" ঘাট নাই, ঘাটের মণিজড়িত সুগঠনের চিহ্নমাত্রও বর্ত্তমান নাই; তাহার প্রয়োজন পর্য্যন্ত তিরোহিত হইয়া গিয়াছে। কারণ, এখন আর ইহাতে কে অবগাহন করিতে আসিবে? এখন কেবল কুম্ভীরগণ নিঃশঙ্কচিত্তে সঞ্চারণ করিয়া বেড়াইতেছে! এই তল্লের দক্ষিণতীরে একটি দেবমন্দির ছিল। এখন তাহার চিহ্ন না থাকিলেও, সেখানে একটি "থান" আছে;—তাহা বাশুলী দেবীর "থান",—তাহার উপর এখনও বর্ষে বর্ষে পূজা হইয়া থাকে। উড়িষ্যার নাল্তিগিরি-শিখরে যে বাশুলী-মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ বর্ত্তমান আছে, তাহার সর্ব্বাঙ্গে বৌদ্ধপ্রভাব অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। কুমার-পুরের বাশুলী-মন্দিরও কি সেইরূপ ছিল? গ্রামের নাম কুমারপুর, দেবীর নাম বাশুলী দেবী, রাজার নাম কুমার রাজা,—এ সকল কি পালবংশীয় বৌদ্ধ নরপাল কুমার পালকে সূচিত করিতেছে না? কুমার রাজার পরে যে বিজয় রাজার আবির্ভাব হইয়াছিল, তিনিই কি সেনরাজ-বংশের বিজয়ী বিজয় সেন বলিয়া প্রতিভাত হইতেছেন না? দেওপাড়ার প্রস্তরলিপি আবিষ্কৃত হইবার পর এ সকল প্রশ্নের একটিমাত্র উত্তর ভিন্ন দ্বিতীয় উত্তর প্রদত্ত হইতে পারে না। এই সেই পুরাতন রাজনগর,—কুমার পালের শেষ আশ্রয়স্থান—সেনরাজ বংশের প্রথম রাজধানী। ইহার কথা ব্যক্ত করিবার জন্যই বিজয় সেনের পুত্র বল্লাল সেন স্বকৃত "দান-সাগর" গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন;—

"তদনু বিজয়সেনঃ প্রাদুরাসীদ্বরেন্দ্রে।"

কোন্ গ্রামের পর কোন্ গ্রাম পরিদর্শন করিতে হইবে, তাহা যেরূপ কৌশলে স্থিরী-কৃত হইয়াছিল, তাহাতে এই সকল ভৌগোলিকতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে কাহাকেও আয়াস স্বীকার করিতে হইল না। কুমার-পুরে প্রবেশ করিবামাত্র প্রাসাদ-শিলার এবং প্রতিমা-শিলার সন্ধান লাভ করিয়া, সাহিত্যিকগণ জনশ্রুতিকে "নহ্যমূলা"

বলিয়াই স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। গ্রামের মধ্যে একটি স্থান সমধিক উচ্চ; তাহার পার্শ্বে পুরাতন পরিখা-চিহ্ন, উপরে বিজন বন, তাহার মধ্যে ব্যাঘ্রের আশ্রয়স্থান! তাহার অনতিদূরে অনেক জরাজীর্ণ দেব-মন্দির; একস্থানে একটি ক্ষুদ্র সরোবর-তীরে চারিটি শিবমন্দির বৃক্ষমূলে জড়িত হইয়া কোনরূপে দৃষ্টিগোচর হইতেছে। তাহার নিকটে নানা বৃক্ষমূলে দেবদেবীর পাষাণমূর্ত্তির ভগ্নাবশেষ পড়িয়া রহিয়াছে। পদ্মাবতী-তীরে উচ্চভূমিখণ্ডের উপর কুমার-পুর প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। নদী সরিয়া গিয়াছে, কিন্তু যেখানে তাহার পুরাতন খাত বর্ত্তমান ছিল, তাহা এখনও "খাড়ি জগাতি" নামে কথিত হইতেছে। তাহার ধার দিয়া আধুনিক রাজপথ গোদাগাড়ী অভিমুখে চলিয়া গিয়াছে। তাহার পার্শ্বে, একটি উচ্চভূমির উপর, এক প্রস্তরমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পরিষ্কৃত করিয়া, জনৈক সম্পন্ন মুসলমান আমীর এক সমাধি-মন্দির নির্ম্মিত করিয়াছিলেন। তাহার ধ্বংসাবশেষ এখনও কুমারপুরকে কৌতূহলের আধার করিয়া রাখিয়াছে।

হস্তিপৃষ্ঠে উপবিষ্ট থাকিয়া সাহিত্যিকগণ এই সকল পুরাকীর্ত্তির নিদর্শন দর্শন করিতে করিতে, পদ্মাতীরে উপনীত হইলেন। পদ্মা বহুদূরে সরিয়া গিয়াছে; সৈকতভূমি সাহারার মরুভূমির মত ধূ ধূ করিতেছে! তাহার উপরে যে উচ্চ তট, তাহাতে অলিপুর নামে একটি গ্রাম বসিয়াছে। সেখানে এক হিন্দু ভূস্বামীর কাছারীবাড়ীর পার্শ্বে শিবির সংস্থাপিত হইয়াছিল। ভূস্বামী অশীতিপর, চিররুগ্ন, প্রায় চলচ্ছক্তিহীন; তিনি বহুদূরে বাস করেন। তথাপি সাহিত্যিকগণকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য স্বয়ং শিবিরে আসিয়া অপেক্ষা করিতে-ছিলেন। তাঁহার কাছারীবাড়ীর সম্মুখে কদলীতোরণ, মঙ্গলঘট, লোকারণ্য। কিন্তু তখন শিষ্টাচারের সময় অতীত হইয়া গিয়াছিল;—ধৈর্য্যের সীমাও অতিক্রান্ত হইবার আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছিল। অগত্যা সাহিত্যিকগণ স্নানাহারে ব্যাপৃত হইয়া পড়িলেন।

এক সময়ে সমগ্র বঙ্গভূমির প্রাণ বরেন্দ্র-ভূমির এই নিভৃত প্রদেশেই স্পন্দিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার কথা বাঙ্গালার বৈষ্ণব-সাহিত্যকে মধুময় করিয়া রাখিয়াছে। "জয়স্কন্ধাবারের" অনতিদূরে—সেকালের পদ্মাবতী-তীরে—গোপালপুর নামক স্থানে একটি রাজধানী ছিল। এখনও রাজপথ-পার্শ্বে বনভূমির মধ্যে তাহার ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া রহিয়াছে। একখানি সংস্কৃত নাটকে সেই রাজধানীর নাম উল্লিখিত আছে। গোবিন্দ কবিরাজ "সঙ্গীত-মাধব" নাটকের প্রস্তাবনায় লিখিয়া গিয়াছেন,—

"পদ্মাবতীতীরবর্ত্তি-গোপালপুর নগর-বাসি-গৌড়াধিরাজমহামাত্য-শ্রীপুরুষোত্তমদত্ত সপ্তমতনুজঃ শ্রীসন্তোষদত্তঃ। স হি শ্রী-নরোত্তমদত্তসপ্তম-মহাশয়ানাং কনীয়ান্ যঃ পিতৃব্যভ্রাতৃশিষ্যঃ। তেন চ শ্রীরাধামাধ-বয়োঃ প্রকট লীলানুসারেণ লৌকিকরীত্যা পূর্ব্বরাগাদিবিলাসার্হং সঙ্গীতমাধবং নাটকং বিরচয্য নানারত্নাদিদানেন নাম্না পুরস্কৃত্য সমর্পিতোঽস্তি॥"

গৌড়াধিপাজের মহামাত্য পুরুষোত্তম দত্তের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণানন্দ দত্তের পুত্র ভক্ত কবি নরোত্তম দত্ত বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিত; বৈষ্ণবসমাজে মহাজনরূপে সুপূজিত। তিনি বঙ্গসাহিত্যের অদ্বিতীয় আশ্রয়দাতা ছিলেন। তাঁহার সাধুজীবন নিরন্তর ধর্ম্মপ্রচারেই অতিবাহিত হইয়াছিল। রাজ্যভোগে জলাঞ্জলি দিয়া, আকুমার ব্রহ্মচারী নরোত্তম দাস কিরূপে ভক্তিমন্ত্রের প্রচারকামনায় আত্মজীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাহা নরহরি-বিরচিত সুবিখ্যাত "ভক্তিরত্নাকরে" সংক্ষেপে এবং "নরোত্তম-বিলাসে" বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত রহিয়াছে। তাঁহার অপূর্ব্ব আত্মত্যাগ-কাহিনী মহাকবি বসন্তের একটি গীতে এখনও কীর্ত্তিত হইয়া থাকে।

"প্রভু নরোত্তম গুণনিধি ॥
কনক কমল জিনি, সুকোমল তনুখানি,
না জানি গড়িল কোন্ বিধি ॥
গোরা-প্রেমে মত্ত হৈয়া, রাজ্যভোগ তেয়াগিয়া,
পরম আনন্দ বৃন্দাবনে ;—
পাইয়া অমূল্য ধন, কৈলা আত্মসমর্পণ,
প্রভু লোকনাথের চরণে ॥
কৃপা করি লোকনাথ, করিলেন আত্মসাৎ,
হইল গমন গৌড়দেশ ;—
শ্রীগৌড় ভ্রমণ করি, গিয়া নীলাচলপুরী,
পুন গৌড়ে করিলা প্রবেশ ॥
প্রভু পরিকর যত, অনুগ্রহ কৈল কত,
কি অদ্ভুত গীত প্রকাশিলা ;—
এ দাস বসন্ত ভণে, পাষণ্ড অসুরগণে,
করুণা করিয়া উদ্ধারিলা ॥"

ইহাই সংক্ষিপ্ত জীবন-কাহিনী,—অপূর্ব্ব আত্মত্যাগ-কাহিনী,—অনির্ব্বচনীয় প্রেম-ভক্তি-কাহিনী,—অলৌকিক পতিতোদ্ধার-কাহিনী। তাহা এখনও শতকণ্ঠে গীত হইয়া থাকে, জয়কন্ধাবারের অনতিদূরে সেই পুণ্যতপোবন, যেখানে এই মানব-প্রীতি এবং দেবপ্রীতি' উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার নাম খেতরি,—বৈষ্ণব-সমাজের এবং বঙ্গসাহিত্যের চিরস্মরণীয় তীর্থক্ষেত্র। সেখানে এখনও বর্ষে বর্ষে মেলা বসিয়া থাকে। নরোত্তমের যত্নে, রাজা সন্তোষদত্তের আশ্রয়ে এই তীর্থক্ষেত্রে প্রথম "বৈষ্ণবমহাধিবেশন" সুসম্পন্ন হইয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাসে প্রথম মহাধিবেশনের স্থান বলিয়া সপ্তপর্ণী-গুহা যেরূপ সুপরিচিত, বাঙ্গালার বৈষ্ণবধর্ম্মের ইতিহাসে খেতরি গ্রামও সেইরূপ। এখানে নরোত্তমদাস ঠাকুর মহাশয়ের "সোণার গৌরাঙ্গ" এখনও প্রতিদিন অর্চ্চিত হইতেছেন। সুতরাং সাহিত্যিকগণ অপরাহ্লে সেই তীর্থক্ষেত্র দর্শন করিতে বহির্গত হইলেন।

তখনও হোরীর দিন অতীত হইয়া যায় নাই। সে নিভৃত নিকেতনে আবীর-কুঙ্কুম "চড়াইবার" লোক বড় অধিক না থাকিলেও মহাপ্রভু তখনও হোরীর বেশেই বিরাজ করিতেছিলেন। শ্রীবিগ্রহ অলিন্দে আসিয়া আবীর গ্রহণ করিলেন;—প্রাঙ্গণ, অলিন্দ এবং শ্রীমূর্ত্তি লালে লাল হইয়া গেল। খোল ছিল না, করতাল ছিল না, সংকীর্ত্তন ছিল না;—আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছিল, দিবসের শেষ আলোক-রেখাও ধীরে ধীরে অপসৃত হইতেছিল,—তথাপি সে নীরব হোরী যেন সরবে গর্জ্জন করিয়া গাহিয়া উঠিতেছিল;—

'আজু পরম রঙ্গে হরষে শ্যাম রসিকরাজ।
বেশ বিরচি বিলসত নব কুঞ্জভবনমাঝ॥
ললিতাদলিতাঞ্জনজল
নাগর শিরে ঢালি;—
হো! হো! হো! হরি উচরি,
বিরচই করতালি॥

সাহিত্যিকগণ খেতরি ছাড়িয়া, প্রেমতলি পার হইয়া, শিবিরের দিকে অগ্রসর হইবার পূর্ব্বেই, আকাশ একেবারে মেঘাচ্ছন্ন হইয়া গেল; কোনরূপে শিবিরে উপনীত হইতে না হইতে, ঝড় উঠিয়া পড়িল! বৃষ্টি নাই কেবল ঝড়,—পদ্মাতীরের প্রবল ঝড়,—তাহাতে বালুকারাশি সবলে শিবির আক্রমণ করায়, সকলে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। পট্টাবাসগুলি যায় যায় হইয়া উঠিল; দড়াদড়ি ধরিয়া কায়ক্লেশে শিবির রক্ষা করিতে গিয়া, কেহ কেহ বিলক্ষণ শিক্ষা প্রাপ্ত হইলেন। ঝড় থামিয়া গেলে, আবার আকাশ পরিষ্কৃত হইল, আবার চন্দ্রমা বিলসিত হইল, আবার পদ্মাতীর শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিয়া, নূতন শোভায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। কিন্তু রজনী বড় নিরুদ্বেগে অতিবাহিত হইল না! শিবিরে ফিরিবার সময়ে শিবিরের অনতিদূরে একটি ঝোপের মধ্যে অনেকগুলি জোনাকী এক সঙ্গে ঝিক্‌মিক্ করিতেছিল। হস্তীগুলি তাহার নিকটে আসিয়া হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়া আকাশে শুঁড় উঠাইতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে ঝোপ নড়িয়া উঠিল, খদ্যোৎপুঞ্জ সচল হইল,—যাঁহাদের দৃষ্টি প্রখর ছিল, তাঁহারা দেখিলেন ব্যাঘ্রাচার্য্য বৃহল্লাঙ্গুল মহাশয় সাহিত্যাচার্য্যগণকে বিনা বিবাদে পথ ছাড়িয়া দিয়া গভীর বনে প্রবেশ লাভ করিলেন, বরেন্দ্রে এরূপ ঘটনা অসাধারণ বলিয়া পরিচিত নয়। সুতরাং পট্টাবাসে রাত্রিযাপন করিতে হইলে, আগ্নেয়াস্ত্র নিকটে রাখিবারই ব্যবস্থা করিতে হয়। তাহাতেও সকল সময়ে সম্পূর্ণরূপে উদ্বেগ দূর হয় না।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

খাদ্য ও রন্ধন সম্বন্ধে কতকগুলি প্রশস্ত নিয়ম

১। সারা জীবজগতে খাদ্যের অভিব্যক্তি দেখিলে বুঝা যায়, খাদ্যের অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গেই জীবের অভিব্যক্তি চলিতেছে। উচ্চশ্রেণীর জীবেরা অবয়বের অল্প আয়তনে অধিক সারাল দ্রব্য খায়। উন্নতিশীল মানুষের মধ্যেও সেইরূপ দেখা যায় এবং সকলেরই সেইরূপই কর্ত্তব্য।

২। খাদ্য যত শুকনা অবস্থায় খাওয়া যায়, হজম ততই সহজে হইয়া থাকে। তবে কখন বেশী জলীয় পদার্থের সহিত খাইলে খাদ্যে হজমের সার রস ভাল করিয়া মিশিতে পারে না।

৩। অনেক শ্রেণীর খাদ্য আছে। মাংস বা ছানা জাতীয়—মাছ, মাংস, ডিম, ডাল, ছানা। তৈল জাতীয়—তেল, ঘী। শ্বেতসার জাতীয়—ভাত, তরকারী। চিনি জাতীয়—চিনি, গুড়। এ সবগুলিতেই অন্য অনেক

জাতীয় খাদ্য আছে, কিন্তু যেটি দিয়া লক্ষ্য করা হইয়াছে সেইটিই প্রধান উপকরণ।

৪। শরীরে বিভিন্ন জাতীয় খাদ্যগুলির ভিন্ন ভিন্ন কাজ। প্রথম বয়সে অর্থাৎ বাল্যাবস্থায় শরীর দিন দিন বাড়ে বলিয়া মাংস বা ছানা জাতীয় খাদ্য অর্থাৎ যাহারা শরীরসত্তার সাহায্য করে তাহারা এই সময়ে প্রশস্ত। মধ্য বয়সে অর্থাৎ যৌবনে বা যে বয়সে খাটিয়া খাইতে হয়, সে বয়সে তৈল, ঘী জাতীয় খাদ্যই বেশী আবশ্যক, কারণ তাহারা শরীরে শক্তি দেয়। আর বার্দ্ধক্যে সামান্য শ্বেতসার জাতীয় আহারই ভাল। কারণ অল্প আয়তনে তাহারা নিরুপদ্রব।

৫। ছেলে বয়সে অতি আহার তত ক্ষতিকর নহে, অনাহার বা অল্পাহার বড়ই ক্ষতিকর। কারণ তাহাতে শরীরে রীতিমত বৃদ্ধির ব্যাঘাত হয়। বৃদ্ধ বয়সে অতি আহার অত্যন্ত হানিকর, স্বল্পাহারে তত ক্ষতি হয় না।

৬। উদ্ভিজ্জ খাদ্য, যথা ভাত, ডাল, বেশী আঁচে রাঁধা ও প্রাণীজ খাদ্য যথা মাছ মাংস, কম আঁচে রাঁধা ভাল। তবে সকল রাঁধায় মধ্যম আঁচে অনেকক্ষণ ধরিয়া রাঁধা প্রশস্ত। বাষ্পে রান্না জলে সিদ্ধ করা অপেক্ষা অনেক ভাল, সাধারণ সুস্বাদ ও সুপাচ্য থাকে।

৭। রাঁধিবার প্রধান উদ্দেশ্য যাতে খাদ্য সুসিদ্ধ, নরম ও সুপাচ্য হয়। সুতার করিবার জন্য তার পরে ব্যবস্থা করা ভাল। খাইবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই সুতার ও সুগন্ধ করিলে সে গুলি যত বিদ্যমান থাকে অনেক আগে করিলে ততটা থাকে না। ঠিক এই সময়েই তাই সাঁতলাবার ও মসলা দিবার ব্যবস্থা করা উচিত।

৮। সদ্য রাঁধা ও সদ্য সাঁতলান জাতীয় খাদ্য অতি উপাদেয় ও সহজে হজম হয়। বাসী খাবার ঠাণ্ডা হওয়ার পর আবার গরম করিলে তেমনটি হয় না।

৯। গরম আহার ও সুতার সুগন্ধ আহার সুহজমের জন্য বড়ই ভাল।

১০। আহারের পূর্ব্বে ও পরে খানিকক্ষণ করিয়া বিশ্রাম করিবে। কিন্তু অব্যবহিত পরেই দীর্ঘ নিদ্রা দিও না।

১১। আস্তে আস্তে ভাল করিয়া চিবাইয়া খাইলে অনেক সহজে খাদ্য হজম হয়। নিয়ত তাড়াতাড়ি খাইলে হজম না হইয়া কতক উৎপাতও করিয়া খাদ্যগুলি আশু বাহির হইয়া যায়।

১২। আহারের সময় সর্ব্বদা নিশ্চিন্ত মনে ও ভাল লোকের সঙ্গে সদালাপ করিতে করিতে ধীরে ধীরে খাওয়া প্রশস্ত।

১৩। আহারের সময়ে তিন-চারিটি তরকারী ছাড়া আর বেশী খাওয়া বিধেয় নয়।

১৪। দৈনিক আহারের পর দিনের কাজ থাকে বলিয়া, তাড়াতাড়ি হয় বলিয়া, ও ভারী পেটে গুরুতর কাজ করাও ক্ষতিকর বলিয়া সে সময়ে হালকা আহার করিবে। দিনান্তে অবসরের সময় সন্ধ্যার আহারই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত।

১৫। সচরাচর অল্পবিস্তর চারবার আহার করাই ভাল। অল্প অল্প অনেক বারে খাইলে একেবারে গুরু আহার অপেক্ষা অনেক সহজে হজম হয়।

১৬। প্রাতে উঠিয়াই সামান্য কিছু খাওয়া চাই; গরম তরল পদার্থই এই সময়ের পক্ষে উপকারী। পূর্ব্বাহ্ণের আহার যেন তত বেশী গুরুতর না হয়। অপরাহ্ণের আহারে কিছু ফল থাকিলে ভাল হয়, আর সে আহারটিও সামান্য হওয়া চাই। সন্ধ্যার আহার সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর হইলে ক্ষতি নাই। কারণ তখন অবসর ও বিশ্রামের সময় বলিয়া সকল শক্তি হজম-কার্য্যেই ব্যয়িত হয়। তবে বেশী রাত করিয়া গুরু আহার ভাল নয়। শুইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে অল্প তরল পদার্থ পান করা ভাল।

১৭। গুরু আহারের সময় বেশী জল বা অন্য তরল পদার্থ পান করিও না। খালি পেটে বা আহারের অনেকক্ষণ পূর্ব্বে ও পরে জলপান করা ভাল। তাহাতে হজমের সাহায্য করে ও পেট ধোবার মত কাজ হয় ও দাস্ত পরিষ্কার থাকে।

১৮। আহার্য্য সামগ্রী ও ভোজনের প্রথা মাঝে মাঝে বদলান চাই। তাতে আহারে স্পৃহা অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

১৯। সপ্তাহে এক দিন কতকটা উপবাসের মত কম খাওয়া ভাল। তাতে অনেক হিত সাধন হয়। যথা আমাদের শরীরের হজমের যন্ত্র ও অন্যান্য যন্ত্রগুলি বিশ্রাম পায়। বাড়ীর মেয়েরা একটু বিশ্রাম পান; ঝি চাকরেরা ও একটু অবসর পায়। সেদিন পূর্ব্ব দিনের রক্ষিত সামান্য আহার করিবে। কেমন করে খাদ্য কিছুদিন রক্ষা করিতে পারা যায়, সে শিক্ষাও হয়। সেটি বড় দরকারী শিক্ষা। সকল কৃতবিদ্য জাতিই সেই শাস্ত্রে পারগ। তাই তাঁহারা এত কাজ করিতে অবসর পান ও এত দেশ-বিদেশে যাইতে ও থাকিতে পারেন।

২০। আবার মাঝে মাঝে পাঁচ জনে একত্র মিলিয়া আমোদ করিয়া বাড়ীতে বা বনভোজনে নিজেরা রাঁধিয়া আহার করিবে, তাতে স্থান পরিবর্ত্তন ও আহার ও চিন্তার পরিবর্ত্তন এবং রান্না শিক্ষাও হয়। অনেক দিন এক ভাবে এক অবস্থায় থাকিলে মানুষের অধোগতি অনিবার্য্য।

২১। প্রতি আনন্দের কার্য্যে বাড়ীর ছেলে মেয়েদের সর্ব্বদা সঙ্গে নিও। এ কথায় যেন কখনও অন্যথা না হয়। কখন তাহাদের সঙ্গে একত্রে আনন্দ উপভোগ করিলে তোমার শরীর মনে যেরূপ উন্নতি হইবে ও তুমি যেরূপ বিমল আনন্দ পাইবে, বিশ্বসংসারে তেমন আর কোথাও পাইবে না।

শ্রীইন্দুমাধব মল্লিক।

সমাজ-বন্ধন।

ছোট জিনিস—যাহা আমাদের কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করে না এবং চক্ষুকে ঝলসিত করিয়া দেয় না—তাহাকে শ্রদ্ধা করিতে আমাদের প্রবৃত্তি হয় না। সেই জন্য কোন ছোট কাজ করিতে আমাদের উৎসাহ জন্মে না। বড় কাজ করিতে না পারি সেও ভাল, বড় কাজ করিবার আয়োজন মাত্রেই আমাদের সমস্ত শক্তি নিঃশেষিত হইয়া যায়

সেও ভাল, তথাপি যাহা ক্ষুদ্র যাহা লোকচক্ষুর অন্তরালে নীরবে সম্পন্ন হইতে পারে, তাহার প্রতি আস্থা আমাদের নাই। প্রকাণ্ড কল্পনা এবং অননুকরণীয় আদর্শ লইয়া আমরা সন্তুষ্ট, কিন্তু ছোট ছোট বিষয় লইয়া কাজ আরম্ভ করিয়া দিতে আমরা প্রস্তুত নহি। আমরা একেবারে এক মহান্ ভারতীয় জাতি গড়িয়া তুলিতে প্রস্তুত, ইংলণ্ডের জনসাধারণকে ভারতসম্বন্ধে সুশিক্ষিত করিয়া তুলিতে প্রস্তুত, কিন্তু সমাজের আশ্রয় লইয়া ছোট ছোট কার্য্যের দ্বারা সমাজকে বলবান করিতে এবং নিজেদেরও সঙ্গে সঙ্গে শক্তিশালী করিয়া তুলিতে আমাদের আগ্রহমাত্র নাই! যদি সমাজেরই উন্নতি করিতে হয় ত একেবারে আমূল সংশোধনের দ্বারা প্রচণ্ড বিপ্লবের দ্বারা, নূতন মতবাদের দ্বারা একেবারে আদর্শ স্বদেশীসমাজ গড়িয়া তোলা হউক। ছোট ছোট পল্লী লইয়া ছোট ছোট জনসঙ্ঘ লইয়া ছোট কাজ আরম্ভ করিয়া দেওয়া—তাহাতে কাহারও সহানুভূতি দেখা যায় না।

কিন্তু আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে মনে হয় এ সকল ব্যাপারে ছোট হইতে বড়তে যাওয়াই সমীচিন পন্থা—বড় হইতে ছোটতে আসা নহে।

সকল সভ্যজাতিরই ব্যক্তিগত শক্তিপুঞ্জের কেন্দ্র—সমাজ। সুতরাং সমাজ সুদৃঢ় না হইলে জাতীয় শক্তির বৃদ্ধি হয় না। রাশীকৃত বিক্ষিপ্ত শক্তিপুঞ্জ বৃথা অপব্যয়িত হয়।

আবার সমাজকে দৃঢ় করিবার উপায় সমাজের প্রতি সকলের শ্রদ্ধা ও সহানুভূতির বৃদ্ধি সাধন। সমাজ যদি তাহার অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিবৃন্দের সুখ-দুঃখের প্রতি উদাসীন হয়, তাহাদের উন্নতি অবনতি যদি সমাজের অতন্দ্রিত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আকর্ষণ না করে, তাহা হইলে সমাজের প্রতি কাহারও সমবেদনা বা শ্রদ্ধার ভাব আসিতে পারে না। সমাজের প্রতি সমাজস্থ জনসাধারণের যেমন একটা কর্ত্তব্য আছে, সমাজস্থ ব্যক্তিবৃন্দের প্রতি সমাজেরও তেমনি একটা কর্ত্তব্য আছে। যে কোন পক্ষের কর্ত্তব্যচ্যুতিই জাতীয় উন্নতির পথে বিঘ্নকর।

আজ আমরা আত্মরক্ষা-প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া নিজেদের বিক্ষিপ্ত শক্তিপুঞ্জকে সংহত করিতে গিয়া দেখিতেছি আমাদের চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত শক্তিরাশির কোন কেন্দ্র নাই। সমাজ একেবারে শক্তিহীন। এখন সমাজ-শাসন বলিয়া কোন একটা শাসনই বিদ্যমান নাই। সমাজের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া লইতে কেহই আগ্রহান্বিত নহে। ইহার কারণ কেবল সামাজিকবর্গের ত্রুটি নহে—সমাজেরও ত্রুটি।

সমাজ জনসাধারণের সুখ দুঃখ, উন্নতি-অবনতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন।

ম্যালেরিয়ার ভীষণ প্রকোপে বাঙ্গালাদেশে প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যু হইতেছে - পানীয় জলের অভাবে সহস্র সহস্র লোক হাহাকার করিতেছে, সমাজ সে বিষয়ে উদাসীন।

বিবাহের জটিল সমস্যা প্রতিদিন দরিদ্র ভদ্রসন্তানের বুকের উপর চাপিয়া বসিতেছে —কন্যাদায়ের ভীষণ বিভীষিকা দেশের

সর্ব্বত্র আতঙ্ক বিস্তার করিতেছে, সমাজ সে সম্বন্ধে দৃষ্টিহীন।

মধ্যবিত্ত ভদ্রসন্তান লেখাপড়া শিখিয়াও অন্নসংস্থানে অসমর্থ—বিকট মৃত্যু তাহার শিরপ্রান্তে দিবারাত্রি লোলুপনেত্রে চাহিয়া বসিয়া আছে—সে জন্য সমাজের উদ্বেগ নাই।

অনাথ সন্তান, ষোত্রহীনা বিধবা আশ্রয়-হীন হইয়া পথের ধূলিতে শয্যা রচনা করিতেছে—শিক্ষার অভাবে নরসন্তান দিন দিন পশুত্বের সোপানে অবতীর্ণ হইতেছে—কিন্তু সমাজ সে জন্য বিন্দুমাত্র উৎকণ্ঠিত নহে।

এরূপ সমাজের প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি, সমবেদনা কিরূপে সম্ভব?

জাতিকে শক্তিশালী করিতে গেলে সমাজকে সুদৃঢ় করার প্রয়োজন, সমাজকে সুদৃঢ় করিতে হইলে সামাজিকবৃন্দের সুখ-দুঃখের প্রতি সমাজকে অবহিত করা আবশ্যক।

কি উপায়ে এই কার্য্য সাধিত হইতে পারে? অতিরিক্ত সমারোহের সহিত একটা প্রকাণ্ড কার্য্যারম্ভ করিয়া দেওয়ার প্রতি আমাদের সহানুভূতি নাই। আমাদের মতে সংকীর্ণ পরিসরের মধ্যে ক্ষুদ্র ভাবে কার্য্য আরম্ভ করিয়া দেওয়া অধিকতর ফলপ্রদ। সমাজের প্রতি ক্ষুদ্র অংশই সমাজের অঙ্গ। সুতরাং এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশের মধ্যে কার্য্য আরম্ভ করিয়া দেওয়াই সমাজ-শরীরে শক্তিসঞ্চারের স্বাভাবিক পন্থা।

সমাজ ব্যক্তিবৃন্দের সমষ্টি মাত্র। সুতরাং সমাজের উপর একটা কাল্পনিক গৌরব ও মহত্বের আরোপ করিয়া আমাদের বক্তব্যকে কবিত্বপূর্ণ করিয়া তুলিবার ইচ্ছা আমাদের নাই।

সমাজের পক্ষ হইতে কার্য্য অর্থে সমাজের শীর্ষস্থানীয় কতকগুলি লোকের কার্য্য ভিন্ন আর কিছুই নহে। কোন দেশেই কোন সামাজিক কার্য্য সমাজের আপামর প্রত্যেকের মত লইয়া সাধিত হয় না। কতকগুলি শীর্ষস্থানীয় লোক লইয়াই সমাজের কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়।

প্রত্যেক গ্রামে বা প্রত্যেক নগরেই কতকগুলি লোক এমন আছেন যাঁহাদের সকলে সম্মান করে এবং যাঁহাদের কথা সকলে শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করে। সেই সকল লোকই সেই গ্রাম বা নগরের সমাজের প্রতিনিধি।

সুতরাং এই সকল ব্যক্তি যদি আপন ক্ষুদ্র সমাজস্থ ব্যক্তিবৃন্দের সুখ-দুঃখের প্রতি অবহিত হন,—যদি সেই গ্রামের লোকদের মধ্যে কাহারও পীড়া হইলে তাহার সুস্থতা প্রাপ্তির উপায় করিয়া দেন,—এবং ভবিষ্যতে যেরূপে শারীরিক নিয়ম পালন করিলে পীড়া হইবার সম্ভাবনা তিরোহিত হইতে পারে তাহা জানাইয়া দেন—সে গ্রামে কাহারও কন্যাদায় উপস্থিত হইলে সে যাহাতে সে দায় হইতে উদ্ধার পাইতে পারে সে জন্য আগ্রহান্বিত হন—সে গ্রামের নিরাশ্রয় বিধবার যদি অন্নসংস্থানের উপায় করিয়া দেন—সে গ্রামে কাহারও জীবিকা উপার্জ্জনের উপায় না থাকিলে তাহাদের জীবিকার উপায় নির্দ্দিষ্ট করিতে যদি যত্নবান হন—তাহা

হইলে সেখানে সমাজের বন্ধন নিশ্চয়ই সুদৃঢ় হয়।

মানুষ স্বভাবত কৃতজ্ঞ এবং মনুষ্যত্বের পূজাপরায়ণ। মহাপুরুষগণের দ্রুত সংগৃহীত শিষ্যসংখ্যা তাহার প্রমাণ।

সুতরাং যদি কেহ ত্যাগ স্বীকার করিয়া কাহারও উপকার করিতে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে তাঁহার প্রতি উপকৃত ব্যক্তি কৃতজ্ঞ হইবেই এবং এই কৃতজ্ঞতাই তাঁহাকে তাহার উপর শক্তিদান করিবে। এই অর্জ্জিত শক্তি সমাজকে শক্তিশালী করিয়া তুলিবে।

তবে ইহার মধ্যে কথা এই যে, যে সকল সামাজিক এইরূপে শক্তি অর্জ্জন করিবেন তাঁহারা অকপটে সে শক্তি সমাজকেই দান করিবেন—নিজের স্বার্থচিন্তা তাহার মধ্যে রাখিবেন না। এই কারণে ধীরে ধীরে সমাজস্থ জনসাধারণকে শিক্ষিত করিয়া তুলিবেন, এবং কোন সামাজিক কল্যাণের কার্য্য কেবলমাত্র নিজের চেষ্টায়, নিজের পরিশ্রমে ও নিজের ব্যয়ে সম্পন্ন না করিয়া সে জন্য সকলের সাহায্য প্রার্থনা করিবেন এবং সে কার্য্য যে সকলেরই কার্য্য, ইহা সকলকে বুঝাইয়া দিবেন।

ইহার জন্য সর্ব্বসাধারণের নিকট হইতে কিছু কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া পল্লীভাণ্ডার স্থাপিত করাই সদুপায়। সেই ভাণ্ডার হইতে সামাজিক-বৃন্দের অভাবমোচনের জন্য অর্থসাহায্য প্রদত্ত হইবে এবং সাহায্য-প্রদানের পূর্ব্বে যথাসম্ভব সকলের অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

এইরূপ কার্য্য আরম্ভ করিলে সহজেই সমাজকে সামাজিকবৃন্দের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের অধিকারী করিয়া তোলা যাইতে পারে। কারণ সংকীর্ণ পরিসরের মধ্যে কার্য্যকে প্রত্যক্ষীভূত করিয়া তোলা অনায়াসসাধ্য।

এইরূপে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজে শক্তি সঞ্চারিত হইলে সকলকে মিলাইয়া বৃহৎ সমাজ গঠিত করিয়া তোলা কঠিন হইবে না।

একটা প্রকাণ্ড মহান্ আদর্শ জাতির সম্মুখে থাকা কল্যাণকর সন্দেহ নাই। কিন্তু আমার বোধ হয় ছোট আদর্শের মধ্য দিয়া বৃহৎ আদর্শে পৌঁছানই স্বাভাবিক ও সহজসাধ্য। জাতীয় উন্নতির এক প্রধান অঙ্গ—জাতীয় শিক্ষার বিস্তার। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিবারের মধ্যে কার্য্য আরম্ভ হইলে লোক-শিক্ষাও অল্প সময়ের মধ্যে সংসাধিত হইবার সম্ভাবনা।

একটা উদাহরণ দিতেছি। আজিকার দিনে ভারতে না হউক বাঙ্গালাদেশের একটি অতি প্রধান সমস্যা—হিন্দুমুসলমানের বিরোধ; বাঙ্গালার লোকসংখ্যার অর্দ্ধেক মুসলমান, অর্দ্ধেক হিন্দু।

সুতরাং বাঙ্গালাদেশে এই বিরোধ বিদূরিত না হইলে বাঙ্গালার উন্নতি অসম্ভব। কংগ্রেসে, সভায়, সংবাদপত্রে এই বিরোধ বিদূরিত করিবার নানা উপায়ের কথা আলোচিত হইতেছে। কিন্তু যাহাদের লইয়া প্রকৃত বিরোধ এই সকল সভাসমিতি তাহাদের স্পর্শ করে না। বিরোধ অধিকাংশ স্থলে উভয় জাতিরই নিম্নশ্রেণী এবং অশিক্ষিতের মধ্যে। শিক্ষার বিস্তারই এই বিরোধ-ভঞ্জনের প্রকৃষ্ট উপায়। যদি প্রতি পল্লী-গ্রামে এইরূপে উভয় সম্প্রদায়ের অগ্রণীগণের

মধ্যে সদ্ভাব স্থাপিত হয় এবং তাঁহারা নিজ নিজ সমাজে প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন তাহা হইলে এই বিরোধ যত অচিরে দুরীভূত হইবে—কংগ্রেসে, সংবাদপত্রে, প্রতিনিধিনিয়োগে তত শীঘ্র হইবার কোন সম্ভাবনা নাই।

বড় কাজের আদর্শ লইয়া আমরা অনেক কালক্ষয় করিয়াছি, ছোট কাজের আরম্ভ করিয়া একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হানি কি?

শ্রীযতীন্দ্রমোহন গুপ্ত।

সূর্য্যমুখী।

বিষবৃক্ষের প্রধান চিত্র সূর্য্যমুখী। হিন্দু-পত্নীর এ আদর্শ হিন্দুর নিকট নূতন নহে, তথাপি কবিকল্পনা ও প্রতিভা ব্যতিরেকে আদর্শ এরূপে অবয়বসম্পন্ন, পূর্ণতাপ্রাপ্ত, এবং চিত্রার্পিত হইত না। মানুষের স্থূল ধারণাকে ব্যষ্টিভাবে, গুণানুভূতিকে সমষ্টি ভাবে, আধারগত ভাবে, ধ্যানের যোগ্য করিয়া, তাহাকে আকার প্রদানেও, কবির ক্ষমতার পরিচয় এবং সে ক্ষমতা যেরূপে এখানে প্রদর্শিত হইয়াছে তাহাতে তাহাকে অসাধারণ বলিতে হইবে। সাবিত্রী ও সীতা সতীর আদর্শরূপে হিন্দুসমাজে পরিচিত। সাবিত্রী পৌরাণিক, পৌরাণিক দেবদেবীর ন্যায় পূজিতা না হইলেও, হিন্দু-রমণীর নিকট বিশেষ সমাদৃতা। সীতা কেবল সমাদৃতা নহেন, জগৎলক্ষ্মীরূপে, ভগবানের অবতার রামের অর্দ্ধাঙ্গভাবে, কেবল হিন্দুরমণীর নহে, হিন্দুমাত্রেরই পূজিতা। সাবিত্রী বা সীতা, কাহাকেও কাল্পনিক চরিত্র বলিয়া হিন্দু বিশ্বাস করে না। সূর্য্যমুখী আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের চিত্র, পৌরাণিকত্বের গৌরববিহীনা মানবী, তাহাও আবার প্রকৃতাস্তিত্বের আখ্যানগতা নহেন। সাবিত্রী সতীত্বের বলে যমের নিকট মৃত পতির জীবন ফিরাইয়া পাইয়াছিলেন, হিন্দুরমণী স্বামীর জীবনে ভাগ্যবতী, বৈধব্য তাহার নিকট ভাগ্যহীনতার শেষাবস্থা, তাই হিন্দুরমণী সাবিত্রীব্রত গ্রহণ করে। রমণীর নিকট সাবিত্রীর যেরূপ প্রভাব, পুরুষের নিকট সেরূপ নহে। সীতা জগৎলক্ষ্মীরূপে স্ত্রীপুরুষ সকলেরই আরাধ্যা। পত্নীত্বের আদর্শরূপেও সীতার আদর্শ কম সমাদরের নহে। সীতার সে সমাদর সাহিত্যজ্ঞের নিকটেই বিশেষভাবে, সকলের নিকট তুল্যরূপে নহে। সাবিত্রী মূলে সাহিত্যের চরিত্ররূপে পরিচিতই নহে। এখন সাবিত্রীর পৌরাণিকত্ব, সীতার দেবতার অবতাররূপিণীত্ব বাদ দিয়া, যদি সাবিত্রী, সীতা, ও সূর্য্যমুখী, তিনকেই কল্পিতচরিত্র ও আদর্শভাবে তুলনা করা যায়, কাহাকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিতে হইবে, বলা সহজ নহে। সাবিত্রীর সতীত্বের বলে যে মহদদৃষ্ট লাভ হইয়াছিল, তাহাই সকলের নিকট বিদিত; পত্নীত্বের, বিশেষ পতিভক্তি ও পতিসেবার কার্য্য কি তাঁহার জীবনকে অলঙ্কৃত করিয়াছিল, তাহা আমরা অবগত

নহি, বা আমরা সেরূপ কিছুর সহিত সংশ্লিষ্ট করিয়া সাবিত্রী-চরিত্রের ধ্যান করি না। জগৎলক্ষ্মীরূপে সীতা, চরিত্রসমালোচনার—গণ্ডীতে তাঁহার স্থান কত উচ্চে এরূপ: তর্ক-মীমাংসার;—অতীত, কেননা জগৎলক্ষ্মী যিনি তিনি সর্ব্ব প্রকারেই আদর্শস্থানীয়া, সাহিত্যের চরিত্ররূপেই কেবল আমরা সেরূপ আলোচনা করিবার অধিকারী। সে ভাবেও সীতা নিতান্ত সাধারণাদর্শ নহেন। স্বামীকর্ত্তৃক নির্ব্বাসিতা হইয়াও, যে সীতা লক্ষ্মণকে গৃহে প্রত্যাগত হইয়া তাঁহার বিরহে কাতর স্বামীকে সান্ত্বনা প্রদান করিতে আগ্রহাতিশয় সহকারে অনুরোধ করিয়াছিলেন, সে সীতার পতিপ্রেম ও পতিপ্রীতি-কামতা যদি চরমোৎকর্ষের দৃষ্টান্ত না হইবে, তবে সেরূপ দৃষ্টান্তের কল্পনা আর কিরূপ হইতে পারে? কিন্তু জনকদুহিতা জানিতেন তাঁহার নির্ব্বাসন পতির স্নেহের অভাব হইতে সংঘটিত হয় নাই, স্বামী রাজধর্ম্ম-প্রতিপালন তৎপর হইয়া,প্রজারঞ্জনানুরোধে, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। আর বঙ্গের কবির কল্পিতা সতী, তাঁহার পতিপ্রেম ও পতিপ্রাণতার আদর্শ, নিজের ভাগ্যহীনতা জানিয়াও, তাঁহার হৃদয়সর্ব্বস্ব, তাঁহার জীবনের একমাত্রাবলম্ব স্বামীকে অন্যে নিরত দেখিয়াও, ক্ষণমাত্র কালের জন্যও পতিভক্তি ও পতিসেবায় শিথিলমনাঃ হয়েন নাই। প্রত্যুত, সেই স্বামীর সন্তোষের জন্য, আপনার উদ্যোগে, তাঁহার অভীপ্সিত পাত্রীর সহিত সম্মিলিত করিয়া, আত্ম-বলিদানে প্রবৃত্তা হইয়াছেন। এখানেও কি বঙ্কিমচন্দ্র চিরপরিচিত আদর্শ অতিক্রম করিয়া উচ্চে আরোহণ করেন নাই? ভ্রমরের পতিপ্রেমও, তাঁহার আজীবন দুঃখের সহিত সমসময়বর্ত্তী হইয়া, পতির পতিত্ব-লোপের পরেও সমানভাবে বিদ্যমান থাকিয়া, আদর্শ পতিপ্রেমের দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছে, কিন্তু তাঁহার বাহ্যিক বিরাগের ভাব, বালিকাস্বভাবসম্ভূত হইলেও, সূর্য্যমুখীর আদর্শের উচ্চত্বে উঠিতে তাঁহাকে বাধা প্রদান করিয়াছে। সূর্য্যমুখী একদিন স্বামীসমক্ষে, স্বামীনিগ্রহদুঃখকাতর হৃদয়ে, অশ্রুমোচন করিয়া স্বামীর অসন্তোষের কারণ হইয়াছিলেন বলিয়া, দুঃখে হৃদয় বিদীর্ণ হইলেও, আর স্বামীসমক্ষে অশ্রুপাত করিতেন না, আত্মধারণে অসমর্থা হইলে দূরে গিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়া আসিতেন। সর্ব্বথা সকল অবস্থায়, স্বামীসুখ ও স্বামী-সন্তোষের ধ্যানরতা এরূপ রমণীরত্ন সাহিত্য-জগতে আমরা আর কুত্রাপি দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। আমরা ভ্রমরকেও আদর্শ হিন্দুরমণী বলিয়াছি, তাঁহার আদর্শ পতিপ্রেমের কথা ভাবিয়া, কিন্তু আভ্যন্তরীণ প্রকৃতির সহিত বাক্য ও ব্যবহারের ভেদরাহিত্যভাবে ভ্রমর সূর্য্যমুখীর অনেক নিম্নে, সূর্য্যমুখী স্বামীর তুলনায় আপনি যে কেহ ইহা কখনও মনে করিতেন না, ভ্রমরে আত্মস্বত্ববোধ ছিল বলিয়া তিনি সেরূপ আত্মবিলোপনে সমর্থা হয়েন নাই।

কমলমণি, সূর্য্যমুখী ও নগেন্দ্রনাথ, তিন জনে মিলিয়া, তারাচরণের সহিত কুন্দের বিবাহে উদ্যোগী হইয়া, কিরূপে বিষবীজ রোপণ করিয়াছিলেন, কবি তৎসম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন, বলিয়াছেন ভবিষ্যৎসম্বন্ধে

মানুষের চিরান্ধতাবশতই এরূপ হইয়া থাকে। কিন্তু এরূপ চিরান্ধতা যে অবাঞ্ছনীয় এ কথা বলিতে পারি না। ভবিষ্যৎ-জ্ঞানের অভাব না থাকিলে, মানুষে ভবিষ্যৎ দুর্ভাগ্য নিরাকরণ জন্য উপায়াবলম্বনে সমর্থ হইত, বা কার্য্যবিশেষ, যাহা সে দুর্ভাগ্যের কারণস্বরূপ, তাহা হইতে বিরত থাকিয়া, তাহা পরিহার করিতে পারিত। কিন্তু নগেন্দ্র বা সূর্য্যমুখীর ব্যক্তিগত দুঃখের চিন্তায় অভিভূত না হইয়া, সমাজের মঙ্গলামঙ্গল চিন্তা করিয়া দেখিলে নগেন্দ্র-সূর্য্যমুখীর ওরূপ দুঃখের অধীন না হওয়া যে বাঞ্ছনীয় তাহা বলিতে পারি না। দুঃখ ও দুর্ভাগ্যই অনেক সময়ে চরিত্র-মহত্বের ভিত্তিস্বরূপ, উপায়স্বরূপ, হইয়া, চরিত্রোৎকর্ষের বিকাশ সাধন করে, মনুষ্যসমাজ সে উৎকর্ষের দৃষ্টান্তে উন্নতি লাভ করিয়া অধিকতর সুখসৌন্দর্য্যের অধিকারী হয়। সূর্য্যমুখীর পত্নীত্বের মহত্ত্ববিকাশ জন্য তাঁহার দুর্ভাগ্যের প্রয়োজন হইয়াছিল এবং নগেন্দ্রের সাময়িক চিত্তবিভ্রম, তাঁহার সাময়িক চরিত্রচ্যুতি, ব্যতীত অন্যরূপে সে সৌন্দর্য্যবিকাশ সম্ভাবিত হইত না। নগেন্দ্রেরও ভার্য্যাপ্রেমের অকৃত্রিমত্ব, এই ঘটনা দ্বারা, প্রকাশ লাভ করিয়াছে। বেগবতী স্রোতস্বতীর স্রোতাভ্যন্তরে প্রতিবন্ধকস্বরূপ দণ্ডায়মান শৈলস্তম্ভ যেমন সে স্রোতবেগের শক্তি প্রমাণ করে, কুন্দপ্রেমরূপ শৈল সেইরূপ নগেন্দ্রের ভার্য্যানুরাগের প্রাবল্যের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া, সে অনুরাগের প্রকৃত প্রবাহ প্রদর্শিত করিয়াছে। মনুষ্যসমাজ ইহাদের ব্যক্তিগত দুঃখ ও দুর্ভাগ্য দ্বারা লাভবান হইয়াছে। অতএব ইঁহাদের জীবনের ঘটনা অন্যরূপ-হইবার ইচ্ছার কোন প্রকৃষ্ট কারণ দেখা যায় না। তবে যাঁহাদের জীবন আমাদের এত বিমল সুখের বিধান করিতেছে, যাঁহাদের দৃষ্টান্ত আমাদিগকে উচ্চতর করিয়া তুলিতেছে, তাঁহাদের দুঃখে দুঃখবোধ আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক। বোধ হয় এরূপ চিন্তা করিলেই আমাদের সে দুঃখের নিরাকরণ হইবে যে, এই সাময়িক দুঃখ দ্বারা নগেন্দ্র-সূর্য্যমুখীও একভাবে লাভ প্রাপ্ত হইয়াছেন। নগেন্দ্র বুঝিয়াছেন সূর্য্যমুখী তাঁহার কি দরের জিনিস, সূর্য্যমুখী দেখিয়া সুখী হইয়াছেন কুন্দপ্রেমরূপ অনলে দগ্ধ হইয়া তাঁহার স্বামীর ভালবাসা কিরূপ খাঁটি সোণা বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। উভয়েই পুনর্ম্মিলনে তাঁহাদের দাম্পত্যসুখের অভিনবত্ব অনুভব করিয়াছেন এবং উভয়েই অতিসুন্দর ভাবে, কবির অপূর্ব্ব কৌশলক্রমে, এ কথার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। স্থানান্তরে সে কৌশলের ব্যাখ্যা আমরা করিয়াছি, শয্যাগৃহের দৃশ্যে সূর্য্যমুখীর সরলতামূলক চরিত্রসৌন্দর্য্য কিরূপ অপূর্ব্ব ভাবে প্রকাশ লাভ করিয়াছে তাহা আমরা দেখাইয়াছি, তাহার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

যাহার যেরূপ প্রকৃতি তাহার কথায় ও কার্য্যে সর্ব্বত্র তাহা প্রতিবিম্বিত দেখিতে পাওয়া যায়। সূর্য্যমুখী-চিত্রে কবি সর্ব্বত্রই গাম্ভীর্য্যের রেখাপাত করিয়াছেন। সর্ব্বস্থলে সকলের সহিত ঘনিষ্ঠতা গাম্ভীর্য্যবিরোধী, বোধ হয় যে গম্ভীর সে স্বভাবতঃ কিছু গর্ব্বিতও হইয়া থাকে। এরূপ গর্ব্বিত ভাব সূর্য্যমুখীরও ছিল, তাই তিনি তাঁহার

গৃহে প্রতিপালিত পৌরনারী-সম্প্রদায়ে বড় বসিতেন না। আবার, তিনি থাকিলে সকলের আমোদের বিঘ্ন হইত, সকলেই তাঁহাকে ভয় করিত, তাঁহার নিকট মন খুলিয়া সকল কথা চলিত না। তিনি অকস্মাৎ পৌরস্ত্রীগণের মধ্যে উপস্থিত হইলে, বাজে কথা একেবারে বন্ধ হইত, অল্পবয়স্কারা সকলেই একটা একটা কাজ লইয়া বসিত। এইরূপে, কৌশলবহুল কবি, তাঁহার প্রতি অন্যের সসম্ভ্রম ব্যবহার দ্বারা, তাঁহার চিত্রে চরিত্র-গাম্ভীর্য্যের রেখা স্পষ্টতর করিয়াছেন। রহস্যেও সূর্য্যমুখীর এই প্রকৃতি প্রতিভাত হইত। সাধারণ রহস্য তিনি জানিতেন না, ব্যঙ্গোক্তি করিতে গেলেও তাহাতে প্রকৃতি-গাম্ভীর্য্যের ছায়া পড়িত। স্বামীর সঙ্গে কমলের রহস্যালাপ স্মরণ করিলে, স্বামীর অনুপস্থিত কালে স্বামী-সন্দর্শন জন্য কমলের চাঞ্চল্যের সহিত সূর্য্যমুখীর সেরূপ স্থলে ধ্যানগত মনঃক্লেশের তুলনা করিলে, এ কথা বিশেষ হৃদয়ঙ্গম হইবে। নগেন্দ্রনাথ কলিকাতায়, কুন্দকে লইয়া কমলের বাড়ী উপস্থিত হইয়াছেন, কুন্দের খবর সূর্য্যমুখীকেও জানাইয়াছেন। সূর্য্যমুখী প্রত্যুত্তরে কুন্দ-নগেন্দ্র সম্বন্ধে দুই একটি রহস্যোক্তি করিয়া, তারাচরণের সহিত কুন্দের বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছেন। সে পত্রের আরম্ভ এইরূপ :— "দাসী শ্রীচরণে কি অপরাধ করিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। কলিকাতায় যদি তোমার এত দিন থাকিতে হইবে, তবে আমি কেনই বা নিকটে গিয়া পদসেবা না করি?" প্রকৃতই তিনি দাসীভাবে স্বামীর চরণসেবার জন্য সর্ব্বদা ব্যগ্র থাকিতেন। সাময়িক স্বামীবিরহে এই খানে তাঁহারও যে হৃদয়ব্যথা, শ্রীশচন্দ্রের কর্ম্মস্থান হইতে আসিতে বিলম্ব হইলে কমলও হৃদয়ে সেইরূপ অস্থিরতাই অনুভূত করিতেন; কিন্তু কমলের সে হৃদয়ক্লেশ, প্রস্ফুরণের প্রণালী ভিন্ন, তাহা তাঁহার নিজ প্রকৃতির উপযোগী। এরূপ স্থলে তিনি খোকা বাবুকে মধ্যস্থ করিয়া কতই না তারল্য প্রকাশ করিয়াছেন। স্থলান্তরে, নগেন্দ্রগৃহে, পৌরস্ত্রীগণের প্রাঙ্গণে, হরিদাসী বৈষ্ণবীর গান শ্রবণ করিয়া, কমলমণি ভ্রূভঙ্গি করিয়া বলিতেছেন, "বৈষ্ণবী দিদি—তোমার মুখে ছাই পড়ুক—আর তুমি মর। আর কি গান জান না?" আবার, "একটা বাবলার ডাল আন ত রে—কাঁটাফোটা কত সুখ মাগীকে দেখিয়ে দিই।" সেই স্থলে, সূর্য্যমুখী মৃদুভাবে হরিদাসীকে বলিলেন, "ও সব গান আমাদের ভাল লাগে না—গৃহস্থবাড়ী ভাল গান গাও।" সূর্য্যমুখী গৃহিণী, গৃহিণীর গাম্ভীর্য্যের সহিত বৈষ্ণবীকে এ উপদেশ প্রদান করিলেন। আর চিরপ্রেমময়ী, চিরপ্রফুল্লহৃদয়া ও চির-রহস্যপ্রিয় কমলের তিরস্কারের মধ্য দিয়া তাঁহার সেই চিরপ্রেমিকতার, সকলের প্রতি সেই সপ্রেম ব্যবহারের, প্রতিবিম্ব দেখা গেলেও, তাহার সহিত তাঁহার প্রকৃতি-গত অথচ সৌন্দর্য্যজড়িত চাপল্য প্রদৃশ্যমান। তরুণী ভ্রমরেও এ চাপল্য ছিল, তাহা কতকাংশে কমলের চাপল্যের সহিত এক-প্রকৃতিক, কিন্তু অতসিতা এবং সর্ব্বত্রিক নহে, অনেকটা সংযতভাবাপন্ন। সূর্য্যমুখীর এই প্রকৃতিগত গাম্ভীর্য্যের যদি কখনও বিচ্যুতি ঘটিয়া থাকে, তবে সে কুন্দের স্নেহে,

কুন্দনন্দিনীর প্রতি তাঁহার পরুষ ব্যবহারে। এ স্থলে তাঁহার এরূপ ভ্রান্তির অতি স্বাভাবিক কারণও ছিল সে কারণের অতিক্রম, অতিমানুষিক চিত্তশক্তি-প্রকাশক হইলেও, বুঝি বা পতিগতপ্রাণার প্রকৃতিবিরুদ্ধ হইত। স্বামী কর্তৃক এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইয়া, এই রমণীরত্ন আপনার হৃদয়সৌন্দর্য্যের যে পট বিকাশ করিয়াছেন, সে দৃশ্য আমরা এখানে উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না;—সূর্য্যমুখীকে নিভৃতে লইয়া গিয়া নগেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি হীরাকে বিদায় দিয়াছ?" সূর্য্যমুখী বলিলেন, "দিয়াছি।" অনন্তর হীরা ও কৌশল্যার বৃত্তান্ত সবিশেষ বিবৃত করিলেন। শুনিয়া নগেন্দ্র বলিলেন, "মরুক্। তুমি কুন্দনন্দিনীকে কি বলিয়াছিলে?"

নগেন্দ্র দেখিলেন, সূর্য্যমুখীর মুখ শুকাইল, সূর্য্যমুখী অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "কি বলিয়াছিলাম?"

নগেন্দ্র। কোন কুর্ব্বাক্য?

সূর্য্যমুখী কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। পরে যাহা বলা উচিত, তাহাই বলিলেন।

বলিলেন, "তুমি আমার সর্ব্বস্ব। তুমি আমার ইহকাল, তুমি আমার পরকাল। তোমার কাছে কেন আমি লুকাইব? কখনও কোন কথা তোমার কাছে লুকাই নাই, আজ কেন একজন পরের কথা তোমার কাছে লুকাইব? আমি কুন্দকে কুকথা বলিয়াছিলাম। পাছে তুমি রাগ কর বলিয়া তোমার কাছে ভরসা করিয়া বলি নাই। অপরাধ মার্জ্জনা করিও। আমি সকল বলিতেছি।"

তখন সূর্য্যমুখী হরিদাসী বৈষ্ণবীর পরিচয় হইতে কুন্দনন্দিনীর তিরস্কার পর্য্যন্ত অকপটে সকল বিবৃত করিলেন। বলিয়া শেষ কহিলেন, আমি কুন্দনন্দিনীকে তাড়াইয়া আপনার মরমে আপনি মরিয়া আছি, দেশে দেশে তাহার তত্ত্বে লোক পাঠাইয়াছি। যদি সন্ধান পাইতাম, ফিরাইয়া আনিতাম। আমার অপরাধ লইও না।"

নগেন্দ্র তখন বলিলেন, "তোমার বিশেষ অপরাধ নাই, তুমি যেরূপ কুন্দের কলঙ্ক শুনিয়াছিলে, তাহাতে কোন্ ভদ্রলোকের স্ত্রী তাহাকে মিষ্ট কথা বলিবে, কি ঘরে স্থান দিবে? কিন্তু একবার ভাবিলে ভাল হইত যে, কথাটা সত্য কি না?"

সূর্য্য। তখন সে কথা ভাবি নাই। এখন ভাবিতেছি।

ন। ভাবিলে না কেন?

সূর্য্য। আমার মনের ভ্রান্তি জন্মিয়াছিল, বলিতে বলিতে সূর্য্যমুখী—পতিপ্রাণা সাধ্বী নগেন্দ্রের চরণপ্রান্তে ভূতলে উপবেশন করিলেন, এবং নগেন্দ্রের উভয় চরণ দুই হস্তে গ্রহণ করিয়া নয়নজলে সিক্ত করিলেন। তখন মুখ তুলিয়া বলিলেন, "প্রাণাধিক তুমি। কোন কথা এ পাপ মনের ভিতর থাকিতে তোমার কাছে লুকাইব না। আমার অপরাধ লইবে না?"

নগেন্দ্র বলিলেন, "তোমায় বলিতে হইবে না। আমি জানি, তুমি সন্দেহ করিয়াছিলে যে, আমি কুন্দনন্দিনীতে অনুরক্ত।"

সূর্য্যমুখী নগেন্দ্রের যুগলচরণে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। আবার সেই শিশিরসিক্ত কমলতুল্য ক্লিষ্ট মুখমণ্ডল উন্নত

করিয়া, সর্ব্বদুঃখাপহারী স্বামিমুখ প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "কি বলিব তোমায়? আমি যে দুঃখ পাইয়াছি তাহা কি তোমায় বলিতে পারি? মরিলে পাছে তোমার দুঃখ বাড়ে এই জন্য মরি নাই। নহিলে যখন জানিয়াছিলাম, অন্য তোমার হৃদয়ভাগিনী, আমি তখন মরিতে চাহিয়াছিলাম। মুখের মরা নহে, যেমন সকলে মরিতে চাহে, তেমন মরা নহে; আমি যথার্থ আন্তরিক অকপটে মরিতে চাহিয়াছিলাম। আমার অপরাধ লইও না।"

নগেন্দ্র অনেকক্ষণ স্থির ভাবে থাকিয়া, শেষ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "সূর্য্যমুখি! অপরাধ সকলই আমার। তোমার অপরাধ কিছুই নাই। আমি যথার্থই তোমার নিকট বিশ্বাসহন্তা, যথার্থই আমি তোমাকে ভুলিয়া কুন্দনন্দিনীতে—কি বলিব? আমি যে যন্ত্রণা পাইয়াছি, যে যন্ত্রণা পাইতেছি, তাহা তোমাকে কি বলিব? তুমি মনে করিয়াছ, আমি চিত্তদমনের চেষ্টা করি নাই; এমত ভাবিও না। আমি যত আমাকে তিরস্কার করিয়াছি, তুমি কখনও তত তিরস্কার করিবে না। আমি পাপাত্মা, আমার চিত্ত বশ হইল না

সূর্য্যমুখী আর সহ্য করিতে পারিলেন না, যোড়হাত করিয়া কাতরস্বরে বলিলেন, "যাহা তোমার মনে থাকে, থাক্—আমার কাছে আর বলিও না। তোমার প্রতি কথায় আমার বুকে শেল বিঁধিতেছে। আমার অদৃষ্টে যাহা ছিল, তাহা ঘটিয়াছে—আর শুনিতে চাহি না। এ সকল আমার অশ্রাব্য।"

"না, তা নয়, সূর্য্যমুখি! আরও শুনিতে হইবে। যদি কথা পাড়িলে, তবে মনের কথা ব্যক্ত করিয়া বলি, কেননা, অনেক দিন হইতে বলি বলি করিতেছি। আমি এ সংসার ত্যাগ করিব। মরিব না, কিন্তু দেশান্তরে যাইব। বাড়ী ঘর সংসারে আর সুখ নাই। তোমাতে আমার আর সুখ নাই, আমি তোমার অযোগ্য স্বামী। আমি আর কাছে থাকিয়া তোমায় ক্লেশ দিব না। কুন্দনন্দিনীকে সন্ধান করিয়া আমি দেশ-দেশান্তরে ফিরিব। তুমি এ গৃহে গৃহিণী থাক। মনে মনে ভাবিও, তুমি বিধবা—যাহার স্বামী এরূপ পামর, সে বিধবা নয় ত কি? কিন্তু আমি পামর হই আর যাই হই, তোমাকে প্রবঞ্চনা করিব না। আমি অন্যাগতপ্রাণ হইয়াছি, সে কথা তোমাকে স্পষ্ট বলিব; এখন আমি দেশত্যাগ করিয়া চলিলাম। যদি কুন্দনন্দিনীকে ভুলিতে পারি, তবে আবার আসিব, নচেৎ তোমার সঙ্গে এই সাক্ষাৎ।"

এই শেলসম কথা শুনিয়া সূর্য্যমুখী কি বলিলেন? কয়েক মুহূর্ত্ত প্রস্তরময়ী মূর্ত্তিবৎ পৃথিবীপানে চাহিয়া রহিলেন। পরে সেই ভূতলে অধোমুখে শুইয়া পড়িলেন। মাটীতে মুখ লুকাইয়া সূর্য্যমুখী কাঁদিলেন কি? হত্যাকারী ব্যাঘ্র যেরূপ হতজীবের যন্ত্রণা দেখে, নগেন্দ্র সেইরূপ স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলেন। মনে মনে বলিতেছিলেন, সেই ত মরিতে হইবে—তার আজ কাল কি? জগদীশ্বরের ইচ্ছা আমি কি করিব? আমি কি মনে করিলে ইহার প্রতিকার করিতে পারি? আমি

মরিতে পারি, কিন্তু তাহা.ত সূর্য্যমুখী বাঁচিবে ?”

*　　*　　*　　*

দণ্ডেক পরে সূর্য্যমুখী উঠিয়া বসিলেন, আবার স্বামীর পায় ধরিয়া বলিলেন, “এক ভিক্ষা।”

ন। কি ?

সূ। আর এক মাস মাত্র গৃহে থাক। ইতিমধ্যে যদি কুন্দনন্দিনীকে না পাওয়া যায়, তবে তুমি দেশত্যাগ করিও। আমি মানা করিব না।

নগেন্দ্র মৌনভাবে বাহির হইয়া গেলেন। মনে মনে আর এক মাস থাকিতে স্বীকার করিলেন। সূর্য্যমুখীও তাহা বুঝিলেন। তিনি গমনশীল নগেন্দ্রের মূর্ত্তি প্রতি চাহিয়াছিলেন। সূর্য্যমুখী মনে মনে বলিতেছিলেন, “আমার সর্ব্বস্ব ধন! তোমার পায়ের কাঁটাটি তুলিবার জন্য প্রাণ দিতে পারি। তুমি পাপ সূর্য্যমুখীর জন্য দেশত্যাগী হইবে ? তুমি বড় না আমি বড় ?”—

এরূপ আত্মবিলোপকারী পতিভক্তি প্রকৃত জীবনে কমই দেখিতে পাওয়া যায়। সাহিত্যজগতেও পত্নীত্বের এরূপ আদর্শ-কল্পনা অধিক আছে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। অতঃপর সূর্য্যমুখী কুন্দনন্দিনীকে অন্তঃপুরোস্থানে দেখিতে পাইয়া, “কুন্দ! এসো—দিদি এসো। আর আমি তোমায় কিছু বলিব না।” এই বলিয়া, তাহার হস্তধারণ পূর্ব্বক, অন্তঃপুর মধ্যে লইয়া গেলেন ; লইয়া গিয়া, স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া, বিধবাবিবাহের বৈধত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ হইলেও, স্বামীর ইচ্ছানুসরণ করিয়া, স্বামীর প্রীত্যর্থে, তাঁহার সহিত কুন্দনন্দিনীর বিবাহকার্য্য সম্পন্ন করিয়া, আ ত্মবলিদানের পরিসমাপ্তি সম্পাদন করিলেন সূর্য্যমুখী, তাঁহার পতিভক্তির এই আত্মা লাপকারী প্রকৃতিবশতই, বিধবাবিবাহের বৈধত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। পতির প্রীতিবিধান পত্নীজীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া যিনি জানিতেন, যাঁহার পতিপ্রেমের অর্থ পতির প্রতি প্রাণপণ ভালবাসা, পতির সুখসন্তোষের জন্য আত্মবিসর্জ্জন, তিনি যে বিধবাবিবাহ-বিধানকর্ত্তার পাণ্ডিত্যে সন্দিহান হইবেন, ইহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি ? তাঁহার এ সন্দেহ সাধারণ হিন্দুপত্নীর বিধবাবিবাহসম্বন্ধে মত প্রকাশ নহে, ইহা তাঁহার পতিপ্রেমের প্রকৃতি ও গভীরত্ব-ব্যঞ্জক। কবি এই সাধারণ কথাটি সূর্য্যমুখীর মুখে তুলিয়া, তাঁহার পতিপ্রেমের ও পতিভক্তির সেই অনির্ব্বচনীয় নিত্যত্ব ও অবিচলিত ভাব প্রকটিত করিয়া, অল্প বা সাধারণ কথায় গূঢ়ার্থ সূচনার ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছেন। এ নূতন বিবাহের সংবাদ সূর্য্যমুখী কমলমণিকে লিখিয়াছিলেন। কমল অতি ব্যস্ত হইয়া শ্রীশচন্দ্রকে লইয়া গোবিন্দপুরে যাত্রা করিলেন—ভ্রাতা নগেন্দ্রনাথ যে কুন্দনন্দিনীকে বিবাহ করিয়া সূর্য্যমুখীর প্রাণহন্তা হইতে বসিয়াছেন, এ কথা তাঁহাকে বুঝাইয়া, যদি এখনও বিবাহ সম্পন্ন না হইয়া থাকে, এরূপ কার্য্য হইতে তাঁহাকে নিবৃত্ত করিবার আশয়ে। কমল জানিতেন স্বামীই সূর্য্যমুখীর সর্ব্বস্ব, স্বামীই সূর্য্যমুখীর জীবন, সূর্য্যমুখীর পক্ষে সে স্বামীকে অন্যে অর্পণ

করিবার উদ্যোগের অর্থ আত্মবিনাশে সংকল্প। তাই কমল, যে সতীশচন্দ্রের মুখ দেখিলে আর সকল কার্য্য ভুলিয়া যাইতেন, সেই সতীশচন্দ্রকে পশ্চাতে ফেলিয়া, অতি উৎকণ্ঠিত চিত্তে গোবিন্দপুরের বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন; প্রবেশ করিয়া সাহসশূন্য হৃদয়ে সূর্য্যমুখীর সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন, ভয় যদি কেহ বলিয়া ফেলে নগেন্দ্রের সহিত কুন্দনন্দিনীর বিবাহ দিয়া সূর্য্যমুখী প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। কমল সত্যই ভাবিয়াছিলেন। সূর্য্যমুখী প্রাণত্যাগের সংকল্পই করিয়াছিলেন, আত্মহত্যার দ্বারা নহে, কারণ আত্মহত্যা সেরূপ ধীর, গম্ভীর, সহিষ্ণু-প্রকৃতির পক্ষে অস্বাভাবিক হইত। সূর্য্যমুখী গৃহত্যাগ করিয়া, শারীরিক ক্লেশ, অনশনাদি দ্বারা জীবনশেষের অভিপ্রায় করিয়াছিলেন। বুঝি বা আত্মহত্যা করিয়া, স্বামীর মুখকান্তি দর্শনের, স্বামীর চরণসেবার, আশা হইতে একেবারে চিরদিনের জন্য বঞ্চিত হইবার অবস্থার সহিত নিজের হৃদয়কে মিলিত করিতে পারেন নাই। তাঁহার এরূপে আজীবনদুঃখভোগে আত্মোৎসর্গের মূলে স্ত্রীসুলভ অভিমান থাকিয়া থাকিলে, কবি বোধ হয় ইহাও দেখাইতে চাহেন যে, সে অভিমান তাঁহার পতি-সেবার লালসাকে পরাজিত করিতে পারে নাই; অন্য দিকে, সে ভাবের অনুগামী হইয়া গৃহত্যাগ করায়, অন্যকে স্বামী দান করিয়া সে অবস্থা সহ্য করিবার অক্ষমতা প্রদর্শিত হইয়া পতিময়জীবিতার, পতিসর্ব্বস্ব রমণীর, চরিত্রের সঙ্গতি বা স্বাভাবিকত্ব রক্ষিত হইয়াছে। কেবল তাহাই নহে। আপন স্বামীতে সূর্য্যমুখীর এত স্বার্থ ছিল বলিয়াই, স্বামীর প্রীত্যর্থে সে স্বার্থত্যাগে তাঁহার এত মহত্ত্ব। কমলমণি সূর্য্যমুখীর শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়া সূর্য্যমুখীকে এক রুদ্ধ গবাক্ষসন্নিধানে অধোবদনে বসিয়া দেখিলেন। পরে সূর্য্যমুখী উঠিয়া নিকটে আসিলে দেখিলেন, "সূর্য্যমুখীর কাঁধের হাড় উঠিয়া পড়িয়াছে, নবদেবদারুতুল্য সূর্য্যমুখীর দেহতরু ধনুকের মত ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, সূর্য্যমুখীর প্রফুল্ল পদ্মপলাশ চক্ষু কোটরে পড়িয়াছে, সূর্য্যমুখীর পদ্মমুখ দীর্ঘাকৃত হইয়াছে।" ইহা দেখিয়া বুঝিতে বাকি থাকিল না যে বিবাহ হইয়া গিয়াছে। তখন সূর্য্যমুখী কমলের কোলে মাথা লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন, কমলের চক্ষের জলে সূর্য্যমুখীর বক্ষ ও কেশ সিক্ত করিতে লাগিল। পরে উভয়ে কথোপকথনে সমর্থা হইলে, এইরূপ কথোপকথন হইল।—

কমল। এ বিবাহ তোমার যত্নেই হইয়াছে—কেন তুমি আপনার মৃত্যুর উদ্যোগ আপনি করিলে?

সূর্য্যমুখী হাসিয়া বলিলেন, "আমি কে?"—মৃদু ক্ষীণ হাসি হাসিয়া উত্তর করিলেন—বৃষ্টির পর আকাশ প্রান্তে ছিন্নমেঘে যেমন বিদ্যুৎ হয়, সেইরূপ হাসি হাসিয়া উত্তর করিলেন "আমি কে? একবার তোমার ভাইকে দেখিয়া আইস—সে মুখভরা আহ্লাদ দেখিয়া আইস;—তখন জানিবে তিনি আজ কত সুখে সুখী। তাঁহার এত সুখ যদি আমি চক্ষে দেখিলাম, তবে কি আমার জীবন সার্থক হইল না? কোন্ সুখের

আশায় তাঁকে অসুখী রাখিব? তাঁহার এক দণ্ডের অসুখ দেখিলে মরিতে ইচ্ছা করে। দেখিলাম. দিবারাত্র তাঁর মর্ম্মান্তিক অসুখ—তিনি সকল সুখ বিসর্জ্জন দিয়া দেশত্যাগী হইবার উদ্যোগ করিলেন—তবে আমার সুখ কি হইল? বলিলাম 'প্রভু! তোমার সুখই আমার সুখ—তুমি কুন্দকে বিবাহ কর—আমি সুখী হইব'—তাই বিবাহ করিয়াছেন।"

কমল। আর তুমি সুখী হইয়াছ?

সূর্য্য। আবার আমার কথা কেন জিজ্ঞাসা কর? আমি কে? যদি কখনও স্বামীর পায়ে কাঁকর ফুটিয়াছে দেখিয়াছি, তখনই মনে হইয়াছে যে, আমি ঐখানে বুক পাতিয়া দেই নাই কেন, স্বামী আমার বুকের উপর পা রাখিয়া যাইতেন

বলিয়া সূর্য্যমুখী ক্ষণকাল নীরবে রহিলেন—তাঁহার চক্ষের জলে বসন ভিজিয়া গেল—পরে সহসা মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কমল, কোন্ দেশে মেয়ে হলে মেরে ফেলে?"

কমল মনের ভাব বুঝিয়া বলিলেন, "মেয়ে হলেই কি হয়? যার যেমন কপাল, তার তেমনি ঘটে।"

সূ। আমার কপালের চেয়ে কার কপাল ভাল? কে এমন ভাগ্যবতী? কে এমন স্বামী পেয়েছে? রূপ, ঐশ্বর্য্য, সম্পদ, সে সকলও তুচ্ছ কথা—এত গুণ কার স্বামীর? আমার কপাল, জোর কপাল—তবে কেন এমন হইল?

কমল। এও কপাল!

সূ। তবে এ জ্বালায় মন পোড়ে কেন?

কমল। তুমি স্বামীর আজিকার আহ্লাদপূর্ণ মুখ দেখিয়া সুখী—তথাপি বলিতেছ, এ জ্বালায় মন পোড়ে কেন? দুই কথাই কি সত্য?

সূ। দুই কথাই সত্য। আমি তাঁর সুখে সুখী—কিন্তু আমায় যে তিনি পায়ে ঠেলিলেন, আমায় পায়ে ঠেলিয়াছেন বলিয়াই তাঁর এত আহ্লাদ!—

সূর্য্যমুখী আর বলিতে পারিলেন না, কণ্ঠ রুদ্ধ হইল—চক্ষু ভাসিয়া গেল, কিন্তু সূর্য্যমুখীর অসমাপ্ত কথার মর্ম্ম কমলমণি সম্পূর্ণ বুঝিয়াছিলেন। বলিলেন, "তোমায় পায়ে ঠেলেছেন বলে, তোমার অন্তর্দাহ হইতেছে। তবে কেন বল, আমি কে? তোমার অন্তঃকরণের আধখানা আজও আমিতে ভরা; নহিলে আত্মবিসর্জ্জন করিয়াও অনুতাপ করিবে কেন?"

সূ। অনুতাপ করি না। ভালই করিয়াছি, ইহাতে আমার কোন সংশয় নাই। কিন্তু মরণের ত যন্ত্রণা আছেই। আমার মরণই ভাল বলিয়া আপনার হাতে আপনি মরিলাম। কিন্তু তাই বলিয়া মরণের সময়ে কি তোমার কাছে কাঁদিব না?

সূর্য্যমুখী কাঁদিলেন। কমল তাঁহার মাথা আপন হৃদয়ে আনিয়া হাত দিয়া ধরিয়া রাখিলেন। কথায় সকল কথা ব্যক্ত হইতেছিল না—কিন্তু অন্তরে অন্তরে কথোপকথন হইতেছিল। অন্তরে অন্তরে কমলমণি বুঝিতেছিলেন যে, সূর্য্যমুখী কত দুঃখী। অন্তরে অন্তরে সূর্য্যমুখী বুঝিয়াছিলেন যে, কমলমণি তাঁহার দুঃখ বুঝিতেছেন।—

অতঃপর রোদন সংবরণ করিয়া, সূর্য্যমুখী কমলমণির সহিত অন্যান্য কথোপকথন করিলেন, এবং গভীর রাত্রে স্নেহভরে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া এবং "বাবা! আশীর্ব্বাদ করি, যেন তোমার মামার মত অক্ষয় গুণে গুণবান্ হও, ইহার বাড়া আশীর্ব্বাদ আর আমি জানি না" এই বলিয়া সতীশচন্দ্রকে আশীর্ব্বাদ করিয়া তাহাদিগকে বিদায় করিলেন। পরে কমলমণিকে এক পত্র লিখিয়া বিছানায় রাখিয়া গৃহত্যাগ করিয়া দেশত্যাগী হইলেন। সে পত্রের কয়েকাংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

(১)

"যে দিন স্বামীর মুখে শুনিলাম যে, আমাতে আর তাঁর কিছুমাত্র সুখ নাই, তিনি কুন্দনন্দিনীর জন্য উন্মাদগ্রস্ত হইবেন, অথবা প্রাণত্যাগ করিবেন, সেই দিনেই মনে মনে সংকল্প করিলাম, যদি কুন্দনন্দিনীকে আবার কখনও পাই, তবে তাহার হাতে সমর্পণ করিয়া তাহাকে সুখী করিব। কুন্দনন্দিনীকে স্বামী দান করিয়া আপনি গৃহত্যাগ করিয়া যাইব; কেননা, আমার স্বামী কুন্দনন্দিনীর হইলেন, ইহা চক্ষে দেখিতে পারিব না। এখন কুন্দনন্দিনীকে পুনর্ব্বার পাইয়া তাহাকে স্বামী দান করিলাম। আপনিও গৃহত্যাগ করিয়া চলিলাম।"

(২)

"——। আমি টাকা কড়ি সঙ্গে লইলে লইতে পারিতাম, কিন্তু প্রবৃত্তি হইল না। আমার স্বামী, আমি ত্যাগ করিয়া চলিলাম—সোণারূপা সঙ্গে লইয়া যাইব?"

(৩)

"তুমি আমার একটি কাজ করিও, আমার স্বামীর চরণে আমার কোটি কোটি প্রণাম জানাইও। আমি তাঁহাকে পত্র লিখিয়া যাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলাম, কিন্তু পারিলাম না—চক্ষের জলে অক্ষর দেখিতে পাইলাম না—কাগজ ভিজিয়া নষ্ট হইল। কাগজ ছিঁড়িয়া ফেলিয়া আবার লিখিলাম—আবার ছিঁড়িলাম—আবার ছিঁড়িলাম—কিন্তু আমার বলিবার যে কথা আছে, তাহা কোন পত্রেই বলিতে পারিলাম না। কথা বলিতে পারিলাম না বলিয়া, তাঁহাকে পত্র লেখা হইল না। তুমি যেমন করিয়া ভাল বিবেচনা কর, তেমনি করিয়া আমার এ সংবাদ তাঁহাকে দিও। তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিও যে, তাঁহার উপর রাগ করিয়া আমি দেশান্তরে চলিলাম না। তাঁহার উপর আমার রাগ নাই; কখনও তাঁহার উপর রাগ করি নাই, কখনও করিব না। যাঁহাকে মনে হইলে আহ্লাদ হয়, তাঁহার উপর কি রাগ হয়? তাঁহার উপর যে অচলা তাহাই রহিল, যত দিন না মাটীতে এ মাটী মিশে, তত দিন থাকিবে কেননা, তাঁহার সহস্র গুণ আমি কখনও ভুলিতে পারিব না। এত গুণ কাহারও নাই। এত গুণ কাহারও নাই বলিয়াই আমি তাঁহার দাসী। এক দোষে যদি তাঁহার সহস্র গুণ ভুলিতে পারিতাম, তবে আমি তাঁহার দাসী হইবার যোগ্য নহি। তাঁহার নিকট আমি জন্মের মত বিদায় হইলাম। জন্মের মত স্বামীর কাছে বিদায় লইলাম,

ইহাতে জানিতে পারিবে যে, আমি কত দুঃখে সর্ব্বত্যাগিনী হইতেছি।'

(৪)

"তোমার কাছে জন্মের মত বিদায় হইলাম, আশীর্ব্বাদ করি, তোমার স্বামী পুত্র দীর্ঘজীবী হউক, তুমি চিরসুখী হও। আরও আশীর্ব্বাদ করি যে, যে দিন তুমি, স্বামীর প্রেমে বঞ্চিত হইবে, সেই দিন যেন তোমার আয়ুঃশেষ হয়। আমায় এ আশীর্ব্বাদ কেহ করে নাই।"

উদ্ধৃত প্রথমাংশে সূর্য্যমুখী তাঁহার গৃহত্যাগের কারণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—সে কারণ তাঁহার স্বামী কুন্দনন্দিনীর হইলেন, তাহা চক্ষে দেখিবার তাঁহার অক্ষমতা, পতিগতপ্রাণা, পতিসর্ব্বস্বা রমণীর প্রকৃতিগত কারণ, তাহার অন্যথাভাব স্বভাব-বিরোধী। কাহার প্রতি ঈর্ষা বা রাগ তিল পরিমাণেও তাঁহাকে এ গৃহত্যাগ-কার্য্যে প্রণোদিত করে নাই, কুন্দনন্দিনীর প্রতি তাঁহার কিছুই ঈর্ষা ছিল না, এ কথা তিনি, গৃহে প্রত্যাগত হইয়া, স্বামী সঙ্গে পুনর্ম্মিলনের পর, নিজের কথা ও কার্য্য দ্বারাই সপ্রমাণ করিয়াছেন। তিনি আপনার উদ্যোগে, কমলকে সঙ্গে করিয়া কুন্দকে দেখিতে গেলেন, বলিলেন "সে আমার কাছে কোন দোষ করে নাই—বা তাহার উপর আমার রাগ নাই। সে আমার এখন কনিষ্ঠা ভগিনী।" কুন্দের গৃহে প্রবেশ করিয়া, কুন্দ বিষপান করিয়াছে দেখিয়া, রোদন করিতে লাগিলেন, বলিলেন, "আমি এত দিনে জানিলাম, আমার কপালে এক দিনেরও সুখ নাই—নতুবা আমি আবার সুখী হইবামাত্রই এমন সর্ব্বনাশ হইবে কেন?" কি সুন্দর কথা! কি সুন্দর ভাব! সূর্য্যমুখী-হৃদয়ের মহত্ত্ব কি সুন্দর প্রকটিত হইয়াছে! স্বামীর প্রতি রাগ করিয়া যে সূর্য্যমুখী গৃহত্যাগ করেন নাই, উদ্ধৃত তৃতীয়াংশে তাহা স্পষ্টীকৃত। বরং তাঁহার পরবর্ত্তী কথায় ইহাই প্রকাশ হইয়াছে যে, তাঁহার গৃহত্যাগে তাঁহার স্বামী তাঁহার প্রতি রুষ্ট হইয়াছেন ভাবিয়া তিনি স্বামীর নিকট আপনাকে অপরাধিনী মনে করিয়াছিলেন। গৃহত্যাগসময়ে অন্য ভাবের প্রাবল্য হেতু এ চিন্তা তাঁহার হৃদয়ে স্থানাধিকার করিয়া না থাকিলেও, পরে সে চিন্তা তাঁহার মনঃক্লেশের কারণই হইয়াছিল। এই অংশে, সূর্য্যমুখী কত উচ্চাঙ্গের পত্নী ও রমণী, তাঁহার পতিভক্তি সাধারণ রমণীর পতিভক্তি হইতে কত উচ্চে স্থাপিত, তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে। কবি তাঁহার প্রেমানুরাগের প্রকৃতি ব্যাখ্যানে গুণজ অনুরাগকে স্থায়ী এবং অতি উচ্চ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। সূর্য্যমুখীর পতিপ্রেম সেই গুণানুভূতি হইতে উৎপন্ন, এবং স্বামীচরিত্রে যে দুর্ব্বলতা সাধ্বী রমণীর পক্ষে সাংঘাতিক, সূর্য্যমুখীর অদৃষ্টের ফেরে তাঁহার স্বামীতে সেই দুর্ব্বলতার উদ্ভব হওয়াতেও তাঁহাকে স্বামীচরিত্রের মূল্যাবধারণে সমর্থা করিয়া, কবি তাঁহাকে সাধ্বী রমণীগণ মধ্যে অতি উচ্চ স্থান প্রদান করিয়াছেন, উদ্ধৃত দ্বিতীয়াংশের ভাবার্থের সহিত, এই রমণীরত্ন স্থানান্তরে স্বামীর তুলনায় আপনাকে যেরূপ অবহেলার পাত্রী বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন,—"তুমি পাপ সূর্য্যমুখীর জন্য দেশত্যাগী হইবে? তুমি

বড় না আমি বড় ?”—তাহার মর্ম্ম সংযোগ করিলে, দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহার স্বামী তাঁহার হৃদয়ে কিরূপ স্থানাধিকার করিতেন, স্বামীর তুলনায় তাঁহার নিকট ইহ জগতে আর সকলই কিরূপ মূল্যহীন ছিল।

শেষাংশেও তিনি স্বামীর প্রেমে বঞ্চিতা সাধ্বী রমণীর জীবনের নিরর্থকতা প্রকাশ করিয়াছেন।

সূর্য্যমুখীর গৃহত্যাগ, বোধ হয়, বঙ্গীয় পাঠকমণ্ডলীতে বিতণ্ডার বিষয় হইয়াছে। এ গৃহত্যাগের প্রকৃতিনিহিত কারণের উল্লেখ সূর্য্যমুখী নিজেই করিয়াছেন, এবং আমরাও সংক্ষেপে তাহার ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছি। নগেন্দ্রনাথ ও কমলমণির সহিত সূর্য্যমুখীর কথোপকথন উদ্ধৃত করিয়া পাঠকসমাপে সূর্য্যমুখীর প্রকৃত বিকাশে আমরা যত্ন পাইয়াছি। কবিও প্রধানতঃ উল্লিখিত বাক্যালাপ দ্বারাই সে প্রকৃতির বিকাশ সাধন সম্পাদিত করিয়াছেন। স্থলান্তরে, কমলকে পত্র লিখিতে সূর্য্যমুখী বলিয়াছেন, “পৃথিবীতে যদি আমার কোন সুখ থাকে, তবে সে স্বামী ; পৃথিবীতে যদি আমার কোন চিন্তা থাকে, তবে সে স্বামী ; পৃথিবীতে যদি আমার কোন কিছু সম্পত্তি থাকে, তবে সে স্বামী, * * * * * পৃথিবীতে আমার যদি কোন অভিলাষ থাকে, তবে সে স্বামীর স্নেহ ; * * * *।” আমরাও, “পতিগতপ্রাণা,” “পতিমাত্র-জীবিতা”, “পতিসর্ব্বস্বা”, ইত্যাকার বিশেষণ দ্বারা, সেই ভাবই প্রতিফলিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। স্বামী সম্বন্ধে এরূপ ভাবাধিকৃত হৃদয়ে, সূর্য্যমুখী তাঁহার একান্ত বাঞ্ছিত পতিপদসেবা অন্যাধিকৃত দেখিয়া, অবিচলিত চিত্তে থাকিতে পারিলে, আমাদের বিবেচনায়, তাহার ভাবের পূর্ণতা প্রমাণিত হইত না, সে ভাবের সার্থকতায়, তাহার সম্যক্ আন্তরিকতায়, অভাব অনুমিত হইতে পারিত। কেবলমাত্র প্রাণত্যাগ দ্বারা সূর্য্যমুখী সে সংশয়ের নিরাকরণ করিতে পারিতেন। কিন্তু আত্মহত্যা তাঁহার গাম্ভীর্য্য-গৌরবের হানিকর হইত, তাঁহার ধীর সহিষ্ণুপ্রকৃতির সহিত অসঙ্গত হইত, তাঁহার পতিপদসেবার লালসারও অশ্রেয়ত্ব প্রতিপাদিত হইত না। মনুষ্য প্রকৃতি সম্বন্ধে প্রভূতজ্ঞানসম্পন্ন, সূক্ষ্মদর্শী কবি সুতরাং আত্মহত্যার ব্যবস্থা করেন নাই, তিনি সঙ্গতি রক্ষার জন্য অন্যোপায়াবলম্বন করিয়াছেন। আবার সে উপায়াবলম্বনও তাঁহার কৌশল বুদ্ধি সমুদ্ভূত। সূর্য্যমুখীর গৃহত্যাগের অর্থ স্বাধীনভাবাবলম্বন নহে, তাহার অর্থ প্রাণাপচয়ের আয়োজন। এ গৃহত্যাগের মূলে স্ত্রীস্বভাবগত অভিমান ছিল না, এ কথা বলা সহজ নহে ; কিন্তু সে অভিমানের অর্থ স্বামীর উপর রাগ নহে, তাহার অর্থ আপনার দুর্ভাগ্যজ্ঞানে আত্মনিগ্রহ, দুঃখভোগের জন্য উদ্যোগ। সুতরাং ইহাতে দোষাবহ কিছু নাই ; অথচ গৃহত্যাগ করিয়া সূর্য্যমুখীর প্রমাণ করিবার অবস্থা হইয়াছিল যে, তিনি কোন অবস্থাতেই স্বামীমুখদর্শন ও স্বামীপদসেবা ব্যতীত জীবন ধারণ করিতে পারিতেন না। তাঁহার গৃহত্যাগে নগেন্দ্রনাথেরও তাঁহার ভার্য্যাবৎসলতা প্রমাণ করিবার সুবিধা হইয়াছিল, অন্যরূপে নগেন্দ্রের সে ভাব অত উজ্জ্বল বর্ণে প্রকটিত

হইতে পারিত না। এ গৃহত্যাগে সে অপূর্ব্ব কবিত্বপূর্ণ দৃশ্য, সে সুন্দর সুখপূর্ণ পুনর্মিলনের দৃশ্য, সে ছায়ানামক পরিচ্ছেদের সামগ্রী সংগ্রহ হইয়াছে। সূর্য্যমুখীর পুনরাগমনে কমলের শঙ্খধ্বনিপূর্ব্বক সে আনন্দের নৃত্যে কমলচরিত্রের যে মনোহর বিকাশ সাধিত হইয়াছে, তাহা কি অন্যরূপে সম্ভাবিত হইত? একটী ঘটনা কত সৌন্দর্য্যের মূলস্বরূপ হইয়াছে। কে সে সমস্ত হইতে বঞ্চিত হইতে ইচ্ছা করিবে? কে এ সকল সুন্দর সৃষ্টি চক্ষের উপর দেখিয়াও, সূর্য্যমুখীর গৃহত্যাগে দোষারোপ করিবে?

বিষবৃক্ষ কাব্যে, নগেন্দ্রনাথের সকল সুখের মন্দির, সূর্য্যমুখীর শয্যাগৃহবর্ণনে বঙ্কিমচন্দ্র অসাধারণ কবিত্বের পরিচয় দিয়াছেন; এরূপ সুন্দর বর্ণনা কমই দেখিতে পাওয়া যায়। এই শয্যাগৃহে তাঁহার সেই ছায়াদৃশ্যের অবতারণ কি সুন্দর সৃষ্টি! এই দৃশ্যে সূর্য্যমুখীর চরিত্র-বিজ্ঞাপক অনেক কথা আছে। সত্যভামা ও তাঁহার তুলাযন্ত্রের চিত্রের নীচে সূর্য্যমুখী স্বহস্তে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন, "যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল! স্বামীর সঙ্গে রূপার তুলা?" উমার কুসুম-সজ্জা দেখিয়া সূর্য্যমুখী একদিন আপন ফুল পরিতে সাধ করিয়াছিলেন। নগেন্দ্র নিজহস্তে পুষ্পচয়ন করিয়া আনিয়া সূর্য্য-মুখীকে কুসুমময়ী সাজাইয়াছিলেন। সূর্য্যমুখী তাহাতে যত সুখী হইয়াছিলেন, কোন্ রমণী রত্নময়ী সাজিয়া তত সুখী হয়? সূর্য্যমুখী একদিন সুভদ্রার সারথ্যের সাধ পুরাইয়া আসিয়া, সুভদ্রার চিত্রকে একটী কিল দেখাইয়া বলিয়াছিলেন, "তুই সর্ব্বনাশীই ত যত আপদের গোড়া।" কেননা সুভদ্রার দৃষ্টান্তনুসরণ করিতে গিয়া হঠাৎ গাড়ী ফটকের বাহিরে উপস্থিত হওয়ায় তিনি বিষম লজ্জার দায়ে পড়িয়াছিলেন। শয্যাগৃহ নির্ম্মিত হইলে, সূর্য্যমুখী স্বহস্তে তাহার গায়ে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন—

"১৯১০ সংবৎসরে
ইষ্টদেবতা
স্বামীর স্থাপনা জন্য
এই মন্দির
তাঁহার দাসী সূর্য্যমুখী
কর্ত্তৃক
প্রতিষ্ঠিত হইল।"

নগেন্দ্র, সূর্য্যমুখী পরলোকগতা বিশ্বাসে, এই শয্যাগৃহে গিয়া কত বিলাপ করিতে-ছেন, শয্যাগৃহে জীবিতা সূর্য্যমুখী দর্শনে আপনাকে ভ্রান্ত উন্মাদগ্রস্ত মনে করিয়া আক্ষেপ করিতেছেন, "শেষ এই কি কপালে ছিল? আমি পাগল হইলাম!" এবং ধরাশায়ী হইয়া বাহু মধ্যে চক্ষু লুকাইয়া কাঁদিতেছেন। সূর্য্যমুখী তাঁহার পদযুগল ধরিলেন, তাঁহার পদযুগলে মুখাবৃত করিয়া তাহা অশ্রুজলে অভিসিক্ত করিলেন; বলিলেন, "উঠ, উঠ! আমার জীবনসর্ব্বস্ব! মাটী ছাড়িয়া উঠিয়া বসো—আমি যে এত দুঃখ সহিয়াছি, আজ আমার সকল দুঃখের শেষ হইল। উঠ, উঠ আমি মরি নাই। আবার তোমার পদসেবা করিতে আসি-য়াছি।" কবি বলিতেছেন, "তখন উভয়ে উভয়ের স্কন্ধে মস্তক ন্যস্ত করিয়া কত রোদন করিলেন। কেহ কোন কথা বলিলেন না।—

কত রোদন করিলেন। রোদনে কি সুখ!” তাই আমরা বলিয়াছি এ ইন্দ্রজাল বুঝা কঠিন। কুন্দ সূর্য্যমুখীর এই সুখের কারণ হইবার জন্যই বুঝি তাঁহার দুঃখের কারণ হইয়াছিলেন। তবুও নিস্তব্ধ বারিরাশিবক্ষে শান্তির দৃশ্যে কে বাত্যাতাড়ন ইচ্ছা করে, যদিও বাত্যাবসানে সে শান্তি অধিকতর অনুভূত হয়!

কল্পনার আদর্শ-সৃষ্টির সম্যক অভিব্যক্তি মনুষ্যভাষায় অসম্ভাবিত মনে করিলে, তাহার পূর্ণভাব হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিবার জন্য আমাদের কবির একটি বিশেষ প্রণালী আছে। যেখানে স্বকীয় রেখাপাত ও বর্ণপ্রয়োগে মনের তৃপ্তি সাধন হয় না, সেখানে তিনি, স্বপ্ন বা মনের ক্ষণিক ভাববিশেষের সাহায্যে, বর্ণিত চিত্রকে অলৌকিকত্ব বা অতিমানুষিকত্বে উন্নয়ন করিয়া, তাহার প্রকৃতি পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা করেন। এ প্রণালীর প্রথম অবতারণ সূর্য্য-চিত্রে, ইহার উৎকর্ষসাধন বা পূর্ণবিকাশ চন্দ্রশেখরের চরিত্রমহত্ত্ব বর্ণনে। গিরিগুহায় চৈতন্যবিহীনা শৈবলিনী স্বপ্নে চন্দ্রশেখরের যেরূপ ধ্যান করিতেছিলেন, তাহাতে সেই মহামহিম চরিত্রের প্রকৃতি যেরূপ বিভাসিত হইয়াছে, কবির অসাধারণ চিত্রনৈপুণ্যেও যেন সে চরিত্রের সেরূপ প্রদীপ্তি সাধন হয় নাই। সূর্য্যমুখী-চরিত্রেরও পূর্ণপ্রকৃতি অবধারণ করাইবার জন্যই যেন, কবি কর্তৃক প্রবর্ত্তিত হইয়া, বিলুপ্তচৈতন্য নগেন্দ্রনাথ, মুদ্রিত নয়নে, সূর্য্যমুখীকে স্বর্গারূঢ় বিশ্বাসে, এইরূপে তাহার রূপ ধ্যান করিতেছেন। নগেন্দ্রনাথ দেখিতেছেন, “তিনি রত্নসিংহাসনে রাজরাণী হইয়া বসিয়াছেন; চারিদিক হইতে শীতল সুগন্ধময় পবন তাঁহার অলকদাম দোলাইতেছে। চারিদিকে পুষ্পনির্ম্মিত বিহঙ্গগণ উড়িয়া বীণারবে গান করিতেছে। দেখিলেন, তাঁহার পদতলে শত শত কোকনদ ফুটিয়া রহিয়াছে; তাঁহার সিংহাসন-চন্দ্রাতপে শত চন্দ্র জ্বলিতেছে। চারিপার্শ্বে শত শত নক্ষত্র জ্বলিতেছে। দেখিলেন, নগেন্দ্র স্বয়ং এক অন্ধকারপূর্ণ স্থানে পড়িয়া আছেন; তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে বেদনা; অসুরে তাঁহাকে বেত্রাঘাত করিতেছে; সূর্য্যমুখী অঙ্গুলীসঙ্কেতে তাহাদিগকে নিষেধ করিতেছেন।” সূর্য্যমুখী রমণীকুলের রাণী, দেবীপ্রকৃতি, পুণ্যাত্মা, পবিত্রতা উজ্জ্বলতা ও কোমলতার আধার—সেই কথাই কবি এ ভাবে অভিব্যক্ত করিয়াছেন। নগেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তিনি জীবিতেও যাহা ছিলেন, পরলোকগতা হইয়াও তাহাই আছেন—নিত্য, অপরিবর্ত্তিত, চিরসুখ ও শান্তিপ্রদায়িনী; তাই তিনি অসুরদিগকে বেত্রাঘাত হইতে নিবর্ত্তিত করিতেছেন। আবার কবি, অন্যের মুখে কথা দিয়া অনেক সময়ে অনেকটা এইভাবেই চরিত্র বিকাশ করিয়া থাকেন। সূর্য্যমুখী মরিয়াছেন বিশ্বাসে নগেন্দ্রনাথ বিষয়ের দানপত্রাদি প্রস্তুত করার জন্য গোবিন্দপুরে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। শ্রীশ কমলও সেই স্থানে। কমলমণি শ্রীশচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন “এ বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী ত বৈকুণ্ঠ ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। তাই বলে, দাদাবাবু বৈকুণ্ঠে এসে কি বটপত্রে শোবেন?” প্রকৃতই সূর্য্যমুখী আপনার গুণে সে পুরীকে বৈকুণ্ঠের ন্যায় পবিত্র সুখের স্থান করিয়া রাখিয়াছিলেন; তাঁহার বিহনে সকলই অন্ধকার ও দুঃখময়তায় পরিণত হইয়াছিল!

শ্রীলোকনাথ চক্রবর্ত্তী।

মানবের জন্মকথা।

মানুষের শ্বদন্ত চর্ব্বণ করিবার পক্ষে উত্তম। কিন্তু ওয়েন বলেন উহার অগ্রভাগ ছুঁচল.* তথায় একটি, গোল রকম বিন্দু আছে, তাহার বাহিরের দিক কুব্জ, এবং ভিতরের ভাগ চেপ্টা অথবা কিঞ্চিৎ ন্যুব্জ, তাহার নীচে সামান্য একটু উচ্চাংশ আছে; ইহাতেই উহাকে শ্বদন্ত বলিয়া বেশ বুঝা যায়। মিলানীয়ান্-বর্গীয় মানবের শ্বদন্তের ঐ ছুঁচলোভাগ বিলক্ষণ স্পষ্ট, বিশেষতঃ অষ্ট্রেলিয়ানদিগের। কর্ত্তনদন্ত অপেক্ষা শ্বদন্তের শিকড় অধিক পুঁতিয়া থাকে, এবং ঐ শিকড় অধিক শক্ত। তথাপিও শক্রগণকে অথবা শিকারকে ছিঁড়িবার পক্ষে এই দন্ত মানুষের কোন উপকারে আসে না। সুতরাং ইহার আসল কার্য্যোপযোগিতা বিবেচনা করিলে ইহাকে অকর্ম্মণ্য বলা যায়। মানুষের মাথার খুলি অনেক গুলি যেখানেই সংগৃহীত থাকে, সেখানেই দেখা যায় যে কতিপয় খুলিতে অন্যান্য দন্ত অপেক্ষা শ্বদন্ত বেশি লম্বা, সুতরাং বাহির হইয়া রহিয়াছে,—যেন উচ্চশ্রেণীর বানরের মত, কিন্তু তাহা হইতে একটু কম। হেকেলও ইহা লক্ষ্য করিয়াছেন। ঐরূপ স্থলে অপর দন্তপাটির যথাযোগ্য স্থানে কিছু ফাঁক থাকে। তাহাতেই একপাটির ঐ লম্বা দন্ত অপর পাটিতে থাকিবার স্থান পায়। ওয়াগ্নার একটি কাফিরের খুলি অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাতে দন্তপাটির ঐ ফাঁকস্থান অত্যন্ত প্রশস্ত। যখন মনে করি যে বর্ত্তমানকালের খুলি অপেক্ষা প্রাচীন কালের কত কম-সংখ্যক খুলি পরীক্ষা করা হইয়াছে, তখন তিনটি খুলির শ্বদন্তও যে অত্যন্ত দীর্ঘ থাকা দেখা যাইতেছে, ইহাই কৌতুহলের কথা। নওলেট্ চোহালিতে যে শ্বদন্ত পাওয়া গিয়াছে তাহা ভয়ঙ্কর দীর্ঘ।

উচ্চশ্রেণীর বানরদিগের মধ্যে পুংজাতীয়গণেরই শ্বদন্ত পূর্ণবিবর্দ্ধিত। কিন্তু স্ত্রীজাতীয় গরিলার, এবং কতকটা স্ত্রীজাতীয় ওরাং-ওটাঙ্গেরও শ্বদন্ত অন্যান্য দন্ত অপেক্ষা অনেক দীর্ঘ। সুতরাং স্ত্রীলোকের শ্বদন্ত কখন কখন দীর্ঘ হইয়া থাকে বলিয়া পুরুষের শ্বদন্তের অতিবৃদ্ধিকে বানরবৎ পুর্ব্বপুরুষগণের শ্বদন্তের পুনরাবর্ত্তন বলিয়া বিবেচনা করিবার বিশেষ বাধা দেখা যায় না। যিনি তাঁহার নিজের শ্বদন্তের আকৃতি, এবং অপর ব্যক্তির শ্বদন্তের কখন কখন অতিবৃদ্ধি দেখিয়া উহাদিগকে আমাদিগের চিরাতীতকালীয় পূর্ব্বপুরুষগণের ভয়ঙ্কর অস্ত্রস্বরূপ শ্বদন্তের পুনরাবর্ত্তন বিবেচনা করিতে, ঘৃণা বোধ করেন, তিনি সম্ভবতঃ ঐ ঘৃণাবশতঃ দন্তপাটি বিকাশ করিয়াই স্বকীয় প্রাচীন বংশাবলী প্রকাশ করিয়া ফেলিবেন। কারণ এই সকল শ্বদন্ত যদিও তিনি আর অস্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করিতে সক্ষম নহেন, এবং ইচ্ছাও করেন না, তথাপি তিনি নিজের অজ্ঞাতসারেও দন্তবিকাশের আবশ্যকীয় পেশি সংকুচিত করিয়া যেন আক্রমণ করিবার ভাবে দন্ত বাহির করিবেন; কুক্কু

* সুচল।

আক্রমণ কালে যে ভাবে বাহির করে, সেই ভাবেই করিবেন।

বানর এবং অন্য স্তন্যপায়ী জীবের যে সকল পেশি সচরাচর থাকে, তাহাদিগের মধ্যে অনেকগুলি সময় সময় মানুষেও দেখা যায়। অধ্যাপক ভ্লাকোভিক্ চল্লিশটি নরদেহ পরীক্ষা করিয়া উনিশটিতে ইস্কিও পিউবিক নামক পেশি পাইয়াছিলেন। ঐ নাম তিনিই দিয়াছেন। অবশিষ্টগুলির মধ্যে তিনটিতে ঐ পেশির স্থলে এক একটি বন্ধনী পাইয়াছিলেন; এবং বাকি আঠারটিতে উহার কোন চিহ্ন প্রাপ্ত হন নাই। ত্রিশটি নারীদেহ পরীক্ষায় কেবল দুইটিতে ঐ পেশি উভয় পার্শ্বেই পাইয়াছিলেন, আর তিনটিতে উহার স্থলে এক একটি অব্যবহার্য্য বন্ধনী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সুতরাং এই পেশি নারী অপেক্ষা নরদেহেই বেশি স্থলে দেখা যায়। মানুষকে কোন নিম্নতর জীব হইতে বিবর্ত্তিত মনে করিলে, এই কথা বোধগম্য হয়। কারণ ঐ পেশি অনেক নিম্নতর জীবদেহে পাওয়া গিয়াছে, এবং উহাদিগের মধ্যে কেবল পুংজাতীয়গণেরই ইহা প্রধানতঃ ক্রিয়ার সহায়তা করে।

মিঃ উড্ তাঁহার মূল্যবান প্রবন্ধাদিতে মানবীয় পেশির অনেকগুলি পরিবর্ত্তন সূক্ষ্ম সুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। ঐ সকল পেশি নিম্নশ্রেণীর জীবের দেহে সচরাচরই দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদিগের নিকট-আত্মীয় অর্থাৎ উচ্চশ্রেণীর বানরগণের দেহে যে সকল পেশি সর্ব্বদাই দেখা যায়, তদনুরূপ পেশি মানবদেহে এত অধিক আছে যে, এ স্থলে তাহাদিগের উল্লেখ করাও দুঃসাধ্য। একটি নরদেহে সাতেরটি পেশি-পরিবর্ত্তন পাওয়া গিয়াছে, তাহার প্রত্যেকটিই বানর-দেহে সর্ব্বদা দেখা যায়। ঐ নরদেহটি বেশ বলিষ্ঠ ও পরিপুষ্ট ছিল, এবং উহার মাথার খুলিও বেশ পূর্ণ গঠিত ছিল। ঐ নরদেহটিতে গলার দুই পার্শ্বেই সবল এবং আসল লেভেটার ক্ল্যাভিকিউলী নামক কণ্ঠাস্থি উত্তোলনকারী মাংশপেশি ছিল; ইহা প্রত্যেক শ্রেণীর বানরেরই থাকে, কিন্তু মানুষের মধ্যে ৬০ জনে এক জনের মাত্র দেখা যায়। উচ্চ ও নিম্নশ্রেণীর বানরগণের পায়ের কনিষ্ঠাঙ্গুলির উপর ভাগের দীর্ঘাস্থির * সহিত যে পেশি হাক্সলি ও ফ্লাওয়ার সর্ব্বদাই সংলগ্ন দেখিয়াছেন তাহাও ঐ নরদেহে ছিল। আমি আর দুইটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিব। খুলির নিম্নভাগের স্কন্ধাস্থি পরিচালক পেশী মানবেতর সমস্ত স্তন্যপায়ী জীবেরই আছে, বোধ হয় চতুষ্পদের মত চলাফেরা করার সঙ্গে ঐ পেশির সম্বন্ধ আছে। কিন্তু উহা মানবের মধ্যে ৬০ জনে এক জনের থাকে। মিষ্টার ব্র্যাডলি মানুষের উভয় পদেই প্রদাস্থি-পরিচালক পেশি আবিষ্কার করিয়াছেন। তাহার পূর্ব্বে উহার অস্তিত্বই জানা ছিল না। কিন্তু এই পেশি উচ্চশ্রেণীর বানরের সকলেরই পায়ে থাকে। মানবের হস্ত এবং বাহুর পেশি সকল অনন্যসাধারণ, কিন্তু উহারাও অত্যন্ত পরিবর্ত্তনশীল, তদ্ধেতু ইতরজীবগণের হস্ত ও বাহুর পেশির তুল্য আকার প্রাপ্ত হয়। এই ঐক্য কখনও সম্পূর্ণ, কখন ও অসম্পূর্ণ; কিন্তু যখন অসম্পূর্ণ থাকে, তখন মানবের

* পায়ের পাতার অস্থি।

এবং ইতরজীবের ঐ সকল পেশির মাঝামাঝি একটা আকৃতি প্রাপ্ত হয়, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। কোন কোন পরিবর্ত্তন স্ত্রীলোকেরই বেশি দেখা যায়, কোন কোন পরিবর্ত্তন পুরুষেরই বেশি হইয়া থাকে, কিন্তু আমরা ইহার কারণ বুঝিতে অক্ষম। মিঃ উড্ বহু পরিবর্ত্তনের উল্লেখ করিয়া অবশেষে এই সারগর্ভ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন;—"পেশি সকলের সাধারণ আকৃতি অপেক্ষাকৃত বিশেষ পরিবর্ত্তন হইলে তাহা নির্দ্দিষ্ট প্রণালিতে অথবা নির্দ্দিষ্ট পথেই হইয়া থাকে; ইহার এমন কোন অজ্ঞাত কারণ অবশ্যই আছে যাহা বুঝিতে পারিলে সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক ভাবে গঠনবিদ্যা (Anatomy) বুঝিবার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় হইতে পারে।

এই অজ্ঞাত কারণই পুনরাবর্ত্তন, অর্থাৎ কোন পূর্ব্বতন জীবদেহের গঠনপ্রণালীর পুনরাবৃত্তি,—এ কথা অতীব সম্ভব বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে। মানবের সাতটি পেশি অকস্মাৎ বিকৃত হইয়া বানরের পেশির ন্যায় হয়, ইহা সম্পূর্ণ অবিশ্বাসযোগ্য! বংশগত সম্বন্ধ না থাকিলে এরূপ হওয়া বিশ্বাস করা যায় না। পক্ষান্তরে, যদি মানব বানরের ন্যায় কোন জন্তু হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা হইলে বহু সহস্র বৎসর পরেও কোন কোন পেশি কেন পুনরাবির্ভূত হইবে না, তাহার কোনই কারণ বুঝা যায় না। অশ্ব, গর্দ্দভ ও খচ্চরের পদযষ্টিতে এবং স্কন্ধে কখন কখন হঠাৎ কৃষ্ণবর্ণ রেখা, বহুশতাব্দি অথবা সম্ভবতঃ বহু সহস্র বৎসর পরেও, উৎপন্ন হইতে দেখা যায়; মানবেরও তদ্রূপ।

এই সকল পুনরাবর্ত্তনের দৃষ্টান্ত এবং প্রথম অধ্যায়ের লিখিত অব্যবহার্য্য অঙ্গসকলের দৃষ্টান্ত এরূপভাবে পরস্পরের সহিত সংসৃষ্ট যে প্রথম অধ্যায়েই ইহাদের উল্লেখ করিলেও চলিত। শৃঙ্গযুক্ত মানবীয় জরায়ু অপূর্ণ অবস্থাতেই আছে, অথচ তাহাই অপর কোন কোন স্তন্যপায়ী জীবের জরায়ুর সাধারণ ও পূর্ণাবস্থা। কোন কোন দেহাংশ—যেমন পুরুষের স্তন ও স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই কোকিলচঞ্চু অস্থি, মানবে অব্যবহার্য্য হইলেও সর্ব্বদাই দৃষ্ট হয়। আর, বাহুর অস্থির নিম্ন ভাগে যে ছিদ্রের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাও কখন কখন দেখা যায়; সুতরাং তাহা পুনরাবর্ত্তনের উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই সকল পুনরাবর্ত্তিত অঙ্গ, এবং অব্যবহার্য্য অঙ্গ, নিম্নপ্রাণী হইতে মানবের জন্মের কথা অভ্রান্তরূপে বিবৃত করিতেছে। (ক্রমশঃ)

শ্রীশশধর রায়।

মথুরায়।

১

"সত্যি তবে তোমার এই মাসেই বিয়ে হবে?" "হ্যাঁ, ভাই, শ্রাবণমাসেই হবে শুনচি, তোর কবে বিয়ে হবেরে মতিয়া?"

একদিন বর্ষাকালের সন্ধ্যাবেলায় যখন নীল আকাশের কোথাও একটুও মেঘশূন্য ছিল না, যখন কূলে কূলে ভরানদী দুধারের শস্যক্ষেত্রের উপর ফুটন্ত কটাহপূর্ণ দুগ্ধের

মত উথলাইয়া উথলাইয়া পড়িতেছিল, যখন আসন্ন বন্যার হাত হইতে রক্ষা করিবার আশায় চাষারা সশঙ্কিত দৃষ্টি নদীর প্রত্যহ-বর্দ্ধিত জলের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে রাশি রাশি ভুট্টা ও মাড়ুয়ার গাছ গরুর গাড়িতে বোঝাই দিতেছিল, সেই সময় বাঘমতীর তীরে বসিয়া মৃত্তিকায় পিতলের কলসী মাজিতে মাজিতে একটি বালিকা তাহার বালক সঙ্গীকে এই প্রশ্ন করিল। রঘুনাথ গাছভাঙ্গা টাট্‌কা ভুট্টা শিকে বিধাইয়া চাষাদের তামাক খাইবার আগুণে পোড়াইয়া আনিয়াছিল। মতিয়ার জন্ম কিছু কোঁচড়ে রাখিয়া গরম গরম ভুট্টা পোড়া বিনা লবণেই পার করিতে করিতে মতিয়ার নিরুদ্যম মুখের দিকে চাহিয়া সগর্ব্বে বলিল "সব্বাই বলচে আমার যে বউ হবে সে ভাই খুব সুন্দর খুব লেখা পড়া জানে, তারা সহুরে কি না!—বিয়ের সময়ে আমাকে কত গয়না দেবে, খুব মজা হবে ভাই, তোর খুব আহ্লাদ হচ্চে না?" মতিয়া মুখ ফিরাইয়া জোরে জোরে কলসী মাজিতে মাজিতে ভগ্নকণ্ঠে কহিল "তোমার বিয়ে হলে আর কি না তুমি আমার কিছু দেবে? পেয়ারা টেয়ারা সব এবার থেকে বউকে দিয়ে দেবে, আমার কেমন করে আহ্লাদ হবে?" রঘুনাথ একটা ভুট্টা শেষ করিয়া দ্বিতীয়টায় মনঃসংযোগ করিতেছিল, সে হাসিয়া উঠিয়া পরিত্যক্ত ভুট্টাটা অভিযোগকারিণীর প্রতি ছুঁড়িয়া মারিল ও সকৌতুকে বলিয়া উঠিল "হুর বউকে বুঝি আমার লজ্জা করবে না? বউএর সঙ্গে বুঝি আমায় কথা কইতে আছে? পেয়ারা টেয়রা সব ভাই তোকেই দোব, খালি একটা বউ হবে, আর গয়না টয়না হবে, বেশ হবে না!" ঈর্ষাগম্ভীর মুখ প্রফুল্ল করিয়া মতিয়া প্রতিশোধ স্বরূপ এক আঁজলা জল সঙ্গীর গায়ে ছুঁড়িয়া দিল। রঘু কৃত্রিম রাগ দেখাইয়া বলিল "পোড়ারমুখী, আমার কাপড় ভিজিয়ে দেওয়া হলো, দাঁড়া তো তোকে দেখাচ্চি মজা।"

২

রঘুনাথের বিবাহ হইল সহরে। তাহার শ্বশুর কলিকাতা য়ুনিভারসিটির উপাধিধারী জজকোর্টের একজন উকিল। চালচলনেও অনেকটা তিনি নিজের সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন, এই জন্য কাছাকাছির লোকেরা কেহই তাঁহার কন্যাগ্রহণে সম্মত হয় নাই। মধ্যে শিবশঙ্কর একবার একটি শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবককে কন্যাদান করিয়া বাঙ্গালী বেহারীর সম্মিলনের পথে ঈষৎ অগ্রসর হইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার এ মহদুদ্দেশ্য সাধিত হইল না; বরং এই সংবাদে শিবশঙ্করের জ্ঞাতি বন্ধুগণ একেবারে আগুণ হইয়া উঠিয়া তাঁহাকে ত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন এবং তাঁহার বৃদ্ধা পিতামহী অন্নজল ত্যাগ করিয়া শয্যাগত হইলেন। সংসারে অনেক শুভ সংকল্প এমনি করিয়া রোষানলে ভস্মীভূত ও অশ্রুপ্রবাহে ভাসিয়া যায়। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া অবশেষে শিবশঙ্কর দূরগ্রামস্থ জমীদার বিশ্বেশ্বরপ্রসাদের অশিক্ষিত কিশোর পুত্র রঘুনাথের হাতে তাঁহার শিক্ষাপ্রাপ্তা ত্রয়োদশবর্ষীয়া কন্যা চন্দনকুমারীকে সমর্পণ করিয়া অবিমৃষ্যকারিতার

ফলভোগস্বরূপ অনুতাপে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। মেয়ে শ্বশুরবাড়ী হইতে ফিরিয়াই দর্পণের সাহায্যে ললাট ও সিঁথি-লিপ্ত সিন্দুর মুছিয়া শ্বশ্রূর শতদিব্য দেওয়া 'লা-বাহু লাঠিয়া ভাঙ্গিয়া, পায়ের তোড়া পাঁইজোর খুলিয়া, রাগিয়া, কাঁদিয়া প্রতিজ্ঞা করিল, সেই অসভ্য, অশিক্ষিত, অপরিচ্ছন্ন শ্বশুরগৃহের শাসনবন্ধনের মধ্যে ধরা দিতে সে এ জন্মে আর কখনও সেখানে যাইবে না। অভিমানে ঠোঁঠ ফুলাইয়া চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে পিতাকে গিয়া নালিস করিল—"বাবা আমাকে তবে কেন তুমি লেখাপড়া শিখিয়েছিলে?" মাকে বলিল "মাগো তাদের মাটির বাড়ী, দড়ির খাটিয়া, সে ঘরে কি আমি থাকতে পারি! আর একদিন থাকলেই আমি মরে যেতুম, আর কখনও সেখানে যাচ্চি না।" শিবশঙ্কর দেখিলেন মেয়েকে উপযুক্ত পাত্রে দিতে না পারিয়া, বড় সঙ্কটই করিয়াছেন। বেহাইকে লিখিতে লাগিলেন "রঘুনাথের লেখা পড়া শেখার বিশেষ প্রয়োজন, তাকে আমার কাছে পাঠান।"

প্রথমটা গোপীনাথও একমাত্র পুত্রের বিরহ সহ্য করিয়া তাহার উন্নতির পথ মুক্ত করিয়া দিতে সম্মত হয় নাই, অবশেষে মূর্খ গোপীনাথ বৈবাহিকের যুক্তি গ্রহণ করিয়া পুত্রকে তাহার শ্বশুরগৃহে পাঠাইতে রাজী হইল। রঘু সংবাদ শুনিয়া যতটা খুসী হইল, তাহার মা ও মাতামহী তেমনিই অসন্তুষ্ট হইলেন, রঘুর মা রাগিয়া বলিলেন "সহরের ডাকিনী ঘরে এনে এই হলো! যখন দেখেছি বউ ফিরিঙ্গী মেমেদের মতন খোঁপা বাঁধে, বাঙ্গালীদের মতন সাড়ি পরে, খড়কে দিয়ে সিঁদুর লাগায়, তখনি জেনেছি ছেলের আমার মঙ্গল নেই! ছেলে আমি ছেড়ে দোব না।" কিন্তু তাঁহাদের আপত্তি টিকিল না, গোপীনাথের কুটিরে একদিন তাহার বৈবাহিকের পদধূলির সঙ্গে সঙ্গে, তাহার পুরবাসিনীদের মরাকান্নার মধ্য দিয়া, রঘু শ্বশুরালয়ে চলিয়া গেল। বৈবাহিকের "অভ্যর্থনার সখের গালি" তাঁহার মস্তকে অজস্র অভিশাপের ধারার মতন পশ্চাৎ হইতে বর্ষিত হইতে লাগিল।

রঘুর উৎসাহ ও আনন্দের প্রথম আবেগ মতিয়ার অশ্রুম্লান করুণ দৃষ্টিতে ঈষৎ প্রতিহত হইয়া আসিল, দ্বারের পিছন হইতে সে মুখ বাড়াইয়া অজস্র ধারায় ক্ষীণদৃষ্টি নিঃশব্দে রঘুনাথের মুখে স্থাপিত করিয়া রাখিয়াছিল। শ্বশুরের হাত ছাড়াইয়া রঘু নিকটে আসিয়া দুই হাতে ছোট তার মুখখানি আদরের সঙ্গে ধরিয়া সান্ত্বনার স্বরে কহিল "কাঁদিস্ নে মতিয়া, আবার আসবো, আবার আমাদের খেলা হবে, মাছধরা টরা সব হবে।"

"না রঘু তুমি যেও না, বউ তোমায় আর আস্‌তে দেবে না, কি হবে রঘু তুমি যেও না।" রঘুনাথ সদম্ভে বলিয়া উঠিল "ই-স্ বউ আমার সঙ্গে পারবে কি না, তুই কেন ভয় করিস্? বউ খেলাটেলা জানে না, খালি বই পড়ে, তার সঙ্গে কিছুতে মিল হবে না, ঠিক চলে আসবো।"

রঘুনাথ দু চার দিনের মধ্যেই বুঝিল, সে সহরের চেয়ে তাহার গ্রাম্য জীবন শতাংশে ছিল ভাল; সেই গাছে গাছে পেয়ারা আম ও জাম পাড়িয়া বেড়ান, জলে পড়িয়া

দু তিন ঘণ্টা নদী উল্টোপাল্টা করিয়া সঙ্গীগণের সহিত সাঁতার কাটা, তীরে বসিয়া মাছধরা, ভুট্টাক্ষেত্র হইতে তাজা ভুট্টা ভাঙ্গিয়া সদলবলে আনন্দ ভোজন, পাখীর বাসা হইতে শাবক ও চাষীর ক্ষেত হইতে শশা চুরি, অবাধ স্বাধীনতার সহিত মুক্ত বিচরণ ও সব চেয়ে বাল্যসঙ্গিনী মতিয়ার সহিত খেলাধূলা ও বিবাদ-কলহ এ সকলের পরিবর্ত্তে বন্দীর মতন জনমুখরিত নগরীর মধ্যবর্ত্তী বন্দীশালার ন্যায় গৃহে বাস, নিয়মিত পরিমিতাহারান্তে গাড়ি চাপিয়া স্কুলে গমন, প্রাতে সন্ধ্যায় কঠোর কর্ত্তব্যপরায়ণ শিক্ষকের নিকট পাঠাভ্যাস এবং রাত্রে মিতভাষিণী শিক্ষিতা স্ত্রীর সঙ্গ তাহাকে যেন মর্ম্মের মধ্যে পীড়ন করিতে লাগিল। বনের হরিণকে গৃহে আনিলে সে যেমন কিছুতেই পোষ মানিতে চাহে না, গ্রাম্য বালকের স্বাধীন চিত্ত তেমনি পরাধীনতার কঠিন নিগড়ে বদ্ধ থাকিয়া হাঁফ হইয়া উঠিতেছিল। রঘু সকলকার আদর স্নেহ ও একান্ত সাবধানতার ভিতরে থাকিয়াও দিন দিন মনের স্ফূর্ত্তি ও শরীরের বল হারাইতে লাগিল, এত যত্ন এত আগ্রহ জামাইয়ের মনকে স্পর্শ করিতে পারিতেছে না দেখিয়া শিবশঙ্কর ও তাঁহার পত্নী নিতান্ত দুঃখিত হইলেন, প্রতিবেশিনী একজন বঙ্গমহিলা শুনিয়া সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া কহিলেন "'জন জামাই ভাগ্না, তিন নয় আপনা।' তা কি করবে দিদি ও রকম হয়েই থাকে।" চন্দনও স্বামীর অন্যমনস্কতা দেখিয়া অনেক সময় রাগ করিয়া দু'চার কথা শুনাইয়া দিতে ছাড়িত না, মধ্যে মধ্যে নিজেও অভিমান করিয়া কথা বন্ধ করিত, কিন্তু তাহাতেও স্বামীকে অবিচলিত দেখিয়া শেষে নিজেই যাচিয়া আবার কথা কহিত।

অবশেষে এক দিন আর থাকিতে না পারিয়া রঘু শ্বশুরকে মুখ ফুটিয়া বলিল "আমি বাড়ী যাবো।" শিবশঙ্কর আদর করিয়া কহিলেন "কেন বাবা এখানে কি কষ্ট হচ্চে?" রঘু ঘাড় নাড়িল "হুঁ।" শিবশঙ্কর দুঃখিত হইলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন "কি কষ্ট হয় বলো, আমি যাতে কষ্ট না হয় তাই করে দোব।" রঘু একটুখানি ভাবিয়া মাথা নাড়িল "না আমি বাড়ী যাবো, আমার মা বাবা আর মতিয়ার জন্য বড় মন কেমন কর্‌চে, মতিয়া যে আমায় শিগ্‌গির করে যেতে বলেছিল"—রঘুনাথের দুই চোখ জলে ভরিয়া আসিল। শিবশঙ্কর একটু বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "মতিয়া কে? আমি তো কই মতিয়াকে দেখিনি।" রঘু চোখ মুছিতে মুছিতে কহিল "আপনি মতিয়াকে দেখেন নি?" পরে একটু ভাবিয়া বলিল "সে একাানদের একটি মেয়ে,—ছোট্ট, আমার চেয়েও ছোট্ট, আমি তাকে খুব ভালবাসি, সেও আমায় ভালবাসে। চন্দনের মতন কুঁদুলে নয়"—শিবশঙ্কর একটু আশ্বস্তভাবে কহিলেন "কেন চন্দন কি তোমার সঙ্গে ঝগড়া করে, বড় অন্যায় তো! ছেলে মানুষ, আচ্ছা আমি বারণ করে দোব এখন।" রঘু ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া কহিল "ছেলে মানুষ! হ্যাঁ বড্ড তো ছেলেমানুষ! আমার ওকে ভাল লাগে না, আমি বাড়ী যাবো।" শিবশঙ্কর বিব্রত হইয়া

উঠিলেন, "আচ্ছা তোমার বাবাকে চিঠি লিখি আগে, তিনি বলেন তো পাঠিয়ে দেবো।" শিবশঙ্কর কন্যাকে ডাকিয়া কিছু উপদেশ দিলে সে রাগিয়া গেল, রঘুর পড়িবার ঘরে আসিয়া চোখ মুখ লাল করিয়া বলিল, "আমার নামে বাবার কাছে লাগানো হয়েচে, আমি তোমার কি করেছি?" রঘু চন্দনকে ভয় করিত, থতমত খাইয়া গেল, ভীত ভাবে উত্তর দিল "তুমি তো ঝগড়া করো, তাই বলেছি বৈ তো না'!" "জানি জানি আমার কথায় তোমার গায়ে ফোস্কা পড়ে কি না, মতিয়ার কথা খুব মিষ্টি! বলো তো তুমি, মতিয়া মতিয়া করো যে অতো—" রঘু সরল চিত্তে দ্বিধাহীন ভাবে কহিল "আমি যে তাকে ভালবাসি—" "কি? তুমি তাকে—সেই ছোটলোকের মেয়েটাকে —ভালবাসো আর আমায় একটুও ভালবাসো না; আচ্ছা আচ্ছা দেখা যাবে আমি আর কখখোনো তোমার সঙ্গে কথা কবোনা তো" রঘু ঈষৎ বিরক্ত হইয়া কহিল "তুমি শুধু শুধু বড্ড ঝগড়া করতে ভালবাসো। কেন তুমিও তো ছোট লোক, তোমাকে তবে সবাই কেন ভালবাসে? তারি বেলায় বুঝি যত দোষ, তুমি তাকে দুচক্ষে দেখতে পারো না, সে তোমার কি করেচে?" "কি তুমি আমায় ছোট লোক বলে? যাচ্চি দাঁড়াও মার কাছে!" চন্দন কাঁদিয়া কাটিয়া কুরুক্ষেত্র করিল। মার কাছে নালিস করিয়া পিতার কাণে উঠাইয়া তারপর কিছু ক্ষণ পরে আবার নিজেই আসিয়া স্বামীর সহিত যাচিয়া ভাব করিল। রঘু সে দিন-কার হাঙ্গামার পর হইতে মতিয়ার নাম চন্দনের সম্মুখে বড় একটা করিত না! কিন্তু তাহার অভাব ভিতরে ভিতরে তাহাকে সর্ব্বদাই পীড়ন করিতেছিল।

৬

তারপর ছয় বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। রঘুনাথ এখন আর অসভ্য অশিক্ষিত পাড়া-গেঁয়ে বালক নয়। তাহার এলবার্ট টেরি, সিল্কের পাঞ্জাবী ও ভূলুণ্ঠিত উড়ানির বাহার দেখিয়া সেই রূপার পদক ও সোণা মোড়া মোটা বালা পরা হৃষ্টপুষ্ট গ্রাম্য রঘুর কথা কাহারও আর মনেও পড়ে না। তাহার দেহ ও রুচির সহিত বুদ্ধিজ্ঞানও অনেকখানি মার্জ্জিত হইয়া উঠিয়াছিল। বাড়ির কথা আর তাহার বড় একটা মনেও পড়ে না, পড়িলেও সেখানের উপর আকর্ষণটা কমিয়াই গিয়াছিল। পিতা দু তিন বার লইতে আসিয়া পুত্রের অনিচ্ছা দেখিয়া ফিরিয়া গিয়াছেন, শ্বশুরও জামাতার সেখানকার মাটির বাড়ীর ড্যাম্প লাগিয়া পাছে অসুখ করে সেই ভয়ে যাইতে দিতে সম্মত নহেন। এবার দৈবগতিকে পুরা বর্ষার সময়েই রঘুনাথকে কিন্তু সস্ত্রীক বাড়ী আসিতে হইল—হঠাৎ সাত দিনের জ্বরে রঘুর পিতার মৃত্যু হইয়াছিল।—সঙ্গে কচি ছেলে, তাহার ঠাণ্ডা লাগিবার ভয়ে স্পিরিট-ষ্টোভ, হরলিক্স মিল্ক, বিস্কুট প্রভৃতি সঙ্গে থাকা সত্বেও খাদ্যাভাব এবং এই সেঁৎ-সেঁতে বাড়ী, দড়ির খাটিয়া, শাশুড়ির দিন রাত কান্নাকাটি, আত্মীয়বর্গের হা হুতাশ, তাহার উপর আবার জানোয়ারের মতন অসভ্য লোকগুলার তাহার সহিত ঘনিষ্ঠতা করিয়া ফেলিবার সকৌতুহল আগ্রহ, এই

সকল বিবিধ কারণে চন্দনকুমারী ভারি জ্বালাতন হইয়াই উঠিল এবং তাহাকে এমন অবস্থায় সঙ্গে করিয়া আনা যে রঘুনাথের নিতান্ত অর্ব্বাচীনতা হইয়াছে, তাহা অসন্তোষের সহিত প্রকাশ করিতে ক্রটী করিল না। রঘুর মা এত দিন পরে ছেলেকে পাইয়া দুঃখে অভিমানে কাঁদিয়া ভাসিতে লাগিলেন, কিন্তু বধূর ভয়ে কিছুই বলিতে সাহস করিলেন না। যথাসময়ে শ্রাদ্ধ প্রভৃতি হইয়া গেল, সস্ত্রীক রঘুনাথ ফিরিবার ব্যবস্থা করিতে লাগিল। রূপণ পিতা অনেক টাকা রাখিয়া গিয়াছিলেন। এবার রঘুনাথ শ্বশুরালয়ের নিকট পৃথক বাড়ী ভাড়া লইবে তাহার বন্দোবস্ত হইয়াছে। শুনিয়া তাহার মা কহিলেন "আমাকেও নিয়ে চ বাবা, এখানে কাকে নিয়ে থাকবো?" রঘু উত্তর করিল "বেশ তো" কিন্তু চন্দন শুনিয়া রাগ করিতে লাগিল বলিল 'তা তুমি আর তোমার মা থেকো, আমার বাপের বাড়ীতেই স্থান হবে; উঁর রকম সকম দেখে সবাই হাসবে, আমি উঁর সঙ্গে থাকতে পারবো না।" রঘু একটু কুণ্ঠার সহিত মাকে জানাইল—সে বাড়িতে ঘর কম তা তিনি গেলে না হয় সে নিজে নীচের ঘরে শয়ন করিয়া তাঁহাকে ঘর ছাড়িয়া দিতে পারে, খোকার জন্য একটা মুসলমান আয়া আনাইবার কথা ছিল তা না হয় তাহাকে আনিবার ব্যবস্থা এখন স্থগিদই করিবার চেষ্টা করিবে।

উথলিত অভিমান রুদ্ধ করিয়া বিধবা মলিত স্বরে কহিলেন—"থাক্, কাজ নেই সে সবে, তোমাদের কষ্ট হবে, আমি এখানেই থাকবো।" মনের মধ্যে একটুখানি লজ্জাবোধ করিলেও রঘু তাঁহাকে একটু সান্ত্বনাও দিতে পারিল না। সীতামারি হইতে ফিরিয়া যাইবার পূর্ব্বদিন বৈকালে চন্দন স্বামীর সহিত নদী তীরে বেড়াইতে গেল। এসব বিষয়েও সে লোক গঞ্জনা গ্রাহ্য করিত না। বলিয়াছি, তখন বর্ষাকাল; পূর্ব্বের মতন এবারও বাঘমতী জলে উচ্ছ্সিত হইয়া উঠিয়াছে, দুইধারের শস্যক্ষেত্র সকল ভাসাইয়া দিয়াছে। জল দেখিতে দেখিতেই যেন তর তর করিয়া বাড়িয়া উঠিতেছিল—বাঘমতীতে বন্যা আসিয়াছে। মাঠ জনশূন্যপ্রায়, গাছগুলা বৃষ্টিধৌত হইয়া গাঢ় সবুজ হইয়া উঠিয়াছিল, জলের মধ্য হইতে কোথাও ছোট ছোট জনেরা ভুট্টার গাছ মাথা উঁচু করিয়া আছে, কোথাও সারগাছের সাদাফুল জলের উপরে জলতরঙ্গের মতন বাতাসে কাঁপিতেছে। রঘুনাথ চন্দনের হাত ধরিয়া বেড়াইতে একটা পুষ্পিত মহুয়া গাছের তলায় আসিয়া দাঁড়াইল, ফুলে ফুলে গাছটার সবুজ পাতাগুলা প্রায় দেখা যাইতে ছিল না, এবং মহুয়ার তীব্র গন্ধে মৌমাছির দল আকুল হইয়া বহু দূর হইতে ছুটিয়া আসিতেছিল। চন্দন মুগ্ধনেত্রে দেখিতে দেখিতে বলিল—"বাঃ, নদীটি বড় সুন্দর তো! প্রদেশেও এমন জায়গা আছে!" রঘু হাসিয়া কহিয়া কহিল—তা আছে বই কি, কোথাও কেবল বন থাকতে পারে না। এই আমার ছোট বেলায় খেলার জায়গা" —বলিতে বলিতে তাহার স্মৃতি মন্দিরের রুদ্ধ কপাট যেন সহসা খুলিয়া গেল।

বিদায়ের সময়ে রোরুদ্যমানা জননীর পার্শ্বে রঘু একখানি পুরাতন পরিচিত মুখ দেখিল! খুকীকে কোলে লইয়া—ও কে? মতিয়া নয়? মতিয়াই ত! রঘুর প্রশ্নে কে বলিল—চিন্‌তে পারচ না? মতিয়ার যে বড় অসুখ, তোমরা যাচ্ছ বলে ও কোন রকমে দেখতে এসেছে!" একটু অপ্রতিভ হইয়া মতিয়ার চক্ষের দিকে চাহিয়া রঘু বলিল,—কেমন আছিস্ রে মতিয়া? তোর কি আজও বিয়ে হয় নি?" মতিয়া কোন উত্তর দিল না, তার ম্লান মুখ, প্রান্তে একটু ক্ষীণ হাসি দেখা দিল— সে তাড়াতাড়ি চোখ ফিরাইয়া লইল "চোখে কি পড়িল বুঝি"—

"ট্রেণ ফেল করবে না কি?"—"না না, এই যে যাই! খুকীকে দেরে মতিয়া।"

শ্রীঅনুরূপা দেবী।

ষড় দর্শন।*

৩

প্রথমতঃ—প্রমাণদ্বারা আমাদের কি রকম প্রয়োজন সাধিত হয়? এবং তাহার (প্রমাণের) লক্ষণ কি?—তাহা প্রদর্শন করা যাইতেছে।

অদ্বৈতবাদিগণ দ্বিবিধ পদার্থ স্বীকার করেন। সত্য এবং মিথ্যা।

সত্য পদার্থ জ্ঞান স্বরূপ। মিথ্যা পদার্থ সকল কল্পিত এবং জড় নামে পরিচিত। সত্য বা জ্ঞান স্বপ্রকাশ, মিথ্যা বা জড় অপ্রকাশ। জ্ঞান অন্যের সাহায্য ব্যতীতই আলোকের মত প্রকাশিত হয়। জড় (মিথ্যা) পদার্থ স্বয়ং প্রকাশিত হইতে পারে না। উক্ত জ্ঞান দ্বারা প্রকাশিত হইয়া থাকে। কিন্তু জ্ঞান সকল সময়ে স্বয়ং প্রকাশিত হয় না, বা অন্যকেও বিশেষ ভাবে প্রকাশ করে না, সে জন্য অদ্বৈতবাদিগণ জ্ঞানের একটি আবরণ স্বীকার করেন। এই আবরণই তাঁহাদের মতে অবিদ্যা, অজ্ঞান, মায়া প্রভৃতি নামে পরিচিত। এই অজ্ঞান অন্ধকারের মত দ্বিবিধ কার্য্য করিয়া থাকে। প্রথমতঃ যে স্থানে অবস্থান করে, সে স্থানের প্রকৃত অবস্থা গোপন এবং তৎপরে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া কোন সময়ে অন্য রকম পদার্থের উদ্ভাবন (অর্থাৎ উৎপাদন) করিয়া থাকে। উক্ত দ্বিবিধ কার্য্যের উৎপত্তি হয় বলিয়া, এক অজ্ঞানেরই আবরণ ও বিক্ষেপ (অর্থাৎ উৎপাদক) নামক দ্বিবিধ শক্তি স্বীকৃত হইয়াছে। আবরণ-শক্তির সাহায্য ব্যতীত বিক্ষেপ-শক্তি কোন কার্য্য করিতে পারে না। সে জন্য জ্ঞানাবরণ বিদূরিত বা বিনষ্ট হইলে কল্পিত পদার্থের অস্তিত্ব অনুভূত হয় না। আবরণ শক্তি দ্বারা কোন বস্তু আবৃত হইলে, তখনই সেই বস্তুতে অজ্ঞাত ভাব (অর্থাৎ অজ্ঞাততা) উৎপন্ন হয়। সেই অজ্ঞাত ভাবের দূরীকরণ বা বিনাশেই প্রমাণের প্রয়োজন। যেমন আমাদের হস্তাদি ক্রিয়া দ্বারা আলোকাবরণ বস্ত্রাদি বিদূরিত বা বিনষ্ট হয়, সেইরূপ চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়া দ্বারা জ্ঞানালোকের আবরণ রূপ অজ্ঞান বিদূরিত বা বিনষ্ট হইয়া থাকে।

এই সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করিয়াই, বেদান্ত পরিভাষায় ধর্ম্মরাজাধ্বরীন্দ্র প্রমা ও প্রমাণের লক্ষণ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে, অজ্ঞাত ও অবাধিত † বিষয়ে যে জ্ঞান হয়

* রাজসাহী রাণী হেমন্তকুমারী সংস্কৃত কলেজে পঠিত। ১৩১৪ সালের চৈত্র এবং ১৩১৫ সালের আশ্বিনের সংখ্যায় এই প্রবন্ধের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছে। সেই অংশে প্রয়োজনের সাধারণ লক্ষণ, প্রয়োজনের বিভাগ, দর্শন শাস্ত্রের রচনা ও অধ্যয়নের প্রয়োজন, দর্শনশাস্ত্র রচনার সময়, দর্শন শাস্ত্রের বিভাগ, ষড় দর্শন-শব্দ ব্যবহারের কারণ, আস্তিক দর্শন ও নাস্তিক দর্শনের ঐকমত্য ও মতভেদ, বেদান্ত দর্শনের প্রাধান্য, বেদান্ত সূত্র রচনার সময়, শঙ্কর ও শাঙ্কর ভাষ্যের সময়, অদ্বৈতবাদের মূলভিত্তি, ন্যায় দর্শন সম্মত বিচার প্রণালী, ব্রহ্মের লক্ষণ, কার্য্যকারণ ভাব সম্বন্ধে মত ভেদ, ব্রহ্ম-বিবরণ ভাব সম্বন্ধে মত ভেদ, ব্রহ্মবিবর্ত্তবাদ এবং ব্রহ্ম পরিণামবাদ প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে।

† যে স্থানে যে সময়ে যে পদার্থ বর্ত্তমান থাকে সে স্থানে সে সময়ে সে পদার্থকে অবাধিত বলা যায়

তাহার নাম প্রমা, এবং যদ্বারা উক্ত প্রমাজ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহার নাম প্রমাণ। প্রথমতঃ আমাদের চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সহিত কোন পদার্থের সম্বন্ধ হইলে, তখনই সেই পদার্থ সম্বন্ধে মনের একরকম অবস্থা বা ভাব উৎপন্ন হয়। এই ভাব বা অবস্থা বেদান্তশাস্ত্রে 'বিষয়াকার মনোবৃত্তি' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই বিষয়াকার মনোবৃত্তি হইলে, স্বপ্রকাশ জ্ঞানের পরিস্ফোরণ হয়, সেজন্য তাহাকেও জ্ঞান বলা হইয়া থাকে। বাস্তবিক বেদান্ত মতে নিত্য-জ্ঞানরূপ ব্রহ্মই জ্ঞানশব্দের মুখ্যার্থ। যেমন দশা ও তৈল সংযুক্ত অগ্নিদ্বারা গৃহাদি প্রকাশিত হয়, সেইরূপ, পূর্ব্বোক্ত মনোবৃত্তি সংযুক্ত ব্রহ্মরূপ জ্ঞানদ্বারা, বিষয় সকল প্রকাশিত হইয়া থাকে

উক্ত বিষয়াকার মনোবৃত্তির উৎপত্তি হওয়া মাত্রই, জ্ঞেয় বিষয়ে জ্ঞাততা উৎপন্ন হয়, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গেই বিষয়ের অজ্ঞাতভাব বা জ্ঞানাবরক অজ্ঞানতা বিদূরিত বা বিনষ্ট হইয়া থাকে। তখন পূর্ব্বোক্ত মনোবৃত্তি ও জ্ঞানের মধ্যে কোনরূপ আবরণ থাকে না; সুতরাং তখন জ্ঞানরূপ চৈতন্যদ্বারা জ্ঞেয় বিষয়, পূর্ব্বোক্ত মনোবৃত্তি, এবং প্রমাতা এই তিনই প্রকাশিত হইয়া থাকে। এই মতে স্মৃতি অর্থাৎ স্মরণ প্রমাজ্ঞান নহে। কারণ অজ্ঞাত বিষয়ে কখনও কোন ব্যক্তিরই স্মৃতি উৎপন্ন হয় না। সুতরাং স্মৃতির কারণ প্রমাণ মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না। যাঁহারা স্মৃতির কারণকেও প্রমাণ মধ্যে গণনা করেন তাঁহাদের মতে প্রমাণের লক্ষণ এই, যাহা-দ্বারা অবাধিত বিষয় জানা যায় তাহার নাম প্রমাণ। বিশেষ বিবেচনা করিলে স্মরণকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করা সঙ্গত মনে হয় না। কারণ, পূর্ব্বে যাহা অনুভূত হইয়াছে, তাহাই আমাদের স্মরণের বিষয় হইয়া থাকে। সুতরাং পূর্ব্বতন অনুভবের প্রামাণ্য স্বীকার করিতে হইবে; এই অবস্থায় স্মরণের পৃথক প্রমাণ্য স্বীকার নিষ্প্রয়োজন মনে হয়।

বেদান্তসূত্র ও তদীয় ভাষ্য হইতে প্রমাণ সম্বন্ধে কোন বিষয়ই স্পষ্টতঃ জানা যায় না। সূত্র ও ভাষ্য সম্মত প্রমাণ কত প্রকার তাহা বলা বড়ই কঠিন। বেদান্ত পরিভাষা গ্রন্থে প্রমাণের যেরূপ বিভাগ প্রদর্শিত হইয়াছে, আমি তদনুসারেই এস্থানে তাহার বর্ণনা করিব।

বেদান্ত পরিভাষায় লিখিত আছে যে প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, উপমিতি, শাব্দ, অর্থাপত্তি, অনুপলব্ধি ভেদে প্রমাজ্ঞান ষড়্‌বিধ। সুতরাং তাহার করণ প্রমাণও ষড়্‌বিধ, অর্থাৎ ছয় প্রকার।

প্রমাজ্ঞান ও তাহার করণ প্রমাণ ছয় প্রকার হইলেও আমরা আপাততঃ তাহাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিতে পারি। প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের প্রামাণ্য সর্ব্ববাদি সিদ্ধ। অপ্রত্যক্ষ জ্ঞান অনুমিতি প্রভৃতিভেদে পাঁচ প্রকার, ইহা বৈদান্তিক ও মীমাংসকগণ স্বীকার করেন। কিন্তু বৈশেষিক ও বৌদ্ধদার্শনিকগণ অনুমিতির অতিরিক্ত কোনও অপ্রত্যক্ষজ্ঞানেরই প্রামাণ্য স্বীকার করেন না। সাংখ্য দর্শনকার কপিল ও যোগদর্শনকার পতঞ্জলি অনুমিতি ও শাব্দ এই দ্বিবিধ অপ্রত্যক্ষ জ্ঞানের প্রামাণ্য স্বীকার করেন। নৈয়ায়িকগণ

অনুমিতি, উপমিতি ও শাব্দ এই ত্রিবিধ অপ্রত্যক্ষ জ্ঞানকেই প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। এখানে এই সব বিষয়ের সবিস্তার বর্ণনা করিতে হইলে বেদান্ত মত হইতে অনেক দূরে সরিয়া পড়িতে হয়, উক্ত দর্শন সকলের স্ব স্ব মতের বিচার সময়ে এই বিষয় সকলের যথাসম্ভব বিস্তৃত বিচার করিতে ইচ্ছা রহিল।

এক্ষণে বেদান্ত সম্মত প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ জ্ঞানের প্রভেদ প্রদর্শন করা যাইতেছে।

আমাদের প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ, সকল জ্ঞানেই, তিনটী বিষয় অনুভূত হয়। জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান। যিনি জানেন তিনি জ্ঞাতা, যে বস্তুটী জ্ঞান দ্বারা বুঝা যায় তাহা জ্ঞেয়, যাহা দ্বারা জ্ঞেয় বিষয়টী নিয়মিতভাবে বুঝা যায় তাহার নাম জ্ঞান। যে জ্ঞান সময়ে উক্ত তিনটী পদার্থই এক স্থানে উপলব্ধ হয় এবং একটীর অস্তিত্ব থাকিলেই অপরটী থাকিতে পারে এইরূপ মনে হয়, তাহার নাম প্রত্যক্ষ জ্ঞান। প্রত্যক্ষ জ্ঞান সময়ে উক্ত তিনটীই একস্থানে অবস্থান করে এবং একটীর অস্তিত্ব থাকিলে ঐ অপরটীরই সত্তা অনুভূত হইতে পারে। যথা ক্রমে এই বিষয়টীর বর্ণনা করা যাইতেছে। অদ্বৈত বাদানুসারে জড় পদার্থ সকল, সর্ব্বব্যাপি ব্রহ্মরূপ চৈতন্যে (অর্থাৎ জ্ঞানে) কল্পিত। কল্পিত পদার্থের নিজের অস্তিত্ব নাই, যাহাতে কল্পিত হয়, তাহার অস্তিত্ব দ্বারাই ঐ সকল পদার্থ সৎরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে। উক্ত চৈতন্যের অর্থাৎ জ্ঞানের স্বাভাবিক কোন ভেদ নাই। কল্পিত পদার্থ দ্বারা তাহা বিভিন্নরূপে অনুভূত হয়। পূর্ব্বোক্ত জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান এই তিনটী ভাবও একমাত্র পূর্ব্বোক্ত সর্ব্বব্যাপী চৈতন্যে (জ্ঞানে) কল্পিত। চৈতন্যের (জ্ঞানের) যে অংশ আমাদের অন্তঃকরণ দ্বারা সীমাবদ্ধ অর্থাৎ যে অংশে আমাদের অন্তঃকরণ কল্পিত, সেই চৈতন্যাংশ জ্ঞাতৃ চৈতন্য। ঘটাদি বিষয় সকল চৈতন্যের যে অংশে কল্পিত তাহার নাম জ্ঞেয় চৈতন্য। অন্তঃকরণের ভাব অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত বিষয়াকার মনোবৃত্তি যে অংশে কল্পিত তাহার নাম জ্ঞান চৈতন্য। প্রত্যক্ষ জ্ঞানে উক্ত তিনটী চৈতন্যই এক বলিয়া মনে হয়। কারণ প্রত্যক্ষজ্ঞান সময়ে, আমাদের অন্তঃকরণ বা মন, ঘটাদি বিষয় দেশ পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হয়। সুতরাং তখন অন্তঃকরণ পরিচ্ছিন্ন পূর্ব্বোক্ত জ্ঞাতৃচৈতন্য, শরীরের মধ্য হইতে ঘটাদি বিষয় দেশ পর্য্যন্ত সমভাবে পরিব্যাপ্ত থাকে। ঘটাদি বিষয় পরিচ্ছিন্ন চৈতন্য, মাত্র বিষয়দেশে অবস্থিত, কিন্তু সে সময়ে জ্ঞাতৃচৈতন্য শরীরের মধ্য দেশ হইতে আরম্ভ করিয়া বিষয় দেশ পর্য্যন্ত সমভাবে অবস্থিত থাকায়, বিষয় চৈতন্যটী, জ্ঞাতার একাংশরূপে বর্ত্তমান থাকে। এই অবস্থায় জ্ঞাতৃচৈতন্য বৃহৎ এবং জ্ঞেয় চৈতন্য তাহার অংশস্বরূপ, সুতরাং তাহার অপেক্ষা ক্ষুদ্র। বৃহৎ পদার্থ থাকিলেই, তাহার অংশ স্বরূপ ক্ষুদ্র পদার্থ অবস্থিত থাকে। যেমন দশ হাত দীর্ঘ বস্ত্র অবস্থিত থাকিলে, তাহার অংশরূপে এক হাত দীর্ঘ বস্ত্রের অবস্থিতি স্বতঃসিদ্ধ, সেইরূপ প্রত্যক্ষ সময়ে জ্ঞাতৃচৈতন্য অবস্থিত থাকিলে

জ্ঞেয় চৈতন্যের অবস্থিতিও স্বতঃসিদ্ধ, কাজেই তখন, জ্ঞেয় চৈতন্য জ্ঞাতৃচৈতন্যের অভিন্নরূপে প্রকাশিত হয়। এবং পূর্ব্বোক্ত অন্তঃকরণ বৃত্তি, পরিচ্ছিন্ন জ্ঞান চৈতন্য ও জ্ঞেয় চৈতন্য হইতে, অভিন্ন ভাবে অনুভূত হইয়া থাকে। আমাদের অন্তঃকরণ আলোকের মত অতি অল্প সময়ে অধিক দূরে গমন করিতে পারে. সেজন্য বৈদান্তিকগণ তাহাকে তৈজস পদার্থ মধ্যে গণনা করিয়া থাকেন। যেমন আলোক, গবাক্ষরূপ ছিদ্রদ্বারা গৃহমধ্যে পতিত হইয়া গৃহাকার ধারণ করে, সেইরূপ প্রত্যক্ষ জ্ঞান সময়ে, আমাদের অন্তঃকরণ, চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় রূপ ছিদ্রদ্বারা, আংশিক ভাবে নির্গত হইয়া, ঘটাদি বিষয়ে পতিত হয়, এবং বিষয়াকার ধারণ করিয়া থাকে; অন্তঃকরণের বিষয়াকার এই অবস্থাই, পূর্ব্বোক্ত মনোভাব বা মনোবৃত্তি নামে অভিহিত হইয়াছে। এই অন্তঃকরণ বৃত্তি পরিছিন্ন জ্ঞান চৈতন্য, ও জ্ঞেয় বা বিষয় পরিছিন্ন চৈতন্য,--এই উভয়ই তখন একস্থানে অবস্থান করে। সুতরাং সে সময়ে তাহাদের পরস্পর বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয় না, বরং জ্ঞান চৈতন্য জ্ঞেয় বা বিষয় চৈতন্যের অভিন্ন রূপেই, পরিস্ফোরিত হইয়া থাকে। এই অবস্থায় ইহা স্থিরীকৃত হইতেছে যে, প্রত্যক্ষ জ্ঞানে জ্ঞাতৃচৈতন্যের অভিন্ন ভাবে জ্ঞেয় বা বিষয় চৈতন্য, এবং জ্ঞেয় বা বিষয় চৈতন্যের অভিন্ন ভাবে জ্ঞান চৈতন্য প্রকাশিত হয়। সুতরাং প্রত্যক্ষ জ্ঞানে পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ চৈতন্যেরই এক অস্তিত্ব স্বীকার করা সঙ্গত। অপ্রত্যক্ষ জ্ঞানে, উক্ত ত্রিবিধ চৈতন্যের একীভাব পরিলক্ষিত হইতে পারে না। কারণ তখন অন্তঃকরণের সহিত, জ্ঞেয় বস্তুর সাক্ষাৎ ভাবে কোন সম্বন্ধ হয় না, সে সময়ে শরীরের মধ্যেই অন্তঃকরণ অবস্থান করে। এবং শরীর মধ্যস্থিত অন্তঃকরণেই, জ্ঞেয় বিষয়ের ভাব বা জ্ঞেয় বিষয়াকার অবস্থা অর্থাৎ অন্তঃকরণ বৃত্তি উৎপন্ন হয়। সুতরাং অন্তঃকরণ পরিচ্ছিন্ন শরীর মধ্যস্থ জ্ঞাতৃ-চৈতন্য, জ্ঞেয় ঘটাদি বিষয় পরিচ্ছিন্ন বহির্দ্দেশস্থ চৈতন্য হইতে অনেক দূরে অবস্থান করে, এবং অন্তঃকরণ বৃত্তি পরিছিন্ন জ্ঞান চৈতন্য শরীর মধ্যেই বর্ত্তমান থাকে, অতএব তাহাও বিষয় চৈতন্যের দূরবর্ত্তী, কাজেই উক্ত ত্রিবিধ চৈতন্য এক স্থানে থাকিতে পারে না। অতএব অপ্রত্যক্ষ জ্ঞানে উক্ত তিন রকম চৈতন্য অভিন্ন ভাবে অনুভূত হয় না। এই সিদ্ধান্তানুসারে এইরূপ লক্ষণও নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে যে, যে জ্ঞানে পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ চৈতন্য একত্র অবস্থিত থাকায় এক বলিয়া প্রকাশিত হয় তাহা প্রত্যক্ষ, এবং যে জ্ঞানে উক্ত ত্রিবিধ চৈতন্য একত্র অবস্থিত হইতে পারে না, তাহার নাম অপ্রত্যক্ষ। জ্ঞেয় পদার্থের সঙ্গে জ্ঞাতার সম্বন্ধ বিশেষের নাম জ্ঞান। অর্থাৎ যে রকম সম্বন্ধ হইলে জ্ঞাতা জ্ঞেয় বস্তুকে গ্রহণ পরিত্যাগ বা উপেক্ষা করিতে পারেন, সেই রকম জ্ঞেয় ও জ্ঞাতৃ সম্বন্ধকে জ্ঞান বলা যায়। সাক্ষাৎ ভাবে (অর্থাৎ অতি নিকট ভাবে), জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার উক্ত সম্বন্ধের নাম প্রত্যক্ষ জ্ঞান, এবং দূরস্থ জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার উক্ত সম্বন্ধের নাম অপ্রত্যক্ষ জ্ঞান। প্রত্যক্ষ জ্ঞান দ্বারা জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার

সাক্ষাৎ সম্বন্ধ হয় বলিয়া, তাহাকে সাক্ষাৎকার বলা হইয়া থাকে। যাহা বর্ত্তমান ও নিকটবর্ত্তী, তাহাই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয় হয়, অপ্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয় সম্বন্ধে এইরূপ নিয়ম নাই। অতীত ভবিষ্যৎ ও দুরস্থ পদার্থ সকলও তাহার বিষয় হইয়া থাকে। সেজন্যই এইরূপ উক্ত হইয়াছে যে "সম্বদ্ধং বর্ত্তমানঞ্চ গৃহ্যতে চক্ষুরাদিনা" ইন্দ্রিয় সংস্পৃষ্ট নিকটবর্ত্তী বর্ত্তমান পদার্থই চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় দ্বারা গৃহীত হইয়া থাকে।

প্রত্যক্ষ প্রমাণ সর্ব্ববাদিসিদ্ধ এবং সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে অপ্রত্যক্ষ জ্ঞানের কারণ। সেজন্য প্রমাণ নিরূপণ সময়ে, সকল দার্শনিকই প্রথমে প্রত্যক্ষের নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং তাহা সকল প্রমাণের অগ্রগণ্য ইহাও বৈদান্তিক ভিন্ন সকল দার্শনিকই বলিয়া থাকেন। কিন্তু বৈদান্তবাদিগণ বেদান্ত বাক্যকেই প্রমাণের শীর্ষস্থানীয় বলিয়া স্বীকার করেন। তাঁহাদের অভিপ্রায় এই যে প্রত্যক্ষ প্রভৃতি জ্ঞানদ্বারা বিশুদ্ধ ভাবাপন্ন কোন বস্তুই জানা যায় না, মিশ্রিত বস্তুই তদ্দ্বারা জানা যায়। মিশ্রিত বস্তু সকলই কল্পিত। কল্পিত পদার্থ বিষয়ে, যে জ্ঞান হয়, তাহা কখনও যথার্থ জ্ঞান নহে। বিশেষতঃ কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই অপরীক্ষিত প্রত্যক্ষ জ্ঞানের প্রামাণ্য স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। কারণ অনেক সময়ে আমাদের প্রত্যক্ষজ্ঞান, দোষযুক্ত ইন্দ্রিয়দ্বারা হইয়া থকে। সেজন্য প্রত্যক্ষ জ্ঞান যথার্থ জ্ঞান কি না—ইহার পরীক্ষা আবশ্যক।

অন্যান্য প্রমাণদ্বারা প্রত্যক্ষ বিষয় পরীক্ষিত হইলেই তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করা যায়। এই জন্য নারদ স্মৃতির সাক্ষিপ্রকরণে উক্ত হইয়াছে যে—

"তলবদ্দৃশ্যতে ব্যোম খদ্যোতো হব্যবাড়িব।
ন তলং বিদ্যতে ব্যোম্নি ন খদ্যোতো
হুতাশনঃ॥
তস্মাৎ প্রত্যক্ষদৃষ্টেঽপি যুক্তমর্থে পরীক্ষিতুং"

অর্থাৎ আকাশ কড়ায়ের মত, এবং খদ্যোত অগ্নির মত দৃষ্ট হইয়া থাকে কিন্তু বাস্তবিক আকাশ কড়াও নহে বা খদ্যোতও অগ্নি নহে। সে জন্য প্রত্যক্ষগত বিষয়েরও পরীক্ষা কর্ত্তব্য। আমরা আকাশকে নীলবর্ণ এবং চন্দ্রসূর্য্য প্রভৃতি গ্রহগণকে আপেক্ষিক ক্ষুদ্র রূপে দেখিয়া থাকি। কিন্তু অনুমান ও গণিত প্রধান জ্যোতিঃশাস্ত্রদ্বারা বিপরীতভাবে পরীক্ষিত হওয়ায় তাহাতে কোন বিবেচক ব্যক্তিই বিশ্বাস স্থাপন করেন না। বরং তাহাকে মিথ্যা জ্ঞান বলিয়া উপেক্ষা করিয়া থাকেন।

ফল কথা, মিশ্রিত ভাবাপন্ন বস্তু সম্বন্ধে আমাদের যে সকল জ্ঞান হয়, তাহাতে অনেক সময়েই প্রামাণ্য সংশয় হইয়া থাকে। কিন্তু বেদান্ত বাক্য দ্বারা ব্রহ্ম বিষয়ে যে জ্ঞান হয়, তাহার বিষয় একমাত্র বিশুদ্ধ ব্রহ্ম। একমাত্র পদার্থ যে জ্ঞানের বিষয় তাহাতে কোনরূপ অপ্রামাণ্যের সম্ভাবনা নাই। মিলিত পদার্থ জ্ঞানেই তাহা সম্ভাব্য। কারণ, অদ্বৈতবাদিগণের মতে মিলিত পদার্থ মাত্রই পর-প্রকাশ্য। যাহা পর-প্রকাশ্য তাহা কখন ও সন্দিগ্ধ, কখন ও বিপর্য্যস্ত, অর্থাৎ বিপরীত ভাবে জ্ঞানের বিষয় হইয়া থাকে। সুতরাং সেই রকম পদার্থ সম্বন্ধে আমাদের যে সকল জ্ঞান হয়, তাহাতে সকল সময়ে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি না। বেদান্ত প্রতিপাদ্য বিশুদ্ধ ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ জ্ঞান স্বরূপ। ইহাই আমাদের আত্মা। আমার জ্ঞান আছে কি না? এবং আমি আছি কি না? বা আমার আত্মা আছে কি না?—এইরূপ, কিংবা আমার আত্মা নাই এইরূপ নিশ্চয়রূপ বিপরীত জ্ঞান, কোন ব্যক্তিরই কখনও হইতে দেখা যায় না। যুক্তি প্রধান অনুমান প্রভৃতির সাহায্যে জড় পদার্থ সমূহের মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হইলে, বেদান্ত বাক্য দ্বারা আত্ম-তত্ত্ব সম্বন্ধ

যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাতে কোনরূপ অপ্রামাণ্য থাকার সম্ভাবনা নাই। কারণ সংশয় জ্ঞানের বিষয় দুইটী পদার্থ। একটী মাত্র পদার্থকে অবলম্বন করিয়া কখনও তাহা হয় না। অন্ধান্ধকারে কোন বৃক্ষ থাকলে তাহাতে এইরূপ সংশয় হয়—যে "ইহা মনুষ্য কি বৃক্ষ"। এ স্থলে মনুষ্য ও বৃক্ষ উভয়ই সংশয়ের বিষয়। যদি কোন কারণে এরূপ জানা যায় যে "ইহা মনুষ্য নহে," তাহা হইলে উক্ত সংশয় বিদূরিত হয়; অধিকন্তু সেই অবস্থায় "ইহা বৃক্ষ" এইরূপ অবধারণই হইয়া থাকে ও তাহার উপর কোনরূপ অপ্রামাণ্য বা অবিশ্বাস থাকে না। সেইরূপ, যুক্তি প্রভৃতি দ্বারা জড় জগতের মিথ্যাত্ব অসন্দিগ্ধ ভাবে স্থাপিত হইলে বেদান্ত বাক্য দ্বারা আত্মার বিষয়ে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহা বিশ্বাস্য ভাবে সমাদৃত হইতে পারে। ইহা অদ্বৈতবাদিগণের সিদ্ধান্ত। অদ্বৈত সিদ্ধি গ্রন্থে মধুসূদন সরস্বতী কর্তৃক এই বিষয়টী বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে বেদান্তের প্রামাণ্য ও আত্মতত্ত্ব নিরূপণ —ইহার যথা সম্ভব বিস্তৃত বিচার করিতে ইচ্ছা রহিল।

প্রত্যক্ষ—'নির্ব্বিকল্পক ও সবিকল্পক ভেদে দুই প্রকার। কোন বস্তুর সহিত আমাদের ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হইলে, তখনই সেই বস্তু সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে এক প্রকার জ্ঞান উৎপন্ন হয়। কিন্তু সেই জ্ঞান দ্বারা বস্তুটি কি রকম, বা তাহার গুণ ক্রিয়া প্রভৃতি কি—তাহা বিবেচিত হয় না। উক্ত প্রকার জ্ঞানই নির্ব্বিকল্পক নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এক বস্তুর সহিত অপর বস্তুর সম্বন্ধ, নির্ব্বিকল্পক জ্ঞানগম্য নহে। বস্তু সকল অসংসৃষ্ট ভাবে নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান গম্য হইয়া থাকে। সেজন্য নির্ব্বিকল্পক গম্য বস্তু, আমরা শব্দ দ্বারা অন্যকে বুঝাইতে পারি না। পূর্ব্বোক্ত বেদান্ত বাক্য জন্য ব্রহ্মজ্ঞান, নির্ব্বিকল্পক প্রত্যক্ষ। কারণ যুক্তি প্রভৃতি দ্বারা ব্রহ্ম ভিন্ন পদার্থ সমূহের মিথ্যাত্ব স্থিরীকৃত হইলে, একমাত্র ব্রহ্ম সত্তারূপে অবশিষ্ট থাকিবে। সুতরাং তখন ব্রহ্ম ভিন্ন কোন পদার্থের সত্তা অনুভূত হইতে পারে না। এই অবস্থায় বেদান্ত বাক্য দ্বারা যে জ্ঞান উৎপন্ন হইবে, তাহার বিষয় সংসৃষ্ট ভাবাপন্ন বস্তু হওয়া অসম্ভব। কারণ পরস্পর বিভিন্ন পদার্থদ্বয়ের জ্ঞান না থাকিলে, সংসৃষ্ট ভাব জ্ঞান হইতে পারে না। অতএব এইরূপ স্বীকার করাই সঙ্গত যে, অদ্বিতীয় ও অসংসৃষ্ট পদার্থ, 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি বেদান্ত বাক্য জন্য জ্ঞানের বিষয়। উক্ত জ্ঞান নির্ব্বিকল্প ব্রহ্মাববোধ নামে, বেদান্ত শাস্ত্রে অভিহিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে নির্ব্বিকল্পগম্য পদার্থ, শব্দদ্বারা অন্যকে বুঝান যায় না এবং এক্ষণে বলা হইল যে বেদান্ত বাক্য নির্ব্বিকল্প ব্রহ্ম জ্ঞান উৎপাদন করে;—এই দুইটী কথার বিরোধ পরিহারার্থ আমার বক্তব্য এই যে শব্দদ্বারা কোন পদার্থই বিশেষ ভাবে প্রতিপাদিত হইতে পারে না। অন্য পদার্থের নিষেধ প্রদর্শন দ্বারা সাধারণ ভাবেই প্রতিপাদিত হইয়া থাকে। গুড় ও চিনির মাধুর্য্যের তারতম্য কেহই শব্দ দ্বারা বুঝাইতে পারেন না। তাহা দুগ্ধ ও খণ্ড প্রভৃতির মাধুর্য্য হইতে ভিন্ন, ইহা মাত্র শব্দদ্বারা প্রতিপাদন করা যাইতে পারে। সেইরূপ নির্ব্বিকল্প অদ্বিতীয়, শব্দ দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রতিপাদিত হইতে পারে না। তিনি পরিদৃশ্যমান জড়বর্গ হইতে ভিন্ন, ইহা মাত্র শব্দ দ্বারা প্রতিপাদিত হয়। সে জন্য "যদ্বাচা নভ্যুদিতং" ইত্যাদি বিষয় শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে। মহাবাক্যার্থ নিরূপণে এই বিষয়ের বিস্তৃত বিচার প্রদর্শিত হইবে। ক্রমশ।

শ্রীগুরুচরণ তর্কদর্শন তীর্থ।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিসন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত

বঙ্গদর্শন।

মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র।

(২)

আমরা অতঃপর উভয় কবির চিত্রাঙ্কণী প্রতিভার বিচারে প্রবৃত্ত হইব। চিত্রাঙ্কণী প্রতিভা বলিতে সাধারণতঃ যাহা বুঝায়, আমরা সেই অর্থেই চিত্রাঙ্কণী প্রতিভা কথার ব্যবহার করিয়াছি। মনুষ্যহৃদয়ের চিত্রও বোধ হয় চিত্রাঙ্কণী প্রতিভার ভিতর ফেলা অন্যায় হয় না, কিন্তু এ স্থলে আমরা তাহার উল্লেখ করিব না। কিন্তু মনুষ্য-হৃদয়ের চিত্র না হইলেও যথার্থ চিত্রাঙ্কণী প্রতিভা কল্পনার সাহচর্য্যপ্রার্থী না হইয়া থাকিতে পারে না। চিত্র—ভগবৎসৃষ্ট জীবের ও প্রকৃতির। ইহা কোথাও শুধু বাহ্যমাত্রে ব্যবসিত, কোথাও বাহ্যের সহিত ভিতর-টুকুও প্রকাশিত করে। যাহা শুধু বাহ্য দৃশ্যের অঙ্কণে নিবৃত্ত, তাহা উচ্চাঙ্গের চিত্রাঙ্কণ নহে, যাহা অঙ্কিত বস্তুর বাহ্যচিত্রের সহিত তাহার হৃদয়টি পর্য্যন্ত ধরিতে ও দেখাইতে পারে, তাহাই যথার্থ প্রতিভাপ্রসূত। একটি মনুষ্যের মুখের ও সর্ব্বাবয়বের ছবি তোলাও চিত্রাঙ্কণ এবং সেই ছবিতেই তাহার মনের কার্য্যাবলী প্রকটিত করিতে পারাও চিত্রাঙ্কণ; প্রথমটির জন্য সূক্ষ্মদৃষ্টি ও সহিষ্ণুতার আবশ্যক, দ্বিতীয়টির জন্য শুধু এই দুই জিনিসে চলে না, ইহাদের সহিত কল্পনার সংমিশ্রণ আবশ্যক হয়। দৈহিক চিত্র আঁকিতে যে ক্ষমতার প্রয়োজন, মনের চিত্র আঁকিতে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক ক্ষমতার প্রয়োজন করে। আপাততঃ আমি কার্য্য দ্বারা বা বিশ্লেষণ দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করিবার কথা বলিতেছি না, শুধু চিত্রাঙ্কণ দ্বারা সেই ভাব প্রকাশ করিবার কথা বলিতেছি। এ বিষয়ে কবি বা ভাস্কর্য্যশিল্পজ্ঞ, অথবা চিত্রকার এই তিনেরই স্থান একত্র। তবে কবির ইহাতে অনেকটা সুবিধা এই যে চিত্রকার যাহা তুলিকার সাহায্যে, ও ভাস্কর যাহা ক্ষোদন-যন্ত্রের (chisel) সাহায্যে প্রকাশ করিতে বাধ্য হ'ন, কবি তাহা কথার সাহায্যে প্রকাশ করিতে পারেন। তবু, কথার সাহায্য পাইলেও, শুধু চিত্রাঙ্কণে মনের ভাব প্রকাশ করা কম ক্ষমতার পরিচায়ক নহে।

প্রকৃতির চিত্রই বল আর মানুষের মূর্ত্তির চিত্রই বল, শুধু যথাযথ অনুকরণ উচ্চ অঙ্গের কলা নহে। প্রকৃতির চিত্রে তালিকা সম্পূর্ণ করিতে পারিলেই কবির কার্য্য শেষ হয় না, মনুষ্যের চিত্রেও শুধু শারীরবিজ্ঞান (Anatomy) অভ্রান্তরূপে বজায় রাখিতে পারিলেই চিত্রকরের প্রকৃতশক্তির পরিচয় প্রদান করা হয় না। ইহার

অতিরিক্ত কবির আরও কিছু নিষ্পাদ্য আছে। প্রকৃতির চিত্রে মানুষের মন কত খানি জড়িত, প্রকৃতিসুন্দরীর নিজের হৃদয়টিই বা কতখানি প্রকাশিত, কবির লক্ষ্য ও চেষ্টা তাহাই ধরিতে পারা; মানুষ যত ক্ষণ রক্তমাংস, পেশি ও অস্থির সমষ্টিমাত্র, ততক্ষণ কবির চক্ষে সে অবহেলনীয়, যখন মানুষের শরীরে ভাব দ্বারা মনের প্রকাশ হয়, তখনই কবির দৃষ্টি তাহার প্রতি আকৃষ্ট হয়। যে চিত্রে কল্পনা-শক্তির বিকাশ নাই, সে চিত্র বিলোপশীল, কেননা তাহা স্থায়িত্বের দাবী করিবার প্রথম হেতুযুক্ত নহে, অতএব দেখা যাইতেছে যে প্রকৃতির চিত্র, অথবা মনুষ্যের চিত্র আঁকিবার জন্য চিত্রকরের এই দুইয়ের সঙ্গেই যথেষ্ট সহানুভূতি থাকা আবশ্যক। সহানুভূতি ব্যতিরেকে সত্য প্রকাশ হয় না। সত্যপ্রকাশ না হইলে কোনও চিত্রেরই স্থায়িত্ব হইতে পারে না। যাহা কেবল অনুকরণ তাহাতে বিশেষ সহানুভূতির আবশ্যক করে না। "পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল" অথবা "চাঁদ উঠেছে, ফুল ফুটেছে" এ কথা বলিবার জন্য কোনও কলানৈপুণ্য বা সহানুভূতির প্রয়োজন করে না। কিন্তু

> পর্য্যাপ্ত পুষ্পস্তবকস্তনাভ্যঃ,
> স্ফুরৎপ্রবালোষ্ঠমনোহরাভ্যঃ।
> লতাবধূভ্যস্তরবোঽপ্যবাপুঃ
> বিনম্রশাখা ভুজবন্ধনানি॥

কল্পনা করিতে বহুল পরিমাণে তরু ও লতা-বধূর সহিত সহানুভূতির আবশ্যক। প্রকৃতির ভিতর প্রাণপ্রতিষ্ঠা না হইলে, ও মানুষের শরীরের ভিতর মনের প্রতিষ্ঠা না হইলে তাহা কবির কোনও প্রয়োজনে লাগে না, উদ্ভিজ্জতত্ত্বান্বেষী বা বৈদ্যশাস্ত্রচর্চ্চাশীল ব্যক্তির তাহাতে প্রয়োজন আছে, কিন্তু কবির শুধু এই টুকুতেই তৃপ্তি হয় না। সুধীবর রস্কিন কহিয়াছেন—

"Again it does not follow that because such accurate knowledge is necessary to the painter, that it should constitute the painter, nor that such knowledge is valuable in itself and without reference to high ends. Every kind of knowledge may be sought from ignoble motions and for ignoble ends and in those who so possess it, it is ignoble knowledge, while the very same knowledge is in and this mind an attainment of the highest dignity and conveying the greatest of blessing. This is the difference between the mere botanist's knowledge of plants and the great poet's or painter's knowledge of them. The one notes their distinction for the sake of swelling his herbarium, the other that he may render them vehicle of expression and emotion...... Thenceforward the flower is to him a living creature with histories written on its leaves and passions breathing in its motions. *Modern Painters,* Vol I. *Bxpan* X L V.

কবির চিত্রাঙ্কণী প্রতিভার প্রয়োজনীয়তা ও

উচ্চতা এমন সুন্দর ভাষায় ও ভাবে কোথাও অভিব্যক্ত হইয়াছে কি না সন্দেহ।

অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে কবিকঙ্কণ ও ভারতচন্দ্র দুইজন প্রাচীন কালের কবি, ইঁহাদের বিষয় বলিবার জন্ম এত বড় বড় কথার ও আধুনিক মতের অবতারণা করিয়া ভূমিকা করিবার প্রয়োজন কি? এ প্রশ্নের সমাধান এখন না করিয়া ইহারই আনুষঙ্গিক আরও দুই একটি কথা বলিয়া রাখিতে চাহি। প্রশ্নের মীমাংসা পরে আপনা হইতেই এই প্রবন্ধ মধ্যে দৃষ্ট হইবে। কেবল এইটুকু এখানে উল্লেখ করিলেই চলিবে যে, যথার্থ কবিত্ব একটি চিরন্তন বস্তু, ভিন্ন দেশে ইহার ভিন্নরূপ বিকাশ মাত্র হইয়াছে। যাহা কলাবিদ্যার বা কবিত্বের সমালোচনা, তাহা এই চিরন্তন সত্যের বিশ্লেষণ বৈ আর কিছুই নয়। অতএব সে কার্য্য যিনিই করিয়া থাকুন, তদুক্ত সমীচিন মত সর্ব্বদেশের কবির বিষয়ে প্রযোজ্য বলিয়া গ্রাহ্য হইতে কোনও বাধা নাই। এই ভাবের কাব্য-সমালোচনাই আজকাল আদর পায় ও সর্ব্বতোভাবে আদর পাইবার যোগ্য। বিশেষতঃ চিত্রাঙ্কণী প্রতিভার সম্বন্ধে মহামতি রস্কিন যাহা বলিয়াছেন, তাহা এমন একটি সরস উপাদানের উপর প্রতিষ্ঠিত, যে তাঁহার মতের সারবত্তা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

সে যাহা হউক এখন আমাদিগের আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে দুই একটা কথা আরও বলিবার আছে। চিত্রাঙ্কণ কবিগণের যেমন প্রিয় তেমনি কঠিন। কবিগণ এই চিত্র-প্রকাশ অবলম্বন করিয়া তাঁহাদের ভাষা ও অলঙ্কার সাজাইতে ভালবাসেন। কাব্যের ভাষা ও অলঙ্কার নিতান্ত অবহেলার বিষয় নহে। তবে ইহাও সত্য যে ভাষা কিংবা অলঙ্কার যদি কাব্যের উৎকর্ষ সাধন না করে, তবে তাহা উপেক্ষণীয়। ভাষা সাজাও, আপত্তি নাই, কিন্তু শুধু ভাষা সাজাইও না, সে ভাষার একটা প্রয়োজনীয়তা স্বতঃস্ফূর্ত্ত করিয়া তোল, এমন কিছু প্রকাশ কর যাহাতে বুঝা যায় যে তুমি যে ভাষা ব্যবহার করিয়াছ তাহার যথার্থ প্রয়োজন ছিল। যে ভাষার সাহায্যে একটি বিরাট বা কমনীয় চিত্র ফুটিয়া উঠে, যে অলঙ্কার দ্বারা চিত্রিত বস্তুর সৌন্দর্য্য বা মহত্ত্ব স্ফুটতর হইয়া উঠে, সেই ভাষার ও অলঙ্কারের সার্থকতা আছে। যাহা তাহা না করে তাহা খুব সজ্জিত হইলেও তাহার কোনও মূল্য নাই। কবিত্ব কেবল শব্দ-যোজনার চাতুর্য্য নহে, তবে শব্দ-যোজনার শক্তি কবিত্বের একটি উপাদান বটে। শব্দ যতই মিষ্ট হউক যদি সেই শব্দের সাহায্যে কোনও একটি গভীর ভাব বা মহৎ চিত্র সজীব হইয়া না দাঁড়ায়, তবে সে মিষ্টতা বালকের ভাল লাগিতে পারে, কিন্তু চিন্তাশীল ব্যক্তির কাছে সেরূপ শব্দ-জালের মোহবন্ধন অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর ও দুর্ব্বল। শব্দ কবির কামনার বস্তু নহে, কামনার বস্তু প্রাপ্তির উপায় মাত্র। শব্দ যোজন-চাতুর্য্য কবির মহত্ত্বের জন্ম প্রয়োজন, কিন্তু ইহাই তাহার মহত্ত্ব নহে। মহাত্মা রস্কিন ঠিকই বলিয়াছেন যে—"It is not by the mode of representing and saying, but by what is represented and said, that the respective greatness either

of the painter or the writer is to be finally determined."—*Modern Painters*, Vol. I. p. 8.

ভাষার অলঙ্কার সম্বন্ধেও তাঁহার বাক্যবলী বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন—

"There is therefore a distinction to be made between what is ornamental in language and what is expressive. That part of it which is necessary to the embodying and conveying the thought is worthy of respect and attention as necessary to excellence though not the bit of it."—*Modern Painter*, Vol. I, p. 9.

এই কথা মনে রাখিয়া আমরা আমাদিগের কবিদ্বয়ের চিত্রাঙ্কণী প্রতিভার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব। আমরা বলিয়াছি যে ভারতচন্দ্রের শব্দ-যোজন-শক্তি অদ্ভুত। কিন্তু সে শব্দযোজনা যদি কেবল ছন্দের পারিপাট্যে পর্য্যবসিত হইত, তাহা হইলে ভারতচন্দ্রের কাব্য এতদিন টিকিত না। তাঁহার পরবর্ত্তী অনেকগুলি কবি-নামধেয় ব্যক্তি পদ্য লিখিয়াছিলেন, আমরা জানিতে পারিয়াছি তাঁহাদের শব্দ-প্রয়োগচাতুর্য্য অনেক স্থলে ভারতচন্দ্রকেও পরাজিত করিয়াছে। কিন্তু তাঁহাদের লিখিত গ্রন্থ একটিও জীবিত নাই। মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রণীত "বাসবদত্তা" এখনও জীবিত আছে বটে, কিন্তু তাহাও জীবন্মৃত অবস্থায় রহিয়াছে। ভারতচন্দ্রের অন্ত যত দোষই থাকুক, তাঁহার শব্দপ্রয়োগশক্তি উচ্চাঙ্গের শিল্পান্তর্ভূত। কেবল এই শক্তির সহায়তায় তিনি এমন এক একটি চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, যাহা বঙ্গবাসীর হৃদয় হইতে কখনও মুছিবার সম্ভাবনা নাই। যেখানে তাহা হয় নাই সেখানেও তাঁহার পদগুলি এমন একটি সুরে, এমন একটি মূর্চ্ছনাময় আবেশময় সঙ্গীতের তানে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে যে, তাহার অর্থের প্রতি বা ভাবের প্রতি দৃষ্টি করিবার পূর্ব্বেই তাহা আমাদের কর্ণবিবরে ভ্রমরগুঞ্জনের ন্যায় মুখরিত হইতে থাকে।

(১)

হর শশাঙ্কশেখর দয়া কর।
বিভূতিভূষিত কলেবর॥
তরঙ্গ ভঙ্গিত ভুজঙ্গ রঙ্গিত
কপর্দ্দমর্দ্দিত জটাধর।
গণেশ শৈশব বিভূতি বৈভব
ভবেশ ভৈরব দিগম্বর।
ভুজঙ্গকুণ্ডল পিশাচমণ্ডল
মহাকুতুহল মহেশ্বর।
রজঃ প্রভায়ত পদাম্বুজানত
সুদীন ভারত শুভঙ্কর॥

(২)

জয় জগদীশ্বর জয় জগদম্বে।
ভব ভবরাণী ভব অবলম্বে॥
শিব শিবকায়া হর হরজায়া
পরিহর মায়া অব অবিলম্বে॥
যদি কর মমতা হত হয় যমতা
দিবি ভুবি মমতা গুহ হেরম্বে॥
তব জন যে বা সুরপতি কে বা
যম দেই সেবা শির পরিলম্বে।
ভব জল তরণে রাখহ চরণে
ভারত চরণে, করি কাদম্বে॥

(৩)

জয় কৃষ্ণ কেশব রাম রাঘব
কংসদানব ঘাতন।
জয় পদ্মলোচন নন্দ নন্দন
কুঞ্জকানন রঞ্জন॥

ইত্যাদি বিষ্ণুস্তোত্র।

(৪)

জয় শিবেশ শঙ্কর বৃষধ্বজেশ্বর
মৃগাঙ্গশেখর দিগম্বর।
জয় শ্মশান নাটক বিষাণ বাদক
হুতাশ ভালক মহত্তর॥
জয় সুরারিনাশন বৃষেশবাহন
ভুজঙ্গভূষণ জটাধর।
জয় ত্রিলোক কারক ত্রিলোক পালক
ত্রিলোক নাশক মহেশ্বর॥

প্রভৃতি শিবস্তোত্র।

এই সকল ছন্দে শুধু শব্দের সংস্কার মাত্র সাধিত হয় নাই, শুধু বঙ্গভাষা গ্রাম্যভাষা হইতে রাজসভার ভাষায় উন্নীত হয় নাই; ইহাদের ভিতর হইতে যে একটি পুলকময় ঝঙ্কার উঠিতেছে তাহা দ্বারা আমাদিগের মনে বহুদিনের পুরাতন অথচ চিরনূতন বৈষ্ণব-কবিদিগের স্মৃতি জাগরূক করিয়া দেয়; কবিতায় সঙ্গীতের মধুরতার সৃষ্টি করে। জানি না ইহাতে ভক্তির গভীরতা আছে কি না, ইহাতে ভক্তের ভক্তিরসাস্বাদন-পিপাসা মিটিবে কি না, কিন্তু ইহা স্বরমাধুর্য্য-পিপাসুর চিত্তে যে আনন্দের উৎস খুলিবে সে বিষয়ে ভুল নাই। ইহাতে ভাষা-সংস্কারের বিকট চেষ্টার শ্রম আদৌ লক্ষিত হইবে না, ছন্দের ললিত ভঙ্গী ও স্বাধীন গতি কোথাও বিকৃত বা প্রতিহত হয় নাই। এমনি শিল্পনৈপুণ্যে ভারতচন্দ্রের যশঃ সুপ্রতিষ্ঠিত। ইহার সহিত যখন ভাব বা কবিত্ব আসিয়া মিশে তখন সোণায় সোহগা হয়।

এ কি অপরূপ ভঙ্গিমা
চরণে অরুণ রঙ্গিমা।
হইতে সোসর শম্ভু হৈলা হর
দেখি পয়োধর তুঙ্গিমা।
থাকিতে অধরে সুধা সাধ করে
সুধাকরে ধরে কালিমা।
ফুলধনু তনু লাজে ত্যজে ধনু
দেখি ভুরুধনু বক্রিমা।
রূপ অনুভবে মোহ হয় ভবে
ভারত কি কবে মহিমা।

(২)

তবে যে দেখহ ভুমিতে কাশী।
পদ্ম পত্রে যেন জল বিলাসি॥
জলে মিশি থাকে পদ্মের পাত।
জলনাশে নহে তার নিপাত॥

(৩)

ওলো ধনী প্রাণ ধন শুন মোর নিবেদন
সরোবরে স্নান হেতু যেয়ো না লো যেয়ো না
যদ্যপি বা যাও ভুলে অঙ্গুলে ঘোমটা খুলে
কমলকানন পানে চেয়ো না লো চেয়ো না।
মরাল মৃণাল লোভে ভ্রমর কমল ক্ষোভে
নিকটে আইলে ভয় পেয়ো না লো পেয়ো না।
তোমা বিনা নাহি কেহ ঘামে পাছে গলে দেহ
বায়ে পাছে ভাঙ্গে কটি ধেয়ো না লো ধেয়ো না

ভাষার অপ্রতিহত কোমল ভঙ্গী এমন আর কোনও বঙ্গকবিতায় নাই। ইহাদের দ্বারা যে ভাব সকল ব্যক্ত হইয়াছে, সেই রূপ ভাব-ব্যক্তির ক্ষমতা ছিল বলিয়া ভারতচন্দ্র নির্জীব

শব্দকৌশলী মাত্র নহেন ও সেই জন্যই কালের নিরপেক্ষ সমালোচনায় তদ্‌গর্ভে এখনও নিহিত হন নাই। শুধু কথার জোরে বা সৌন্দর্য্যে কোনও কবির মহত্ব ব্যক্ত হয় না। বিদ্যাসুন্দর কাব্যেও যথেষ্ট শব্দচাতুর্য্য আছে, তাহাতে একটিও অশ্লীল শব্দ খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। কিন্তু সেই মিষ্ট কথার সমষ্টি দ্বারা মানুষের একটা নীচ প্রবৃত্তি মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে, অতএব সে শব্দ-পারিপাট্যের কোনও মূল্য নাই, এবং ঐ কাব্যপ্রণয়ন দ্বারা ভারতচন্দ্র নিজের অসারত্ব ভিন্ন আর কিছুই প্রকাশ করেন নাই। ভাবের দোষে "বিদ্যাসুন্দর" বিশেষভাবে দুষ্ট। সে কথা পরে বলিতেছি। আমি বিবেচনা করি যে ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী হইতে "বিদ্যাসুন্দর কাব্য" খানি একেবারে তুলিয়া দিলেও বিশেষ ক্ষতি হয় না; যদিও তদ্দ্বারা দুই একখানি সুন্দর চিত্র হইতে বঙ্গবাসী বঞ্চিত হয়, তথাপি এমন কুরুচিপূর্ণ কাব্য নিজের অস্তিত্বের বড়াই না করাই ভাল।

আমরা প্রসঙ্গক্রমে একটা অবান্তর কথার উত্থাপন করিয়া আসল কথার অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। এখন আবার চিত্রাঙ্কণী প্রতিভার কথা বলিতে প্রবৃত্ত হইব। আমরা পূর্ব্বে যে কথা বলিয়াছি তাহাই এখন প্রমাণ করিবার প্রয়াস করিব। শুধু শব্দের বলে ভারতচন্দ্র যেমন চিত্র অঙ্কিত করিতে সক্ষম হইয়াছেন, বাঙ্গালাকাবিদিগের ভিতর আর কেহ তেমন পারেন নাই। আমাদিগকে একবার সতীর মৃত্যুশ্রবণে ক্রুদ্ধ মহারুদ্রের চিত্রকে স্মরণ করিতে হইবে। এ চিত্র বাহ্যচিত্র মাত্র নহে, এ চিত্রে ভাববিশ্লেষক একটিও কথা খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না, অথচ ইহাতেই যেন রুদ্ররস সজীবমূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমাদের চক্ষের সমক্ষে দাঁড়াইয়াছে, কোথাও বা রুদ্ররসের সহিত বীভৎস রস মিশিয়া সমগ্র চিত্রটিকে এক অসাধারণ নৈপুণ্যের সহিত সম্পূর্ণতা দান করিয়াছে। খুঁজিয়া দেখিলে ইহাতে শব্দচাতুর্য্য ভিন্ন আর কিছুই নাই, বড় ভাবের কোনও কথা নাই, রাগারাগির একটি শব্দও নাই, অথচ ইহারই ভিতর হইতে যেন একটা বিশ্ববিনাশী ক্রোধ মূর্ত্তিমান্ হইয়া আত্মপ্রকাশ করিতেছে। চিত্রটি বহুবার উদ্ধৃত হইলেও তাহা পুনরুদ্ধার যোগ্য।

"মহারুদ্ররূপে মহাদেব সাজে।
ভভম্ভম্ ভভম্ভম্ শিঙ্গা ঘোর বাজে॥
লটাপট্ জটাজূট সংঘট্ট গঙ্গা।
ছলচ্ছল টলট্টল কলকল তরঙ্গা॥
ফণাফণ্ ফণাফণ্ ফণীফন্ন গাজে।
দিনেশ প্রতাপে নিশানাথ সাজে॥
ধকধ্বক্ ধকধ্বক্ জ্বলে বহ্নি ভালে।
ববম্বম্ ববম্বম্ মহাশব্দ গালে॥
দলম্মল দলম্মল গলে মুণ্ডমালা।
কটিকট্ট সাদ্যোমরা হস্তিছালা।
পচা চর্ম্ম ঝুলি করে লোল ঝুলে।
মহাঘোর আভা পিনাকে ত্রিশূলে॥
ধিয়া তাধিয়া তাধিয়া ভূত নাচে।
উলঙ্গী উলঙ্গে পিশাচী পিশাচে॥
সহস্রে সহস্রে চলে ভূত দানা।
হুহুঙ্কার হাঁকে উড়ে সর্পবাণা॥
চলে ভৈরবা ভৈরবী নন্দী ভৃঙ্গী।

মহাকাল বেতাল তাল ত্রিশৃঙ্গী॥
চলে ডাকিনী যোগিনী ঘোর বেশে।
চলে শাঁখিনী প্রেতিনী মুক্ত কেশে॥
গিয়া দক্ষযজ্ঞে সবে যজ্ঞ নাশে।
কথা না সরে দক্ষরাজে তরাসে॥
অদূরে মহারুদ্র ডাকে গভীরে।
অরে রে রে দক্ষ দে রে সতীরে॥
ভুজঙ্গ প্রয়াতে কহে ভারতী দে।
সতী দে সতী দে সতী দে সতী দে॥

আমরা একটি সম্পূর্ণ চিত্রকে খণ্ডিত করিবার কোনও কারণ দেখিতে না পাইয়া সমগ্র চিত্রটিই উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। ইহাকে অনেকে খণ্ডিত করিয়াছেন নিজেদের পসন্দ সই করিয়া লইবার জন্য, কিন্তু আমার মতে তাহার কোনও আবশ্যক ছিল না। ধূম বাদ দিয়া অগ্নি জ্বালা যায় না; ধূমের সহিত মিশিয়াই, অথবা ইহা বলিলে আরও ঠিক হয় যে ধূমাবৃত হইয়াই অগ্নির সম্পূর্ণতা। চতুর্দ্দিকের এই পিশাচী পিশাচের, ভৈরবা ভৈরবীর মধ্যে থাকিয়াই মহারুদ্রের রৌদ্রত্ব আরও উজ্জ্বল হইয়াছে। এই সকলে মিশিয়া যেন একটা প্রলয়কালীন ঝড়ের সৃষ্টি হইয়াছে, যেন সেই ঝটিকোত্থ ধূলি দ্বারা আবৃত গগণের গায়ে "অবৃষ্টিসংরম্ভ অম্বুবাহের" ন্যায় মহারুদ্র-মূর্ত্তি আরও ভয়ঙ্কর হইয়াছে; এবং সেই অম্বুবাহের গর্জ্জন "অরে রে রে দক্ষ দে রে সতীরে" যেন আমাদের হৃদয় পর্য্যন্ত আলোড়িত করিয়া সেই রুদ্র-হৃদয়ের গভীর ক্রন্দন আমাদের হৃদয়েও প্রতিধ্বনিত করিয়া দিতেছে।

এই বিরাট মহৎ চিত্রে ভাবের ফেণিল উচ্ছ্বাস নাই, কিন্তু এক একটি কথায় যেন মহারুদ্রের সমস্ত ভাবটি মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে। "ধকধ্বক ধকধ্বক জ্বলে বহ্নি ভালে" এই কথা কয়টিতে যেন উদ্গীরিত অনলরাশি আমাদিগকে গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে। ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলিতে যেন প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে "ছলচ্ছল টলট্টল কলকল তরঙ্গা"। এই ছত্রে তরঙ্গের তিনটি গুণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, "ছলচ্ছল" জলের প্রবাহব্যঞ্জক, "টলট্টল" জলের নির্ম্মলতাব্যঞ্জক, "কলকল" জলের নিক্কণব্যঞ্জক;—গঙ্গাতরঙ্গের এরূপ সংক্ষিপ্ত ও সুন্দর বর্ণনা বোধ হয় আর কোনও কবিই দিতে পারেন নাই।

দীনেশবাবু 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে' এই সমগ্র চিত্রটির সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহাও উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। "স্থানে স্থানে শুধু ছন্দ ও শব্দের ঐশ্বর্য্যে কোনও মহামহিমান্বিত মূর্ত্তির অপূর্ব্ব অবতারণা হইয়াছে; (ইহার পর তিনি এই চিত্রের কতক উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন) … … নিম্নোদ্ধৃত পংক্তিনিচয়ে মহাদেবের যে ভৈরব সুন্দর চিত্রখানি জাগিয়া উঠিয়াছে তাহা কাব্য-সাহিত্যের শীর্ষদেশে স্থান পাইবার যোগ্য—ইহাতে কবির ভাষা ও ছন্দের উপর আশ্চর্য্য অধিকার প্রতিপন্ন হইয়াছে।"

আমরা বলিয়াছি যে হরগৌরীর চিত্র দুই কবিতেই প্রায় একই রকম আছে। এ শিবসৈন্যের চিত্র কবি মুকুন্দরামেও আছে, তুলনার্থ তাহা আমরা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

"ছিণ্ডিয়া ফেলিল কোপে মহীতলে জটা।
বীরভদ্র হৈল তথি সঙ্গে বীর ঘটা॥
তিন সূর্য্য সম তার তিনটী লোচন।
মাথায় মুকুট তার ঠেকিছে গগণ॥
শূল হস্তে রহে বীর শিবের সম্মুখে।
নয়নে নিকলে অগ্নি ঝলকে ঝলকে॥
* * * * * *
আজ্ঞা পায়ে বীরভদ্র চলে শীঘ্রগতি।
নন্দী আদি করিয়া যতেক সেনাপতি॥
সঙ্গে ষোল কোটি লড়ে প্রেত ভূত দানা,
দামামা দগড় বাজে বিয়াল্লিশ বাজনা॥
বীরভদ্রের তেজ যেন সূর্য্যের প্রকাশ।
অন্ধকার করি দানা চলিল আকাশ॥
পদভরে টলমল করয়ে ধরণী।
ধূলায় আচ্ছাদিত হইল দিনমণি॥"

টীকাটীপ্পনী দ্বারা চিত্র দ্বয়ের পার্থক্য বুঝাইবার আবশ্যক নাই। মুকুন্দরামের চিত্র ভারতচন্দ্রের চিত্রের পাশে নিতান্ত ম্লান ও নিষ্প্রভ। ভারতচন্দ্রের মত শব্দ যোজনা দ্বারা কোনও মহিমময় চিত্র অঙ্কন করিবার শক্তি মুকুন্দরামের ছিল না, তাহা আর একটি চিত্র হইতে প্রতিপন্ন করিতেছি। সে চিত্র আদ্যাশক্তির সংহার-মূর্ত্তি কালীর চিত্র।

মুকুন্দরামের চিত্র এইরূপ—

শঙ্খ যুত ক্ষিতিপাণী কালী কপালমালিনী
সিংহমুখী করালবদনা।
মুখে অট্ট অট্ট হাস করে ধরি অসিপাশ
খট্টাঙ্গধারিণী ঘোর রসনা॥
দ্বীপী চর্ম্ম পরিধানা শুষ্কমাংস ভীষণা
বিস্তারবদনা ভয়ঙ্করা।
লোলজিহ্বা ঘোরমুখী নিমগ্না লোহিত আঁখি
নিষাদে পূরিল দিগন্তরা॥

এ বর্ণনায় দেবীর কোনও অঙ্গহানি হয় নাই কথাগুলি মুকুন্দরামের নিজের নহে মার্কণ্ডেয় চণ্ডী হইতে আনীত সমস্ত বর্ণনাটাই সপ্তশতীর অনুবাদ মাত্র;

"কালী করালবদনা বিনিষ্ক্রান্তাসিপাশিনী॥
বিচিত্র খট্টাঙ্গধরা নরমালাবিভূষণা।
দ্বীপিচর্ম্ম পরিধানা শুষ্ক মাংসাতিভৈরবা॥
অতিবিস্তারবদনা জিহ্বা ললনভীষণা।
নিমগ্না রক্তনয়না নাদপূরিতদিঙ্মুখা॥

অতএব এখানে মুকুন্দরামের কৃতিত্ব কিছুই নাই বলিলেও চলে। কিন্তু ভারতচন্দ্র এই ভয়ঙ্করী মাতৃমূর্ত্তির এক অপূর্ব্ব ভীষণ মনোহর চিত্র আঁকিয়াছেন, শুধু আঁকিয়াছেন তাহা নহে, তাহাকে শব্দমন্ত্রে উজ্জীবিত করিয়া প্রতিমায় প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন:—

মা কালিকে

কালি কালি কালি কালি কালি কালি
কালিকে।
চণ্ড মুণ্ড মুণ্ড খণ্ডি খণ্ড মুণ্ডমালিকে॥
লট্ট পট্ট দীর্ঘ জট্ট মুক্তকেশ জালিকে।
ধক ধক তক তক অগ্নিচণ্ড ভালিকে।
লীহ লীহ লোল জীহ লক লক সাজিকে।
সৃক সৃক ভক ভক রক্তরাজি রাজিকে॥
অট্ট অট্ট ঘট্ট ঘট্ট ঘোর হাস হাসিকে।
মার মার ঘোর ঘার ছিন্দি ভিন্দিভাষিকে॥
ঢক ঢক হক হক পীতরক্ত হালিকে।
থেই থেই থেই থেই নৃত্যগীততালিকে॥
ভীতিচূর্ণ কামপূর্ণ কাতি শুণ্ড বারিকে।
শম্ভু বক্ষ পাদ লক্ষ পাদ পদ্ম চারিকে॥
থর্ব্ব থর্ব্ব দৈত্য গর্ব্ব গর্ব্ব খর্ব্ব কারিকে।
সিংহভাব ঘোররাব ফেরু পাল পালিকে॥

এই চিত্রে সমস্ত কথাগুলির অর্থ বোধ হয় না, কিন্তু আত্মপ্রকাশক শক্তি আছে। জগতের বুকের উপর দিয়া প্রচণ্ড ঝঞ্ঝার মত চিত্রটি আমাদের বুকের উপর দিয়া বহিয়া যায়, একটা ভীষণ শক্তির আকর্ষণে আমরা মুগ্ধ বশীভূত আত্মহারা হইয়া পড়ি, বুঝিতে পারি যে যে শক্তিসাধক শব্দমন্ত্রে এই প্রলয়াত্মিকা মূর্ত্তিকে সজীব করিতে পারিয়াছেন তাঁহার কেন মৃত্যু নাই।

আনন্দ ও কোমলতার চিত্র প্রকাশেও ভারতচন্দ্রের কৃতিত্ব বড় কম নহে, এখানেও তাঁহার অবলম্বন শব্দসজ্জা। এই শব্দমন্ত্রের বলে তিনি অনায়াসে একটা গম্ভীর চিত্রকে আনন্দময় রূপে দেখাইতে পারেন, একটা বিরাট চিত্রকে শান্তিময় করিয়া ফেলিতে পারেন। মহাদেবের রুদ্রমূর্ত্তি আমরা দেখিয়াছি, আনন্দময় মূর্ত্তিও দেখিয়া লই :—

জয় জয় অন্নপূর্ণা বলিয়া।
নাচেন শঙ্কর ভাবে ঢলিয়া ॥
হরিষে অবশ অলস অঙ্গে ।
নাচেন শঙ্কর রঙ্গ তরঙ্গে ॥
লট পট জটা লপটি পায়।
ঝর ঝর ঝরে জাহ্নবী তায় ॥
গর গর গর গরজে ফণী।
দপ দপ দপ দীপয়ে মণি ॥
ধক ধক ধক ভালে অনল।
তর তর তর চাঁদ মণ্ডল ॥
সর সর সরে বাঘের ছাল।
দল মল দোলে মুণ্ডের মাল ॥
তাধিয়া তাধিয়া বাজয়ে তাল।
তাতা থেই থেই বলে বেতাল ॥

ববম্ ববম্ বাজয়ে গাল।
ডিম ডিম বাজে ডমরু ভাল ॥
ভভম্ ভভম্ বাজয়ে শিঙ্গা।
মৃদঙ্গ বাজয়ে তাধিঙ্গা ধিঙ্গা।
পঞ্চমুখে গেয়ে পঞ্চম তালে।
নাচেন শঙ্কর বাজায়ে গালে ॥

শুধু কথার পরিবর্ত্তনে ভাবের অপূর্ব্ব রূপান্তর! যুক্তাক্ষরের কৌশলময় প্রয়োগে ও ছন্দের গাম্ভীর্য্যে যে চিত্র বিরাট ও ভয়ঙ্কর, যুক্তাক্ষর বর্জ্জন ও কোমল ছন্দে সেই চিত্রই আনন্দময়। এই কথার ও ছন্দের সাহায্যেই চিত্র আবার অন্যত্র শান্তিময় হইয়াছে :—

জয় জয় হর রঙ্গিয়া।
কর বিকশিত নিশিত পরশু
অভয় বর কুরঙ্গিয়া ॥
লক লক ফণি জট বিরাজ,
তক তক তক রাজী রাজ
ধক ধক ধক দহন সাজ
বিমল চপল গঙ্গিয়া।
ঢুলু ঢুলু ঢুলু নয়ন লোল,
হুলু হুলু হুলু যোগিনী রোল
কুলু কুলু কুলু ডাকিনী রোল
প্রমদ প্রমথ সঙ্গিয়া।
ভভম্ ভবম্ ভবম্ ভাল
ঘন বাজে শিঙ্গা ডমরু গাল
রুদ্র তালে তাল দেয় বেতাল
ভৃঙ্গী নাচে অঙ্গভঙ্গিয়া ॥

এই চিত্রগুলিতে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে সবগুলিতেই উপকরণ একই, কিন্তু উপকরণগুলি অবস্থা বিশেষে কার্য্য করিতেছে বহুবিধ। ইহাদের আরও বিশেষত্ব এই যে একটি বিশ্বমনোহর দেব-

মূর্ত্তির সহিত প্রকৃতির অনেকখানি জড়িত হইয়া আছে; এক মহাদেবের মূর্ত্তির সহিত গঙ্গার মূর্ত্তি, চাঁদের মূর্ত্তি, অনলের মূর্ত্তি, সর্পের মূর্ত্তি অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িত, কবি একের বর্ণনা কালে এই সকল গুলির বর্ণনা করিবার অবকাশ পাইয়াছেন, ও অনিন্দ্য কৃতিত্বের সহিত তাহাদিগের অবস্থাভেদে রূপভেদ বর্ণনা করিয়াছেন। যাহা প্রথম চিত্রে সর্ব্বগ্রাসী অনল, তাহাই দ্বিতীয় চিত্রে যেন আলোকের শোভা। একে যেমন গঙ্গার একটা উদ্দাম গতি, অপরে তেমনি আনন্দময় নির্ঝরমূর্ত্তি, আবার তৃতীয় স্তরে শান্ত প্রবাহ। একটি চিত্রে মুণ্ডমালার দোলনির সহিত যেন আমরা মহারুদ্রের হৃদয়ের উন্মত্ত স্পন্দন অনুভব করিতেছি, অপরটিতে আনন্দনৃত্যে বুকে ফুলের মালার দোলনির মত মুণ্ডমালার আন্দোলন আনন্দই ব্যক্ত করিতেছে। একটি চিত্রে চন্দ্রের কিরণও যেন অগ্নি উদ্গীরণ করিতেছে, অপরটীতে চাঁদ যেন হাসিয়া হাসিয়া ঢলিয়া ঢলিয়া সরিয়া যাইতেছে, ধরা দিতে চাহিতেছে না। এই সুন্দর চিত্রগুলিতে শুধু একটি দেবমূর্ত্তি জাগরুক হইয়া উঠে নাই, সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতি-সুন্দরীর মধুরমূর্ত্তিও যেন জাগরূক হইয়া পড়িয়াছে। জানি না বঙ্গসাহিত্যে কোন কবি এমন আয়াস-বিরহিত উচ্ছ্বাসবিহীন সরল ও সহজ উপায়ে আশ্চর্য্যজনক কৃতিত্ব দেখাইতে সক্ষম হইয়াছেন কিনা। ভারতচন্দ্র কবি শুধু ছন্দকর্ত্তা নহেন, আমরা এই সকল স্থলে তাহা বুঝিতে পারি। ভারত-চন্দ্রের মনে একটি চিত্র প্রথমে জাগিয়া উঠে, সেই চিত্র প্রকাশের জন্য যেন কথাগুলি আপনি আসিয়া যোগায়; কথাগুলা তাঁহার সম্পূর্ণ আয়ত্তের মধ্যে, তাঁহার অধীন হইয়া কার্য্য করে, নিজেদের দেহ ভাঙ্গিয়া চুরিয়া, সারকাসের রিংমাষ্টারের চাবুকের ঘায়ে ক্রীড়াপ্রদর্শকগণের মত সেই চিত্র সজ্জিত করিবার জন্য আসিয়া জুটে। ভারত-চন্দ্রের শব্দপ্রয়োগশক্তির ইহাই বিশেষত্ব।

ভারতচন্দ্রের সমকক্ষ না হইলেও মুকুন্দ-রামও চিত্রাঙ্কণ-কার্য্যে বিশেষ দক্ষ। তাঁহার তুলিকায় বিরাট চিত্র তেমন ভাল ফুটে নাই বটে, কিন্তু কোমল চিত্র অনেকগুলি ফুটিয়াছে। কালীদহের চিত্র প্রসিদ্ধ।

শ্বেত রক্ত নীল পীত, শতদলে বিকশিত
কহ্লার কুমুদ কোকনদ।
* * *
অপরূপ দেখি কালীদহে॥
কমলে কুমুদ ফুটে কার কান্তি নাহি টুটে
চিত্র গন্ধ লৈয়া বায়ু বহে॥
মধুকর সনে বধূ বিকচ কমলে মধু
পান করি গায় কলগীত।
গীতে সমাহিত মন দলে দলে মৃগীগণ
যেন রাহু চিত্রের নির্ম্মিত॥
কমল পরাগে গোর, আমার লোচন চোর
ফিরি ফিরি বুলে অলিকুল।
ক্ষণেক কৈরবে বসে ক্ষণে মত্ত মধুরসে
বিরহী জনার চিত্তশূল॥
ডাহুক ডাহুকী ডাকে চক্রবাকী চক্রবাকে
বদনে বদনে আলিঙ্গন।
চারি পাঁচ মিলি যাযি তাণ্ডব করয়ে কামী
মন্দ মন্দ মেঘের গর্জ্জন॥
নাহি লখি কিবা হেতু এককালে ছয় ঋতু
গ্রীষ্মহিম শিশির বসন্ত।

সঙ্গে মকর কেতু বরিষা শরৎ ঋতু
বিরহী জনের করে অন্ত ॥
রাজহংস করে কেলি, কৌতুকে মৃণাল তুলি
প্রিয় মুখে করে আরোপণ।
চঞ্চু পুটে বিন্ধি মাছে সারস সারসী নাচে
উড়ে বৈসে খঞ্জনী খঞ্জন ॥

ইহাকে আমি একটি নিরাবিল সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি বলিতে পারি। এই চিত্রে প্রকৃতির একখানি অখণ্ডিত চিত্র প্রতিফলিত হইয়াছে; কুমারসম্ভবের তৃতীয় অঙ্কের সুন্দর চিত্রের আভাস ইহাতে পাওয়া যায়। সৌন্দর্য্য সংযত, অথচ আনন্দময়। এই আনন্দময় দৃশ্যের মধ্যে কবি 'কমলে কামিনী'কে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এমনি একটি সুন্দর চিত্রের মাঝখানে ভারতচন্দ্র অন্নপূর্ণার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, সে চিত্রখানিও কল্পনা দ্বারা উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে এবং ভারতচন্দ্রের নিজস্ব যে বর্ণোজ্জ্বলতা, ভাষার লীলাচাঞ্চল্য, তাহাও অতি সুন্দররূপে পরিস্ফুট হইয়াছে—

মধুমাস প্রফুল্ল কুসুম উপবন।
সুগন্ধি মধুর মন্দ মলয় পবন ॥
কুহু কুহু কুহু কুহু কোকিল হুঙ্কারে।
গুন গুন গুন গুন ভ্রমর ঝঙ্কারে ॥
সুশোভিত তরু লতা নবদল পাতে।
তর তর থর থর ঝর ঝর বাতে ॥
অলি পিয়ে মকরন্দ কমলিনী কোলে।
সুখে দোলে মন্দ বায়ে জলের হিল্লোলে ॥
ঘরে ঘরে নানা ছন্দে বসন্তের গান।
সঙ্গে ছয় রাগিণী বসন্ত মূর্ত্তিমান ॥
শুষ্ক তরু শুষ্ক লতা রসেতে মুঞ্জরে।
মঞ্জরীতে মুকুল আকুল মন করে ॥
তরুকুল প্রফুল্ল কুসুম ছলে হাসে।
তাহে শোভে মধুকর মধুকরী পাশে ॥
ধন্য ঋতু বসন্ত সুধন্য চৈত্র মাস।
ধন্য শুক্লপক্ষ যাহে জগত উল্লাস ॥

"তর তর থর থর ঝর ঝর বাতে" এই পংক্তিতে "নবদল পাতের" হৃদয়ের আনন্দটুকু যেন মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে। জগতের এই উল্লাসময় অবস্থায় "বসিলা অন্নপূর্ণা মণি দেউলে"। সঙ্গে সঙ্গে জগদুদ্ভাসিনী প্রকৃতিতে যেন কোন সঞ্জীবন মন্ত্র প্রভাবে জীবনী ও হ্লাদিনী শক্তির আবির্ভাব হইল—

কমল পরিমল, লয়ে শীতলজল
পবনে ঢল ঢল উছলে কূলে;
বসন্তরাজ আনি ছয় রাগিণী রাণী,
পাতিল রাজধানী অশোকমূলে ॥

কবির চক্ষে প্রাকৃতিক কোনও দৃশ্য বা কোন ভাবই নির্জ্জীব নহে, সকলই যেন উজ্জীবিত হইয়া নিজ নিজ কার্য্য করিতেছে, আনন্দ বিলাইতেছে ও আনন্দ উপভোগ করিতেছে। ইহা শুধু তালিকা নহে। প্রকৃতিকে এই ভাবে দেখাই যথার্থ কল্পনার কাজ। কবির হৃদয়ের আনন্দ, নূতন ছন্দে মৃদুল ভাষায় কমল পরিমলবাহী শীতল জলের মত যেন উছলিয়া পড়িতেছে। কিন্তু এখানে কবির আনন্দ উচ্ছৃঙ্খল নহে, সংযত; তাই এই চিত্র সুন্দর। সৌন্দর্য্য বাহ্যোপকরণে সৃষ্ট হউক বা হৃদয়োপকরণেই সৃষ্ট হউক সংযত না হইলে তাহার গরিমা নাই।

এই চিত্রদ্বয়ের তুলনায় সমালোচনা করিলে আমরা ইহাদের মধ্যে একটুখানি তারতম্য দেখিতে পাই, সে তারতম্য শুধু

শব্দ ও ছন্দের নহে। এক জন ছন্দ ও শব্দের ঐন্দ্রজালিক, আর এক জন তাহা নহেন, ইহা তো স্পষ্টতঃই দেখা যায়। প্রভেদটুকু এই যে কবিকঙ্কণের চিত্র সুন্দর বটে, কিন্তু তাহাতে কুমুদ-কহ্লারের পুষ্পত্ব ঘুচে নাই, এই পুষ্পত্বের যে বর্ণবৈচিত্র্য তাহা স্বাভাবিক ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহারা অচেতন পুষ্প ব্যতিরিক্ত আর কিছুই নহে। কিন্তু ভারতচন্দ্রের চিত্রে প্রাকৃতিক পদার্থ গুলি সচেতনত্ব লাভ করিয়াছে—Ruskin-এর ভাষায়—Thenceforward the flower is to him a living creature, with histories written on its leaves and passions breathing in its motion. It * * * is no more point of colour, no meaningless spark of light.

চিত্রাঙ্কণে ভারতচন্দ্র বিশেষ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতির চিত্র তিনি অধিক আঁকেন নাই। মুকুন্দরাম অনেকগুলি প্রকৃতির চিত্র আঁকিয়াছেন, যথাযথ বর্ণনায় তিনি সিদ্ধহস্ত। প্রকৃতির যে মূর্ত্তি তিনি যখনই আঁকিয়াছেন তখনই তাহা নিখুঁত ফটোগ্রাফের মত প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। কলিঙ্গে ঝড়ের বর্ণনা এইরূপ একখানি নিখুঁত ছবি।

"ঈশানে উরিল মেঘ সঘনে চিকুর।
উত্তর পবনে মেঘ ডাকে দুর দুর॥
নিমিষেকে ঝাপে মেঘ গগনমণ্ডল।
চারি মেঘে বরিষে মুষল ধারে জল॥
কলিঙ্গে থাকিয়া মেঘ করে ঘোর নাদ
প্রলয় ভাবিয়া প্রজা ভাবয়ে বিষাদ॥
হুড় হুড় দুড় দুড় করে বিমুখিয়া ঝড়।
বিপাকে চত্বর ছাড়ি প্রজা দিল রড়॥
ধূলি আচ্ছাদিত হৈল সকল পুরীতে।
উঠি বসি করে সব প্রজা চমকিতে॥
চারি মেঘ বরিষয়ে অষ্ট গজ রাজ।
সঘনে চিকুর পড়ে বেঙ্গ তড়কা বাজ॥
করিকর সমান বরিষে জলধারা।
জলে মহী একাকার পথ হৈল হারা॥
ঘন বজ্র ধ্বনি চারি মেঘের গর্জ্জন।
কারো কথা শুনিতে না পায় কোন জন॥
পরিচ্ছিন্ন নাহি সন্ধ্যা দিবস রজনী।
সেওয়া সকল লোক জনকজননী॥
হুড় হুড় দুড় দুড় শুনি ধ্বনি ঝন ঝন।
না পায় দেখিতে কেহ রবির কিরণ॥

কবিকঙ্কণের দৃষ্টি সূক্ষ্ম, তাঁহার চক্ষে কোনও অঙ্গটি বাদ পড়ে না। সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনটাকেও তিনি যেন চক্ষের সামনে দেখিতে পান। নদীর বন্যার মূর্ত্তি তিনি দুইটি ছত্রে এত নিপুণ ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন যে মনে হয় যেন ধবল বন্যা আমাদের চক্ষের উপর সপ্ত তাল হইয়া খেলিয়া বেড়াইতেছে ঃ—

পূর্ব্বদিকে আইল বন্যা দেখিতে ধবল।
সপ্ত তাল হ'য়ে গেল মগরার জল॥

ভারতচন্দ্রেও ঝড়ের বর্ণনা আছে, তাহাও অঙ্গহীন হয় নাই সত্য, কিন্তু মনে হয় যেন কবি-কল্পনার সাক্ষ্য সে ঝড়ের মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করে নাই, তাই তাহা অনেকটা কৃত্রিমতা-দোষের ভাগী হইয়াছে। তাহা হইলেও ইহাতে কবির সূক্ষ্মদৃষ্টির পরিচয় ভেকের স্বরের বর্ণনায় বেশ পাওয়া যাইতেছে। সন্ধ্যায় গা ঢাকা অন্ধকারে কেহ যদি জল-

কল্লোলিত পল্লীর মাঠে বর্ষার শোভা দেখিয়া থাকেন তাহা হইলে তিনি বুঝিতে পারিবেন যে ভেকের মক্‌মকানি সমস্ত স্বরের সহিত কেমন ঐক্যতানে সংবদ্ধ।

মুকুন্দরামের প্রকৃতির চিত্রে একটি বিষম দোষ আছে ; তিনি একই চিত্র একই কথায় বার বার বর্ণনা করেন, তাহাতে কিছু মাত্র বৈচিত্র্য প্রদান করেন না, সুতরাং সেগুলি একঘেয়ে হইয়া পড়ে। এ দোষ তাঁহার অন্যান্য বর্ণনায়ও পাওয়া যাইবে। ভারতচন্দ্র যেমন শব্দের চাতুর্য্যে একই চিত্র বহুমূর্ত্তিতে দেখাইতে পারেন মুকুন্দরাম তাহা পারেন না। মুকুন্দরাম কবি, শিল্পী নহেন, ইহা হইতে তাহাই প্রমাণ হয়।

মুকুন্দরাম কিম্বা ভারতচন্দ্র এ দুইকবির কেহই প্রকৃতির উপর নিজেদের সৃষ্ট পাত্র পাত্রীর মনের ভাব চাপাইয়া দেন নাই। "Pathetic fallacy" অথবা উৎপ্রেক্ষা অবস্থাবিশেষে একটি সুন্দর কাব্যালঙ্কার হইলেও তাহা প্রকৃতির সহিত সহানুভূতির লক্ষণ নহে, এবং কথঞ্চিত মিথ্যারাগ রঞ্জিত। সুকবিগণ এই জন্য প্রায়ই ইহার বর্জ্জন করিবার প্রয়াসী ও পক্ষপাতী। বরঞ্চ, নিজের বা নিজসৃষ্ট পাত্রপাত্রীর মনের অবস্থা যেমনই হউক না কেন, তাঁহারা প্রকৃতির সৌন্দর্য্য বা নিজত্ব লোপ করেন না। আমার মনে যে দিন আনন্দ সেই দিন প্রকৃতিসুন্দরীকেও হাসিতে হইবে, যে দিন আমি সুখী, সে দিন ঝড় বাদল হইবে না, এবং যে দিন আমি দুঃখী, সে দিন কোনও ক্রমেই চাঁদ উঠিবে না, এমন কিছু লেখা পড়া নাই ; অতএব Pathetic fallary দ্বারা প্রকৃতির চিত্র প্রকাশ করিতে গেলে আমাদের মনের চিত্র ফুটিতে পারে, কিন্তু প্রকৃতির চিত্র ম্লান হইয়া পড়ে। কবি মুকুন্দরাম প্রকৃতিকে এমন ক্ষুদ্র ভাবে দেখেন নাই। আমরা দেখিতে পাই যে মুকুন্দরামের কবিত্ব অনেক পরিমাণে কালিদাসের কবিত্ব দ্বারা অনুপ্রাণিত। কালিদাসের কাছ হইতে মুকুন্দরাম প্রকৃতিকে একটি স্বতন্ত্র সত্বা দিতে শিখিয়াছিলেন ; প্রকৃতিকে তিনি বা তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রগুলি আত্মীয় ভাবে দেখিতে শিখিয়াছিলেন। প্রকৃতি সৃষ্টি যে কেবল মানুষের সুখের জন্যই হইয়াছে, এ কথা মুকুন্দরামের মনে একবারও উদয় হয় নাই। তাঁহার কাছে মানুষ ও প্রকৃতি উভয়েই এক দেবতার আদেশে নিজ নিজ কার্য্য করিয়া যাইতেছে, মানুষ ও প্রকৃতি এক অচ্ছেদ্য সৌহৃদ্য-বন্ধনে আবদ্ধ। তাহারাও আলাপ সম্ভাষণের যোগ্য, ঝগড়া করিবার যোগ্য। বিরহিণী খুল্লনার বিরহক্লিষ্ট হৃদয়ে প্রকৃতির কোনও সৌন্দর্য্যই লুপ্ত হয় নাই, তাহার চক্ষে তরুলতা ভ্রমরভ্রমরী কোকিল সকলেরই স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে ; লতিকা এত দুঃখেও তাহার বেদনা জানাইবার সখী স্বরূপ।

"মন্দ মন্দ বহে হিম দক্ষিণ পবন।
অশোক কিংশুকে রামা করে আলিঙ্গন॥
কেতকী ধাতকী ফুটে চম্পক কানন।
কুসুম পরাগে মত্ত হৈল অলিগণ॥
লতায় বেষ্টিত রামা দেখিয়া অশোক।
খুল্লনা বলেন সই তুমি বড় লোক॥
সই সই বলি রামা কোলে কৈল লতা।
স্বরূপ কহ না সই তপ কৈলে কোথা॥

আমা হৈতে জনম তোমার হৈল ভাল।
তোমার সোহাগে বন করি আছ আলো॥
ময়ুর ময়ূরী ডাকে সুমধুর ডাক।
শুনিয়ে খুল্লনার চিত্তে বড়ই বিষাদ॥
এক ফুলে মধু পিয়ে ভ্রমর দম্পতি।
সুমধুর গায় গীত দোঁহে একমতি॥

খুল্লনার হৃদয়ে বিষাদ বর্ত্তমান বলিয়া কবি তো প্রকৃতির একটি সৌন্দর্য্যেরও লোপ করেন নাই, খুল্লনার দৃষ্টি সকল সৌন্দর্য্যের প্রতি আকৃষ্ট করিতেও বিরত হন নাই। এখানে কেহ বা খুল্লনার সখী, কেহ বা খুল্লনার বিনয় পাত্র, কেহ বা খুল্লনার কাছে গালি খাইতেছে।

ভ্রমরী ভ্রমর তোরে যুড়ি কর,
না গেয়ো মধুর গীত।

খুল্লনা কোকিলকে ডাকিয়া বলিতেছেন :—

কে তোমারে বলে ভাল, ভিতরে বাহিরে কাল
বধ কৈলে অনাথা যুবতী॥
আর যদি কাড় রা মদনের মাথা খা,
বসন্তের শতেক দোহাই।
তোর রব সম শর অঙ্গ কৈল জর জর
অনাথীরে তোর দয়া নাই॥

একটা জাতীয় সহানুভূতির ফলে বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণকান্তের উইলে রোহিণীর মুখে এমনি একটী তিরস্কার লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই যে বিশ্বের সহিত, বিশ্বের খুঁটিনাটি সকলের সহিত আত্মীয়তা, ইহাই আমাদের জাতীয় বিশেষত্ব। পাশ্চাত্য-শিক্ষা-প্রণোদিত কবিগণ এই আত্মীয়তা ভুলিয়া প্রকৃতিকে নিজেদের আমোদের উপাদান স্বরূপ কল্পনা করিতে শিখিতেছেন। বহিঃ, প্রকৃতিকে যেখানে দূর করিয়া পর করিয়া ভাবে, যেখানে মানুষ আপনার চারিদিকে প্রাচীর তুলিয়া জগতের সর্ব্বত্র কেবল ব্যবধান রচনা করিতে থাকে, সেখানকার সাহিত্যে এরূপ সৃষ্টি সম্ভবপর হইতে পারেনা। তাহাদের কাছে প্রকৃতি হয় স্বকীয় প্রীতির বস্তু, নচেৎ তাহা বিরোধের বস্তু। তাহাকে বাধ্য করিয়া নিজেদের দাসত্বে নিযুক্ত করা তাঁহারা পরমপুরুষার্থ মনে করেন। স্বয়ং সেক্সপীয়র Ariel চরিত্রে সেই বিরোধ ভাবের প্রশ্রয় দিয়া গিয়াছেন। প্রকৃতির কার্য্য আর্য্য-সাহিত্যে বড় সুন্দর ভাবে নির্দ্দেশিত হইয়াছে। রবি বাবুর সরল ভাষায়—"সে কাজ টেম্পেষ্টের এরিয়েলের ন্যায় শাসনবদ্ধ দাসত্বের বাহ্য কাজ নহে; তাহা সৌন্দর্য্যের কাজ, প্রীতির কাজ, আত্মীয়তার কাজ, অভ্যন্তরের নিগূঢ় কাজ।"

মুকুন্দরামের বর্ণনায় ইন্দ্রিয়পরতা এবং আধ্যাত্মিকতা এই দুই দোষই স্বাভাবিক সরলতার সহিত পরিহৃত হইয়াছে। প্রকৃতির দৃশ্যগুলি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করিয়া তিনি আধ্যাত্মিকতা দোষ বর্জ্জন করিয়াছেন, এবং তাহাদিগকে মনের কার্য্যপ্রবর্ত্তক করিয়া ইন্দ্রিয়পরতার দোষও বর্জ্জন করিয়াছেন। প্রকৃতির চিত্রাঙ্কণে এই দুইটী দোষ বড় সহজেই প্রবেশ লাভ করে। প্রকৃতিকে প্রেমের চক্ষে দেখিয়াও যাঁহারা কেবল তাহার ভিতর হইতে তথ্য নিষ্কাশণ করিতে চেষ্টা করিতে থাকেন তাঁহারা আধ্যাত্মিকতা দোষে দুষিত হয়েন। Word sworth ইহার নিদর্শন। আর যাঁহারা প্রকৃতিতে কেবল চক্ষু কর্ণাদির তৃপ্তি সাধিত করিবার উপায় খোঁজেন তাঁহারা ইন্দ্রিয়পরতা দোষাক্রান্ত

Thompson প্রভৃতি কবিগণ ইহার নিদর্শন। প্রকৃতি বর্ণন বিষয়ে কবিকঙ্কণ ও ভারতচন্দ্র উভয়েই এই দুই শ্রেণীর কবিগণ হইতে একটু পৃথক্।

সে পার্থক্য তাঁহাদিগের জাতীয় শিক্ষা হইতে আসিয়াছে। এ বিশ্বজগতের সকলি যে বিশ্বনিয়ন্তার একটী সুন্দর সুবর্ণ সূত্রে মণিগণের ন্যায় গ্রথিত, সকলেই সকলের আত্মীয়, এ সংস্কার আমাদের জাতীয় সংস্কার। অতএব আমরা প্রকৃতিকে অন্য চক্ষে দেখিতে শিখিয়াছি। সে শিক্ষা যে আমরা বিকৃত সংস্কারবশতঃ ভুলিতে বসিয়াছি ইহাই দুঃখের বিষয়, এবং এই জন্যই বলিয়াছি যে আমাদের প্রাচীন কবিদিগের চর্চ্চা করিলে সময় নিতান্ত অপব্যয়িত হইবে না।

প্রকৃতির চিত্র যেমন চিত্রাঙ্কনী প্রতিভার অন্তর্গত, মনুষ্যের রূপ-বর্ণণাও তেমনি তাহারই অন্তর্গত। রূপ-বর্ণনা মুকুন্দরামও ভারতচন্দ্রে অনেক আছে। কিন্তু তাহার বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন নাই। রূপ বর্ণনায় উপমাদি অলঙ্কার কবিগণের আশ্রয়ণীয়। কিন্তু উপমা বা উৎপ্রেক্ষা যতটুকু স্বাভাবিক ততটুকু প্রযুক্ত হইলেই রূপবর্ণনা স্বাভাবিক ও সুন্দর হয়, নচেৎ তাহা অপ্রীতিকর হইয়া পড়ে। যাহা রূপটুকু ফোটাইবার জন্য প্রয়োজন তাহাই শোভন অলঙ্কার, যাহা কেবল বর্ণোজ্জলতা প্রদান সংকল্পে প্রযুক্ত হয়, তাহাতে চিত্রের সৌন্দর্য্য নষ্ট হয় —তাহা শুধু বাহাদুরিতে দাঁড়ায়। ভারতচন্দ্রের রূপ বর্ণনায় এই দোষ লক্ষিত হয়। তাঁহার বিদ্যাসুন্দরের বিদ্যার রূপবর্ণনা অত্যন্ত কৃত্রিম। মুকুন্দরামের রূপবর্ণনায় অলঙ্কার-বাহুল্য আছে সত্য কিন্তু সে উপমা-বাহুল্যের দ্বারা তাঁহার হৃদয়ও জড়িত, তাহাতে কেবল উৎপ্রেক্ষার ঘটা দৃষ্ট হয় না। যে মূর্ত্তিটী তিনি আঁকিতে ইচ্ছা করেন তাহা সুন্দর ভাবে অঙ্কিত হয়। কমলে-কামিনীর চিত্রটী এইরূপ মধুর। অন্নপূর্ণার মোহিনী মূর্ত্তিতেও ভারতচন্দ্র এমন স্বাভাবিকতা দিতে পারেন নাই। ভারতচন্দ্র এখানে নিজস্ব গর্ব্বে একটু মত্ত হইয়াছেন। তিনি অন্নপূর্ণার কমনীয় মূর্ত্তিটী চিত্রিত করিতে গিয়া 'কেমন লিখিতেছি' এই কথাটী ভুলিতে পারেন নাই। বার্দ্ধক্যের চিত্র উভয় কবিই নিপুণ ভাবে আঁকিয়াছেন। দারিদ্র্যের চিত্রও কবির কাব্যে বিদ্যমান আছে। কিন্তু এই সকলের বিশ্লেষণের স্থল অন্যত্র। চরিত্র-সৃষ্টির বিচার কালে এই সকল চিত্রের কথা আমাদিগকে আবার উত্থাপন করিতে হইবে। অতএব আমরা এই খানেই মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্রের চিত্রাঙ্কণী প্রতিভার বিষয়ে আমাদিগের বক্তব্য শেষ করিলাম।

মুকুন্দরামে ও ভারতচন্দ্রে যথার্থ ইতর বিশেষ কোথায় তাহা তাঁহাদিগের কাব্যসৃষ্ট চরিত্র বিশ্লেষণ না করিলে বুঝা যাইবে না। অতঃপর আমরা তাহার আলোচনা করিব।

ক্রমশ

ভারতে ইংরাজের পদার্পণ।

জনশ্রুতি এইরূপ যে ৮৮৩ খৃঃ ইংলণ্ডাধিপতি য়্যালফ্রেড, মালিয়াপুরে ঋষি টমাসের যে গোর আছে তথায় উপাসনাদি করিবার জন্য সিঘেল মাস নামক ইংলণ্ড দেশীয় এক ধর্ম্মযাজককে প্রেরণ করেন। এ জনশ্রুতির মূলে কতদূর সত্য নিহিত আছে তাহা জানিবার বিশেষ কোন উপায় নাই। তবে, প্রচার যে, সিঘেলমাস কেবল উপাসনাতেই নিযুক্ত না থাকিয়া প্রত্যাগমন কালে যথেষ্ট পরিমাণ মসলা ও মণিমুক্তা সঙ্গে লইয়াছিলেন। উপরোক্ত ঘটনার প্রায় সাত শত বৎসর মধ্যে শ্বেতদ্বীপবাসী অন্য কোন ব্যক্তির ভারতবর্ষে আগমনের সংবাদ পাওয়া যায় না। কিন্তু ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হইবার বিশ বৎসর পূর্ব্বে ভারতে ইংরাজের পদার্পণ হইয়াছিল এবং সেই সময় হইতেই ভারতবর্ষের দিকে ইংরাজের দৃষ্টি নিপতিত হয়।

পনর শত উনাশী খৃষ্টাব্দে টমাস ষ্টিফেন্স (Thomas Stephens) নামক একজন ইংরেজ এতদ্দেশে আগমন করিয়াছিলেন। প্রকৃত পক্ষে ষ্টিফেন্সই প্রথম শ্বেতদ্বীপ-বাসী যিনি ভারতবর্ষে আগমন করিয়া কিছু-কালের জন্য বসবাস করেন। ষ্টীফেন্স ১৫৭৯ খৃষ্টাব্দে গোয়া পৌছেন এবং সাল-সিটের জিসুইট কলেজের রেক্‌টরের পদে নিযুক্ত হন। ষ্টীফেন্স অক্সফোর্ডের বিশ্ব-বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং ভারত-বর্ষে আসিয়া তিনি তাঁহার পিতার নিকট যে সকল পত্র লেখেন তাহার দুই একখানি এখনও পাওয়া যায়। দুঃখের বিষয় ঐ সকল পত্রে তিনি কেবলমাত্র গোয়া ও তন্নি-নিকটবর্ত্তী স্থানের বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু কেবলমাত্র ঐ প্রদেশের বর্ণনা থাকিলেও ঐ পত্রগুলি তৎকালে বিলাতে যথেষ্ট আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিল। অনেকের মতে ষ্টীফেন্সের পত্রই ইংলণ্ড-বাসীদের দৃষ্টি ভারত বর্ষের উপর নিপাতিত করে। *

ষ্টীফেন্সের এতদ্দেশে আগমনের চার বৎসর পরে অর্থাৎ ১৫৮৩ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনের জনৈক বণিক মাষ্টার রল্ফে ফীচ (Master Ralphe Fitch) এতদ্দেশে ভ্রমণার্থ আগমন করেন। ইংরাজ পর্য্যটকদিগের মধ্যে ফীচই প্রথম। নিউবেরী ও লিডস্ নামক অপর দুইজন ইংরাজ-সঙ্গী সহ ফীচ অর্ম্মজ পৌছেন ও পরে ভারত-সমুদ্র পার হইয়া গোয়া পৌছেন। গোয়ার পথে পর্য্যটক-ত্রয় ডিউ দর্শন করেন। ফীচ লিখিয়াছেন যে অধিবাসীরা গোপূজা করে এবং গোময় দ্বারা গৃহ লেপন করে। তাহারা উকুন পর্য্যন্ত মারে না। তখন সতীদাহ বর্ত্তমান ছিল এবং লোকেরা শবদাহন করিত। শবদাহের কারণ সম্বন্ধে ফীচ লিখিয়াছেন যে,অধিবাসীরা বলে যে মৃতদেহ কবরস্থ করিলে মৃতদেহে অনেক কীট জন্মিবে, যতদিন মৃতদেহ

* "His letters to his father are said to have roused great enthusiasm in England to trade directly with India." Sir George Birdwood—Report on the old Records of the India office. Page 197

থাকিবে ততদিন এই সকল কীটের আহারের অভাব থাকিবে না কিন্তু মৃতদেহ ফুরাইয়া গেলে এই সকল কীটের আহার্য্যের অভাব হইবে; উহাতে পাপ স্পর্শিবে। সুতরাং মৃতদেহ দাহন করা কর্ত্তব্য।

ডিউ, চৌল এবং গোয়া তখন পর্ত্তুগীজদিগের অধিকারে ছিল এবং তথায় তখন তাহাদের একাধিপত্য। পর্ত্তুগীজদিগের ছাড়পত্র ব্যতীত কোন জাহাজই ডিউ অতিক্রম করিতে পারিত না। ইংরাজপর্য্যটকগণ গোয়া পৌছিবা মাত্র, গুপ্তচর বোধে তাঁহাদের তিন জনকেই কারারুদ্ধ করা হইল। ইংরাজদিগের সৌভাগ্যবশতঃ পূর্ব্বোক্ত ষ্টিফেন্স তখনও জিস্যুইট কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁহারই সাহায্যে ফীচ ও তাঁহার সঙ্গিগণ ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দে গোয়া হইতে মুক্ত হইয়া বিজাপুর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। বিজাপুরের দেবমূর্ত্তি সকলের বর্ণনায় ফীচ বলিয়াছেন যে মূর্ত্তিগুলির কতক গরুর ন্যায়, কতক হনুমানের ন্যায়, কতক বা ময়ূরের ন্যায় এবং কতকগুলি ভূতের মত।

বিজাপুর হইতে ফীচ ও তাঁহার সঙ্গীদ্বয় গোলকন্দায় গমন করেন; গোলকন্দায় তখন মহম্মদ কুলি খাঁ ছিলেন। পরে তাঁহারা বার্হানপুর হইয়া আকবরের (Zelabdi Echebar) রাজ্যে পৌছেন। পথিমধ্যে ফীচ অনেকগুলি অল্পবয়স্কা বালিকা ও বালকের বিবাহ দর্শন করেন। আগ্রায় ফীচ ও তাঁহার সঙ্গিগণ অধিক দিন বাস করেন নাই। আগ্রা তখন বহুজনাকীর্ণ এক বৃহৎ সহর। আকবর বাদসাহ তখন ফতেপুরে বাস করিতেন। পর্য্যটকগণ তথায় কয়েক মাস কাটান। আকবরের দরবারের জাঁকজমকত্বের আতিশয্যের কথা ফীচ তাহার বর্ণনায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

ফতেপুর হইতে তিনজন সঙ্গী তিন পথ অবলম্বন করিলেন। নিউবেরি গোয়ায় এক বিপণী খুলিয়া বসবাস করিতে লাগিলেন, লীভ হইলেন আকবরের জহুরী এবং ফীচ আগ্রা হইতে পুনরায় ভ্রমণোদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

নৌকাযোগে ফীচ বারাণসী পৌছিয়া বঙ্গদেশের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পথিমধ্যে তিনি এক বিবাহ-ব্যাপার দেখেন; তাহার বৃত্তান্ত এইভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—"বিবাহ কালে বর ও কনে নদীতীরে উপস্থিত হন। পরে পুরোহিত গো ও গোবৎস সহ সেই স্থানে আগমন করেন। পরে বর, কনে, গো, গোবৎস ও ব্রাহ্মণ জলে নামেন। তখন ব্রাহ্মণকে চারি হস্ত পরিমিত একখণ্ড শুভ্রবস্ত্র ও নানা দ্রব্য পূর্ণ একটি ঝুড়ী প্রদান করা হয়। ব্রাহ্মণ বস্ত্রখণ্ড গরুর পৃষ্ঠদেশে স্থাপন করিয়া গরুর লেজে হাত দিয়া মন্ত্র পাঠ আরম্ভ করেন। এবং কনে জলপূর্ণ কলস বা তাম্রপাত্র হস্তে লন। বর এক হস্তে ব্রাহ্মণের হস্ত ও অপর হস্তে কনের হস্ত স্পর্শ করেন এবং সকলে গরুর লেজ স্পর্শ করিয়া ঐ পাত্রের জল গরুর লেজে ঢালিতে থাকে। পাত্রের জল এই প্রকারে গরুর পুচ্ছের উপর নিক্ষিপ্ত হইয়া সকলেরই হস্তে পতিত হয়। এই ব্যাপার সমাধা হইলে ব্রাহ্মণ বর ও কনের বস্ত্র একত্রিত করিয়া বন্ধন

করেন। তখন স্বামীস্ত্রী, গো ও গোবৎস প্রদক্ষিণ করিয়া দরিদ্রদিগকে নানাদ্রব্য এবং ব্রাহ্মণকে বৎস সহিত গো দান করিয়া দেবমন্দিরে যাইয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করেন, এবং দেবমন্দিরের মৃত্তিকা চুম্বন করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করেন।"

ফীচ তৎপর পাটনা, সপ্তগ্রাম, হুগলি প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করিয়া কচ দেশে যান। পরে অন্যান্য নানা স্থান পর্য্যটন করিয়া ১৫৯১ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে পৌঁছিয়া Purchas his Pilgrimes নামক একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন। ফীচের বৃত্তান্ত তেমন মূল্যবান নহে, কিন্তু সকল বিষয় বিবেচনা করিতে গেলে তিনি যে "ভারতে প্রথম ইংরাজ" সে বিষয়ে কোন সন্দেহই থাকে না।

ফীচ যখন ভারতবর্ষে ছিলেন তখন আরও নানা প্রকারে ভারতবর্ষের স্বর্ণরৌপ্যাদির বৃত্তান্ত বিলাতে পৌঁছে। ১৫৮৭ খৃষ্টাব্দে ড্রেক নামক নৌ-সেনানী গোয়া প্রত্যাগত এক পর্ত্তুগীজ জাহাজ অধিকার করেন। সেই জাহাজের মালামাল দেখিয়া এবং ষ্টীফেন্সের পত্র ও ফীচের বৃত্তান্তে প্রলুব্ধ হইয়া তৎকালে কয়েকজন ইংরাজ ১৫৯১ ও ১৫৯৬ সনে দুইবার ভারতবর্ষ পৌঁছিবার চেষ্টা করেন; কিন্তু কোনবারই উঁহারা কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে জন মিলডেন হল্ নামক জনৈক ইংরাজ স্থলপথে ভারতবর্ষে আসিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। যাহাতে আকবরের সহিত ইংরাজরাজের সন্ধি হইয়া বাণিজ্যের সুবিধা হয় তজ্জন্যই মিলডেন হল্ যাত্রা করেন। সমুদ্রপথে আলেপ্পো পৌঁছিয়া ইনি স্থলপথে আর্ম্মেনিয়া, খুর্দ্দীস্থান, পারস্য, আফগানিস্থান হইয়া পরে কান্দাহার দিয়া লাহোরে পৌঁছেন, এবং লাহোর হইতে ১৬০৩ খৃষ্টাব্দে আগ্রায় উপস্থিত হন। আগ্রায় পৌঁছিয়া তিন দিবস পরে মিলডেন হল্ আকবরের দেখা পান, এবং সম্রাটকে ২৯টি ঘোটক এবং কয়েকটি রত্ন উপহার প্রদান করেন। এই উপহারে সম্রাট অত্যন্ত প্রীত হইয়াছিলেন। পরদিন মিলডেন হল্ সম্রাট সকাশে আপনার প্রার্থনাত্রয় পেশ করেন। প্রথম—রাজ্ঞী এলিজাবেথের সহিত আকবরের সৌহৃদ্য-স্থাপন, দ্বিতীয়—আকবরের রাজ্যে বাণিজ্যের প্রার্থনা, এবং তৃতীয়—তাঁহার রাজ্য মধ্যে ইংরাজ ও পর্ত্তুগীজে যুদ্ধ বাধিলে তাঁহাকে নিরপেক্ষ থাকিবার অনুরোধ। কিরূপ স্তুতিবাদের সহিতপ্রার্থনা পেশ করিতে হয় মিলডেন হল্ অবশ্য তাহা বিলক্ষণ জানিতেন।

আকবর মিলডেন হলের প্রার্থনাগুলি লিখিত দরখাস্তে পেশ করিবার আদেশ দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে পর্ত্তুগীজ জিস্যুইটগণের নিকট হইতে ইংরাজের প্রতিপত্তি ইত্যাদির বিষয় অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। পর্ত্তুগীজ-পাদরীগণ ইংরাজদিগের জাতীয় চরিত্রে অযথা অসাধুত্বের কলঙ্ক আরোপ করিতে এবং সঙ্গে সঙ্গে মিলডেন হলের দৌত্য যে কেবল মাত্র আকবরের কতকগুলি বন্দর অধিকারের সূচনা মাত্র ইহা বলিতে বিন্দু মাত্র কুণ্ঠিত হইলেন না। মিলডেন হল্ গোপনে এই সংবাদ অবগত হইলেন কিন্তু আকবরের ব্যবহারে ইহার বিন্দু বিসর্গেরও প্রমাণ পাইলেন না। সম্রাট প্রকাশ্যে মিলডেন হল্‌কে বলিলেন যে

তৃতীয় সর্ত্ত ব্যতীত তিনি অন্য সকল সর্ত্তেই সম্মত আছেন। মিলডেন হল্ কিন্তু সে সর্ত্ত পরিত্যাগ করিতে অস্বীকৃত হওয়ায়, আকবর পুনর্ব্বার তাঁহার প্রস্তাব বিবেচনা করিয়া দেখিবেন স্বীকার করিলেন। এদিকে কোনরূপ সুবিধা না দেখিয়া মিলডেন হল্ দরবারে হাজরি দেওয়া কিছুদিন স্থগিত করিয়া আকবরের আদেশে পুনর্ব্বার দরবারে যাইতে লাগিলেন। দুঃখের বিষয় জিসুইটদিগের প্ররোচনায় দরবারের ক্ষমতাপন্ন কোন কর্ম্মচারীই মিলডেন হল্কে সাহায্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। জিসুইটদিগের চক্রান্তে তাঁহার দোভাষীও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গেল। তখন বাধ্য হইয়া ছয় মাস ধরিয়া তাঁহাকে পারশ্য ভাষা শিক্ষা করিতে হইল।

পারশ্য ভাষা শিক্ষা করিয়াই মিলডেন হল্ আকবরের দরবারে স্পষ্টাক্ষরে সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন এবং সামান্য দুই জন জিসুইটের কথার উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার মত পরাক্রমশালী সম্রাটের এতদিন অপেক্ষা করা যে কোন প্রকারেই সমীচিন হয় নাই, তাহা বলিতেও দ্বিধাবোধ করিলেন না। আকবর তখন প্রকাশ্য দরবারে তাঁহাকে ও জিসুইটদিগের প্রতিনিধিকে উপস্থিত হইতে আদেশ দিলেন। দরবারে মিলডেন হল্ জিসুইটদিগকে স্পষ্টই বলিলেন যে কেবল মাত্র ধর্ম্মযাজক বলিয়াই, জিসুইটগণ ইংরাজজাতির অযথা নিন্দাবাদ করাতেও তিনি তাহাদের হত্যা করেন নাই নতুবা তিনি ইহার উপযুক্ত শাস্তি দিতেন। যাহা হউক মিলডেন হল্ তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাস্ত করিয়া প্রমাণ করাইলেন যে জিসুইটদিগের প্রতিবন্ধকতার জন্যই সাহান সা ইংলণ্ডাধিপ এলিজাবেথের নিকট হইতে উপহারাদি প্রাপ্ত হইতেছেন না। আকবর এই বাক্যযুদ্ধে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া ত্রিশ দিবস পরে মিলডেন হলের প্রার্থনাই মঞ্জুর করিলেন। মিলডেন হল্ও পারশ্য দেশ হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন।

মিলডেন হলের দৌত্যে বাস্তবিক কোন ফল ফলিয়া ছিল কি না সন্দেহ। সম্ভবতঃ তিনি আকবর বাদসাহের নিকট হইতে কোন রূপ ফার্ম্মাণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু সম্রাটের মৃত্যুর পর সম্রাটের ফার্ম্মাণ বাজে কাগজেই পরিণত হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন যে তিনি সম্পূর্ণ প্রতারিত হইয়াছিলেন, আবার কাহারও মতে মিলডেন হল্ নিজের অকৃতকার্য্যতাকে ঢাকিবার জন্যই জাল ফার্ম্মাণ ও অতিরঞ্জিত বিবরণ প্রচার করিয়াছিলেন। এ সকল বিষয়ের সহিত আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধের কোন সম্পর্ক নাই। সুতরাং এ বিষয়ে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার।

কুন্তী-ব্রাহ্মণ-সংবাদ

(মহাভারত হইতে গৃহীত)

কুন্তী।

কুন্তী-

কেন আচম্বিতে আজি ব্রাহ্মণের ঘরে
কাতর ক্রন্দন শুনি ? যিনি কৃপা করে'
পঞ্চপুত্র সহ মোরে দিলেন আশ্রয়,
আজি কি দৈবের বিধি চির নিরদয়
সহসা ঘেরিল তাঁরে ? দুঃখ নিশাচর
সংসারীর চির সাথী,—ব্যথিত অন্তর
বুঝি সেই মহাত্মার সে করাল গ্রাসে '
ব্যাকুল পরাণ মোর কাঁপিতেছে ত্রাসে,
পাছে হায় ! ভাগ্যহীন সংসর্গ আমার
ঢেকে ফেলে সুবিমল শুভাদৃষ্ট তাঁর
হসিত তপনচ্যুত কিরণের জালে
ঢাকে যথা কাল মেঘ গগনের ভালে।
কাঁদে প্রাণ ব্রাহ্মণের বিপদ নেহারি ;
যাই দেখে আসি যদি জানিবারে পারি
কোন্ রন্ধ্র অন্বেষিয়া ক্রন্দন সঙ্গিনী
দুর্ব্বার নিয়তি, যেন কাল ভুজঙ্গিনী,
প্রবেশিয়া হেন সুখশান্তিময় নীড়ে
ঢালিয়া গরল রাশি এ সবারে পীড়ে।
হে অন্তরযামী, চির আর্ত্তের সহায় !
সহায় হও হে মম ; সুধার ধারায়
সিক্ত কর মোর প্রাণ, সে সুধা পরশে
পারি যেন জুড়াইতে আজি শান্তি রসে
বিষদগ্ধ জ্বালাময় দ্বিজের পরাণ ;
পারি যেন স্বার্থ-হীনা সাধিতে কল্যাণ !

(২)

ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী ও কন্যা পুত্র।

অন্তরালে কুন্তী।

ব্রাহ্মণ—

ভুলেছ কি, প্রিয়তমে ! নিষ্ঠুর পর্য্যায়
এসেছে আজি এ ঘরে ? বেলা বহে যায়
দুরন্তের কোপদৃষ্টি পড়িলে, সকলে
ভস্মীভূত হব সেই প্রদীপ্ত অনলে ;
তাই বলি ভুলি আর নিষ্ফল মায়ায়
বিলম্ব করিছ কেন ? দাও গো বিদায়।

ব্রাহ্মণী—

জানি আমি প্রিয়তম ! পর্য্যায়ের কথা,
জানি আমি এক জনে যেতে হবে তথা ;
জেনে শুনে সে উপায় রাখিয়াছি করি,
শেষ দেখা দেখিতেছি শুধু প্রাণ ভরি' !
যাবে দাসী, তুমি কেন মাগিছ বিদায় ?
চরণে মিনতি—আজ্ঞা দাও হে আমায় !

ব্রাহ্মণ—

কি বলিলে ? যাবে তুমি ? সে কেমন কথা
প্রিয়তমে ! প্রেমময়ি ! মরমের ব্যথা
বাড়ায়োনা কহি হেন বিপরীত বাণী !
অয়ি প্রিয়ে, অয়ি সতি, অয়ি হৃদিরাণি !
এ বিশ্বের আশীর্ব্বাদ লভিয়াছ তুমি
উদার বচনে তব, এই ধন্যা ভূমি
আনন্দে গাহিবে তব প্রণয় মহিমা ;
ধন্য আমি তব প্রেমে, গুণের গরিমা

জন্ম জন্মান্তরে মোর হৃদে রবে আঁকা!
হায় দেবি, নিয়তির গতি চির বাঁকা!
তাই ও অমৃত উৎস প্রণয়ে তোমার
বঞ্চিত হইয়া হায় মরণের দ্বার
হইবে পশিতে। তুমি যাবে সুহাসিনী?
হৃদয় কুলায়ে মোর যেই বিহঙ্গিনী
কত আশে কত সুখে লয়েছে আশ্রয়,
অন্তরের নির্ম্মমতা করি পরাজয়
তারে তুলে দিব আজি বল কোন্ প্রাণে
করাল ব্যাধের গ্রাসে? চাহ মোর পানে—
এত কি অধম আমি? চির শুভাষিণি!
আজি কেন হ'লে তুমি অপ্রিয়বাদিনী?
বিপন্ন বলিয়া কি গো, ধর্ম্মাধর্ম্ম ভুলে
স্নেহ মায়া মনুষ্যত্ব উৎপাটি' সমূলে
ফেলিব রাক্ষস হ'য়ে? বল কোন্ সুখে
বহিব জীবন ভার? বল কোন্ মুখে
রহিব ধরায় বহি' ঘৃণিত জীবন?
জীবন্ত নিষ্ঠুর বলি যবে সর্ব্বজন
দেখাইবে মোরে—কি উত্তর দিব সবে?
কর্ত্তব্য বিবেকহীন কাপুরুষ ববে
বলিবে সবাই মোরে—কি দিব উত্তর?
গত-শান্তি তুচ্ছ প্রাণে কিসের আদর!
অয়ি অভাগিনি; ভাগ্যহীন তব পতি;
কিন্তু সে অসৎ নয়, তুমি যার সতি।

ব্রাহ্মণী—

তুলোনা ও কথা আর, ছিছি প্রিয়তম,
বিঁধিছে বচন তব হৃদে শেল সম।
থাকিতে এ দাসী নাথ দেববপু তব
রাক্ষসের ভক্ষ্য হবে? একি অসম্ভব
অমঙ্গল প্রস্তাব তোমার! অয়ি প্রিয়
যাবে তুমি হরি মোর জীবন অমিয়,
বল কোন সুখে তবে সংসার কারায়
রব আমি সহি নিত্য দারুণ জ্বালায়?
জলদের শেষে রহে দামিনী কি কভু?
যাবে দাসী যথা যাবে তুমি মোর প্রভু।
পুত্র কন্যা! যবে তরু ভীষণ ঝঞ্ঝায়
চুষে তুমি, ছিঁড়িবে না ভাব কি ব্রততী
পত্র পুষ্পময়ী বলে? বল কোন সতী
সন্তানের মুখ চেয়ে প্রাণহীন দেহে
বাঁধা রহে বৈধব্যের সুখহীন গেহে?
শুন নিবেদন পদে, থাক ভবে তুমি
হয়ে পুত্র তনয়ার আশ্রয়ের ভূমি;
ত্যজ মোরে। বহু দিন সেবিয়া চরণ
সার্থক করেছি নাথ ঐহিক জীবন;
এবে এ ভঙ্গুর দেহ চাহি হাসি মুখে
পুণ্য ব্রতে সঁপিবারে। চিরদিন সুখে
থাক তুমি, পুত্র কন্যা লয়ে এ সংসারে;
দাও পদধূলি, আশীষ এ প্রণতারে,
চরণ-রেণুর বলে জন্ম জন্মান্তরে
লভি যেন পদছায়া; এ দীন অন্তরে
নাহি সাধ অন্য কোন। হে হৃদি-সম্বল,
তব আশীর্ব্বাদে যেন থাকে হৃদে বল
মরণ সময়ে চিন্তিতে ও পদ তব।
জ্ঞানী তুমি, বোঝ সব কি আর কহিব।
(পুত্রকে দেখিয়া)
দেখ দেখ তৃণ-অসি ধরি ক্ষুদ্র করে
অরাতি নাশিতে ধায় মহা দম্ভভরে
ক্ষুদ্র শিশু! এত দুঃখে হাসি আসে মুখে
হেরি এ সুন্দর খেলা ভুলি সব দুঃখে।
রে বাঞ্ছিত, ওরে মোর হৃদয়-নন্দন!
কোথা যাবে তুমি? এস চুমি ও বদন
মুহূর্ত্তের তরে সব জ্বালা নিবারিয়া
স্বর্গ সুখ করি অনুভব। প্রসারিয়া
ক্ষুদ্র বাহু দু'টি করি মোরে আলিঙ্গন,

কর এ কাতর হৃদে অমিয় বর্ষণ।
ত্যজ শোক প্রিয়তম! হৃদে তব রবে
এ কুসুম—কি অভাব তবে নাথ ভবে?
(কন্যার প্রতি)
ওরে বাছা ছাড় মোরে, সম্বর ক্রন্দন;
তোমায় আশ্রয় আজি পিতার চরণ।
হেন শুভক্ষণে আর অশ্রু বরষিয়ে
রেখ না আমায় মাগো মায়ায় বেড়িয়ে।

কন্যা—

না না মা যেয়োনা তুমি; তুমি চলে গেলে
দেখিবে কে কে ভুলাবে এ অবোধ ছেলে
মাগো আমি যাব।

কুন্তীর প্রবেশ।

কুন্তী—

ক্ষান্ত হ রে সুকুমারী
অবোধ বালিকা কেন এসে আগুসারি,
খুলে নয়নের কাছে লাবণ্য ললিত,
জনক জননী হৃদি কর জর্জ্জরিত?
স্বহস্তে সিঞ্চিয়া বারি বিষের বল্লরী
বাঁচাইয়া ধীরে ধীরে, যবে প্রাণ ধরি
কেহ নারে উন্মুলিতে—তবে কি করিয়া
দিবে তারা ছাড়ি তোরে পিশাচ সাজিয়া?
জনক-জননী-হৃদে তুই রে বালিকা
ফুটেছিস যেন চারু কুসুম কলিকা।
দুষ্ট-কীট সম সেই মঞ্জুল কোরক
নাশিবে কেমনে দংশি' জননী জনক?
শোন বিপ্র, বিপ্রজায়া, যবে ঘূর্ণ্যমান
উল্কা-পিণ্ড সম বিতাড়িত হত-মান
আশ্রয় খুঁজিতেছিনু বিশাল সংসারে
তোমরা রাখিলে মান—বাঁচালে আমারে।
মহাঋণে বদ্ধ আমি তোমাদের পদে,
বিন্দুমাত্র উপকার এ মহা বিপদে
পারি যদি করিবারে, হে দ্বিজ-প্রবীণ,
কণামাত্র শোধ হবে সে অসীম ঋণ।
জ্বলুক মঙ্গল দীপ তোমার আলয়ে;
অশান্তির স্থান যেন তোমার হৃদয়ে
কভু নাহি রহে। করিয়াছ উপকার,
তোমার বিপদ নাশ কর্ত্তব্য আমার।
আছে পঞ্চ পুত্র মোর, তারি একজনে
প্রেরিব আজি সে দুষ্ট রাক্ষস সদনে

ব্রাহ্মণ—

অতিথির—আশ্রিতের—জীবন নাশিয়া
আপনার তুচ্ছ প্রাণ কি ফল রাখিয়া?
ব্যর্থ তব অনুরোধ, অদৃষ্টে আমার
ফলুক অসহনীয় বিধি বিধাতার।

। (স্বগতঃ)—

কি হবে জানি না, কিবা করিব উপায়
রক্ষিতে এ দ্বিজবরে? বুঝি অনিচ্ছায়
বঞ্চনায় হ'ল মোরে করিতে আশ্রয়;
কিবা ক্ষতি সে অনৃতে যদি পাপ হয়?
তবু এই মহাত্মার বিপদ নাশিতে
হবে মোর প্রাণপণে কৌশল রাখিতে।
(প্রকাশ্যে)—

হে দ্বিজ, নিশ্চিন্ত রও, কিসের ভাবনা?
রাক্ষসের জেনো ইহা শমন-প্রেরণা।
মহামন্ত্র বলে বলী তনয় আমার,
শত বারণের বল শরীরে তাহার।
নহে কি জননী হয়ে, নির্ভয় অন্তরে
পাঠাইতে চাহি তারে মৃত্যুর গহ্বরে?
দেহ শুভ আশীর্ব্বাদ, যাহার প্রসাদে
বিশ্ব-বিজয়িনী শক্তি লভিয়ে, প্রমাদে
অচিরে জিনি সে শত্রু, নমিবে চরণ।
আজি তার বহু ভাগ্য, সার্থক জীবন!

ব্রাহ্মণ—

ওহে অগতির গতি ! ওহে লীলাময় !
দিলে কি হে দয়া করি দীনে পদাশ্রয় ?
হে ব্রাহ্মণি ! ভাব্লি মনে, বড় শুভক্ষণে
ভিখারিণীবেশা দেবী এ নারী রতনে
পঞ্চ পুত্র সহ আনি' রাখিনু কুটীরে ;
আজি রক্ষা হ'ল তাই। দেবি ! তব শিরে
আর তব মহাসত্ব পুত্রের মাথায়,
দরিদ্র কৃতজ্ঞ দ্বিজ অজস্র ধারায়
বর্ষে আশীর্ব্বাদ। বিপন্ন এ পরিবারে
উদ্ধারিলে নিজগুণে। এ ভব সংসারে
পুত্রগণ সহ সুখে থেক অবিরত ;
হ'ক পুত্রগণ তব সদা ধর্ম্মে রত।
পুণ্যময়ি ! নিজ ব্রত সাধ এ ধরায়
মাতৃত্ব শিখিবে ভব তোমার শিক্ষায়।

শ্রীজিতেন্দ্রলাল বসু।

নব্য ব্রাহ্ম-সমাজের আদর্শ।

রোমীয় সভ্যতা ও সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের উপর খৃষ্টধর্ম্মের বিজয় পতাকা উড্ডীন হইতে দেখিয়া রোমীয় সভ্যতার শেষ কবি রুতিলিয়াস নিউম্যাসিয়েনাস বেদনা-পীড়িত কণ্ঠে গাহিয়াছিলেন—

"Would to the gods that Judea had never been conquered ! The plague extirpated there hath spread abroad, and a vanquished nation oppresses its conqueror." হায়, ভগবান্ জুডিয়াদেশ জয় না করিলেই ভাল ছিল। বিজীত জুডিয়া দেশে যে ব্যাধি মূলোৎপাটিত হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহা চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে, এবং বিজীত জাতির কুসংস্কার আজি বিজেতৃদিগকে পীড়িত করিতেছে।"

য়িহুদিদিগের ভাব ও চিন্তা যে শুধু রোমানদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল তাহা নহে, সমস্ত রোমান সাম্রাজ্য জয় করিয়া আজ ভারতবর্ষকেও আক্রমণ করিয়াছে।

"প্রবাসীতে" শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার "থুড়ি থুড়ি মা কালী" শীর্ষক প্রবন্ধে বলিয়াছিলেন ব্রাহ্মসমাজ পাশ্চাত্যদিগের অনুকরণ করেন নাই, অনুসরণ করিয়াছেন। বিগত বৈশাখ মাসের "বঙ্গদর্শনে" শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ মহাশয় আমাদিকে "সমাজ-প্রসঙ্গ" শীর্ষক প্রবন্ধে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে ব্রাহ্মসমাজ অনেক বিষয়েই বিলাতী সমাজের অনুকরণ করিয়াছেন। যতীন্দ্রবাবু বলেন পাঁচটি স্তম্ভের উপর ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত—নিরাকার উপাসনা, জাতিভেদবর্জ্জন, যৌবনবিবাহ, বিধবা-বিবাহ ও স্ত্রীস্বাধীনতা। যৌবনবিবাহ ও স্ত্রী-স্ত্রীস্বাধীনতা সম্বন্ধে বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি কছু বলিতে চাহি না, কিন্তু নিরাকার উপাসনা, জাতিভেদবর্জ্জন ও বিধবাবিবাহ এই তিনটি বিষয়ে যে ব্রাহ্মসমাজ বিলাতী সমাজের সম্পূর্ণ অনুকরণ করিয়াছেন,

ইহাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য।

যে ভাবে নিরাকার উপাসনা ব্রাহ্মসমাজে হয় তাহা সম্পূর্ণ খৃষ্টানী গীর্জ্জার উপাসনার অনুকরণ। সেই বেদীর উপর আচার্য্য উপবিষ্ট—নিম্নে উপাসকমণ্ডলী। হিন্দু অথবা মুসলমান কোনো সমাজেই উক্ত রূপ উপাসনা পদ্ধতি প্রচলিত ছিল না। অবশ্য ব্রাহ্ম মহোদয়গণ সে প্রথাকে নিশ্চয়ই ভাল বলিয়া বুঝিয়াছিলেন তাই তাহার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। কিন্তু তাহাকেই অনুকরণ বলে। কোন জিনিসকে ভাল বলিয়া না বুঝিলে তাহার অনুকরণে কেহ অগ্রসর হয় না। উক্ত পদ্ধতিকে হিন্দুর উপসনা পদ্ধতি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট মনে করিবার বিশেষ কোন কারণ বর্ত্তমান ছিল কি? প্রাচীন ব্রাহ্মগণ এখন হয়ত বুঝিতে পারিয়াছেন যে সপ্তাহান্তে রবিবারে খৃষ্টানদিগের ন্যায় প্রার্থনা-মন্দিরে সমবেত হইয়া বক্তৃতা শ্রবণাপেক্ষা নির্জনে একাকী উপাসনা শ্রেয়স্কর। বহুলোক একত্র সমবেত হইয়া ভগবানে চিত্তনিবেশের চেষ্টা করা যে অন্যায় অথবা অবিধেয়, সেকথা বলা আমার উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু ঈদৃশ উপাসনা-পদ্ধতিকে প্রাধান্য দিলে, ভগবানে গভীর মনঃসংযোগ চেষ্টা যে বিরল ও কঠিন হইয়া পড়ে তাহা বোধ হয় এত দিনের ব্রাহ্মসমাজের অভিজ্ঞতায় স্বীকৃত হইয়াছে। সাধারণ লোক প্রার্থনা দিনে বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াই কর্ত্তব্য শেষ হইল মনে করে; অপেক্ষাকৃত ভাবুকলোকেও বহুলোকের সহিত উপাসনায় অভ্যস্ত হইয়া নির্জ্জনোপাসনায় তৃপ্তি অনুভব করেন না।

বক্তৃতার দ্বারা উপাসনা ভারতবর্ষে নূতন। এ উপাসনায় উপাসকের ভক্তি উদ্রিক্ত করিবার ভার আচার্য্যের উপর। আচার্য্য নানাবিধ ভক্তিরসাল বাক্য দ্বারা শ্রোতৃবৃন্দের মন সরস করিবার চেষ্টা করেন এবং স্বীয় মনের সহিত শ্রোতার মনও ভক্তির গভীর প্রদেশে লইতে প্রয়াসী হন। এই ভাবে পরনিয়ন্ত্রিত মন একাকী যে কিছুই করিতে পারে না, তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই।

এই উপাসনাপদ্ধতির প্রবর্ত্তক ইজরেল সম্প্রদায়। ইজরেল ঈশ্বরের উপাসনার জন্য মূর্ত্তির আবশ্যকতা স্বীকার করিত না। (শাস্ত্রে মূর্ত্তির ব্যবহার নিষিদ্ধ হইলেও কার্য্যতঃ জিহোবার মন্দিরে বহু দেবমূর্ত্তি বহুবার স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। তজ্জন্য বহু জাতির উপর জিহোবা বহু অভিসম্পাত বর্ষণ করিয়াছেন, য়িহুদিদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে তাহার বর্ণনা আছে।) ব্রাহ্মগণ শুধু যে উপাসনা-পদ্ধতিতে ইজরেলের অনুকরণ করিয়াছেন, তাহা নহে, ইজরেলের ধর্ম্মশাস্ত্রের মূর্ত্তি-বিদ্বেষ ও তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন। যিশুখৃষ্ট ইজরেলের জিহোবা-বাদকে কথঞ্চিৎ সংস্কৃত করিয়াছিলেন। গ্রীক-দার্শনিকের হাতে পড়িয়া খৃষ্টের ধর্ম্মমতও অনেকটা সংস্কৃত হইয়া পড়িয়াছিল। ব্রাহ্মগণ এই সংস্কৃত জিহোবা উপাসনা ভারতবর্ষে প্রচলিত করিতে যত্নবান হইয়াছেন। ইহাই তাঁহাদের নিরাকার-বাদ।

ব্রাহ্মগণ বলিয়া থাকেন তাঁহাদের নিরাকার বাদ উপনিষদ ও বেদান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের তৃতীয় উল্লাসও তাঁহারা স্বপক্ষে উদ্ধৃত করিয়া থাকেন।

ভারতে নিরাকারবাদ ছিল না এমন নহে। পরন্তু ভারতীয় নিরাকারবাদ যে সীমায় পৌঁছিয়াছিল, তাহার নিকট য়িহুদীয় নিরাকারবাদ সাধারণ মূর্ত্তিপূজা বই আর কিছু নহে। কিন্তু নিরাকারের সাকারাবলম্বন-হীন উপাসনা ভারতে কখনও প্রচলিত ছিল এমন মনে হয় না। ভারতের নিরাকার শুধু নিরাকারই নহেন, তিনি নির্গুণ ও নির্বিকারও বটেন। তাঁহার উপাসনার জন্য আকারাবলম্বন প্রয়োজনীয় বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। সমাধিমগ্ন যোগী নির্গুণ ব্রহ্মে মিলিত হন শাস্ত্রে আছে এবং উক্ত রূপে মিলিত হইবার সাধনোপায়ও শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজে নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা হয় না। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে পরব্রহ্মের উপাসনা প্রণালী বর্ণিত আছে (মহানির্ব্বাণ তন্ত্র যে খুব সামান্য গ্রন্থ তাহা নহে। কিন্তু তাহাতেও যে প্রণালী বর্ণিত আছে তাহার সহিত ব্রাহ্মসমাজে অবলম্বিত উপাসনাপ্রণালীর আকাশ পাতাল প্রভেদ) ব্রাহ্মসমাজ শুধু তাহার বক্তৃতা অংশ স্তোত্রাদি গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু তাহার মন্ত্রভাগটী সম্পূর্ণ বর্জ্জন করিয়াছেন। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে বর্ণিত উপাসনা ব্রহ্মমন্ত্র সাধনা ব্যতিরিক্ত অন্য কিছু নহে। তাহাতে ব্রহ্মমন্ত্র, তাহার অর্থ ও চৈতন্যশক্তি বর্ণিত আছে; তৎপরে অঙ্গন্যাস এবং করন্যাস, ব্রহ্মমন্ত্র সাহায্যে প্রাণায়াম ও মানসোপচারে ব্রহ্মের পূজাপদ্ধতি বিস্তারিত বিবৃত আছে। ব্রাহ্মসমাজ তাহার কিছুই গ্রহণ করেন নাই। শুধু যে স্থলটি খৃষ্টানী ভাবের সহিত মিলিয়াছে তাহাই গ্রহণ করিয়াছেন। যে স্তোত্রটি মহানির্ব্বাণ তন্ত্র হইতে ব্রাহ্মসমাজ গ্রহণ করিয়াছেন তাহা হইতে নির্গুণত্বসূচক শব্দগুলি বাদ দিয়া তৎস্থানে নূতন শব্দ সন্নিবেশিত করিয়াছেন।

উপনিষদে ব্রহ্মসূচক পদ অনেক আছে। কিন্তু মন্ত্র সাহায্য ব্যতিরেকে বক্তৃতা করিয়া উপাসনা-প্রণালী কোথাও বিবৃত নাই। সাধক অথবা ভাবুক অনেক সময় সৌভাগ্যক্রমে চতুর্দ্দিকস্থ পদার্থ হইতে হঠাৎ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়া তাহাদের অন্তঃসত্তার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া থাকেন, কিন্তু সে ভাব ক্ষণস্থায়ী। চেষ্টা করিয়া সে অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া সহজ নহে। কি উপায়ে ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার লাভ করা যায় উপনিষদের ঋষিগণ এবং সাধকেরা তাহার প্রত্যক্ষ বিবরণ দিয়া গিয়াছেন। সে পন্থা অনুসরণ না করিয়া শুধু তাঁহাদের বর্ণিত ব্রহ্মস্বরূপের বর্ণনা করিয়া বক্তৃতা করিলে বক্তার বা শ্রোতার ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের আশা সুদূর পরাহত। উপনিষদে ব্রহ্ম নিরাকার বলিয়া বর্ণিত আছেন, মুখে "নিরাকার, নিরাকার" বলিয়া ডাকিলেই যে নিরাকারকে পাওয়া যাইবে এমন কথা উপনিষদে নাই।

তাই বলিতেছিলাম ব্রহ্ম নিরাকার এ কথা উপনিষদে থাকিলেও তাঁহাকে পাইবার জন্য ব্রাহ্মগণ যে উপাসনা-প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা উপনিষদের নহে। তাহা য়িহুদীয়, তাহা খৃষ্টানী। জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি কেহ কেহ চক্ষুরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণের উপর এত খড়্গহস্ত কেন? চক্ষুগ্রাহ্য গুণটি তাঁহারা ঈশ্বরে আরোপ করিতে অনিচ্ছুক কেন? শুনিতে পাই, ব্রাহ্মমহোদয়গণের

মধ্যে সাধক যাঁহারা, তাঁহারা ঈশ্বরের বাণী শ্রবণ করেন, ঈশ্বরের ঘ্রাণ পান, এবং ঈশ্বরকে স্পর্শ করিয়াও থাকেন। তবে চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারা তাঁহাকে দেখা অসম্ভব কেন? অনেকে বলিবেন যেখানে ঈশ্বরকে ঘ্রাণ ও স্পর্শ করিবার কথা ও তাঁহার বাণী শ্রবণ করিবার কথা বলা হইয়াছে, সেখানে রূপক ব্যবহার করা হইয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। যেখানেই ভক্ত একান্ত মনে ভগবানের উপাসনা করিয়াছে সেখানেই তাহার সমগ্র ইন্দ্রিয় ঈশ্বরাভিমুখী হইয়া ঈশ্বরকে সম্ভোগ করিয়াছে। আর সমগ্র ইন্দ্রিয় দ্বারা তাঁহাকে সম্ভোগ করাই প্রকৃত উপাসনা। এই রূপে সর্ব্ব দেশে সর্ব্বকালেই মূর্ত্তির ধ্যান ও কল্পনা প্রচলিত হইয়াছে। যাঁহাদের চক্ষুতে দৃষ্টি-শক্তি আছে, তাঁহারা দেখিতে পান। ভক্ত খৃষ্টান যখন একান্তভাবে ভগবানের চিন্তা করেন, তখন তাহার মানসচক্ষুর সমীপে ক্রুশবিদ্ধ খৃষ্টরূপে ভগবান বিরাজ করেন। ব্রাহ্মসমাজের সাধুভক্তগণও যে মূর্ত্ত ভগবানেরই উপাসনা করেন তাহা নিশ্চয়।

সাধনা যাঁহারা করেন, তাঁহাদের নিকট অনন্তরূপী ভগবান অনন্ত রূপে প্রকাশিত হন। এ কথার প্রমাণ পাইতে হইলে প্রকৃত সাধকের নিকট যাইতে হয়। ব্রাহ্ম সমাজ ইহার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান না করিয়া নির্ব্বিবাদে য়িহুদীয় নিরাকারবাদ গ্রহণ করিয়াছেন। সে নিরাকারবাদ কোনও দার্শনিক তত্ত্বের উপর যদি প্রতিষ্ঠিত হইত, তাহা হইলে তাহাকে শ্রদ্ধা করিতে পারিতাম। দার্শনিকের অভাব ভারতে ও গ্রীসে কখনও ছিল না। সেখানে নিরাকারোপাসনা উদ্ভূত হয় নাই। উদ্ভূত হইয়াছে এমন দেশে, যেখানে দর্শনের নামও পরিজ্ঞাত ছিল না। সমসাময়িক দার্শনিকগণ য়িহুদীয় ও তৎপরবর্ত্তী খৃষ্টীয় ধর্ম্মমতকে বহু স্থলে জঘন্য কুসংস্কার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যুক্তি বলে খৃষ্টধর্ম্মের সত্য উপলব্ধি করিয়া বেশী লোক যে খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে, তাহা নহে। নানা কারণে খৃষ্টধর্ম্ম এত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু যুক্তির উপর যাহা প্রতিষ্ঠিত নহে, তাহার সহিত না মিলিলেই মত-বিশেষকে ভ্রান্ত বলা চলে না।

শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রবন্ধ পাঠে জানা যায়, স্বদেশী আন্দোলনের ফলে অনেক শিক্ষিত লোকের মন তথাকথিত পৌত্তলিকতার আকৃষ্ট হইতে দেখিয়া তিনি ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন, এবং মনে করিয়াছেন দেশ উন্নতি-সোপান হইতে স্খলিত হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু তাঁহার নিরাকারবাদ যে উন্নত সভ্যতার পরিচায়ক, তাহার প্রমাণ কি? ধনে মানে গৌরবে ইয়োরোপীয়গণ আমাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর বলিয়া তাহাদের উপাসনাপ্রণালীও যে আমাদের উপাসনাপ্রণালী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহা ত বলা যায় না। যে য়িহুদীদিগের নিকট হইতে ইয়োরোপীয়দিগের ধর্ম্মমত গৃহীত, সে য়িহুদীগণ ত সুসভ্য ছিল না। তাহারা যখন স্বীয় ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া পরধর্ম্মাসহিষ্ণুতার পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছিল, তখন সুসভ্য পরাক্রান্ত রোম তাহাদিগকে

বর্ব্বর বলিয়াই মনে করিত। তৎপূর্ব্বেই গ্রীস সভ্যতার উচ্চশিখরে বিচরণ করিয়া তথা হইতে নামিয়া আসিয়াছিল। গর্ব্বিত গ্রীস প্রাচীন মিশরকে গুরুর ন্যায় ভক্তি করিত। বেবিলনকেও যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিত। কিন্তু মিশর, বেবিলন ও গ্রীস কখনও ইজরেলকে ঘৃণার বই শ্রদ্ধার চক্ষে দেখে নাই। সেই চিরঘৃণিত বর্ব্বর জাতির ধর্ম্মমত আজ অধিকাংশ জগৎ গ্রহণ করিয়াছে। করুক, তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় নাই। প্রাচীন জাতি সকল যখন উন্নতি শিখর হইতে স্খলিত হইয়া পড়িয়াছিল, তখনই তাহারা য়িহুদীয় কুসংস্কার গ্রহণ করিয়াছিল। অন্য যে সমস্ত জাতি উক্ত মত গ্রহণ করিয়াছিল, তাহারা য়িহুদী অপেক্ষাও অসভ্য ছিল। কিন্তু সুসভ্য সমুন্নত আর্য্যসন্তান যদি ঘৃণার সহিত সে মত প্রত্যাখ্যান করে, তাহা হইলে "দেশ রসাতলে গেল" বলিয়া চীৎকার করিবার আবশ্যকতা আছে কি?

পাশ্চাত্যদিগের বাহ্য চাকচিক্যে মুগ্ধ হইয়া নির্ব্বিচারে ব্রাহ্মগণ তাহাদিগের অনুকরণ করিয়াছেন। মুখে স্বীকার না করিলেও মনে মনে সর্ব্ববিষয়ে ইয়োরোপীয়ের অনুকরণ করা সেই ব্রাহ্মগণ সভ্যতার চিহ্ন বলিয়া মনে করেন।

তার পরে জাতিভেদবর্জনের কথা। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম যে ঘৃণার উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, যতীন্দ্র বাবু তাঁহার প্রবন্ধে তাহা দেখাইয়াছেন। ব্রাহ্মগণ যে জাতিভেদবর্জন করিয়া পাশ্চাত্যসমাজের অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাই আমি দেখাইতে চাই।

বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের ভিত্তি সংযম। পাশ্চাত্য দৃষ্টিতে অবশ্য স্বার্থপরতার উপরই উক্ত ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু পক্ষপাতবিহীন ভাবে আলোচনা করিলে দেখা যায়, মানুষের স্বসুখান্বেষণী বৃত্তিকে সংযত করিয়া, সমস্ত সমাজের মঙ্গলের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করাই বর্ণাশ্রমের উদ্দেশ্য। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বর্জন করিবার পূর্ব্বে ব্রাহ্মসমাজ এ দিকটা ভাল করিয়া দেখিয়াছিলেন কি? বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মে কোনও ত্রুটি নাই এ কথা বলা যায় না। কিন্তু ত্রুটি কিসে না আছে? যে পাশ্চাত্য সমাজের আদর্শে ব্রাহ্মগণ জাতিভেদ বর্জন করিয়াছেন, সে সমাজও কি নির্দ্দোষ? খৃষ্টীয় ঈশ্বরধারণা ও মানুষের ভ্রাতৃত্ববাদ গ্রহণ করিয়া, ব্রাহ্মগণ ভাবিয়াছেন —মানুষে মানুষে প্রভেদ রক্ষা করা মহাপাপ। ব্রাহ্মগণ হয় ত আরও ভাবিয়াছিলেন, বহুসংখ্যক জাতিতে বিভক্ত সমাজ কখনও "নেশনে" পরিণত হইতে পারে না। নেশনের ভাবটি সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য। আর্য্যগণ যখন সমাজ গঠন করিয়াছিলেন, তখন পরজাতি-বিদ্বেষ সৃষ্টি করিবার প্রয়োজনীয়তা তাঁহারা উপলব্ধি করেন নাই। সমাজে সুখ ও শান্তি বিরাজ করে, ইহাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহাদের বিধান যদি সমাজের সুখ ও শান্তির সহায়তা করে, তাহা হইলে তাহাতে নেশন গঠনের প্রতিবন্ধকতা হয়, এ আপত্তি করা চলে না। কিন্তু বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মাবলম্বী সমাজ যে নেশনে পরিণত হইতে পারে না, তাহা স্বীকার করা যায় না বর্ণাশ্রমের বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে যে সম্বন্ধ,— বর্ণাশ্রমের বহির্ভূত কোনও জাতির সহিত বর্ণাশ্রমস্থ কোনও বর্ণেরই ততটা নিকট

সম্বন্ধ নাই। ইহাতে কি উক্ত বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে আত্মীয়তা-বোধটি জাগ্রত হইবার অবকাশ পায় না? এক দেশে বাস, এক ভাষা কথন ও এক ধর্ম্ম পালন—ইহাতেও যদি আত্মীয়তা-বোধ বিকশিত হইবার অবকাশ না পায়—তাহা হইলে একপংক্তিক ভোজন ও বিভিন্ন জাতির মধ্যে আদান-প্রদানেই বা বিশেষ কি সুবিধা হইবে, তাহা বলা যায় না। পাশ্চাত্য সমাজেও শ্রেণী-বিভাগ আছে এবং বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে একত্র ভোজন ও বৈবাহিক সম্বন্ধও যে বেশী পরিমাণে চলে তাহা নহে। কিন্তু সেখানে নিজের দেশ বলিয়া একটি সাধারণ স্থানে সকলেরই আকর্ষণ আছে। সেই আকর্ষণই "নেশন"ভাবের মূল। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম উক্ত আকর্ষণের প্রতিকূলতা করে বলিয়া মনে হয় না।

মানুষে মানুষে প্রভেদ রক্ষা করা এক কথা, ও মানুষকে ঘৃণা করা আর এক কথা। মানুষে মানুষে প্রভেদ আছে—তুমি আমি চেষ্টা করিয়া সে ভেদ দূর করিতে পারি না। যতদিন সে ভেদবাচক, ততদিন জোর করিয়া তাহা ভাঙ্গিবার চেষ্টা না করিয়া আপনার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করাই শ্রেয়ঃ—বিজ্ঞান তাহা প্রমাণ করিয়াছে। মানুষকে ঘৃণা করা অন্যায়, কিন্তু স্বাভাবিক ভেদ স্বীকার করা অন্যায় নহে। বর্ণাশ্রমধর্ম্মের বিরুদ্ধে প্রধান আপত্তি এই যে, ইহাতে বিভিন্ন বর্ণের ভিতর ভেদ চিরস্থায়ী করিয়া রাখে। হিন্দুধর্ম্মে ইহার যে সুস্পষ্ট মীমাংসা আছে যতীন্দ্র বাবু তাঁহার প্রবন্ধে তাহা দেখাইয়াছেন। আর্য্যগণ জন্মান্তরে বিশ্বাস করিতেন, সকলে স্বকর্ম্মের অনুরূপ জন্মলাভ করে, এই বিশ্বাস থাকায় তাঁহারা বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে অনতিক্রমণীয় পার্থক্য স্বীকার করেন নাই। প্রকৃতি যাহাকে যেরূপ মানসিক ক্ষমতা দিয়া জগতে পাঠান, মুখ্যতঃ তাহা দ্বারাই তাহার মান প্রতিপত্তি নিয়ন্ত্রিত হয়। সেই মানসিক ক্ষমতা যখন সকলের সমান নহে, তখন জগতে সকলেই সমান সম্মান লাভ করিবে, ইহা আশা করা যায় না। এই মানসিক সম্পদের পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও ব্রাহ্মগণ ঈশ্বরে পক্ষপাতিত্বের আরোপ করেন না। বর্ণাশ্রমের ধর্ম্ম এই পার্থক্য স্বীকার করিয়া লইয়াছে বলিয়াই তাহাকে যত নিন্দার ভাগী হইতে হয় কেন? ব্রাহ্মগণ খৃষ্টধর্ম্মের অনুকরণে জন্মান্তরবাদ বর্জন করিয়াছেন, কাজেই বিভিন্ন বর্ণের ভিতর অনতিক্রমণীয় পার্থক্য দেখিয়া ভীত হইয়াছেন। পৃথিবীর সুখদুঃখকে মানদণ্ড করিয়া ব্রাহ্মগণ সমস্ত রীতিনীতির বিচার করিয়াছেন, প্রকৃতি যে পার্থক্য সৃষ্টি করিয়াছেন, জোর করিয়া তাহা দূর করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। পার্থক্য দূর করিতে পাশ্চাত্য সমাজ পারে নাই, ব্রাহ্মসমাজও পারিবে না। কিন্তু এরূপ চেষ্টা জড়বাদীদিগের পক্ষেই শোভা পায়; যাঁহারা জগতের প্রতি কার্য্যে ভগবদিচ্ছা স্বীকার করেন, তাঁহাদের পক্ষে এতাদৃশ চেষ্টা অশোভন। যুগ-যুগান্তর হইতে প্রাকৃতিক নিয়মে হিন্দুসমাজ যে গঠনের দিকে চালিত হইয়া, পরিশেষে তাহাতে পরিণতি লাভ করিয়াছে, ব্রাহ্মগণ বিশেষ বিবেচনা না করিয়া তাহার বিরুদ্ধে সমর ঘোষণা করিয়াছেন। ফলে এক দোষ

দূর করিতে যাইয়া তদপেক্ষা গুরুতর দোষ আহ্বান করিয়া লইয়াছেন।

বর্ণাশ্রমের অনেক বিধান আধুনিক দৃষ্টিতে স্বার্থপরতাপ্রণোদিত বোধ হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। ব্রাহ্মণগণের পাপের জন্য শাস্ত্রে লঘুদণ্ডের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু ব্রাহ্মণের উপর অনুষ্ঠিত অপরাধের জন্য গুরুতর শাস্তি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ব্রাহ্মগণ এই সমস্ত ব্যবস্থায় বিরক্ত ও উগ্র হইয়া উঠিয়াছিলেন বলিয়া বর্ণাশ্রমের গুণগুলি ধরিতে পারেন নাই। তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন নাই, ব্রাহ্মণঘাতকের উপর যে শাস্তি বিহিত হইয়াছে, গোঘাতকের উপরও তদ্রূপ শাস্তিরই ব্যবস্থা আছে। ভগিনী নিবেদিতা এক স্থলে বলিয়াছেন, লিপিবিদ্যা আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে আর্য্যজাতির সঞ্চিত বিদ্যা ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃকই মুখে মুখে পুরুষপরম্পরা ক্রমে চলিয়া আসিত। কোন ব্রাহ্মণ হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, তদধীত বিদ্যা তৎসঙ্গে লোপ পাইবার সম্ভাবনা ছিল। সুতরাং জাতীয় বিদ্যা রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যেই যে ব্রাহ্মণের শরীর কঠোর আইন দ্বারা দ্বারা সুরক্ষিত হইত তাহাতে সন্দেহ নাই। ইংরেজের আইনে আজি ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের অপরাধের তারতম্য নাই; মুদ্রাযন্ত্রের অবাধ প্রচলনে তাহার প্রয়োজনও নাই। সুতরাং তাহার বিরুদ্ধে সমরঘোষণা নিষ্প্রয়োজন।

প্রত্যেক বর্ণের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবসায় নির্দ্দেশই মূলতঃ বর্ণাশ্রমধর্ম্মের উদ্দেশ্য। প্রত্যেক ব্যবসায়ে স্বতঃই একপ্রকার আচার-ব্যবহার গঠিত হইয়া উঠে, এবং স্বতন্ত্র নিয়ম দ্বারা তাহা নিয়ন্ত্রিত হয়। প্রচলিত আচার-ব্যবহার তদবলম্বীদিগের মন ও চরিত্রের উপর ক্রিয়া করে। কাজেই বিভিন্ন ব্যবসায়াবলম্বীদিগের মানসিক অবস্থা ও চরিত্র ভিন্ন হইয়া দাঁড়ায়। পরিশ্রম যেরূপই হউক, তাহাতে অপমানের কিছুই নাই। বর্ণাশ্রমাবলম্বী বিভিন্ন বর্ণের মধ্যেও উচ্চনীচ কোনও সম্বন্ধ বাস্তবপক্ষে নাই। তবে মানুষ স্বতঃই ব্যবসায়ের মধ্যে ছোটবড় কল্পনা করে; শাস্ত্রব্যবসায়ী ও মদ্যবিক্রেতার ব্যবসায়ের মধ্যে অনলঙ্ঘনীয় ব্যবধান সৃষ্টি করে; আবার প্রত্যেক ব্যবসায় তদবলম্বীদিগের মন ও চরিত্রের উপর ক্রিয়া করে বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়াবলম্বীদিগের মধ্যে বাস্তবিকই চরিত্রগত পার্থক্য সৃষ্ট হইয়া উঠে। সকল দেশেই যাহা হয়, ভারতেও তাহা হইয়াছে। এই জন্যই আদিম সহজ বর্ণাশ্রমধর্ম্ম আধুনিক কঠিন জাতিভেদে পরিণত হইয়াছে। সংস্কারের প্রয়োজন যে নাই, তাহা নহে। কিন্তু সংহারের আবশ্যকতা কোথায়?

প্রত্যেক ব্যক্তির উন্নতির জন্য পূর্ণ সুবিধা প্রদান করা সুস্থ ও স্বাধীন সমাজের লক্ষণ। বর্ণাশ্রমাবলম্বী সমাজে সে সুবিধা নাই, এই আপত্তি বর্ণাশ্রমের বিরুদ্ধবাদিগণ করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন জাতির মধ্যে কাহারও পক্ষে বিদ্যাদ্বার রুদ্ধ ছিল না। কেবল যাহারা শূদ্র ছিল, তাহারাই বিদ্যাচর্চ্চার সুবিধা হইতে কথঞ্চিত বঞ্চিত ছিল। সে শূদ্র জাতি আজি উন্নত হইয়াছে, বিদ্যাচর্চ্চার পথও আপনা হইতেই উন্মুক্ত হইয়াছে। বংশানুক্রমিক ব্যবসায়

স্থির থাকিয়া, বিদ্যাচর্চ্চার পথ সকলের পক্ষে অবারিত থাকিলে বর্ণাশ্রমের কোনও ক্ষতি নাই। ব্যবসায়-বিচার উঠিয়া গিয়াই সমাজে যত বিশৃঙ্খলার উৎপত্তি হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজ উদ্ভূত হইবার পূর্ব্ব হইতেই বিদ্যাচর্চ্চার পথ সকলের পক্ষেই উন্মুক্ত হইয়া আসিতেছিল। তবুও ব্রাহ্মসমাজ বর্ণাশ্রমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। তবেই বলিতে পাইব না কি যে ব্রাহ্মসমাজ পাশ্চাত্য সমাজের অনুকরণে হিন্দুসমাজ গঠন করিতে চেষ্টা করিয়াছিল?

বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বৈবাহিক আদানপ্রদান ও ভোজনব্যাপারটা কতকগুলি নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখিয়াছেন। ইহাতে যে কতটা সংযমশিক্ষা দিয়াছে— ব্রাহ্মসমাজ তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক মনে করেন নাই। বৈজ্ঞানিক ভাবে উক্ত বিষয়ের আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। বর্ত্তমানে অধিকাংশ লোকেই যখন ইন্দ্রিয় লালসায় ঘুরিতেছে, তখন বাহ্যতঃ বন্ধন রক্ষা করিয়াও বিশেষ সংযমশিক্ষা হইতেছে না, এ কথা সত্য। কিন্তু যে আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া ঋষিগণ উক্ত বন্ধন গঠন করিয়াছিলেন তাহার বিরুদ্ধে সমরঘোষণা কি পাশ্চাত্য সভ্যতার উপর অতিরিক্ত প্রীতির লক্ষণ নহে?

বর্ণাশ্রমধর্ম্ম মানুষের মনুষ্যত্বকে কখনও ঘৃণা করিতে শেখায় নাই, তা সে ব্রাহ্মণই হউক, আর চণ্ডালই হউক। বর্ণাশ্রম চেষ্টা করিয়াছে—নীচপ্রবৃত্তির হাত হইতে উচ্চ প্রবৃত্তিকে রক্ষা করিতে, তজ্জন্য যে যে বিধি আবশ্যক মনে করিয়াছে তাহা প্রণয়ন করিয়াছে। আমাদের উচ্চ প্রবৃত্তিনিচয় বিলয়োন্মুখ। তাহাদিগকে পুনরুজ্জীবিত করিতে হইলে বহুসংখ্যক বন্ধন স্বীকার করিতে হইবেই।

নব্যব্রহ্ম বর্ণাশ্রমধর্ম্মের মধ্যে কোনও গুণই দেখিতে পান নাই এবং তাহার কোনও অংশই রক্ষা করিবার চেষ্টা করেন নাই। সমাজ আপনার চিরাভ্যস্ত সংযম পরিত্যাগ করিয়া সুখের সন্ধানে ছুটিয়াছে, ব্রাহ্মসংস্কারকগণ বিলাসলালসায় অগ্নিতে ইন্ধন যোগাইয়াছেন। সমস্ত পাশ্চাত্য শিক্ষা শত উপায়ে শারীরিক সুখ বৃদ্ধি করিতে ও তাহাই প্রার্থনীয় বলিয়া শিখাইতেছে। গৃহে, বিদ্যালয়ে ও বাহিরে বালকেরা সংযম শিক্ষা পাইতেছে না, সংযমের আদর্শ প্রাচীন ব্যক্তিগণ ক্রমে ক্রমে আমাদিগের নিকট হইতে বিদায় লইতেছেন। এ অবস্থায় যে ধর্ম্ম আমাদিগকে সংযম শিখাইত, বিলাসিতার হস্ত হইতে রক্ষা করিত, ব্রাহ্মসমাজ তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া ভাল কাজ করেন নাই।

বর্ণাশ্রমবহির্গত সমাজে মহাজন ও শ্রমজীবীর মধ্যে আজ বিপুল সমর চলিয়াছে। সমস্ত মানবজীবনটাই তথায় সংগ্রামে পরিণত হইয়াছে। কঠোর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয় লাভ করিবার জন্য প্রতি মানব ছুটিয়াছে এবং অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল প্রতিদ্বন্দ্বীকে পায়ে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিতেছে। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যাহারা পরাজিত হইতেছে, তাহাদের দুর্দ্দশার সীমা থাকিতেছে না। শতাধিক বর্ষের পাশ্চাত্য সংসর্গের ফলে আমাদের সমাজে বর্ণাশ্রমের বন্ধন শিথিল হওয়ায়, আমাদেরও

জীবনক্ষেত্র সংগ্রামক্ষেত্রে পরিণত হইবার উপক্রম হইয়াছে। চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ দেশের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া ব্যাকুল হইয়াছেন। নিম্নপ্রাণী জগতে একে অন্যকে খাইয়া জীবন ধারণ করিতেছে। সুসভ্য মানবসমাজও কি সেই প্রাকৃতিক নিয়মের উপরে উঠিতে পারিবে না? না পারিয়াছিল, তাহা নহে। আমাদের সমাজবন্ধনের গুণে গৃহে গৃহে শান্তি বিরাজ করিত। হিন্দু পৈতৃক ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া যাহা পাইত তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিত, অন্যের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিত না।

নব্যব্রাহ্মসমাজ বিধবার বিবাহব্যাপারটি যে ভাবে গ্রহণ করিতেছেন তাহাতে মনে হয়, তাঁহাদের মতে বিধবার পক্ষে পুনর্বিবাহই শ্রেয়ঃ। কিন্তু ব্রহ্মচর্য্যব্রতপরায়ণা বিধবা সব সমাজেই পূজ্যা। বিবাহ অপেক্ষা ব্রহ্মচর্য্যই যে শ্রেষ্ঠতর তাহাতেও সন্দেহ নাই।

প্রত্যেক সমাজেই পারিবারিক বন্ধন বিমুক্ত এমন কতকগুলি লোকের প্রয়োজন আছে যাঁহারা সমস্ত শক্তি দিয়া দেশ ও সমাজের সেবা করিতে পারেন। অন্যান্য দেশে অনেক স্ত্রী ও পুরুষ স্বেচ্ছায় অবিবাহিত থাকিয়া সমাজসেবাব্রত গ্রহণ করেন। বিবাহ যে প্রতি মানবের অবশ্য করণীয় ব্যাপার এমন কথা কিছু নাই। আমাদের সন্তানবিহীন বিধবাগণকে সুশিক্ষা দিলে তাঁহারা কায়মনোবাক্যে স্বদেশের সেবা করিতে পারেন। তাঁহাদের দ্বারা অন্ততঃ স্ত্রীশিক্ষার যথেষ্ট সহায়তা হইতে পারে। ব্রাহ্মগণ সমাজহিতের এমন মূল্যবান উপকরণের সদ্ব্যবহারের চেষ্টা না করিয়া বিধবাগণকে পুনর্ব্বিবাহ-শৃঙ্খলে বদ্ধ করিতেই সমুৎসুক। দাম্পত্য সুখ কি স্বদেশ ও স্বজাতি-সেবা হইতেও বড় জিনিষ? দেবীপ্রতিমা বিধবাগণের সমক্ষে ব্রাহ্মগণ পুনর্ব্বিবাহের যে আদর্শ উপস্থিত করিয়াছেন তাহাতে ব্রহ্মচর্য্যের মহান্ আদর্শ ক্রমেই ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িতেছে।

সত্য বটে, আমাদের বিধবাদিগের মধ্যে অনেকে ব্রহ্মচর্য্যের মহান্ আদর্শ হইতে স্খলিত হইয়া পড়িয়াছেন, এমন দৃষ্টান্ত একান্ত বিরল নহে। কিন্তু সধবাদিগের মধ্যেও ওরূপ পদস্খলনের উদাহরণ পাওয়া যায়। ইহার প্রতিবিধান করিতে হইলে সুশিক্ষার ব্যবস্থা প্রয়োজন। আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করা সমীচিন নহে। সধবাদিগের পদস্খলন হইলে কেহ ত পত্যন্তর গ্রহণের সমর্থন করেন না; তবে বিধবার বেলাতেই কেন সে ব্যবস্থা হইবে?

নব্যব্রাহ্মসমাজ আমাদের সমস্ত জাতীয় প্রতিষ্ঠানকে আক্রমণ করিয়া আমাদের জাতীয় আত্মসম্মান-জ্ঞানকে চিরকালই ক্ষুণ্ণ করিয়া আসিয়াছেন। আজি স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে তাঁহারাই আবার হিন্দুর জাতীয়তা রক্ষায় অগ্রণী হইয়াছেন। তাঁহারা জাপানের উদাহরণ অনবরত আমাদিগের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া থাকেন——জাপান অল্পদিনের মধ্যে জাতীয় সমস্ত সংস্কার পরিত্যাগ করিয়া যাবতীয় ইয়োরোপীয় প্রণালী অবলম্বন করিয়াছে; জাপান আজি পাশ্চাত্য শক্তিনিচয়ের সমকক্ষ। কিন্তু তাহার দৃষ্টান্ত

বাস্তবিকই কি অনুকরণীয়? জাপান যখন প্রাচী গগন আলোকিত করিয়া নবোদিত সূর্য্যের ন্যায় প্রথম আমাদিগের লোচনপথবর্ত্তী হইয়াছিল, তখন বহু আশাপূর্ণ হৃদয়ে আমরা তাহার অভিনন্দন করিয়াছিলাম। আশা ছিল, প্রাচীর পুরাতন আদর্শের সহিত বাহুবল মিলিত হইয়া প্রাচ্য আদর্শকে জয়যুক্ত করিবে। আজি প্রতীচ্য জড়বাদ ও সাম্রাজ্যবাদ জাপানের অন্তঃস্থলে আশ্রয় লাভ করিয়াছে। একে একে প্রাচ্য সংস্কারনিচয় জাপান হইতে বিদায় লইতেছে। পাশ্চাত্য শক্তির সহিত জাপানের বিশেষ পার্থক্য আজ আর অনুভূত হইতেছে না। আজ জাপানের আদর্শ গ্রহণ করা ও ইয়োরোপের আদর্শ গ্রহণ করা একই কথা। শুধু বাহ্য সম্পদ আমাদিগের প্রার্থনীয় নহে। বাহ্য সম্পদকে আমরা ঘৃণা করিব না—কিন্তু যদি তাহাকে দায়স্বরূপে গ্রহণ করিতে না শিখি, তাহা হইলে তাহাতে আমাদের প্রয়োজন নাই। পরজাতিকে পীড়িত করিয়া আমরা বড় হইতে চাহি না, পরজাতিকে বঞ্চিত করিয়া আমরা ধনসঞ্চয়ে ইচ্ছুক নহি। আমরা চাহি, সমস্ত মানবজাতির মঙ্গল, আমরা স্বীয় উন্নতি চাহি সমগ্র মানবসমাজের উন্নতির জন্য। এই আকাঙ্ক্ষার চরিতার্থতা সম্পাদন করিতে হইলে জাতীয় জীবনের পূর্ব্বাহ্ণেই আমাদিগকে ত্যাগে ও সংযমে ভাল করিয়া অভ্যস্ত হইতে হইবে। তাহা যদি না হই—তাহা হইলে, যখন ক্ষমতা আমাদের হস্তে আসিবে, তখন জাপানের ন্যায় আমাদিগেরও মস্তিষ্কবিভ্রম উপস্থিত হইবে। কিন্তু এই ত্যাগে ও সংযমে অভ্যস্ত হইতে হইলে আমাদের সূক্ষ্মদর্শী ব্যবস্থাপকগণ কর্ত্তৃক স্থাপিত প্রতিষ্ঠানগুলিকে রক্ষা করিতে হইবে। সে গুলি যদি নষ্ট করিয়া ফেলি, তাহা হইলে শুধু গোড়া কাটিয়া আগায় জল দেওয়াই সার হইবে।

শ্রীতারকচন্দ্র রায়।

রাজর্ষি রামমোহন।

সুপ্ত পৌরজন যবে ঘুমে অচেতন
হে বিনিদ্র যোগী, শয্যা ত্যজি ব্রাহ্মক্ষণে
একা বাহিরিলে পথে, একতন্ত্রী সনে
গাহিলে অমৃত-গীতি যিনি নিরঞ্জন,
জলে স্থলে শূন্যে এক, আনন্দ যাঁহার
বিশ্বশতদল রূপে উঠিয়াছে ফুটি'
—রটিলে মহিমা তাঁর। সঙ্গীতে উদার
নিদ্রিত পুরীর স্বপ্ন তন্দ্রা গেল ছুটি,
কক্ষে কক্ষে গেল খুলি রুদ্ধ বাতায়ন।
হে জ্যোতিষি, ত্রিকালজ্ঞ, অভ্রান্ত গণিতে
ভারতের কোষ্ঠিপত্র করিলে রচন,
সত্য যাহা বর্ণে বর্ণে। তব হোমাগ্নিতে
শান্তি স্বস্ত্যয়নমন্ত্রে সর্ব্ব অকল্যাণ
ভস্ম করি' লোকান্তরে করিলে প্রয়াণ।

শ্রীসুঃ—

শঙ্খ।*

(গীতি-কবিতা।)

'প্রদীপ', 'কণকাঞ্জলি' ও 'ভুল'র কবি অক্ষয়কুমারের নূতন করিয়া পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। আধুনিক বাঙ্গলা সাহিত্যে যে কয় জন প্রধান গীতি-কবির অভ্যুদয় হইয়াছে, অক্ষয় বাবু তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম।

সে আজ প্রায় ত্রিশ বৎসরের কথা, যখন বালক অক্ষয়কুমারের লিখিত, "রজনীর মৃত্যু" বঙ্গদর্শনে, ও "পুনর্মিলনে" ভারতীতে প্রায় একই সময়ে প্রকাশিত হইয়াছিল। অক্ষয়কুমারের সাধারণে সেই প্রথম পরিচয়, —সেই প্রথম পরিচয়েই, সেই তরুণ বয়সেই, মনে পড়িতেছে অক্ষয়কুমার সাহিত্য-সমাজে কি সমাদর কি উৎসাহ লাভ করিয়াছিলেন! সেই সময়েই অক্ষয়কুমারের বিশেষত্ব রসজ্ঞের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। আমরা জানি তখনকার অনেক প্রধান সাহিত্যিক সেই দুইটি, কেহ বা ইহার মধ্যে একটি মাত্র কবিতা পড়িয়াই, অক্ষয়কুমারের পরিচয় লইতে উৎসুক হইয়াছিলেন। সে একদিন ছিল; তখন "যে লেখে সে পড়ে না," এমন দিন ছিল না! তখন ছোট বড় সকল সাহিত্যিকই, সমসাময়িক সাহিত্যের সংবাদ রাখিতেন! তখনকার বড় বড় সাহিত্যিক যাঁহারা, তাঁহারাও নবীন-লেখকের গুণের পরিচয় পাইলে, সাক্ষাতে বা পরোক্ষে অকপটে যথেষ্ট উৎসাহ দিতেন! নবীনলেখকেরাও বয়োজ্যেষ্ঠ সাহিত্যিকবর্গকে আন্তরিক সম্মান করিতেন, তাঁহাদের সহিত পরিচয়ের সুযোগ উপস্থিত হইলেই ধন্য হইতেন। সাহিত্যের সেই সুখের সেই শান্তির যুগে, অক্ষয়কুমার, বাণীর মন্দিরে, পূজার জন্য, ভক্ত-মণ্ডলীতে সম্মিলিত হন। তখন তরুণ রবির কিরণ সম্পাতে বঙ্গসাহিত্যের কাব্যকুঞ্জ ঝকমক করিতেছে, তাঁহার সঙ্গীতে বঙ্গ-সাহিত্য-প্রভাত মুখরিত হইতেছে,—তখন হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র যেন কতকটা শ্রান্ত—হেম বাবুর কথায় বলিতে গেলে, তখন 'হেম নবীনের নাইক জারিজুরি'!—সেই রবীন্দ্রীয় যুগের প্রারম্ভে, রবির আলোকের পার্শ্বেই নবীন-কবি অক্ষয় আপনার প্রদীপটি জ্বালিয়াছিলেন; রবির উজ্জ্বল আলোকেও তাঁহার সে দীপশিখা ম্লান হইয়া পড়ে নাই! সে প্রদীপে মায়ের আরতি সম্পন্ন হইয়াছিল। প্রতিভাবান কবি অক্ষয়কুমার যে সেই রবীন্দ্রীয় যুগের মধ্যেও আপনার বিশেষত্ব রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন, আপনার মধুর সুরে উদাত্ত রাগিণীতে বাঙ্গালী কাব্য-পাঠকের চিত্ত জয় করিতে পারিয়াছিলেন—তাহা বড় সাধারণ ক্ষমতার কাজ নহে। তার পর, দিনে দিনে, কঠোর সাধনায় বহু যত্নে বহু চেষ্টায় অক্ষয়কুমার আপনার সেই বিশেষ সেই স্বতন্ত্র সুরটি মধুর হইতে মধুরতর করিয়া তুলিয়াছেন।

অক্ষয়কুমারের কবিতা রত্নভূষিতা মহীয়সী সাম্রাজ্ঞীর মত;—ঝিল্লী-মুখরিত

* শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল প্রণীত। মূল্য ৸০

নক্ষত্রখচিত সান্ধ্যপ্রকৃতির মত। ইহার গম্ভীর ধ্বনি হৃদয়কে পূর্ণ করিয়া তোলে ;—সানাইয়ের করুণ রাগিণীর ন্যায় ইহা হৃদয়ের অন্তঃস্তল পর্য্যন্ত স্পর্শ করে। নবপ্রকাশিত কাব্য 'শঙ্খে' আমরা কবির এই গম্ভীর রাগিণীর যথেষ্ট পরিচয় পাই। গ্রন্থের নামটি বড় সঙ্গত হইয়াছে। ইহার ঝঙ্কার শঙ্খ-ধ্বনিরই মত গভীর, মধুর, সংযত ও মঙ্গলাবহ। শঙ্খের গম্ভীর ধ্বনির মধ্য দিয়া যেমন অনন্ত সমুদ্রের গভীর কল্লোলস্মৃতি আমাদের হৃদয়ে আসিয়া স্পর্শ করে, তেমনি কবির এ শঙ্খও তাঁহার অনন্তমুখী বিচিত্র হৃদয়ের কথা আমাদিগকে জানাইয়া দেয়। শঙ্খের সর্ব্বত্রই কবির এই গম্ভীর রাগিণী ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে। আমরা স্থল-বিশেষ হইতে উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন দেখিলাম না।

প্রেম-কাব্যে বাঙ্গলা-সাহিত্য চিরপ্রসিদ্ধ। অক্ষয়কুমারও এই প্রেম-মন্ত্রে দীক্ষিত। কিন্তু তাঁহার প্রেমকাব্যে একটু বিশেষত্ব আছে। প্রেমরাজ্যে অক্ষয়কুমার চির বিরহী। বিরহ-সঙ্গীতেই অক্ষয়কুমার তাঁহার প্রেমের সাধনা করিয়াছেন। এই বিরহ প্রেমের বস্তুকে চিরদিনই দূরে দেখিয়া থাকে ;—কাছে পাইয়াও পায় না। মিলনের মধ্যেও এই বিরহ-ভীতি জাগিয়া রহিয়াছে। বৈষ্ণব-কবিগণ যে বিরহ বীণার তারে ঝঙ্কার দিয়া বাঙ্গালীর হৃদয় উন্মত্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন—সেই বীণাই নব্য বঙ্গের কবি অক্ষয়কুমার অন্য সুরে বাঁধিয়াছেন। অক্ষয়কুমারের "প্রদীপ" ও "কণকাঞ্জলি" বিরহের এই করুণ রাগিণীতেই পরিপূর্ণ। তাঁহার বিরহ নিরাশ ভগ্নহৃদয়ের উন্মত্ত প্রলাপ নহে—তাহা সংযত হৃদয়ের গভীর মর্ম্মোচ্ছ্বাস ; উপেক্ষিত উপাসকের কাতর অভিমানোক্তি। প্রেম তাঁহার নিকট স্বার্থগন্ধশূন্য—লালসা পরি-বর্জ্জিত। প্রেমের বস্তু তাঁহার নিকট দেবতা। তাঁহার ভালবাসা—সাধারণ ভালবাসা নহে ; তাহা উপাসকের আত্ম-বলিদান। নারী তাঁহার নিকট কেবলমাত্র বিলাসের সামগ্রী নহে, নারী প্রেম-মন্দিরের দেবী, জীবনের আনন্দ। শঙ্খে এই সংযত প্রেমের আরও বিকাশ হইয়াছে। শঙ্খে নবীন বিরহীর সে ব্যাকুলতা, সে উচ্ছ্বাস নাই ; ইহাতে পরিণত হৃদয়ের শান্ত, গভীর প্রীতি বিরাজ করি-তেছে। জড়কে ছাড়াইয়া স্থূলকে ছাড়াইয়া এই কলুষশূন্য প্রেম বহু উর্দ্ধে উঠিয়া গিয়াছে, "আহ্বান" কবিতায় কবি বলিতেছেন—

"আজি কার কর দিয়া বুঝিছ আমারে প্রিয়া,
বুঝিছ কি মনঃপ্রাণ সব ?
নহে মৃৎ নহে শূন্য, নহে পাপ, নহে পুণ্য
আত্মায় আত্মায় অনুভব !
বুঝিছ কি কি আনন্দ এত আলো এত ছন্দ
এত গন্ধ, এত গীতি গান।
কত জন্ম মৃত্যু দিয়া কত স্বর্গ মর্ত্ত্য নিয়া
করি আজ তোমারে আহ্বান !
বিস্ময়ে কাতর চক্ষে হের এ কম্পিত বক্ষে
কত শোভা, কত ধ্বংস প্রিয়া !
শত শত ভগ্নস্তূপ কি বিরাট অপরূপ
জন্ম জন্ম আশা স্মৃতি নিয়া।
চিত্রে,শিল্পে,কাব্যে,গানে মগন তোমার ধ্যানে
তুচ্ছ করি কালের গরিমা !
পাষাণে পাষাণে রেখা তোমার প্রণয় লেখা
মর জড়ে—অমর মহিমা॥"

ইহা যে প্রেমের অতি উচ্চাবস্থা তাহাতে সন্দেহ নাই!

জীবনসঙ্গীতে অক্ষয়কুমার সাধারণতঃ দুঃখবাদী। এই পৃথিবী শোকদুঃখভরা, এ জীবন সংগ্রাম-ক্ষেত্র—আমরা নিয়তই এই জীবযুদ্ধে পরাস্ত হইতেছি, এই ভাব অক্ষয়-কুমারের কবিতার অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই দুঃখবাদ নাস্তিকতার দুঃখবাদ নহে। ইহাতে আত্মসুখহতাশ, ভক্তিহীনতার ঔদ্ধত্য নাই। জীবন-সংগ্রাম-কাতর ভক্তের ভগবানের নিকট করুণ প্রার্থনা আছে। কোথায়ও সন্দেহ নাই, সংশয় নাই। কখনও ইহা দুর্ব্বল মানবের আত্মদৈন্যের নিবেদন—

"দেহ কি চঞ্চলমর্ম্ম	কি ক্ষুধার্ত্ত অস্থিচর্ম্ম
সহস্র তাড়না,
এত নিগ্রহের মাঝে	ভুগিতেছি তব কাজে
কর হে মার্জ্জনা।
ফিরে লও তব দান,	এই দেহ মনঃ প্রাণ
শ্রান্ত, ক্লান্ত অতি;
ফিরে লও ভুল ভ্রম	পাপ তাপ বৃথা শ্রম
দাও অব্যাহতি।"

কখনও বা সংসার-দুঃখ-কাতর জীবনের করুণ প্রার্থনা—

"এই মায়া-মোহ-ক্লেশ	এই খানে হোক শেষ
তুমি যেন আর,
একটি একটি করি	ন্যায় তুলাদণ্ড ধরি
করো না বিচার।"

কিন্তু সংসারের এই অশুভের মূলে যে শুভ নাই, মঙ্গল নাই, তাহা কবি কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না—

"কোথা হে জগৎপিতা, ডাকি হে কাতরে,
দলিত, মথিত আমি সংসারসমরে।
নিত্য এই পরাজয়—দীনতার মাঝে,
বল তব শুভ ইচ্ছা সতত বিরাজে।
এ জীবন কালরাত্রি—বল' বল', নাথ,
অদূরে রয়েছে চির বসন্ত প্রভাত।"

জ্ঞানের রাজ্য বিজ্ঞানের—কবিতার রাজ্য আনন্দের। বিজ্ঞান যতই স্থূল জগতকে জয় করিতেছে, কবিতার রাজ্য ততই সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর জগতে সরিয়া যাইতেছে। এই যে 'তরুলতা পুষ্পভরা' পৃথিবী—এই যে মানব-জীবনের সাধারণ সুখদুঃখ—ইহা সকলই হয় ত একদিন কবিতার রাজ্যের মধ্যে ছিল। কিন্তু বিজ্ঞান ক্রমেই আপনার ক্ষেত্রকে বিস্তৃত করিয়া লইতেছে;—কবিতা ক্রমেই সেইরূপ নূতন নূতন জগতে আপনার মায়া বিকাশ করিতেছে। বিজ্ঞান প্রকৃতির রহস্যাবলী যতই ভেদ করিতেছে—অজ্ঞাত লোকের পর অজ্ঞাত লোক যতই মানুষের জ্ঞানের মধ্যে আসিতেছে—ততই কবিতার কার্য্য ক্রমে কঠিন হইয়া দাঁড়াইতেছে। সেই সরল শৈশবে—মানবের সভ্যতার প্রথম যুগে মানুষের চিত্ত সহজেই সরস হইয়া উঠিত; সহজেই প্রকৃতির আনন্দের মধ্যে ডুবিয়া যাইত। কিন্তু এই নীরস, কঠোর বিজ্ঞানের যুগে মানবচিত্ত আর তেমন সহজে ভুলে না। ইহাকে ভুলাইতে হইলে আরও উচ্চ গ্রামের সুর চাই, ইহাকে আনন্দ দিতে হইলে আরও সূক্ষ্মতর রসের অবতারণা করা চাই। তাই নব্য কবির কাজ বড় কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আধুনিক সভ্যতার বিপুল সংঘর্ষের মধ্যে—নিত্য কঠোর জীবন-

সংগ্রামের কোলাহলের মধ্যে—অবিশ্বাসী বিজ্ঞানের সতর্কবুদ্ধির মধ্যে—আনন্দের বার্ত্তা, রসের বার্ত্তা আনয়ন করাই নব্য কবির কাজ। এই নিত্য নূতন রচিত বৈচিত্র্যের মধ্যে—এই কঠোর নির্ম্মম প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে মানব-জীবনকে মধুর, জগতকে সুন্দর করিয়া তোলাতেই নবযুগের কবির সফলতা। “প্রদীপ” ও “কণকাঞ্জলিতে” এই নবযুগের কবিতার আভাস খুব কম দেখিতে পাই। “শঙ্খে” আমরা এই নবভাবের সূচনা দেখিতে পাইতেছি।

“শঙ্খের” তৃতীয় বা শেষ অংশের কবিতা-গুলিতে আমরা এই নবযুগের কবিতার আভাস অনুভব করিতে পারি। এখানে কবি মানবজীবনের সাধারণ সুখদুঃখ, বিরহ মিলন, হাসিকান্না হইতে অতি উর্দ্ধে চলিয়া গিয়াছেন। এই স্থূল জগতের অতীত সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর জগতে কবি তাঁহার আনন্দময়ী ‘মানসপ্রতিমা’কে দেখিতেছেন। দ্যুলোকে ভূলোকে তাঁহারই স্বপ্নগীতি কাঁপিয়া উঠিতেছে; ‘বিহগের সুরে ছন্দে’ ‘ফুলের বরণে গন্ধে’ তাঁহারই ললিত লীলার আভাস পাওয়া যাইতেছে। এই মানস-প্রতিমাকে লক্ষ্য করিয়া কবি বলিতেছেন—

“এই জীবনের পাশে এই স্বপনের শেষে,
কে যেন আমার আছে জীবন্ত কল্পনা বেশে ;
উড়ে কেশ বায়ু ভরে ছলছল দুনয়ান,
বুকে উছলিছে প্রেম, মুখে কত অভিমান।”

কবি এই মানস প্রতিমাকে চিরদিন ধরিয়া খুঁজিতেছেন, ধরি ধরি করিয়া ধরিতে পারিতেছেন না—

“বুঝিতে পারি না আমি এ খেলা কেমন !
চির দিন ধরি ধরি, খুঁজিয়া খুঁজিয়া মরি
সেই এই এই করি যাবে কি জীবন ?”

তাই ব্যাকুলভাবে তাঁহাকে আহ্বান করিতেছেন—তুমি কোথায়, কতদূরে—তুমি এস —

“কোথা তুমি কত দূরে কোন সুর-অন্তঃপুরে
স্বর্ণমেঘ দ্বারে দ্বারে রাখে কি আড়ালে ?
[illegible] চেয়ে দেখে দিক গাছে গাছে ডাকে পিক
কত শশী অনিমিখ চায় চক্রবালে।

* * *

তুমি [illegible] কখন গবাক্ষ খুলে
দেখ না বা [illegible] কত দীর্ঘশ্বাস ;
[illegible] শোভা কত [illegible] কত শোভা কত ছন্দ
কি যন্ত্রণা কি আনন্দ কি চির বিশ্বাস।”

এই মানস প্রতিমার অভাবে হৃদয় শূন্য—জীবন ব্যর্থ—জগৎ অসম্পূর্ণ—সমস্ত সঙ্গীত বেসুরো! যদি সে শুধু একটিবার আসিত, তবেই বুঝি এ সকলই সার্থক হইয়া উঠিত—মধুর হইয়া উঠিত—সুন্দর হইয়া উঠিত—

“এ জীবনে পূরিত সকল,
সে যদি গো আসিত কেবল !
গানে বাকি সুর দিতে ফুল বাকি তুলে নিতে
স্বপ্নে বাকি হইতে সফল—
সে যদি গো আসিত কেবল !
অযতনে ব্যর্থ হয় সবি !
ধরিয়া তুলিটি শুধু দুটি রেখা টেনে গেলে
শূন্য হৃদি হয়ে যেত ছবি।
কি কথা বলিতে হবে একবার বলে গেলে
লক্ষ্যহারা হয়ে যেত কবি !”

তবে কি এ মানবজীবনের আকুল প্রার্থনা কেহ শুনিবে না? ‘এ জীবন হেঁয়ালির চরণ পূরণ’ কি কোন দিনই হইবে

না? সেই অজ্ঞাত লোকের, সেই জীবনের পরপারের প্রিয়তমার সঙ্গে কি মিলন হইবে না? কবি তাই ব্যাকুলভাবে আহ্বান করিতেছেন ঃ—

"জ্ঞান আর নাহি জ্ঞান, শত বাহু বাড়াইয়া—
আকুলি ব্যাকুলি হৃদি তোমারে ডাকিছে, প্রিয়া
তরঙ্গে তরঙ্গে বিশ্ব— আলোকে আঁধারে মেলা,
ছায়া নিয়ে মায়া নিয়ে এ জীবন প্রেম খেলা।
'দাঁড়াও অভেদ আত্মা' পরলোক বেলাভূমে,
বাড়ায়ে দক্ষিণ কর মৃত্যুর নিবিড় ধূমে!
জগতের বাধাবিঘ্ন—জগতে পড়িয়া থাক্,
নীরবে সৌন্দর্য্য মাঝে কবিত্ব ডুবিয়া যাক্।"

ইহাই মানবজীবনের চরম কামনা। সমস্ত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া সেই মহা-সৌন্দর্য্যে ডুবিয়া যাওয়াতেই মানব জীবনের চরম সার্থকতা! আশা করি বঙ্গদেশ আরও অনেক দিন ধরিয়া এই সঙ্গীত শুনিবার অবসর পাইবে।

এতক্ষণ আমরা কবি অক্ষয়কুমারকে বুঝিতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু শিল্পী হিসাবেও অক্ষয়কুমার অতি কৃতী শিল্পী। আজকাল অনেকের মুখেই শুনা যায় যে ভাষা ও ছন্দ কবিতার আসল জিনিষ নহে; উচ্চ অঙ্গের কবিতার জন্য ভাষা ও ছন্দের সম্পূর্ণতার প্রয়োজন নাই। এ কথা কিয়ৎপরিমাণে সত্য হইলেও সম্পূর্ণ সত্য নহে। ভাষা ও ছন্দ ভাবের বহির্বিকাশ। যে কবিতার ভাষা ও ছন্দ পূর্ণাঙ্গ সুন্দর নহে, তাহাকে অসম্পূর্ণ না বলিয়া থাকিতে পারি না। সুগঠিত, সুন্দর, সুস্থ দেহ যেমন পূর্ণ মানবত্বের একটি অংশ, ভাষা ও ছন্দের সম্পূর্ণতাও তেমনই পূর্ণাঙ্গ কবিতার পক্ষে প্রয়োজনীয়। এই হিসাবে অক্ষয়কুমারের কবিতা বঙ্গসাহিত্যে আদর্শস্থানীয় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অক্ষয়কুমারের 'ইঙ্গিতে ভাষা ও ছন্দ যেন নৃত্য করে।' তাঁহার কবিতার ছন্দ অতি সুগ্রথিত, সুনিবদ্ধ; কোথায়ও অসম্পূর্ণতা নাই—কোথাও তাল-ভঙ্গ হয় নাই। ভাষার উপরে তিনি যেমন আধিপত্য লাভ করিয়াছেন তাহা বহু সাধনার ফলেই হইয়া থাকে। এক একটি শব্দ যেন শাণযন্ত্রে উজ্জ্বল করিয়া বসানো হইয়াছে। সুনিপুণ মালাকরের ন্যায় অতি যত্নের সঙ্গে, শৃঙ্খলার সঙ্গে তিনি সে গুলি সাজাইয়াছেন। আমরা "বিপত্নীক" শীর্ষক কবিতা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি। পাঠক দেখিবেন শব্দগ্রন্থনে অক্ষয়কুমারের কি অসাধারণ কৌশল!

সে শয়ন গৃহ এই, গৃহে সে আলোক নেই
আলোকে সে খেলা নাই খেলায় সে টান।

পালঙ্কের আশে পাশে সে হাসি আর না ভাসে
যবনিকা অন্তরালে সে মুগ্ধ নয়ান।

কত দিন গেছে চলে নাহি আর গৃহ তলে
লুণ্ঠিত অঞ্চল চিহ্ন চরণের রাগ।

শব্দচিত্রেও অক্ষকুমারেরর অসাধারণ নিপুণতা। দক্ষ চিত্রকরের ন্যায় অতি সহজেই তিনি তাঁহার অঙ্কনীয় মূর্ত্তি আমাদের চোখে ফুটাইয়া তুলেন। কবি 'বঙ্গভূমি'র ধ্যান করিতেছেন। একটি একটি দৃশ্যে বঙ্গ-মাতার একটি একটি মূর্ত্তি যেন আমাদের হৃদয়ে উজ্জ্বল করিয়া তুলিতেছেন ঃ—

"শত শৃঙ্গ বাহু তুলি' হিমাদ্রি-শিয়রে
করিছেন আশীর্ব্বাদ—স্থির নেত্রে চাহি';

শুভ্র মেঘজটাজাল দুলে বায়ুভরে,
স্নেহ-অশ্রু শতধারে ঝরে বক্ষ বাহি,'

* * * *

"গভীর সুন্দর বনে তুমি শ্যামাঙ্গিনী
বসি' স্নিগ্ধ বটমূলে—নেত্র নিদ্রাকুল!
শিরে ধরে ফণাছত্র কাল ভুজঙ্গিনী,
অবলেহে পা দু'খানি আগ্রহে শার্দ্দূল।

* * *

"বিস্তীর্ণ পদ্মার তুমি ভগ্ন উপকূলে
বসে' আছ মেঘস্তূপে অসিতবরণা!
নক্রকুল নত তুণ্ড পড়ি' পদমূলে,
তুলি' শুণ্ড করিযূথ করিছে বন্দনা।

'রবীন্দ্রনাথ', 'ঈশানচন্দ্র' 'নিত্যকৃষ্ণ বসু,' 'হেমচন্দ্র' প্রভৃতি যে কয়েকটি 'ব্যক্তিগত কবিতা' শঙ্খে স্থান পাইয়াছে, তাহাতে অক্ষয়কুমারের এই চিত্রাঙ্কণী ক্ষমতার আরও বিকাশ হইয়াছে। এগুলি যেন এক একটি ফটোগ্রাফ। ক্ষুদ্র 'সনেটের' পরিসরের ভিতর তিনি কি সুন্দরভাবে এক একটি মূর্ত্তিকে সম্পূর্ণরূপে চিত্রিত করিয়াছেন, তাহা দেখিলে তাঁহার কলাকৌশলের প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা 'নিত্যকৃষ্ণ বসু' নামক কবিতাটির উল্লেখ করিতে পারি। কবিতাটি এতই সুন্দর যে আমরা তাহা উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না—

"হে নিত্য, অনিত্য সব—সকলি দু'দিন!
সেই প্রেম—প্রীতি-স্নেহ-করুণ অন্তর,
দারিদ্র্যের মৃদু গর্ব্বে চরিত্র সুন্দর,
স্বভাবে সরল অতি কর্ত্তব্যে প্রবীণ।
ধীর ভাষা, স্থির আশা, জ্ঞান সর্ব্বাঙ্গীন,
সংসারের সুখে দুখে সদা অকাতর;
জীবন-পাবন-যজ্ঞে মগ্ন নিরন্তর—
হৃদয়ে অজেয় বীর, বিশ্বে উদাসীন।"

হে সুহৃদ্ গেলে কোন মানসের তীরে
নবীন প্রভাতে ল'য়ে নব জাগরণ!
রঞ্জিত দু'খানি পাখা পরাগে শিশিরে,
নয়নে জড়িত স্বপ্ন, সুখে গুঞ্জরণ!
বাণীর চরণ-পদ্ম ঘিরে' ঘিরে' ঘিরে'
করিতে জীবন গীতি পূর্ণ সমাপন!"

আমরা এইখানে 'শঙ্খের' কবিতার সমালোচনা শেষ করিলাম। বলিবার ইচ্ছা সত্ত্বেও এই অল্প পরিসরের ভিতর অনেক কথা বলা হইল না। যাহা হউক শঙ্খ যে একখানি অতি উৎকৃষ্ট কাব্য সংক্ষেপে ইহা বলিতে কোন দ্বিধা নাই, এখানি অক্ষয়কুমারের পরিবর্দ্ধমান কবিত্বগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। কেবল উপসংহারে শঙ্খের একটি বিশেষত্বের উল্লেখ করা আবশ্যক মনে করি। শঙ্খে কবির স্নেহ-প্রবণ চির নবীন হৃদয়ের সুরটি স্পষ্ট ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। এই কাব্য-মুকুরে, এই মসৃণ-শুভ্র শঙ্খে, তাঁহার হৃদয়ের ছায়া প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। আমরা এই কাব্যে কবি অক্ষয়কুমারের সঙ্গে সঙ্গে স্বভাব-শিশু গৃহী অক্ষয়েরও পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হই। সমসাময়িক কবি ভ্রাতাদের প্রতি এই "সরল হৃদয় কবি" যেরূপ প্রীতি ও সহৃদয়তা দেখাইয়া উদারতার ও গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন, সাহিত্যে তাহার দৃষ্টান্ত বড় বেশী মিলে না।

গ্রন্থারম্ভে কবি ভয়ে ভয়ে বলিয়াছেন—

"আসে যায় কেহ নাহি চায়
সবাই খুঁজিছে মুক্তামণি,
কে শুনিবে হৃদয়ে আমার
ধ্বনিছে কি অনন্তের ধ্বনি!"

কিন্তু আমাদের মনে হয়, কবির এই আশঙ্কার কোনই কারণ নাই। অনেকেই "মুক্তামণি" ফেলিয়া এই "অন্তরের ধ্বনি" শুনিবার জন্য ব্যাকুল হইবে।

সহ পরিবর্ত্তন। মানবে এবং ইতর প্রাণীর দেহে অনেক গঠন এরূপ ভাবে সংসৃষ্ট যে একটির পরিবর্ত্তন হইলে অপর কোনটিও পরিবর্ত্তিত হয়; কিন্তু অনেক স্থলেই আমরা ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারি না। একটি অপরটিকে নিয়ন্ত্রিত করে কি না, অথবা উভয়ই অন্য কোন পূর্ব্বতন দেহাংশ কর্ত্তৃক নিয়মিত হয়, তাহা বলা যায় না। জিওফ্রেয় পুনঃপুনঃ বলিয়াছেন যে অনেক অতিবিকৃত দেহাংশ এই ভাবে সংসৃষ্ট। বিশেষতঃ অনুরূপ দেহাংশ সকল যুগপৎ পরিবর্ত্তনশীল; যথা হস্ত ও পদের অংশ, দেহের উভয় পার্শ্বস্থ গঠন সকল যুগপৎ পরিবর্ত্তিত হয়। মেকেল অনেক কাল পূর্ব্বে বলিয়াছেন যে বাহুর * পেশি সকল যখন পরিবর্ত্তিত হয়, তখন পদযষ্টির পেশির ন্যায় হইয়া থাকে, এবং পদযষ্টির পেশিও পরিবর্ত্তিত হইলে বাহু-পেশির ন্যায় হয়। চক্ষু এবং কর্ণ, দন্ত এবং কেশ, গায়ের বর্ণ এবং কেশের বর্ণ, পায়ের বর্ণ এবং ধাতু (constitution);—এ সকল ন্যূনাধিক সহ-পরিবর্ত্তিত হয়। স্কফ্‌হশেন সর্ব্বাগ্রে দেখাইয়াছেন যে দৃঢ় পেশল দেহ এবং ভ্রূযুগের নিম্নস্থ উচ্চ অস্থি পরস্পর সহ-পরিবর্ত্তিত হয়। এই লক্ষণ অসভ্য জাতির মধ্যে প্রায়শঃ দেখা যায়।

উপরের বর্ণিত পরিবর্ত্তন সকল ব্যতীতও অনেক পরিবর্ত্তন আছে, তাহাদিগকে "যদৃচ্ছ" বলা যাইতে পারে, কেমনা তাহারা কোন প্রবর্ত্তক কারণ ব্যতীতও উৎপন্ন হয় এইরূপ আমরা অজ্ঞতাবশতঃ বিবেচনা করি। কিন্তু ইহা প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে যে ঐ সকল পরিবর্ত্তন, ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র পরিবর্ত্তনই হউক, অথবা আকস্মিক গুরুতর গঠন-বৈষম্যই হউক, প্রাণিগণের (আভ্যন্তরিক) ধাতুর উপরই অধিক নির্ভর করে, পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর তাদৃশ নহে।

বৃদ্ধির হার। অনুকূল অবস্থায় সভ্য মানব পঁচিশ বৎসরে সংখ্যায় দ্বিগুণ বাড়ে; আমেরিকার যুক্তরাজ্যে এইরূপ হইয়াছে। ইউলার একবার গণনা করিয়াছিলেন, তদনুসারে দ্বাদশ বৎসরেও দ্বিগুণ হইতে পারে। পঁচিশ বর্ষে দ্বিগুণ হইলে, ঐ যুক্তরাজ্যের বর্ত্তমান তিন কোটী লোক ৬৫৭ বৎসরে এরূপ ঘনভাবে পৃথিবীর জলে স্থলে বিস্তৃত হইয়া পড়িবে যে প্রত্যেক বর্গগজ * স্থানে চারিজন ব্যক্তি দাঁড়াইতে হইবে। ক্রমাগত জনসংখ্যা বৃদ্ধির মূল অথবা প্রধান প্রতিবন্ধক এই যে সকলের আহার প্রাপ্তি দুর্ঘট হইয়া উঠে, এবং সুখে বাস করাও কঠিন হয়। আমরা যাহা দেখিতেছি তাহা হইতে এইরূপই অনুমান করা যায়। যুক্তরাজ্যে আহার সংগ্রহ করা সহজ, এবং স্থানও প্রচুর আছে, (সুতরাং সংখ্যাও বাড়িতেছে)। এই সকল গ্রেট্ ব্রিটেনে যদি অকস্মাৎ দ্বিগুণ সুলভ হয়,

* স্কন্ধ হইতে কনুই পর্য্যন্ত।

* দুই হাত দীর্ঘ, দুই হাত প্রস্থ স্থান।

তাহা হইলে আমাদিগের সংখ্যাও দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইবে। সভ্যজাতির মধ্যে আহার-সংগ্রহের কাঠিন্য ও স্থানাভাববশতঃ বিবাহের সংখ্যা হ্রাস হয়। দরিদ্র শ্রেণীতে শিশুমরণের আধিক্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য; এবং সকল বয়সের লোক মধ্যেই দেখা যায় যে অতি জঘন্য গৃহে বাস করিলে ও বহু লোক একত্র বাস করিলে নানাবিধ পীড়ায় মৃত্যুর সংখ্যা বাড়িয়া যায়। মহামারিতে এবং যুদ্ধে যে লোকক্ষয় হয়, তাহা অনুকূল অবস্থায় শীঘ্র পূর্ণ হইয়া উঠে। দেশান্তর গমনেও জনসংখ্যা বৃদ্ধি কিছু কালের নিমিত্ত স্থগিত থাকে, কিন্তু অতীব দরিদ্র শ্রেণীতে এই কারণবশতঃ সংখ্যার বৃদ্ধির অধিক বাধা হয় না।

সভ্য অপেক্ষা অসভ্য মানবের জননশক্তি কম, এরূপ অনুমান করিবার কারণ আছে; এই কথা স্যালমান্ বলিয়াছেন। আমরা এ সম্বন্ধে নিশ্চয় কিছুই জানি না, কারণ অসভ্যগণের জনসংখ্যা গণনা করা হয় নাই। কিন্তু পাদরি মহাশয়দিগের এবং অন্যান্যের নিকট জানা যায় যে অসভ্যদিগের পরিবার ক্ষুদ্র, বৃহৎ পরিবার অতি অল্প। উক্ত মহাশয়গণ দীর্ঘকাল অসভ্যদিগের মধ্যে বাস করিয়াছেন, তাঁহারা এক বাক্যে ঐরূপ বলেন। উহারা অনেক দিন শিশুদিগকে স্তন্যদান করে, এ কথা অনেকেই বিশ্বাস করেন। উহাদিগের অপত্যসংখ্যা কম হইবার ইহা একটি আংশিক কারণ হইতে পারে। কিন্তু অসভ্যগণ অনেক কষ্ট ক্লেশ সহ্য করে, এবং সভ্যমানবের ন্যায় শরীর পোষণোপযোগী আহার সংগ্রহ করিতে পারে না। সুতরাং তাহাদিগের জননশক্তি হ্রাস হওয়া বিশেষ সম্ভব। আমার Variation of animals and plants under domestication নামক গ্রন্থে আমি দেখাইয়াছি যে গৃহপালিত পশু পক্ষীদিগের এবং আবাদী শস্য ও বৃক্ষের জননশক্তি, আরণ্য পশু পক্ষীর এবং জঙ্গলী শস্য ও বৃক্ষের জননশক্তি অপেক্ষা অধিক। জন্তুগণ হঠাৎ অধিক আহার পাইলে, অথবা স্থূলকায় হইলে, এবং অধিকাংশ উদ্ভিদ সারহীন মৃত্তিকা হইতে সারযুক্ত মৃত্তিকাতে আসিলে, জননশক্তি অল্লাধিক হ্রাস হয়; কিন্তু ইহাতে উল্লিখিত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সঙ্গত আপত্তি উত্থাপন করা যায় না। এ নিমিত্ত আশা করা যায় যে সভ্যমানব অসভ্যদিগের অপেক্ষা অধিক জননশক্তি-সম্পন্ন হইবে, কারণ সভ্যগণকে এক অর্থে বিশেষ ভাবে গৃহপালিত বলা যায়। গৃহপালিত জন্তুর জননশক্তির আধিক্য যেমন বংশানুগত, তেমনই সভ্যমানবেরও উহা বংশানুগত হইবে, ইহাই সম্ভব। অন্ততঃ যমজ উৎপন্ন হওয়া কোন কোন পরিবারে বংশানুগত হইয়াছে, এমত জানা যায়।

যদিও সভ্য মানব অপেক্ষা অসভ্যের জননশক্তি কম তথাপিও তাহাদিগের সংখ্যা কোন কোন কারণে নিতান্ত হ্রাস না হইয়া গেলে শীঘ্রই বাড়িয়া যাইত। সাঁওতালিরা ভারতবর্ষের পাহাড়িয়া জাতি, তাহারা এই কথার উত্তম দৃষ্টান্ত স্থল। কারণ মিঃ হান্টার দেখাইয়াছেন * যে টীকা

* cf. Annals of Rural Bengal, 1868, p.256.

দেওয়ার প্রথা তাহাদের মধ্যে প্রচলন করা অবধি, এবং অন্যান্য মারাত্মক রোগের প্রকোপ হ্রাস হওয়ায় ও যুদ্ধ বিগ্রহ বলপূর্ব্বক নিবৃত্ত করণে তাহাদিগের সংখ্যা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু যদি তাহারা নিকটবর্ত্তী স্থানে না যাইত এবং তথায় পরিশ্রম দ্বারা অর্থোপার্জ্জন না করিত, তাহা হইলে তাহাদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি হইত না। অসভ্যেরা প্রায় সকলেই বিবাহ করে; তথাপিও তাহাদিগের কিছু কিছু বাধা আছে, কারণ তাহারা সচরাচর নিতান্ত বাল্যকালে বিবাহ করে না। অনেক স্থলে যুবকদিগকে দেখাইতে হয় যে তাহারা স্ত্রী প্রতিপালন করিতে সক্ষম এবং যে অর্থ দ্বারা শ্বশুর শাশুড়ির নিকট হইতে স্ত্রী ক্রয় করে তাহাও উপার্জ্জন করিতে হয়। অনেক সময় আহার্য্য বস্তুর অভাবে সভ্যগণ অপেক্ষা অসভ্য জাতীয়গণের সংখ্যা হ্রাস হয়, কারণ তাহারা সময় সময় ভীষণ দুর্ভিক্ষে মারা যায়। দুর্ভিক্ষ সময়ে তাহারা অস্বাস্থ্যকর আহার করিতে বাধ্য হয়, সুতরাং স্বাস্থ্যভঙ্গ না হইয়াই পারে না। দুর্ভিক্ষ সময়ে এবং তৎপরে তাহাদিগের যেরূপ বিশীর্ণ হস্তপদ ও স্ফীত উদর হয়, তাহার বর্ণনা অনেক প্রকাশিত হইয়াছে। তখন তাহারা নানাস্থানে ভ্রমণ করিতে বাধ্য হয়, এবং আমি অষ্ট্রেলিয়াতে জ্ঞাত হইয়াছি যে, এই সময় তাহাদিগের শিশুগণ অনেক মরিয়া যায়। ঋতুর পীড়নে উহাদিগের মধ্যে দুর্ভিক্ষ হইয়া থাকে, এবং দুর্ভিক্ষও সময় সময় হয়-ই; সুতরাং এই হেতু বশতঃ উহাদিগের সংখ্যারও হ্রাসবৃদ্ধি হইয়া থাকে। উহারা চেষ্টা দ্বারা খাদ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হয় না, সুতরাং উহাদিগের সংখ্যাও বরাবর রীতিমত বৃদ্ধি হইতে পারে না। অসভ্যগণ আহারাভাবে নিতান্ত পীড়িত হইলে পরস্পরের আবাসভূমি দখল করিয়া বসে, সুতরাং পরস্পরে যুদ্ধ বাধিয়া উঠে। তাহাদিগের নিকটবর্ত্তী অসভ্যগণের সহিত সর্ব্বদাই যুদ্ধ করিতে হয়। আহার অন্বেষণের নিমিত্ত জলে স্থলে নানা বিপদে তাহাদিগকে পতিত হইতে হয়, এবং কোন কোন দেশে বৃহৎকায় হিংস্র জন্তুর উৎপীড়নেও তাহাদিগের অনেক ক্ষতি হয়। ভারতবর্ষেও ব্যাঘ্রের উৎপাতে অনেক জেলা জনশূন্য হইয়াছে।

জন-সংখ্যাবৃদ্ধির এই সকল প্রতিবন্ধক ম্যাল্‌থাস্ আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর প্রতিবন্ধকটি তিনি যথাযোগ্যরূপে আলোচনা করেন নাই। শিশু-হত্যা, বিশেষতঃ কন্যাবধ এবং গর্ভপাত করা, এই দুইটিই জনসংখ্যা বৃদ্ধির গুরুতর প্রতিবন্ধক। পৃথিবীর অনেক ভাগে এই সকল দুরাচার এখনও বর্ত্তমান। মিঃ ম্যাক্‌লেনান্ দেখাইয়াছেন যে শিশুহত্যা পূর্ব্বকালে আরও অধিকতর প্রচলিত ছিল। যত শিশু জন্ম গ্রহণ করে, অসভ্যেরা তাহাদিগের সকলকে প্রতিপালন করা অসম্ভব অথবা কঠিন মনে করে। উপরি উক্ত প্রতিবন্ধকগুলির মধ্যে ব্যভিচারকেও ধরিতে হয়, কিন্তু ইহা আহারাভাবে ঘটে না। জাপানের অবস্থাতে বিবেচনা হয় যে কোন কোন স্থলে জনসংখ্যা বর্দ্ধিত হইতে না দিবার উদ্দেশ্যেই ব্যভিচারকে বাড়িবার সুযোগ দেওয়া হইয়াছে।

যখন মানব মানবনামের গৌরব পাইবার অধিকারী হইয়াছিল না, সেই সুদূর অতীত কালের দিকে তাকাইলে বুঝা যায় যে সে সময় সে সহজ বৃত্তির দ্বারাই অধিক চালিত হইত, বুদ্ধির দ্বারা তাদৃশ নহে। বর্ত্তমান যুগের অসভ্যগণের অপেক্ষাও ঐরূপ অবস্থা তাহার বেশি ছিল। আমাদিগের প্রাথমিক অৰ্দ্ধমানব পূর্ব্ব পুরুষগণ শিশুহত্যা বহুপতিগ্রহণ, বোধ হয়, করে নাই। কারণ নিম্নপ্রাণিগণের সহজ বৃত্তি এত বিকৃত নহে যে তাহারা শিশুহত্যা বরাবর আচরণ করিবে, অথবা একেবারেই স্ত্রীঘটিত ঈর্ষা পরিত্যাগ করিবে। তাহাদিগের আহারাভাবে বিবাহের (স্ত্রী-গণের) প্রতিবন্ধকতাও হইবার কোন কারণ ছিল না। স্ত্রীপুরুষ অল্প বয়সেই মিলিত হইত, সুতরাং মানবের সেই পূর্ব্ব পুরুষগণ দ্রুতগতি বৃদ্ধির দিকে অগ্রসর হইতেছিল। কিন্তু সাময়িকই হউক, আর চিরস্থায়ীই হউক, কোনরূপ প্রতিবন্ধক অবশ্যই তাহাদিগের বৃদ্ধি কমাইয়া রাখিয়াছিল; বর্ত্তমান অসভ্যজাতীয়গণের অপেক্ষাও কঠোর ভাবে কমাইয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু সেই সকল প্রতিবন্ধক ঠিক্ কিরূপ ভাবের ছিল তাহা বলা যায় না; অনেক ইতর প্রাণীর সম্বন্ধেই আমরা তাহা বলিতে সক্ষম হই না। আমরা জানি যে দক্ষিণ আমেরিকায় যখন অশ্ব এবং গো-মহিষাদি মুক্তভাবে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল তখন তাহাদিগের সংখ্যা অসাধারণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। এ সকল প্রাণীর জননশক্তি অত্যন্ত অধিক নহে। হস্তীর জননশক্তি সকল প্রাণীর অপেক্ষা কম। সেও কয়েক সহস্র বৎসর মধ্যেই সংখ্যায় সমস্ত পৃথিবী পরিপূর্ণ করিতে পারে। প্রত্যেক জাতীয় বানরের সংখ্যাই অবশ্য কোন কারণে হ্রাস করিয়া রাখিয়াছে; কিন্তু ব্রেহ্‌মে মনে করেন, হিংস্র জন্তুর আক্রমণবশতঃই ঐরূপ হইয়াছে, তাহা হইতে পারে না। কেহই এরূপ বিবেচনা করিবেন না যে আমেরিকায় উক্ত জঙ্গলা অশ্ব এবং গো-মহিষাদির জননশক্তি প্রথমেই উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল; অথবা যখন প্রত্যেক স্থান উহাদিগের দ্বারা পূর্ণ হইয়াছিল তখন ঐ জননশক্তি আবার হ্রাস হইয়া গেল। এ স্থলে এবং অপর স্থলেও বহু প্রতিবন্ধক একত্র ক্রিয়া করে, সন্দেহ নাই; এবং ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাতেও ভিন্ন ভিন্ন প্রতিবন্ধক ক্রিয়া করিয়া থাকে। কিন্তু ঋতুর প্রতিকূলতাবশতঃ সময় সময় যে আহার্য্যের অসদ্ভাব উপস্থিত হয়, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর প্রতিবন্ধক। মানবের প্রাথমিক পূর্ব্বপুরুষগণেরও বোধ হয় এইরূপই হইয়াছিল।

(ক্রমশ)

শ্রীশশধর রায়।

ষড় দর্শন

৩

এক বস্তুর সহিত অন্য বস্তুর সংসৃষ্টভাব যে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয়, তাহা সবিকল্পক প্রত্যক্ষ। সবিকল্পক গম্য বস্তুর সম্বন্ধে আমরা শব্দের ব্যবহার করিতে পারি। সবিকল্পক দ্বারা বস্তু ও তদীয় গুণ ক্রিয়া প্রভৃতির পরস্পর সম্বন্ধ গৃহীত হইয়া থাকে। অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিকগণের মতে সমস্ত সবিকল্পক জ্ঞানই কল্পিত বস্তুকে অবলম্বন (বিষয়) করিয়া হইয়া থাকে। কারণ তাহাদের মতে একটী মাত্র সত্য পদার্থ। সবিকল্পক জ্ঞানের বিষয় দুই পদার্থের সংসৃষ্টতা। সুতরাং উক্ত দুইটী পদার্থের একটীও অন্ততঃ, তাহাদের মতে মিথ্যা এবং অপরটী সত্য পদার্থ, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। অতএব সবিকল্পক জ্ঞান মাত্রই মিথ্যা পদার্থ বিষয়ে সমুৎপন্ন ইহা তাহাদের সিদ্ধান্ত। বৌদ্ধ দার্শনিকগণও এই সিদ্ধান্তের পক্ষপাতী। ইহা স্থানান্তরে দেখান যাইবে।

বাহ্য বিষয় সম্বন্ধে আমাদের যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয় তাহা ইন্দ্রিয় জন্য প্রত্যক্ষ। আভ্যন্তর সুখ দুঃখাদি সম্বন্ধে যে প্রত্যক্ষ হয় তাহা ইন্দ্রিয় জন্য প্রত্যক্ষ। ইন্দ্রিয় পাঁচ প্রকার। চক্ষু, কর্ণ, রসনা, নাসিকা ও ত্বক্। বৈদান্তিকগণ মনের ইন্দ্রিয়ত্ব স্বীকার করেন না। চক্ষু দ্বারা রূপ প্রভৃতি, কর্ণ দ্বারা শব্দ, রসনা দ্বারা রস, নাসিকা দ্বারা গন্ধ ও ত্বক্ দ্বারা স্পর্শ প্রভৃতির প্রত্যক্ষ হয়। এবং মন দ্বারা সুখ দুঃখ প্রভৃতির প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয় সকল এবং মন স্বসংসৃষ্ট বিষয়েই জ্ঞান উৎপাদন করিতে সমর্থ। সে জন্য দূরস্থ ও ব্যবহিত বাহ্য পদার্থ ও অন্যের সুখ দুঃখাদির প্রত্যক্ষ হয় না। কারণ সে সকল পদার্থের সহিত আমাদের ইন্দ্রিয় ও মনের সম্বন্ধ হইতে পারে না।

রসনা, ত্বক্ ও নাসিকা দ্বারা দূরস্থ বস্তু গৃহীত হয় না। যে স্থানে উক্ত ইন্দ্রিয়গণ অবস্থান করে, সে স্থানে উপনীত রস, স্পর্শ ও গন্ধ প্রভৃতিই তদ্দ্বারা গৃহীত হইয়া থাকে। কিন্তু চক্ষু ও শ্রবণেন্দ্রিয়, মধ্যে আবরণ না থাকিলে দূরস্থ পদার্থও গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। সে জন্য চাক্ষুষ ও শ্রাবণ প্রত্যক্ষ সময়ে আমরা জ্ঞেয় পদার্থ ও জ্ঞাতার মধ্যবর্ত্তী দূরত্ব ও অন্তরাল বুঝিতে সমর্থ হইয়া থাকি।

কোন কোন দার্শনিক বলিয়া থাকেন যে চাক্ষুষ জ্ঞান সময়ে, আলোক সংযুক্ত পদার্থ চক্ষুতে প্রতিবিম্বিত হয় এবং সেই প্রতিবিম্বই মন দ্বারা গৃহীত হইয়া থাকে। তদনন্তর উক্ত প্রতিবিম্ব দ্বারা বাহ্য বিষয়ের অনুমান হয়। এই সিদ্ধান্তে আমাদের আস্তিক দার্শনিকগণ সম্মত নহে। তাঁহাদের অভিপ্রায় এই, যেমন আলোক সংযুক্ত পদার্থ, ও আলোক, উভয়ই আমরা চাক্ষুষ জ্ঞান দ্বারা বুঝিতে

পারি, সেইরূপ আলোকসংযুক্ত পদার্থের অভাব এবং আলোকের অভাব বা অন্ধকারও তদ্দ্বারা অনুভব করিয়া থাকি। অভাব বা অন্ধকারের প্রতিবিম্ব নাই। কেহই আলোকবিহীন স্থানে কখনও প্রতিবিম্ব অনুভব করেন না। সুতরাং প্রতিবিম্ববাদিগণের সিদ্ধান্ত স্বীকার করিলে, আলোক সংযুক্ত পদার্থের অভাব, এবং আলোকাভাব বা অন্ধকারের চক্ষু দ্বারা জ্ঞান হইতে পারে না। প্রতিবিম্ব বিচার সময়ে ইহার পুনর্ব্বিচার করা যাইবে। এ স্থলে প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে আর অধিক কিছু বলিব না। এইক্ষণ অনুমান সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করিতেছি।

ব্যাপ্য পদার্থ জ্ঞান হইলে ব্যাপক পদার্থের যে জ্ঞান হয় তাহার নাম অনুমান। ব্যাপ্য ও ব্যাপক এই দুইটী আপেক্ষিক শব্দ। কোন এক পদার্থ অপেক্ষা অপর পদার্থ ব্যাপ্য বা ব্যাপক হইয়া থাকে। যেমন বহ্নি ও ধূম। এ স্থলে বহ্নি ব্যাপক ও ধূম ব্যাপ্য। বহ্নি অপেক্ষা ধূম ব্যাপ্য এবং ধূম অপেক্ষা বহ্নি ব্যাপক। যে স্থানে ব্যাপকের অভাব থাকে, সে স্থানে ব্যাপ্য থাকে না এবং যে স্থানে ব্যাপ্য থাকে সে স্থানে ব্যাপকের অভাব থাকে না। এই অবস্থায় ব্যাপ্য ও ব্যাপকের এইরূপ লক্ষণ নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে যে, যাহার অভাবাধিকৃত স্থানে যে পদার্থ অবস্থান করে না, সেই পদার্থ তাহার ব্যাপ্য এবং যাহার আশ্রয়ে যে পদার্থের অভাব থাকে না সে পদার্থ তাহার ব্যাপক। বহ্নির অভাবাধিকৃত সরোবরাদিতে ধূম অবস্থান করে না সেজন্য ধূম বহ্নির ব্যাপ্য এবং ধূমের অধিকরণে বহ্নির অভাব থাকে না বলিয়া বহ্নি ধূমের ব্যাপক। ব্যাপ্য পদার্থ, কখনও ব্যাপক পদার্থকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না, সুতরাং যে স্থানে ব্যাপ্য পদার্থ জ্ঞান হয়, সে স্থানে ব্যাপক পদার্থের জ্ঞান হইয়া থাকে। ভূয়োদর্শন প্রভৃতি দ্বারা ব্যাপ্য ব্যাপক ভাব অবধারিত হয়।

প্রত্যক্ষ দৃষ্ট কোন পদার্থে, অপ্রত্যক্ষ পদার্থের সাদৃশ্য জ্ঞান হইলে, অপ্রত্যক্ষ পদার্থে প্রত্যক্ষ দৃষ্ট পদার্থের সাদৃশ্য জ্ঞান উৎপন্ন হয়, এই দ্বিতীয় সাদৃশ্য জ্ঞানই উপমিতি। অরণ্যস্থ গবয় দেখিয়া তাহাতে গৃহস্থিত গো'র সাদৃশ্য জ্ঞান হইলে গৃহস্থিত গো এই গোয়ের সদৃশ এইরূপ জ্ঞান হইয়া থাকে—ইহাই উপমিতি। গোর সহিত ইন্দ্রিয় সম্বন্ধ না থাকায় গৃহস্থিত গো গবয় সদৃশ এই রকম সাদৃশ্য জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ বলা যাইতে পারে না। এবং ব্যাপ্য ব্যাপক ভাব জ্ঞান না থাকিলেও এইরূপ জ্ঞান হইয়া থাকে, সে জন্য তাহা অনুমানের অন্তর্ভূতও হইতে পারে না। ইহা বৈদান্তিকগণের অভিপ্রায়।

শব্দ দ্বারা তদর্থ বিষয়ে যে জ্ঞান হয় তাহার নাম শাব্দজ্ঞান। শাব্দজ্ঞান দুই প্রকার। লৌকিকার্থ বিষয়ক ও অলৌকিকার্থ বিষয়ক। উক্ত শাব্দজ্ঞান দ্বিবিধ বলিয়া শব্দ প্রমাণও দ্বিবিধ। অন্য প্রমাণ দ্বারা অবগত বিষয় বুঝাইবার জন্য যে শব্দ ব্যবহৃত হয়, তাহা লৌকিক বা দৃষ্ট এবং অন্য প্রমাণের দ্বারা অজ্ঞাত বিষয় বুঝাইবার জন্য যে শব্দ ব্যবহৃত হয় তাহা

অলৌকিক বা অদৃষ্ট শব্দ। বেদ অদৃষ্ট শব্দের অন্তর্গত।

উপপাদ্য জ্ঞান হইলে, উপপাদকের যে কল্পনা করা হয়, সেই কল্পনা অর্থাপত্তি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। যে পদার্থ না থাকিলে, যাহা যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে না, তাহা সে পদার্থের উপপাদ্য; এবং যাহার অভাবে, যে পদার্থ যুক্তিসিদ্ধি হইতে পারে না, তাহা সে পদার্থের উপাদান। স্থূলশরীর কোন লোক, দিনে ভোজন করে না, ইহা দেখিলে এইরূপ কল্পনা করা হইয়া থাকে যে, অবশ্যই এই ব্যক্তি রাত্রে ভোজন করে। রাত্রে ভোজন কল্পনা, অর্থাপত্তির ফল। এস্থলে দিবা ভোজনবিহীন ব্যক্তির স্থূলকায়ত্ব উপপাদ্য, এবং সেই ব্যক্তির রাত্রিতে ভোজন উপপাদক। রাত্রি ভোজনের অভাবে, দিবা ভোজনবিহীন ব্যক্তির, স্থূলদেহত্ব উপপন্ন (যুক্তিসিদ্ধ) হইতে পারে না সুতরাং দিবোপবাসী ব্যক্তির স্থূলকায়ত্ব উপপাদ্য, এবং রাত্রিভোজন উপপাদক। কোন ব্যক্তির সঞ্চিত অর্থ নাই ও তাহাকে উপার্জ্জন করিতেও দেখা যায় না, এবং সে ব্যক্তি যথেষ্ট অর্থ ব্যয়ও করিয়া থাকে, এই অবস্থায়, তাহার চৌর্য্যবৃত্তি কল্পনা অর্থাপত্তি প্রমাণের ফল। নৈয়ায়িকগণ ইহাকে অনুমানের অন্তর্গত বলিয়া থাকেন।

ঘটের অভাব, ঘটের অনুপলব্ধি (ঘট জ্ঞানের অভাব) দ্বারা অনুভূত হয়। অনুপলব্ধি প্রমাণ দ্বারা অভাবের অনুভব হয়। যে গৃহে ঘট নাই, সেখানে ঘটের অভাব আছে, ইহা সর্ব্ববাদি সিদ্ধ। এই অভাব অনুপলব্ধি প্রমান গম্য। কোন আলোক সংযুক্ত গৃহে ঘট উপলব্ধি না হইলে, সে স্থানে আমরা ঘটাভাবের চাক্ষুষ অনুভব করিয়া থাকি। কিন্তু অন্ধকারাবৃত গৃহে তাহা হয় না। সেজন্য ঘটের অনুপলব্ধি মাত্র ঘটাভাব জ্ঞানের কারণ নহে। যদি এ স্থানে ঘট থাকে, তাহা হইলে অবশ্যই আমি দেখিতে পাইতাম, যে স্থানে এইরূপ তর্ক হইতে পারে, সেইরূপ স্থানেই অনুপলব্ধি দ্বারা অভাব জানা যায়। অন্ধকার গৃহে এইরূপ বিতর্ক উপস্থিত হইতে পারে না, সে জন্য সেখানে ঘটাভাবের জ্ঞান হয় না উক্ত বিতর্ককে, বৈদান্তিকগণ "যোগ্যতা" অর্থাৎ অনুপলব্ধির সামর্থ্য বলিয়া থাকেন।

প্রমাণ সম্বন্ধে অনেক কথা বলা আবশ্যক। কিন্তু এ স্থলে তাহার বিস্তার করিতে হইলে প্রকৃত বিষয় হইতে অনেক দূরে পড়িতে হয়, সে জন্য তাহা পরিত্যাগ করিয়া প্রস্তাবিত বিষয়ের বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইব। ন্যায়দর্শনের আলোচনা সময়ে প্রমাণ সম্বন্ধে বিস্তৃত বর্ণনা করা যাইবে।

এই ক্ষণে ইহা বিচার্য্য যে ব্রহ্ম প্রমাণসিদ্ধ কি না? প্রমাণসিদ্ধ না হইলে, কেহই তাহার অস্তিত্ব স্বীকার করিবেন না। সুতরাং ব্রহ্মের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রমাণ প্রদর্শন আবশ্যক। এই বিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে ব্রহ্ম প্রমাণসিদ্ধ। প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ, অর্থাপত্তি ও অনুপলব্ধি এই ষড়্‌বিধ প্রমাণ দ্বারাই ব্রহ্মের অস্তিত্ব সাধিত হইতে পারে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ব্রহ্ম সৎ, চিৎ ও আনন্দ স্বরূপ। এবং উক্ত তিনটীই পরস্পর অভিন্ন অর্থাৎ এক। আমাদের সকল জ্ঞানেই তাহা অনুভূত হয়। ক্রমশঃ ইহা প্রদর্শিত হইতেছে। আমাদের জ্ঞান মাত্রেই জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই ত্রিবিধ পদার্থ সৎস্বরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে। জ্ঞাতা বা অহং সুখ অর্থাৎ আনন্দ স্বরূপ। কারণ কেহই জ্ঞাতার নিজের অভাব প্রার্থনা করেন না। যাহার অভাব অনভিলষিত, তাহাই সুখ বা আনন্দ। জ্ঞান চিৎস্বরূপ। জ্ঞান দ্বারাই সকল পদার্থ প্রকাশিত হয়। যাহা প্রকাশক তাহাই চিৎ বা জ্ঞান নামে অভিহিত হইয়া থাকে। জ্ঞেয় পদার্থ সৎ

অর্থাৎ অস্তিত্ব স্বরূপ।' 'আমরা লৌকিক জ্ঞানে দুইটী পদার্থ অনুভব করিয়া থাকি। একটী সৎ এবং অপরটী নাম, রূপ বা ক্রিয়া। 'সৎ' এই অংশ ব্রহ্মরূপতা, ইহাই বেদান্ত মতে একমাত্র সত্য পদার্থ। নাম রূপ ও ক্রিয়া উক্ত সৎ পদার্থে কল্পিত। যাহা সকল সময়ে সর্ব্বত্র এক রকম অনুভূত হয়, তাহাই সত্য পদার্থ। 'সৎ' পদার্থ সকল সময়ে সর্ব্বত্র একরূপেই অনুভূত হইয়া থাকে। আমাদের যত প্রকার জ্ঞান হইয়া থাকে, সে সকল জ্ঞানেই 'সৎ' অর্থাৎ অস্তিত্বের উপলব্ধি হয়। অস্তিত্বের উপলব্ধি-বিহীন কোন জ্ঞানই হয় না। এমন কি অভাব জ্ঞানেও অভাবের অস্তিত্ব উপলব্ধি হইয়া থাকে। যখন ব্রহ্ম সৎ পদার্থ অর্থাৎ অস্তিত্ব স্বরূপ এবং সকল প্রকার জ্ঞানেই তাহার উপলব্ধি হইতেছে, তখন এই অস্তিত্বরূপ সৎপদার্থকে 'সকল প্রমাণ বা জ্ঞানগম্য বলাই যুক্তিসিদ্ধ। লৌকিক জ্ঞানে ব্রহ্মের পূর্ণ ভাব উপলব্ধি হয় না। তাহাতে ব্রহ্মের সহিত কল্পিত পদার্থের মিশ্রিত ভাবও জ্ঞাত হয়।' চিত্তের বিশুদ্ধতা সাধিত হইলে ব্রহ্মের পূর্ণ ভাব বেদান্তবাক্য জন্য নির্ব্বিকল্প প্রত্যক্ষ দ্বারা পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে। সবিকল্প প্রত্যক্ষ ও অনুমানাদি দ্বারা তাহার পূর্ণ ভাব উপলব্ধি হয় না। ব্রহ্মের পূর্ণ ভাব সাধারণ প্রমাণগম্য নহে, সে জন্যই শাস্ত্রকারগণ স্থানে স্থানে ব্রহ্মকে "অপ্রমেয়" এই শব্দ দ্বারা নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন।

ব্রহ্ম সম্বন্ধে আরও কতিপয় বিষয় বেদান্ত শীর্ষক প্রবন্ধে প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীগুরুচরণ তর্কদর্শনতীর্থ।

পতিতা

ষোল বৎসর বয়সে মোক্ষদা বিধবা হইয়াছিল। উপযুক্ত দেবর এবং যাতার অত্যাচারে ইহার পর সে আর অধিক দিন শ্বশুরগৃহে টিকিতে পারিল না। একদিন মলিন বেশে অনাথা বিধবা আসিয়া রামনগরে তাহার ভ্রাতার গৃহে আশ্রয় লইল। মোক্ষদা শৈশবে মাতৃহীনা, তার বিবাহের একবৎসর পরেই তাহার পিতার মৃত্যু হয়। জ্যেষ্ঠ দিগম্বর ছাড়া তাহার আপনার বলিবার আর কেহ ছিল না।

দিগম্বরের প্রথমা পত্নী মোক্ষদার সমবয়সী এবং বাল্যসঙ্গিনী ছিল। মোক্ষদা বিধবা হইবার কিছু দিন পরে দিগম্বরকে একটি পুত্ররত্ন উপহার দিয়া সেও স্বর্গারোহণ করিল। ছেলেটি এবং সংসারের ভার পড়িল মোক্ষদার উপর। সে অনেক চেষ্টা করিয়া জ্যেষ্ঠের আবার বিবাহ দিল। ইহাতে তাহার কাজ বাড়িল বই কমিল না। বালিকা-বধূর গৃহকর্ম্মশিক্ষা এবং যত্নের ভারও মোক্ষদার উপরই পড়িল।

দাদার সংসার লইয়া মোক্ষদার দিন একরকম সুখেই কাটিতেছিল। ছেলে ও বৌ লইয়া সে সুখের সংসার পাতিয়াছিল। দিগম্বর নিরীহ ব্যক্তি, ক্ষেতের কাজকর্ম্ম করে এবং বিশ্রামের সময় আপনার ঘরের দাওয়ায় বসিয়া তামাক টানে। সাংসারিক কোন কথা কেহ জিজ্ঞাসা করিলে বলে "মুখিকে জিজ্ঞাসা কর, ওই সব জানে।"

২

অশুভক্ষণে একদিন গ্রামের নূতন নায়েব নবীনকিশোর মোক্ষদাকে দেখিল। তাহার নিখুঁত অঙ্গ সৌষ্ঠব, স্বাস্থ্য-সৌন্দর্য্য

বিমণ্ডিত যৌবন নবীনকিশোরকে উদ্ভ্রান্ত করিল। তাহার ফলে সে কিছু ঘন ঘন দিগম্বরের বাড়ীর দিকে যাতায়াত আরম্ভ করিতে লাগিল এবং সুযোগমত একদিন মোক্ষদাকে তাহার ঘৃণ্য প্রস্তাব জানাইল। উত্তরে মোক্ষদা তাহাকে যাহা বলিল, তাহাতে বিফলমনোরথ নবীনকিশোর তাহার উপর জাতক্রোধ হইল। শেষে একদিন সন্ধ্যার পর পুকুরঘাট হইতে জল আনিবার পথে মোক্ষদাকে জমীদারের পাইকগণ জোর করিয়া নায়েবের বাসায় লইয়া গেল। কেহ জানিতেও পারিল না।

কি করিয়া যে মোক্ষদা এই নরপিশাচের হাত হইতে রক্ষা পাইল তাহা জানা যায় নাই, কিন্তু প্রাতে শুনিতে পাওয়া গেল যে গোমস্তা মহাশয় না কি অত্যন্ত পীড়িত। কাছারীর পাইকরা কাণাকাণি করিতে লাগিল যে ইহা মোক্ষদার কোমল পদ-পল্লবের আঘাতেরই প্রতিক্রিয়া।

সমস্ত রাত্রি মোক্ষদা গৃহে ফিরিল না, তখন দিগম্বর খুঁজিতে বাহির হইয়া দেখিল সদর রাস্তার ধারে মোক্ষদা সাশ্রুনয়নে একজন সাহেবী পোষাকধারীর সহিত কথা কহিতেছে—চারিদিকে চৌকীদারেরা এবং গ্রামবাসিগণ দূরে দূরে দাঁড়াইয়া আছে। দিগম্বর কাছে গিয়া জানিল যে ইনি মহকুমার হাকিম। মফস্বল পরিদর্শন করিয়া ফিরিবার পথে সাশ্রুনয়না মোক্ষদার নিকট তাহার দুঃখের কাহিনী শুনিতেছেন। ব্যাপার জানিতেও তাহার দেরী হইল না।

অল্পক্ষণ পরে হাকিম একজন চৌকীদারকে দিগম্বরের খোঁজে পাঠাইলেন। থানার দারোগা সেই খানেই ছিলেন—ডিপুটী বাবু তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন যে তৎক্ষণাৎ মোক্ষদার এজাহার লইয়া আসামী তলব দেওয়া হয়। দিগম্বরের ডাক হইলে সে কাঁদিতে কাঁদিতে হাকিমের সম্মুখীন হইয়া প্রণাম করিয়া জোড় হস্তে দাঁড়াইল। ডেপুটী বাবু তাহাকে বলিলেন—"এ তোমার ভগ্নী, ইহার উপর গোমস্তা অত্যাচার করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, যত দিন তাহার বিচার না হয় ততদিন কাহারো কথাতে তুমি ইহাকে তাড়াইও না। যদি জানিতে পারি তুমি ইহাকে গৃহে স্থান দাও নাই, তাহা হইলে তোমার পক্ষে সুবিধা হইবে না।"

বাড়ী আসিয়া বেচারা দিগম্বর অগ্নি-পরীক্ষায় পড়িল। একদিকে স্নেহমমতা, আজন্মের বন্ধন, বালিকা পত্নী এবং মাতৃহীন বালকের ক্রন্দন; অন্য দিকে সমাজের আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশীর তীব্রসমালোচনা। শেষে প্রবল প্রতাপান্বিত হাকিমের আদেশেরই জয় হইল, দিগম্বর কোন কথা না ভাবিয়া ভগ্নীকে গৃহে স্থান দিল।

৩

মোক্ষদার মোকদ্দমা আরম্ভ হইল, স্বয়ং ডেপুটী বাবু মোকদ্দমার উদ্যোগী, গভর্ণমেণ্টের নিমকহালাল দারোগা বাবু কি সে বিষয়ে কোনও উদাসীন্য দেখাইতে পারেন? তিনি যথাসাধ্য প্রমাণাদি সংগ্রহের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। দুষ্ট লোকেরা কিন্তু বলে গভীর রাত্রে অভিযুক্ত গোমস্তার মোহরেরকে তাহারা দারোগা বাবুর বাসায় যাতায়াত করিতে দেখিয়াছে। তা সে সব কথায় কাণ না দেওয়াই ভাল।

গোমস্তার বদনামে জমীদারের কলঙ্ক, কাজেই সে পক্ষ হইতেও তদ্বিরের কোন ত্রুটি হইল না। মোক্ষদার বুদ্ধিমান দেবর রামনাথ আসিয়া সাক্ষ্য দিল যে মোক্ষদার স্বভাবচরিত্র ভাল নহে এবং সেই জন্যই সে তাহাকে গৃহে স্থান দিতে পারে নাই, নতুবা অভাগিনী ভ্রাতৃজায়াকে দু'মুটা ভাত দিবে না এমন পাষণ্ড সে নহে। রাম-নাথ এক ঢিলে দুই পাখী মারিল, একদিকে জমীদারের এবং গোমস্তা মহাশয়ের প্রীতি

এবং সঙ্গে সঙ্গে মোক্ষদার বিষয়ের অংশ—দুটাই তার কাছে প্রবল প্রলোভন—এমন সুযোগ কোন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তি ত্যাগ করিতে পারে? এ হেন যোগাযোগে মোক্ষদার মোকদ্দমার ফল যাহা হইবার তাহাই হইল। ডেপুটী বাবুর একান্ত আগ্রহ ও চেষ্টা সত্ত্বেও উপযুক্ত সাক্ষ্য-প্রমাণের অভাবে মোকদ্দমা টিঁকিল না। নবীনকিশোরের মোক্তার প্রমাণ করিয়া দিলেন যে নবীনের মত ধর্ম্মাত্মা, জিতেন্দ্রিয় আজকালকার দিনে দুর্লভ এবং মোক্ষদা ব্যাপকা, দুশ্চরিত্রা ইত্যাদি। মোক্ষদা আর ধৈর্য্য ধরিতে পারিল না। ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। দয়াল হরি এ কি করিলে! সে ত কোন অপরাধেই অপরাধী নহে, তবে তারকপালে মিথ্যা এ কলঙ্ক কেন, ঠাকুর?

৪

ডেপুটী বাবুর সৎ উদ্দেশ্য ভাসিয়া গেল। আদালতে মোক্ষদা কলঙ্কিনী বলিয়া প্রমাণ হইল। এর উপর আর কথা চলে না। আদালত হইতে বাহির হইতে না হইতেই মোক্ষদার গ্রামের পাঁচ জন যাহারা সাক্ষ্য দিতে আসিয়াছিল, তাহারা মোক্ষদাকে উপলক্ষ্য করিয়া নেপথ্যে টিটকারি দিতে আরম্ভ করিল। নায়েব মহাশয়ের তদ্বির-কারকদের মধ্যে মোক্ষদার জ্ঞাতি-কুটুম্বও দুই চারি জন ছিল, তাহারা সামাজিক শাসনের ভয় দেখাইতে ছাড়িল না। তবে, তবে কি হইবে! মোক্ষদা ত এত কথা ভাবে নাই! সত্য কথাই ত।

এই ব্যাপারের পর দিগম্বর কেমন করিয়া সে সমস্ত সমাজের সকল প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজন ত্যাগ করিয়া সে কালামুখীকে আশ্রয় দিবে! অনাথিনী বিধবা এ কলঙ্কের ডালি মাথায় লইয়া কোথায় যাইবে? ভাবিতে তার বুক ফাটিয়া যাইতেছিল। তবে কি তার সেই আশৈশবের পিতৃগৃহ, যেখানে পিতামাতার স্নেহের ক্রোড়ে সে লালিত পালিত হইয়াছিল, যেখানকার প্রত্যেক গাছপালার, প্রতি ধূলিকণার সহিত তার যেন রক্তের যোগ,—সেখানে তার আর স্থান নাই। যে মাতৃহীন বালককে সে পুত্রাধিক স্নেহে পালন করিয়াছে, এক দিনের অকারণ কলঙ্কে কি সমাজ তাকে তার বুক হইতে ছিঁড়িয়া লইবে? আর তার বালিকা ভ্রাতৃবধূ—সে কেমন করিয়া তাকে ছাড়িয়া থাকিবে, সে যে মোক্ষদারই হাতে গড়া। স্নেহময় নিরীহ জ্যেষ্ঠ সহোদর দিগম্বর, সে যে মোক্ষদা ভিন্ন আর কিছুই জানে না! এই সব নানা কথা তোলা-পাড়া করিতে করিতে সে রামনগরে আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু বাড়ীর কাছে আসিয়া তাহার আর পা উঠিল না—সহৃদয় ডেপুটী বাবু যে স্ত্রীলোকটিকে তার সঙ্গে দিয়াছিলেন, তাহাকে বিদায় দিয়া বাড়ীর খিড়কির বাগানে এক গাছতলায় মোক্ষদা বসিয়া আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিল। সহসা গৃহে গিয়া তাহার নিরীহ ভ্রাতাকে কেন সে শুধু শুধু কলঙ্কের ভাগী করিবে? না—সে গৃহে প্রবেশ করিয়া সেই শান্তিময় গৃহে অভিসম্পাত আনিবে না। যা হইবার তা ত হইয়াছে, তার ভাগ্যে যা ছিল, তা ত ঘটিল; যা ঘটিবার তাও ঘটিবে, তবে ভ্রাতাকে কেন আর সে বিপন্ন করে?

না, আর সে ভাবিতে পারে না, শ্রান্ত, ক্লান্ত দেহে, অবসন্ন মনে, সে সেই গাছ-তলাতেই ঘুমাইয়া পড়িল।

৫

প্রাতে মোক্ষদার প্রত্যাগমন সংবাদ গ্রামে প্রচার হইবা মাত্র ক্ষুদ্র রামনগর গ্রাম সজীব হইয়া উঠিল। গৃহে গৃহে তাহার কথা লইয়া ঘোরতর আন্দোলন আলোচনা চলিতে লাগিল, মোক্ষদার কাহিনী শাখা পল্লবিত হইয়া মহিলা-মহামণ্ডলে প্রচারিত হইবা মাত্র মহা গণ্ডগোল উপস্থিত হইল।

বৃদ্ধারা গালে হাত দিয়া বলিল এমন বেহায়া মেয়ে তার বাপের কালেও কখন দেখে নাই। প্রৌঢ়া গৃহিণীরা মন্তব্য করিল—ও পোড়াকপালীকে গাঁয়ে ঢুকতে দিলে কে? ও গাঁয়ে থাকলে ছোট ছোট ঝিবৌ নিয়ে গাঁয়ে বাস করাই যাবে না। বেশ ত গিয়েছিল মহকুমায়, সেখানে থাকলেই হত। ইত্যাদি। যাহারা মোক্ষদার হইয়া কথা কহিল, তাহাদের সংখ্যা বড় বেশী নহে, সুতরাং তাহাদের মত 'ভোটে' টিকিল না, সুতরাং মোক্ষদা যে অসচ্চরিত্রা ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত হইয়া গেল।

ক্রমে কথাটা গ্রামের 'পরামাণিক' মধু মণ্ডলের কাণে উঠিল। বৃদ্ধ মধু বিজ্ঞতার ভাব দেখাইয়া বলিল—"হাঁ, তা ঠিক! এর একটা বিচার হওয়া চাই-ই চাই।" প্রথমেই মধু দিগম্বরের বাটী গেল, কিন্তু দিগম্বর দরিদ্র, মধুর মান রাখিতে পারিল না। অথবা ভবিষ্যতেও যে রাখিতে পারিবে এমন আশাও দিতে পারিল না! মধু তখন দিগম্বরের পক্ষে 'বিষ' হইয়া দাড়াইল, সে বিষ জীর্ণ করা যে সে দিগম্বরের কাজ নহে। মধুর অপমান! অচ্ছা দেখা যাক। তখন সমাজের উপকার করিবার ইচ্ছায় বড় মণ্ডলের ব্যাটা মধু নিঃস্বার্থভাবে উঠিয়া পড়িয়া লাগিল।

'পরামাণিক' মধুর এমন কাজ অনেক দিন জোটে নাই। গ্রামে স্বজাতির মধ্যে যে কখন কলঙ্কের কথা উঠে নাই, এমন নহে; কিন্তু মধু পরামাণিক সে সকল স্থলে বিচার করিবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে নাই, বরং তাহারই উদ্যোগে সে গুলি চাপা পড়িয়াছে। কিন্তু দিগম্বরের চাপা দেওয়াইবার কিছু উপায় ছিল না, কাজেই সমাজের শাসন সংরক্ষণার্থে মধু উৎসাহে গামছা কাঁধে ফেলিয়া সাধের হুকা কলিকাটি লইয়া দুপুরের মধ্যে রামনগর ও পার্শ্বের পাঁচ গ্রামের স্বজাতির বাড়ী ঘুরিয়া আসিল।

বৈকালে তারই গৃহে মোক্ষদার বিচারের বৈঠক বসিবে।

দেখিতে দেখিতে পরামাণিক মধু মণ্ডলের চণ্ডীমণ্ডপে লোক সমাগম হইতে লাগিল। ক্রমে পাঁচ গ্রামের সদ্গোপ জাতির পুরা পঞ্চায়েতের মজলিস বসিল। দা'-কাটা তামাকের তীব্র গন্ধে সমস্ত পাড়াটি আমোদিত হইয়া উঠিল।

মোড়লদের আদেশে একজন গিয়া দিগম্বরকে ডাকিয়া আনিল। বেচারা অপরাধীর ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে আসিয়া মুরুব্বিদের প্রণাম করিয়া এক পাশে গিয়া বসিল। পরামাণিক মধু কাঁধে গামছা খানি ফেলিয়া দাঁড়াইয়া "জাতের পাঁচ জনকে" মোক্ষদার কাহিনীটি বিস্তারিত বর্ণনা করিল, অবশ্য গোমস্তা মহাশয়ের সমস্ত দোষ গোপন করিয়া সমস্ত দোষ মোক্ষদার স্কন্ধেই চাপাইল। এখানে সাক্ষীর অভাব হইল না। গ্রামস্থ অনেকেই বলিল যে তাহারা অনেক দিন হইতেই লক্ষ্য করিয়া আসিতেছে যে মোক্ষদার "স্বভাব চরিত্তিরটা" ভাল নহে। নতুবা চাষার ঘরের বিধবা যে অমন "সাফ-সুতরা" হইয়া বেড়ায় তার ত একটা যুক্তি-সঙ্গত কারণ আছে? যাহারা অতিরিক্ত আত্মীয়তা দেখাইতে গিয়া মোক্ষদার নিকট অপমানিত হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ এমনও বলিল যে শুধু ঘটনার রাত্রে কেন, তার আগে একমাস ধরিয়া তাহারা মোক্ষদাকে কাছারী বাড়ীর দিকে যাইতে দেখিয়াছে।

ক্রমে ক্রমে মোক্ষদার দোষ প্রমাণ হইয়া গেল, 'ভাল মানুষ' দিগম্বর সবই শুনিতেছিল। তার উপর পঞ্চায়েতের হুকুম হইল যে সে মোক্ষদাকে গৃহে স্থান দিতে পারিবে না এবং মোকদ্দমার পূর্ব্বে যে বাড়ীতে মোক্ষদাকে থাকিতে দিয়াছিল এই অপরাধে শীঘ্রই কুটুম্বদের একটা পাকা-ফলার দিবে, নতুবা সে জাতিতে 'ঠেলা' থাকিবে, তার

ধোপা, নাপিত এবং পুরোহিত বন্ধ থাকিবে। হুকুম শুনিয়া বেচারা কাঁদিয়া ফেলিল। সে পুরোহিত এবং উপস্থিত প্রধানদের পায়ে ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল, গরীব সে—তার উপর দয়া হউক। কিন্তু মোড়লরা অটল। বৃদ্ধ পুরোহিত বলিলেন, "দেখ বাবু দিগম্বর, আমরা সবই বুঝিতেছি, মোক্ষদাকে তাড়াইলে, তোমার সংসার নষ্ট হইয়া যাইবে। কিন্তু কি করিব, বল? ব্যাপারটা যদি গোপনে হইত, তা হ'লে যেমন করে হোক চাপাচুপি দেওয়ার উপায় থাকিত। কিন্তু মোক্ষদার মোকদ্দমা তোমাদের জাতের কে না জানে? এমন স্থলে, মোক্ষদাকে জাতে লইলে এ গাঁয়ের লোকের সঙ্গে বাহিরের কেউ করণ-কারণ, খাওয়া-দাওয়া করিবে না। এ অবস্থায় মোক্ষদাকে ত্যাগ করা ছাড়া আর উপায় নাই। হ'তে পারে সে নির্দ্দোষী, কিন্তু সে কথা সমাজ মানবে কেন?" পুরোহিত ঠাকুর চুপ করিলে চারি দিকে মহাকোলাহল উপস্থিত হইল। সকলেই আপন আপন মত জাহির করিল এবং ভাল মন্দ নানা কথা দিগম্বরকে শুনাইয়া দিল।

এ দিকে কোন উপায় না দেখিয়া দিগম্বর পরামাণিকের পা জড়াইয়া ধরিল, বলিল "সে গরীব পাকা-ফলার দিতে পারে এমন সামর্থ্যই তার নাই। তবে যদি 'ক্ষেতের পাঁচ জন' দই চিড়ায় সন্তুষ্ট হন তবে সে চেষ্টা করিতে পারে! নইলে ছা'পোষা গরীব সে মারা যায়। মুরুব্বীদের দয়ার শরীর, তাঁহারা দয়া করিয়া তাহাতেই রাজী হইলেন। দাদা ঠাকুর ফর্দ্দ করিলেন—পাঁচশ টাকা সাড়ে বারো আনা খরচ হইবে। আয়োজনের ভার পড়িল দাদা ঠাকুর ও মধু পরামাণিকের উপর—তাহারা বলিল যে পাঁচশ টাকার মধ্যেই তাহারা সব সারিয়া লইবে। বাস্তবিক দিগম্বর গরীব, এর বেশী কোথা হইতে দিবে।

৬

অনেক বেলায় হতভাগিনী মোক্ষদার ঘুম ভাঙ্গিল, সে দেখিল তার পোষা বিড়ালটি তার পাশে বসিয়া তার আদরের প্রতীক্ষা করিতেছে, নিকটে দিগম্বরের স্ত্রী খোকাকে কোলে করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। মোক্ষদা চক্ষু মেলিবামাত্র খোকা ঝাঁপাইয়া তাহার কোলে গেল, মোক্ষদা খোকাকে জড়াইয়া ধরিল—চক্ষু দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। বৌ বলিল—"ঠাকুর ঝি, এখানে কেন? বাড়ীতে চল। আজ ক'দিন তোমাকে দেখতে না পেয়ে খোকার কি দশা হয়েছে দেখ।"

মোক্ষদা বলিল—"না, বোন, আমি আর ঘরে ঢুকবো না। এ অভাগিনীকে ঘরে নিলে তোদের অকল্যাণ হবে।"

বৌ বলিল—"ঠাকুরঝি তুমি না এলে আমরা কি করবো? খোকাকে ত রাখা যাবে না।"

মোক্ষদা বলিল—"আমি ত কোথাও যাব না, আর কোথায় বা যাব? তবে ঘরে ঢুকবো না। এই গাছতলাতেই আমার জায়গা।"

ক্রমে বেলা বাড়িতে লাগিল, বৌ আসিয়া অনেক খেদ করিয়া মোক্ষদাকে কিছু খাওয়াইল। খোকা সঙ্গে যাইতে চাহিল, মোক্ষদা কিছুতেই তাকে যাইতে দিল না।

পঞ্চায়েতের ডাক হইলে দিগম্বর একবার মোক্ষদার কাছে গিয়া সব কথা বলিল। মোক্ষদা বলিল, "দেখো দাদা আমার জন্যে যেন তোমার জাতপাত না যায়, আমার কপালে যা আছে তাই হবে। পাঁচজনে যা বলে তাতেই রাজী হ'য়ো।"

মোক্ষদা সমস্ত দিন গাছতলায় বসিয়া রহিল, কোথাও যাইতে তার শক্তিও নাই, প্রবৃত্তিও নাই। গ্রামের যাদের সঙ্গে তার খুব ভাব তারা কেহ তাকে একবার দেখিতেই আসিল না। কেবল তৃতীয় প্রহরে

তার বাল্যসঙ্গিনী সই সকলকে লুকাইয়া একবার আসিয়াছিল, তা' সেও তিরস্কারের ভয়ে বেশীক্ষণ থাকিতে পারে নাই।

দিগম্বর ফিরিয়া আসিলে মোক্ষদা সবই বেশ স্থির হইয়া শুনিয়া বলিল—"তা বেশ হয়েছে, দাদা তুমি আমার জন্যে বেশী দুঃখু করো না, মনে ক'রো আমি মরে গেছি।" বলিতে বলিতে তার অশ্রু আর বাধা মানিল না। দিগম্বর কি সান্ত্বনা দিবে ভাবিয়া না পাইয়া ধীরে ধীরে ঘরে গেল। সে রাত্রিও মোক্ষদা সেই গাছতলায় কাটাইবার উদ্যোগ করিল।

সেখানেও এক উৎপাত আসিয়া সন্ধ্যার পর জুটিল। সেই গোমস্তার চর। তবে স্ত্রীলোক। কেমন, মোক্ষদা এখন ঠাণ্ডা হইয়াছ ত? তার সকল পথ ত বন্ধ হইল কলঙ্কের অবধি রহিল না, এখনও যদি মোক্ষদার সুবুদ্ধি হয়, যদি সে গোমস্তার বাধ্য হয়, তবে এখনও সকল দিক রক্ষার উপায় আছে। তার কলঙ্ক ঢাকা পড়ে, ইচ্ছা করিলে ভাইয়ের ঘরে থাকিতেও পারে, আর আর সঙ্গে সঙ্গে কত টাকাকড়ি সোনা-দানার মুখ দেখিতে পায়।

মোক্ষদা ধীরভাবে সব শুনিল, বড় উত্তেজিত হইয়াছিল, কিন্তু কি ভাবিয়া কিছু বলিল না। এত দুঃখেও তার মুখে হাসির রেখা দেখা দিল। একটু মৃদু হাসিয়া সে বলিল "বৈষ্ণব বৌ, খুব হয়েছে, এখন বাড়ী যাও।" বৈষ্ণব বৌ ভাবিল, মোক্ষদা গভীর জলের মাছ—তার জালে এ সহজে পড়িবে না, তবে চার ধরিয়াছে, যাবে কোথা? সে হাসির অর্থ সে অন্যরূপ বুঝিয়াছিল।

*　　*　　*　　*　　*

কোন প্রলোভনেই মোক্ষদা প্রলুব্ধ হইল না। কত ভয়, কত লাঞ্ছনা, কত ষড়যন্ত্র, মোক্ষদা কিন্তু অটল। মোক্ষদা ভিক্ষা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে ভাবিল; সে চেষ্টাও করিল। প্রথম প্রথম বড় করিত, তা লজ্জা করিলে কি হইবে? নহিলে যে আর উপায় নাই, কিন্তু তাহাতেও নানা বাধা বিপত্তি! ছাই রূপ! এ রূপ ছাই না হইলে বুঝি আর মোক্ষদার নিস্তার নাই, তবে মোক্ষদা কি করিবে, কোথায় আশ্রয় পাইবে!

*　　*　　*　　*

আজ আর বুঝি মোক্ষদার রক্ষা নাই। মোক্ষদার হস্তপদাদি সমস্তই আবদ্ধ, তাহার করুণ চীৎকারেও কেহ অগ্রসর হইল না, আততায়ীরা মুখ বন্ধ করিয়া ফেলিল।

হায়, কপালে শেষে এই ছিল। কিন্তু কে উনি, কোন দেবতা করুণা করিয়া আজ এ বিপদ হইতে মোক্ষদাকে উদ্ধার করিলেন, বলিলেন—"আয় মা, আমার সঙ্গে আয়।"

রামনগর চাষার গ্রাম, অধিকাংশ জাতিতে সদ্গোপ। দুই এক ঘর ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁহারা ইহাদেরই যজন-যাজন করিয়া থাকেন। গ্রামের এক প্রান্তে কয়েক ঘর মুসলমানের বাস। সেখানে একটি আখড়া ছিল। আখড়ার বাবাজি হরিদাস—বৃদ্ধ, ধার্ম্মিক এবং সহৃদয় বলিয়া তিনি হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই বিশেষ শ্রদ্ধাভক্তি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। সিদ্ধ পুরুষ বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল। বহু দূর হইতে লোকে তাঁর আখড়ায় 'মানসিক' ভোগ দিয়া যাইত। লোকের বিশ্বাস ছিল যে তাঁর আশীর্ব্বাদ পাইলে দুরারোগ্য রোগও আরোগ্য হয়। তিনিও জাতি-নির্ব্বিশেষে সকলকে পরমস্নেহে আশীর্ব্বাদ করিতেন। তাঁর নাতিদীর্ঘ শুভ্রকেশ ও সুদীর্ঘ শ্বেতশ্মশ্রু মণ্ডিত প্রশান্ত বদনে এমন একটা জ্যোতিঃ ছিল যে দেখিলে স্বতই ভক্তির উদয় হইত। আখড়ায় সংসৃষ্ট ভূসম্পত্তি যথেষ্ট ছিল, এবং 'প্রণামী'তেও বিস্তর আয় হইত। বাবাজী এই সমস্ত অর্থ অতিথি-সেবায় ব্যয় করিতেন।

হিন্দু ও মুসলমানের জন্য তাঁর পৃথক অতিথি-শালা ও পৃথক বন্দোবস্ত ছিল। তিনি নিজে কিন্তু ভিক্ষা অন্নে জীবন ধারণ করিতেন। আজ তাঁরই অনুগ্রহে মোক্ষদা উদ্ধার পাইয়াছিল।

মোক্ষদা অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সেই বাবাজির আশ্রয়ই গ্রহণ করিল। নিজে সে পৃথক ভাবে থাকিত, স্বহস্তে রাঁধিত, সুতরাং বৈষ্ণবের আশ্রয় বলিয়া তাহার মনে কোন দ্বিধা উপস্থিতির কারণ ঘটে নাই। বাবাজির যত্নে, ব্যবহারে, মোক্ষদা মুগ্ধ হইয়া গেল। বাবাজিও মোক্ষদার গুণগ্রাম দিন দিন বিশেষ জ্ঞাত হইতে লাগিলেন। মোক্ষদা বাল্যকালে পিতৃহীনা, সে বাবাজির নিকট পিতার আদর ও স্নেহ পাইয়া ধন্য হইল। কৃতজ্ঞতায় তার হৃদয় ভরিয়া উঠিল। বাবাজির মনও অপত্যস্নেহরসে আপ্লুত হইয়া উঠিল। ক্রমে উভয়ের স্নেহ-বন্ধন দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর দাঁড়াইল। বাবাজির ধর্ম্মভাব, নিষ্ঠা, ঈশ্বরচিন্তা, প্রভৃতি দর্শনে অনুপ্রাণিতা মোক্ষদাও ধর্ম্মপথে ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিল। যদিও মোক্ষদার সমাজের অন্য বন্ধন আর ছিল না, যদিও সে হিন্দুসমাজের পরিত্যক্তা, পতিতা, তবু সে হিন্দু, হিন্দুর কন্যা সংস্কারবশে সরল বিশ্বাসে সে আপনার হিন্দুর সামাজিক আচার-ব্যবহারের গণ্ডীর ভিতর আবদ্ধ থাকিয়া সে হিন্দুর করণীয় ধর্ম্মানুষ্ঠানেই রত থাকিত। বাবাজি এ সকল দেখিয়া হাসিতেন, মোক্ষদার ধর্ম্মবিশ্বাস বিচলিত করিবার জন্য কোন দিন চেষ্টা করেন নাই। তবে সন্ধ্যার পর অবকাশ মত ধর্ম্মজগতের অনেক সার কথা তিনি মোক্ষদাকে শুনাইতেন।

* * * *

বাবাজি অসুস্থ হইয়া পড়িলেন, আর তিনি ভিক্ষায় বাহির হইতে পারেন না, স্বহস্তে রন্ধন করিয়া খাওয়াও আর তার পক্ষে কষ্টকর হইয়া উঠিতে লাগিল।

মোক্ষদা বাবাজির কষ্ট দূর করিবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিত, কিন্তু বাবাজি ত মোক্ষদার অন্ন গ্রহণ করিবেন না। মোক্ষদা যেরূপ পবিত্রা ও শুদ্ধাচারিণী তাহাতে মোক্ষদা বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে তার প্রস্তুত অন্ন ব্যঞ্জন আহার করিতে অবশ্য বাবাজির আপত্তি থাকিত না। এ বাবাজি আহারাদি সম্বন্ধে সাধারণ বৈষ্ণব অপেক্ষা বেশী নিয়ম পালন করিতেন।

* * * *

বাবাজির শারীরিক অবস্থা ক্রমেই মন্দ হইতে লাগিল। এখন তাঁর সেবা-শুশ্রূষার বড়ই আবশ্যক। মোক্ষদার হৃদয়ে অনেক সংগ্রাম চলিল।

* * * *

হরিদাস স্বর্গে চলিয়া গিয়াছেন, এখন মোক্ষদাই তার সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী। মোক্ষদা ইচ্ছা করিলে নূতন সংসার পাতিয়া সংসারের সুখে সুখী হইয়া ব্যবস্থা মত সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক রাখিতে পারিত—উইলে সে ইঙ্গিত ছিল—কিন্তু মোক্ষদা সে কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছিল। সে ধর্ম্মচিন্তায় মগ্ন থাকিয়া সন্ন্যাসিনীর বেশে বাবাজির সম্পত্তির সদ্ব্যবহার করিতে লাগিল। বাবাজির নিকট মোক্ষদা কেবল একটি বিষয় প্রার্থনা করিয়াছিল, বাবাজিও সানন্দে মোক্ষদাকে তার প্রার্থিত বিষয়ের সুব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। মোক্ষদার ন্যায় যাহারা সমাজচ্যুতা অথবা অদৃষ্টদোষে অধিকতর বিড়ম্বিতা, তাহারা সংভাবে থাকিলে আপন আপন আচার ও ধর্ম্মবিশ্বাস স্থির রাখিয়াও এই আশ্রমে আশ্রয় পাইত। বাবাজি এই আশ্রমের নাম দিয়াছিলেন "মোক্ষদা-কুটীর।" সে কুটীরে সংসারের ব্যথা বিতাড়িতা, সমাজনিপীড়িতা আশ্রয়চ্যুতা দ্বাদশটি অনাথা পতিতা চিরজীবন প্রতি-পালিত হইতে পারিবে।

শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিসন, ... দ্বারা মুদ্রিত